গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

(সুদীর্ঘ উপক্রমণিকা সহ)

প্রথম খণ্ড।

—:০:—

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-চরিত—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক,—শ্রীগৌর-গীতিকা—বাঙ্গালির ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি—শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-অষ্ট-কালীয়-লীলা স্মরণ-মনন পদ্ধতি—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহস্র-নাম-স্তোত্র—শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাই লীলাকাহিনী—প্রাচীন পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাসের জীবনী ও পদাবলী—গজপতি প্রতাপরুদ্র নাটক—শ্রীজাহ্নবা চরিত—সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি মহারাজ—সিদ্ধ বংশীদাস বাবাজি মহারাজ—উপদেশ-দ্বিশতক—বৈষ্ণব-বন্দনা—শ্রীনিতাই-গৌর-নাম-মাহাত্ম্য—শচীবিলাপ-গীতি—শ্রীমদ্বিশ্বরূপ-চরিত—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক—সার্ব্বভৌম-শতক—গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সন্দর্ভ—পকেট শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—বেদান্ত-স্যমন্তক ও মূর্খ শতক প্রভৃতি বহু ভক্তিগ্রন্থ লেখক এবং প্রকাশক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈষ্ণব-পত্রিকা "শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া গৌরাঙ্গ" সম্পাদক

প্রাচীন পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুর বংশীয়

শ্রীমন্নিত্যানন্দ পরিবার শ্রীপাট দোগাছিয়ানিবাসী

শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত ও প্রকাশিত।

—"গৌর-লীলা দরশনে, বাঞ্ছা হয় মনে মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি কেহ ইহা দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নবহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥"—

ঠাকুর নরহরি

বঙ্গাব্দ ১৩৪০—গৌরাব্দ ৪৪৭।

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ, বুড়াশিবতলা, শ্রীধাম নবদ্বীপ।

মুল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ রুদ্র প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
প্রিণ্টার—শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।
কলিকাতা ।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

সূচনা

আদিখণ্ড।

(২৯)

প্রিয়াজি কর্ত্তৃক নদীয়াবাসী গৌরভক্তগণের অন্তঃপুরাঙ্গন প্রবেশের অধিকার দান,—নদীয়াবাসিনী মাতৃস্থানীয়া বর্ষীয়সী বৈষ্ণবগৃহিণীগণের মনঃদুঃখ প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান কর্ত্তৃক প্রিয়াজির চরণে নিবেদন—প্রিয়াজির কৃপাদেশে তাঁহাদিগের অন্তঃপুর মধ্যে শুভাগমন ও প্রিয়াজির সঙ্গে গৌরকথার ইষ্টগোষ্ঠী—শুদ্ধ বাৎসল্যরসে গৌর-ভজনের উপদেশ দান—তাঁহাদিগের যথোপযুক্ত অতিথি সৎকার এবং সসম্মানে বিদায়—প্রিয়াজির আত্মবিলাপ—তাঁহার দণ্ডাত্মিকা-লীলা বর্ণন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের অষ্টোত্তর-শত-নাম-স্তোত্র বর্ণন—ঈশানের ব্রজরসাস্বাদন।

পৃঃ ৪১৭—৪৩৮

(৩০)

মর্ম্মী সখিদ্বয়ের পরামর্শে প্রিয়াজিকে গৌর-লীলার পূর্ব্বাভাসের প্রাচীন পদাবলী গান শুনাইবার প্রস্তাব—বিরহিণী গৌর-বল্লভা নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে গভীর নিশীথে পতিপাদপদ্মধ্যানমগ্না—উৎকট গৌরবিরহজ্বালায় তিনি যেন জর্জ্জরিত হইয়া মর্ম্মীসখিদ্বয়ের বদনের প্রতি প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে গৌর-বিরহতাপ কথঞ্চিৎ উপশমের জন্য সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—সখি কাঞ্চনা তাঁহার মনভাব বুঝিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবিত গৌরলীলার পূর্ব্বাভাসের পদাবলীর গান আরম্ভ করিলেন,—গান শুনিতে শুনিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার মধ্যে মধ্যে প্রেম-মূর্চ্ছা—সখিদ্বয় কর্ত্তৃক তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা—মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁহার কখন বা অর্দ্ধবাহ্য—কখন বা নিপটবাহ্যদশায় প্রাচীন মহাজনী পদাবলীর রসাস্বাদন—সখি কাঞ্চনা কর্ত্তৃক গৌর-বল্লভার তত্ত্ব কথন এবং চণ্ডীদাস ঠাকুর রচিত শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল লীলার পূর্ব্বাভাসের প্রাচীন একটী পদরত্ন গান—এই গান শ্রবণে বিরহিণী গৌরপ্রিয়ার ভাব-বিপর্য্যয় এবং মৌনভাব ধারণ,—পরে দিব্যোন্মাদ-দশা—মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা ও প্রেম-সমাধি—এই অবস্থায় তাঁহার অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন এবং মূর্চ্ছাভঙ্গে পুনরায় মৌনাবলম্বন—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের কাতর প্রার্থনায় তাঁহার স্বপ্নবিলাসলীলারঙ্গ কথন—সখি কাঞ্চনা কর্ত্তৃক এই স্বপ্নবিলাসের রহস্য কথন ও মর্ম্মোদ্ঘাটন এবং প্রিয়াজির স্বরূপ-তত্ত্ব কথন—বিরহিণী প্রিয়াজির মৌনভাব ধারণ—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের তাঁহার "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" দর্শনে আনন্দ—প্রভাতী কীর্ত্তন শ্রবণান্তে সখিবৃন্দ সহ প্রিয়াজির অন্তঃপুর গমন।

পৃঃ ৪৩৯ ক—৪৫৮ ক

(৩১)

শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর বৎসরান্তে পুনরায় শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথির আরাধনা—নদীয়াবাসী ও বিদেশী সর্ব্ব ভক্তগণের নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে নদীয়ায় শুভাগমন—তাঁহাদের শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-কীর্ত্তনে নবদ্বীপ মুখারিত—বিরহিণী প্রিয়াজি যথারীতি নিজ নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে পতিপাদপদ্ম-ধ্যানমগ্না,—তাঁহার এখন দশমী দশা—সখিবৃন্দের দারুণ উৎকণ্ঠা এবং তৎকাল ও ভাবোচিত প্রাচীন পদাবলীর রসাস্বাদন—প্রিয়াজির অপ্রকট প্রকাশের সূচনা,—হরিনাম মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা—গৌরবল্লভার অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায় প্রলাপ—বহিরাঙ্গনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের অভিষেক—ঈশানের অভিষেক-গীতি,—সমবেত গৌরভক্ত-বৃন্দের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের আবির্ভাব ও প্রিয়াজির প্রতি তাঁহার দৈববাণী—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সমবেত সখিবৃন্দের যুগল-কীর্ত্তনসহ বিরহিণী প্রিয়াজির অন্তঃপুরপ্রাঙ্গনে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে শুভ বিজয়—সখি ও নদীয়া-নাগরী-বৃন্দের যুগলমিলন-গীতি—শেষ বিদায় কালীন প্রিয়াজির সখিবৃন্দের প্রতি অপূর্ব্ব প্রীতি ব্যবহার—শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে বিরহিণী প্রিয়াজির প্রবেশ এবং অদর্শন—অপ্রকট প্রকাশে ভক্তবৃন্দের শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং মহা সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে নদীয়াযুগলসেবাকাঙ্ক্ষার বিজ্ঞপ্তি,—গ্রন্থকারের প্রার্থনা এবং আত্মনিবেদন প্রভু-প্রিয়াজির শ্রীচরণ-কমল-যুগলে—গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

পৃঃ ৪৩৯—৪৫৮

শুদ্ধিপত্র

উপক্রমণিকা।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
/০	১ম	৬	তুপাচাণাং	তুপচারাণাং
,,	২য়	১৬	উদ্ঘোষণ	উদ্ঘোষণ
/০	১ম	২৯	নাম্নিজীতি	নাম্নজীতি
,,	২য়	১০	ভাগবতমুদা	ভাগবতং মুদা
,,	,,	২৫	সাক্ষের	সাক্ষ্যের
,,	,,	২৭	নিজক্ত	নিজকৃত
,,	,,	৩১	দোষ ফাল	দোষকাল
১/০	১ম	২	ফলিতান্তঃকরণ	কলিলান্তঃকরণ
,,	২য়	৮	মন্তক্তনাং	মন্তক্তানাং
,,	,,	,,	ত্তে	স্তে
,,	,,	২১	প্রিয়তমঃ	প্রিয়তম
।০	১ম	৪	নৈ´চ	ন´চ
,,	,,	৬	মন্মংাত্মং	মন্মাহাত্মং
,,	,,	,,	মৎসপর্য্যাং	মৎসপর্য্যাং
,,	,,	,,	মৎসপর্য্যং	মৎসপর্য্যাং
,,	,,	,,	মচ্ছদ্ধাং	মচ্ছ্রদ্ধাং
,,	,,	২৬	ব্রজসুভ্রবঃ	ব্রজসুভ্রূণ
,,	২য়	৭	অনীর্ব্বচনীয়	অনির্ব্বচনীয়
/০	১ম	২৬	তীর্য্যগ	তির্য্যগ্
,,	,,	,,	বিষ্ণো	বিষ্ণোঃ
,,	২য়	১০	তুস্বাদাস্যং	তুস্বদাস্যং
,,	,,	১২	রূপায়	রূপায়
,,	,,	৩৬	একাত্মাবশি	একাত্মানাপি
।৴০	১ম	২	তদ্বয়	তদ্বয়ং
,,	,,	৪	,,	,,
।৶০	১ম	২	স্বরূপাশিক্তায়াং	স্বরূপাসিক্তায়াং
,,	,,	৩	রুল্লসন্ত্য	রুল্লসন্ত্যা
,,	,,	৪	মাধকং	মধিকং
,,	,,	১৫	সম্বাদিনীতে	সম্বাদিনীতে
,,	,,	১৭	নামাননং	নামানং
,,	,,	২৬	শস্তনীকার	শস্তনিকর

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	,,	২৭	সুগভ	সুভগ
,,	,,	৩২	বিষ্ণুপ্রিয়া	বিষ্ণুপ্রিয়া
,,	২য়	৯	সংমিশ্রিণ্	সংমিশ্রণ
,,	,,	২৯	উপহাসাস্কর	উপহাসস্কর
,,	১ম	২৯	সুগৃহিত নাম	সুগৃহীত নাম
,,	,,	৩১	মহাত্ম্য	মাহাত্ম্য
,,	২য়	১৩	লক্ষার্থ	লক্ষ্যার্থ
,,	,,	২৫	প্রকাশ	প্রবেশ
।৴০	১ম	২১	একধী	একধা
,,	,,	২৮	সংকল্প	সংকল্প
,,	২য়	৮	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত
,,	,,	১৯	অন্যাভিলাস	অন্যাভিলাষ
,,	,,	২৭	স্বসুখাভিলাস	স্বসুখাভিলাষ
,,	,,	৩১	এতএব	অতএব
,,	,,	৩৫	নৈস্ত্রিং	স্ত্রৈস্ত্রিং
।৶০	১ম	১২	স্ত্রীনাং	স্ত্রীণাং
,,	,,	৩০	ময়ী	ময়ি
,,	২য়	১৬	দ্বৈবিদ্ধ্য	দ্বৈবিধ্য
,,	,,	২৩	রূপানুগত্যে	রূপানুগত্যে
,,	,,	৩৩	শ্রীমহাপ্রভুর	শ্রীমহাপ্রভু
।৷৶০	,,	২	কারাইবার	করাইবার
৸০	১ম	৯	অরোপণ	আরোপণ
,,	,,	১৬	ময়া	ময়া
,,	২য়	২	উপাস্থ্য	উপস্থ্য
,,	,,	৪।৫	ঐ	ঐ
,,	,,	২৪	সুখ	সুত
,,	,,	২৬	দিপীকা	দীপিকা
,,	,,	২৭	লক্ষ্যাদি নামিব	লক্ষ্যাদীষামিব
,,	,,	২য়	ভাবনায়	ভাবনীয়া
,,	,,	৩০	লক্ষ্যাদিনামিব	লক্ষ্যাদীষামিব
৸৴০	১ম	১	ব্যুহ	ব্যূহ
,,	,,	৩	স্তেভ্যোপিহ	স্তেভ্যোপীহ

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃ	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	,,	৭	যাঁযাং	যামাং	১৯	,,	৩	সন্ধাকালে	সন্ধ্যাকালে
,,	,,	৯	কান্তাভাবে	কান্তভাবে	,,	২য়	২৪	তদবস্থার	তদবস্থায়
,,	,,	২২	লাম্পট্য	দাম্পট্য	২০	,,	৩	গোলোযোগ	গোলযোগ
,,	,,	২১	বৃন্দাব দাস	বৃন্দাবন দাস	২১	১ম	৩১	গৌরগাবিন্দ	গৌরগোবিন্দ
৸৶০	,,	২৯	পূর্ণ	পূর্ণো	২২	২য়	১৭	আমিতা	অমিতা
,,	,,	,,	মৌলি	মৌলিঃ	,,	,,	২৩	শ্যামের	শ্যামর
,,	২য়	২	গুরো	গুরোঃ	২৩	১ম	৮	করুণ	করুন
,,	,,	৩৩	শ্রিজীব	শ্রীজীব	,,	২য়	১৯	অন্তরঙ্গ	অন্তরঙ্গা
১৲	২য়	২৯	প্রামাণাভাবে	প্রমাণাভাবে	,,	,,	৩১	সাধ্যায়	স্বাধ্যায়
১৶০	১ম	১৭	ভার	ভাব	২৪	২য়	৫	চতুরত	চতুরতা
১৷০	,,	১৪	প্রতিপাণা	পতিপ্রাণা	২৫	১ম	৩৫	মম্মা	মর্ম্মী
১৷০	,,	১২	শরীর	শরীর	২৬	১ম	২১	নিমিলিত	নিমীলিত
,,	২য়	২৬	রচিত	চরিত	২৭	,,	৩২	অকুল	অকূল
			সূচনা।		২৮	২য়	২৬	কথাস্তুলি	কথাগুলি
২	১ম	৩৪	স্বর্ব্বস্ব	সর্ব্বস্ব	৩০	,,	২৫	পটিয়সী	পটীয়সী
৩	২য়	৮	দেখিয়া	দেখিতে	৩১	১ম	২৭	কাষ্ট	কাষ্ঠ
৪	১ম	৫	বিষদরূপে	বিশদরূপে	,,	২য়	২৮	বল্লেভর	বল্লভের
,,	২য়	৩৫	শ্রিগৌরঙ্গপার্ষদ	শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ	৩৬	,,	১৭	বিশিষ্ঠ	বিশিষ্ট
,,	,,	৩৬	দশাগ্রন্থ	দশাগ্রন্থ	৩৭	১ম	১৫	কম্পবান	কম্পমান
৫	১ম	২৮	সঙ্কুচিত	সঙ্কুচিত	১০	,,	১৯	অত্যাদ্ভুত	অত্যদ্ভুত
৬	২য়	৩	প্রভুতির	প্রভৃতির	,,	২য়	৩১	সকল	সফল
,,	,,	৬	পারমহংস	পারমহংস্য	,,	,,	৩৫	প্রখ্যালন	প্রখ্যাপন
,,	,,	১৪	ঐ	ঐ	৪৬	১ম	১	সাজের	সাঁজের
৭	২য়	২৩	সংকল্প	সংকল্প	,,	,,	১৩	সুখের	মুখের
৮	,,	২	অশ্রুজল	অশ্রুজলে	,,	,,	৩৫	দৈনন্দিত	দৈনন্দিন
১০	১ম	২৫	বৈরাগ খণ্ড	বৈরাগ্যখণ্ড	৪৭	১ম	২৪	মহ	মহা
,,	২য়	২৬	ব্যাথা	ব্যথা	৪৮	২য়	৪	সর্ব্বদলশেষে	দল সর্ব্বশেষে
১১	,,	১৬	আশ্চার্য্যের	আশ্চর্য্যের	৫০	,,	১৮	অবাস্তর	অবান্তর
১২	,,	৫	যে	যে	৫১	১ম	২০	আতঙ্ক	আতঙ্ক
			মঙ্গলাচরণম্।		৫২	,,	১৬	সপথ	শপথ
১৩	,,	৬	মনসৌ	মনসৌ	,,	,,	১৯	স্বরণ	স্মরণ
,,	,,	১২	নিজ ভাবলুব্ধঃ	নিজ ভাবলুব্ধ	৫৩	২য়	২৫	পিপাশা	পিপাসা
			আদিখণ্ড।		৫৪	,,	২২	দেহষষ্ঠী	দেহযষ্টি
১৫	১ম	১৪	বিশিষ্ঠ	বিশিষ্ট	,,	,,	২৭	সামর্থ	সামর্থ্য
১৬	,,	২	সম্ভারে	সম্ভারে	৫৫	১ম	১৪	প্রসমিত	প্রশমিত

পৃঃ	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭	,,	১০	হর	হের
৫৮	,,	১১	কল্পতরু	কল্পতরু
৫৯	,,	১০	আপনায়	আপনার
৬০	১ম	২২	ন্যুনতা	নূ্যনতা
,,	২য়	২৫	সুশ্রূষার	শুশ্রূষার
৬১	১ম	২২	কমলঙ্কিত	কমলাঙ্কিত
৬২	,,	২১	একুলে	একূলে
,,	২য়	৯	অনুপম	অনুপাম
৬৩	১ম	৩	হুতাসের	হুতাশের
,,	,,	৫	শূচীভেদ্য	সূচীভেদ্য
,,	,,	১০	বিরহভাব	বিরহ-ভার
,,	২য়	২৬	অমাবশ্যা	অমাবস্যা
৬৪	১ম	১৮।১৯	ঐ	ঐ
৬৫	১ম	২৫	জীবন	যৌবন
,,	২য়	১	অস্ফুরিত	অঙ্কুরিত
,,	,,	৩	স্কন্দদেশে	স্কন্ধদেশে
৬৬	১ম	২২	সাবল্য	শাবল্য
৬৭	২য়	৩০	নিক্রান্ত	নিক্রান্ত
,,	,,	৩৫	উচ্চৈঃশ্বরে	উচ্চৈঃস্বরে
৬৮	১ম	৩৫	মনব্যধা	মনব্যথা
,,	,,	৩৬	অবস্থা	অবস্থা
,,	,,	১৪	স্মরণ	শরণ
৬৯	১ম	২৯	প্রেমোন্দাদ	প্রেমোন্মাদ
,,	২য়	২৭	জলভরাক্রান্ত	জলভারাক্রান্ত
৭৪	১ম	৪	অমাবশ্যার	অমাবস্যার
৭১	১ম	৩	লোঠন	লোটন
,,	,,	৯	সতৃষ্ঠ	সতৃষ্ণ
৭৫	২য়	২৩	স্মতিপথে	স্মৃতিপথে
,,	,,	২৮	তাঁহা	তাঁহার
৭৭	১ম	৪	বিধ্বস্থ	বিধ্বস্ত
,,	২য়	৬	নরলীলা	নরলীল
,,	,,	২৫	সুরমুনি	সুরগণ-মম
,,	,,	৩১	অনুবন্ধ	অনুবন্ধ
৭৮	১ম	২১	জিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাসা
,,	,,	২৭	সুরমুনি	সুরমুনিগণ-মন

পৃঃ	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	২য়	৫	বৈশিষ্ঠ	বৈশিষ্ট্য
৭৯	১ম	২৭	একক্কী	একাকী
৮০	,,	১২	পয়ম	পরম
৮১	,,	৫	প্রাণেয়	প্রাণের
৮২	২য়	১৭	ভরপুর	ভরপূর
৮৪	,,	১৯	সহিত	সহিতঃ
৮৬	১ম	২২	সদন	দশন
,,	,,	২৪	সিধু	সীধু
,,	,,	২৫	ররজ	বরজ
,,	২য়	২৯	বিশিষ্টাশীর্বাদ	বিশিষ্টাবির্ভাব
৮৭	১ম	৪	কৃষ	কৃশ
৮৮	,,	৮	উপসম	উপশম
,,	,,	২০	সন্ন্যা ধর্ম্ম	সন্ন্যাস ধর্ম্ম
,,	,,	২৯	দেবহুতি	দেবহূতি
৯০	১ম	২	সম্পাতে	সম্পাতে
৯১	,,	২	প্রসমন	প্রশমন
৯৩	২য়	৭	সারদীয়	শারদীয়
৯৮	১ম	২৪	শোভার	শোভায়
৯৯	,,	৩৫	মত্তক্ত	মত্তক্তা
,,	,,	৩০	যেন দেখিতেছে	দেখিতেছে
,,	২য়	১৭	এমন	এখন
১০০	১ম	৫	লম্পাট	লম্পট
১০১	২য়	৭	কম্পবান	কম্পবান
১০২	১ম	২২	স্বতন্ত্রতার	স্বমন্ত্রতার
,,	২য়	৩	বিস্ময়েরা	বিস্ময়ের
১০৩	,,	২১	বিধ্বস্থ	বিধ্বস্ত
১০৪	১ম	৬	পুনং	পুনঃ
,,	,,	৭	প্রিয়তল	প্রিয়তম
,,	,,	২১	তোমারা	তোমরা
,,	২য়	২	অভিন্না	অভিন্ন
১১০	১ম	১১	সন্ধাকাল	সন্ধ্যাকাল
,,	,,	১৫	আনকথার	আনকথায়
,,	,,	১৫	বৃথার	বৃথায়
১১২	,,	৯	অরুণিত	অরুণিম
,,	,,	১৮	গৌর-বল্লভা	গৌর-বল্লভা

পৃঃ	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	,,	৩৪	কস্তুরি	কস্তূরি	,,	,,	১৪	দ্বীপ	দীপ
১১৩	,,	১১	হরিদাসিরা	হরিদাসিয়া	১৩৯	১ম	৮	কাস্ত্যঙ্গতে	কান্ত্যাঙ্গতে
১১৪	,,	১৬	কায়ব্যুহ	কায়ব্যূহ	,,	২য়	৪	অন্তপুরের	অন্তঃপুরের
১১৭	,,	১	রাধা	রাঁধা	,,	,,	৪	অঙ্গিনার	আঙ্গিনায়
,,	,,	৯	ঐ	ঐ	,,	,,	২৮	নিরূপায়	নিরুপায়
,,	,,	১১	মাতার	মাথার	১৪০	১ম	১২	হইয়া	লইয়া
১২০	,,	৮	সকালেই	সকলেই	১৪২	,,	১৩	টুলু টুলু	ঢুলু ঢুলু
,,	,,	১০	মর্ম্মান্তিক	মর্ম্মান্তিক	১৪৩	২য়	২১	বৈশিষ্টের	বৈশিষ্ট্যের
১২১	২য়	৪	মিঠে	মিটে	১৪৪	১ম	১	এই গম্ভীর	———
১২২	১ম	৩৩	যোগপীটে	যোগপীঠে	,,	২য়	২১	দ্বীপ	দীপ
,,	,,	৩৫	পরিবেষ্ঠিত	পরিবেষ্টিত	১৪৫	১ম	২	গম্ভীরা	গম্ভীর
,,	২য়	৩১	নবঙ্গলতা	লবঙ্গলতা	,,	২য়	২০	গিরাছিলেন	গিয়াছিলেন
১২৩	১ম	৪	মকুলিত	মুকুলিত	১৪৬	১ম	২৬	বিশিষ্ঠ	বিশিষ্ট
,,	২য়	৩২	তথাপি	তথাহি	,,	২য়	৩২	রসাস্বদ	রসাস্বাদ
১২৫	,,	৩৫	কম্পবান	কম্পমান	১৪৯	১ম	৫	ভাবোন্নম্	ভাবোদ্গম
১২৬	১ম	৩২	যোগদান	যোগদান	১৫০	২য়	৬	তথৈব	স্তথৈব
১২৭	,,	১৮	কোঠরাগত	কোটরাগত	১৫১	,,	১	যোগিণী	যোগিনী
,,	২য়	১১	কাঞ্চন	কাঞ্চনা	১৫৪	১ম	১৫	প্রেমানন্দ-রস	প্রেমরসানন্দ
১২৯	১ম	৩১	করিলেন	করিলে	১৫৫	২য়	১৮	শাস্ত্বনাবাক্য	সান্ত্বনাবাক্য
,,	,,	১২	উত্তমর্ণের	অধমর্ণের	১৫৮	২য়	২৪	বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
,,	,,	১২	অধমর্ণকে	উত্তমর্ণকে	,,	,,	২৬	আখি	আঁখি
,,	,,	৩১	স্বতন্ত্রতা	স্বতন্ত্র	১৫৮	১ম	২১	কস্তরী	কস্তূরী
,,	২য়	৩৫	তত্ত্ব	তত্ত্ব	,,	২য়	২৯	নাগরী	নাগর
১৩১	১ম	১৭	গৌরপ্রিয়া	গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া	১৬০	,,	১৭	কুলে	কূলে
১৩৩	২য়	৫	প্রসযন	প্রশমন	১৬১	,,	১৭	করিবে	করিবে,
১৩৪	১ম	২২	শ্রীবিষ্ণুপ্রিরা	শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া	,,	,,	৩৩	কস্তরী	কস্তূরী
১৩৫	,,	২৮	বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য	১৬৪	,,	১৪	দিৎদয়	নিরদয়
,,	২য়	৭	বরজ	বজর	,,	,,	৩৩	মো	সো
১৩৬	১ম	২০	হরযে	হরষে	১৬৬	,,	২৭	দুহুজনে	দুহুঁজনে
১৩৭	,,	৬	জানিয়ে	জাগিয়ে	১৭১	,,	৩২	যথন	যখন
,,	২য়	৩৪	ভুর্য্য	তূর্য্য	১৭৩	,,	২৫	ঔসুক্য	ঔৎসুক্য
,,	ফুটনোট	৩৭	বিজিস্তুতো	বিজৃম্ভিত	১৭৪	,,	১৪	ভারে	ভাবে
১৩৮	১ম	২৪	আসাধ্য	অসাধ্য	১৮০	১ম	১৮	বৈশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
,,	২য়	৫	সুচীকিৎসকের	সুচিকিৎসকের	১৮৩	২য়	৩১	সপে	সঁপে
,,	,,	১০	গোর	গৌর	১৮৬	১ম	১১	সুন্দর	সুন্দর

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	,,	২৪	সুন্দয়ং	সুন্দরং
,,	,,	২৫	মুন্দর	সুন্দর
১৮৭	২য়	১	হইয়	হইয়া
১৮৮	,,	৩০	করবী	করভী
১৮৯	,,	১৮	পবে	পরে
১৯১	১ম	১৫	প্রসমনার্থ	প্রশমনার্থ
১৯২	,,	১৪	ঘৃতদ্বীপ	ঘৃতদীপ
,,	,,	২৬	ভাবেই	ভাবই
১৯৩	২য়	১৭	রাধিনু	রাঁধিনু
১৯৪	১ম	২৪	ভারে	ভাবের
১৯৫	,,	৪	প্রসমনের	প্রশমনের
১৯৬	,,	৩৪	দ্বীপে	দীপে
২০২	,,	৩০	করিলেন	করিলেন,—
,,	,,	২২	পাগলিনার	পাগলিনীর
২০৪	,,	৩০	মাতৃদেবা	মাতৃদেবী
,,	২য়	২০	উপসম	উপশম
২০৬	,,	১২	সামর্থ	সামর্থ্য
২০৭	,,	১০	চাও	দাও
২০৮	১ম	১৪	ঘৃতদ্বীপের	ঘৃতদীপের
২১৫	২য়	১৫	নিস্বাসে	নিশ্বাসে
২১৮	,,	১৯	ফাসে	ফাঁসে
,,	,,	৩৪	আখি	আঁখি
২২০	,,	১	ঘৃতদ্বীপটি	ঘৃতদীপটি
২২২	১ম	১৯	নাই	নাহি
২২৩	,,	১০	বিষ্ণুপ্রিয়ার	বিষ্ণুপ্রিয়ায়
,,	,,	৩২	নিগুঢ়	নিগূঢ়
২২৪	২য়	২৫	ভাব	ভাষ
২২৫	,,	৩১	উত্তাল	উত্তান
২২৬	১ম	৬	এ	ঐ
২২৯	২য়	১১	জজ জীবন	জগজীবন
২৩৪	১ম	৩০	চুরী	চুর
২৩৭	,,	৫	পরচুর	পরচুর
২৩৮	,,	৩১	তাহাদের	তাঁহাদের
২৪০	,,	৮	প্রিরাজিকে	প্রিয়াজিকে
,,	,,	১০	উপসম	উপশম

পৃঃ	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
,,	,,	৩১	পার্ষদ	পার্ষদ
,,	২য়	৬	মুপুর	নূপুর
২৪১	,,	৩৭	ক্ষাণ	ক্ষীণ
২৪৩	,,	১৮	বধু	বধূ
২৪৪	,,	৭	কেল	কৈল
২৪৮	,,	৩২	কম্প	কম্পি
২৫১	,,	৬	পহিলাহি	পহিলহি
২৫২	১ম	১৯	চরণে	শ্রীচরণে
২৫৪	,,	১৮	দাড়াইয়া	দাঁড়াইয়া
২৫৫	২য়	১৩	তেঁই	তেঁহ
,,	,,	২০	নিবন্ধ	নিরবন্ধ
২৫৬	,,	১১	করিলন	করিলেন
২৫৮	১ম	৩৩	গুণণিধি	গুণনিধে
২৬৫	,,	৩২	এমনও	এখনও
২৬৬	১ম	১৪	লেষাভাস	লেশাভাস
২৬৮	১ম	১	গৌবহরির	গৌরহরির
১৬৯	,,	৮	পারে না	পারেন না
২৭৫	,,	১৩	সুসংস্কৃত	সুসংকৃত
২৭৭	,,	১২	প্রাণবল্লভার	প্রাণবল্লভের
২৮১	,,	৩১	দুকুল	দুকূল
,,	২য়	১২	পড়িল	গড়িল
১৮২	১ম	৩১	লখিমী	লছিমী
২৮৬	,,	১৯	লোহিত	লোলিত
২৮৯	,,	২৩	বিষ্ণুপ্রিয়ায়	হরিদাসিয়ার
২৯৪	,,	৩	নর	নব
২৯৮	২য়	৯	ভারে	ভাবে

মধ্যখণ্ড।

পৃঃ	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০৬	৩য়	৮	শেতবস্ত্র	শ্বেতবস্ত্র
৩০৮	১ম	৩২	প্রাণ-বল্লভার	প্রাণ-বল্লভের
৩০৯	,,	৩	বহিরাঙ্গণে	বহিরাঙ্গনে,—
৩১২	২য়	১৩	প্রকটিতই	প্রকটিত
৩১৩	,,	৩২	মাজ	আজ
৩২১	১ম	১০	এথনও	এখনও
,,	,,	২১	ঘৃতদ্বীপ	ঘৃতদীপ
৩২৭	,,	১	উভয়	উভয়ই

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২৮	,,	৩৬	যন	যেন
৩৩০	২য়	২	তাহ	তাহা
,,	,,	,,	অমি	আমি
৩৩১	,,	৩০	ধরিবেন	ধরিলেন
৩৩৪	,,	১৪	জগতময়	জগময়
,,	,,	২৬	যাঁহার	যাঁহার
৩৪১	১ম	১৫	নিল্লজতায়	নির্লজতার
৩৪৪	২য়	২৯	প্রসমিত	প্রশমিত
৩৪৬	,,	১৮	আমিতা	অমিতা

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪২২	,,	১৮	জাপনারা	আপনারা
৪২৩	২য়	২৫	শান্তনার	সান্তনার
৪২৮	,,	৯	প্রিরাজি	প্রিয়াজি
,,	,,	১৭	মধ্যে মধ্যে	———
৪৩৪	,,	১৩	লাগালিন	লাগিলেন
৪৩৫	১ম	২	য' নিখান	যা' লিখান
৪৩৬	,,	৩৬	প্রয়	প্রিয়
৩৪৩	,,	২৬	শোড়শ	ষোড়শ
৪৪৪	,.	১৩	যে	যে

অন্ত্যখণ্ড।

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪৭	,,	৮	যংকান্ত	যৎকান্তি
৩৫০	১ম	৩০	পড়িরাছে	পড়িয়াছে
৩৫৩	২য়	৩৬	সেল	গেল ॥
৩৬০	১ম	১২	পিষ্ঠদেশ	পৃষ্ঠদেশ
৩৬১	,,	১	রাজি আছে	রাজি নিহিত আছে
,,	,,	৮	প্রসংশা	প্রশংসা
৩৭০	২য়	১১	প্রিরাজিকে	প্রিয়াজিকে
৩৭১	,,	২৪	হাসবে	হাসচে
৩৭৬	১ম	২২	দেখ সবে	দেখ্‌বে সবে
,,	২য়	১	আসিয়াছ	এসেছ
,,	,,	১৯	ইহার	ইহার
৩৭৭	১ম	৩১	ঘৃতদ্বীপ	ঘৃতদীপ
৮০	২য়	১৫	যায়	যায়
,,	,,	২০	পীরিতি	পিরীতি
৩৯২	১ম	৫	ঘৃতদ্বীপ	ঘৃতদীপ
৩৯৩	২য়	৮	পরিধান	পরিধানা
৩৯৭	১ম	১৩	মহালক্ষী	মহালক্ষ্মী
৪১১	২য়	১২	তনি	তিনি
৪১২	১ম	২০	স্তবক	স্তবক
,,	,,	৩১	পিরিতি	পিরীতি
৪১৬	২য়	৩৫	সখিরি ললিতা	সখি ললিতার
৪১৮	,,	২১	চিন্তিয়া	চিন্তিয়া
৪১৯	১ম	১৩	ভক্তবৎসা	ভক্তবৎসলা
৪২০	,,	২৯	বৈষ্ণব-শক্তি	বৈষ্ণবী-শক্তি

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥"

শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামীপ্রভু

শ্রী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ কুঞ্জ,

৬ পুড়াশিবতলা, শ্রীধাম নবদ্বীপ.

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

—"আত্ম শোধিবার তরে দুঃসাহস কৈনু।
লীলা-সিন্ধুর এক বিন্দু স্পর্শিতে নারিনু॥"—
অদ্বৈত-প্রকাশ।

গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী মহা-মহাভাবময়ী সনাতন-নন্দিনী শ্রীশ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দুরধিগম্য ও বেদগোপ্য নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-লীলা-সমুদ্রের অগাধ ও অতলস্পর্শ সলিল মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া অমূল্য লীলারত্ন আহরণ করিবার বাতুল প্রচেষ্টা ও দুঃসাহস করিবার ধৃষ্টতার অভিমান প্রভুপ্রিয়াজি আমার মত হস্তিমূর্খ এবং সর্ব্বভাবে ভজনসাধনহীন অযোগ্য একটী নরপশু সদৃশ নগণ্য ব্যক্তিকে কেন দিলেন? এই প্রশ্নটি নিরন্তর আমার মনে স্বতঃই উদয় হয়, এবং ইহাতে সময় সময় আমার পাপ-কলুষিত হৃদয়কে অত্যন্ত মথিত ও ব্যথিত করে। আত্মশোধনের ইচ্ছা ও চেষ্টাটি আমার মত পাষণ্ডীর মনে যে সহজে উদ্ভূত হইয়াছিল—তাহা আমার মনে হয় না—কারণ আমি একটী নরপশু—এই নরাকৃতি পশুর মনে এরূপ একটী উচ্চ ভক্তিভাবপূর্ণ সৎবাসনা কখনই উদয় হইতে পারে না। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা-প্রেরণায় যদি এই ভক্তিভাবটি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে—তাহার অনুভূতির সৌভাগ্যটিতেও এই দুরাচারী এবং সর্ব্বভাবে অযোগ্য জীবাধম গ্রন্থকার সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত। ইহা আমার বৈষ্ণবীয় দৈন্যবাক্য নহে—কারণ আমার বৈষ্ণবাভিমান করিবার কোনরূপ অধিকার নাই। সর্ব্ব সাধুবৈষ্ণবের চরণ-ধুলিকণাই আমার পাপ-জীবনের একমাত্র সম্বল। তবে মনে আমার একটা দুঃসাহস আছে যে আমার পরম দয়াল কুলের ঠাকুর শ্রীনিতাইচাঁদ কেশে ধরিয়া আমার মত কুলাঙ্গার নরাধমকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভুবনমঙ্গল পাষণ্ডীদলন শ্রীচরণাঘাত দ্বারা যে দণ্ড-প্রসাদ প্রদান করেন—তাহার প্রবল তাড়নায় কখন কখন প্রভুপ্রিয়াজি সম্বন্ধে আমাকে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু হিজিবিজি লেখাপড়া করিতে হয়। "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং" এই শাস্ত্রশাসনে যদি কিছু ফল হইয়া থাকে—আর আমার পাষণ্ডীদলনবানা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর "জয়মঙ্গলের" ভয়ে যদি কিছু আবলতাবল লিখিয়া থাকি—তাহার কৃতীত্ব আমার অক্রোধ পরমানন্দ অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের অযাচিত কৃপাকণার অপূর্ব্ব মহামহিমার এবং তাঁহার পতিতপাবন নামের অত্যদ্ভুত মহামাহাত্ম্যের—অন্য কিছুরই নহে।

চির দিনই আমি আমার হৃদয়ের অতি বড় প্রিয় বস্তু মূর্খাভিমানটিকে অন্তরে অন্তরে অতি যত্নে পোষণ করিয়া আসিতেছি—তাহার ফলে আমার মূর্খতা ও শাস্ত্রজ্ঞানহীনতার দিব্যজ্ঞানটী আমার হৃদয়ের অন্তঃস্তলে নিরন্তর জাগরূক থাকে। আমি যে আজন্ম গোব্রাহ্মণদ্বেষী রাজসেবী এবং এখন পর্য্যন্ত রাজবৃত্তিভোগী নীচপ্রকৃতির বিষয়ী লোক, সে জ্ঞানটিও আমার পূর্ণ মাত্রায় আছে। সাধু-গুরুমুখে বা আচার্য্যমুখে ভক্তি-শাস্ত্রকথা-শ্রবণ-সৌভাগ্য আমার ঘৃণিত জীবনে কদাচিৎ কখনও হইয়াছে কি না সন্দেহ—সদ্বৈষ্ণব সাধুসঙ্গ আমার অদৃষ্টে আমার কুল-দেবতা বৈষ্ণব ঠাকুরগণ এবং আমার ভাগ্যবিধাতা শ্রীগুরুগোস্বামিমহারাজ লিখেন নাই। শ্রীধাম বৃন্দাবনে কিছুকাল বাসের সৌভাগ্য তাঁহারা আমাকে দিয়াছিলেন বটে—কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি সেই পরম দুর্লভ সৌভাগ্যের যথোচিত সম্মান ও আদর করিতে পারি নাই। তবে শ্রীগুরুমহারাজ ও সাধুবৈষ্ণবগণের প্রবল কৃপা-তাড়নায় আজি ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতিবর্ষব্যাপী প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে যাহা কিছু শ্রী প্রভু ও প্রিয়াজি সম্বন্ধে হিজিবিজি ও আবলতাবল লিখিয়াছি, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ ও ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণব-সাধুগণের যে মনমত হইবে না, বা হইতে পারে না—তাহা আমি বিশেষ করিয়া জানি ও বুঝি। তবে কূপোদকে শ্রীশ্রীনারায়ণশিলাকে স্নান করাইলে তাঁহার শ্রীচরণামৃত যেমন লোকে নত মস্তকে ধারণ ও পান করে—তদ্রূপ আমার এই কূপোদক তুল্য অতি হীন হিজিবিজি ভাবভক্তিশূন্য পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধে কোনই লালিত্য গুণ নাই সত্য—তথাপি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার সম্পর্কে ইহার আস্বাদে পরমোদার গৌরভক্ত সুধী বৈষ্ণবগণ অবশ্যই ইহাতে আনন্দানুভব করিবেন* সে বিশ্বাস আমি হৃদয়ে পোষণ করি।

---

* সমাশ্রিন সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতি ললিতা
মুদং ধাস্যন্ত্যেবৈতদপি হরিগন্ধাদ্ বুধগণাঃ।
অপ শালগ্রাম স্নপন-গরিমোদ্গার-রসরসাঃ
সুধী কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥
বিদগ্ধমাধব নাটক।

সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল একখানি প্রথম শ্রেণী শ্রীবৈষ্ণব-পত্রিকা পরিচালনে এবং ছোট বড় শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারতাদি ন্যূনাধিক ৩০।৪০ খানি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-গ্রন্থাবলী প্রণয়নে, —বিশেষতঃ সর্ব্ব শেষ "গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" শ্রীগ্রন্থ প্রণয়নে আমার ত্রুটি, বিচ্যুতি ও অপরাধের অন্ত নাই,—আমার নির্লজ্জতারও সীমা নাই—তাহা এই শ্রীগ্রন্থের সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র দেখিলেই কৃপাময় পাঠকপাঠিকাবৃন্দ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শিষ্য প্রশিষ্য অনুশিষ্য ও আমার অনুগতজন বহু আছেন, কিন্তু আমার এই দুঃসাহসিক বিরাট বৈষ্ণবসাহিত্যসেবা-কার্য্য সম্বন্ধে কাহারও নিকটে কোনরূপ সাহায্য আমি এপর্য্যন্ত পাই নাই। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কৃপাবলে একবারে কলমে আমার যাহা আসে—তাহাই কাগজে লিখিত হইয়া প্রেসে যায়। প্রেসে দিবার উপযুক্ত নকল করিয়া লিখিয়া দিবার যোগ্য এমন একটি মনমত লোক আমার ভাগ্যে কখন জুটিল না—আর আমার নিজেরও এ পর্য্যন্ত এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিবার উপযুক্ত অবসর হইল না। প্রুফ দেখা কার্য্যটি আমারই নিজস্ব একচেটিয়া কার্য্য,—যাহা গত দ্বাবিংশ বর্ষাধিক কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত রীতিমত চলিতেছে। অতএব এ সম্বন্ধে সকল ত্রুটি, বিচ্যুতি ও দোষই আমার অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ এবং নিজস্ব সম্পত্তি,—তজ্জন্য আমি মাথা পাতিয়া আমার নিজের এসকল অপরাধ ও দোষের জন্য কৃপাময় পাঠকপাঠিকাবৃন্দের চরণে অকপটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার স্বতন্ত্র-প্রকৃতিগত একটি মহা দোষ—তাহা আমি অকপটে স্বীকার করি। তবে যদি কেহ আমার দুর্দ্দশা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এবং আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাকে কোনরূপ সাহায্য করেন, তাঁহার নিকট চিরদিন আমি তাঁহার শ্রীচরণের দাস হইয়া থাকি। আমার বয়ঃক্রম এখন অষ্টষষ্ঠীতম বৎসর হইল। সুদীর্ঘকাল এই বিরাট বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রণয়নকার্য্যে নিজে সকল সময়ে সর্ব্ববিধ প্রুফ দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টি-শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। একটি চক্ষু আমার দৃষ্টিহীন,—ইহা আমার জন্মগত চক্ষুদোষ। কিন্তু পরমাশ্চর্য্যের বিষয় আমার এই চক্ষুদোষটী কাহারও দৃষ্টি গোচর হয় না, এবং ইহা কেহ জানেনও না। তদুপরি গুরু-তর দায়িত্বপূর্ণ আমার সরকারী কার্য্যোপলক্ষে দেশবিদেশে নানা স্থানে স্থিতির জন্য এবং সরকারী কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গত একাদশ বৎসর কাল শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যে নানা দেশ ভ্রমণজনিত বিশেষ অসুবিধার মধ্যে এবং সময়াভাবে প্রুফ দেখার গুরুতর কার্য্যটী বিদেশে কখন গাড়ীতে কখনও নৌকাতে কোন গতিকে আমাকে সমাধান করিতে হইয়াছে। এজন্য ভ্রম, প্রমাদ, অনবধান, ত্রুটি, বিচ্যুতি প্রভৃতি ইহারই ফল, এবং সে জন্য সর্ব্বতোভাবে আমিই প্রকৃতপক্ষে দোষী।

এই গ্রন্থে অনেক পদ একাধিকবার উক্ত হইয়াছে পুনরুক্তি দোষের জন্যও আমিই স্বয়ং দোষী,—তবে ভক্তি-শাস্ত্রে এরূপ পুনরুক্তি দোষ অমার্জ্জনীয় নহে। সাধারণ সমালোচক ও পাঠক পাঠিকার মনে ইহা দোষাবহ হইতে পারে। এ গ্রন্থ তাঁহাদিগের জন্য প্রণীত হয় নাই।

সর্ব্বশেষে সর্ব্ব গৌরভক্তগণের চরণে আমার বিনীত নিবেদন,—তাঁহারা আমার অদোষদরশী প্রভুর নিজজন,—সর্ব্বভাবে অযোগ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ এই বৃদ্ধ নরাধমের সর্ব্বপ্রকার দোষ ক্ষমা করিয়া তাহাকে শ্রীচরণধূলি দানে কৃতার্থ করুন।

"(সর্ব্ব) বৈষ্ণবের পদে মোর এই নিবেদন।
কৃপা করি মাথে সবে দেহ শ্রীচরণ।
শ্রোতা সবে পাদোদকে শুদ্ধ কর মন।
পাঠক পাঠিকা দাও চরণে শরণ॥
অধিকারী নহি মুঞি করোঁ পরমাদ।
প্রিয়াজি-চরিত লিখি মনে বড় সাধ॥
আত্ম শোধিবার তরে দুঃসাহস কৈনু।
লীলা-সিন্ধুর এক বিন্দু স্পর্শিতে নারিনু॥
দাস হরিদাসে তার' চরণে দলিয়া।
(সে) মরে যেন অন্তকালে গৌরাঙ্গ বলিয়া।"

দীন হীন হরিদাস গোস্বামী
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ—
শ্রীধাম নবদ্বীপ
১লা আশ্বিন ১৩৪০।

শ্রীশ্রীগৌর-বিধুর্জয়তি।

"মায়াবাদকুতর্কপুঞ্জতিমিরান্ সজ্যোৎস্নয়াস্তস্তয়ন্।
ভক্তিং ভাগবতীং প্রপন্ন হৃদয়ে কারুণ্যয়া ভাসয়ন্॥
বিস্রব্ধং মাধুর্য্যং প্রতিপদ নবং স্বান্তরঙ্গে প্রযচ্ছন্।
নটন্তং গৌরাঙ্গং স্মরতু মে মনঃ শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়েশং॥"

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার মহাভক্তিপূর্ণ ও প্রেমপবিত্রতাপূর্ণ চরিতের বর্ণন শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার সুচিহ্নিত ভক্ত ব্যতীত অপরের সাধ্য নহে। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর এই পুণ্য-পবিত্রতাময়ী প্রেমভক্তিময়ী মহাপতিব্রতা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবনী-লীলা একেবারেই মহা বিপ্রলম্ভরসময়ী। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবিপ্রলম্ভ-রসজনিত যে মহাভাব জীবগণের ভজন-সাধন মঙ্গলের জন্য প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহাতে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বহুপ্রকার অদ্ভুত ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। এমন কি বহিরঙ্গ ভক্তগণের চক্ষেও সে সকল অদ্ভুত ভাবের চিত্তচমৎকারজনক অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। শ্রীবৃন্দাবনে কালিন্দীতটে নিভৃত নিকুঞ্জে এবং কোন কোন লীলা-বিহার-স্থলীতে শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী দিব্যোন্মাদে উন্মাদিনী দুঃসহ প্রিয়-বিরহজনিত মহাভাবময়ী শ্রীরাধার যে সকল ভাব তাঁহার প্রিয় সহচরি সখীগণের সবিশেষভাবে সুগোচর হইতেন, নীলাচলে সুনীল জলধির তটান্তস্থিত শ্রীগম্ভীরা-মন্দিরে ভাব-গম্ভীর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণবিরহে মহাভাবনিচয় তদপেক্ষা বহুগুণে বৈচিত্র্যময়, গাম্ভীর্য্যময় এবং ভজনসাধনের উপযোগিতারও বহু পরে প্রগাঢ় নিগূঢ় রসপূর্ণরূপেই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। প্রেমভক্তি-সাধক একান্ত ভাবুক ভক্তগণের শিক্ষার্থ ও আস্বাদনার্থ উহার অভিব্যক্তি যে পরিমাণে প্রয়োজন শ্রীমন্মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলায় তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক বিপ্রলম্ভরসময় ভাবপ্রকটন পরিলক্ষিত হইত। কেন না কেবল লোক-শিক্ষাই উহার উদ্দেশ্য ছিল না, শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কি প্রকার এবং শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা কি প্রকারে আস্বাদন করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যানুভবে শ্রীরাধা কি প্রকার সুখ লাভ করিতেন, তাহার পরিজ্ঞান এবং স্বয়ং সেইভাবে তাহার আস্বাদন করাই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং লোকশিক্ষার জন্য সেই বিপ্রলম্ভরসের অভিব্যক্তি যে পরিমাণ প্রয়োজন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বকীয় সেই রস আস্বাদনব্যাপারে ভাব-রসাভিব্যক্তি অনন্ত গুণে অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীগৌর-প্রেমভক্তি-ভজন-সাধননিষ্ঠ সাধক ভক্তগণের শিক্ষার্থেই মহামহাভাবময়ী গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিপ্রলম্ভরসময়ী লীলানুধ্যান তাদৃশ ভক্তগণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই মহীয়সী মহালীলা বহুকাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিতা ছিলেন। শ্রীচরিতলেখকগণের মধ্যে অনেকেই ঋষি বা ঋষিতুল্য ছিলেন। তাঁহারা কি-জানি-কি কারণে এতকাল সেই অদ্ভুত চমৎকারিতাপূর্ণ লীলা জনসাধারণের সমক্ষে প্রকটিত করেন নাই। তাঁহারা ভাবগম্ভীর, সুতরাং তাঁহাদের উদ্দেশ্য

অনুসারে লোকশিক্ষার্থ ভগবচ্চরিতলেখক ঋষিগণের আবির্ভাব হয় এবং দেশ-কাল-পাত্র অনুসারেই তাঁহারা ভগবচ্চরিত্রের অনভিব্যক্ত ভাব অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। ঋষি-হৃদয়েই নিগূঢ় লীলা-রহস্য প্রকটিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের পরম কৃপাময়ী প্রেরণায় জীবশিক্ষার্থ তাঁহারা অনভিব্যক্ত লীলা-রহস্য কখন বা সূত্রবৎ অস্ফুট ভাষায়,—কখন বা সুধীজন-জ্ঞানগম্য কিঞ্চিৎ প্রস্ফুট ভাষায়,—আবার কখন বা জনসাধারণের হিতার্থে, আস্বাদনার্থে এবং ভজনসাধন শিক্ষার্থে অতীব সরল-সরস-সহজ-সমুজ্জ্বল-লালিত্য-মাধুর্য্যময়ী সর্ব্বচিত্তাকর্ষণী সুরম্য-মধুর-কোমল-কান্তি-পদ-বাক্যবিন্যাস-বৈভবময়ী ভাষায় সেই মাধুর্য্যময়ী লীলারসের পীযূষ-প্রবাহে জনসাধারণের চিত্ত আনন্দরসে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের চিত্তবৃত্তিগুলিকে তাদৃশ ভজনসাধনের জন্য একান্ত উন্মুখী করিয়া তোলেন।

আজ আমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে জীবন-মরণের চরম সীমায় দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়নম্র-ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে জনসাধারণ সমক্ষে এই আনন্দ-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে আমার অনুজ-প্রতিম পরম স্নেহাস্পদ সুবিখ্যাত বৈষ্ণবসাহিত্যিক বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ-প্রণেতা "শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকার সুপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজননিষ্ঠ শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামি মহোদয় "গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" এই মহাভাবগর্ভ সন্দর্ভাকারে একখানি বৃহদায়তন শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজন-সাধন-ব্রতী মহামহা ভাগ্যবান বৈষ্ণবগণের মহোপকার সাধন করিলেন। এই শ্রীগ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার যে অসাধারণ শক্তি প্রকটিতা হইয়াছেন, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। সূক্ষ্মদর্শী সহৃদয় পাঠকগণ আরও বুঝিবেন যে ইহা তাঁহার ঋষি-শক্তি-বৈভব-গৌরবের এবং সাক্ষাৎ ভাগবতী-কৃপার একান্ত পরিচায়ক।

শ্রীগৌরাঙ্গের গম্ভীরা-লীলা বর্ণনার মহর্ষি শ্রীশ্রীমদনগোপালের কৃপাদেশ-প্রাপ্ত ভজনসিদ্ধ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি মহোদয়। তাঁহার পরে তাঁহারই কৃপাপ্রসাদকণোচ্ছিষ্টভোজী তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে—তাঁহারই কৃপা-সাহায্য-বৈভবের,ছিদ্রপূর্ণ বরাটিকাপ্রাপ্ত কেহ যদি কিছু লিখিয়া থাকেন, এই শ্রীগ্রন্থের গ্রন্থকারই তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যোগ্যতম লীলা-লেখক। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামি মহোদয় সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা-প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে - এই ভাব প্রকটনের পূর্ব্বে,—অন্য কোনও সৌভাগ্য-শালী লেখক ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন কি না তাহা জানি না,—বহির্জগতের কোথাও তিনি এই মহাবিরহের মহাভাবস্বরূপ মহামহীরুহের কোন বীজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না তাহাও জানি না,—কিন্তু তিনি এই "গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" নামক শ্রীগ্রন্থ লিখিয়া ভক্তজগতের ও বৈষ্ণব-সাহিত্যজগতের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিলেন,—ভজননিষ্ঠ সদাশয় পাঠকপাঠিকা মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই শ্রীগ্রন্থের ভাষা গ্রন্থকারের স্বভাবসুলভ সরস, সুন্দর, সুমধুর ও প্রাঞ্জল—যমুনা-জাহ্নবীর স্রোতের ন্যায় অবিরাম অনবচ্ছিন্ন আবেগপূর্ণ। ইহার সর্ব্বত্রই পুণ্য-পবিত্রতা, বৈরাগ্য-মধুরতা, প্রেমভক্তিময় বিপ্রলম্ভরসের সমুজ্জ্বল সুন্দর সুমধুর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজমান। আমি ইহার অন্তর্গত কোন সার-তথ্য লিখিয়া প্রকাশ করিতে অসমর্থ। বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনে পাঠক-পাঠিকাগণের হৃদয়ে যে চিত্তশুদ্ধি, ভাব-ভক্তি ও প্রেম-ভক্তি সমুদিত হন, তাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সুবিদিত। এই গ্রন্থ পাঠে প্রকৃত বৈষ্ণবীয় ভজনপথের এবং আত্মার মধুর উজ্জ্বল সদ্ভাব উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠার পরম সহায় হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

২৫নং বাগবাজার, কলিকাতা, }
২৭এ ভাদ্র ১৩৪০ সাল। }

নিবেদক—
শ্রীরসিকমোহন দেবশর্ম্মা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

উৎসর্গ-পত্র।

—"অধিকারী নহোঁ মুঞি করো পরমাদ।
গোরাগুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ॥
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে শুন সবে নদীয়া-রহস্য॥"

ঠাকুর লোচনদাস।

(১)

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ হে!

(আমার) দুখের কথা শুনতে তোমার
ইচ্ছা যদি হয়,—
প্রাণের ব্যথা জানতে তোমার
প্রাণ যদি চায়,—
প্রাণের মাঝে, কেমন করে,
(তুমি) বুঝ্‌তে যদি চাও,—
(তোমার) স্বরূপ-শক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার
তত্ত্বটি বুঝাও।
(তুমি) গোপন করে রেখেছ তাঁরে
(আমার) বুঝ্‌তে বাকি নাই,
(তুমি) কেন যে কর, লুকিয়ে খেলা,
(আমি) জানতে তাহা চাই।
(তুমি) যদি বা বল "তোমার তাতে
কি হেতু মাথাব্যথা।"
(তবে) বলছি শুন স্পষ্ট করে
আমার মর্ম্মকথা॥
(আমি) দাসীর দাসী তোমার প্রিয়ার
(তাঁর) মনের কথা জানি।
(তুমি) বল না বল সে সব কথা
হয়েছে জানাজানি॥
(এমন) কেই বা করে কেন বা হয়
এসব রটনা।
(তোমার) আড়ালে থেকে গোপন লীলা
কেউ তা বুঝে না॥
(ঐ শুন) জগত জুড়ে দিতেছে আজি
বিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্বনি।

(তুমি) লুকায়ে যারে রাখিয়াছিলে
(এখন) স্বয়ং প্রকাশ তিনি॥
(ওহে) শ্রীগদাধর রাধা-শক্তি
বিষ্ণুপ্রিয়া রাধা।
(এখন) সবাই বলে এই কথাটি
(তুমি) কাহাকে দিবে বাধা॥
(ওহে) জীবের প্রাণে যে ভাব জাগে
যে তত্ত্বটি ফুটে
তুমিই তার সৃষ্টিকর্ত্তা
সর্ব্ব শাস্ত্রে রটে॥
(এই) দুর্ম্মুখাটা পড়েছে ধরা
শাস্তি সে যে যাচে।
(তাই) পাতিয়ে মাথা পড়ে সে আছে
তোমার প্রিয়ার কাছে॥
(তুমি) পুছিয়ে তারে দাও হে সাজা
ভয় নাহিক তার।
(তুমি) নদের রাজা সর্ব্বেশ্বর
করনাক' অবিচার॥
নদের মাঝে হয়েছে এবা
রাধারাণীর দরবার।
(এবার) ভক্তি-ব্রজে নাগরী মাঝে
(হবে) চুল চিরে বিচার॥
(ওহে) কিসের লাজ কিসের ডর
(এবার) নদীয়া গুলজার।
(এবার হবে) জুরার বিচার,— কাজীর বিচারে
হবে না কার্য্য সিদ্ধি।
(তোমার) রাখ্‌তেই হবে কালের ধর্ম্ম
সে তোমারি সমৃদ্ধি॥
নদীয়া-নাগরী আর মহাজন
জুরীতে বসিবে যবে।
(এবার) ভক্তি-ব্রজে হাইকোর্টে
বিচার ইহার হবে॥
(ওহে) জুরীর মতে, অমিল হ'লে
জজের মতে রায়।
(এবার) জজ আমাদের রাধারাণী
মিলিত গোরা রায়॥

দেখ্‌বে লোকে বিচার কার্য্যে
স্বরূপশক্তির জয়।
(তাই বল্‌চে) সর্ব্বলোকে উচ্চৈঃস্বরে
(জয়) বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়॥
(যদি) জুরীর বিচারে হয় হে ফাঁসি
সেও ত মহা ভাগ্য।
(তুমি) চরম সাজা দিও হে তারে
(হরি) আসামী অযোগ্য॥
(তুমি) ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে দিও
হরিদাসিয়ার দেহটা।
(জয়) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর বলে
যায় যেন তার প্রাণটা॥
(তুমি) দাঁড়িয়ে থেক সম্মুখে তার
ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে।
(স্বহস্তে) কাটিয়ে দিও প্রাণের শিরা
সিভিল সার্জ্জন রূপে॥ (অতি চুপে চুপে)
(দেখ) মরা হরি বল্‌বে তখন
জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
(দেখ) সর্ব্বলোকে করবে তখন
তোমায় ছিয়া ছিয়া॥
(দেখ) মহাজনেও কাঁদবে তখন
বলে "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া"
(তখন) উঠ্‌বে ধ্বনি গগন ভেদি
টল্‌বে ধরা মুহুর্মুহু।
(প্রিয়ার) নামের গুণে আপনি যাবে
কলি জীবের হাহা হুহু॥
(হরির) রক্ত বীজের ঝাড় উঠ্‌বে
বিশ্ব গগন ভেদি।
(তখন) মধুর নামের মধুর ধ্বনি
হইবে বজ্রনাদী॥
কুলের ঠাকুর নিতাই চাঁদ
(দিবেন) বিষ্ণুপ্রিয়ার ধ্বনি।
শ্রীঅদ্বৈতের হুহুঙ্কারে
জাগ্‌বে সুর মুনি॥
(ওহে) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ
(তখন) কি করবে বল তুমি?

তাই শুন্‌তে কান পেতেছেন
আমার ঠাকুরাণী॥
(আমার) কুলের ঠাকুর পাগ্‌লা নিতাই
কানে দিয়েছেন ফুঁ।
অটল নির্ভয় এ হরিদাসিয়া
(কুলোকে) যতই বলুক কু॥
বুড়োশিবতলার "বুড়ো নাগরী"
বল্‌চে লোকে বলুক।
শচীর আঙ্গিনা কথনই নহে
মিঞাপুরের তালুক॥
(ওহে) এই নদীয়ায় ফাঁসি তলায়
হয়েছে কত ফাঁসি।
(অবিচারে) ফাঁসির কাঠে ঝুল্‌ছে কত
নাগরী নদেবাসী॥
(ওহে) রক্তবীজের ঝাড় যে সবে
মর্‌বে কেন তারা।
জীবনে মরণে যুগেও যুগে
(তারা) ভজ্‌বে নাগর গোরা॥
স্বরূপশক্তির কায়ব্যূহ সবে
নিত্যসিদ্ধা সখি।
(ওহে) তাদের মরম তুমিই বুঝ্‌বে
(কু) লোকের তাতে কি?
পার্‌বে না কেউ ধর্‌তে তাদের
ছুঁতে তাদের গা।
(তাদের) বুকে যে বাঁধা রক্ষা কবচ
তোমার রাঙ্গা পা॥
(তুমি) কপট ন্যাসী নদের শশী
নাগরীক' প্রাণ
(মোরা) জন্ম হ'তে আস্‌চি শুনে
চৈতন্যমঙ্গল গান! (১)

১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আদি খণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গজন্মলীলা বর্ণনায়,—
—"জন্মমাত্র বালক হৈল যেই দেখা।
কত দিন ছিল পূরবের যেন সখা॥
প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।
নিরখিতে হৃদয়ে নয়নে যেন বাসি॥

মহামহিম পণ্ডিতগণ
না বুঝিবে ইহা। (২)
(ইহার) বুঝবে মরম নাগরিয়া যত
গৌর-পদ-লেহা॥
(ওহে) চরণে তোমার এই মিনতি
বহুবল্লভ হে!
(কু) লোকের কথায়, ভুল না যেন,
আপন স্বরূপকে॥
(ওহে) তোমাদের বহর দেখি
ডর লাগে যে মনে।
(ভয়ে ভয়ে) ঠাকুরাণীর চরণ ধরি
বলিনু গোপনে॥
(তাঁর) স্বপ্নাদিষ্ট, ইঙ্গিত পেয়ে,
মত্ত এ হরিদাসিয়া।
সবাই মিলে, বল গো তোরা,
(জয়) গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া॥
উচ্চৈঃস্বরে, বল্ গো সবে,
নাগর গোরা রায়।
নদের পথে, নিতাই সাথে
(ঐ) নেচে চলে যায়॥
(তোরা দেখ্‌বি যদি আয়)

বালক দেখিয়া হিয়া ভরল আনন্দ।
আলসল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবি-বন্ধ।"

পুনশ্চ—
—"গৌর-নাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমৃত অখণ্ড॥
দেখিতে দেখিতে সবার জুড়াইল নয়ান।
সভার মনে হৈল, এই **নাগরীক'প্রাণ**॥"
ঠাকুর লোচনদাস।

(২) একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্যভাগবত সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন পুঁথি খানির বয়স ২৪০ বৎসর হইবে এবং ইহা শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীপাদ বিভূতিভূষণ গোস্বামীর নিকট বর্ত্তমানে আছেন। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীপাদ রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয় ইহার নিম্নলিখিত পাঠটি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন—

—"অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর **বই** স্তব নাহি বোলে॥"—

এই পাঠই শাস্ত্রসম্মত ও সমাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

(২)

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ হে!
তোমার প্রিয়ার, গম্ভীরা-লীলা,
তোমারই গুপ্ত ধন।
এতদিন তুমি, রাখিয়া গোপনে,
বঞ্চিয়াছ নিজজন॥
(তোমার) অন্তঃপুরের, চাবি কাটিটি,
রেখেছিলে নিজ করে।
(এখন) স্বয়ং প্রিয়াজি, লয়েছে কাড়িয়া,
বড় অভিমান ভরে॥
(তুমি) করিয়া যতন, রেখেছিলে চাবি,
ডোর কৌপিনে বাঁধিয়া।
হয়ে সর্ব্বত্যাগী, সেজেছিলা ত্যাগী,
চাবিকাটি বুকে ধরিয়া॥
(তোমার) গুপ্তবিত্ত, প্রেয়সী-প্রেম,
শচী-আঙ্গিনায় আছে।
অজ্ঞাত সে ধন, গুপ্ত ভাণ্ডার,
আছে প্রিয়াজির কাছে॥
নদীয়া-নাগরী, করিয়া ডাকাতি,
করিয়াছে চাবি চুরি।
চৌরাগ্রগণ্য মহাপুরুষের,
(তারা) ভাঙ্গিয়াছে ভারিভুরি॥
ডাকাতের রাণী, তোমার গৃহিণী,
ডাকাতের দলে মিশে।
(কটির) ডোর ছিঁড়িয়া, লয়েছে ছিনিয়া,
চাবিকাটি অবশেষে॥

(৩)

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণকান্ত হে!
কি হবে এখন বল না?
(তোমার) গুপ্ত ধনের, গুপ্ত চাবিটি,
আর ত ফিরিয়া পাবে না।
নাগরীর হাতে, পড়েছে সে চাবি,
(তারা) আর ত ফিরিয়ে দিবে না॥

(তোমার) গুপ্ত ধন যে, ব্যক্ত হইল,
লোকে হ'ল জানাজানি।
(এখন) নানা জনে মিলে, নানা কথা বলে,
(আর) করে কত কানাকানি॥

নাগরীর গণ, হ'ল যে এখন,
(তোমার) গুপ্তধনের অধিকারী।
(তারা) লুটে পুটে খায়, নাচিয়ে বেড়ায়,
(আর) দান করে অবিচারি॥

(তারা) ডাকাতের দল, করে ছল বল,
(প্রেয়সী-) প্রেমধনে বলীয়ান।
করে না স্বীকার, স্বামীর ব্যভার,
(তারা) নিজ ভাবে গরীয়ান॥

(তারা) সরব সমক্ষে, প্রাণনাথ ব'লে,
ডাকে যে তোমাকে প্রেমে।
(প্রেয়সী-) প্রেমরস-সার, প্রেমের ভাণ্ডার,
(তারা) পুরিয়াছে নিজ প্রাণে॥

(এখন) নাগরী-অনুগা, হইতে হইবে,
তোমার ভকত জনের।
তবে ত সন্ধান, পাইবেন তাঁরা
তোমার গুপ্ত ধনের॥

(তাই) নাগরীর জয়, দিতেছে সবাই,
পাইবারে প্রেমধন।
(এবে) নদীয়া-নগরে, নদীয়া-নাগরী,
(প্রেয়সী-) প্রেমের মহাজন॥

নদীয়া গম্ভীরা, প্রেমের ভাণ্ডারা,
গৌর-প্রেম-রস-সার।
নদীয়া-নাগরী, প্রেমের গাগরী,
ধারে না কাহারও ধার॥

ব্রজ-গোপী-জন- বল্লভ এবে,
নাগরী-জন-বল্লভং।
হরিদাসিয়ার, প্রণয়-আধার,
দেহি পদ পল্লবং॥

(৪)

নাগরীজনবল্লভ হে!

তুমিই তাদের, পরাণের পতি,
তুমিই তাদের উপপতি।
তোমার চরিত্র, জানে তারা ভাল,
না বুঝিবে দুরমতি॥

বেদ শিরোমণি, ভাগবত-বাণী,
(তারা) জানিয়াছে ভাল মতে।
চরিত্রহীনতা, দোষ নাহি লাগে,
(স্বয়ং) ভগবানে কোন মতে॥

শাস্ত্রের অতীত, বেদবিধি পার,
রসরাজ অবতার।
ব্রজের গোপিনী, নদীয়া-নাগরী,
সতীসাধ্বী প্রেমাধার॥

(তোতা) পাখীর ডাকে, ফাকা আওয়াজে,
ভুলিবে না কভু তারা।
আনে কি জানিবে, রসের আরতি,
(তারা যে) শাস্ত্র করে মনগড়া॥

শ্রীচৈতন্যদাস, সিদ্ধ বাবাজি,
নদীয়া-নাগরী ভাবে।
কত না রঙ্গে, ভজি গৌরাঙ্গে,
শিখাইল কলিজীবে॥

(দাস) গোবিন্দ আদি পার্ষদ-কবি,
কত না রচিল পদ।
(ঠাকুর) লোচন বাসু, নরহরি কৃত,
ভজন-সার-সম্পদ॥

শ্রীখণ্ডবাসী, ঠাকুর গোষ্ঠী,
(নাগরী) প্রেমরসে মাতোয়ারা।
কত না সজ্জন, অনুগত জন,
এ ভাবে পাগলপারা॥

ব্রজবধূ সবে, নদীয়া-নাগরী,
ব্রজরাজ গোরা রায়।
শাস্ত্রানুগত, মধুর ভজন,
দাসী হরিদাসী গায়॥

(৫)

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ হে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার, গম্ভীরা-লীলা,
তোমার গুপ্তধন।
চুরি করা ধন, চোরের প্রাপ্য,
চোর তার মহাজন॥
চোরের উপরি, করি বাটপাড়ি,
করিয়াছি যাহা চুরি।
চৌরাগ্রগণ্য, পুরুষ-চরণে,
দিনু তা' অঞ্জলি ভরি॥
চোরা-মাল ল'য়ে, বুক ফুলাইয়ে,
বিকিকিনি করি মোরা।
চোর-অবতার, নদীয়া-নাগর,
নাগরীর প্রাণগোরা॥
চোরের রমণী, চোর শিরোমণি,
চোর তাঁর দাসীগণ।
বর্ণ-চোরার, বুঝেছে মর্ম্ম,
বিষ্ণুপ্রিয়ার গণ॥
চোর হরিদাসী, কহে হাসি হাসি,
(চিত-) চোর-চরণে কথা।
(ওহে) বিষ্ণুপ্রিয়ার, প্রাণ-বল্লভ,
শুন তার মন-ব্যথা॥
(তুমি) লম্পট-গুরু (১) নারী-মন-চোরা,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
নদীয়ার চাঁদ, নাগরীর প্রাণ,
(এখন) দাও তার প্রতিদান॥
গম্ভীরা-মন্দিরে, গভীর নিশীথে,
বসি লিখি (এ) প্রেম-পত্রী।
সম্মুখে রাখিয়া, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া,
তোমার প্রেম-পাত্রী॥
হরিদাসিয়ার, জীবনের সার,
প্রিয়াজির রাঙ্গা পা।
ভজন-সম্পদ, পাইতে যে পদ,
(পদে পদে) কত খেয়েছি, খেতেছি ঘা॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার, পাদ-পদ্ম,
হৃদে ধরি দিবা-নিশি।
উৎসর্গিলা, গম্ভীরা-লীলা,
গোরা-পদে হরিদাসী॥

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ কুঞ্জ,
শ্রীনবদ্বীপ-ধাম
বসন্ত পঞ্চমী।
১৭ই মাঘ ১৩৩৯, গৌরাঙ্গ ৪৭৬।

(১) —"গোপীনাং কুচকুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্তারুণং।
নিন্দৎ কাঞ্চনকান্তি রাসরসিকা শ্লেষেণ গৌরং বপুঃ॥
তাসাং গাঢ় করাভিবন্ধনঃ রসোল্লাসোন্দাম দৃশ্যতে।
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পট গুরোঃ সন্ন্যাসীবেশং ক্ষিতৌ।"—
শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গৌ-জয়তঃ

শ্রীগ্রন্থ-সমর্পণ-উৎসর্গ-পত্রী।

যিনি রায় রামানন্দ—শ্রীরূপ-শিক্ষামৃত—গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী—নীলাচলে ব্রজমাধুরী—শ্রীনাম-মাধুরী—সাধন-সঙ্কেত—শ্রীচরণ-তুলসী—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচন্দ্রাস্বাদিত পদাবলী ব্যাখ্যা—সানুবাদ রায় রামানন্দপ্রণীত টীকা সহ জগৎবল্লভ নাটক প্রভৃতি বহু ভক্তিগ্রন্থাবলী প্রণেতা এবং বহু প্রবন্ধ লেখক,—যিনি একটী বিরাট অভিনব বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্রষ্টিকর্ত্তা,—যিনি ভক্তিশাস্ত্র এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায়-দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পরম সুপণ্ডিত—যিনি শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজননিষ্ঠ এবং যিনি আমার অগ্রজপ্রতিম পরম পূজ্যপাদ সুবিখ্যাত প্রবীণ ও প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য—যাঁহার **"গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ"** শ্রীগ্রন্থপাঠে আমার মনে এই গ্রন্থপ্রণয়ন-বাসনার প্রথম উদ্রেক হয়—সেই অতিবৃদ্ধ প্রবীণ মহাপুরুষ গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-গতপ্রাণ পূজ্যপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই শ্রীগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—সেই প্রাতঃস্মরণীয় গৌরভক্তপ্রবর সর্ব্ব বৈষ্ণবপ্রাণ শ্রীপাদ রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের শ্রীকরকমলে মৎপ্রণীত **"গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"** শ্রীগ্রন্থখানি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সমর্পিত হইল।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ,
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ।
কার্ত্তিক-পূর্ণিমা-তিথি,
১৩৪০ সাল—গৌরাব্দ ৪৪৭।

স্নেহের
হরিদাস

মঙ্গলাচরণম্ ।

—"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্ ॥"—

—"বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্ ।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥"—

—"অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গান্ সারাসারভৃতোখিলান্ ।
হিত্বা সারান্ সারভৃতো নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ।"—

—"শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥"—

—"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধু ভ্যো এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"—

—"শ্রীচৈতন্যং প্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরম্ ॥"—

—"বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া ।
প্রসভং নর্ত্ত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োপ্যয়ং ॥"—

—"শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎ পদাশ্রয়-বীর্য্যতঃ ।
সংগৃহ্ণাত্যাকর ব্রাতা যজ্ঞঃ সিদ্ধান্ত সন্মণীন্ ॥"—

—"কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ ।
বিস্মৃতে বিপরীতস্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তং ॥"—

—"বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং তৎ প্রসাদতঃ ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনাম প্রজল্পকাঃ ॥"—

—"তং বন্দে গৌর-জলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান ভক্ত শস্যাণ্য জীবয়ৎ ॥"—

—"স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ ।
তল্লীলা বর্ণনযোগ্য সদ্যস্যাদধমোঽপ্যয়ং ॥"—

—যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ।
স চৈতন্যদেবো মে ভগবান সম্প্রসীদতু ॥"—

—"শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং ।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্টা ব্রজবিলাসিনঃ ॥"—

—"অগত্যেক গতিং নত্বা হীনার্থাধিক সাধকং ।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তি বদান্যতা ॥"—

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ

গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

উপক্রমণিকা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-যুগলার্চ্চন

(১)

(মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, শ্রীবৃন্দাবন)

ভক্তির নয়টি অঙ্গ যথা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ,পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। এই নয়টি অঙ্গের মধ্যে পঞ্চম অঙ্গ অর্চ্চন।

"অর্চ্চনম্ তুপাচারাণাং স্যান্মন্ত্রেণোপপাদনম্।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধ, পুষ্প আদি উপচার উপপাদন করার নাম "অর্চ্চন"।

শাস্ত্র বা সদাচারে এমন কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না, যে তুমি যাঁহাকে ভক্তি করিবে, তাঁহার অর্চ্চন-অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ৮টি অঙ্গ অনুষ্ঠান করিবে। পঞ্চম অঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে নিষিদ্ধ কার্য্য করা হইবে বা তাহা করা অনুচিৎ.—বিশেষতঃ এই নিয়ম শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী সম্বন্ধেই প্রযুজ্য! শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নাম ও লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দনাদি করিতে পারিবে, কিন্তু অর্চ্চন করিতে পারিবে না! এ কি কথা!

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অর্চ্চনে বিপ্রতিপত্তিকারী আমার বান্ধব বৈষ্ণববৃন্দ প্রভুর লীলা শ্রবণ সময়ে ও লীলা কীর্ত্তন সময়ে এবং প্রভুর অষ্টকালীন লীলা স্মরণ সময়ে শ্রীমতীর নাম লীলা গুণ প্রভৃতির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু অর্চ্চন মাত্রেই বিপ্রতিপত্তি! ইহার কারণ তাঁহারা শাস্ত্রে অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমি সন্ধান করিয়াও কোন শাস্ত্রে পাইলাম না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মন্ত্র কোথায়,যদ্দারা উপচারার্পণ করিয়া অর্চ্চন করিবে? তাঁহাদের বিশেষভাবে বিবেচনা ও আলোচনা করা উচিৎ, যে মূলতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভু,—শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আবরণ। পূজনে আবরণ দেবতাগণের চতুর্থ্যন্ত নামমন্ত্রে পূজন বিধান। "পীঠে ভগবতো বামে শ্রীগুরূন্, গুরুপাদুকাঃ নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধান্ যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্।" (হরিভক্তিবিলাস ৬অ: ৯ প্রয়োগ যথা:—শ্রীগুরুভ্যোঃ নমঃ ইতি। "কেচিদাত্মাক্ষরং বিন্দু-সহিতং বীজত্বে নাদৌ প্রযুঞ্জ্যতে" অর্থাৎ কেহ কেহ সবিন্দু আত্মক্ষর বীজরূপে আদিতে যোগ করিয়া থাকেন, যথা গুং গুরুভ্যোঃ নমঃ ইতি।

সেইরূপ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূজা তাঁহার চতুর্থ্যন্ত নামমন্ত্রে কিম্বা সবিন্দু আত্মক্ষররূপ বীজসংযুক্ত নামমন্ত্রে করিতে হইবে। যথা—

"বিষ্ণুপ্রিয়াদেব্যৈঃ নমঃ" বা "বিংবিষ্ণুপ্রিয়াদেব্যৈঃ নমঃ"।

এইত বিধিভক্তির প্রকার। রাগমার্গে যাঁহারা দাসী-ভাবে বা সখীভাবে পূজন করিবেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস তুন্দুভিবাদ্যে উদ্ঘোষণ করিতেছেন যে "স্বরসেনৈব তদ্বিধিঃ"।

শ্রীভগবানের পীঠার্চ্চনে শ্রীগুরু, শ্রীপরমগুরু প্রভৃতির পূজনমাত্র করিতে হয়, এইমাত্র নহে, অপিতু "যজেদন্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্" বিধি আছে। টীকাতে "অন্যাংশ্চ আধুনিকান্ ভাগবতান যজেত" এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ আধুনিক ভক্তবৃন্দেরও পূজন করা উচিত।

এখন বিবেচ্য এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পীঠপূজনে গুরু পরম্পরাকে পূজন করিতে পারা যায়। তাহাতে যাঁহার শ্রীগুরুদেব প্রকট আছেন, তিনি বর্ত্তমান নিজ গুরুদেবকে পীঠে পূজন করিবেন এবং আধুনিক ভাগবতগণের মধ্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাসকেও অর্চ্চনা করিতে পারিবেন, এমন কি গুরুপাদুকা পর্য্যন্তের স্থান

তথায় আছে, কিন্তু নাই কেবল প্রভুর অর্দ্ধাঙ্গনী, বক্ষবিলাসিনী শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর! কিমাশ্চর্য্য অতঃপরং।

নির্ম্মৎসর শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতি এই মাৎসর্য্যের উদয় কেন হইয়াছে যে আধুনিক ভাগবতগণকে বা গুরুপাদুকাকে পর্য্যন্ত পীঠে পূজন করিলে দোষ হইবে না, কিন্তু প্রধান দোষ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অর্চ্চনে! হায় হায়! একি দুর্ব্বুদ্ধি!

তামাক, চরস, গাঁজা, সিদ্ধি, আফিং খাইলে, টাকা লগ্নি করিয়া সুদ খাইলে, মামলা মোকর্দ্দমাতে হলপ লইয়া অসত্যভাষণ করিলেও ভগবত্তত্ত্বের ব্যাঘাত হইবে না,—ব্যাঘাত হইবে কেবল প্রভুর বামে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সমর্চ্চনে! কি দুর্দ্দৈব!

প্রভুর প্রসাদ, চন্দন, মালা প্রভৃতি আচণ্ডাল পামর পর্য্যন্তকে দিতে বাধা নাই, বাধা কেবল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দিতে! কি ভীষণ কথা!

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সমর্চ্চনে বিপ্রতিপত্তিকারী শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের চরণে আমি সাষ্টাঙ্গ প্রাণপাতপূর্ব্বক দন্তে তৃণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে পতিপরায়ণা, মুগ্ধা, কিশোরী চিরবিরহিণী, শোকসন্তপ্তহৃদয়া ব্রাহ্মণকুমারীকে তাঁহার স্বীয় ভাগ প্রভুর নির্ম্মাল্য, মালা, চন্দন ও প্রভুর অধরামৃত প্রসাদ হইতে বিচ্যুত করিবেন না। তিনি ত আপনাদের কোন অনুপকার বা অনিষ্ট করেন নাই তবে তাঁহার প্রতি এই প্রচণ্ড দণ্ড কেন অর্পণ করা হইতেছে? এ কি নিষ্কারণ দণ্ডবিধান!

কেহ কেহ দ্বিতীয় পত্নি ধর্ম্মপত্নি নহে বলিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চনকে মনুস্মৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন!

তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিৎ যে শ্রীমতী সত্যভামা, কালিন্দী, জাম্ববতী নাগ্নিজীতি প্রভৃতি সমস্ত মহিষীগণ দ্বিতীয়া কেন ৭মী, ৮মী পর্য্যন্ত আছেন। তাঁহাদের সমর্চ্চন শ্রীগোপালমন্ত্রের আবরণ পূজনে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে এবং অন্যান্য সমস্ত ভগবদুপাসনাপ্রতিপাদক গ্রন্থে এমন কি অথর্ব্বোপনিষদ শ্রীগোপাল তাপনীতেও বিধান আছে!

মনুস্মৃতি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিলে এই সমস্ত পূজন অকরণীয় হইয়া পড়ে

মনুস্মৃতি যে ভাগবতধর্ম্ম বিরহিত, এসম্বন্ধে কলিকাতার "নারায়ণ" এবং "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" মাসিক পত্রিকাতে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলেই স্মৃতিশাস্ত্রের স্বরূপজ্ঞান হইতে পারে।

আমার মনুস্মৃতি আলোচনার কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই প্রতিবাদের খণ্ডনস্বরূপ শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামীর লিখিত ষট্সন্দর্ভান্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভের কয়েকটী পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

> স্বয়ম্ভুর্নারদ শম্ভুকুমারঃ কপিলোমনুঃ,
> প্রহ্লাদোজনকো বিভীষণোবলির্বৈয়াসকির্ব্বয়ম্।
> দ্বাদশৈতে বিজানীমো, ধর্ম্মং ভাগবতম্ভদা,
> গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

টীকা :—এতে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ বিজানীম এব নতু স্মৃত্যাদিষু প্রায়েণ উপদিশাম যতঃ গুহ্যং অপ্রকাশ্যং দুর্ব্বোধং অন্যৈস্তথা গৃহীতুমশক্যঞ্চ। গুহ্যত্বে হেতু যং জ্ঞাত্বেতি।

যমরাজ আপনার দূতগণকে শিক্ষা দিতেছেন, স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু আদি আমরা দ্বাদশজন ভাগবতধর্ম্মকে জানি। এবিষয়ে শ্রীগোস্বামীপাদের ব্যাখ্যা এরূপ, আমরা সকলে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভাগবত ধর্ম্মকে জানি, কিন্তু আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র সকলে তাহা উপদেশ করিব না, যেহেতু ভাগবতধর্ম্ম গুহ্য অর্থাৎ অপ্রকাশ্য ও দুর্ব্বোধ্য, অর্থাৎ অন্য লোকেরা সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না। গুহ্য কেন না, যাহার জ্ঞানমাত্রে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়।

আমার স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা একটী "দলীল" তাহাতে এই ভক্তিসন্দর্ভের বাক্য "রেজেষ্টারী শীল"। কিন্তু রেজেষ্টারী করিতে হইলে সাক্ষের প্রয়োজন,—সাক্ষীর স্বাক্ষর স্বরূপে চক্রবর্ত্তীমহাশয়ের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিলাম।

বিজানীম ইতি নতু নিজকৃ স্মৃতিশাস্ত্রেষ্বপি স্পষ্টং কথয়ামাত্যর্থং গুহ্যং পরমতত্ত্বত্বাৎ সম্ভৃত্যৈব স্থাপ্যং। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়ে "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয় শৃণুমে" ইত্যত্র হেতোরেব দৃষ্টত্বাৎ বিশুদ্ধং গুণাতীতং সগুণ স্মৃত্যাদিশাস্ত্রেষু বর্ত্তুমনর্হত্বাৎ। দুর্ব্বোধং কর্ম্মাভিরর্থবাদাদি দোষফলনাগুকরণৈর্দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ। অর্থাৎ জানি, ইত্যাদি, কিন্তু নিজকৃত স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্ট করিয়া কথন করি না। কেন, গুহ্য যেহেতু পরমতত্ত্ব সম্বরণ করিয়াই রাখা উচিৎ। রাজবিদ্যারাজগুহ্যাধ্যায়ের শ্লোকে গুহ্যত্বের হেতু দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ অর্থাৎ গুণাতীত, সগুণ স্মৃতিশাস্ত্রে

বর্ণন করিবার অযোগ্য, দুর্ব্বোধ্য অর্থাৎ অর্থবাদাদ দোষ দ্বারা ফলিতান্তঃকরণ কর্ম্মনিষ্ঠজনের পক্ষে দুজ্ঞেয়।

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান আচার্য্য শ্রীনারদ মহর্ষিও নিজ স্মৃতিতে ভাগবতধর্ম্ম নিরূপণ করিলেন না। তবে অন্যান্য স্মৃতিকর্ত্তাদের সম্বন্ধে কৈমুত্য ন্যায় ঘটিতে পারে।

মনুস্মৃতি দ্বারা যাঁহারা শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, ব্রজসুন্দরীগণের সমর্চ্চন বিষয়ে তাঁহারা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে পরম সন্তুষ্ট হইব।

ীয় পত্নি ধর্ম্মপত্নি হইতে পারে না" এই হেতু দিয়া যাঁহারা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চন বর্জ্জন করিতে উৎসুক তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, যে মনুস্মৃতির নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের স্থান কোথায়? হেতু দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণায়ককে মনুস্মৃতিতে হৈতুক বলা হইয়াছে এবং হৈতুকের সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন, "হৈতুকান্ বকবৃত্তিংশ্চ বাঙ্ মাত্রেনাপি নার্চ্চয়েৎ"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অর্চ্চন শাস্ত্রে অতিদেশ লব্ধ, তবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনের পর শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর আরাধন কোন ভাবে প্রতিপাদিত? ইহার উত্তর তদীয়ারাধন ভাবে "আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা তথা তদীয় ভক্তানাং নোচেদ্দোষোহস্তি দুস্তরঃ" মুকুন্দের আরাধন যেরূপ আবশ্যক, তদীয় ভক্তবৃন্দের আরাধনও সেইরূপ আবশ্যক। না করিলে দুস্তর দোষ হয়।

অনন্ত শ্রীভগবানের অনন্ত ভক্ত, তাঁহাদের সকলের পূজন কিরূপে সম্ভব হয়, এতদ্বিষয়ের বিবেচনা এরূপ করা হইয়াছে যে অনন্ত ভক্তগণের পূজন অসম্ভব; তবে সর্ব্বপ্রধান ভক্তগণের পূজন করিলেই ভাগবতপূজন সিদ্ধ ও সাঙ্গ হইয়া যায়। এতদর্থে শ্রীভক্ত্যামৃতে এরূপ ক্রম নিরূপণ করা হইয়াছে, হরিসেবনের পর বৈষ্ণবের উচিত ইঁহাদের সেবা করা, অন্যথা পরম অপরাধ হয়।

"অর্চ্চয়িত্বাতু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।
নতে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকাস্মৃতাঃ॥"

যাঁহারা গোবিন্দকে অর্চ্চন করিয়া তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চনা করেন না, তাহারা ভগবানের প্রসাদের (কৃপার) ভাজন হয় না। তাহারা দাম্ভিক।

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥"

(শিববাক্য)

ইহলোকে যতপ্রকার আরাধনা আছে তাহার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা প্রধান, আর বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা পরতর তদীয় ভক্তবৃন্দের সমর্চ্চন।

"মম ভক্তাহি যে পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে মতা।
মদ্ভক্তনাংচ যে ভক্ত তে মে ভক্ততমাঃ মতা॥

হে পার্থ! যাঁহারা আমার ভক্ত অর্থাৎ কেবল আমারই আরাধনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত নহেন, যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহারা আমার ভক্ততম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম ভক্ত।

"মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা" আমার ভক্তপূজা আমার পূজন অপেক্ষা অধিক।

এই সমস্ত বাক্যদ্বারা শ্রীভগবতপূজার পরে ভক্তপূজার অবশ্য বিধেয়তা প্রতিপাদন করিয়া, সমস্ত ভক্তগণের পূজন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া প্রাধান্য নির্দ্দেশ আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সমস্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রহ্লাদপ্রবর, প্রহ্লাদের অপেক্ষা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, পাণ্ডব অপেক্ষা কোন কোন যাদব অতি শ্রেষ্ঠ, সমস্ত যাদবের মধ্যে উদ্ধবপ্রবর, শ্রীভগবান নিজমুখে যাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন—

"ন তথা মে প্রিয়তমঃ আত্মযোনির্নশঙ্কর-
র্নচ সংকর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মাচ যথা ভবান্॥"

হে উদ্ধব! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, তদ্রূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর, সংকর্ষণ এবং শ্রীও আমার প্রিয়তম নহে। এমন কি আমার নিজরূপ, তোমার সমান, আমার প্রীতির বিষয় নয়।

এইরূপ শ্রীভগবৎপ্রীতি-বিষয় উদ্ধব হইতে ব্রজদেবী সকল বরীয়সী, যেহেতু উদ্ধব মহাশয়ও তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্য বাঞ্ছা করিয়া থাকেন।

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বোগোবিন্দ এব
নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভয়ো মুনয়ো বয়ংচকিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥"

উদ্ধব কহিলেন পৃথিবীতলে এই সকল গোপবধূদিগেরই জন্ম সফল,—যেহেতু ইহারা অখিলাত্মা ভগবানে এবম্প্রকার প্রেমবতী হইয়াছেন। এই প্রেমা সামান্য নহে। সংসার-

ভীরু মুনিগণ মুক্ত হইয়াও ইহা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। আমরাও ইহা অভিলাষ করিয়া থাকি।

তথাহি বৃহদ্বামনে ভগবদ্বাক্যং—

"ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ নাচারৈর্নৈ চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্না প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যেজানন্তি যর্ম্মণি॥
নিজাঙ্গমপিযাগোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং নমে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনমিতি॥"
"নচিত্রং প্রেমমাধুর্য্যমাসাং বাঞ্ছেদ্যদুদ্ধবঃ
পাদরেণু স্থিতং যেন তৃণজন্মাপি যাচ্যতে॥"

আমি তপ, বেদ, আচার ও বিদ্যার দ্বারা বশীভূত হই না। কেবল প্রেমের দ্বারা বশীভূত হইয়া থাকি। এ বিষয়ে ব্রজ-গোপিকাগণ প্রমাণ। আমার মাহাত্ম্য, আমার সপর্য্যা, আমার শ্রদ্ধা, আমার মনোগত ভাব কেবল ব্রজগোপীকাই জানেন। হে অর্জ্জুন! মর্ম্মে আর কেহ জানে না। যে গোপীকাগণ নিজাঙ্গকেও আমার বস্তু বলিয়া উপাসনা করেন, তাহাদের অপেক্ষা আমার নিগূঢ় প্রেমভাজন আর কেহ নাই। যে গোপীগণের এইরূপ মাহাত্ম্য শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, উদ্ধব যে কেবল তাঁহাদের প্রেমমাধুর্য্য প্রার্থনা করেন এতাবন্মাত্র নয়, কিন্তু তিনি ব্রজসুন্দরীগণের পাদরেণু-স্থিত তৃণগুল্ম জন্ম বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। শ্রীভাগবতামৃতে এইরূপ গোপীগণের মাহাত্ম্য নিরূপণের পরে বিধান করা হইয়াছে।

"ইতি কৃষ্ণং নিবেদ্যাগ্রে কৃষ্ণোপাসকৈর্জনৈঃ
সেব্যা প্রসাদ পুষ্পাদ্যৈরবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনের পরে প্রধান ভক্ত কোটিতে সন্নিবিষ্ট ব্রজ-সুন্দরীগণের পূজনের আবশ্যকতা কৃষ্ণোপাসকের সম্বন্ধে দৃঢ়-ভাবে বিধান করা হইয়াছে। যদি কেহ সমস্ত ব্রজসুন্দরী-গণের পূজনে অক্ষম হন, তবে ব্রজসুন্দরীগণের চূড়ামণিস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকাজীকে অবশ্য পূজা করিবেন।

"তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতি বরীয়সী।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা যা পুরাণাগমাদিষু॥"

এইরূপ ক্রমে সর্ব্বপ্রধান ভক্তকোটীতে শ্রীমতীর পূজন স্থাপন করা হইয়াছে।

যদ্যপি তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি-স্বরূপা এবং অচিন্ত্য ভিন্নাভিন্নস্বরূপা তথাপি শক্তিমত্তত্ত্বের শক্তি হওয়াতে ভক্তকোটীতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভক্তভাব শ্রীমতী রাধিকার নিজোক্তিতেও দেখা যায়।

"হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ! কাসি কাসি মহাভুজ!
দাস্যাস্তে কৃপণায়াঃ মে সখে দর্শয় সন্নিধিং॥

এই বাক্যে দাস্যভাব ও সখ্যভাব দুইটী সংমিশ্রিত, অতএব অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়।

শ্রীভগবান ব্রজসুন্দরীবৃন্দের প্রেমের পরাকাষ্ঠা সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কথা বলিয়া অবশেষে এই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বর্ণন করিয়াছেন "নিজাঙ্গমপি যাগোপ্যো মমেতি সমুপাসতে" যাহারা নিজ অঙ্গকেও নিজবস্তু বলিয়া উপাসনা করেন না, আমার বস্তু বলিয়া উপাসনা করেন, অর্থাৎ এই অঙ্গ শ্যাম-সুন্দরকে অর্পণ করা হইয়াছে, ইহা তাঁহার বস্তু;—তাঁহার বস্তুকে যত্ন করিতেই হইবে! এইভাবে নিজ অঙ্গকে পালন পোষণ ও যত্ন করিয়া থাকেন।

গৌর-বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কি এরূপ ভাব নাই? তিনি কি মনে ভাবেন না যে আমি আমার অঙ্গ শ্রীপ্রভুকে অর্পণ করিয়াছি, এই অঙ্গ প্রভুর বস্তু, ইহাকে পালন, পোষণ ও যত্ন করিতেই হইবে!

তিনি কি নিজ সুখের নিমিত্ত নিজ অঙ্গকে লালন পালন ও ভূষিত করিতেন? প্রভুর সন্ন্যাসের পরে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, সে বিষয় যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা বলিতে পারেন, কি ভাবে তিনি প্রভুর পাদুকা লইয়া নিজ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রচুর প্রেমের আশ্রয় হইয়া কি তিনি তদীয়ারাধন স্থলে প্রভুর বামাঙ্গে পূজিতা হইতে পারেন না? এইত তদীয়ারাধনরূপে শ্রীমতী বিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর আরাধনের শাস্ত্রীয়াতিদেশ, তাঁহার তত্ত্ব-বিচারেও তিনি সর্ব্বারাধ্যা।

শ্রীবাসপণ্ডিতের অঙ্গনে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরাজমান এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও চতুর্দ্দিকে ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত। প্রভু পরিহাস করিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন "সীতাপতির্জয়তি লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ।" অদ্বৈতপ্রভু সীতাপতি শব্দের অর্থে শ্রীরামচন্দ্রকে কল্পনা করিয়া বলিলেন এখানে "রঘুনাথ" কোথায়? এখানেত "অত্র ভবান্" পূজ্য আপনি "যদুনাথ" শ্রীকৃষ্ণ উদিত রহিয়াছেন। প্রভু বলিলেন "অদ্বৈত! নির-বধি তোমার এখানকার নিবাসের উপায় আমি চিন্তা করি।

ইহা শুনিয়া শ্রীবাস বলিলেন,"যদ্যপি শান্তিপুরবাসই অদ্বৈতের উপযোগী, তথাপি এই নবদ্বীপ নববিধ ভক্তিদ্বীপের সমান, অতএব শ্রীচরণের (প্রভুর) আবির্ভাব অবধি এইখানে বাসই অদ্বৈতের পক্ষপাত, অতএব ব্যাপক নিত্যানন্দও এখানে।

অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন "অতোঽত্র: শ্রীবাস:" (এই হেতুই এখানে শ্রীবাস) শ্রীবাসপণ্ডিত শ্রী শব্দের অর্থে মহাপ্রভুর প্রথমা ঘরণী লক্ষ্মীদেবীকে কল্পনা করিয়া বলিলেন "সাতু তিরোহিতেব" (তিনিত তিরোহিত হইয়াছেন)।

প্রভু বলিলেন বিষ্ণুভক্তি শ্রী তিনি ত আপনাদের মধ্যে আছেনই, অর্থাৎ শ্রী তিরোহিত হন নাই।

অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন 'ইদানীং সৈব বিষ্ণুপ্রিয়া:"। এখন সেই বিষ্ণুভক্তিরূপা শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভক্তিস্বরূপা।

প্রভু বলিলেন "অথ কিং" আর কি ? "সৎস্থ জ্ঞানাদি মার্গেষু ভক্তিরেব বিষ্ণো: প্রিয়া:" জ্ঞানাদি মার্গ থাকিতেও ভক্তিই বিষ্ণুর প্রিয়া। অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন, অতএব ভগবান তামঙ্গীচকার"এইজন্যই ভগবান (আপনি) তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এই শ্রীমন্মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু আর শ্রীবাসপণ্ডিতের সংলাপের অভিপ্রায় এই যে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভক্তিস্বরূপিণী শ্রী।

ভগবান যে সময়ে যেভাবে অবতীর্ণ হন, শ্রীও সেই সময় সেইভাবে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার লীলার সাহায্যকারিণী হইয়া থাকেন।

"দেবত্বে দেবীরূপা সা মানুষত্বে চ মানুষী।
তীর্য্যগ্রূপাচ তীর্য্যক্ত্বে বিষ্ণোশ্রীরনপায়িনী॥"

শ্রীভগবানের দেবভাবে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীও দেবীরূপা, মানুষভাবে মনুষ্যরূপা ও তীর্য্যগ্ভাবে তীর্য্যগ্রূপা হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যেহেতু তিনি বিষ্ণুর অনুযায়িনা। তাঁহার সঙ্গে তাঁর অপায় নাই। স্বয়ং ভগবান যে সময়ে মনুষ্য মধ্যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ, অনপায়িনী শ্রীও সেই সময়ে মনুষ্যনাট্যে ভক্তিরূপিণী হইয়া অবতীর্ণা।

প্রভুর এই বাক্য যে শ্রীবিষ্ণুভক্তিই শ্রী, বড়ই গভীর। শ্রীভগবানের অনপায়িনী শ্রী অভিন্নতত্ত্ব হইয়াও শক্তিভাবে শক্তিমত্তত্ত্বের দাস্যপ্রধান পরম রমারূপা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী এতদ্বিষয়ে প্রমাণ। "ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং" নিজের অসাধারণ গুণের কারণ যাহাকে "স্মরগরলখণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারং" বলেন এবং সখিগণ "রাধাপদ্ম সরোজবাবকরসো বক্ষ:স্থলস্থোহরে:" দেখিয়া থাকেন, তিনি বলেন "দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং।"

যে ব্রজসুন্দরীকে শ্যামসুন্দর বলেন "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি ব:" তাঁহারা বলেন "সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা"। পরকীয়া রসের হেতু ব্রজে মাত্র এই ভাব তাহা নয়, স্বকীয়ারসের প্রধান দ্বারাবতীতেও এইভাব প্রচুর "দাসীশতা অপি বিভোর্বিদধু:স্ম দাস্যং। ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠেও এই ভাবের অভাব নাই "শ্রীর্যত্র-রূপিণ্যুরুপায় পাদয়ো করোতি মানং বহুধা বিভূতিভি:। প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশমভ্যর্চ্চতী॥"

এই দাস্যভাব ভক্তির এক অঙ্গ; সেই ভক্তিস্বরূপা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। যে ভাব ব্রজ, দ্বারকা বৈকুণ্ঠাদি স্থানে ব্যাপ্ত, তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে অর্চ্চনা না করিয়া তাঁহার ভাবের প্রার্থনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা সুধী বৈষ্ণবগণ বিচার করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তত্ত্ব-বিচারে ভক্তিস্বরূপা। ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামী তাহা এইরূপে নিরূপণ করিয়াছেন :—

"তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনী নাম্নি বর্ত্ততে প্রকাশ বস্তুন: স্বরূপপ্রকাশন শক্তিবৎ তৎ পরমবৃত্তিরূপৈবৈবা(ভক্তি)তাঞ্চ ভগবান স্ববৃন্দ নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে, তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি (ভক্তি-সন্দর্ভ)।

প্রকাশবস্তুর (সূর্য্যদীপক আদির) যেমন নিজেকেও অপরকে প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, সেইরূপ পরমানন্দৈকরূপ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী নামে যে স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তি আছে, এই ভক্তি তাঁহারই পরম বৃত্তিরূপা। শ্রীভগবান নিত্যই এই ভক্তি নিজ ভক্তমণ্ডলীকে দান করিয়া থাকেন। আবার তাঁহার সম্বন্ধে স্বয়ং অতিশয় আনন্দিত হন।

হ্লাদিনী নাম্নী শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি, ভক্তিরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী; সুতরাং তিনি হ্লাদিনীশক্তি।

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাৎ একাত্মাবপি

ভুবিপুরাদেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা, তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং"। শ্রীরাধিকা হ্লাদিনীশক্তি, শক্তিমত্তত্ত্বের ভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদিত করেন। আর যখন "তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং" রাধাকৃষ্ণ এক হইয়া গৌরাঙ্গরূপে প্রকাশ পান, তখন সেই হ্লাদিনীশক্তিরই পরম বৃত্তিরূপা সেই ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভিন্ন আর কেহই তাঁহাকে আহ্লাদিত করিতে পারেন না।

হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, অতএব শ্রীমতী রাধিকার বিলাসমূর্ত্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাববিশেষ, আর শ্রীবলরামের আবির্ভাববিশেষ শ্রীনিত্যানন্দ; সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র। শ্রীগৌরাঙ্গকে মানিয়া যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দকে মানেন না তাঁহাদিগকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে।

বিলাসমূর্ত্তির অমান্য করিলে যদি পাষণ্ড হয়, তবে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীকে মান্য করিয়া, তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি শ্রীসনাতনমিশ্রনন্দিনীকে অমান্য করিলেও পাষণ্ডতা দোষ দুর্নিবার্য্য।

আর এক বিপ্রতিপত্তি এই যে কোন কোন মহাত্মা বলেন নবদ্বীপসুধাকরকে মধুর রসে উপাসনা করিতে পারা যায় না। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে তাহা হইলে নবদ্বীপধাম, নবদ্বীপপরিকর ও নবদ্বীপলীলা সব অনিত্য হইয়া যায়। নবদ্বীপধাম, নবদ্বীপপরিকর ও নবদ্বীপলীলা যদি নিত্য হয়, এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যদি মায়াকল্পিত, প্রাকৃত, অনিত্যবস্তু না হন, তবে তাঁহার আনুগত্যে, তাঁহার সখীভাবে বা তাঁহার দাসীভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের মধুরভাবে উপাসনা হইবে না কেন?

মর্য্যাদাপুরুষোত্তম একপত্নিব্রতধর শ্রীরঘুনাথদর্শনে জিতেন্দ্রিয় তপস্বী দণ্ডকারণ্যবাসী মুণিগণের হৃদয়ে যদি কামিনীভাব উদয় হইতে পারে, তবে কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যানির্ম্মঞ্ছিতপদনখাগ্র শ্রীব্রজরাজকুমারের অসীম সৌন্দর্য্য, যাহা তদীয় মনোহারিণী শ্রীরাধিকার সৌন্দর্য্যসংশ্রিণে পরপরার্দ্ধ অনন্ত গুণিত হইয়া নবদ্বীপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দর্শনে কি কোন অনন্ত সৌভাগ্যবান জীবের হৃদয়ে কামিনীভাব উদয় হইতে পারে না? এই সমুদিতভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঘরে তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার ভাবকে অবরোধ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। মানুষের শরীরের উপর সমস্ত গুরুজন অভিভাবক বা রাজার পর্য্যন্ত অধিকার আছে, কিন্তু ভাবের উপর তাঁহাদের অধিকার নাই, থাকিতেও পারে না।

রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে দর্শন করিয়া যদি আমার মনে কামিনীভাব উদয় হয়, তবে তাহাকে কে নিবারণ করিতে পারে? শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রসরাজত্বভাবই তাঁহার নাগরত্ব।

কোন কোন কুতর্কী এইরূপ কুতর্ক করিয়া থাকেন, যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধুর রসের অবলম্বন করিলে তাঁহার সমুজ্জ্বল চরিত্রে কলঙ্ক আরোপন করা হয়। তবে কি দণ্ডকারণ্যবাসী মুণিগণকে শ্রীরামচন্দ্রের সমুজ্জ্বল চরিত্রে কলঙ্কারোপণের অপরাধে অপরাধী মনে করিতে হইবে?

যদি তাঁহারা এইরূপ ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইতেন, তবে কি তাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারিতেন? হরি, হরি! এইরূপ অযথা ও বিলক্ষণ কল্পনা অভক্ত ও অশাস্ত্রজ্ঞ লোকের মন টলাইতে পারে, ভজনপরায়ণ শাস্ত্রদর্শী গুরুবৈষ্ণবকৃপাভাজন সাধকের হৃদয়ে এই কটুকল্পনা ভাস্করাভিমুখে তমিস্রের ন্যায় স্থান পায় না। এসকল কথা বহির্ম্মুখ জগতের বহিরঙ্গ লোকের মুখেই শোভা পায়।

যদি কেহ বলেন দণ্ডকারণ্যবাসী মুণিগণের ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গকে মধুরভাবে কামনা করিলেও, ব্রজে যাইতে হইবে, তাহাও ত পরম অভীষ্ট।

শ্রীগৌরাঙ্গকে মধুরভাবে ভজন করা যায় না, তাহার আর একটী হেতু অনেকে এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। নবদ্বীপে স্বকীয়ভাব এবং প্রভু একপত্নিধর, সুতরাং তুমি মধুরভাবে তাহাকে কিরূপে পাইবে? ইহার উত্তর এই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মার্গে কেবল নিত্যসিদ্ধ পরিকরের রাগাত্মিকাভাব এবং ভক্ত সাধকের রাগানুগাভাব। তাঁহারা কি নিজে সঙ্গমের প্রয়াসী? না, সখী কিংবা দাসীর ভাব গ্রহণ করা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের এবং বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিলাসের সম্পাদন করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, আর সেই সঙ্গে পরমানন্দে নিজের দেহদৈহিক ব্যাপার বিস্মরণপূর্ব্বক "ব্রহ্মানন্দাদপ্যুপরিচর" রসই আস্বাদন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা আনন্দসাগরেই নিমগ্ন থাকেন। শেষ কুতর্কের উত্তর এই যে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সখী ও দাসীবৃন্দ তৎসুখসুখার্থিনী, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বসুখাভিলাষরূপ স্বার্থগন্ধ নাই। ইহার প্রমাণ ব্রজেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে।

"সখ্য শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদবিধোহ্লাদিনী নামশক্তেঃ সারাংশ প্রেমবল্ল্যা কিশলয়দলপত্রাদিরূপ স্বরূপাশিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যমমুষ্যাং যাতোৎসেকা স্বসেকাচ্ছতগুণ সাধকং হন্ত যৎ তন্নচিত্রং ॥"

সুধীগণের বিবেচনা করা উচিৎ যেখানে পরকীয়া রস, সেখানেও শ্রীমতীর সখীগণ স্বসুখাভিলাষিণী নহেন, এবং শ্রীগুণমঞ্জরী, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখ্যভাব সংমিশ্রিত দাসীগণও স্বসুখাভিলাষিণী নহেন, তবে বিশুদ্ধ স্বকীয়ারসপ্রধান নবদ্বীপের সখীও দাসীগণের কি কথা ?

আর একটী তর্কাভাস এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চনের সম্প্রদায় নাই। যাঁহারা নিজের পরম্পরাকেই সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা এইরূপ ভাবকে পোষণ করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্বকে পূর্ণরূপে জানেন, তাঁহাদের মনে এ কুতর্ক উদয় হয় না। ইহার উত্তর "সর্ব্ব সম্বাদিনীতে" শ্রীজীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন, স্বসম্প্রদায় সহস্রাধিদৈবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামাননং শ্রীভগবন্তং।" প্রভু সহস্র সম্প্রদায়ের অধিদেবতা। কোন সম্প্রদায় কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা করিয়া থাকেন, কোন সম্প্রদায় গৌরনিত্যানন্দ—কোন সম্প্রদায় গৌরগদাধর,—কোন সম্প্রদায় গৌরনরহরি,—কোন সম্প্রদায় গৌরবক্রেশ্বর,—কোন সম্প্রদায় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া,—কোন সম্প্রদায় শচীগৌরাঙ্গ,—কোন সম্প্রদায় লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ামধ্যস্থ গৌরাঙ্গ,—ইত্যাদি ইত্যাদি। ছয় গোস্বামী সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পাইয়াছিলেন তাঁহাকে সেই ভাবে ধ্যান স্মরণাদি করিয়াছেন, "যতীনামুত্তংশন্তরণীকার বিদ্যোতিবসনঃ নামগণনাকৃত গ্রন্থিশ্রেণীসুগভ কটিসূত্রোজ্জলকর" ইত্যাদি। নবদ্বীপলীলার উপাসকেরা "শ্রীমম্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং" এইরূপে ধ্যান করিয়াছেন। মুরারীগুপ্ত শ্রীরামরূপে, নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী নৃসিংহরূপে, শ্রীমদদ্বৈতপ্রভু শ্রীকৃষ্ণরূপে ধ্যান অর্চ্চনা পূজন ইত্যাদি করিয়াছেন। তবে কি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত ধ্যান অর্চ্চন করিতে পারা যায় না ? ছয় গোস্বামীপাদ শ্রীবৃন্দাবনে কিম্বা অন্যত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন নাই, তবে কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করাও অসাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে ?

"গৌরাঙ্গ-নাগরীর পৌত্তলিকতা"র বিশ্লেষণ।

(মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, শ্রীবৃন্দাবন)

আজ কাল বৈজ্ঞানিক যুগ। বৈজ্ঞানিক যুগে বিশ্লেষণ করাই তত্ত্ব নির্দ্ধারণের পথ। সাধারণ দৃষ্টিতে জল তত্ত্ব-বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, জল তত্ত্ববস্তু নয়,—হাইড্রোজেন প্রভৃতি কয়েকটী গ্যাসের সংমিশ্রণ মাত্র।

* "গৌরাঙ্গ-নাগরীর পৌত্তলিকতা"ও আপাততঃ তত্ত্ব বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু বিশ্লেষণে যে মূল পদার্থ প্রতীত হইবে, তাহাই বাস্তবিক তত্ত্ববস্তু।

"গৌরাঙ্গ-নাগরীর পৌত্তলিকতা-বাদ" সমূহ প্রস্তাবের মূর্দ্ধণ্য,—এই মূর্দ্ধণ্যে স্থূল প্রত্যয়ে তিনটী পদ।

(১) গৌরাঙ্গ (২) নাগরীর (৩) পৌত্তলিকতা। পৌত্তলিকতা শব্দবিন্যাসে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের শৈথিল্য সংমিশ্রণ হইয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণের সামান্য গানের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেও শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের সঙ্গে পৌত্তলিকতা সম্বন্ধ দেখা যায় না।

পৌত্তলিকতা শব্দের বিন্যাস ব্রাহ্মধর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়াছেন; 'পুতুল' একটী বঙ্গভাষার শব্দ, কাষ্ঠ মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত বালক বালিকাদের ক্রীড়নক-বাচক।

নিরাকার-বাদী ব্রাহ্মধর্ম্ম শ্রীভগবদর্চ্চাতে 'প্রতিমা' বা 'মূর্ত্তি' আদি আদরবাচক শব্দ প্রয়োগ করিতে নারাজ। তাহাই একটী উপহাসাস্পদ পুতুল শব্দ লইয়া তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া পৌত্তলিক শব্দ তৈয়ার করিলেন,—এবং এই শব্দকে শ্রীমূর্ত্তিপূজকগণের উপহাসস্বরূপে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যেস্থানে মূর্ত্তিপূজক বা প্রতিমাপূজক বুঝাইবার প্রয়োজন, সেই স্থানে পৌত্তলিক শব্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

শীর্ষে ও প্রস্তাবে সেই পৌত্তলিক শব্দে আবার ভাবার্থে তা প্রত্যয় করিয়া পৌত্তলিকতা শব্দ তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহার অর্থ প্রতিমা-পূজন।

---

* "গৌড়ীয়ে" ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত "গৌর-নাগরীর পৌত্তলিকতা" প্রতিবাদ প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর।

দ্বিতীয় শব্দ নাগরীর। নাগরী শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। নগরে ভবা—'নাগরী'। নগরে উৎপন্ন কিম্বা নগরে স্থিতা স্ত্রী 'নাগরী',—আরম্ভিক শব্দ গৌরাঙ্গ। 'গৌরাঙ্গ' শব্দ 'নাগরী' শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত,—গৌরাঙ্গ শব্দে বহুব্রীহি সমাসে ও গৌরাঙ্গ-নাগরী শব্দে তৎপুরুষ সংযুক্ত। তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে,—গৌরাঙ্গের নাগরীর প্রতিমা-পূজন। গৌরাঙ্গ শব্দ যদ্যপি যোগবৃত্তিতে যাহার গৌর অঙ্গ তাহারই বাচক কিন্তু "রূঢ়ির্যোগমপহরতি" ন্যায়েন পঙ্কজ শব্দ বৎ যোগরূঢ় বৃত্তিদ্বারা শ্রীনবদ্বীপসুধাকরের বাচক।

তাহা হইলে গৌরাঙ্গ ও নাগরী এই উভয় পদের সমাস করিলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসই অধিকাংশ সম্ভব। তবে এইরূপ অর্থ হইতে পারে গৌরাঙ্গের 'নাগরীর প্রতিমা-পূজা'।

শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরী শব্দে যদি শ্রীগৌরাঙ্গের পত্নী অর্থ বুঝিতে হয়, তবে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে লক্ষ্য করা যায়। বর্ত্তমানে শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে লইয়া কোন চর্চ্চা নয়,—সুতরাং প্রস্তাবের মূর্দ্ধণ্য পদ সমূহের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূজন এই অর্থ প্রতীতি হয়।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভক্তিস্বরূপা। ভক্তিদেবীর কৃপা কটাক্ষ না হইলে জীব আদৌ ভগবদুন্মুখ হইতে পারে না, অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সমর্চ্চন সর্ব্বভাবে আবশ্যক। এই সত্য যদ্যপি নিত্য, তথাপি প্রকাশসাপেক্ষ্য। লোকে যত প্রকার সত্য প্রতিষ্ঠিত, সমস্তই নিত্য, কিন্তু কোন কোন বিশিষ্ট 'কৃতলক্ষণ' মহাজনগণ, তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর নিত্যধর্ম্ম। নিউটন কিছু নূতন নির্ম্মাণ করেন নাই, কেবল প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূজন ও তাঁহার কৃপালাভ, শ্রীভগবদুন্মুখতার কারণ,—এই সত্যও নিত্য, এবং ত্রিকাল বর্ত্তমান। সুগৃহিতনাম প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মহাত্ম্য লোকে প্রকাশ করেন। ভক্তবরেণ্য সর্ব্ব-সভাজন-ভাজন শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় (যদি আমার ভুল না হয়) এইকালে সর্ব্বপ্রথমে মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বামে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দকে ধন্য করেন ও কণ্টক-কোটীরুদ্ধ ভক্তিমার্গকে নিষ্কণ্টক করিয়া ভ্রমবাত্যা-পরাঙ্মুখ জীবের চিত্ত-ভ্রমরকে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল পদারবিন্দ-মকরন্দপানের সৌভাগ্য প্রদান করেন। এই দুই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পরমান্তরঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দের আদর্শ। যাঁহারা ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগলের পূজনকে অবহেলা করেন, অর্থাৎ অনুচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের যে শেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুতে ঘোর অপরাধ হইবে, তাহা সম্ভবপর।

> গুরু উপেক্ষা করিলে ঐছে ফল হয়।
> ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
>
> চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।

নাগর শব্দ নগর শব্দে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ব্যুৎপন্ন হয়, তাহার অর্থ নগরে জাত কিম্বা নগর-নিবাসশীল। নগর শব্দের লক্ষার্থ চতুর। নাগর শব্দের প্রতিযোগী শব্দ গ্রাম্য বা বন্য। যাঁহারা আমার প্রাণ গৌরাঙ্গকে নাগর বলিতে নারাজ, প্রকারান্তরে তাহারা তাঁহাকে গ্রাম্য বা বন্য বলিতেছেন। যাঁহারা নবদ্বীপলীলাকে সাধন-সম্পত্তি এবং কেবল ব্রজলীলাকে সাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, অথচ শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতি বলিয়া কেবল নিজের ভাবকে সঙ্গত মনে করেন ও অপর সকলের ভজন-পথকে নগণ্য বলিয়া সময়ে সময়ে অবহেলা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের একবার বিবেকাঞ্জন দিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলে ভ্রম-তমিশ্র বিদূরিত হইতে পারে।

শ্রীস্বরূপ দামোদর যদি ব্রজলীলার ললিতা হন, আর রায় রামানন্দ যদি বিশাখা হন, তবে সাধ্য ব্রজলীলা হইতে তাঁহাদের সাধন গৌরলীলায় প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ছিল? সাধ্যসম্পত্তিতে যাঁহারা সিদ্ধভাবে বিরাজমান, তাঁহারা সাধন-সম্পত্তিরূপ নিম্নস্তরে অবরোহন করেন না। যদি দৈবাৎ সাধ্যভূমি হইতে কোন কারণ-বশে সাধন ভূমিতে অবরোহণ হয়, তাহাকে উৎকর্ষ বলিতে পারা যায় না,—বরং অপকর্ষ বলা যায়। এইরূপ অপকর্ষ সাধন-সিদ্ধ জীবের হইতে পারে,—নিত্য সিদ্ধের হয় না। আবার শ্রীভগবৎভাগবতাপরাধী নিত্যসিদ্ধেরও অপকর্ষ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীললিতা বিশাখা প্রভৃতির ত এরূপ কোন অপরাধ ঘটে নাই যে, তাঁহাদিগকে সিদ্ধভূমি হইতে আবার সাধন ভূমিতে নামিতে হইল। আবার যে সিদ্ধি হইতে নামিয়া আসিতে হয়, সে সিদ্ধি সিদ্ধিই নয়।

কেবল যাগাদি কর্ম্মফলের সমান কর্ম্মফল ভোগমাত্র,—তাহা ভগবৎপ্রাপ্তি নয়। ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে এই ডিণ্ডিম বাদ্য ঘোষিত হইয়া আছে—

ন স পুনরাবর্ত্ততে।
ন স পুনরাবর্ত্ততে ॥

এই সিদ্ধান্তে অর্থাৎ নবদ্বীপ-লীলা কেবল সাধন সম্পত্তি,—ব্রজলীলাই সাধ্য,—আর একটা 'নিগ্রহস্থল' আছে, কেহ কেহ বিরুদ্ধবাদী এইরূপ বলিতে পারেন যে, ব্রজলীলা সাধন এবং নবদ্বীপ-লীলা সাধ্য, যেহেতু ব্রজপরিকর সর্ব্ব ব্রজে শ্রীকৃষ্ণারাধন করিয়া পরে শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধন পূর্ব্ব ও সাধ্য পর এই স্বাভাবিক নিয়ম।

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ লীলাতে সাধ্য-সাধনরূপ ভেদ বিবেচনা করাই 'অপসিদ্ধান্ত'। বাস্তবিক উভয় লীলাই একরূপ। এবিষয়ে কেহ কেহ কুতার্কিক তর্ক করিয়া থাকেন যে, একজন সাধক যুগপৎ দুইলীলা স্মরণ মননে অভীষ্ট লাভ করিবে কিরূপে? প্রথমে এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক—এইত সিদ্ধি। জড়দেহ জড়াভিমান বদ্ধজীব একত্বধর্ম্মবিশিষ্ট,—সে দুই হইতে পারে না। জড়ভাবমুক্ত জীব স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় ও সত্যসংকল্প তৎ সম্বন্ধে উপনিষদে দুন্দুভি ঘোষ রহিয়াছে "স একধা ভবতি, দ্বিধা ভবতি, বহুধা ভবতি"। সিদ্ধজীব যুগপৎ দুইরূপে ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা দুইটী আস্বাদন করিয়া থাকেন। এই চিন্ময়রূপে উভয় লীলার আস্বাদন দুই প্রকারে হইয়া থাকে,—জীবের সত্যসংকল্পতা নিবন্ধন ও শ্রীভগবৎলীলার অচিন্ত্যতা নিবন্ধন। জীবের সত্যসংকল্পতা নিবন্ধন উপনিষদে দেখা যায় —

যদি পিতৃলোক কামস্যাৎ সংকল্প দেবাস্য পিতরঃ সমুপতিষ্ঠন্তে, যদি মাতৃলোক কামস্যাৎ সংকল্পা দেবাস্য মাতরঃ সমুপতিষ্ঠন্তি ইত্যাদি।

এই মুক্তজীব যদি পিতৃলোক কামনা করিয়া থাকে অর্থাৎ আমার পিতা হউক এইরূপ সংকল্প করিয়া থাকে তবে সংকল্প মাত্রে তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হন,—যদি সে মাতা চাহে, তবে সংকল্পমাত্রে মাতা আসিয়া উপস্থিত হন,—এই বেদবাক্যে সংকল্প—কর্তাকে একবচনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (singular) ও মাতা পিতাকে বহুবচনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (plural), একটী জীবের অনেক আকৃতি না হইলে অনেক মাতা পিতা হইতে পারে না, ইহাতেই মুক্ত জীবের অনেকরূপতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন ব্রজপরিকর সকল ব্রজ হইতে আসিয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া গৌরলীলা আস্বাদন করেন। তাহারা আর ব্রজে থাকেন না, কিন্তু ইহা একেবারে অপসিদ্ধান্ত, কারণ তাহা হইলে ব্রজলীলা অনিত্য হয়। আবার যাঁহারা বলেন যে নবদ্বীপ-লীলাতে সাধন করিয়া সাধ্য ব্রজলীলাতে প্রবেশ হয়, তাহাই সিদ্ধি,—আর তাঁহারা নবদ্বীপে থাকেন না,—ইহাও তদ্রূপ অপসিদ্ধান্ত। যেহেতু তাহা হইলে গৌরলীলা অনিত্য হয়। অতএব যদি ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা উভয় লীলাই নিত্য হয়, তবে তাহার মধ্যে সাধ্য-সাধনের নির্দ্ধারণ করা অজ্ঞানকৃত বিড়ম্বনা মাত্র। নিত্য নবদ্বীপলীলাতে শ্রীগৌরাঙ্গসহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সমর্চ্চন শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীভগবানের শক্তিরূপা ভক্তিদেবী। ভক্তির অনন্ত বৃত্তি সকল তাঁহার সখি ও দাসীরূপা। অন্যাভিলাস (স্বসুখ, স্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি) শূন্য আনুকুল্যময়ী বিশুদ্ধা ভক্তির বৃত্তি সকলের ভাবে ভাবিত বিশুদ্ধ জীব ভিন্ন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সখিমণ্ডলে ও দাসীবৃন্দে প্রবেশ করা দুষ্কর। তাদৃশ বিশুদ্ধভাবময়ী নদীয়াযুগল-উপাসনাকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের চরিত্রে কলঙ্কারোপন-জ্ঞান করা জ্ঞানকৃত দুর্ব্বিদগ্ধতা মাত্র। এইরূপ বিশুদ্ধ প্রেমকে প্রাকৃত জঘন্য কামকল্পনা করিয়া ভ্রম করা জীবহৃদয়ের মালিন্যের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

এইরূপ স্বসুখাভিলাসশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমোল্লাসকে রসাভাস বা রসবিরুদ্ধ জ্ঞান করা দিংমোহ! যাঁহারা দিঙ্মোহে মুগ্ধ হইয়া যান, তাঁহারা বিরুদ্ধ দিকে গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারাই প্রেমের দিক হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া কামের দিকে গমন করিতেছেন। এতএব তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের বিশুদ্ধ প্রেমময় মাধুর্য্যরসকে কামবাসনা মনে করিয়া সেই উচ্চ ভাবকে প্রভুর চরিত্রে কলঙ্কারোপ মনে করিতেছেন। তাহা হইবারই সম্ভাবনা।

"বারুণী দিগ্‌গতং বস্তু ব্রজ নৈন্দ্রিং কিমাপ্নুয়াৎ"

শ্রীরূপানুগত্যের দোহাই দিয়া যাঁহারা সাধনপ্রয়াসী

তাঁহাদের উচিৎ একবার গভীরভাবে শ্রীরূপ গোস্বামীর ভাব বিচার করা।

'রসোদ্দামাকামার্বুদমধুরধামোজ্জলতনু' শ্রীরূপগোস্বামীর এই ভাব কোন ভাব? এই যে গৌরসুন্দরের "কামার্বুদ মধুরধামতা" ইহা কোন রস? পুরুষভাব বিশিষ্ট সাধক যদি বিষয় জাতীয় আলম্বনকে স্মররূপে দর্শন করে, তাহা রস না রসাভাস? বাস্তবিক রস হইতেই পারে না,—রসাভাসও হইতে পারে না। বরং ইহা রসবিরুদ্ধ!

সর্ব্বরসময় শ্রীব্রজরাজ-কুমারকেও নাগরীবৃন্দই স্মররূপে দর্শন করিতেন,—যেস্থানে তাঁহার সর্ব্বরসময়তা নিরূপণ করা হইয়াছে তথায়—

"স্ত্রীনাং স্মরো মূর্ত্তিমান্" এই বলা হইয়াছে, মধুর রস ভিন্ন অন্যরসে শ্রীকৃষ্ণেরও 'স্মরতা' প্রতীত হইতে পারে না। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসে বিষয়জাতীয় আলম্বনকে কন্দর্পরূপে দর্শন করা বা কন্দর্পরূপতা গুণ সংগ্রহ করা বর্ণিত নাই। প্রস্তাবের বিস্তার ভয়ে এই বিষয় অধিক লেখা হইল না। বিশেষ বিজিজ্ঞাসায় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরস নিরূপণ-কারিণী লহরী দ্রষ্টব্য!

এই চারিটী রসের বিষয়ালম্বনরূপ শ্রীকৃষ্ণেতে স্মররূপতা বা কামর্বুদমধুরধামতা বর্ণিত হয় নাই। যেমন মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররসরূপ শ্রীকৃষ্ণে মধুর রস ভিন্ন অন্যরসে কন্দর্পসৌন্দর্য্য নিরূপিত নাই, তেমন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পুরুষভাবে ও পুরুষদৃষ্টিতে কামার্বুদমধুরধামতা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামীর এই উক্তি নাগরীভাবভাবিত অন্তঃকরণ হইতেই উদিত হইয়াছে। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে যদি সত্যভামারূপে স্বীকার করা হয়,—তবেত তিনি সাক্ষাৎ বৃষভানুনন্দিনী; শ্রীললিত মাধব নাটকে ... বৃন্দা বলিতেছেন,—

কাল ... ত্যা দেবস্য ময়ীনির্ম্মাল্যমম্বরম্
যুক্ত শি ... কারি দিব্যায়াম্ রাধৈব কথমর্প্যতে।

অর্থ,—দেবের (শ্রীকৃষ্ণের) নির্ম্মাল্য বস্ত্র আমাকে প্রসাদ দিয়া অর্থাৎ আমার মাথায় দিয়া ও আমাকে দিব্য (শপথ) করাইয়া এই শ্রীরাধিকাকেই কেন অর্পন করিতেছেন। সত্যভামা দেবীকে শ্রীমতি রাধিকার প্রকাশ বা বিলাস বলিবারও শক্তি নাই। তিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা, অতএব নববৃন্দা বলিতেছেন "রাধৈব" এই এব শব্দে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যদি সত্যভামা হন, তবে তিনি শ্রীরাধিকা। তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অর্চ্চনে আপত্তি করিলে "দ্রবিড় প্রাণায়াম ন্যায়ে" শ্রীরাধিকার পূজনেই আপত্তি করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

অপর কেহ কেহ বলেন "ললিতমাধব আবার একটী নাটক, সে কি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ যে,তাহার কথা গ্রাহ্য করিব?" কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী এই নাটকের প্রমাণ দিয়াই ব্রজে স্বকীয়ারস স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহারা ললিতমাধব নাটককে নাটক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, তাঁহাদের রূপানুগত্যে ভজনের দর্প করা বিড়ম্বনা মাত্র।

অগাধ শ্রীবৈষ্ণবসিদ্ধান্তসমুদ্রে বিহরণ করা কিম্বা সন্তরণ করাও সহজ ব্যাপার নয়, তবে তদস্পর্শ করিয়া রত্ন উদ্ধার করাও সুদুষ্কর ব্যাপার, তাহা সহজেই বোধগম্য হয় এই রসাস্বাদপ্রকরণে দ্বৈবিদ্ধ্য নির্ণীত হইয়াছে,—যদি শ্রীগৌরাঙ্গে মধুর রস না থাকে, তবে তাঁহাকে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান বলিতে পারা যায় না।

সর্ব্ব কামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ, যিনি অসর্ব্বরস,—তিনি অপূর্ণ,—যিনি অপূর্ণ তাঁহাকে স্বয়ংভগবান বলিতে পারা যায় না।

এ বিষয়ে আর একটী প্রগাঢ় ভ্রম আছে যে নবদ্বীপে "স্বকীয়ারস" ব্রজে "পরকীয়া-রস"। রূপানুগত্যে পরকীয়া রস আস্বাদন করা সিদ্ধান্ত, কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামীপাদ শেষে ব্রজেও স্বকীয়ারসসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্বকীয়ারসের আস্বাদন যদি রূপানুগত্যে না হয়, তবে জীবানুগত্যে হইতে পারে। বাস্তবিক শ্রীজীব গোস্বামী কোন প্রকার রূপানুগত্যের বিপরীত পথে যাইতে পারেন না, যেহেতু তিনি শ্রীরূপগোস্বামীর শিষ্য, তিনি কি গুরুর অমতে যাইতে পারিবেন?

রূপানুগমন ভিন্ন ভজন সিদ্ধ হয় না, এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক,—কারণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিক্ষা ও ভজনপ্রণালী, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিক্ষা ও ভজন-প্রণালী, রায় রামানন্দের শিক্ষা ও ভজন-প্রণালী,—(যাহা শ্রীমহাপ্রভুর নিজে শ্রোতা হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন) সকলই কি অনুপযুক্ত, শ্রীরূপগোস্বামীর পূর্ব্বে যাঁহারা ভজন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ

মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীপাদ কেশবভারতী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, সেন শিবানন্দ, বাসুদেব ঘোষ, ঠাকুর নরহরি প্রভৃতি মহাজনগণ যাঁহারা ভজন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের ভজন-প্রণালী কি অনুপযুক্ত ?

শ্রীগৌরাঙ্গ যুগলার্চ্চনের বিষয়কে বিচারের প্রথম কক্ষ, —অর্থাৎ 'বাদ' হইতে নামাইয়া 'বিতণ্ডা' কক্ষতে নিপাতিত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, আছে,—তিনটিকে এরূপ ভাবে জটীল করা হইয়াছে, যাহাতে অল্পজ্ঞ জন ব্যামোহগর্ত্তে পড়িয়া যায়, এবং যাহাতে তাহারা কিছু বুঝিতে না পারে। আমরা সাধক, পাঠক ও সাধারণের জ্ঞানের জন্য ঐ বিষয়েরও বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক করিতে চেষ্টা করিব।

১। শ্রীগৌরাঙ্গ-যুগলার্চ্চনা।

২। শ্রীগৌরাঙ্গে মধুর রস আস্বাদন।

৩। লৌকিক ঘৃণিত কামবৃত্তি পরিচালন দ্বারা ভগবদুপসনার ভ্রান্তি।

তৃতীয় ভাবটী অর্থাৎ লৌকিক ঘৃণিত কামবৃত্তি পরিচালনাভাবই সবিগর্হিত, ঘৃণিত ঘোর অপরাধজনক ও জীবের সর্ব্বনাশের মূল কারণ।

দুঃখের বিষয় এই যে "শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চন বিরোধীবৃন্দ" ১ম ও ২য় ভাবকেও এই ৩য় ঘৃণিত ভাবে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের বাস্তবরূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক নিজ পক্ষ সমর্থনার্থে জন-সমাজে প্রচার করিতেছেন। এই কল্পিত আবরণ উন্মোচন করিয়া আমরা শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চনের বাস্তব রূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

"যুগলার্চ্চন" একটী জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি ও সহজ ধর্ম্ম। লক্ষ লক্ষ লোক, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীসীতারাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরুক্মিণীকৃষ্ণ, শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ শচীপুরন্দর, হরগৌরী, কামরতি ইত্যাদি অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কোন ভাব নাই, কোন রস নাই,—কেবল আছে একটি হৃদয়ে অজ্ঞাত সংস্কার, যে শ্রীভগবান বা অন্যান্য দেবতাগণ প্রায় যুগল এবং তাঁহাদের শক্তিসহ উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।

ইহা 'তত্ত্ববস্তুর' শক্তিমত্তারূপ বৈদিক শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অপরিস্ফুট নিত্য-সংস্কার,—যাহা জীবের স্বরূপভূত নিত্যদাসত্বের বীজ,—এই ভাবকে পরিস্ফুট করাইবার উদ্দেশে সিদ্ধান্ত-বিৎ শ্রীমৎ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কেদারনাথ দত্ত মহোদয় শ্রীমায়াপুরে একালে শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলার্চ্চনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-সেবা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর রস আস্বাদন। যাঁহারা রসের স্বরূপ জানেন, তাঁহারা রসাস্বাদনের রীতিও জানেন। রসাস্বাদনের পরিপাটী এইরূপ, যে কোন স্থায়ী ভাব হউক না কেন সামগ্রী সংমিশ্রনে রসরূপ হইয়া যায়। মুখ্য সামগ্রী বিভাব; বিভাবের দুইভেদ,—আলম্বন ও উদ্দীপন; আলম্বন বিভাব দ্বিবিধ,—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন শ্রীভগবান, আশ্রয়ালম্বন ভক্ত। আশ্রয়ালম্বনাধারক প্রীতি অনুভাব সঞ্চারী প্রভৃতি সামগ্রী সহকারে রস হইয়া সামাজিকের আস্বাদ্য হয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক কান্তভাবের আশ্রয়ালম্বন, তদাধারক প্রীতি যদি অনুভাবসঞ্চারী সামগ্রী সহকারে ভক্তবৃন্দের আস্বাদ্য হয় তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর রস আস্বাদন। এইরূপ লীলাগান ও শ্রবণ যে শাস্ত্রনিষিদ্ধ সদাচারবিরুদ্ধ তাহা কোন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত না হইলে বিতণ্ডা রূপেই পরিণত হইতে পারে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সখী দাসী কেহ নাই, আর হইতেও পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি কেহ ভাগ্যবান্ ভাবুক জীব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সখীবৃন্দ বা দাসীবৃন্দের ভাবে ভাবিত হইয়া সেবা করিতে কামনা করেন, তিনি সম্প্রদায়বহির্ভূত আউল বাউলের মতন ত্যজ্য,—এইমত অতি 'বিলক্ষণ' বিবেক! ইহা কুসিদ্ধান্ত। এই কুসিদ্ধান্তের ভাব এইরূপ যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বর নহেন,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি নহেন। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়াযুগল নবদ্বীপবাসী একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারসম্ভূত। [illegible] প্রিয়ার সখী নাই, দাসী নাই,—তিনি নিজে তাঁহার [illegible]মের [illegible]বিশুদ্ধ করেন, নিজেই পাত্র সংস্কার করেন!!

যদি শ্রীগৌরাঙ্গকে পরতত্ত্বস্বরূপ স্বয়ংভগবান বলিয়া বিশ্বাস করা হয়,—তাঁহার লীলা নিত্য, নবদ্বীপধাম নিত্য, নবদ্বীপলীলাপরিকর নিত্য,—ব্যক্তাব্যক্তরূপে বিবিধ ও অপরিমিতঐশ্বর্য্য নিত্য অনন্ত দাসদাসী সখাসখী সকলই নিত্য। সেই সমস্ত সখী আর দাসী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর

সজাতীয় ভাবাপন্না। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-বিলাসের সময়ে বিষয়ালম্বন শ্রীগৌরাঙ্গ ও আশ্রয়ালম্বন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মধুর লীলারঙ্গকে সামগ্রী সহকারে মধুর রস সম্ভোগরূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং নীলাচল-লীলার সময়ে বিপ্রলম্ভ রূপ মধুর রসকে আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহাতে যে শ্রীমন্ গৌরসুন্দরকে ব্যভিচার-দোষে দূষিত করা হয়, এবং তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রে কলঙ্ক অরোপিত করা হয়,—তাহারত কোন গন্ধমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। যে বুদ্ধি হইতে এরূপ দোষ অরোপন করিতে পারে,—সে বুদ্ধি যে দুরাগ্রহ রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইযাছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যদি কেহ স্বসুখাভিলাষী হইয়া নিজেন্দ্রিয়সুখভোগ লালসায় নিজেকে নাগরীভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীনবদ্বীপ সুধাকরকে পরকীয়া রসবিলাসী সাজাইতে চাহেন,—তাহা নিশ্চয় ঘোর পাপ,—লীলারসবিরুদ্ধ, নিষিদ্ধ, সদ্বিগর্হিত ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলার্চ্চনে ত এইরূপ কোন বিরুদ্ধভাব নাই, তবে তাহাকে সম্প্রদায়বহির্ভূত বা ঘৃণিত বলা হয় কেন? নদীয়া-নাগরীভাবকে হেয়জ্ঞান করা হয় কেন?

এইরূপ স্বসুখাভিলাস ঐন্দ্রিয়িক ভোগ লালসাকে ভক্তি বা প্রীতিশব্দে ব্যবহারই করা যায় না। সে স্থায়ীভাবই নয়,—সে রসরূপ হইবে কিরূপে? এইরূপ ভোগলালসা শ্রীকৃষ্ণবিষয়কও নিন্দ্য—তবে শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক ত অতীব নিন্দ্যতম; অতএব শ্রীশুকদেব কুব্জাকে বলিলেন—

"দুর্ভগেদ মযা চ ত"

অর্থাৎ "দুর্ভগা এই যাচ্ঞা করিলেন"। যাঁহার স্মরণ মাত্রে জীবলোকের সৌভাগ্য উদয় হয়,—তাঁহার সঙ্গে রমণ করিয়াও কুব্জা দুর্ভগা! তাহার কারণ এই যে তিনি ঐন্দ্রিয়িক সুখকামনা করিয়াছিলেন। 'তৎসুখ সুখিতা' তাহাতে ছিল না।

শ্রীধর স্বামী লিখিতেছেন—

কামমেব প্রাকৃতা দৃষ্ট্যা অযাচত ন চ গোপ্য ইব সা তন্নিষ্ঠেতি দুর্ভগত্বং।

কুব্জা প্রাকৃতদৃষ্টিতে কাম যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, গোপীগণের ন্যায় তাঁহার ভগবৎনিষ্ঠা হয় নাই।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

দুর্ভগা ঔপাস্থ্যসুখলম্পটা ঔপাস্থ্য সুখমাত্রপ্রদং ভগবন্তং মত্বা ইদং কামং অযাচত—

কুব্জা দুর্ভগা কেন না, ঔপাস্থ্য সুখলম্পটা। শ্রীভগবানকে ঔপাস্থ্য সুখমাত্র দাতা মানিয়া এই (কাম) যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

কোথায় বা তৎসুখসুখিতারূপ সমুজ্জ্বল—হেমসদৃশ প্রেম, আর কোথায় বা স্বসুখাভিলাষময় কামরূপ লৌহ।

শ্রীগৌরাঙ্গযুগলার্চ্চনরূপ বিশুদ্ধ প্রেমকে যদি কেহ কামরূপ লৌহ মিশ্রিত করিয়া নিকৃষ্ট করিতে চাহেন—করুন, কিন্তু 'ধ্মাতং যথা হেম মলং জহাতি—ন্যায়েতে যখন তাহাকে যুক্তিশাস্ত্র ইন্ধন ও সদগুরূপদেশবহ্নি দ্বারা তাপ দেওয়া হইবে, তখন সে আবার বিশুদ্ধ হেমই থাকিবে। এই ভাবেতেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল কিশোর"।

ইহাতে শ্রীগৌরচন্দ্রকে পতি বলা হইয়াছে,—এই পতি ভাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে সখিভাব কি দাসীভাব ভিন্ন উদয় হইতে পারে না।

জীবের শ্রীভগবানে কান্তভাব সৎশাস্ত্র-সঙ্গত ও পরম উচ্চ। ভক্তিশাস্ত্র মতে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরু সুহৃদোদৈবমিষ্টম্
(শ্রীমদ্ভাগবত)

ইহাতে শ্রীভগবানকে প্রিয়, আত্মা, সুখ, সখা, গুরু, সুহৃদ, দেব ও ইষ্টরূপে ভাবনা করার বিধান আছে। তন্মধ্যে প্রিয় শব্দে 'কান্ত'। দিপীকা দীপনকার লিখিতেছেন—"প্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাদি নামিব কান্ত-ভাবেন ভাবনায়"—অর্থাৎ লক্ষ্ম্যাদি কান্তাগণের মতন কান্তভাবে ভাবনীয়—আবার শ্রীজীব গোস্বামী লিখিতেছেন "প্রিয়ঃ—লক্ষ্ম্যাদি নামিব তত্তয়া ভাবনীয়ঃ"—অর্থাৎ লক্ষ্মী আদি প্রেয়সীগণের মতন কান্তভাবে ভাবনীয়।

আবার চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"প্রিয়ঃ—ইতি প্রেয়সী ভাববতাং"

অর্থাৎ প্রেয়সীভাবে ভাবিত যাহারা, তাহারা প্রিয়ভাবে ভাবনা করেন।

'নারায়ণ ব্যূহস্তবে'

পতি পুত্র সুহৃদ ভ্রাতৃ পিতৃবৎ মিত্রবৎ হরিং
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোপিহ নমো নমঃ

যাহারা পতি পুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতা পিতা ও মিত্রের সমান শ্রীভগবানকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও প্রণাম। এই প্রকরণে পূর্ব্ব শ্লোকে 'যেষাং' উত্তর শ্লোকে 'যে' এই দুইটী পদ পুংলিঙ্গ ইহাতে 'যাষাং' ও 'যা' বলা হয় নাই। তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে অধিকারী পুরুষ কান্তাভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীভগবানকে কান্তাভাবে ভাবনা ও ধ্যান করিতে পারে। তাহা হইলে যদি কেহ ভাগ্যবান জীব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যে নিজেকে তাঁহার সখী কিম্বা দাসীভাবে ভাবিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কান্তভাবে ধ্যান ও ভাবনা করেন, তাহা শাস্ত্র-সঙ্গত এবং সদাচার সম্মত।

উক্ত ভাগবত শ্লোকে যে অহং শব্দ আছে তাহার অর্থ কি শ্রীভগবান, না আর কিছু? যদি শ্রীভগবান অর্থ হয়, আর শ্রীভগবানকে প্রিয়ভাবে ভাবনা করা শ্রীভগবানের আজ্ঞা হয়, তবে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রিয়ভাবে ভাবিতে দোষ কি?

এস্থানে আর একটী দুর্ব্বল কুতর্ক আছে, তাহার মীমাংসা করা হউক। কেহ কেহ বলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভাবিলে তাঁহাতে লাম্পট্য দোষ আরোপন করা হয়। সেটী ঘোর অপরাধ, কিন্তু শ্রীভগবান যে অনন্ত কল্যাণগুণরাশীসমষ্টি ও দোষাস্পৃষ্ট তাহা নির্ণীত,—একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি, শ্রীমান্ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—

"হরিরস মদিরা মদেন মত্তা"

ইহাতে শ্রীভগবৎ-রসকে মদিরা বলা হইয়াছে, ইহাতেও যদি শ্রীভগবানের শৌণ্ডিকত্ব দোষ আরোপন করা না হয়, তবে কান্তভাবে ভাবিলে শ্রীগৌরাঙ্গে লাম্পট্য দোষ কেন আরোপিত হইবে? লৌকিক দৃষ্টিতে লাম্পট্য দোষের অপেক্ষা শৌণ্ডিকত্ব দোষ গুরুতর। সুতরাং এইরূপ সমস্ত অপসিদ্ধান্ত প্রকাশ করা অবিপক্ক বুদ্ধির ভ্রান্ত অবস্থা মাত্র, অতএব আমি পূর্ব্ব কবিবরের এই প্রতিধ্বনি করিয়া প্রস্তাব শেষ করিলাম।

ইতর তাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতরতানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ

শ্রীগৌরাঙ্গ-নাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে নদীয়ানাগরভাবে ভজন করিয়াছিলেন পূর্ব্ব সাধুবৈষ্ণব মহাজনগণ,—এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ ও প্রাচীন পদ আছে। এই সকল মহাজনগণ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ—তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বলীলায় ব্রজের পরিকর—এবং তাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে সবিশেষ পরিচিত। ইঁহাদিগের ভজনপ্রণালী একেবারে উড়াইয়া দিয়া—এই সকল সাধু মহাজন-বাক্যের অনাদর করিয়া একশ্রেণীর লোক গৌরাঙ্গ-নাগরীভাবের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে দুঃসাহস করিতেছেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ আছে—কিন্তু লড়াই নাই।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে কথাটি লইয়া মতবিরোধ, তাহারই আলোচনা করিব। মহাপ্রভুর বিদ্যাবিলাসের সময় তিনি নদীয়াবাসী লোকের সঙ্গে নানাস্থানে নানাভাবে চপলতার ভাব প্রকাশ করিতেন। সেই সকল কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"এইমত চাপল্য করেন সভা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥
অতএব যত মহা-মহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিও স্বভাব সে গায় বুধগণে॥" চৈঃ ভাঃ

এস্থলে "মহামহিম সকলের" অর্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণই বুঝিতে হইবে—পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণেরও নাগরত্ব স্বীকার করেন না—রাসলীলা রূপক মনে করেন—রসরাজ মহাভাবের অর্থই বুঝেন না—তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি গীতার লইয়া—তাঁহাদের গৌরভক্তি সন্ন্যাসী ও ত্যাগী

শ্রীগৌরাঙ্গ লইয়া। তাঁহাদের মনে শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরভাব উদয় না হওয়াই সম্ভব। এইজন্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিলেন মহামহিম সকলে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুকে নাগর বলিয়া স্তব করেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ছাড়া জগতে আরও ত লোক আছেন—পণ্ডিত মহাশয় ত সকলেই নহেন—সেই অপণ্ডিত ভক্তলোকেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে নাগর বলেন—কিন্তু সে স্বয়ং ভগবানভাবে,—সচ্চরিত্র ও নীতি জ্ঞানসম্পন্ন নিমাইপণ্ডিতভাবে নিশ্চয়ই নহে। নিমাই পণ্ডিতের মত সচ্চরিত্র অকলঙ্ক শশী কেহই ছিলেন না—ইহা কে না জানে? তিনি যখন স্বয়ং ভগবানরূপে তাঁহার রসিক ভক্তবৃন্দহৃদয়ে পরম পরতত্ত্বভাবে স্ফূর্ত্তি পাইলেন—তখনই তিনি তাঁহাদের প্রাণবল্লভ হইলেন—তখন তিনি নদীয়ানাগর হইলেন,—তখনই তিনি রসরাজ গৌরাঙ্গ হইলেন।

প্রাচীন মহাজনগণ আমাদের মত ভজনহীন ছিলেন না,—আমাদের মত না পড়িয়া পণ্ডিত ছিলেন না। আমাদের মত নিস্ফল বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহারা ভজনবিজ্ঞ সারগ্রাহী সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন,—তাঁহাদিগের ভজনপন্থায় কোনরূপ কামগন্ধ ছিল না—তিনি শ্রীকৃষ্ণই হউন, আর শ্রীগৌরাঙ্গই হউন,—তিনি সম্ভোগরসবিগ্রহই হউন, আর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহই হউন,—কামগন্ধশূন্য নির্ম্মল প্রেমপ্রবণতাই তাঁহাদের স্বরূপ—স্বয়ং ভগবানের রসরাজত্ব,—স্বয়ং ভগবানের নাগরত্ব, সাধারণ নরপ্রকৃতির অঙ্গীভূত নহে—তোমার আমার মত কামুক পুরুষের কামুকতাব্যঞ্জক যোষিৎসঙ্গপ্রসূত আত্মসুখেচ্ছাসূচক পরিভাষা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের রসরাজত্ব নাই,—নাগরত্ব নাই—একথা বলিলে মহাজনবাক্য অবহেলা করা হয়—সিদ্ধ মহাপুরুষ গৌরাঙ্গপার্ষদ রসিক ভক্তবৃন্দের অবমাননা করা হয়। এ অবমাননা তাঁহাদের নহে—স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের—তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না।

এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নাগরত্বের প্রমাণ সকল নিম্নে উদ্ধৃত হইবে। অনেকে নিজপক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নিজের অনুমানই প্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করেন—নিজের ব্যাখ্যাই সদ্ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচার করেন। অপর পক্ষের কথা উড়াইয়া দিবার এই এক নব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন নদীয়ানাগরীভাবের পদাবলী, যাহা মহাজনীপদ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থ সকলে উচ্চ স্থান পাইয়াছে, তাহা মহাজনীপদ নহে—দুষ্টপ্রকৃতি সহজিয়াগণ মহাজনের নাম দিয়া ঐ সকল পদ রচনা করিয়াছেন। একথার প্রমাণ তাঁহারা দিতে পারেন না—পারিবেনও না,—অথচ বলিবেন। যে বৈষ্ণববংশে এই সকল মহাজন শ্রীগৌরাঙ্গের রসিকভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন—সে বংশ এখনও বর্ত্তমান—সেই গৌরাঙ্গপার্ষদ রসিক ভক্তদিগের হস্তলিখিত পুঁথি এবং পদ বহুস্থানে অদ্যাবধি সংরক্ষিত,—তাঁহাদের ভজনপদ্ধতি পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের বংশাবলীর ভজনরাজ্যে পরম নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত ও আচরিত হইতেছে—নদীয়ানাগরীভাবের পদাবলী পরমপ্রেমভরে আবহমানকাল হইতে তাঁহাদের ভজনমন্দিরে গীত হইতেছে এবং যাহার শ্রবণে তদ্ভাবাপন্ন ভক্তহৃদয়ে পরম পবিত্র প্রেমভক্তির উৎস উঠিতেছে। এই সকল প্রাচীন সাধুবৈষ্ণববৃন্দের বিশুদ্ধ ভজনানন্দসম্ভূত হৃদ্গত প্রেমভাবের অনাদরকারী সাহসকে আমরা দুঃসাহসই বলিব। ঠাকুর নরহরির গৌরাঙ্গ সাধনাপদ্ধতি,—বাসুদেব ঘোষের গৌরাঙ্গভজন প্রণালী,—ঠাকুর লোচনদাসের নবদ্বীপ রসের ভজনব্যাপার—যাঁহারা বিকৃত এবং শাস্ত্রবহির্ভূত মনে করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বনিবনাও হইতে পারে না—তাঁহাদের সঙ্গলাভে আমাদের মন ধাবিত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথমে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরত্বের প্রমাণস্বরূপ সেই সর্ব্ব বৈষ্ণবজনবিদিত এবং নিত্য প্রভাতে শ্রীগৌরাঙ্গমন্দিরে গীত মহাজন কৃষ্ণদাস রচিত প্রভাতী প্রাচীন পদটির প্রথম চরণেই দেখিতে পাই শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে তিনি নাগর বলিয়াছেন যথা—

(১) "সোঙর নব গৌর-সুন্দর নাগর বনোয়ারী।
নদীয়া ইন্দু করুণা-সিন্ধু ভকতবৎসলকারী।।" ইত্যাদি।

এই প্রাচীন পদকর্ত্তা দীন কৃষ্ণদাস, যে কবিরাজ গোস্বামী নহেন, তাহার প্রমাণ কি?

(২) শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত শ্রীগ্রন্থে শ্রীগৌরসুন্দরকে "নাগর বর" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যথা :—

কোঽয়ং পট্টধটীবিরাজিত কটীদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎপদে নূপুরং।

উর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভরপ্রোৎফুল্লমল্লীস্রগঃ—
পীড় ক্রীড়তি গৌর-নাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ॥

এস্থলে "গৌর-নাগরবর" কে বিরোধীদল শ্রীকৃষ্ণ বলেন—এই নাগরবর গৌরাঙ্গ নহেন, একথা বলিবার সাহসকে বলিহারি যাই!

পূজ্যপাদ সরস্বতী ঠাকুর ধ্যানস্থ হইয়া এই রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গনাগর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন—তিনি কখন শ্রীনবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষ দর্শনের সৌভাগ্য পান নাই।

(৩) তারপর দেখুন পূজ্যপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার রচিত গৌরাঙ্গ স্তবে কি লিখিয়াছেন,—

যথা—"কলেবর কৈশোর নর্ত্তক বেশং
নটনর্ত্তন নাগরীরাজ কুলং"।

আর একটী শ্লোকের শেষে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বিশুদ্ধং মাধুর্য্যং প্রতিপদ নবং স্বান্তরঙ্গে প্রযচ্ছন্
নটস্তং গৌরাঙ্গং স্মরতু মে মনঃ শ্রীলক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়েশং"॥

এখানে তিনি শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া সমন্বিত নটবর নাগর গৌরাঙ্গসুন্দরকেই স্মরণ করিতেছেন। এখানে ঔদার্য্যভাব-পোষক কোন কথাই নাই, তাঁহার প্রতি পদে মাধুর্য্য-রসেরই প্রকাশ দেখিতেছেন;—এই মাধুর্য্যরসবিগ্রহই নাগরগৌরাঙ্গ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ। শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনে সম্ভোগরস নাই—একথা আমরা স্বীকার করি না।

(৪) শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি গ্রন্থ তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন,—

"সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস বিভ্রমৈ-
র্ব্রাজরাজদ্বরহেমগৌরঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-লালিত পাদ-পঙ্কজো
রসেন পূর্ণ রসিকেন্দ্র মৌলি।"

এই রসিকেন্দ্র কি নাগর-গৌরাঙ্গ নহেন?

(৫) ঠাকুর নরহরি সরকারের নদীয়ানাগরীভাবের সকল পদেই গৌরাঙ্গপ্রভুর নদীয়া-নাগরত্ব ঘোষিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার গৌরাঙ্গাষ্টক-স্তোত্রের প্রথম শ্লোকেই শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে অতি মধুর ভাষায় "লম্পটগুরু" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমশ্চারুণং
নিন্দৎকাঞ্চনকান্তি রাসরসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ় করাভিবন্ধনবসান্ লোমোদ্গমো দৃশ্যতে
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পটগুরো সন্ন্যাসীবেশং ক্ষিতৌ॥

ঠাকুর নরহরি ব্রজের মধুমতী—তিনি গৌরকৃষ্ণ অদ্বয়-তত্ত্বই দেখিতেন—তাই শ্রীকৃষ্ণের গৌর-বপুকেই রসরাজ নদীয়ানাগরভাবেই ভজন করিতেন। ঠাকুর নরহরি একজন নগণ্য মহাজন নহেন। পূজ্যপাদ ছয়গোস্বামীপাদের তিনি পূজ্য ছিলেন—তাই তাঁহারা ঠাকুর নরহরির অষ্টক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভজনপদ্ধতি যে ষড়গোস্বামী-পাদগণের অননুমোদিত, একথা বলিবার দুঃসাহস কেহ করিতে পারেন না।

(৬) শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বাসুঘোষের নদীয়া-নাগরী-ভাবের পদাবলীর ত কথাই নাই—তিনিও সর্ব্বপ্রথম গৌরাঙ্গ দর্শনেই—একেবারেই গৌর-নাগরী-ভাবে আত্মহারা হইয়া তাঁহার প্রাণের কথাটি পদে লিখিয়া ফেলিলেন—

যথা— নিরমল গৌর তনু, কষিত কাঞ্চন জনু,
হেরইতে ভৈ গেল ভোর।
ভাও ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মনে,
অন্তর কাঁপই মোর॥
সজনি যব্ হাম্ পেখনু গোরা। (ধ্রু)
আকুল দিগবিদিক্, নাই পাইয়ে,
মদন-লালসে মন ভোরা॥
অরুণিত লোচনে, তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুমশর সাধে।
জীবইতে জীবনে, থেই নাহি পাওল,
ডুবু পড়, গঙ্গা অগাধে।
মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ জানসি যদি,
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন রে সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥

ইহার উপর নদীয়ানাগরভাবের আর কথা নাই।

(৭) মহাজন কবি গোবিন্দদাস ও তাঁহার প্রাচীন পদাবলীকে বহুমাননা না করেন, এমন বৈষ্ণব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ পর্য্যন্ত তাঁহার রচিত পদ আস্বাদন করিতেন। তিনি কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

সখিরে শুরুয়া গৌরব দূরে গেল॥ (ধ্রু)
ভুবুয়ন লোচন, শ্রবণরসায়ন, সকলি গৌরময় ভেল।
দূর সঞে যব, গৌর নাম শুনই, চমকই অবিচল চিত।
না জানিয়ে কো ঘটায়ল, গৌরচান্দ সনে মিত॥

পতিক সোহাগ আগসম লাগই, রোই রোই ভেল উদাস॥
নিশিদিশি রোই গোই কত রাখব কহতহি গোবিন্দদাস॥

ইহার উপর আর নদীয়ানাগরীভাবের উচ্চ আদর্শ নাই।

(৮) প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা রায় চন্দ্রশেখরের প্রাচীন নদীয়া-নাগরীভাবের পদের ভণিতায় দেখি—

"যুবতী গরব, ত্যজিতে গৌরব, নদীয়া-নগর মাঝে।
চন্দ্রশেখর কহয়ে বরজ পড়ল যুবতী লাজে॥

নদীয়ানগর মাঝে নদীয়া-নাগর গৌরাঙ্গসুন্দরের এই নাগরভাব সিদ্ধ মহাজনগণ স্বচক্ষে দেখিয়া, তবে পদে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

(৯) ঠাকুর লোচনদাসের নদীয়া-নাগরী ভাবের পদের ত কথাই নাই। তিনি যে ঠাকুর নরহরির উপযুক্ত শিষ্য। তাঁহার পদ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই—সে সকল পদ সর্ব্বজন বিদিত।

(১০) ঠাকুর নয়নানন্দ, পণ্ডিত গোসাঞি গদাধর প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মন্ত্রশিষ্য—তাঁহারও নদীয়ানাগরী-ভাব। তিনি একটি পদের শেষে লিখিয়াছেন,—

"পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল গোরা নটরাজ।
দূর সঞে দেখে সব নাগরী সমাজ॥
নদীয়া নাগরীগণ বুঝিল মরমে।
যার পরসাদে পাই প্রেম-রতনে॥
গদাধর প্রেমে বশ গৌর-রসিয়া।
কহয়ে নয়নানন্দ এরসে রসিয়া॥

পণ্ডিত গোসাঞিরও নদীয়া-নাগরীভাব—তাহা না হইলে গৌরসুন্দর "গদাধরের প্রাণনাথ" হইলেন কি করিয়া?

(১১) মহাজন কবি শ্রীনিত্যানন্দপরিকর দ্বিজ বলরাম-দাস ঠাকুর কৃত নদীয়ানাগরীভাবের পদ আছে—সেগুলিও প্রাচীন পদ—তাহাতে দেখিতে পাই তিনি বাল গৌরাঙ্গের উপাসক হইলেও পরে মধুরভাবের উপাসনার সাধক হইয়াছিলেন—স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার মন্ত্রগুরু—অতএব শ্রীগুরুর উপদেশেই তিনি গৌরাঙ্গের রসিকভক্ত হইয়াছিলেন। দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর রচিত নিম্নলিখিত নদীয়া-নাগরীভাবের প্রাচীন পদটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গৌরববরণ মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলিল, টলিল সকল দেশ॥

মনু মনু সই হেরিয়ে গৌরাঙ্গ ধাম।

বধিতে যুবতী, কো বিধি গড়ল, কামের উপরে কাম (ধ্রু)
চম্পা নাগেশ্বর, মল্লি থরে থর, বিনোদকিশোর সাজ।
ওরূপ দেখিতে যুবতী উনমতি, ছাড়ল ধৈরজ লাজ॥
ওরূপ দেখিয়া, পতি উপেক্ষিয়া, নদীয়া-নাগরী কান্দে।
ভালে বলরাম আপনা নিছিল, গোরাপদ নখ-ছান্দে॥

এই প্রাচীন মহাজন দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের প্রকট নদীয়ালীলা স্বচক্ষে দেখিয়া এই পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

(১২) প্রাচীন ভক্তকবি গোবিন্দদাস আর একটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের ভণিতায় লিখিয়াছেন,—

"শ্রবণে সোনার মকর কুণ্ডল রঙ্গিনী পরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস কহই নাগর হারাই হারাই তিলে॥

মহাজন প্রাচীন কবি রায়শেখর একটি পদে লিখিয়াছেন—

"সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে?
সুরধনী তীরে- নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে।
পীরিতি পরশ অঙ্গের ঠাম, ললিতলাবণ্য কলা।
নদীয়া নাগরী করিতে পাগলী না জানি কোথা না ছিলা॥

এখন যদি গৌরাঙ্গ নাগরই না হইবেন, এতগুলি প্রাচীন ভজনবিজ্ঞ মহাজন এরূপ নাগরীভাবের পদাবলী রচনা করিয়া ইহা ভজনাঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করিলেন কেন? এখন প্রশ্ন হইতে পারে অকলঙ্ক শশী শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিত্র জানিয়া শুনিয়া প্রাচীন মহাজনগণ এইরূপ নাগরী ভাবাত্মক বহু পদ কেন রচনা করিলেন? অপর পক্ষ বলিলেন এই সকল পদ মহাজনীপদ নহে, সহজিয়া দুষ্টমতপোষক অপধর্ম্মযাজক-গণ মহাজনের নাম দিয়া এইরূপ পদাবলী রচনা করিয়াছে এবিষয়ের বিশিষ্ট প্রামাণাভাবে গৌরভক্তবৃন্দ বহিরঙ্গ লোকের কথায় মহাজনী পদের অসম্মান করিতে পারেন না। গৌর-নাগরীভাব মহাজনানুগত ভাব,—ইহাতে কামগন্ধ নাই,—নদীয়ানাগরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে দেখিয়াই সুখী,—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হউন কিম্বা তিনি নয়নকোণে তাঁহাদের প্রতি একবার চান, নদীয়া-নাগরীদের মনে ভ্রমেও এ বাসনার ক্ষীণ ছায়া-পাতও হয় না,—ইহাই নাগরীভাবের গূঢ় রহস্য।

যাঁহারা ব্রজভাবের রসিকভক্ত, রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে তাঁহারা রসিক নাগরভাবেই চাহেন,কারণ গৌরকৃষ্ণ অভিন্নতত্ত্ব —"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই"। এই জন্যই রসিকভক্ত প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ শ্রীগৌরাঙ্গকে নাগর সাজাইয়া আপনারা নাগরীভাবে তাঁহার রূপগুণ বর্ণনা করিয়া মধুরভাবে গৌরাঙ্গভজন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভজন যে অসিদ্ধ, একথা বলিলে মহাজনের অবমাননা করা হয়।

গোলকগত মহাত্মা শিশিরবাবু নাগরীভাবের বিরোধী ছিলেন না, তিনি তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিতে তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যথা— "যদি নদীয়া-নাগরী ভজন না থাকিত, তবে শত শত নদীয়া-নাগরী-ভাবের নব নব অনুরাগের পদ কেন সৃষ্টি হইল? যদি নদীয়ানাগরী না থাকিবেন, তবে এ সমুদয় পদ প্রাচীন মহাজনগণ কেন সৃষ্টি করিলেন? আর কেনই বা সংগ্রহ করিয়া ভজনের নিমিত্ত গ্রন্থবদ্ধ করিলেন? অতএব হে বৈষ্ণবগণ! হে ভক্তগণ! কেহ কাহারও ভজনসাধনে ব্যাঘাত দিও না"—

মহাত্মা শিশিরকুমার নদীয়া-নাগরীভাবের পোষকতা করিতেন না,—একথা বলা কেবল গায়ের জোরে। তাঁহার কৃপাপাত্র বসন্তসাধু তাঁহার এই নদীয়া নাগরীভাবে গৌরাঙ্গ-ভজনতত্ত্ব শিশিরকুমারের নিকটেই শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গনাগর যে বংশীধারী, তাহা শ্রীপত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহাদের মনে রাখা উচিত ভজনসাধন কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে,—শাস্ত্রতত্ত্ব সকলে একভাবেই বুঝেন না এবং তাহাতে একমতও হইতে পারেন না। ব্যক্তিগত নিজভাবেই মহাজন ভাষ্যকার ভাষ্য লেখেন। কাহারও সহিত তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ভাষ্য লেখেন না। উপাসনা-ক্ষেত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। উপাসনাক্ষেত্রে গুরূপদেশই শাস্ত্র,—মহাজনানুগত পথই প্রশস্ত।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় নদীয়া-নাগরী-ভাবের বিরোধী ছিলেন না,—তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ বিরোধী হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এখন তাই বলিয়া গৌরনাগরী-ভাব যে অশাস্ত্রীয়, একথা কেহ বলিতে এবং তাহা সকলেই মানিবে,এরূপ ভাব মনে পোষণ করিলে আত্মম্ভরিতার পরিচয় দেওয়া হয়। তোমার মত তোমার শিষ্যগণ অবশ্য মানিবে,—সকলেই ত তোমার শিষ্য নহে,—এবং তুমিও সকলের গুরু নহ। বিশাল গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে একমাত্র গুরু গোসাঁঞি কেহ নাই,—ভজনমুদ্রা নিজ নিজ গুরুমুখী বিদ্যা, ভজনরাজ্যে নানা ভাবের ভজন প্রথা প্রচলিত আছে—নানা ভাবের ভজনানন্দী গুরুও আছেন,—প্রাচীন সিদ্ধ ও সাধকগণের বিবিধ গণও আছেন—নিজ নিজ মনের মানুষ মহাজনও আছেন,—গুরুপরম্পরাও আছে। সকলেই একজনের মতে চলিবেন, এরূপ আশা করা বড়ই অসঙ্গত আবদার। এতগুলি মহাজন যাঁহারা নদীয়া-নাগরী-ভাবের পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের যে ভজন সিদ্ধ হয় নাই, একথা এখন বলা আত্মম্ভরিতার পরিচয় এবং দুঃসাহস মাত্র। সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজীর ভজন কিছুই নহে যিনি বলেন,—ঠাকুর নরহরি ও বাসুঘোষের ভজনপ্রণালীতে যিনি দোষ দৃষ্টি করেন,—তাঁহার এ দুঃসাহসকে সুধী বৈষ্ণবগণ প্রসংশা করিতে পারেন না।

নদীয়ানাগর ভজননিষ্ঠ—জনৈক বৈষ্ণব দাস।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

("সাধনা" হইতে উদ্ধৃত)

(সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম, এ)

(১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীকে বিবাহ করেন; তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তিনি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে বিবাহ করেন; এক্ষণে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। তপনমিশ্রকে কাশীতে বাস করিতে বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, শীঘ্রই কাশীতে প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে; প্রভু নিজের ভাবী সন্ন্যাসের কথা ভাবিয়াই একথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ছিল মনে করিতে হইবে। গৃহস্থের পক্ষে সন্ন্যাসের প্রধান অন্তরায়

সঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাসের এই অন্তরায় দুরীভূত হইল; তথাপি ইহার পরে প্রভু আবার বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে বিবাহ করিলেন কেন? বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই পতিপ্রাণা কিশোরী-ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা জানিয়াও প্রভুর পক্ষে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষেই প্রয়োজন ছিল। একটা বিরাট-ত্যাগের দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বীয় আন্তরিকতা এবং বলবতী পিপাসার পরিচয় দিয়া বহির্ম্মুখ পড়ুয়া আদি নিন্দুক লোকদিগের চিত্ত তাঁহার প্রতি অনুকূলভাবে আকৃষ্ট করাই ছিল প্রভুর সন্ন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য (চৈঃ চঃ ১।১৭। ২৫৫-৫৯ এবং ১।৭।৩৩)। লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধানের পরে যদি তিনি পুনরায় বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে বিপত্নীক-অবস্থাতেই তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত। বিপত্নীক লোকের সন্ন্যাস-গ্রহণে লোকের চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু চিত্তাকর্ষক চমৎকৃতি ও প্রশংসার ভাব সাধারণতঃ উদিত হয় না—বিপত্নীক প্রভুর সন্ন্যাসেও হয়তো হইত না, না হইলে তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। তাই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল। প্রেমবান্ পতির পক্ষে প্রেমবতী পত্নী স্বভাবতঃই অত্যন্ত আদরের বস্তু; প্রেমবান্ বিপত্নীক লোকের পক্ষে প্রেমবতী দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী আরও অধিকতর আদরের বস্তু—তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা হৃদয়ের কতটুকু অংশ ছিঁড়িয়া ফেলাও বোধ হয় তাদৃশ স্বামীর পক্ষে কম যন্ত্রণাদায়ক। প্রভু কিন্তু তাহাই করিলেন—প্রেমবান্ বিপত্নীক স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের প্রেমবতী কিশোরী ভার্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাহাতেই তাঁহার সংসার-ত্যাগের মহনীয়তা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয় নিন্দুকদিগের চিত্ত তুমুল-ভাবে আলোড়িত হইয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর আকার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে গিয়া মিলিত হইল।

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে। তাঁহার নিন্দাকারীদের চিত্তকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি যে সরলা পতিপ্রাণা ভার্য্যাকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিলেন, ইহাতে কি প্রভুর স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে না? না—ইহাতে তাঁহার স্বার্থের কিছুই নাই। নিন্দাকারীদের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধি নহে—পরন্তু, তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তির অধিকারী করা। প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন জগদ্বাসীকে প্রেমভক্তি দিতে—নিন্দুক কয়জন প্রেমভক্তি না পাইলে তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; তাই তাঁহার সন্ন্যাস। প্রেম-ভক্তি-বিতরণের কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্ষদবর্গ যেমন তাঁহার সহায়, তাঁহারই স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও তদ্রূপ তাঁহার সহায়; তিনি ব্যতীত অপর কেহই প্রভুর সংসারত্যাগকে নিন্দুকদিগের চিত্তাকর্ষণের উপযোগিনী মহনীয়তা দান করিতে পারিত না। পতিপ্রাণা সাধ্বী-রমণী কখনও নিজের সুখ চাহেন না—চাহেন সর্ব্বদা পতির তৃপ্তি; দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াও তাহাই করিয়াছেন। তিনি প্রভুর সহধর্ম্মিণী; প্রভুর কোনও সঙ্কল্পসিদ্ধির কার্য্যে কোনও রূপ আনুকূল্য করিতে পারিলেই তিনি নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। পতি-বিরহে তাঁহার অসহ্য দুঃখ হইয়াছিল সত্য—কিন্তু পতির সঙ্কল্প-সিদ্ধির আনুকূল্য-বিধায়ক বলিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী সেই দুঃখকেও বরণীয় জ্ঞানে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ প্রেমভক্তি-বিতরণ কেবল প্রভুর কাজও নয়—ইহা ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও কাজ; ভক্তিরূপে তিনি নিজেকে জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তো বোধহয় প্রেম-ভক্তি-বিতরণে প্রভুর এত আগ্রহ; মুখ্যতঃ তাঁর জন্যই তো প্রভুর সন্ন্যাস। প্রভুর সন্ন্যাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ—ভক্তিরূপে আপামর সাধারণের চিত্তে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর নিজের তীব্র বাসনা। প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য তিনি প্রভুকে বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন; প্রভু সন্ন্যাসী হইলেন; আর সন্ন্যাসিনী না সাজিয়াও পতিপ্রাণা সাধ্বী ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন—তপ্ত-ইক্ষুচর্ব্বণের ন্যায় পতির চরণচিন্তার দুঃখবিজড়িত সুখ ব্যতীত আর সমস্ত সুখের বাসনাকেই তিনি তাঁহার অশ্রু-গঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন; আর, কিরূপে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হয়, লাভ করিয়াও কিরূপে তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহার আদর্শ জগদ্বাসীকে দেখাইবার নিমিত্ত ভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া যে তীব্র সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা মিলে কি না সন্দেহ।

গৌরসুন্দর নিজে হরি হইয়া হরি বলিয়াছেন, আর তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নিজে ভক্তি-স্বরূপিণী হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—জীবের মঙ্গলের জন্য। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ম্মন্তুদ বিরহ-দুঃখ, শ্রাবণ-ধারানিন্দি তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন নীরব অশ্রু, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার তীব্র ভজন—জগদ্বাসীর চিত্তে যে প্রবল-বাত্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার গতিমুখে সকল রকমের বিরুদ্ধতা, সকল রকমের প্রতিকূলতা—কোন্ দূর-দূরান্তরে অপসারিত হইয়া হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? প্রভুর সন্ন্যাস, আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ—প্রভুর স্বার্থের জন্য নহে, প্রেমভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে; সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় প্রভুর পক্ষে নিন্দার কথা কিছু নাই; উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কার্য্যের দোষগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য।

আর একটী প্রশ্ন উঠিতেছে। প্রতিপ্রাণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে লৌকিক দৃষ্টিতে সেই ত্যাগ যদি মহনীয় না হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহার প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অন্তর্ধান করাইলেন কেন? অন্তর্ধান করাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে বিবাহই বা করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দানের চেষ্টা করিতে হইলে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর তত্ত্ব কি দেখিতে হইবে। তিনি স্বরূপে লক্ষ্মী—বৈকুণ্ঠেশ্বরী; কান্তা-রূপে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ পাওয়ার নিমিত্ত তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়া দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ পাইতে পারেন নাই। ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর তীব্র উৎ-কণ্ঠার অনাদর করিতে পারেন না; বিশেষতঃ নবদ্বীপ-লীলায় তিনি কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই। তাই লক্ষ্মীদেবীর বাসনা পূরণের নিমিত্ত নবদ্বীপ-লীলায় প্রভু তাঁহাকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করিয়া স্ব-সঙ্গ দান করি-লেন। লক্ষ্মীর বাসনা পূরণই তাঁহাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য।

বিবাহ করিয়া প্রভু তাঁহার অন্তর্ধান করাইলেন কেন? বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ভগবৎকান্তা হইলেও কৃষ্ণস্বরূপের নিত্য-কান্তা নহেন—নারায়ণ-স্বরূপের কান্তা। আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী হইলেন স্বরূপে সত্যভামা—কৃষ্ণস্বরূপের নিত্যকান্তা। বিষ্ণু-প্রিয়ারূপে সত্যভামা যখন প্রকটিত হইয়াছেন, তখন গৌর-রূপী কৃষ্ণ তাঁহাকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করিবেনই, তাই লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করার পরেও প্রভুর পক্ষে শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াকে বিবাহ অপরিহার্য্য। এক্ষণে আলোচ্য এই যে, লক্ষ্মী-প্রিয়াদেবীকে অন্তর্হিত না করাইয়াও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে পারিতেন কি না? সামাজিক দৃষ্টিতে তৎকালে ইহা বোধ হয় বিশেষ নিন্দনীয় হইত না; কারণ, শ্রীল অদ্বৈতা-চার্য্যাদি প্রামাণিক ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরও তৎকালে একাধিক পত্নী বিদ্যমান থাকার রীতি দেখা যায়। অন্য এক কারণে বোধ হয় শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্র-স্থিতি সম্ভব হইত না। কারণটী এই। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ কামনা করিয়া থাকিলেও কোনও কৃষ্ণকান্তার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই; তিনি ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, বৈকুণ্ঠে-শ্বরের একমাত্র কান্তা; নিজের পক্ষে অন্য রমণীর আনুগত্য-স্বীকারের ধারণাই বোধ হয় তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। যেখানে আনুগত্যের ভাব নাই, সেখানে সপত্নীত্বও সহনীয় হইতে পারে না; বস্তুতঃ লক্ষ্মীদেবী সপত্নীত্বেও অভ্যস্তা নহেন এবং আনুগত্য স্বীকারে অনভ্যস্তা এবং অসম্মতা বলিয়া সপত্নীত্বের সহনশীলতা অর্জ্জন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এইরূপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সপত্নীরূপে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না বলিয়া এবং শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াকে বিবাহ করাও অপরিহার্য্য বলিয়াই বোধ হয় লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মীদেবীকে প্রভু অন্তর্ধান করাইলেন।

(২)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ উর্ম্মিলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা এবং পত্রলেখাকে "কাব্যে উপেক্ষিতা" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; কেন না, কাব্যে ইঁহাদের চরিত্র-কথা যথাযথভাবে বর্ণিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সত্য; কিন্তু তিনি যে কয়জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আরও একজন আছেন, তিনও উপেক্ষিতা—দেবী বিষ্ণু-প্রিয়াও গোস্বামি-শাস্ত্রে উপেক্ষিতা। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ-প্রিয়তমা, রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া—জগদ্বাসীর উদ্ধারের নিমিত্ত কত দুঃখ, কত কষ্ট না সহ্য করিয়াছেন, —তাঁহার প্রাণ-কোটী-প্রিয় কোটী-মন্মথ-মদন শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরকে মায়াহত দীনদুঃখীর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলাই-

বার নিমিত্ত ত্রতাপদগ্ধ আচণ্ডাল-সাধারণকে স্বীয় কোটি-চন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণতলে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নবীন-যৌবনে তাঁহার প্রাণবল্লভকে জগতের দ্বারে ছাড়িয়া দিলেন, জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত নিজে মর্ম্মন্তুদ দুঃখ চিরকালের তরে বরণ করিয়া লইলেন। গৃহে থাকিয়াও তিনি সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন এবং তিনি যেরূপ তীব্র বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, কয়জন সন্ন্যাসী তাহা করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন, বলা যায় না। দেবী—

> প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
> কদাচিত নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
> কনক জিনিয়া অঙ্গ—সে অতি মলিন।
> কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
>
> —ভক্তিরত্নাকর। ৪র্থ তরঙ্গ।

আর দেবীর ভজন-কঠোরতাও ছিল অতুলনীয়া;

> হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
> সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥
> তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
>
> —ভক্তিরত্নাকর। ৪র্থ তরঙ্গ।

ভক্তগণ সাধারণতঃ মালায় হরিনাম-সংখ্যা রক্ষা করেন; দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া রক্ষা করিতেন—তণ্ডুলে; এক এক বার নামজপ হইলে এক একটী তণ্ডুল রাখিয়া দিতেন; দিনান্তে এইরূপে যে তণ্ডুল জমা হইত, তাহাই রন্ধন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ভোগ লাগাইতেন এবং সেই প্রসাদের কিঞ্চিন্মাত্র দেবী গ্রহণ করিতেন। দেবী জীবের জন্য এইরূপে ভজনের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতাদি প্রাচীন কোনও গোস্বামি-গ্রন্থেই দেবীর মর্ম্মন্তুদ দুঃখের বর্ণনা নাই, তাঁহার তীব্র-কঠোর-ভজনাদর্শের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস—প্রভুর সন্ন্যাসের পরে শচীমাতার দুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন, নদীয়াবাসীর দুঃখেরও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এই বর্ণনায় দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। তৎকালীন গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র শ্রীল লোচনদাস-ঠাকুরই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন; আর পরবর্ত্তী গ্রন্থকারদের মধ্যে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তীও দেবীর বৈরাগ্যাদির বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কোনও গ্রন্থে এ সমস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া জানি না। গোস্বামিগ্রন্থে ছোট বড় বহু ভক্তের কার্য্যাবলীরও বর্ণনা আছে; কিন্তু লোকহিতার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী এবং ভজনোদ্দেশ্যে কঠোর-বৈরাগ্যবতী দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত বর্ণনা নাই।

কেহ হয়তো বলিবেন—"গোস্বামিপাদগণ সাধারণতঃ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। রাধাভাবে ভাবিত গৌর শ্রীরাধাভাবে নিজকে রাধা বলিয়া মনে করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতেন; তাই তিনি কান্তাভাবের আশ্রয় মাত্র, বিষয় নহেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কান্তা-ভাবের বিষয়—আশ্রয় নহেন। তাই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরাঙ্গের লীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার স্থান নাই—এজন্য গোস্বামি-শাস্ত্রেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিতের বিশেষ উল্লেখ নাই।"

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি স্বীকার করিয়া লইলেও ইহাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত-বর্ণনা হইতে বিরতির সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। গোস্বামি-শাস্ত্র যে কেবল কান্তাভাবের আশ্রয়-রূপেই গৌরের লীলা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নহে; অন্য ভাবের লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু শচীমাতার বাৎসল্যের বিষয় ছিলেন—শচীমাতা তাঁহাকে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত বলিয়াও মনে করিতেন না; তথাপি প্রভুর প্রতি শচী-মাতার বাৎসল্যের বর্ণনা গোস্বামিশাস্ত্রে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত গোস্বামিশাস্ত্র হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত-বর্ণনা বর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিনা বলিয়াই, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমরা গোস্বামিশাস্ত্রের উপেক্ষিতা বলিতেছি। আমাদের মনে হয়, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্র-বর্ণনা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থে নাই—তাহা অসম্পূর্ণ। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মাকাশের একটী উজ্জ্বলতম নক্ষত্র; তাঁহার প্রচ্ছন্নতায়, সেই আকাশের শোভা ক্ষুণ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, গোস্বামি-শাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গের বিশদ বর্ণনা নাই বলিয়া রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরের উপাসক কোনও কোনও ভক্ত আজকাল শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গের আলোচনাতেও যেন বিচলিত

হইয়া উঠেন। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, তাঁহারা বোধ হয় জানেন না—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কে? তাঁহারা বোধ হয় জানেন না—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ভক্তিরূপিণী; তাঁহারা বোধ হয় জানেন না—ভক্তিরূপিণীর কৃপা ব্যতীত কাহারও হৃদয়েই ভক্তিরাণীর সিংহাসন বসিতে পারে না; তাঁহারা বোধ হয় জানেন না—ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নিজেকে জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার ইচ্ছা করাতেই জগদ্বাসী শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে পাইতে পারিয়াছে। গোস্বামিশাস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-প্রসঙ্গের বিস্তৃত বর্ণনা নাই সত্য; কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি কটাক্ষও নাই; কোনও কোনও আধুনিক ভক্তের আচরণে তাহাও যেন প্রকাশ পাইয়া থাকে; এইরূপ কটাক্ষ যে গুরুতর অপরাধের হেতু, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

সুখের বিষয়, আজকাল দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্বন্ধীয় আলোচনা বিশেষ প্রসার লাভ করিতেছে; কেবল শুষ্ক আলোচনাই নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যুগলরূপের উপাসনাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; সম্ভবতঃ মহাত্মা শিশির কুমারই এই উপাসনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে—শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা-পদ্ধতি মহাত্মা শিশিরকুমারের একটী অপূর্ব্ব দান; তিনি বাঙ্গালীকে অনেক জিনিষ দিয়া গিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে বোধ হয় এই উপাসনা-পদ্ধতিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান।

কিন্তু প্রাচীনপন্থী বৈষ্ণবদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলভজনের বিরোধী; তাঁহাদের আপত্তির মুখ্য হেতু বোধ হয় দুইটী; প্রথমতঃ, গোস্বামিশাস্ত্রে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজনের উপদেশ নাই। দ্বিতীয়তঃ, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-ভজনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া হইলেন কান্তাভাবের আশ্রয়, আর গৌর হইলেন বিষয়—কান্ত, নাগর; কিন্তু গৌরের স্বরূপ হইল রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধার ভাবে তিনি নিজেকে রাধা মনে করেন; তাই তিনি কান্তাভাবের আশ্রয় গৌরের নাগর-ভাব তাঁহার স্বরূপ-বিরোধী।

আমাদের মনে হয়, এই দুইটী হেতুর একটীও শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগল-ভজনের প্রতিকূলে সঙ্গত কারণ হইতে পারে না। প্রথমতঃ, গোস্বামিশাস্ত্রে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজনের উপদেশ নাই বলিয়াই তাদৃশ ভজন অশাস্ত্রীয় হইতে পারে না। গোস্বামিগণ সমস্ত ভজন-প্রণালীর উপদেশ লিপিবদ্ধ করেন নাই; শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনই তাঁহারা প্রধানভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—আনুষঙ্গিক ভাবে কি প্রসঙ্গ-ক্রমে দাস্য সখ্য-বাৎসল্যভাবের ভজনের কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠাধীশ্বর নারায়ণের ভজন ও শ্রীরামচন্দ্রাদির ভজন-বিষয়ে উপদেশ তাঁহাদের গ্রন্থে মুখ্যভাবে দৃষ্ট হয় না; শিব ও ভগবতীর উপদেশ বোধ হয় তাঁহাদের গ্রন্থে মোটেই নাই। তজ্জন্যই কি বলিতে হইবে যে, নারায়ণাদির উপাসনা, কি শৈব-শাক্তদের উপাসনা-পদ্ধতি অশাস্ত্রীয়? ভগবানের অনন্ত-স্বরূপ, অনন্ত ভাব; যে কোনও ভাবে সেই ভাবের অনুকূল স্বরূপের উপাসনাতেই ভগবৎকৃপা লাভ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী নদীয়া-পুরন্দরের মুখ্যা শক্তি; শক্তির সহিত শক্তিমানের ভজন চিরপ্রসিদ্ধ; সুতরাং শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল-ভজন অশাস্ত্রীয় হওয়ার কোনও হেতুই দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় আপত্তি—গৌরের নাগর ভাবের সহিত তাঁহার স্বরূপের বিরোধ। এ সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন এই—গোস্বামিশাস্ত্রানুসারে, গৌর = শ্রীকৃষ্ণ + শ্রীরাধার ভাব; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই তিনি স্বয়ং ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই তিনি শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ভাবই তাঁহাতে আছে এবং শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া শ্রীরাধার ভাবও তাঁহাতে আছে। কৃষ্ণত্ব ত্যাগ করিয়া তিনি গৌর হয়েন নাই, কৃষ্ণত্বকে প্রচ্ছন্ন করিয়া গৌর হইয়াছেন; তাই তিনি "অন্তঃ কৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ।" তাঁহার কৃষ্ণত্ব প্রচ্ছন্ন বটে, কিন্তু সকলের নিকট প্রচ্ছন্ন নহে। ভগবানের শক্তি এবং ভাব ভক্তের ভক্তির বৈচিত্র্য অনুসারে প্রকটিত হয়; ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণরতি সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যের আধার; তাই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার বৈচিত্র্য ব্রজে প্রকটিত; ব্রজের সমস্ত ভাবই মাধুর্য্যমণ্ডিত বলিয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনও মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা। দ্বারকা পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত; তাই ব্রজেন্দ্র-নন্দনই যখন প্রকট-লীলায় দ্বারকায় যায়েন তখন, তিনি যশোদা-স্তনন্ধয়ত্ব ভুলিতে না পারিলেও তাঁহার ব্রজের মাধুর্য্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আর ব্রজে যে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের

অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকে, পরিকর ভক্তদের ভাবের আকর্ষণে দ্বারকায় তাহাই আবার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। নবদ্বীপেও তাহাই। নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তিদ্বারা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও ভক্তের নিকট তাঁহার কৃষ্ণত্ব ধরা পড়িয়া গিয়াছে। নবদ্বীপে—

যশোদা-নন্দন হৈল শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥

চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ।

শ্রীকৃষ্ণ যশোদানন্দনরূপে ব্রজে যে চারিটী রস আস্বাদন করিয়াছেন, এই চারিটী রস কি কি? দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই চারিটী রস তিনি ব্রজে কি ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন?—বিষয়রূপে, কিন্তু আশ্রয়রূপে নহে। নবদ্বীপে কি ভাবে আস্বাদন করিলেন? দাস্য, সখ্য, ও বাৎসল্যরস তিনি নবদ্বীপেও বিষয়রূপেই আস্বাদন করিয়াছেন; তিনি শচীমাতার পুত্র, শচীমাতার বাৎসল্য তিনি তাঁহার পুত্ররূপে—অর্থাৎ বাৎসল্যের বিষয়রূপেই—আস্বাদন করিয়াছেন। এস্থলে গৌর বাৎসল্যের আশ্রয় নহেন। দাস্য ও সখ্য সম্বন্ধেও একই কথা—গৌর বিষয়। কিন্তু মধুর-ভাব সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে;

স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গীকরিয়াছে ভাল মতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্র-নন্দনে মানে আপনার কান্ত॥

—চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ।

রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি রাধাস্বরূপ হইয়াছেন—কান্তাভাবের আশ্রয় হইয়াছেন, শ্রীঅঙ্গে শ্রীরাধার কান্তির ন্যায়, তাঁহার মনে শ্রীরাধার ভাবও উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু শ্রীরাধার কান্তি যেমন তাঁহার কৃষ্ণবর্ণকে নষ্ট করিতে পারে নাই, প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে মাত্র, শ্রীরাধার ভাবও তেমনি ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভাবকে নষ্ট করিতে পারে নাই, প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। সুতরাং শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কান্তাভাবের আশ্রয় হইয়া থাকিলেও, এই আশ্রয়ত্বের অন্তরালে ব্রজের কান্তাভাবের বিষয়ত্বও, তাঁহাতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শ্রীল নরহরি-সরকার-প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণ স্বীয় ভক্তি-বৈচিত্রীর প্রভাবে তাঁহাকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। তাই তাঁহারা নিজেদিগকে নাগরী এবং গৌরকে নাগর ভাবিয়া গৌরের উপাসনা করিতেন; তাঁহাদের উপাসনায় শ্রীগৌরাঙ্গ কান্তাভাবের বিষয়—আশ্রয় নহেন। স্বয়ং প্রকাশানন্দ-স্বরস্বতীও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে "বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র" এবং "বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর" বলিয়া স্তব করিয়াছেন। এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয় এবং আশ্রয়—এই উভয়রূপে মধুর-রস আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লিখিত উক্তি হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা স্বীকার না করিলে শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ণ ভগবত্তারই বিরোধ জন্মে। পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া রাম-নৃসিংহবরাহাদিও তাঁহার মধ্যে আছেন—কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে; ভক্তের ভাব-বিশেষের প্রভাবে এসকল প্রচ্ছন্ন-স্বরূপও গৌরের স্বরূপে প্রকটত্ব লাভ করিয়াছেন; তাই ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গকেই রাম, নৃসিংহ, বরাহাদিরূপে, এমন কি রুক্মিণী, ভগবতী-আদিরূপেও দর্শন করিয়াছেন; তিনি রাধাভাব-সুবলিত বলিয়া এ সকল রূপের এবং তত্তদ্রূপানুকূল ভাবের প্রকটনে যেমন কোনও বিঘ্ন জন্মে নাই, তিনি কান্তাভাবের আশ্রয়ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে কান্তাভাবের বিশেষত্ব-প্রকটনেও কোনও রূপ বিঘ্ন জন্মে নাই—জন্মিতে পারেও না। কান্তাভাবের আশ্রয়ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া অন্যভাবের প্রকটন যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে রাম-নৃসিংহাদি ভাবের আবেশ, জগজ্জননী-ভাবের আবেশ, "মুঞি সেই, মুঞি সেই" এবং "শুতিয়াছিলাম মুঞি ক্ষীরোদের গর্ভে" ইত্যাদি উক্তি, "গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন। ব্রজেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন॥" ইত্যাদি উক্তিও অসম্ভব হইত। এসমস্ত কারণে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া যুগল-ভজনের বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিতীয় হেতুরও কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কান্ত, বল্লভ; আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার বল্লভা, কান্তা। মধুর ভাব তাঁহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—অনাদিকাল হইতে। এই ভাবের বিষয় শ্রীগৌরাঙ্গ, আশ্রয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। ভক্তসাধকের ভজন আনুগত্যময়। যাঁহারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে—তাঁহার দাসী-অভিমানে শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলের উপাসনা করিতে প্রয়াসী—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসকের ন্যায়,

শ্রীশ্রীসত্যভামা-কৃষ্ণের উপাসকের ন্যায়, শ্রীশ্রীরুক্মিণী-কৃষ্ণের উপাসকের ন্যায় - তাঁহারাও ধন্য, নমস্য। সাম্প্রদায়িকতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিলে, আমাদের মনে হয়, গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে—ভক্তি-স্বরূপিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন কিনা সন্দেহ। যাহা আমার উপাসনার অনুকূল নহে, তাহাকেই অশাস্ত্রীয় মনে করা নিষ্ঠার পরিচায়ক নহে—বরং ধৃষ্টতারই পরিচায়ক। স্বরূপবিশেষ বা ভাববিশেষে নিষ্ঠাবান ভক্ত শ্রীহনুমানের কথাই বলিয়া থাকেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃকমললোচনঃ॥

শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক-সম্প্রদায় মধ্যেও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতিকূলতাচরণের আজকাল বেশ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। নানা কারণে গোস্বামীদের প্রবর্ত্তিত প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না—নানাবিধ ব্যভিচার, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, তথাকথিত আচারের অত্যাচার, মন্ত্র-ভাগবত-বিগ্রহ-ব্যবসায়ীদের শোষণাদি প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজকে সাধারণের দৃষ্টিতে বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে। তাই এই সমাজের বিস্তৃতি যেমন একটু স্থগিত হইয়া পড়িতেছে, কোনও কোনও স্থানে যে সঙ্কুচিতও না হইতেছে, একথাও বলা যায় না। সমাজের এরূপ অবস্থায় নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্যম, নূতন ভাব, নূতন অনুরাগের আন্তরিকতা, স্নিগ্ধতা, উদারতা লইয়া শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসক-সম্প্রদায় সমাজের দ্বারে উপস্থিত। পুরাতনের প্রতি বিরক্ত হইয়া দলে দলে লোক নূতনের প্রতি ধাবিত হইতেছে, নূতনের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। যাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও কৃপার বর্ণনে প্রাচীন লেখনী কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাঁহার জয়-নাদে বঙ্গের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতেছে। কত মণ্ডপ মাতাল বোতল ছাড়িয়া শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম-কীর্ত্তনে মত্ত হইয়াছেন। কত কামিনী-কাঞ্চনের উপাসক শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ঐকান্তিকী উপাসনায় বিভোর হইয়া পড়িতেছেন। এরূপ অসাধ্যসাধন লৌকিক চেষ্টায় সম্ভব নহে, আমাদের বিশ্বাস—ইহা ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরই কৃপাবৈচিত্রীর অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। সত্য বটে—যাঁহারা গোস্বামীদের প্রবর্ত্তিত পন্থায় ভজন করেন, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন তাঁহাদের জন্য নহে, (১) কিন্তু শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কৃপাও তাঁহাদের পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে, বরং প্রার্থনীয়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন; তাই উপাসনাপদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা থাকিলেও এবং সাধ্যভাবেরও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলেও সকলের লক্ষ্যই এক—স্বয়ং ভগবানের সেবা দ্বারা লীলারস বৈচিত্রীর আস্বাদন। রসও অনন্ত, রসের বৈচিত্রীও অনন্ত; যে রসের যে বৈচিত্রীতে যাঁহার লোভ জন্মে,—তাহার আস্বাদন পাইলেই তিনি ধন্য হইতে পারেন। সমগ্র ভারতের বুক জুড়িয়া পতিতপাবনী গঙ্গা প্রবাহিত, তাহার যে কোনও ঘাটের গঙ্গোদক গ্রহণ করিলেই জীব পবিত্র হইতে পারে; সকলকেই যে এক ঘাটে উপনীত হইতে হইবে—এমন কোনও ব্যবস্থা হইতে পারে না। আমার আচরিত ঘাটে যিনি আসিবেন না, তিনিই যে আর পবিত্র হইতে পারিবেন না, এরূপ মনে করা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর পরিচায়ক মাত্র। ভগবানের সহিত নিজের রুচি অনুযায়ী সেবার অনুকূল একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনই ভজনের উদ্দেশ্য এবং তদনুকূল ভাবে ভগবৎ-স্মৃতির ধ্রুবানুসরণের চেষ্টাই ভজন। যিনি যে বিহিত উপায়ে সেই চেষ্টায় রত হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সেই উপায়ের অবলম্বন অসঙ্গত বা নিন্দনীয় হইতে পারে না।

যাহা হউক, জানিয়া বা না জানিয়া যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা-পদ্ধতির প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন, শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া এবং তাঁহাদের উপাসকমণ্ডলী তাঁহাদের প্রতি কৃপা করুন, ইহাই উপসংহারে আমাদের প্রার্থনা।

(১) "সত্য বটে" বলিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম বুঝিলাম না। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করিলে গোস্বামিমত প্রতিকূল হইবে কি? আরও দুই একটী কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পরে নিবেদন করিব।
সম্পাদক।

নদীয়া-নাগরীভাব ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

(মাধ্ব গৌড়েশ্বরাচার্য্য—শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী, সার্ব্বভৌম লিখিত)

নদীয়া-নাগরীভাব ভক্তিমার্গের পরমোচ্চ ভাব, উহা হৃদয়ঙ্গম করা অপরিমার্জ্জিত হৃদয়ের কার্য্য নহে!

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুর প্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্।

নদীয়া-নাগরীভাবে যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের পূর্ণ অভিমত ছিল, তাঁহার একটি প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সজ্জনতোষিণী পত্রিকা তিনি স্বয়ং সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহার নিজের অনভিমত কোন বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন না।

সজ্জনতোষণী ৮ম খণ্ড ৮ম সংখ্যাতে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দ ঠাকুরের পদাবলী হেডিং দিয়া কতকগুলি প্রাচীন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদাবলী জেলা বর্দ্ধমান উকরা নিবাসী শ্রীকিশোরীমোহন গোস্বামীর প্রেরিত বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা হইতে একটী পদ, উদ্ধৃত হইল।

"গৌর-কলেবর মৌলি-মনোহর চিকুর ঐছে মেহারি।
জনু হেম মহীধর-শিখরে চামর দেই মনমথে জারি।" *

আহা! এই চিকুরের কি শোভা! যেন হেম মহীধরের শিখরে চামর রহিয়াছে। এই চিকুরে দর্শনে নাগরীগণের হৃদয়ে মন্মথ (কন্দর্প) জারিয়া দেয় (উদ্দীপনা করে)।

* পাঠান্তর—"উরপর ডারি,"
উক্ত পদটীর শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।
পীন উর উপনীত, কৃত উপবীত সীতিম রঙ্গ।
জনু, কনয়া ভূধর, বেড়ি বিলসই, সুরতরঙ্গিণী গঙ্গ॥
আধ অম্বর আধ-সম্বর আধ অঙ্গ সুগোর।
জনু জলদ সঙ্গে, অতি বাল রবিচ্ছবি, নিকসে অধিক
জগত আনন্দ পহুঁক পদনখ, ঐছই ঐছন ছন্দ॥
জনু মীন কেতন, কঙ্ক নির্ম্মঞ্ছন, চরণে দেই দশ চন্দ॥

এই কন্দর্প উদ্দীপন বা মন্মথ জারণ পুরুষের হইতে পারে না, অবশ্য নদীয়া-নাগরীগণের ভাবে বিভাবিত সাধকের এই উক্তি সম্ভব।

"সজ্জন তোষিণী"তে প্রকাশিত আর একটি পদ এই—
"সহজেই মধুর মধুর স্বচ্ছ মাধুরী ত্রিভুবন জন-মনহারী।
জলজ কি স্থলজ চলাচল জগভরি, সবহুঁ বিমোহনকারী॥"
মাইরি! অপরূপ গোরারূপ-কাঁতি।
নিরখি জগতে ধরু, দামিনী কামিনী, চঞ্চল চপল খেয়াতি॥ধ্রু
হারকি ছলকিয়ে, তারক বিলসই, উরপরিযঙ্কে নিহারি।
গগণহি ভগন রমণ নিজ পরিজন গণি গণি অন্তরকারি॥
যাহা দেখি সুরপুর, নারী নয়ন ভরি, ধারে ঝরত অনিবারি।
জগদানন্দ ভণ, তাহাকি ধৈরজ ধর, দ্বিজবর কুলজকুমারি॥"

মাইরি "অপরূপ গোরারূপ কাঁতি"—ইহাতে "মাইরি" শব্দটি নারীগণের আশ্চর্য্যোক্তি, যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বঙ্গভাষায় "বাপ্‌রে বাপ্—কি হ'ল" ভাষা প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ মহিলাগণের উক্তিতে "মাইরি" শব্দ প্রয়োগ হয়। ইহার ভাব এই যে গৌরাঙ্গরূপকান্তি অত্যাশ্চর্য্য মনপ্রাণ হরণকারী, যাহা দেখিলে জগতের কামিনী-কুল দামিনীর (বিদ্যুতের) ন্যায় চঞ্চল হইয়া চঞ্চল খ্যাতি অর্জ্জন করেন অর্থাৎ অধীর হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলতা প্রাপ্ত হন। যে রূপকে দর্শন মাত্র সুরপুরের নারীগণের (দেবাঙ্গনাগণেরও) নয়নে অনিবারিত অশ্রুবর্ষণ হয়, তাহা দেখিয়া দ্বিজবর কুলজ কুমারীগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুমারীগণ কিরূপে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন? এই ব্রাহ্মণকুমারীগণই নদীয়া-নাগরীগণ।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় নিজ সম্পাদিত পত্রিকায় নদীয়া নাগরী ভাবের পদাবলী কখনও প্রকাশিত করিতেন না, যদি নদীয়া-নাগরীভাব তাঁহার অনভিমত হইত। তিনি কি সিদ্ধ তোতারাম বাবাজির ভনিতাযুক্ত কবিতাটি জানিতেন না? এক্ষণে এই কবিতাটির দোহাই দিয়া তাঁহার গণ বিশুদ্ধ নদীয়ানাগরীভাবকে গর্হণ করিতেছেন।

সজ্জনতোষিণী হইতে আর একটি নদীয়া-নাগরী-ভাবের পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শশধর যশোহর, নলিনমলিন কর, বয়ন নয়ন দুহুঁ তোর।
তরুণ অরুণ জিনি, বসন দশনগণি, মোতিম জ্যোতি উজোর

চিত্তচোর গৌর তুহু ভাল।
জিতলি শীতল কিরণে হিরণ মণি দলিত ললিত হরিতাল ॥ধ্রু॥
পদকর শরদর বিন্দই নিন্দই নখবর নখতর পাঁতি।
রসনা রসায়ন বদন ছদন হেরি মোতিম রোহিত কাঁতি॥
সুখ মুখ দুরগতি ধরণী বরণি নহ বিধিক অধিক নিরমাণ।
অতএব তেজি কুল,যুবতী উমতি ভেল,জগত জগতে করু গান॥

নদীয়ানাগরীভাবের বিরোধীগণের উচিত দুরাগ্রহের চশমা দূরে নিক্ষেপ করিয়া এই সকল প্রাচীন মহাজনপদের গূঢ় মর্ম্মার্থ বিচার করা। উক্ত পদটীর ভণিতায় মহাজন কবি জগদানন্দ তাঁহার প্রাণবঁধুয়া গৌরাঙ্গপদে নিবেদন করিতেছেন,—"অতএব তেজি কুল যুবতী উমতি ভেল জগত জগতে করু গান"। ইহার মর্ম্ম এই যে সমস্ত জগজ্জন সমগ্র জগতের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে এইরূপ গান করুক যে কুলযুবতীগণ গৌরাঙ্গরূপ দর্শনে কুমতি (উন্মত্ত) হইয়াছে। আরও সুস্পষ্টরূপে নদীয়ানাগরীভাব জগদানন্দ প্রভুর পদে দেখুন—যথা,

নিরখিতে ভরমে,মরমে মঝু পৈঠল, যব সঞে গৌরকিশোর।
তব সঞে কোন কি করি কাঁহা আছিয়ে, অনুভবি নহ
পুন ঠোর॥
কহল শপথ করি তোয়।
দ্বিজকুল গৌরব, গৌরক সৌরভে, চোর সদৃশ ভেল মোয় ॥ধ্রু
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ, স্মৃতি-পথগত মুখচন্দ।
করে ধরি কতএ, যতন করি রাখব, অবিরত বিধি নিরবন্ধ॥
ধৈরজ আদি পহিলে দূর ভাগল, হেতু কি বুঝিয়ে না পারি।
জগদানন্দ সব, অব সমুঝায়ব, রহ দিন দুই তিন চারি॥

এই প্রাচীন পদের অর্থ রাগদ্বেষশূন্য ভাবে বিচার করিলে সুবুদ্ধিমান এবং সত্যসন্ধিৎসু ধর্ম্ম-তত্ত্ববিচারকগণ অতি সহজেই বুঝিবেন নদীয়া-নাগরীভাব পৌত্তলিকতা নহে বা আউল, বাউল, সহজিয়া কর্ত্তাভজার দলের মত সদ্‌বিগর্হিত অসৎ ভজনপন্থা নহে। ইহা মহান্ উচ্চ ধর্ম্মভাব এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজনানুগত রাগমার্গের ভজনপন্থা।

উপরোক্ত মহাজনীপদের মর্ম্মার্থ—

একজন সখী তাঁহার প্রিয় সখীকে বলিতেছেন, হে সখি, আমার ইচ্ছা ছিল না যে গৌরকে দেখি, কিন্তু প্রতিবাসিনী সকলে বলিতে লাগিলেন একটী সোণার মানুষ নদীয়ার পথে নাচিতে নাচিতে যাইতেছে, তাহাই ভরমে নিরখিতে অর্থাৎ ভ্রমে দেখিতেই সেই অবধি গৌরকিশোর মঝু (আমার) মরমে পৈঠল (প্রবিষ্ট হইয়াছে)। তদবধি আমি যে কোথায় আছি, কি করিতেছি এই সকল আমার অনুভব অল্পই আছে, আমি শপথ করিয়া তোমাকে বলিতেছি গৌরাঙ্গগন্ধমাত্র প্রাপ্তিতে আমার ব্রাহ্মণকুলের গৌরব চোরসদৃশ হইয়াছে। অর্থাৎ দূরে পলাইয়া গিয়াছে। আমি গৌরাঙ্গ ভুলিতে চাহি—কিন্তু স্মৃতি-পথপ্রাপ্ত সেই গৌরমুখচন্দ্র আর কিছুতেই বিস্মরণ হয় না, কি বলিব এই বিধির নির্ব্বন্ধ আমার প্রারব্ধের ভোগ; এখন যাহা হইবে তাই হইবে। এই ভাবকে হাতে চাপিয়া কি করিয়া গোপন করিব? সখি বলিলেন, তুমি কুলবতী ধৈর্য্য ধারণ কর, উতলা হইও না। তাহার উত্তরে নদীয়া-নাগরী বলিতেছেন "ধৈরজ আদি পহিলে দূরে ভাগল, হেতু কি বুঝিয়ে না পারি"। পদকর্ত্তা জগদানন্দ সেই ভাবে ভাবিত হইয়া বলিতেছেন দুই চারি দিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে তোমাদেরও এই দশা হইবে। একটু অপেক্ষা কর। (সজ্জনতোষিণী ৮ম খণ্ড ১১ সংখ্যা)

ইহার অপেক্ষাও প্রজ্জ্বলিত পূর্ব্বানুরাগের আর একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। সজ্জনতোষিণী ৮ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা—

শারদ ইন্দু কুন্দ নব বন্ধুক ইন্দীবর নিন্দ।
যাকর বদন বদনাবলী ছদন নয়ন পদ অরবিন্দ॥
দেখ শচীনন্দন সোই।
যছু গুণ কেতন তনু হেরি চেতনহীন মীনকেতন হোই॥ধ্রু॥
হেরইতে যাক চিকুর রুচি বিগলিত কুলবতী হৃদয় দুকুল।
সো কিয়ে পামরী চামর ঝামর চামর সমতুল মূল॥
নিরখিত নয়ন, নহত পুন তিরপিত, অপরূপ রূপ অতিরূপ।
জগদানন্দ সতী ভনই-ভাবিনী সো আসে চণক স্বরূপ॥

নদীয়ানগরী উক্তি! সখি, দেখ দেখ শচীনন্দন কেমন গুণের কেতন (নিবাস) তাঁহার সুন্দর তনু দর্শনে মীন-কেতন (কন্দর্প) চেতনহীন হইয়া যায়, অর্থাৎ মোহগ্রস্থ হয়। সেই কন্দর্পমোহন বররুচি হেরইতে অলক সন্দর্শনে কুলযুবতীগণের হৃদয়ের দুকুল আপনা আপনিই খসিয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহাদের মনে মোহ উদয় হয়—

"কুঞ্জগতিং গমিতা নবিদামঃ কশ্মলেন কবরীং বসনং বা।"

এই সমস্ত নদীয়া-নাগরীভাবের পদাবলীতে সুস্পষ্টভাবে নাগরীভাব মহাজন প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় পরম সমাদরে এই ভাবকে সজ্জনতোষিণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সময়ে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় স্বয়ং সজ্জনতোষিণী পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই সমস্ত পদাবলী এবং এই ভাব তাঁহার অনভিমত হইলে তিনি কখনও পত্রিকায় স্থান দিতেন না। কোন কোন সম্পাদক অন্যের অনুরোধে নিজের অনভিমত বিষয়ও নিজ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে লিখা হয় সম্পাদকের অনভিমত, এজন্য তিনি দায়ী নহেন, কিন্তু এই সমস্ত পদাবলী প্রকাশ বিষয়ে কোথাও লিখা নাই, সম্পাদকের অনভিমত, বরং তিনি শ্রীশ্রীপ্রভু জগদানন্দের পদাবলী বলিয়া হেডিং দিয়াছেন। শ্রীশ্রীদ্বয় ও প্রভুশব্দ যে কত আদর ও শ্রদ্ধার বিষয়, তাহা গৌড়েশ্বর বৈষ্ণববৃন্দ অবশ্যই জানেন।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, নদীয়া-নাগরীভাবরূপ অপসিদ্ধান্তকর্ত্তাকে এইরূপ সম্মান কখনও দিতেন না। তিনি আজকালকার কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারকের মত "মনে এক মুখে এক" ভাবের লোক ছিলেন না। তিনি সত্যপ্রিয়, যথার্থবক্তা, ধর্ম্মভীরু, নির্ভীক বিশুদ্ধহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের দল পাকাইবার জন্য প্রকৃত সত্যকে অসত্য প্রমাণ করিয়া কেবল পরাপবাদের দ্বারা নিজদল পোষণ করাকে এবং আত্মশ্লাঘাকে মহাপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এইজন্য তিনি নদীয়া-নাগরীভাব প্রকাশক পদাবলী দ্বারা তাঁহার সম্পাদিত সজ্জনতোষিণীর কলেবর ভূষিত করিয়া প্রকৃত সত্যের আদর করিয়াছিলেন এবং তাদৃশ ভাব বিশিষ্ট পদকর্ত্তার নামের অগ্রে শ্রীশ্রীদ্বয় যোজনা পূর্ব্বক প্রভুশব্দ দ্বারায় মহাসম্মানিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ তাঁহার মতের বিরুদ্ধবাদী হইয়া বিশুদ্ধ নদীয়া-নাগরীভাবকে দুষ্ট-বলিতেছেন। অহো! কালস্য কুটিলা গতি!

নদীয়া-নাগরী-পদ

(বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ লিখিত)

বঙ্গীয় পদ-সাহিত্যে নদীয়া-নাগরী-পদ বলিয়া যে এক শ্রেণীর অতি সুমধুর পদ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল পদের কর্ত্তা শ্রীমৎ লোচনদাস ঠাকুর বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ফলতঃ কবিবর লোচনদাস ব্যতীত আর কেহ এরূপ পদের রচয়িতা বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এমন মধুর পদ-রচনায় আর যে কেহ এরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাদাসিদে গ্রাম্য ভাষায় এমন মধুর কোমল প্রাণস্পর্শী পদ রচনা সবিশেষ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন কবি ভিন্ন অপরের নিকট আশা করা যায় না।

এই কবিতাগুলি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা অতি স্থূল কথা। কিন্তু উহার অন্তরঙ্গ কথাই সবিশেষ আলোচ্য। নদীয়া-নাগরী-পদ কোন ইতর নায়ক সম্বন্ধে রচিত হয় নাই। এই সকল পদের যিনি বিষয়—তিনি নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত—শচী-জগন্নাথ-নন্দন। পিতামাতার অতি আদরের ছেলে হইলেও বাল্যকাল হইতে কঠোর অধ্যয়নশীল। যে সময় ইঁহার আবির্ভাব হয়, সে সময় লেখাপড়া না শিখিলে ব্রাহ্মণ সমাজে অতীব হেয় ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে হইত। ছেলেটী সোহাগে যত্নে লালিত পালিত হইলেও বিলাস জানিতেন না। যজ্ঞোপবীতের পর হইতেই ইঁহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত শাস্ত্রবিচারে যথেষ্ট চাপল্যের নিদর্শন ও প্রমাণের অভাব না থাকিলেও বালিকাদিগের সহিত ইঁহার বাক্‌চাপল্যের বা প্রীতিসূচক আলাপ সম্ভাষণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। শারীরিক সৌন্দর্য্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোন নর-বালকেই কেহ কখন দেখিতে পান না। কবিকুল-বর্ণিত কুসুমায়ুধ কন্দর্পের রূপও ইঁহার রূপের নিকট বিলজ্জিত। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-গুণ-গ্রহণে স্বভাবতঃ নিপুণা নদীয়া-কিশোরীগণ যে এই ভুবনভুলান সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন এবং স্নানের বেলায় গঙ্গাঘাটে যাইয়া ইঁহার রূপ দেখিয়া দুর্ন্নিবার মন্মথ-মনোমথন প্রভাবে বিভাবিত হইয়া ইঁহার রূপের কথা বলাবলি করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় অথবা অস্বাভাবিকতাই বা কি আছে। স্বাভাবিক ভাবের বর্ণনাই প্রকৃত কবির কাব্যকুশলতা—অপরের ভাব নিজহৃদয়ে টানিয়া আনিয়া সেই ভাবকে আশোষণ (Absorption) সমীকরণ (Assimilation) ও ভাষার সাহায্যে সেই ভাবের প্রকাশ (Expression)—ইহা

প্রকৃত কবির ভগবৎপ্রদত্ত কবিত্ব-শক্তি। ইহা বাস্তবিকই সুদুর্লভ। সাহিত্য দর্পণকার বলেন :—

"নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥"

অর্থাৎ ইহজগতে নরত্ব অতি দুর্ল্লভ, মনুষ্যকুলে জন্মলাভ করিলেও বিদ্যালাভ সুদুর্ল্লভ। কিন্তু বিদ্যালাভ করিলেও কবিত্ব সকলের পক্ষে ঘটে না। আবার যদিও কেহ কেহ কবি হন, কিন্তু শক্তিশালী কবিত্ব অতীব সুদুর্ল্লভ।

কবিবর লোচনদাস প্রকৃতই সুদুর্ল্লভ কবিত্বশক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নদীয়া-নাগরীদের হৃদগতভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের স্বভাব-সুলভ সরল, সরস, সহজ ও সজীব ভাষায় যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে সে সকল পদ চিরদিনই বঙ্গভাষার গৌরব উদ্ঘোষণা করিবে। কিশোরীগণের উচ্ছাসপূর্ণ নবানুরাগের প্রথম উচ্ছাসময়, আশা, উৎসাহ ও ব্যাকুলতাময় ভাবরাশি এমন সরস সজীব সরল ভাষায় প্রকাশ করা স্বভাবসিদ্ধ কবিত্ব শক্তিরই পরিচয়।

অপর কথা এই যে লোচনদাস শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে সাক্ষাৎ স্বয়ংভগবান বলিয়াই জানিতেন। তিনি যে মহাপ্রেমরসময় বিগ্রহ, তাহাও তাঁহার জানা ছিল। অন্যান্য কবি ও লীলা লেখকগণ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের যে লীলা-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, লোচনদাস দেখিলেন সে সকল ঐশ্বর্য্য-ভাব-পূর্ণ; কিন্তু মাধুর্য্যভাবের বর্ণনা না থাকিলে প্রেমিক ভক্তগণের চিত্তবিনোদন হইতেই পারে না। তাঁহার শ্রীগৌরসুন্দর যে—

—"রসময় রসিকশেখর গুণধাম।
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্য সুন্দর সুঠাম॥"—

তাঁহার সে চিদানন্দ-রস সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদনের পাত্র কাহারা? শীতের অন্তে এক বিশ্বপটে যখন নব-বসন্তের উদয় হয়, যখন আম্রের মুকুলে নবকিশলয়ে ঊষার কণকরাগে সুস্নিগ্ধ মলয়সমীরে উহার প্রথম প্রকাশ উদ্ঘোষিত হয়, তখন কলকণ্ঠ কোকিলকুলসহ কাননের বিহগগণ ভিন্ন কে সেই নব বসন্তের সুধাস্বাদ গ্রহণ করে? কুসুমকোমলা ভাবব্যাকুলা ভগবৎরসের নিগূঢ় সম্পুট-রূপিণী নদীয়া-বালাদলই আমার রসিকশেখর শ্রীগৌর-সুন্দরের রূপলাবণ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সুধার আস্বাদন সর্ব্ব-প্রথমে পাইয়াছিলেন এবং কবি লোচনদাসের ঋষি-হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথমে চন্দ্রলেখার ন্যায় সেই ভাবের উন্মেষও উদয় হইয়াছিল। যাঁহারা এই পুণ্যপবিত্রতামাখা প্রেমরসের বৃন্দাবনীয় ঝঙ্কার শুনিয়া নাসিকা সঙ্কোচন করিয়া শুচিম্মন্যতা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান, তাহাদের হৃদয়টা নরক-কল্মষের জঘন্য বায়স-রঙ্গস্থলী কি না, তাঁহারা নিজেরাই তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। এমন দেবদুর্ল্লভ ভাব-রসে অপবাদ আরোপ করা কেবলই স্বীয় কুরুচির অবাধ আত্মপ্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর অখিলরসামৃত মূর্ত্তি।

"আনন্দলীলাময় বিগ্রহায়।
হেমাভ দিব্যচ্ছবিসুন্দরায়॥
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়।
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

এই নমস্কারসূচক পদ্যটী যতীন্দ্রশিরোমণি পরম মহানুভাব শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত হইতে উদ্ধৃত। ইনি সাংখ্য-পাতঞ্জল-পূর্ব্ব-মীমাংসা-উত্তর-মীমাংসা-ন্যায়-বৈশেষিক-আগম-নিগম-পুরাণ-ইতিহাস-পঞ্চরাত্র-অলঙ্কার-কাব্য-নাটকাদি নিখিল রহস্য সিদ্ধান্তের পারদর্শী ছিলেন। ইনি অসংখ্য সন্ন্যাসীর আচার্য্য। হ্লাদিনী শক্তির সারভূত মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি-গ্রাহী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টিপাতে ইঁহার হৃদয়ে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্ফুরিত হইয়াছিল।

উদ্ধৃত পদ্যটিতে জানা যায় শ্রীগৌরাঙ্গ আনন্দলীলাময় বিগ্রহস্বরূপ এবং তিনি মহা প্রেমরসপ্রদ। বেদবেদান্ত পরম তত্ত্বের স্বরূপ-নির্ণয়ের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে—"সত্য জ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম" "আনন্দমমৃত রূপং যদ্ বিভাতি" "আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং", ইত্যাকার বহুল শ্রুতিতে জানা যায় তিনি আনন্দ-অমৃত স্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে "রসোবৈসঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি।" সুতরাং তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার নিষ্কর্ষ এই যে—তিনি প্রেমানন্দরসস্বরূপ।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামি মহোদয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে লিখিলেন—"অখিল রসামৃত মূর্ত্তিঃ" "শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি সুবলিত" শ্রীকৃষ্ণ যে "রসরাজ মহাভাব-

স্বরূপাখিলরসামৃতমূর্ত্তি—ইহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুগত ভক্ত মাত্রেরই পরমাদর সম্মত সুসিদ্ধান্ত। তাঁহার লীলায় যাঁহারা মায়াবাদিসিদ্ধান্তসম্মত শুষ্ক সন্ন্যাসের ভাব আরোপ করেন, তাঁহারা তাঁহার ভগবত্তত্ত্বে বিশ্বাসী নহেন। তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কপট বেশ মাত্র। আদি পুরুষের অবতারগণের মধ্যে আমরা কচ্ছপ অবতারের কথা শুনিতে পাই। সেই জন্য ভগবান্ প্রকৃত কচ্ছপ নহেন। শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকে—"কপট সন্ন্যাস" বলিয়া দুন্দুভি-রবে ঘোষণা করিয়াছেন,—

"প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ।
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটী-প্রহসনং॥
বমন্তং মাধুর্য্যৈ-রমৃতনিধিকোটীরিব তনু-
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটং॥"—

কেবল বৈরাগ্য ভগবত্তার এক অংশ মাত্র। বৈরাগ্য যেমন ভগবত্তার এক উপাদান, শ্রী বা সৌন্দর্য্যও তেমনই ভগবত্তার এক উপাদান। শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে যেমন স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্তকোটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আকৃষ্ট হয়, তাঁহার এই আবির্ভাবেই বা তাহা না হইবে কেন? সেই পরমতত্ত্বের শ্রীগৌররূপ আবির্ভাবেই বা নরনারীগণ আকৃষ্ট না হইবেন কেন?

শ্রীশ্রীরাস বর্ণনায় মহামুনি ব্যাসদেব গোপীদিগের কথা লিখিয়াছেন :—

—"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত বেণু-গীত।
সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাং॥
ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং।
যদ্গোদ্বিজদ্রুম মৃগা পুলকান্যবিভ্রন্॥"—

তাঁহার এই জগদাকর্ষিরূপ জগতে প্রকটন করা তাঁহার মহাকারুণ্যের পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনায় ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুকার স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন নারীমনোহারিত্ব তাঁহার একটী প্রধান গুণ। শ্রীকৃষ্ণ নারীমনোহারী গুণে যদি সমাদৃত ও সম্পূজিত হন, শ্রীগৌরাঙ্গে সেই গুণ স্বীকার করিলে এবং তদ্ভাববিভাবিত হইয়া তাঁহার ভজন করিলে শাস্ত্রযুক্তির ও ব্যবহারের কোন মর্য্যাদা নষ্ট হয় বলিয়া ধারণা করা অসম্ভব। ভাব ভেদে,—ধ্যান ভেদে অতীব স্বাভাবিক।

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসী—মনুষ্য নহেন। তিনি সর্ব্ববিধ নরনারীগণের পরমোপাস্য রসতত্ত্ব—তিনি সচ্চিদানন্দ-রসঘন-মূর্ত্তি। রসিক ভাবুক সাধক ও সিদ্ধগণ যেমন তাঁহার উপাসক—রসিকা ভাবুকা সাধিকা ও সিদ্ধা রমণীগণও তাঁহার তেমনিই উপাসিকা। সে রূপ উপাসনা সর্ব্বাংশেই সাধুসজ্জনসম্মতা এবং যতীন্দ্র-রাজ-চূড়ামণিগণেরও ভজননিষ্ঠ চিত্তের লালসা বর্দ্ধন করে। একদেশদর্শী অজ্ঞাততত্ত্বার্থ অনভিজ্ঞ লোকদের পক্ষে প্রগাঢ় সূক্ষ্মভাবপূর্ণ ভগবদুপাসনার সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করা, কেবল যে অশান্ত চপল চটুল বুদ্ধির বিড়ম্বনা তাহা নহে—অপরাধজনকও বটে। জগৎ অনন্ত ও বিশাল। বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীও অনন্ত, শ্রীভগবানের লীলাও অনন্ত, উপাসনার প্রকারভেদও অনন্ত—অথচ এই অনন্ত তত্ত্বের সকলই নিত্য সত্য। আপাত প্রতীয়মান বিরোধসঙ্কুল ভাব সমূহ (apparently Conflicting ideas) পরিণামে সকলই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া জ্ঞানী ভক্তগণের নিকট সমাদৃত ও সম্পূজ্য হইয়া থাকে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ভগবৎসন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি নিখিল বিরুদ্ধশক্তির সমাশ্রয়। তাঁহাতে এক দিকে যেমন কঠোর বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা, অপর দিকে আবার তেমনি লীলাবিলাস রসসম্ভোগ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার যে সকল গুণ তদীয় ভজনীয় গুণ বলিয়া ভূষণস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে, শ্রীশ্রীগৌরলীলায় তাঁহার কোন কোন গুণ কেনই বা দূষণ হইবে?

শ্রীমদ্ভগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"।

যে আমায় যেরূপভাবে ভজন করিবে, আমিও তাহাদের নিকট তৎ তৎরূপ-ভজনীয় ভাবে আত্মপ্রকটন করিয়া তাহাদের অভীপ্সিত ভজনের সহায় হইব। যাঁহারা তাঁহাকে কান্তভাবে ভজন করিয়া আনন্দলাভ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদের সম্মুখে শ্রীভগবানের "কাট খোট্টা" সন্ন্যাসীর ভাব প্রদর্শন একেবারেই অস্বাভাবিক ও অসাধুসম্মত। গো-গোপ-সংখ্যাবৃত মধুময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীনরসিংহদেবের উদয় হইলে এক ভীষণ বিভীষিকা উৎপাদিত হইয়া নিদারুণ উৎপাতের সৃষ্টি হইবে। সেখানে শ্রীশ্রীমদনগোপাল বিগ্রহই শোভনীয়। সেই রূপ শ্রীশ্রীগৌরলীলাতেও মধুর

ভাবের উপাসকগণের সমক্ষে সন্ন্যাসবেশ এক "শুক্লষষ্ঠী" একেবারেই খাপ ছাড়া ও হৃদ্‌বিদারক ক্লেশজনক দৃশ্য। একই সময়ে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দর্শকগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিয়াছিলেন। কংসরঙ্গালয়ে কংসারি বিগ্রহের কথা স্মরণ—

—"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ॥
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড় বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং।
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

অগ্রজ-সহ শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন মল্লগণ তাঁহাকে বজ্রসার পুরুষ—নৃপতি-গণ নৃপতি কুলশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ কন্দর্প, গোপগণ স্বজন, দুষ্ট-রাজগণ শাস্তা, বসুদেব দেবকী নিজেদের শিশু, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যু, অতত্ত্বজ্ঞগণ বিরাট পুরুষ, যোগীগণ পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণ আপনাদের কুলদেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

এরূপ ভাবের পদ্য সংস্কৃত ভাষায় আরও আছে—যথা :—

—"মল্লৈঃ শৈলেন্দ্রকল্পশিশু বিতরজনৈ পুষ্পচাপোঽঙ্গণাভি-
গোপৈস্তু প্রাকৃতাত্মা দিবি কুলিশভৃতা বিশ্বকায়োঽপ্রমেয়ঃ॥
ক্রুদ্ধ কংসেন কালো ভয়চকিত দৃশা যোগিভির্ধ্যেয়মূর্ত্তি।
দৃষ্টো রঙ্গাবতারো হরিরমরগণানন্দকৃৎ পাতু বিশ্বান্॥"—

লোকে কথায় বলে "কৃষ্ণ কেমন?" তদুত্তরে বলা হয় "যার মনে যেমন"। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন পূর্ণতম তত্ত্ব তখন তাঁহার সম্বন্ধেই বা নাগরীভাবের ভজন অশ্রদ্ধেয় হইবে কেন? নাগরীভাবের ভজনের নামান্তর—গোপী-ভাবের ভজন। শ্রীভাগবতের ভাষায় শ্রীরাসনায়িকা-গণের ভজন। সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি বলিয়া শ্রীরাসলীলা যখন পরমহংসকুলবর্য্যগণের গ্রাহ্য ও শিক্ষাপ্রদা, তখন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের মধুর রসময় ভজনই বা অপবাদার্হ হইবে কেন?

শ্রীভগবানের চরিত্ররক্ষা।

(শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,)

ভগবানের পরীক্ষা।

'ভগবানের চরিত্র রক্ষা'—ইহাই হইল একালের সমস্যা। নরনারীর চরিত্ররক্ষার বড় প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। কারণ, তাহাতে স্বাভাবিক মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয় না, মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না, নীতির জয়জয়কার হয়, মানুষটা মরিয়া যায় ইত্যাদি। পুরুষের একপত্নী নিষ্ঠা ত নাইই, থাকিলেও সেটা কাপুরুষতা; নারীর সতীত্ব একটা কুসংস্কার মাত্র, নরনারীর অবাধ প্রেমমিলনে, চরিত্রহীনতায় একটা গৌরব আছে, ইহাই একালের মত। কিন্তু "চরিত্ররক্ষা" নীতিটা ভারতবাসী হিন্দুর মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এ নীতি একেবারে ছাড়িবার উপায় নাই। তাই এখন এই নীতির প্রকোপ প্রত্যক্ষ হস্তপদ-বিশিষ্ট চোখ-কান-ফোটা মানুষগুলাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া নিরীহ নির্ব্বাক্ বাহ্যতঃ প্রতিকারাসমর্থ ভগবান বেচারীর উপর সবেগে পতিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ এই চোট পড়িয়াছিল—ব্রজের 'চরিত্রহীন' 'গোপবধূটী দুকূলচৌর' গোপবালকটীর উপর। বঙ্কিমবাবু প্রমুখ মহামান্য লেখকগণ যথেষ্ট লেখনী চালন করিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন ছাড়াইয়া কুরুক্ষেত্রে ও দ্বারকায় আনিয়া ফেলিয়া, মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে আদর্শ মানবরূপে খাড়া করিয়া, কথাটা চাপা দিয়া ফেলিয়া, কোনরূপে তাঁহার চরিত্ররক্ষা করিয়া দেশের ও তথা ধর্ম্মের মুখরক্ষা করিয়া-ছিলেন। তারপর কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার সেই গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সেই ননীচোরা বসন-চোরা গোপীদের মনোচোরার কথাই আবার ঘরে ঘরে লোকে আদর করিয়া বরণ করিয়া লইল। কথায়-বার্ত্তায়, আমোদে-উৎসবে, শ্রাদ্ধের কীর্ত্তনে, ভিক্ষুকের গানে সর্ব্বত্রই ইহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও ব্যাপার দেখিয়া তাড়াতাড়ি পাঁজি পুঁথি বিচার করিয়া, তাঁহাকে মানাইয়া গুছাইয়া 'নারায়ণ' বলিয়া মানিয়া লইয়া পূজার ঘরে স্থান দিয়া ফেলিলেন। নারায়ণের 'রাস', 'দোল' করিয়া কোন রকমে আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও হইল না। ঐ যে শ্রীচৈতন্যদেব কি হরিনাম

শুনাইয়া গেলেন, সেই হরিনামে ও কৃষ্ণনামে এত সাধু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লোককে সেই অসাধু কালাচাঁদ ও তাঁর অসাধ্বী প্রেয়সীগণের পক্ষপাতী করিয়া তুলিল। যাহাই হউক শ্রীকৃষ্ণ এখন সমাজে চলিয়া গিয়াছেন, সমাজভুক্ত নরনারীর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাও হইতেছে। যেমন করিয়া, যে কারণেই হউক এখন অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীভগবান ও উপাস্য বলিয়া মানিতেছেন ও তাঁহার প্রেয়সী-সংবাদসম্বলিত পদাবলীরও ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহলে শ্রদ্ধাভরে শ্রবণকীর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ একেবারে অচল। যদি তাঁহাকে চালাইতেই হয়, ভক্তরূপে বা সৎসন্ন্যাসীরূপে চালাইতে পার, কারণ এরূপ বৈরাগ্য ও ভক্তি বাস্তবিকই জগৎ কখনও দেখে নাই। কিন্তু তাঁহাকেও ভগবান্ বলিয়া যে ঐ ব্রজের নষ্টামিব্যাপার ভজন বলিয়া চালাইবে, এ অনাচার অত্যাচার কুলাচার বহির্ভূত ভাবের প্রচার করিতে দিতে তাঁহারা একেবারে নারাজ। ইহাকে অশ্লীলতা বলিতেই হইবে; এবং সকল বিদ্যাবিশারদ সর্ব্ববিধ জ্ঞানের আস্পদ যথার্থ স্বধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মাবতার ম্লেচ্ছরাজার ধর্ম্মাধিকরণে ইহার যথাশাস্ত্র যথোচিত বিচার-বিভ্রাট ঘটাইয়া ধর্ম্মধ্বজী সমাজদ্রোহীবর্গকে শিক্ষা দেবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই অনর্থ দূরীকরণ মানসে কটিবদ্ধ হইয়া তাঁহারা আসরে নামিয়া পড়িলেন। আধুনিক সংস্কৃত-শার্দ্দুল-ভয়ভীত সদ্যোবিশ্ববিদ্যালয়বিমুক্ত খাঁটী স্বদেশীভাষার একনিষ্ঠ সেবক তরুণ সংবাদপত্রসম্পাদক-শাবকমণ্ডলীর দ্বারা অনেক প্রবন্ধও লেখাইয়া ফেলিলেন। 'নীতি বাগীশের জয় হউক' 'তাঁহাদের সাধুপ্রচেষ্টা ফলবতী হউক' বলিয়া সংবাদ পত্রাদিতে অনেক ঢাক বাজিল, অনেক শিঙাও ফুঁকিল,—কিন্তু ভজন বন্ধ হইল কি? ভগবানের চরিত্ররক্ষা হইল কি? তাহার সঠিক সংবাদ রাখা হইয়াছে ত?

হায় একালের মানব! হায়রে তোমার নীতিজ্ঞান! হায়রে তোমার বুদ্ধি! তোমরা ভগবানকে কিরূপ বুঝিয়াছ? এই "নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য" গীতায় এই বাণীর প্রমাণ তোমাদের আচরণে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বলি, যিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' তাঁহাতে আবার সামাজিক পাপ-পুণ্যের বিচার চলে কি? যাঁহাকে স্মরণ করিলে বাহ্য অভ্যন্তর শুচি হইয়া যায় তাঁহাতে অশুচি সম্ভাবনা করিয়া নরকের দ্বার প্রশস্ত করিতে চাও নাকি? ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ আদি দেবগণ তাঁহার স্তুতি করেন, ষড়ঙ্গবেদ উপনিষদে যাঁহার মহিমা গীত হয়; শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ ধ্যান-যোগে সমাধিস্থ হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন, সুরাসুরে যাঁহার অন্ত পায় না—সেই অনন্তদেবের কার্য্যাবলীর বিচার তুমি করিবে নাকি? ব্রহ্মনির্ব্বাণ যাঁর অঙ্গজ্যোতি, অন্তর্য্যামী পরমাত্মা যাঁর অংশবিভূতি, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান যিনি স্বয়ং, সেই পরম পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবকে কি তোমার নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে নাকি? তুমি পরীক্ষায় পাশ করিলে তবেই তাঁহার ভজন চলিবে, নইলে উঠিয়া যাইবে এ দুরাশাও তুমি পোষণ কর নাকি? তোমার ব্যবহারিক কৌশল-জালে শ্রীভগবানকে হারি মানিতে হইবে—এমন সম্ভাবনাও তোমার মনে স্থান পায় নাকি? পাইতেও পারে। কারণ শুনা যায়—খ্রীষ্টধর্ম্মের 'সয়তান' নাকি এমন চেষ্টা করিয়াছিল, করিতেছে ও করিবে। আমাদের ধর্ম্মে কলির প্রভাবও এইরূপ। এ কলিকাল, তাহাই বা না চলিবে কেন! তবে সয়তানের এ চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই, অধন্য কলিও শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে ধন্য হইয়া গিয়াছে। অতএব সাবধান! নিজের বুদ্ধির উপর অত্যধিক শ্রদ্ধাস্থাপন করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিও না। তোমার বুদ্ধি ভগবান্ বলিয়া না মানিতে পারিলেই ভগবানের ভগবত্তার লোপ হইবে না, নিজেরই সমূহ ক্ষতি হইবে, ইহা বিস্মৃত হইও না। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীগীতায় যে 'রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ' বলিয়াছেন সেই আসুরী-প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া, শ্রীভগবানকে নরাকারে আসিতে দেখিয়া সাধারণ মানবরূপে ধরিয়া লইয়া বিচার করিতে বসিলে, শ্রীকৃষ্ণ তোমার 'মূঢ়' আখ্যায় ভূষিত করিয়া দিবেন, এবং 'মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ'—এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়া তদনুরূপ প্রতিবিধান করিবেন, ইহা ভুলিয়া, বা অভিমানভরে তপ্তরক্ত-জনিত-বিকারে জ্ঞানহারা হইয়া না মানিয়া ইহলোক পরলোক খোয়াইও না। এ কৃপার যুগে বেশী বাড়াবাড়ি করিও না। আর হিতকামী বন্ধুবর্গের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, একান্তই যদি বাড়াবাড়ী কর, তাহা হইলে ভাগীরথীর স্রোতে ঐরাবতের মত তুমিই ভাসিয়া যাইবে, আর বাধা পাইয়া স্রোতের বেগও বর্দ্ধিত হইয়া দুকূল ভাসাইয়া চলিতে থাকিবে। কালের স্রোত, কৃপার

গতি শ্রীভগবানের ইচ্ছায় প্রতিরোধ করিতে কেহই পারিবে না, ইহা স্বচ্ছন্দগতিতে অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকিবে। কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গই স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ কৃপাগুণে তোমাদের দুর্মতি দূর করিয়া, সুবুদ্ধি প্রদান করুন ইহাই আমদের প্রার্থনা।

২। মাতা ও শিশুকন্যা।

মাতার কোলে শিশুকন্যা। শিশু শুধাইল, "মা, তোর বর কে মা"! মা শুধু হাসে কথা কয় না। শিশু ছাড়ে না, আব্দার ধরিয়াছে বলিতে হইবে। "মা, বল তোর বর কে? বল, বলিতেই হইবে, নইলে ছাড়িব না"। শিশু কাঁদিতে লাগিল। তখন মাতা চুপি চুপি বলিলেন, "তোর বাবাই আমার বর।" "ধ্যেৎ তাই বুঝি হয়? বাবা নাকি আবার বর হয়?" শিশু বিশ্বাস করে না, আবার জিজ্ঞাসা করে। মাতা হাসে, শিশু কাঁদে। এই পর্ব্ব চলিল, মীমাংসা হইল না। বাবা যে মাতার 'বর' হইতে পারেন, সে কথা শিশুকে কে বুঝাইবে? ভক্তকুল-তিলক, ষড়ৈশ্বর্য্যের অন্যতম বৈরাগ্যবৈভবের পরমাশ্চর্য্য আদর্শ, সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য যে আবার "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ—" পরমসুন্দর নবনটবর নদীয়ানাগর হইতে পারেন—তাহা যে জানে না তাহাকে কে বুঝাইবে?

আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে লইয়া হইয়াছে তাই। প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু, এই ভাব লইয়া যাঁহারা আছেন, তাঁহারা খুব ভালই করিয়াছেন, সত্য লইয়াই তাঁহারা আছেন, তাহাদের নিকট তাঁহাদের ভাব খাঁটি সত্য, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি হইতে পারে না, ইহাতে সকলেরই আনন্দ। কিন্তু তাই বলিয়া আর কোনও ভাব ইহাতে হইতে পারে না, এ কথা বলার দুঃসাহস হওয়া উচিত নয়। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে, ইহাতে অপরাধের সম্ভাবনা আছে। ভজন-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনমাত্রেরই এবিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হইতেছে না। এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা, অনেক গবেষণা, তুমুল আন্দোলন, নিদারুণ শাস্ত্র-শস্ত্রচালনা চলিতেছে। ফলেও শিশু কন্যার মাতার পতিনিরূপণ-চেষ্টার ন্যায় মীমাংসার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইতেছে।

(৩) উভয় দলের মতামত।

একদল বলিতেছেন, তাঁহাদের প্রভু সাধুর সাধু, ভক্ত-ভূপ ভক্তচূড়ামণি, করুণায় গলিয়া জীবকে নামচিন্তামণি পরাইবার জন্য নবীন সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন, জীবের মস্তকে গোপীভাব রাধাভাবের মুকুটমণি পরাইবার জন্য আপনি রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া গম্ভীরায় প্রবেশ করিয়াছেন। আর একদল বলিতেছেন, ওভাব তাঁর স্বরূপের ভাব নয়, ও এ যুগের অবতারের কার্য্য,—অবতারীর নয়,—দ্বাপরে যেমন অবতারের লীলা ব্রজেই হইয়াছিল,—মথুরায় বা দ্বারকায় নয়, এ যুগেও সেইরূপ স্বরূপের লীলা নবদ্বীপে, নীলাচলে নয়, সে যুগেও যেমন 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি, এ যুগেও অনন্তসংহিতাতেই আছে "নবদ্বীপং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(৪) শাস্ত্রের প্রমাণ।

এক্ষণে প্রশ্ন এই:—তবে কথাটি কি? মীমাংসা কি? তাহাই ত আলোচ্য। আলোচ্য ত বটে, কিন্তু প্রমাণটা হইবে কিসের বলে তাহাও ত প্রণিধান করিতে হইবে।

যদি বল, শাস্ত্রের প্রমাণে। আমরা বলি 'বাঢ়ং'। তাই দেখা হউক। শ্রীচৈতন্য যে স্বয়ংভগবান্ এ বিষয়ে অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণ বাহির হইয়াছে, সে বিষয়ে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতি-সম্বলিত হইয়া আসিয়াছেন সে বিষয়ে ভক্তগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্" কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের এই বাণী সকলেই মানিয়া থাকেন। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই" এই পদ প্রায় সকলেই গাহিয়া থাকেন। তবে সংশয় কোথায়? ইহারা বলেন যে, প্রভেদ হইয়াছে লীলায়। বৃন্দাবনের গোপীদের সহিত রাসলীলাদি ব্যাপারের মত ব্যাপার এ লীলায় নাই। যদি থাকে,—ভাবে; প্রকটে দেহাদির মিলন সম্ভোগাদি ব্যাপার নবদ্বীপে হয় নাই। প্রমাণ? উল্লেখ নাই, অতএব বুঝিতে হইবে—হয় নাই। 'নরহরি বাসু'ঘোষ ইত্যাদির পদাবলীতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু ঘটনার বর্ণনা নাই।

আচ্ছা, শ্রীবৃন্দাবনের রাসলীলাদি ব্যাপার আমরা কিরূপে জানিতে পারিলাম তাহা একটু আলোচনা করা যাউক। শ্রীবৃন্দাবনের লীলা-ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছেন ব্যাসদেব,

শুকদেবের মুখে সেই লীলা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় নহে, ইতিহাসের বিবরণের আকারেই প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার এ সম্বন্ধে কোনও উক্তি নাই, এ লীলার প্রত্যক্ষদর্শী গোপীবৃন্দেরও রচনা নাই। ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া শুকমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, কবে কতকাল পরে তাহাও সঠিক বলিবার উপায় নাই।

এ যুগের লীলাও এইরূপে ব্যক্ত হইতে পারে—পরে, কারণ—"বিস্তারিয়া বর্ণিবেন আসি বেদব্যাস"।

এই কথার বারম্বার পুনরুক্তি করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার—ভবিষ্য ব্যাসদেবের নিশ্চিত আবির্ভাবের কথা জানাইয়া দিয়াছেন। আসিতে পারেন পরে এ যুগের শুকদেব, যিনি এই লীলা—স্বমুখে ব্যক্ত করিবেন। এইরূপ যে হইবে না—বা হইতে পারে না—এরূপ মনে করায় বাহাদুরী থাকিতে পারে, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। অতএব এ যুগের এ লীলায় পারম্পরিক বর্ণনা—এক্ষণে পাইতেছি না বলিয়াই—ইহা হইতে পারে না বলাটা —সমীচীন হইবে না।

(৫) শাস্ত্র ও অনুভব।

আসল কথাটা এই, যে—শাস্ত্রবাক্য শিরে ধরিয়া আমাদের সাধনার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

গীতা বলিতেছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥" ইত্যাদি,

কিন্তু ভজনের ঘরে প্রবেশ করিলে সেথায় শাস্ত্রবিচারে বিশেষ সাহায্য হইবে না—এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতেই পাওয়া যায়।

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ" ইত্যাদি

সে—বচনটি কি?

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"
"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

ইহাই গীতার শেষ কথা। ইহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের পরাভক্তি বা ভাগবত ধর্ম্মের কথা। রাধা-ভাবের ইঙ্গিতে ভাগবতের শেষ কথা। তাহার পর শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। গীতার ধর্ম্মের শেষেই শাস্ত্রের গণ্ডী ছাড়াইয়া অনুভবের "শুদ্ধ ধর্ম্মে" আসিতে হইল। তবে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মের প্রমাণ —যে ধর্ম্মের সম্বন্ধে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয় বলিতেছেন—"যদ্বেদ নো বা শুকঃ" স্বয়ং শুকদেবেরও যে ধর্ম্মে প্রবেশ নাই,—শ্রীগৌরাঙ্গের সেই উজ্জ্বল ভক্তিমার্গের ধর্ম্মের প্রমাণ বিশেষ ভাবে কিসের উপর নির্ভর করিবে—তাহা প্রণিধানযোগ্য। আর এক কথা—এই যে, বাস্তবিক বিনা অনুভবে শাস্ত্র বিচারে মীমাংসা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পরিকরবর্গের অনুভূতির সাহায্য পাওয়ার পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনের ভজন শ্রীমৎ ভাগবত পাঠ করিয়াও—এমন করিয়া কেহ বুঝেন নাই। কেন বুঝিতে পারেন নাই? ইহার কারণ কি? এক বেদান্ত শাস্ত্রেরই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য মহোদয়গণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন, অথচ সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ করিয়াছেন কিসের বলে তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন? কিসের প্রভাবেই বা তাঁহাদের সেই সেই মত এতদিন জগতের লোকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে—তাহাও বিবেচ্য। তাহার কারণ এই যে, আচার্য্যগণ—সকলেই অনুভবী পুরুষ,—তাঁহারা সনাতন সত্য বস্তুকে প্রত্যেকেই এক এক ভাবে অনুভব করিয়া স্বমত ব্যক্ত করিয়াছেন, আর সেই জন্যই আজও তাঁহাদের মত লোক আদর করিয়া গ্রহণ করিতেছে।

(৬) কর্ত্তব্য কি?

আজ প্রয়োজন হইয়াছে—এই বিদ্বৎ অনুভবের। অন্যথা,—পাঁজি পুঁথি নাড়াচাড়া করিয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া কোন লাভ হইতেছে না,—অযথা শক্তিক্ষয় হইতেছে—এবং অপরাধের বৃদ্ধি হইতেছে, ও তাহার ফলে সম্প্রদায়ে শক্তির হ্রাস হইতেছে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া তাঁহার প্রচার-কার্য্যে বাধা দিয়া কলির প্রসারের সাহায্য করা হইতেছে।

এ যুগেরও শ্রী শ্রীসিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয় প্রমুখ সিদ্ধ মহাত্মাগণও এই গৌর-নাগরী ভাবের তত্ত্ব

অনুভবে পাইয়াছেন, আরও অনেকে যে না পাইতেছেন এমন নহে, তবে অনর্থক বিতণ্ডা কেন? শক্তি থাকে, যাঁহার ভাব তাঁহার নিকটেই অর্জ্জুনের মত "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া শরণাগত হইয়া তাঁহারই নিকট তাঁহারই কৃপায় ইহার তত্ত্ব জানিয়া লইয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। আর ততদুর যদি শক্তিতে না কুলায়, তাহা হইলে "যাহার যৈছে ভাব সেই সে উত্তম" বুঝিয়া, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে—" ইত্যাদি যাঁহার উক্তি তিনি, যিনি যে ভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন তাঁহাকে সেই ভাবেই কৃপা করেন, ইহাই নিশ্চয় করিয়া, নিজ নিজ ভাবানুরূপ ভজন করিয়া কৃতার্থতার পথে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য, ইহাতে সন্দেহ কি?

(৭) শেষ কথা।

উপসংহারে এইমাত্র আমাদের বক্তব্য ও বিনীত নিবেদন যে, কয়েকটী কথা আমাদের সকলেরই বিবেচনা করিয়া চলা উচিত। নারদঋষি যাঁহাকে "কিম্" শব্দ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি বলিতে নাই। তাহা হইলে উপনিষদ বলিবেন "কিছুই বোঝ নাই" ('অবিজ্ঞাতং বিজানতাং' ইত্যাদি) এ আশঙ্কা আছে। তিনি অখিল রসবিগ্রহ, ('রসো বৈ সঃ') তাঁহার 'ইতি' করিতে নাই, 'ইতি' করিতে যাইলে অপরাধে পড়িতে হইবে, এরূপ যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। শাস্ত্র প্রমাণে যিনি "রসরাজ-মহাভাব" তাঁহার রসরাজত্বের বিলোপ সাধন করিতে যাইলে, অঙ্গহানি করা হয় ইহ স্মরণ রাখা উচিত। আশা করি, এ কৃপার যুগে বিশ্বমানব-মহামিলনের বালার্ক-কিরণোদয়ের প্রাক্কালে, এই কয়টী কথা মনে রাখিয়া আমরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না করিয়া নিজ নিজ ভাবে সাধন ভজনে মনোনিবেশ করিয়া নিজ নিজ ভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে সচেষ্ট হইয়া, লাভ, পূজা, মান, প্রতিষ্ঠা, কাক-বিষ্ঠার ন্যায় দূরে পরিহার করিয়া, সকলে হাতাহাতি গলাগলি কোলাকুলি করিয়া, একমনে এক প্রাণে "জয় শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামপ্রেম বন্যায় ভাসিয়া গিয়া, আপনারা মাতিয়া সকলকে মাতাইয়া—তাঁহারই সেথায় প্রাণপাত করিয়া ধন্য হইব।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

(২)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও পদাবলীর প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আর যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল।

(১) গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের প্রত্যঙ্গ-বর্ণনা-স্তোত্রে তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে "শ্রীনাগর-শিরোমণি" বলিয়া স্তব করিয়াছেন, যথা—

—"সর্ব্ব ভাগবতাহৃত কান্তাভাবপ্রকাশকং।
নটরাজশিরোরত্নং শ্রীনাগর-শিরোমণিং॥"—

(২) ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন—আদিখণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মলীলা বর্ণনায়—

—"গৌর নাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড।
প্রতি অঙ্গ রসরাশি অমৃত অখণ্ড॥
দেখিতে দেখিতে সভার জুড়াইল নয়ান।
সভার মনে হৈল এই নাগরীর প্রাণ॥"—

—"জন্ম মাত্র বালক হৈল যেই দেখা।
কত দিন ছিল পুরুষের যেন সখা॥
প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি।
নিরখিতে হৃদয়ে নয়নে যেন বাসি।
বালক দেখিবা গিয়া ভরল আনন্দ।
আলসল অঙ্গ সভার শ্লথ নীবি-বন্ধ॥"—

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রথম শুভ বিবাহলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে ঠাকুর লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

—"যূথে যূথে নাগরী চলিলা বিপ্রবধু॥"—
—"নদীয়া নাগরী চলে পাণ সাহিবারে॥"—

ইত্যাদি।

তিনি এই বিবাহ-প্রসঙ্গে পুনরায় লিখিয়াছেন—

—"গৌরাঙ্গের নয়ন সন্ধান শরাঘাতে।
মানিনীর মান-মৃগ পলায় বিপথে॥
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মাতিল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥
ভুরুভঙ্গী আকর্ষণে রঙ্গিনীর গণ।
দোলমান হৃদয় করিছে অনুক্ষণ॥

বক্ষঃস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া।
কেশরী জিনিয়া মাজা অতি সে ক্ষীণিয়া॥
চিত্ত হরি লইল সভার এক কালে।
মান-মীন ধরিয়া রাখিল রূপ-জালে॥"—

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ—এই শ্রীগ্রন্থ বহু মাননা না করেন, এমন বৈষ্ণব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই প্রাচীন গ্রন্থের বহু স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরত্বসূচক বহু পদাবলী আছে এবং পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ঠাকুর লোচনদাস রচিত নদীয়া-নাগরী-ভাবের বহু ধামালি পদাবলীও আছে।

(৩) শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ প্রাচীন মহাজন কবি গোবিন্দ দাসের পদাবলী পূজ্যপাদ শ্রীজীবগোস্বামী পর্য্যন্ত আস্বাদন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রাচীন মহাজন কবি ২৫টী নাগরী-ভাবের পদাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছি—নিম্নে আরও কিছু দিলাম।

(ক) "সুরধুনীতীরে গৌরাঙ্গসুন্দর, সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধূগণ, নিগমন মন, ডুবিল সতীর মতি॥
শুন শুন সই, গোরাচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি, কহিলে খাঁকারি, এ বড় মরমে ব্যথা॥"

(খ) "শচীর কোঙর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল,
অরুণ নয়ন-বাণে॥
সই, মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে, নদীয়া নগরে,
নাগরী না রবে ঘরে॥"

(গ) —"মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কিক্ষণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু।
সাত পাঁচ সখি যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিনী সঙ্গিনী সঙ্গে।
কৈল ঠারাঠারি কি রসরঙ্গে॥
থির বিজুরী করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
অথির নাচনী ভাঙর দোলা।
মোর হিয়া-মাঝে করিছে খেলা॥
চাঁদ ঝল-মলি বদন ছাঁদে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের খোঁটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দ দাস তেঁই সে ঝুরে॥"—

(ঘ) —"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসিয়া তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মুরছা পায়॥
কিবা নাগর, কিক্ষণে দেখিনু, ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বিয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায়॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশিল,না কহি লোকের লাজে
এমন কঠিন নারীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি, হয় পরিণামে,দাস গোবিন্দ কয়॥"

(ঙ) যতিখনে গোরারূপ আইনু হেরি।
মাজল মুকুর আনল তত বেরি॥
সখি হে! সব সেই আনল অনুপ।
ইথে লাগি মুকুর হেরল নিজ মুখ।
তৈখনে হেরইতে ভেল হাস ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরা মুখ-চন্দ॥
সখি হে! সব সোই আনল অনুপ।
ইথে লাগি মুকুর হেরল নিজ মুখ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্ধ।
উয়ল দরপণে গোরা-মুখ-চন্দ।
মঝু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ।
কিয়ে কিয়ে বাড়ল প্রেমতরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর॥
কয়ইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
অবশে আরসী করে খসল আমারি॥

বহুত পরশরস অদরশ কেলি।
গোবিন্দ দাস শুনি মুরছিত ভেলি ॥”—

(৩) —“বিহির কি রীত, পিরীতি আরতি,
গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী,
আনে সে ঝুরিয়া মৈল ॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা বদন হেরিয়া ঘুচাব মনের ব্যথা ॥ ধ্রু ॥
সো গোরা গায়, ঘাম কিরণে, নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
আছুক আনের কাজ, মদন বিনিয়া বিনিয়া কাঁদে ॥
শ্রবণে সোনার মকর কুণ্ডল, রঙ্গিনী পরাণ গিলে।
গোবিন্দ দাস, কহই নাগর, হারাই হারাই তিলে ॥”—

(৪) মহাজন কবি জ্ঞানদাসের পদাবলী সর্ব্ব বৈষ্ণবজন-আদৃত। তাঁহার একটী পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

—“সই, দেখিয়া গৌরাঙ্গ-চাঁদে।
হইনু পাগলি, আকুলি বিকুলি, পড়িনু পিরীতি ফাঁদে ॥
সই, গৌর যদি হৈত পাখি।
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া-পিঞ্জরায় রাখি ॥
সই, গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোঁপার উপরে, দুলিত কাণেতে দুল ॥
সই, গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হৈত অতি ॥
সই, গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া রঞ্জিতাম আঁখি শোভা যে হৈত ভাল ॥
সই, গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়ে, মজিত কুলের বধূ ॥

(৫) প্রাচীন মহাজন কবি রায়শেখরের মধুর পদাবলী ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ বহু মাননা করেন—তিনিও নাগরী-ভাবের বহু পদাবলী রচনা করিয়াছেন,—তাহা একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

—“সখি! গৌরাঙ্গ গড়িল কে?
সুরধুনী তীরে, নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে।
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়া নাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা বা ছিলা।
সোনায় বাঁধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে
ও চাঁদ মুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে ॥
যৌবন-তরঙ্গ, রূপের বাণ পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পঁহু, বৈভব কো কহু, ভুবন ভরল যশে ॥”—

(৬) পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাসও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন কবি। তিনিও নদীয়া-নাগরীভাবের পদাবলী লিখিয়াছেন—তাঁহার একটী পদ উদ্ধৃত হইল।

—“গোরাচাঁদে দেখিয়া কি হৈনু।
গোপত পিরীতি-ফাঁদে মুঞি সে ঠেকিনু ॥
ঘরে গুরুজন জ্বালা সহিতে না পারি।
অবলা করিল বিধি তাহে কুলনারী ॥
গোর রূপ মনে হৈলে হইয়ে পাগলী।
দেখিয়া শাশুড়ী মোর সদা পাড়ে গালি ॥
রহিতে নারিনু ঘরে কি করি উপায়।
যদু কহে ছাড়িলে না ছাড়ে গোরারায় ॥”—

(৭) গৌরাঙ্গপার্ষদ, শ্রীল মুরারি গুপ্ত আদি গৌরাঙ্গ-লীলা-লেখক। তাঁহারও রচিত নাগরীভাবের পদ কয়েকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

—“সখি হে! কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া, দিয়া যেই পদছায়া,
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে ॥ ধ্রু ॥
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ, জিউ করে আনচান্,
স্থির হৈয়া রৈতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম, পিরীতি না করিতাম,
যাচিয়া না দিতু প্রাণ পরে ॥
আমি ঝুরি যার তরে, সে যদি না চায় ফিরে,
এমন পিরীতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে, বজর ক্ষেপিলে তাহে,
যায় ফাটি যায় কিনা বুক ॥
মুরারি গুপুত কয়, পিরীতি সহজ নয়,
বিশেষ গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর,
তবে সে পাইবা শচীর বালা ॥”—

প্রাচীন পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসও নাগর-গৌরাঙ্গ ভজননিষ্ঠ ছিলেন—নিম্নলিখিত তাঁহার পদটী তাহার প্রমাণ যথা,—

—“অপরূপ গোরাচাঁদে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে, তাঁব গু- [illegible] ধ্রু
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা, পুলকে পুরল অঙ্গ।

খেনে গরজয়ে, খেনে যে কাঁপয়ে, উথলে ভাবতরঙ্গ ॥
পারিষদগণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গনাগর, যে লাগি আছিলা হেথা ॥"—

প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনকবি ভুবনদাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর উক্তি তাঁহার বারমাস্যা পদাবলীর প্রথমেই শ্রীগৌরসুন্দরকে নাগরাখ্যা দিয়াছেন—যথা,—

—"পহিলহি মাঘ, গৌরবর নাগর,
দুখ-সাগরে মুঝে ডালি।
রজনিক শেষ, শেজ সঞে ধায়ল,
নদীয়া করিয়া আঁধিয়ারি ॥"—

প্রাচীন পদকর্ত্তা রাধাবল্লভ ভণিতাযুক্ত পদেও নদীয়া-নাগরী-ভাব, যথা,—

—"গঙ্গার ঘাটে, যাইতে বাটে, ভেটিনু নাগর গোরা।
শূন্য দেহে আইনু গেহে, পরাণ হৈল হারা ॥

* * * *

শুনিতু ব্রজে, গোপী সমাজে, ডাকাতি করিত কালা।
সেই নাকি লো, নদ্যায় এলো, হৈয়া শচীর বালা ॥
দিন দুপুরে, ডাকাতি করে, মুচ্‌কে হাসি হেসে।
নয়ান বাণে, বধি প্রাণে, কুল মান যায় ভেসে ॥
রাধাবল্লভ কয়, আর ছাড়া নয়, যুকতি শুন দিদি।
মদন রাজায়, জানাও ত্বরায়, কুল রাখ্‌বে যদি ॥"—

(৯) প্রাচীন মহাজন বৈষ্ণবকবি দেবকীনন্দন রচিত পদেও সেই ভাব,—

—"ভুবন মোহন গোরা, রূপ নেহারিয়া আজু,
নয়ান সার্থক ভেল মোর।
ও চাঁদ মুখের কথা, অমিয়া সমান জনু,
শ্রবণে সার্থক শ্রুতি জোর ॥
এ দুঁহু নাসিকা মঝু, সার্থক হোয়ল সই,
গোর গুণমণি অঙ্গ-গন্ধে।
এ চিত ভোমরা মঝু, অতিহুঁ সার্থক ভেল,
মধু পীয়ে ও পদারবিন্দে ॥
এ কাঠ কঠিন হিয়া, সার্থক হোয়ব কবে,
ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া।
এ কুচ কমল মঝু, সার্থক হোয়ব কবে,
ও ভোমরে মকরন্দ দিয়া ॥
এ গণ্ড যুগল মঝু, সার্থক হোয়ব কবে,
ও না মুখের চুম্বন লভিয়া।
দেবকীনন্দন শির, সার্থক হোয়ব কবে,
নাথের চরণে লুটাইয়া ॥"—

(১০) প্রাচীন কবি লক্ষ্মীকান্ত দাস রচিত পদেও তাই—

—"কি ক্ষণে দেখিনু গোরা, নবীন কামের কোঁড়া,
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল, কত না ভরিব জল,
কত যাব সুরধুনী তীরে ॥
বিধি তো বিমু বুঝিতে কেহ নাই।
যত গুরু গরবিত, গঞ্জন বচন কত,
ফুকারি কাঁদিতে নাই ঠাঁই ॥ ধ্রু ॥
অরুণ নয়নের কোনে, চাঞাছিল আমা পানে,
পরাণে বড়শি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর, ছারখারে যাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে ॥
আপনা আপনি খাইনু, ঘরের বাহির হইনু,
শুনি খোলকরতাল নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয়, মরমে যার লাগয়,
কি করিবে কুল পরিবাদ ॥"—

* * * *

(১১) প্রাচীন কবি রসিকলালের পদেও সেইভাব, যথা,—

* * * *

"গৌরাঙ্গ নাগরী, সোহাগে আগরি
পাইনু রসের নিধি।
আই আই কিয়ে, সেরূপ মাধুরী
নিরমিল কোন বিধি ॥"—

(১২) প্রাচীন পদকর্ত্তা সর্ব্বানন্দের পদেও নদীয়া-নাগরী ভাব—যথা—

—"মোর মন ভজিতে গৌরাঙ্গচরণ চায় গো।
কি করি উপায়, কুলবধু হইলাম তায়,
জঞ্জাল যৌবন-বৈরি তায় গো ॥ ধ্রু।

* * * *

চাঁচর চিকুর চারু, চামরী চিকুর হারু,
ঘাম ঘাম জাগয়ে হিয়ায় গো।
ভনে মন্দ সর্ব্বানন্দ, কি জানি কি জানে গৌরচন্দ্র
মুরছি তার মন্মথ-চিতায় গো ॥"—

(১৩) পণ্ডিত জগদানন্দের প্রাচীন পদে দেখিতে পাই সেই নদীয়া-নাগরী ভাব, যথা,—

"নিন্দই ইন্দুবদন রুচি সুন্দর
বদনহি নিন্দই কুন্দ।
বদন ছন্দন রুচি, নিন্দই সিন্দুর
ভুরুযুগ ভুজগ-গতি নিন্দ॥
আজু কহবি গৌর যুবরায়।
যুবতী মতি হর, তোহারি কলেবর,
কুলবতী কি করু উপায়। ধ্রু॥

* * * *

গুরুজন নয়ন, প্রহরীগণ চৌদিকে,
নিশিদিন রহব আগোরি।
কি করব অবিরত, আবেকত রোয়ত,
জগদানন্দ কহ তোরি॥"—

পুনশ্চ অন্য পদে—

—"নদীয়াপুরে নিজ নয়নে নিরখনু
নবীন দ্বিজ যুবরাজ।
যতনে কতশত, যুবতী রূপ সেবই,
তেজি কুল মান লাজ॥
অব তোহে কি কহব আন।
মাইরি তছু বদন, সমরিতে কি জানি,
কি কব পরাণ॥"—

(১৪) পদকর্ত্তা বাসুঘোষের পদের ত কথাই নাই। একটী পদে নদীয়া-নাগরীভাবে তিনি কি কহিতেছেন শুনুন,—

—"নিশি শেষে ছিনু, ঘুমের ঘোরে।
গৌর নাগর পরিরম্ভিল মোরে॥
গণ্ডে কয়ল সই চুম্বন দান।
কয়ল অধরে অধররস পান॥
ভাঙ্গল নিঁদ নাগর চলি গেল।
অচেতনে ছিনু চেতনা ভেল॥
লাজে তেয়াগিনু শয়ন গেহ।
বাসু ঘোষ কহে তুয়া কপট লেহ॥"—

(১৫) ঠাকুর নরহরি সরকারের প্রাচীন পদে দেখিতে পাই,—

—"নাগরী সকলে গৌরাঙ্গ মুরতি
হিয়ায় রাখিয়া প্রেমে পূজিল।
নরহরি কহে নদীয়া-নগরে
নাগরী-নাগরে মিলন হইল॥"—

(১৬) প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের পদেও, সেই নদীয়া-নাগরীভাব,—যথা,—

—"গৌর মনোহর নাগর-শেখর।
হেরইতে মুরছই অসীম কুসুমশর॥"—

* * * *

অন্যত্র—

—"নাচত গৌর সুনাগর-মনিয়া
খঞ্জন গঞ্জন, পদযুগ-রঞ্জন,
মঞ্জীর মঞ্জুল ধ্বনিয়া॥"—

* * * *

পুনশ্চ—

—"গৌর বরণ, মণি আবরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভুলল, টলিল সকল দেশ।
মনু মনু সই, দেখিয়া গৌরঠাম।
বধিতে যুবতী, গড়ল বিধি, কামের উপরে কাম। ধ্রু॥
চাঁপা নাগেশ্বর, মল্লিকা সুন্দর, বিনোদ কেশের সাজ।
ওরূপ দেখিতে, যুবতী উমতি, ধরব ধৈরজ লাজ॥
ওরূপ দেখিয়া, নদীয়া-নাগরী, পতি উপেখিয়া কাঁদে।
ভালে বলরাম আপনা নিছিল, গোরাপদ নখচাঁদে॥"—

আর একটী পদে—

—"গৌর মনোহার, নাগর শেখর।
হেরইতে মুরছই অসীম কুসুম শর॥"—

* * * *

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে নাগররাজ বলিয়াছেন, যথা—তাঁহার পদে,—

—"নবদ্বীপ চাঁদ, চাঁদ জিনি সুন্দর,
নাগরী বিদগধ রাজ।
আনন্দ রূপ, অনুপম গুণ গণ,
আনন্দ বিতরণ কাজ॥
হরি হরি! হামারি মরণ এবে ভাল।
যো যদি সুখময়, কেলি উপেখিয়া
বিরহ ভাবে খেপু কাল॥ ধ্রু॥

"শ্রীগৌরবিরুদাবলী" গ্রন্থের দুই একটী শ্লোকও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—যথা—

(১)—"ফুল্লচিল্লি প্রসিত যুবতীকুল,দৃষ্টিস্পৃষ্টি স্থগিত হৃদয়-বল॥"

অর্থ—"আপনার (শ্রীগৌর নাগরের) ভ্রূভঙ্গে তরুণী-বৃন্দের দৃষ্টি, মন অপহৃত ও আবদ্ধ হয়।"

(২) —"জননী, কিঙ্কর, গৃহিণী শঙ্কর ধীর"—

অর্থ—"হে শচীপ্রিয়কারিন্! হে প্রেয়সীবাঞ্ছাপূরক!"

(৩) "চাচর ক্লাপ্ত, মাধুরী তৃপ্ত,
প্রেয়সী দিপ্ত, মেদিনী বিত্ত"

অর্থ—"আপনি চাতুর্য্যময় বাক্যের দ্বারা প্রেয়সীর চিত্তে প্রসন্নতা বিস্তার করিয়া থাকেন।"

(৪)—"যুবতীজন চিত্তমোহন,ভবতীহ প্রণতাং রতির্মম॥"

অর্থ—"হে যুবতী-চিত্ত বিমোহন! আপনাতে আমার রতি বিধান করুণ"। *

এই সমস্ত বাক্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাগরত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

জনৈক-বৈষ্ণবদাস।

সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজি

(শ্রীহরগোবিন্দ শিরোমণি)

গৌরগতপ্রাণ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন,—ইহ বোধ হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবিদিত নয়। তাঁহার শ্রীমুখের বাণী একটীও বিফল হইয়াছে, ইহা আমরা কাহারও মুখে শুনি নাই। বাল্যকালে আমরা তাঁহার দর্শন করিয়াছি এবং প্রাচীন লোকদের মুখেও শুনিয়াছি, চৈতন্যদাস বাবাজি সত্যই একজন লক্ষণাক্রান্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার ভজনসাধন, আচার ব্যবহার, সম্প্রদায়সিদ্ধ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের ন্যায়ই ছিল, তবে তাঁহার মধ্যে একটু নূতনত্বও ছিল। ভজনসাধনে বা আচার ব্যবহারে নূতন প্রণালী অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে, অনেকেই শিহরিয়া উঠেন সত্য, কিন্তু ইহাতে সিহরিয়া উঠিবার মত কোন অঘটনঘটনা নাই। নূতনত্বের অর্থ, প্রাচীনেরই একটা নূতন ব্যাখ্যা মাত্র, কোন নূতন গ্রন্থ নয়। নূতন গ্রন্থ হইলে মহাকবি কালিদাসের উক্তির ন্যায় একটা মুখবন্ধের ঘটাও থাকিত। কবি বলিয়াছেন:—

> পুরাণমিত্যেব ন সাধুসর্ব্বং
> ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্॥

পুরাতন সবই ভাল, নূতন সবই মন্দ, তাহা নয়। পুরাতনপ্রিয়দিগের নিকট নূতনের পরাজয় যদিও স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু নূতন ব্যাখ্যাকারের প্রতি কেহই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, বরং তাহাতে আদরের মাত্রাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বর্ণিত বাবাজি মহারাজের জ্ঞানগত ব্যবহারে যে একটু নূতনত্ব শুনা গিয়াছে, তাহাতে পুরাতনের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় নাই, বরং বর্দ্ধিতই হইয়াছে, কাজেই তাহাতে কাহারও অসন্তোষের তেমন একটা কারণ প্রকাশ পায় নাই।

গোপীভাবের ভজনে যাঁহারা আত্মনিমজ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা পুরুষ বলিয়া কখনও আত্মাভিমান করেন না, তাঁহাদের নিকট পুরুষ একমাত্র সেই পুরুষোত্তম, তাঁহাদের আত্মা সেই পুরুষোত্তমের সেবিকা মাত্র। চৈতন্যদাস বাবাজিও সেই গোপীভাবের ভক্ত। তাঁহার আত্মাও সেই ভগবৎসেবিকার পদেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্র হইয়া তিনি কখনও কখনও দর্শনার্থে আগতা রমণীগণের নিকট হইতে বস্ত্রাদি ভূষণ চাহিয়া লইতেন, তাহা নিজ অঙ্গে স্থাপন করিয়া সেই পলিতকেশ, গলিতদন্ত, শ্লথচর্ম্ম, জরা-ক্লিষ্ট কলেবরটীকে রমণীর ন্যায় বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া মহাপ্রভুর মন্দিরে গমন করিতেন, কত আত্মনিবেদন শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রকাশ করিতেন। মহাপ্রভুর অনিন্দ্য-সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দন্তহীন মুখে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেন। "নদীয়া নাগরীর" ভাবে নবদ্বীপবাসিনী "গৌর-গরবিনী" যুবতীর আবেশে আত্মহারা হইয়া ভুবনমোহন শ্রীশচীনন্দনের নিকট কত রতিরসের অভিভাষণ করিতেন। কোনও রসিক বৈষ্ণব তাঁহার এই ভাব দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে "আমি যে গৌরভাতারী গো" বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। পরিচয় দানের সময় দুনয়ন বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইত, সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিত। "গৌরভাতারী" কথাটা নিতান্ত গ্রাম্য হইলেও উহার ভাবটা গ্রাম্য নয়। উহাতে আধ্যাত্মিকতার বিমল জ্যোতি সুস্পষ্টভাবে বিরাজিত আছে। "গৌরভাতারীর" সাধুভাষা

"গৌরভর্ত্তৃকা" অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই যাহার ভর্ত্তা, পতি, প্রাণবল্লভ। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "যিনি জগৎ ভুলিয়া, জাতিকুল ভুলিয়া, ধনজন ভুলিয়া, সাধনামৃতপানে আত্মার নশ্বরত্ব ভুলিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সাধনের ধনকে নিজের প্রাণবল্লভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই গৌরভাতারী বা ভর্ত্তৃকা বলিয়া আত্মপরিচয় দিবার অধিকারী। পাঠক! সংসারের ক্রীতদাস তুমি আমি সে পরিচয়ের যোগ্য হইতে পারি না। এই নূতনত্ব তাঁহার জীবনলীলায় আমরা দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছি। যদি তার্কিক বৈষ্ণবমণ্ডলী বাবাজিমহারাজের এই ভাবের বিরুদ্ধে একটু তর্কের অবতারণা করিতে চান, তাহাতে অবশ্য "আসল গৌরভাতারী" ভীত হইলেন না, নকলের ভয় পদে পদে, ইহা পাঠকই চিন্তা করিয়া দেখিবেন। তার্কিকের তর্ক এই, যদি "আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ" ই হ'ন, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই যদি বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য হয় আর শ্রীচৈতন্যবীথি-পথিকগণের যদি শ্রীকৃষ্ণ সেবাই একমাত্র ধর্ম্ম হয়, তবে আবার "গৌরভাতারী"দের এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিল কেন? "গৌরভাতারী"র গৌর-চন্দ্রিকা এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে একটু ললিত-ভৈরবের ঝঙ্কার দিয়া বলিতেছেন,—ওহে গোপীভাবের সাধক! কৃষ্ণকে প্রাণপতি করিতে গেলে, যেমন গোপীভাবের আশ্রয় ব্যতিরেকে পূর্ণমনোরথ হইতে পারা যায় না। নিজে গোপী না সাজিলে, স্বয়ং গোপী হইয়া গোপীযূথে প্রবেশ না করিলে গোপীনাথকে তো আত্মসাৎ করা যায় না। এ শাস্ত্রের কথা, এসব দ্বাপরযুগের কথা, এসব বৃন্দাবনের কথা, আজ কলিযুগের মানুষ তুমি কোন্ দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিবে? বৃন্দাবনের সেই সেই লীলা, সেই বহু পুরাতন নন্দনন্দনের লীলারস নূতন করিয়া, হৃদ্য করিয়া, কোন্ দৃষ্টান্তের আশ্রয়ে বুঝিবে? বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে যে রসমাধুর্য্য শ্রীব্রজ-গোপীগণ একা একা আস্বাদ করিয়াছেন, সেই মধুর রস, সেই ভজনামৃত জগৎকে আস্বাদন করাইবার জন্য পূর্ণরস-স্বরূপ শ্রীভগবান্ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির সহিত মিশ্রদেহ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সাজিয়া ভুবনকে পবিত্র করিয়াছেন। এ অবতারের উদ্দেশ্য ব্রজলীলার পুনরাবৃত্তি মাত্র। ব্রজে যে যে ভাবে ব্রজবাসীগণের মন মোহিত হইয়াছিল, সেই ব্রজভাবানুগত প্রেমধন জগতে বিতরণ করিবার জন্য গৌরহরি নবদ্বীপে অবতীর্ণ। ইহা যদি সত্য হয়, তবে নবদ্বীপ নাগরীগণ গৌরভাবে গদ গদ হইয়া ব্রজভাবের, সেই গোপী-ভাবের আভাস বা গৌরচন্দ্রিকা দেখাইবার জন্য গৌররূপে মনপ্রাণ মজাইয়া থাকেন, তাহা কি অন্যায় বলিতে হইবে? আর যদি শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত ভক্ত কোন মহাপুরুষ চারি-শত বৎসরের সেই সব ঘটনার আবৃত্তি করিবার জন্য বা জগৎকে সেই সেই সুমধুর গোপীভাব শিখাইবার জন্য গৌরবিগ্রহেই তদৃশ প্রেমানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, তাহা কি শ্রীভজনের বহির্ম্মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে? বরং শ্রীভগবানে ঐকান্তিক আসক্তির অখণ্ড পরিচয় করিয়া জীবকে কৃতার্থ করা হইবে আমি বলি এসব গৌরভাতারীদিগের প্রতি রোষকষায়িত কটাক্ষ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদের মধুর ভজনের মধুরতা অনুভব করায় দোষ কি? শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজির নাগরীভাবে গৌর-ভজন এই ভাবের জিনিষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। শ্রীনন্দনন্দনে ও শ্রীশচীনন্দনে অদ্বয়তত্ত্ব এক ভাবেই দেখিতেন, এক বিগ্রহে যুগলরূপ দর্শন করিতেন, তাই তিনি ব্রজের ভাবে উন্মত্ত হইয়া গোপীভাবেরই আভাস মাত্র নদীয়ানাগরীর ভাব ধরিয়া শ্রীগৌরবিগ্রহে শ্রীরাধাবল্লভের উপাসনা করি-তেন। ইহা প্রাচীন পদ্ধতি নয় বলিয়া যদি কেহ এরূপ ভজনের বিরুদ্ধে দণ্ড ধারণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহা দিগের দৃষ্টি আমি প্রাচীন পদাবলীর দিকে একটু আকৃষ্ট করিতে চাই। গৌরচন্দ্রিকা নামে যে সব প্রাচীন পদাবলী পূজ্যপাদ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বিরচিত পদাবলীর অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সব পদা-বলীতে নদীয়ানাগরীর ভাব অনেক স্থলে উল্লেখ আছে ইহা বোধ হয়, বৈষ্ণব মাহন্থানা উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। সে সব স্থলে নদীয়ানাগরীর ভাবকে গোপীভাবের আভাস না বলিয়া কেহই থাকিতে পারেন না। শ্রীগোপী-ভাবই যে নদীয়ানাগরীর ভাব, ইহা স্বীকার না করিলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন সাধন অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। তবে বলিতে পারেন ভজনগিরির উচ্চশৃঙ্গে যাঁহারা আরো-হণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, যাঁহারা ভগবদ্ভাবে আত্মহারা তাঁহারাই শ্রীভগবানের সহিত ক্রীড়াকৌতুক ও রসবিস্তার করিবার অধিকারী; কিন্তু যাঁহারা ভজনগিরিতে আরোহণ করিবার ইচ্ছুক, তাঁহাদের নিকট এরূপ আদর্শ

ধরিয়া দিলে, তাঁহারাও সহজে ইহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এইজন্ত গোপীভাবের ভজনেও নানা গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এমন বিশুদ্ধভজন অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া বিদ্যাসুন্দরের টপ্পায় পরিণত হইয়াছে। তাহা হইলে এসব নাগরীভাবের ভজনও ব্যক্ত করিবার বস্তু নয়। ইহা যাঁহাতে আছে, তাহাতেই থাকিবে, ইহাই মানিয়া লইতে হয়। পাছে ঐ সব আদর্শ অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া ভজনে কুফল প্রকাশ করে, তজ্জন্য ভজনসিদ্ধ মহানুভব বৈষ্ণবগণ সাধন ভক্তির পরাকাষ্ঠা ছাড়িয়া দেন নাই। এক্ষেত্রে নাগরীভাব ধারণ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা গৌরাঙ্গসেবকই বিচার করিবেন।

যাউক ও সব কথা; এখন প্রকৃত কথার অনুসরণই কর্ত্তব্য। চৈতন্যদাস বাবাজি ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়াই শেষ বয়সে এই নাগরীভাবের ভজনে আসক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহাকেও তিনি নাগরীভাবে ভজন করিতে অনুরোধ করিতেন না। বালকের খেলার মত তিনি তাহা করিয়া যাইতেন। যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের শেষ-জীবন একটা খেলার মত হইয়া পড়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংসও মধ্যে মধ্যে রমণীর ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত হইতেন, গোপী সাজিয়া গোপীজনবল্লভকে হৃদ্দেশে দর্শন করিতেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় নয়, "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন তথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" এ গীতা উক্তির অধিকারী তাঁহারাই সত্য। তবে কখনও কখনও তরুণবয়স্ক নরকে গোপীর বেশে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তাহা কতদূর সঙ্গত, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন কি না জানি না। তবে সিদ্ধ পুরুষগণ ভাবে বিভোর হইয়া যখন যে ভাব অবতীর্ণ হ'ন, তখন তাহাদের অন্তর বাহ্য সেই ভাবেই ভাবিত হইয়া যায়। যখন তাহারা নারী সাজেন, তখন তাহাদের অন্তর বাহির নারীই হইয়া যায়, বাহিরে নারী অন্তরে পুরুষ তাঁহারা থাকেন না। কিন্তু সকলে কি তাহাতে অধিকারলাভ করিতে পারে? চৈতন্যদাস বাবাজির নাগরীভাবে পুরুষভাবের লেশ মাত্রও থাকিত না, ইহাই সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ। অসিদ্ধ সাধকের অন্তর বাহির এত সংযত হয় না। ভজনে সিদ্ধিলাভ একবার হইয়া গেলে, ভজনের 'বুনিয়াদ' একবার পাকা হইয়া গেলে, পতনের সম্ভাবনা আর থাকে না, কিন্তু অপক্ক অবস্থায় এ সব ভাব আনিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয় না কি? গোপী-ভাব বা নাগরীভাবের ভজনে প্রবৃত্তি থাকিলেই যে হঠাৎ তাহাকে অধিকার বলা যায়, এরূপ আশা করাই অনুচিত। তবে সেই ভজনে যাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে, যাঁহার অন্তর সেই সেই ভাবে বিভোর হইয়াছে, যাঁহার অন্তর বাহির এক হইয়া গিয়াছে, তিনি ভাবনার অনুরূপ বেশ ধারণ করিলে, তাঁহাকে কেহ নিন্দা করিবেন না, বরং তাঁহার তাদৃশ রুচিতে লোক আনন্দ অনুভবই করিবে। কাজেই নদীয়ানাগরী ভাবকে আমরা ঠেলিয়া ফেলিতে পারি না। প্রাচীন গোপীভাব শিক্ষার একটী আদর্শ মাত্রই নদীয়া-নাগরীভাব। শ্রীভগবানের ভুবনমোহন রূপে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ভুলিয়া ছিল, রূপতৃষ্ণায় লোলুপ বিলাস-বাসনায় বিবশ, নরনারী কেন তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন করিবে না? ভগবান্ যখন গৌররূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মধুর ভাবের ভক্তগণ কেহই দূরে ছিলেন না। যাঁহারা গৌররূপে প্রাণমন মজাইয়া ছিলেন, তাঁহারাও যে সামান্য নরনারী, তাহাও ভাবিতে আশঙ্কা হয়। গৌর-রূপ যে সব নদীয়া নাগরীর মনপ্রাণ হরিয়াছিল, তাঁহারাও শ্রীভগবানের নিত্য-সেবিকা। সেই নিত্যসেবিকাগণের ভাবকদম্বে যাঁহার মনোরাজ্য সুবাসিত, তিনি সমালোচককে ভয় করিবেন কেন? তিনি নিজের ভাবে ভগবানকে ভজিবেন, তাহাতে পর-মুখাপেক্ষা নাই। তবে আমার বক্তব্য এই যাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পাঁচজনে জানে, যাঁহার জীবন সংসারের খুঁটিনাটির জন্য ব্যস্ত নয়; সর্ব্বদা ভজনানুরাগ যাঁহার অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছে, কামিনী-কাঞ্চনের লালসা ক্ষণকালের জন্যও যাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে না, তাদৃশ ভক্তের আচরণে কোনরূপ কটাক্ষ করিলে অপরাধ হয়, তাই বলি ভাই! শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজির মত "গৌরভাতারী"কে দেখিয়া মনে কোন দ্বিধা করিও না, বিশুদ্ধ মনে তাঁহার কৃপাভিক্ষায় লালায়িত হইয়া প্রার্থনা করিও, তাঁহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহ অদৃশ্য হইলেও তাঁহারা অলক্ষ্যে থাকিয়া জগজ্জীবকে কৃপা বর্ষণ করেন। জয় গৌরনিত্যানন্দ!

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

সূচনা।

গৌরাঙ্গ বলেন—"আমার বৈরাগ্য স্ব-ধর্ম্ম।
বৈরাগ্য ছাড়িয়া আমার নাহি কোন কর্ম্ম"॥ জঃ চৈঃ মঃ

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের যখন তীব্র বৈরাগ্য, সংসার-সুখ তখন তাঁহার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইল। তিনি পিতৃকর্ম্ম করিয়া গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এক দিন নিজ গৃহের অন্দরমহলে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে নির্জ্জনে ডাকিলেন। দুইজনে গোপনে কি পরামর্শ হইল, কেহ জানিতে পারিলেন না। ভক্তগণকে সঙ্গে আনিতে বলিলেন, সকল ভক্তগণ প্রভুর অন্দরমহলে একত্রিত হইলেন। বৈরাগ্যযোগ-ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রভুর ভিতরে ভিতরে গোপনে এই আয়োজন। প্রভুর মনে একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্যও আছে। শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী প্রভুর সংসার-বৈরাগ্য দর্শনে বিশেষ সন্তপ্ত। তাঁহাকে বৈরাগ্য-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই প্রভুর এই গুপ্ত কৌশল-জাল বিস্তার। প্রভু স্বয়ং বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও প্রভুর উপদেশমত উৎকট বৈরাগ্য-যোগ সাধন করিয়াছেন। সেই বৈরাগ্য-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই প্রভু নিজগৃহের অন্দর মহলে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিলেন। জয়ানন্দ ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে এ সকল কথা বিশেষ-রূপে লিখিয়াছেন।—

—"একদিন গৌরাঙ্গ অদ্বৈতচন্দ্রে আনি।
ভিতর মন্দিরে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর চারি ভাই।
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি বসিলা তথাই॥
হরিদাস ঠাকুর জগদানন্দ গোপীনাথে।
শ্রীবাস দাস মুরারি গুপ্ত যোড় হাথে॥
দামোদর স্বরূপ আর দাস গদাধর।
আচার্য্যরত্ন রাঘব পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥"—

সকল ভক্তগণই প্রভুর অন্দরমহলে আজ উপস্থিত। প্রভুর প্রকৃত মনের ভাব কেহই জানেন না। প্রভু সাধারণতঃ বহির্ব্বাটিতেই ভক্তসঙ্গ করিতেন। আজ এই নিয়মের ব্যতিক্রম কেন করিলেন? ইহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। এই ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে প্রভুর শ্বশুর মহাশয়ও আছেন, মেসো মহাশয়ও আছেন। খোলাবেচা কাঙ্গাল শ্রীধরও আছেন। পুরোহিত ঠাকুরও আছেন।

"আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিত সনাতন।
পাটুয়া শ্রীধর শ্রীমান পণ্ডিত সুদর্শন॥"

ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহই বাকি নাই। সকলেই প্রভুকে ঘিরিয়া সারি সারি বসিয়াছেন। প্রভুর মন কেহ জানেন না। গৌরগৃহে আজ যেন চাঁদের হাট ব'সয়াছে।

—"এ সব বৈষ্ণব বসিলা সারি সারি।
প্রভুর হৃদয় কেহ বুঝিতে না পারি॥"—

সকলেই বসিয়া আছেন। প্রভুর তখন বিকট বৈরাগ্য—মহা উগ্রস্বভাব। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা ঠাকুর জয়ানন্দ কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

—"না লয় চন্দনমালা না পরে বসন।
নিগমে বসিয়া থাকে কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥
চাঁচর কেশ না বান্ধে না শুনে কারো কথা।
ভোর দুপুর বেলা গৌর যায়ে যথা তথা॥
গজেন্দ্র গমনে যায়ে উলটি না চায়ে।
আউলাইল মাথার কেশ শচী পাছু ধায়ে॥
কর্পূর তাম্বুল ছাড়ি প্রিয় কৃষ্ণকেলি।
কণক কুণ্ডল হার হিরণ্য মাদুলি॥
ছাড়িয়া পালঙ্কী শয্যা ভূমে নিদ্রা যায়ে।
কিরে কিরে করি ঘন ডাকে উর্দ্ধ রায়ে॥
না করে স্নান গৌর না করে ভোজন।
না করে শ্রীঅঙ্গে বেশ তৈল উদ্বর্ত্তন॥
দূরে গেল সন্ধ্যা তর্পণ দেবার্চ্চনা।
দূরে গেল মন্ত্র জাপ্য তুলসীবন্দনা॥"—

* * * *

"সিংহাসন পালঙ্ক ছাড়িঞা ভূমিশয্যা।
ছাড়িল বৃন্দার সেবা কৃষ্ণ-পরিচর্য্যা॥
রত্নকুণ্ডল হার হিরণ্য মাদুলি।
সুখময় বসন না পরে কৃষ্ণকেলি॥
বিষ্ণু তৈল ছাড়ি প্রভু সুগন্ধি পরাগ।
চাঁচর কেশ ধুলায় ধুসর তিন ভাগ॥
যে ঠাকুর দিব্য মালা পরে শত শত।
সে প্রভুর গলে নাম ডোর গ্রন্থ কত॥
যে অঙ্গে চন্দনাগুরু কস্তুরী সুন্দর।
সে অঙ্গ কীর্ত্তনানন্দে ধুলায় ধুসর॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল যার মুখে।
সে প্রভু হরীতকী ফল খায় কোন সুখে॥
মহা বৈরাগ্য দেখি পার্ষদ উন্মাদ।
তা দেখি গৌরাঙ্গ সভারে করিল প্রসাদ॥"

এইরূপ প্রভুর অবস্থা দেখিয়া পুত্রবৎসল শচীমাতার মনে এবং পতিপ্রাণা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রাণে যে কিরূপ মর্ম্মন্তুদ দুঃখ হইত, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শ্রীমতী কেবলমাত্র প্রভুর চরণের প্রান্তে পতিত হইয়া কান্দিতেন, আর বলিতেন "নাথ! জীবনধন! জীবন-সর্ব্বস্ব! এ দাসীরে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে?"

"বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী চরণে পড়িয়া।
(বোলেন) কোথায় চলিবে প্রভু আমারে ছাড়িয়া॥"

শচীমাতার মর্ম্মান্তিক দুঃখ দেখিয়া মালিনী দেবী, নারায়ণী দেবী কান্দিয়া আকুল হইতেন। প্রভুর বিকট বৈরাগ্য দর্শনে, এবং শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখভারাক্রান্ত মর্ম্মন্তুদ অবস্থা দেখিয়া নবদ্বীপবাসী নরনারী সকলেই বিষম অসুখী এবং সর্ব্বক্ষণ ম্রিয়মান। প্রভুর ধাত্রীমাতা নারায়ণী ও মালিনী-দেবী বিশেষভাবে বিষম ব্যথিতা হইলেন। তাঁহারা দিবানিশি ক্রন্দন করেন।

"শচীর করুণা দেখি বৈষ্ণবী মালিনী।
কান্দিতে লাগিলা ধাত্রী-মাতা নারায়ণী॥"

প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা অতিশয় শঙ্কাজনক। সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘিরিয়া তাঁহার অন্দর মহলে বসিয়া আছেন। প্রভু তাঁহাদিগকে নিজগৃহে যে কি জন্য আহ্বান করিয়াছেন তাহা তাঁহারা কিছুই জানেন না। প্রভুর কঠোর বৈরাগ্য-পূর্ণ মলিন শ্রীমুখের প্রতি সকলেই চাহিয়া আছেন। তাঁহার গম্ভীর ভাব। কেহ কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। প্রভুও কিছুই বলিতেছেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল পূর্ণ বৈরাগ্য-ভাবব্যঞ্জক। প্রভু কোন কথা বলিতেছেন না,—ইহা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রভুকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অনুমান করি তবে কহিলা ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরে বৈরাগ্য কেন করে॥
ঈশ্বরে বৈরাগ্য সেবকে কিবা সুখ।
ঈশ্বর বৈমুখ যার সংসার বিমুখ॥
সর্ব্ব ভূতে অন্তর্য্যামি কি কার্য্য বৈরাগ্যে।
সর্ব্বসুখ আমোদ করাহ ভাগ্যে॥" জঃ চৈঃ মঃ

এখন এই নিগূঢ় কথাটির একটু মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার অজানিত কোন বস্তুই নাই। তিনি প্রভুর অন্তরের কথা সকলি জানেন, প্রভুও তাঁহার অন্তর জানেন। অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন "তুমি সাক্ষাৎ ভগবান, তুমি সর্ব্বানন্দ, সদানন্দ, সর্ব্ব সুখের আকর। তুমি প্রভু, বৈরাগ্য কেন করিবে?—তোমার সুখেই তোমার সেবকের সুখ। তোমার দুঃখে তোমার ভক্তের দুঃখ। সেবকের মনে সুখ দেওয়াই তোমার কার্য্য। তুমি তাহাদের মনে দুঃখ দিবে কি জন্য? তাহারা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি

যদি তাহাদের দুঃখ না বুঝিয়া তাহাদের প্রতি বৈমুখ হও,—তাহাদের সংসারে প্রয়োজন কি? তুমি ত সকলি জান;—জানিয়া শুনিয়া এ কার্য্য কেন করিবে? তুমি আনন্দময়, সর্ব্ববিধ সুখে সর্ব্বভাবে তুমি তোমার ভক্তবৃন্দকে সুখী কর। তাহাদের ভাগ্যে তুমি নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহাদের প্রাণে ব্যথা দিও না। তাহাদের লইয়া আনন্দ কর।"

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর এই কথাগুলির নিগূঢ় মর্ম্ম আছে। শচীমাতা এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রাণের মর্ম্মব্যথা তিনি অবগত আছেন। প্রভুর বৈরাগ্য দর্শনে প্রিয়াজি কিরূপ ব্যথিতা হইয়াছেন, তাঁহার কোমল প্রাণে কিরূপ নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সকলি জানেন। তাই সর্ব্বসমক্ষে প্রভুকে বৈরাগ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য এই কথাগুলি বলিলেন।

প্রভুরও উদ্দেশ্য তাই। তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তিনি কিছু লুকাইবেন না। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর,—ইচ্ছাময়। তিনি যাহা করিবেন তাহা নিবারণ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। গুরুতুল্য বৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কথা শুনিবেন না, ইহা বুঝিতে পারিলেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রভুকে বৈরাগ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে ক্ষান্ত হইবেন, এইটি বুঝাইবার জন্য আমার রঙ্গিয়া প্রভুর এই অদ্ভুত লীলা-রঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে তিনি গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন, শচীমাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জানিতেন তাঁহার কথা প্রভু কিছুতেই এড়াইতে পারিবেন না। প্রভুর ইচ্ছা কিন্তু অন্যরূপ,—তিনি দেখাইবেন, তিনি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহার ইচ্ছামত কর্ম্ম তিনি করিবেন। কেহ তাহাতে প্রতিবাদী হইতে পারিবেন না। ঈশ্বরের কার্য্য তাঁহার স্বতন্ত্রতা, স্বৈরচারিতা তাঁহার একটী গুণ,—তাহা জীবের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে। এই সকল তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্য পরম কৌশলী প্রভু আমার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে গম্ভীরভাবে বলিলেন:—

গৌরাঙ্গ বলেন "আমার বৈরাগ্য স্ব-ধর্ম্ম।
বৈরাগ্য ছাড়িয়া আমার নাহি কোন কর্ম্ম॥"

এই দুইটী কথায় পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন প্রভু আমার তাঁহার নির্ব্বিকার পরমব্রহ্মভাবের পরিচয় দিলেন। তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসও যাহা,—সংসার-সুখও তাই। তিনি বলিলেন "বৈরাগ্য আমার স্ব-ধর্ম্ম"। এ কথাটির একটু বিচার প্রয়োজন। বৈরাগ্য শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে একটি ঐশ্বর্য্য। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে:—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥

অতএব বৈরাগ্য তাঁহার ধর্ম্ম। শুধু ধর্ম্ম নহে, তাঁহার স্ব-ধর্ম্ম। স্বয়ং ভগবানের এই বৈরাগ্যরূপ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ কেবল শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারেই দেখিয়া পাওয়া যায়। অন্য কোন অবতারে শ্রীভগবান এই ঐশ্বর্য্যটি বিশেষভাবে প্রকট করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার অন্যান্য সকল অবতার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, ইহা মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন; এই একটি তাহার বিশেষকারণ। বৈরাগ্য শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, কারণ—শ্রীভগবানের বৈরাগ্য দেখিয়া সর্ব্বশ্রেণীর জীবের হৃদয় দ্রব হয়, স্থাবর জঙ্গম পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ভগবদ্ভাবে বিহ্বল হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্ম সমর্পণ করে। শ্রীভগবানেরও স্ব-ধর্ম্ম আছে, তাহা তাঁহাকেও পালন করিতে হয়। সুতরাং বৈরাগ্য শ্রীভগবানের একটি বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষার বস্তু। এই জন্যই ইহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পরিগণিত। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু নিজ বাসগৃহে বসিয়া চতুর্দ্দশবৎসরবয়স্কা সুন্দরী তরুণী ভার্য্যার সম্মুখে,—শোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে শুনাইয়া শুনাইয়া এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও ভক্তবৃন্দ নীরবে শুনিতেছেন। প্রভুর শ্রীমুখে উৎকট বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তাঁহাদের মনে দারুণ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। তাহার উপর যখন তাঁহারা তাঁহার স্বমুখে নিজ বৈরাগ্যের প্রশংসার কথা শুনিলেন, তখন তাঁহাদের মনের সন্দেহ অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইল। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে যখন বলিলেন:—

"বৈরাগ্য ছাড়িয়া আমার নাহি কোন কর্ম্ম।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী একথা শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহারই মস্তকে যেন তখনই বজ্রপাত হইল। তিনি ও শচীমাতা পার্শ্বের গৃহে ছিলেন। প্রিয়াজি শচী-মাতার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। শচীমাতা পুত্রবধূকে লইয়া সেখানে মহা বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু গম্ভীরভাবে সর্ব্ব ভক্তবৃন্দকে সেদিন বিশিষ্টভাবে বৈরাগ্য-যোগ শিক্ষা দিতে বসিলেন। তিনি

রাজা জড়ভরতের কথা তুলিলেন। ভরতরাজার কর্ম্ম-বাসনাফলে মৃগজন্ম প্রাপ্তি, তাঁহার পর পুনর্জ্জন্ম ব্রাহ্মণ গৃহে,—তাঁহার উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য,—তাহার ফলে পরিণামে কৃষ্ণপ্রাপ্তি। এ সকল কথা প্রভু একে একে সকল ভক্তগণকে বিষদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এ সকল কথা বলিতে বলিতে প্রভু হরিদাস ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"সেই নিদ্রা সিংহাসন পালঙ্ক উপরে।
সেই নিদ্রা তৃণ কাষ্ঠ কুটীর ভিতরে॥
দেহ মাঝে করঙ্গেতে করে জলপান।
দুই জলে তৃষ্ণা খণ্ডে সন্তোষ সমান॥
অল্প ভাগ্যে নহে দেহে বৈরাগ্য প্রকাশে।
অল্পভাগ্যে নহে গুরুচরণ প্রবেশে॥" চৈঃ মঃ

প্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বুঝিলেন নিতান্তই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। প্রভুর মনের ভাব ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া দেবী বিশেষ কাতরা হইলেন। তিনি এক্ষণে বুঝিলেন, এই সকল তীব্র বৈরাগ্যের কথা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্যই তাঁহার প্রাণ-বল্লভ নিজগৃহের অন্তঃপুর মধ্যে ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়বল্লভ এই সকল তীব্র বৈরাগ্যের কথা তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ বৈরাগ্যের অবতার, নদীয়ার অবতার-নারী হইয়াও তাঁহাকে তীব্র বৈরাগ্য-যোগ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রভুর এই উপদেশে তাহার সূত্রপাত মাত্র। চতুর চূড়ামণি প্রভু শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্যই এই ফাঁদ পাতিয়াছেন। বুদ্ধিমতী পতিপ্রাণা সনাতন-নন্দিনী তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলি শুনিলেন। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছাময়। কে তাঁহার কথার বাদী হইবে? রাত্রি এক প্রহরের সময় ভক্তবৃন্দ নিজগৃহে ফিরিলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া সকলেই মনদুঃখে হায় হায় করিতে লাগিলেন। পুত্রপ্রাণা বৃদ্ধা শচীমাতা এবং পতিপ্রাণা দুঃখিনী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা মনে করিয়া সকলেই নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। শ্রীপাদ সনাতন মিশ্র মনদুঃখে অভিভূত হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া ফেলিলেন। আসিবার সময় তাঁহার দুঃখিনী কন্যার সহিত একটী বার দেখা করিতেও পারিলেন না।

সে দিন রাত্রিতে প্রভুর সহিত প্রিয়াজির মিলন হইল। প্রভু তাঁহার তাৎকালিক স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে প্রিয়াজিকে অতি সুস্পষ্ট কথায় তীব্র-বৈরাগ্য-যোগ শিক্ষা দিলেন। সে বড় বিষম কথা।

প্রভু নিজ শয়নকক্ষের ভূমিতলে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্যলক্ষণ সকল দেখিয়া শচীমাতা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাতিশয় ভীতা ও চিন্তিতা হইয়াছেন। প্রভু আর এখন পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করেন না। যে দিন তিনি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে নিজগৃহে আহ্বান করিয়া বিষয়-বৈরাগ্যের কথা তুলিয়া নানাবিধ উপদেশ দিলেন, সে দিবস রাত্রিকালে প্রিয়াজি প্রভুর শয়নকক্ষে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণবল্লভ ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া অঝোর-নয়নে কান্দিতেছেন। ইহা দেখিয়া পতিপ্রাণা-সরলা,বালা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রাণে যেরূপ নিদারুণ মর্ম্মব্যথা পাইলেন, তাহা কৃপাময় পাঠকপাঠিকাবৃন্দ মনে মনে কল্পনা করিয়া লউন। সে দারুণ মনঃকষ্ট ও ভীষণ মর্ম্ম-পীড়ার বিবরণ কল্পনার অতীত হইলেও গৌরভক্তের ধ্যানের বিষয়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তাৎকালিক মনের অবস্থা ও মর্ম্মব্যথার বিষয় দুই দণ্ড স্থিরভাবে ধ্যান, চিন্তা ও অনুশীলন করিলে মলিন হৃদয় নির্ম্মল হইবে, শুষ্ক নয়নে বারিধারা প্রবাহিত হইবে, কাষ্ঠ পাষাণও বিগলিত হইবে! প্রিয়তম গৌরভক্ত-পাঠকবৃন্দ! কৃপাপূর্ব্বক মন স্থির করিয়া গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তাৎকালিক অবস্থাটি মনে মনে একবার একটু ধ্যান করিয়া দেখিবেন। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির ধ্যান ত সকলেই করিয়া থাকেন, তাঁহার সচ্চিদানন্দময় যুগলমিলনরূপের ধ্যান করিয়া সকলেই ত আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। সুখময় ও আনন্দপ্রদ বিষয়ের ধ্যানে চিত্ত প্রেমানন্দময় হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীভগবানের নরলীলার দুঃখময় লীলাকাহিনী, তাঁহার সর্ব্বোত্তম নরলীলার পারিষদবর্গের ভগবতবিরহের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ, তাঁহার লীলার প্রধান সহায়িনা অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা মহালক্ষ্মীগণের প্রাণস্পর্শী বিরহোন্মাদদশাও ভক্তবৃন্দের ধ্যানের বিষয়।

শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্দাসগোস্বামী তাঁহার বিরচিত শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তব-কল্পতরুতে প্রেমোন্মাদদশাগ্রস্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর গম্ভীরালীলা-স্মরণে প্রাচীরের ভিতে মুখঘর্ষণ এবং তজ্জনিত রক্ত-পতন-লীলারঙ্গ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

"স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপামুন্মাদাৎ সতত মতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ-শশ্বদ্বদন-বিধু ঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে মনের মধ্যে যে শোকাবেগ উত্থিত হয়, তাহার ফল ভক্তবৃন্দের প্রতি ইন্দ্রিয়গ্রামে পরিলক্ষিত হয়। অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য, স্বেদ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া জীবের মনের মলিনতা চিরতরে বিনষ্ট করে, চিত্তের অবসাদ দূর করিয়া মলিনচিত্ত শুদ্ধ করে। শ্রীভগবানের নরলীলা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম, তাহার প্রধান প্রমাণ এইটি। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনঃকষ্ট, ও মর্ম্মপীড়া ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন এবং তাহা বুঝিয়া নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করুন। তাহাতেই আপনাদের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে।

কৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত ও তীব্র বৈরাগ্যপ্রিয় এবং ভূমিশয্যায় শায়িত পতিদেবতার পাদমূলে প্রিয়াজি ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছিল, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। প্রভু আপন মনে ভূমিতলে বসিয়া অঝোরনয়নে কান্দিতেছেন, প্রিয়াজি তাঁহার পাদমূলে বসিলেন, তিনি তাহা লক্ষ্যই করিলেন না। কিছুক্ষণ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এইরূপ নীরবে তাঁহার পতিদেবতার সর্ব্বাবয়বের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন,—পরে কাতরকণ্ঠে কান্দিতে কান্দিতে করুণস্বরে অতিশয় ভয়শঙ্কুচিতচিত্তে কহিলেন ;—

"যথা তথা চল তুমি, সঙ্গে যাইব আমি,
আমা না ছাড়িবে দ্বিজরাজ।
করিব তোমার সেবা, সেই সে আমার শোভা
গৃহ পরিজনে পড়ু বাজ॥
কেন কর হেট মাথা, শুনিয়াছি পূর্ব্বকথা,
বেদবিহিত লোকাচার।
রঘুনাথ বনবাসে, জানকী তাঁহার পাশে,
অযোধ্যা ছাড়িয়া সিন্ধুপার॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, কেবল ধার্ম্মিক বীর,
পাশারে হারিয়া নিজদেশে।
দ্রৌপদী সঙ্গেতে করি, অজ্ঞাত বাসেতে চলি,
মহারণ্যে করিল প্রবেশে॥
নলদময়ন্তীর কথা, শুনেছি যতেকাবস্থা,
এই সে তোমার শ্রীমুখে।
শনিগ্রহে দোষে তথি শ্রীবৎস নরপতি,
চিন্তা নিয়া ভ্রমিলা বিপাকে॥" জঃ চৈঃ মঃ

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই হৃদিবিদারক মর্ম্মব্যথার করুণ কথাগুলি প্রভু ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া একে একে সকলই শুনিলেন। তাঁহার ইচ্ছা প্রিয়াজিকে তিনি তীব্র বৈরাগ্য সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ দিবেন। পরোক্ষে সে উপদেশ তিনি দিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যক্ষে দুই একটি অতি গুহ্য কথা বলিবেন সেই জন্যই এই ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছেন। প্রভু ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা হইতে উঠিলেন,—বদন লুকাইয়াছিলেন,—এক্ষণে বদন উঠাইলেন। প্রিয়তমার অশ্রুপূর্ণ কাতর বদনচন্দ্রের প্রতি গম্ভীরভাবে একটিবার মাত্র উদাস নয়নে চাহিলেন। পুনরায় বদনচন্দ্র অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বিশেষ করিয়া কিছু দিব্যজ্ঞানের কথা কহিতে লাগিলেন।

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনি গৌরচন্দ্র মনে গুণি
দিব্যজ্ঞান কহিল বিশেষে।
নবদ্বীপে বৈস তুমি তোমার পতিক ভূমি
সস্ত্রীক ধর্ম্ম কভু নহে॥
অরুণ উদয় কালে অলকানন্দার জলে
নিত্যরূপী স্নান করিহ।
আমার যজ্ঞসূত্র দিব্য ধৌত খেনি বস্ত্র
মন্দিরে আসি নিত্য পরিহ॥
আতপ তণ্ডুল মুষ্টি ভূমে থুঞা এক মুঠি
একটি তণ্ডুল হাতে করিহ।
হরেকৃষ্ণ হরিনাম বত্রিশ অক্ষর নাম
সাঙ্গ হৈলে সে তণ্ডুল ছাড়িহ॥
এই মতে যত পার প্রমাণ দুই প্রহর
সে তণ্ডুল রন্ধন করিহ।
সে অন্ন ভাজনে থুঞা তুলসী মঞ্জুরী দিয়া
কৃষ্ণে নিবেদিয়া ধ্যান করিহ॥

সে মহাপ্রসাদ অন্ন কেবল তোমারে ব্রহ্ম
সেই অন্ন ভোজন তোমার।
সঙ্কীর্ত্তন করাইহ বৈষ্ণবেরে অন্ন দিহ
এই সত্য পালিহ আমার॥
কার মাতা পিতা পুত্র ধনজন বন্ধু যত
স্বকর্ম্ম ফলের ভোগ ভুঞ্জি
কৃষ্ণ হেন মহাপ্রভু না পাসরিহ কভু
বৈষ্ণবী-মায়ায় মন মজিয়ে॥
যত দেখ চলাচল পদ্মপত্রে যেন জল
সমুদ্র-তরঙ্গ হেন বাসি।
জীবন যৌবন ধন যত গৃহ পরিজন
তিলেক বিনাশ ভস্মরাশি॥
শুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদয়ে দেখ চিন্তিয়া
সব মিথ্যা কেহ কারো নহে।
কহিল সকল তত্ত্ব রাখিহ আপন মহত্ত্ব
স্ত্রী সঙ্গে সন্ন্যাস না হয়ে॥" জঃ চৈঃ মঃ

এক্ষণে প্রভুর এই কথাগুলির একটু বিচার করিব। তিনি সর্ব্বপ্রথমে প্রিয়াজীকে বলিলেন, "তুমি নবদ্বীপে থাক, নবদ্বীপে তোমার পতির গৃহ, তোমাকে আমি সঙ্গে লইতে পারিব না, কারণ স্ত্রী সঙ্গে ধর্ম্ম হয় না।" এখানে প্রভু প্রিয়াজীকে তিনটী কথা বলিলেন। প্রথমতঃ "তুমি নবদ্বীপে থাক।" এ কথার নিগূঢ় অর্থ আছে। প্রভু জানেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপে আর আসিতে পারিবেন না। নবদ্বীপ তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী-পরমধাম। অনাদি অনন্ত কালাবধি যুগলে তিনি এই নিত্যধামে নিত্য-লীলা করিতেছেন। তিনি প্রিয়াজীকে সে কথা এখন খুলিয়া বলিতে পারিলেন না। কারণ তিনি প্রচ্ছন্ন অবতার। "তুমি নবদ্বীপে থাক" ইহার নিগূঢ় অর্থ "তুমি যেখানে আমিও সেখানে, তুমি নবদ্বীপে থাকিলেই আমিও নবদ্বীপে রহিব।" দ্বিতীয় কথা "নবদ্বীপে তোমার পতিগৃহ, পতিগৃহেই স্ত্রীলোকের বাস সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পতি-গৃহই স্ত্রীলোকের নিজবাস। নদীয়া নিত্যধাম, শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের নিত্য-যুগলবিলাস-রাস-লীলাস্থলী, এই নিত্যধাম শ্রীনবদ্বীপ ছাড়িয়া তুমি অন্য কোথাও যাইতে পার না, প্রভুর মনের এই ভাব। তৃতীয় কথা "সস্ত্রীক ধর্ম্ম কভু নহে।" —প্রভুর এই কথাটী "সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ" এই মহাজন-বাক্যের বিরোধী। এখানে ধর্ম্মশব্দের অর্থ বিভিন্নরূপ বুঝিতে হইবে। প্রিয়াজী প্রভুকে পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা, শ্রীবৎস রাজা প্রভৃতির সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণের কথা তুলিয়া এ কার্য্য যে "বেদবিহিত লোকাচার" তাহা বলিয়া-ছেন। প্রভু তাহার উত্তরে কহিলেন—"সস্ত্রীক ধর্ম্ম কভু নহে।" এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ পারমহংস-ভাগবত-সন্ন্যাসধর্ম্ম। শ্রীগৌরভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের একটী ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহাকে "বৈরাগ্যবিদ্যা" আখ্যা দিয়াছেন। এই বৈরাগ্যধর্ম্ম যাহা প্রভু স্বয়ং আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহা সস্ত্রীক আচরণীয় নহে, ইহা গার্হস্থ্যধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। শ্রীল রূপসনাতন রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শ্রীল স্বরূপ দামোদর, দামোদর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ নিত্য পার্ষদগণ প্রভুর কৃপায় এই পারমহংস-ধর্ম্মমূলক ভাগবত-বৈরাগ্যবিদ্যা শিক্ষাপূর্ব্বক স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া কলি-হত জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সন্ন্যাসধর্ম্মে প্রকৃতির মুখদর্শন নিষিদ্ধ। প্রভু আমার এইরূপ ভাগবত-যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাই বলিলেন "সস্ত্রীক ধর্ম্ম কভু নহে।"

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে প্রভু তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পর যতদিন শচীমাতা প্রকট ছিলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ততদিন প্রভু-প্রদর্শিত এই উৎকট বৈরাগ্যপন্থা সম্যক অবলম্বন করেন নাই। কারণ এই কার্য্যে প্রভুর নিষেধ ছিল। শচীমাতার অপ্রকটের পর বিরহিণী গৌরবল্লভার প্রাণে এই উৎকট বৈরাগ্যযোগ স্ফুরিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার বিশ্বাসী অনুচর এবং প্রিয়তম মন্ত্রশিষ্য শ্রীঈশান নাগরকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তাৎকালিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীঈশান নাগর যাহা দেখিয়া মনদুঃখে আকুল হইয়া কান্দিতে কান্দিতে শান্তিপুরে ফিরিয়া গিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন, প্রিয়াজীর প্রতি তাঁহার প্রাণবল্লভের আদিষ্ট সেই তীব্র বৈরাগ্যের উপদেশগুলি এই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয়াজি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সকলই তাঁহার প্রাণ-বল্লভের উপদেশ অনুসারেই করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া সরলা বালিকা ঘরণীকে কিরূপ তীব্র বৈরাগ্য

আচরণের উপদেশ দিলেন, তাহা শুনিলে সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠে। ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষর তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ হরিনাম একবার জপ করিবে এবং এক একটি তণ্ডুল মৃণ্ময়পাত্রে রাখিবে। দুইপ্রহর কাল এইরূপ বিধিবদ্ধ জপসংগৃহীত তণ্ডুলসমষ্টি একত্র করিয়া তাহা পাক করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিবে। সেই প্রসাদ প্রিয়াজির প্রাণধারণের জন্য গ্রহণীয়। কিন্তু প্রিয়াজি সেই প্রসাদ হইতেও ভক্তবৃন্দকে কিছু কিছু বণ্টন করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত তাহাই প্রাণরক্ষার জন্য গ্রহণ করিতেন। প্রভুর সুতীব্র বৈরাগ্য এবং প্রিয়াজির অনুষ্ঠিত উৎকট বৈরাগ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। আর তাহা থাকিবেই বা কেন? শক্তি-শক্তিমান দুইই যখন এক বস্তু, কেবলমাত্র লীলার উদ্দেশে দেহভেদ মাত্র। প্রভু তাঁহার প্রিয়াজিকে নবদ্বীপে রাখিলেন কেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহাকে নবদ্বীপে রাখিবার আর একটি কারণও আছে। সেটিও প্রভু প্রিয়াজীকে অতঃপর স্বয়ং খুলিয়া বলিয়া দিলেন ;—

"সংকীর্ত্তন করাইহ বৈষ্ণবেরে অন্ন দিহ
এই সত্য পালিহ আমার॥"

প্রভু প্রিয়াজিকে এই আদেশটি দিলেন, লোকশিক্ষার জন্য। নদীয়াবাসী নরনারী সকলে প্রভুর কথায় হরিনাম লইল না। সেই দুঃখে প্রভু আমার গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সেই অতি দুরূহ কার্য্যভারটি প্রভু আমার নবীনা প্রিয়াজীর উপর দিয়া গেলেন। প্রিয়াজী কিরূপে প্রভুর আদেশে এই জীবোদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা পরে বলিব। প্রভু যাহা বাকি রাখিয়াছিলেন, প্রিয়াজি তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এ সকল অতি নিগূঢ় বেদ-গোপ্য কথা। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর স্বরূপ-শক্তি, তাঁহার অলৌকিক শক্তির সাহায্যে জীবোদ্ধার-কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং হইতেছে তাহা অনেকবার বলিয়াছি। প্রয়োজন হইলে শত সহস্রবার বলিব।

জীবনে মরণে গৌরবক্ষ-বিলাসিনী সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই গুণই যেন নিরন্তর গাহিয়া দেহপাত করিয়া আত্মশোধন করিতে পারি,—শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের রসিক ভক্তগণের চরণে জীবাধম লেখকের এই সকাতর প্রার্থনা এবং বিনীত নিবেদন। কলিজীবোদ্ধারকর্ত্রী পতিতোদ্ধারিণী গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অপূর্ব্ব লীলাকাহিনীগুলি শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সুধামধুর লীলাকাহিনীগুলির সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। অগাধ অসীম গৌরাঙ্গ-লীলা-সিন্ধুর অনন্ত মাধুর্য্যপূর্ণ রসাস্বাদনের লোভ ও মহা সৌভাগ্য গৌরভক্তগণের হেলায় ছাড়িবার বস্তু নহে। শ্রীগুরু নিতাই-গৌরাঙ্গ এবং গৌরভক্ত মহাজন কৃপায় এই লোভ এবং সৌভাগ্য কলিহত জীবের দগ্ধ ভাগ্যে কখন কখন উদয় হয়। যাঁহার ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন তিনিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মুখ্যা শক্তি প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী গৌরবক্ষ বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অপূর্ব্ব নদীয়া-যুগল-বিলাস রসরঙ্গ এবং মধুর লীলারসাস্বাদন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ ও ধন্য মনে করেন। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনায় প্রাচীন মহাজন কবি নরহরিদাস লিখিয়াছেন—

"লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নিজগণ সনে।
কৃপা কর নদীয়ার বিহার রঙ্গ মনে॥"

করুণাময় প্রভু আমার বৈষ্ণব-জননী প্রিয়াজিকে এইরূপ তীব্র বৈরাগ্যযোগ শিক্ষা দিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইলেন। নববালা বিষ্ণুপ্রিয়ার নববয়স, নবীন যৌবনের প্রারম্ভমাত্র। এই অল্পবয়সে এরূপ তীব্র বৈরাগ্যযোগ-সাধনা সম্ভবপর নহে, ইহা প্রভু বিলক্ষণ জানিতেন। তাহার উপর প্রিয়াজির মলিন বদন, নীরব ক্রন্দন, উদাস-ভাব দেখিয়া প্রভু বুঝিলেন, ঔষধের ফল ধরিবার বিষয়ে কিছু সন্দেহও আছে। এই কথা যেই প্রভুর মনে উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি দৃঢ়সংকল্প হইয়া পুনরায় তাঁহাকে পতিধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি জানেন, সাধ্বী স্ত্রীলোকের নিকট পতিধর্ম্মই পরমধর্ম্ম, সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি যে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সেই আজ্ঞা প্রতিপালনই যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,—এক্ষণে প্রভু তাহাই বলিতেছেন। পতিব্রতা নারীর পতি-আজ্ঞা পালন ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম নাই। তাই প্রভু এবার স্ত্রীলোকের পতিধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া রোরুদ্যমানা প্রিয়াজিকে কি উপদেশ দিলেন ভক্তিপূর্ব্বক শুনুন—

পতিধর্ম্ম রক্ষা করে সেই পতিব্রতা।
নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি কল্পলতা॥
শুন শুন বিষ্ণুপ্রিয়া না কর ক্রন্দন।
পতি-আজ্ঞা লঙ্ঘিলে কি ধর্ম্মে প্রয়োজন॥ অঃ চৈঃ মঃ

শেষ কথায় সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমার পতিভক্তির চূড়ান্ত ব্যাখ্যান করিলেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নীরবে স্থিরভাবে শুনিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি মুখ তুলিয়া একটিও কথা কহেন নাই। তাঁহার নয়নদ্বয় প্রভুর চরণপদ্মের উপর,—প্রভুর পাদমূলে তিনি বসিয়া আছেন ও তাঁহার শ্রীমুখে তীব্র বৈরাগ্যের কথা শুনিতেছেন। প্রিয়াজির বদন-চন্দ্র শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে, কমল-নয়নের অশ্রুধারায় বসনাঞ্চল সিক্ত হইতেছে। জগদ্-গুরু প্রভু আমার জীবের পরম মঙ্গলকর উপদেশ প্রদান করিতেছেন। প্রিয়াজির সঙ্গে এখন প্রভুর গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। জগতগুরুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রভু করিতেছেন। তিনি পুনরায় সেই কঠোর ব্রতানুষ্ঠানের কথা তুলিয়া প্রিয়াজিকে গম্ভীর-ভাবে বলিলেন।—

"অরুণ উদয়কালে গঙ্গা স্নান করি।
মন্দিরে আসিয়া দিব্য ধৌতবস্ত্র পরি॥
এক মুষ্টি আতপতণ্ডুল ভূমে ফেলি।
একটি তণ্ডুল লইয়া হরেকৃষ্ণ বলি॥
হরিনাম বত্রিশ অক্ষর হৈলে।
সেই তণ্ডুল গুটি থুবে গঙ্গাজলে॥
এই মত তিন প্রহর যত পার।
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে নিবেদন কর॥
সেই অন্ন ভক্ষণ কর দেহ-রক্ষা হেতু।
তোমার চরিত্র লোকে ধর্ম্মশিক্ষা সেতু॥"
জৈঃ চঃ মঃ

প্রভুর এই কঠোর ও কঠিন আদেশ-বাণী সকল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্থিরভাবে শুনিলেন। এই কথাই তিনি পূর্ব্বে আর একবার বলিয়াছিলেন। এখন পুনরায় বলিলেন। পূর্ব্ব দিবসে দুই প্রহর পর্য্যন্ত এরূপ কঠোর ব্রতাচরণের কথা উপদেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে বলিলেন তিন প্রহর পর্য্যন্ত যতপার এইভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবে। ইহাতে দেবী বুঝিলেন, প্রভু তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতায় সন্দিহান হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। সে দুঃখ আর কাহাকে বলিবেন? মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিলে নয়নের ধারায় তাহা প্রকাশ পায়। এক্ষণে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও তাহাই হইল। তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রবলবেগে দরদরিত অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া বসনাঞ্চল ভিজাইয়া দিল। প্রিয়াজির নয়নাশ্রুতে গৃহতল সিক্ত হইল। বৈষ্ণবজননীর উষ্ণ অশ্রুজল জগদ্গুরু প্রভুর পাদপদ্ম ধৌত হইল। প্রভু তখন দেখিলেন ও বুঝিলেন ঔষধের ফল ধরিয়াছে। এক্ষণে কিছু সান্ত্বনাবাক্যের প্রয়ো-জন, তীব্র বৈরাগ্যেযোগের ফল এসময়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এই ভাবিয়া প্রিয়াজিকে তিনি আদর করিয়া মধুর বচনে "বৈষ্ণব-জননী" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নবদ্বীপ-রক্ষার গুরুভার বৈষ্ণব-জননী প্রিয়াজির হস্তে দিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ সূক্ষ্মদর্শী প্রভু আমার তাঁহাকে সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন;—

"শুন সতি, বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব-জননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্ত মনে গুণি॥
কলিকালসর্পে দংশিবে সর্ব্বজীবে।
সংকীর্ত্তন বিনা কিছু না করল সবে॥
তুমি না থাকিলে হবে সংকীর্ত্তন বাদ।
নবদ্বীপ লৈঞা হ'বে বড়ই প্রমাদ॥
মহান্ত বৈষ্ণব উদাসীনে হবে দ্বন্দ্ব।
তুমি সভার মা পুত্রে করাবে আনন্দ॥
বাপ শূন্য পুত্র জীয়ে মায় শূন্য মরে।
ইহা জানি থাক সতি নবদ্বীপপুরে॥
আমার বচন সতি কর অবধান।
তোমার শাশুড়ী যেন দুঃখ নাহি পান॥" জঃ চৈঃ মঃ

এখানে কৃপাময় পাঠকবৃন্দ প্রভুর উপরিলিখিত কথা-গুলির একটু বিচার করুন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমার সর্ব্বদর্শী। তিনি প্রথমেই শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে "বৈষ্ণব-জননী" আখ্যা দিলেন। নবদ্বীপে অনেক পতিত পাষণ্ডীর বাস। তাহারা প্রভুর নিকট মধুর হরিনাম গ্রহণ করিল না। তাহাদেরই উদ্ধারকল্পে প্রভুর এই সন্ন্যাসগ্রহণ। তিনি ত নবদ্বীপে থাকিতে পারিবেন না। তাই এই গুরুভার তাঁহার মুখ্যাশক্তির স্কন্ধে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। স্বয়ংভগবান প্রভু আমার, তাহার পর যুগধর্ম্মের কথা তুলিলেন। "কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" শ্লোকের মর্ম্ম বুঝাইয়া প্রভু প্রিয়াজিকে কহিলেন. "তুমি নবদ্বীপে না থাকিলে আমার এত সাধের হরিসংকীর্ত্তনে বাধা পড়িবে। তাহা হইলেই এই নবদ্বীপ লইয়া বড়ই প্রমাদ হইবে। কারণ নবদ্বীপের লোকের যাহা কিছু বিষ্ণুভক্তি হইয়াছে, তাহা

কেবলমাত্র যুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনের বলে। তাই প্রিয়াজির নিকটে প্রভুর কাতর মিনতি—যেন তাঁহার এত সাধের সংকীর্ত্তনে বাধা না পড়ে। "সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ"প্রভু আমার, —জগজ্জননী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া আমার "সঙ্কীর্ত্তন-জননী"। পিতা মাতার উপর শিশুপুত্রের লালনপালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সুধু তাহাই নহে, প্রভু আর একটি বড় মধুর কথা বলিলেন। উদাসীন বৈষ্ণব,গৃহস্থ বৈষ্ণব ও মোহান্ত প্রভৃতিতে যখন কলহ বিবাদ হইবে, তখন শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মধ্যস্থ হইয়া এই সকল বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সকলের মনে শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিবেন। রঙ্গিয়া প্রভু আবার এইস্থানে প্রিয়াজির সহিত একটু রঙ্গ করিলেন। এখন কিন্তু এরূপ রঙ্গের সময় নহে। তবুও রসরাজ-নদীয়া-নাগর রঙ্গ ছাড়িলেন না। তিনি প্রিয়াজিকে কহিলেন "বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি নবদ্বীপ ছাড়িতে পারিবে না। আমি নদীয়া ছাড়িয়া যাইতেছি। নদীয়াবাসী আমার প্রাণসম, তাহারা আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম; পিতৃহীন বালক মাতৃস্নেহে পালিত হয়, কিন্তু মাতৃহীন বালক মাতার স্নেহের অভাবে মরিয়া যায়। তুমি এখানে না থাকিলে, নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ প্রাণে মরিবে। তাহাদের পক্ষে আমা অপেক্ষা তুমিই বড়।" প্রভু আমার এখানে ভাগবতীয় উত্তম শ্লোক "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" ভগবদ্বাক্যের মর্ম্ম ব্যাখ্যান করিলেন। গৌরবল্লভা প্রিয়াজি শ্রীগৌরভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম ভক্ত। তিনি ভক্ত গোষ্ঠীর সমষ্টি। তাঁহার মত প্রিয় ভক্ত আর কে আছে? তাই চতুর চূড়ামণি প্রভু ভক্তের মান বাড়াইয়া চতুরতার সহিত এই কথাটি বলিলেন। ভক্তের মান বাড়াইতে প্রভু আমার চিরদিন ব্যাকুল। সময় পাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এখানেও প্রিয়াজির তত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশ করিলেন। ইহার পর প্রভু ভাবিলেন তিনি যে প্রিয়াজিকে কঠোর বৈরাগ্যযোগের উপদেশ করিলেন,—তাঁহার বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান, তাঁহার হৃদয়ে শেল হইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৃহে রহিলেন। এই অল্পবয়সে যদি এখন হইতেই ঐরূপ কঠোরতা অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি ভজন সাধন করেন, তাহা হইলে বৃদ্ধা জননীর প্রাণে কষ্টের উপর বিষম কষ্ট হইবে। তিনি প্রাণে মরিয়া যাইবেন। এইজন্য প্রভু আমার সঙ্কেতে প্রিয়াজিকে কহিলেন যে এই সকল ভাবিয়া বৈরাগ্যযোগের কথা যাহা তোমাকে কহিলাম, কঠোর ব্রতানুষ্ঠানের উপদেশ যাহা তোমাকে দিলাম, তাহা এখন তোমার করণীয় নহে। যতদিন আমার বৃদ্ধা জননী প্রকট থাকিবেন, ততদিন তাহা তোমার আচরণীয় নহে। তাই প্রভু বলিলেন—

> "আমার বচন সতি কর অবধান।
> তোমার শাশুড়ী যেন দুঃখ নাহি পান॥"

প্রিয়াজি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। প্রভুর সঙ্কেত-বাক্য তাঁহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি তাঁহার হৃদয়বল্লভের কথার মর্ম্ম বুঝিয়া নীরবে প্রভুর উপদেশ-বাণী সকল অঙ্গীকার করিলেন।

এত কথা প্রভু প্রিয়াজিকে কহিলেন, কিন্তু প্রিয়াজি একটিও কথা কহিলেন না। তিনি কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া প্রভুর মনে সাহস হইল। আরও দুই একটী শেষ কথা বলিবার সুযোগ দেখিয়া ভক্ত-পূজার কথা তুলিলেন। প্রভু প্রিয়াজিকে কহিলেন "দেখ! আমার ভক্তগণ আমা অপেক্ষা বড়। এই নবদ্বীপে আমার অগণ্য ভক্ত বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মধ্যে কয়েকটির মাত্র নাম উল্লেখ করিতেছি। তাঁহারা এক একটি বৈষ্ণববিগ্রহ। আমা অপেক্ষা তাঁহাদিগকে বড় মনে করিয়া পূজা করিবে।"

> "গঙ্গা বিষ্ণুপূজা নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন।
> তুলসী অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রাণধন॥
> হরিদাস ঠাকুর পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
> গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি আদি সুপ্রকাশ॥
> শ্রীরামদাস জগদানন্দ বক্রেশ্বর!
> দ্বাদশ বিগ্রহ মুঞি সবাকার পর॥" জঃ চৈঃ মঃ

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রভুর শ্রীমুখের সকল উপদেশই কণ্ঠহার করিয়া রাখিলেন। কোন কথারই তিনি উত্তর দিলেন না দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাকে শেষ কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। সেই শেষ কথাটি এই :—

> "বিষ্ণুপ্রিয়া! মনে কিছু না ভাবিহ আর।
> তোমারে ছাড়িতে যেন বিষম সংসার॥
> আমি যদি বৈরাগ্য না করিব সংসারে।
> বেদ নিন্দা কলিযুগে ধর্ম্ম না প্রচারে॥
> কুলধর্ম্ম যুগধর্ম্ম আমি না পালিব।
> কেমতে সংসারে লোক ধর্ম্ম প্রচারিব॥"

এই স্থানে প্রভু প্রিয়াজিকে মহাভারতীয় "সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তঃ" শ্লোকের ভাবার্থ বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন,

"শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে বৈরাগ্য প্রধান ঐশ্বর্য্য। কলিযুগে সেই সর্ব্বপ্রধান ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন প্রয়োজনবোধে বৈরাগ্যযোগ-সাধন আমাকে লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং করিতে হইবে। যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে আমার এই অবতার। আমি স্বয়ং আচরণ করিয়া না করিলে তাহা কে করিবে? তোমাকে ছাড়িয়া, সংসার ছাড়িয়া আমি বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিব, ইহাতে আমার সুখ নাই, কিন্তু কি করিব, কলির জীবোদ্ধার কার্য্য লইয়া আমি নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছি। আমাকে তাহা করিতেই হইবে। তুমি ভাবিও না।"

প্রিয়াজি সকলই শুনিলেন। নীরবে প্রভুর সকল কথারই তিনি অনুমোদন করিলেন। স্বামীর উপদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। প্রভু কোন উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয়া তাঁহার উপদেশ মত চলিবেন। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" মহাজন বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া প্রভু তখন সেই গভীর রাত্রিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিলেন। প্রিয়াজি ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর জয়ানন্দ তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থের বৈরাগ্য-খণ্ডে এ সকল কথার সূত্রাকারে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সূত্র লইয়া প্রভু ও প্রিয়াজির বৈরাগ্যতত্ত্বব্যঞ্জক কথোপকথন বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়া আত্মশোধন করিলাম। ঠাকুর জয়ানন্দ লিখিয়াছেন :—

"বৈরাগখণ্ড বিচারিতে যত বাড়ে সুখ।
সে সুখ বৈষ্ণব ভুঞ্জে পাষণ্ডী বৈমুখ॥
আগম নিগম বেদ পুরাণের সার।
বৈরাগ্য শুনিলে সর্ব্বজীবের নিস্তার॥"

প্রভুর বৈরাগ্য বিষয়ক কথাগুলি বড় বিষম, বড়ই হৃদয়বিদারক। কিন্তু মহাজনগণ এ সকল কথা বিচার করিয়া আনন্দ পাইয়াছেন। আমরা এ সকল বিষয় যতই ভাবি, যতই আলোচনা করি, ততই কাঁদিয়া আকুল হই। কলির ভজনই রোদন;—একথাও মহাজনগণ বলিয়া গিয়াছেন। "বালানাং রোদনং বলং" ইহাও মহাজনবাক্য। অধম কলিজীবের পক্ষেও সেই বিধিই বলবান।

প্রভুর আদেশ ও উপদেশবাণীগুলি প্রিয়াজি তাঁহার কোমল হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। সেইগুলি তাঁহার জপমালা হইল। সে রাত্রিতে প্রভুর সহিত আর কোন কথা হইল না। প্রভু শয়নকক্ষ হইতে বহির্গত হইলে শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার শাশুড়ীর গৃহে যাইয়া বিষণ্ণবদনে বসিলেন। শচীমাতা বধূর ম্লান মুখখানি দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রের এত রাত্রে বহির্গমনের কারণ কি। তিনি প্রিয়াজিকে কিছু না বলিয়াই বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া "নিমাই নিমাই" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। মিশ্র-ভবন গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। রাত্রিকালের ডাকে গঙ্গাতীরস্থ লোকজন জাগিয়া উঠিল। প্রভু গঙ্গাতটে বসিয়া হরিনাম করিতেছিলেন, তাঁহার কর্ণেও জননীর স্নেহের ডাক পৌঁছিল। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহে আগমন করিলেন। জননীকে দ্বারে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে দেখিয়া মাতৃভক্ত প্রভুর কোমল হৃদয় মথিত হইল। তিনিও জননীর পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শচীমাতা তাঁহার কৃষ্ণবিরহজর্জ্জরিত রোরুদ্যমান পুত্রের হাত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে গৃহে তুলিলেন।

গৃহমধ্যে মাতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অঝোরনয়নে কান্দিতে লাগিলেন। উভয়েরই নীরব ক্রন্দন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। প্রিয়াজিও গৃহান্তরে দ্বারের অন্তরালে বসিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। নদীয়ার গৌর-গৃহে তিনটি প্রাণী নীরবে রোদন করিতেছেন। তিনজনেরই মনে দারুণ ব্যাথা। ব্যথিত হৃদয়ের মর্ম্মব্যথা সকল তিন জনের অন্তরের মধ্যেই চাপা রহিয়াছে। কেহ কাহারও নিকট আপন মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছেন না। অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শচীমাতা পুত্রকে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন "বাপ্ নিমাই! তুমি এত রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিলে?" প্রভুর তীব্র বৈরাগ্য। তাঁহার মনে বৈরাগ্য ভাব ভিন্ন অন্য ভাবের স্ফূর্ত্তিই নাই। তিনি মস্তক অবনত করিয়া জননীর এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। শচীমাতার কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি কি ভাবিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। শচীমাতা পুনরায় ঐ কথাই বলিলেন। প্রভু তখন একবার মাথা তুলিয়া

জননীরপ্রতি করুণ-নয়নে চাহিলেন। তাঁহার দুই কমল নয়নে অবিরল বারি-ধারা পড়িতেছে,—চন্দ্রবদনখানি মলিন, মুখের ভাব গভীর কাতরতা-ব্যঞ্জক।

শচীমাতা পুত্রের অবস্থা বুঝিলেন। পুত্রের এরূপ অবস্থা ও কাতরভাব দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া গেল। গৌরসুন্দর তাঁহার স্নেহময়ী জননীর দুঃখ বুঝিয়া এবার উত্তর করিলেন। অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন "মা! রাত্রিকালে নির্জ্জনে গঙ্গার শোভা অতি মনোরম বোধ হয়। আমি গঙ্গাদর্শনে যাইয়া গঙ্গাতটে সুখে শয়ন করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম।" শচীমাতার হৃদয়খানি স্নেহের পারাবার। পুত্রস্নেহরসে তাঁহার মনপ্রাণ দেহ সকলই বিগলিত হইল। পুত্রের কথা শুনিয়া তিনি স্নেহভরে উত্তর করিলেন 'ষাট্ আমার! ষষ্ঠীর দাস আমার! রাত্রিতে কি গঙ্গাতীরে শয়ন করিতে আছে? কত ভূত প্রেত পিশাচের দৃষ্টি পড়ে। তোমার মনে একটু ভয়ও কি করে না? আজ হইতে বাপ্! এস তুমি আমার গৃহে আমার সহিত শয়ন কর।" ইহা শুনিয়া প্রভু মনে মনে হাসিলেন। জননীর বাৎসল্যভাবাধিক্য দেখিয়া তিনি আন্তরিক বড় প্রীত হইলেন। তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

শচীমাতা পুত্র ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিলেন। বধূকেও সেই গৃহে শয়ন করাইলেন। মাতৃভক্ত-চূড়ামণি প্রভু আমার মাতৃ-আজ্ঞা পালনে চিরদিন তৎপর। এই সময়ে কিছু দিন ধরিয়া তিনি জননীর গৃহে শয়ন করিতেন, শচীমাতা রাত্রি কালে পুত্রের সহিত বধূর সম্মুখে নানারূপ সাংসারিক কথা কহিতেন। প্রভু শুনিয়া যাইতেন। কিন্তু কোন উত্তর করিতেন না। শচীমাতা দেখিলেন, প্রিয়াজি বালিকা নববধূ। পুত্রের দারুণ কঠোর বৈরাগ্য। বালিকা বধূর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি সকল ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা কালে পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া গৃহে বসিয়া নানারূপ গৃহস্থালির কথা কহিতেন। শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে প্রভুর নিকট কঠোর বৈরাগ্যের উপদেশ পাইয়াছেন, তাহা শচীমাতা জানিতেন না। সেই উপদেশানুসারেই প্রভুর ইচ্ছায় শচীমাতার গৃহে তাঁহার শয়ন। প্রভু আমার প্রিয়াজীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, কৌশলে তাঁহার সমক্ষে তাঁহাকে স্বয়ং আচরণের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করাইলেন।

এসকল কথা প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের কয়েকদিন পূর্ব্বের। ভক্তকবি ঠাকুর জয়ানন্দ প্রভুর গৃহত্যাগের পর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীমুখ দিয়া তাঁহার গভীর গৌর-বিরহ শোকোচ্ছাসপূর্ণ করুণ রসাত্মক বারমাস্যা পদাবলী বাহির করিয়াছিলেন। প্রিয়াজি জানিতে পারিয়াছিলেন, প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন,—তাঁহার দগ্ধ অদৃষ্টে পতিপদ-সেবা-সুখভোগ নাই। তাঁহার জীবন দুঃখের জীবন। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারমাসের দুঃখ বর্ণনার পদটি কেহ কেহ বলেন ঠাকুর লোচন দাসের রচিত, কিন্তু তাহা নহে। এই সুন্দর পদটি ঠাকুর জয়ানন্দ রচিত। পদকল্পতরুর ১৭৮৩ সংখ্যক পদে ঠাকুর লোচন দাসের ভণিতাযুক্ত শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারমাস্যা পদটি লিপিবদ্ধ আছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় কেবল মাঘ মাসের বর্ণনা ব্যতীত আর সকল অংশে তাঁহার সহিত কবি জয়ানন্দের বর্ণিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বারমাস্যার মিল আছে যে অংশটুকু মিলে না তাহা এই:—

"মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব।
এইত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! মোরে লহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস॥

পদকল্পতরুর উক্তপদে ঠাকুর লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত দেখিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারমাস্যা পদটী ঠাকুর লোচন দাসের রচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে! ঠাকুর জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে এই পদটি দৃষ্ট হয়। ঠাকুর লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, ধামালি ও প্রেমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে এই পদটির কোন উল্লেখই নাই।

যাহা হউক শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বৈরাগ্যশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইল তাহা সকলই ঠাকুর জয়ানন্দ-রচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে সংগৃহীত। ঠাকুর জয়ানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপাত্র ছিলেন। এই মহাপুরুষ

সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বন্দ্যঘটির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। মাতার নাম রোদনী। ইনি মহাপ্রভুর শাখা। কবি জয়ানন্দের বাল্যকালের ডাক্‌নাম ছিল "গুইয়া"। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যখন সন্ন্যাসাবস্থায় নীলাচল হইতে গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন, বর্দ্ধমানে আমাইপুর গ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের বাটীতে তিনি একবার পদার্পণ করিয়া তাঁহার গৃহ পবিত্র করেন। সেই সময় জয়ানন্দ ঠাকুরের বাল্যাবস্থা। প্রভু তাঁহার "গুইয়া" নাম পছন্দ করিলেন না। "জয়ানন্দ" নাম তাঁহার প্রভু-দত্ত নাম। কবি জয়ানন্দ মহাপ্রভু-শাখা-সন্তান। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

"সুবুদ্ধি মিশ্র হৃদয়ানন্দ কোমল নয়ান,"

তিনি প্রভুর অনেক লীলারঙ্গ স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আর যাহা দেখেন নাই, তাহা নদীয়ার লোকের মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন। এ কথার আভাস তিনিই দিয়াছেন। যথা, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

"নদীয়ার লোক যত তার তুমি আঁখি।
এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাক্ষী॥"

কবি জয়ানন্দ তাঁহার গ্রন্থে স্বয়ং তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত আত্ম পরিচয় দিয়াছেন,—যথা—

"শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দের জন্ম মাতামহ বাসে॥
গুইয়া নাম ছিল মায়ের মড়াছিয়া বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে॥"

কবি জয়ানন্দ তাৎকালিক হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়া নিম্নলিখিত ভবিষ্যৎ-বাণীটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা,—

——"শূদ্রানী লইয়া ঘর করিবে ব্রাহ্মণে।
কন্যা বেচিবেক যে সব শাস্ত্র জানে॥
ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ী পারস্য পড়িবে।
মোজা পায়ে নড়ি হাথে কামান ধরিবে॥
মনসরিয়াবৃত্তি সে করিবে দ্বিজবরে।
ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবে নিরন্তরে॥
শূদ্র জগৎগুরু হবে, ম্লেচ্ছ হবে রাজা।
রাজা সর্ব্বস্ব হরিবেক দুঃখিত হবে প্রজা॥"

এই ভবিষ্যত বাণী ফলবতী হইয়াছে।

কবি জয়ানন্দ—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল সম্পাদক সুবিখ্যাত বিশ্বকোষ প্রণেতা প্রাচ্য বিদ্যার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে ১৪৩৩ হইতে ১৪৩৫ শকের মধ্যে কবি জয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৪৯২ শকের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন। ভক্তকবি স্বয়ং চামর হস্তে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
প্রিয়াজি বৈরাগ্য শিক্ষা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম-নবদ্বীপ—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ, গৌরাব্দ ৪৪৪—বিজয়া দশমী—১৫ই আশ্বিন ১৩৩৭।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

মঙ্গলাচরণম্।

"সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচবণারবিন্দং॥
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-মাদ্য-মনসো-রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং॥"

"যা গোকুলশ্রীঃ বৃষভানুপুত্রী
যস্যাশ্চসখ্যৌ ললিতাবিশাখে।
সা কৃষ্ণকান্তা স্বয়মাবিরাসীৎ
বিষ্ণুপ্রিয়াসৌ ব্রজভক্তিরূপা॥"

রাধা মুকুন্দং নিজভাবলুব্ধং
মাশ্লেষভঙ্গ্যাদ্যুতিমর্পয়িত্বা।
নীত্বা চ স্বান্তঃ প্রমদোন্মদান্ধা
তস্যানুযোগ্যাং ব্যদধাৎ স্বমূর্ত্তিম্॥"

"শ্রীগৌরবিষ্ণোর্নিজশক্তিরূপা-
প্যঙ্গীকৃতাশেষরসস্বভাবা।
মাধুর্য্যলীলাসুখসারদাত্রী
শৃঙ্গারভাবৈক্যরসাত্মকস্য।"

"রাধায়াঃ প্রিয়কারিণ্যৌ বিশাখা ললিতে যথা।
বিষ্ণুপ্রিয়া মহাদেব্যা স্তথৈব কাঞ্চনামিতে॥
নীলাচলে যথা গৌরদেবস্য ভাবরূপিণৌ।
রামানন্দস্বরূপৌদ্বাবন্তরঙ্গসখৌসদা॥"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

আদি খণ্ড।

"ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
প্রভুর প্রেয়সী যিঁহো,—তাঁহার কি কথা।
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥
তাঁহার অসাধ্য কিবা,—নামে এত আর্ত্তি।
নাম লয়েন,—তাহে রোপেন প্রভুর শক্তি॥" প্রেমবিলাস

(১)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সখিগণের মধ্যে কাঞ্চনা ও অমিতা প্রধানা—শ্রীমতি রাধিকার যেমন ললিতা ও বিশাখা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দকে লইয়া গভীর নিশীথে নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদন করিতেন। তাঁহার স্বরূপশক্তি স্বয়ং ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী নদীয়ার গৌরশূন্য গৌরগৃহরূপ মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া তদ্রূপ নির্জ্জনে তাঁহার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয়—কাঞ্চনা এবং অমিতাকে লইয়া গৌরপ্রেমরসাস্বাদন করিতেন। যে তত্ত্বে ও যে শাস্ত্রমতে স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ শ্রীরাধিকার সখি ললিতা ও বিশাখা নামে খ্যাত—সেই তত্ত্ব ও শাস্ত্রমতেই কাঞ্চনা ও অমিতা শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় ললিতা ও বিশাখার বিশিষ্ট আবির্ভাব। ললিতা ও বিশাখা যেমন শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ, কাঞ্চনা ও অমিতাও তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর কায়ব্যূহ।

নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকার অন্তরঙ্গা সখি ললিতার ও বিশাখার ভাবে বিভাবিত হইয়া রাধাভাবেবিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্রজরস-নাগর-চূড়ামণিকে যে ভাবে ব্রজপ্রেমরসাস্বাদন করাইতেছেন—ঠিক তদ্রূপ ভাবেই নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার গৌর-গোবিন্দ-রূপের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্ব-স্বরূপে এবং স্বয়ং ভাবেই তাঁহার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা সহ নিগূঢ় নবদ্বীপরসাস্বাদন করিতেছেন। নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ রাধাভাবে বিভাবিত—আর নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার শ্রীগৌরগোবিন্দ স্বরূপের স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্ব-স্বরূপে, স্ব-স্বভাবে এবং স্বভাবেই বিরাজমানা—এখানে তিনি শ্রীরাধিকাই—তিনি অন্য কোন স্বরূপের বিশিষ্টভাব মাত্র অঙ্গীকার করেন নহে,—স্বয়ং আবির্ভাবহেতু লীলানু-যায়ী সকল কান্তাভাবই তাঁহাতে সম্যক্‌ভাবে অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং লীলারঙ্গোদ্দেশে তাহা যথাসময়ে সমুদিত হয়। অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নদীয়ায় এই যে মহা-গম্ভীরা-লীলারঙ্গ—ইহা অতিশয় অনির্ব্বচনীয় ও চমৎকার ভাবমাধুর্য্যে বিভাবিত ও বিমণ্ডিত এবং ভাবরাজ্যে অতুলনীয় ভাবসম্পদে বিভূষিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরূপশক্তি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী প্রেম-ভক্তিস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অপূর্ব্ব লীলা-বৈভব এবং

তাঁহার লীলা-বৈচিত্রী ও লীলাবৈশিষ্ট অত্যুজ্জল এবং উন্নতোজ্জল রস-সম্ভারে পরিপুরিত। নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ ললিতা ও বিশাখার ভাবে বিভাবিত—আর নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে কাঞ্চনা এবং অমিতা সখিদ্বয় স্বরূপতঃই ললিতা ও বিশাখার বিশিষ্ট আবির্ভাব। তাঁহারা স্ব-স্বরূপেই তাঁহাদের প্রিয় সখি গৌর-গোবিন্দ-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত আছেন—বিরহিণী প্রিয়াজীকে তাঁহারা অশেষ বিশেষে সর্ব্বভাবে গৌরপ্রেমরসাস্বাদন করাইতেছেন এবং তাঁহারা নিজেও করিতেছেন। অতএব নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-লীলারস-মাধুর্য্যের বিশিষ্টতা ও অপূর্ব্ব চমৎকারিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা অস্বীকার করিলে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের অসমোর্দ্ধ লীলারস-মাধুর্য্যকে সঙ্কোচ করা হয়।

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ-বল্লভা শ্রীমতি রাধিকার আবির্ভাব বিশেষ—সুতরাং তাঁহার নদীয়ার মহা গম্ভীরা-লীলার বিশিষ্টতা অবশ্যই আছে। সেই লীলাবৈশিষ্টই তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত অনুগত একান্ত ভক্তগণের বিশিষ্ট ভজন-সম্পদ। এই বিশিষ্ট ভজন-সম্পদের অধিকারী হওয়া বহু ভাগ্যের কথা—আর ইহাতে বঞ্চিত হওয়া বহু দুর্ভাগ্যের কথা। শ্রীশ্রীগৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের মুখ্যাশক্তি—এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই।

প্রকট লীলায় অপ্রকট-ভাব-মাধুর্য্যই সবিশেষ আস্বাদনীয়—এই ভাবেই ব্রজলীলার সর্ব্বভাবে ও সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীধাম নবদ্বীপে মায়াপুরযোগপীঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াসমন্বিত ও নাগরীগণবেষ্টিত শ্রীশ্রী-গৌর-গোবিন্দের যে পুষ্পোদ্যান-নিত্যরাস-লীলা-রহস্য,—তাঁহার লীলাশক্তির অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবেই এক্ষণে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইতেছে। এই লীলারহস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চিহ্নিত দাস শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর ভজন-সম্পদ। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই লীলারহস্য কিঞ্চিন্মাত্র উট্টঙ্কিত আছে। এই অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় প্রকাশভেদে লীলা-ভেদ-রহস্য শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের একান্ত অন্তরঙ্গ প্রিয়তম নিত্য পরিকরবৃন্দের সহিত সাধারণ-ভক্তের অগোচরে এবং অলক্ষিতভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর যোগপীঠে অনাদি অনন্তকাল হইতে নিত্য প্রকাশিত। এই অপূর্ব্ব রাসলীলারঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের রসরাজত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্যকভাবে পরিদৃশ্যমান—তাঁহার মহাভাবাভিমানত্বের কোনরূপ সম্বন্ধ এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গে নাই। ইহারই নাম প্রকাশভেদে লীলা-ভেদ-রহস্য। শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের ঠাকুর নরহরি-পরিবার শ্রীগৌরগোবিন্দের পরম রসিক ভক্তবর শ্রীপাদ রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহাশয়,তাঁহার সম্পাদিত "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী" গত শ্রাবণ-ভাদ্র-সংখ্যা শ্রীপত্রিকায় এই প্রকাশ-ভেদে লীলাভেদ রহস্যটী অতি সুচারুভাবে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে কৃপাময় পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা পাঠ করিলে এই নিগূঢ় তত্ত্ব সকলই বুঝিতে পারিবেন।

এতক্ষণ ভণিতা গেল। পূজ্যপাদ কবিরাজ, গোস্বামী লিখিয়াছেন—

——"তত্ত্ব বলি না কর অলস।"
যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে হয় সুদৃঢ় লালস॥"——

তত্ত্বকথা লীলাকথার সহিত সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব ও মধুর রস উদ্গীরণ করে—লীলাবাদ ও তত্ত্ববাদ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে ভজনরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দুইটীর সমন্বয়ে যে লীলারসাস্বাদন,—তাহাই মহাজনানুগত প্রকৃষ্ট ভজনপন্থা।

কার্ত্তিক মাস—দিন ছোট হইয়াছে—শীতের প্রারম্ভ। গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের ভজন-পন্থা কঠোর হইতে কঠোরতমরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার অন্তরঙ্গা মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতার মনে বড় দুঃখ—ইহা তাঁহাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। তাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্র সোয়াস্তি নাই—সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়সখির গৌর বিরহানল-জ্বালা নিবারণের নব নব উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন।

সে দিন মহাতপস্বিনী গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি সমস্তদিনের কঠোর ভজনান্তে সন্ধ্যার প্রাক্কালে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া গৌরশূন্য গৌর-গৃহের উন্মুক্ত অলিন্দের বাতায়ন-পথে বসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় সহ গৌরকথা আলাপন করিতেছেন। নদীয়া-গগনে সূর্য্যদেব ডুবু ডুবু হইয়াছেন—গঙ্গা-তীরে অপূর্ব্ব রক্তিম শোভা হইয়াছে। ধীরে ধীরে চন্দ্রোদয়

হইতেছেন—শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিরহে যেন চন্দ্রদেবও বিরহাকুল ভাবে মলিনবেশে উদয় হইতেছেন। বিরহিণী প্রিয়াজি সখিদ্বয় সহ নদীয়া-গগনে চন্দ্রোদয়কালীন শশধরের এই গৌরবিরহ-কাতরভাব অনুভব করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—আকাশের পানে তাঁহারা তিন জনেই একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—হস্তে হরিনামের মালা—নয়নে প্রেমাশ্রুধারা—গৌরশূন্য গৌর-গৃহের মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে যেন মূর্ত্তিমতী নীরবতার আবির্ভাব হইয়াছে।

এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সখি অমিতা তখন গৌরকথা আরম্ভ করিলেন।

"অমিতার গৌরকথা কাঞ্চনার গান।
বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়ার রাখয়ে পরাণ॥"

সখি অমিতা অতি ধীরে ধীরে তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতার সহিত বিরহিণী প্রিয়াজির বিষণ্ণ বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"সখি! তোমার প্রাণবল্লভ নদীয়ানাগর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গুণগান তোমার মুখে কিছু শুনিতে বড় সাধ হইয়াছে। সখি! তুমি তোমার প্রাণবল্লভের গুণগাথা কিছু বল—আমরা শুনিয়া ধন্য হই।"

গৌরবিরহিণী-প্রিয়াজি তখনও জপমগ্না—তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গৌরনাম জপ করিতেন—জপমগ্নাবস্থায় প্রেমাশ্রু-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত—এবং তিনি বারম্বার শ্রীনীলাচলধামের উদ্দেশে ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিতেন। যথা, পদাবলী সাহিত্যে,—

"বিষ্ণুপ্রিয়া নববালা, হাতে লয়ে জপমালা,
কুই কুই জপে গৌর নাম।
নবীনা যোগিনী ধনি, বিরহিণী কাঙ্গালিনী,
প্রণময়ে নীলাচল-ধাম॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধুলা মাখা, লম্বাকেশ এলোচুলা,
সোণার অঙ্গ অতি দুরবল।
বলরামদাস কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
মুছায়ে দাও দেবী-আঁখি-জল॥"

সখি অমিতার কথা শ্রবণে বিরহিণী প্রিয়াজি জপ সমাপন করিয়া প্রেমাশ্রুনয়নে অতি মৃদু প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন,—

"সখি অমিতে। আমি গৌরকথা বা গৌর-গুণ-গাথা কিছুই জানি না—তোমরা নদীয়া-নাগরী—তোমাদের ভাণ্ডারেরই নিজস্বধন গৌরকথা এবং গৌর-গুণ-গাথা। সখি! তোমরাই গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী! সখি কাঞ্চনা এবং তুমি গৌর-কথা-গানে আমার মত অভাগিনী জীবন্মৃতার এতদিন প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছ। তোমরা যদি না থাকিতে, আমার অদৃষ্টে আজ কি হইত সখি! বল দেখি,—তোমরা গৌর-কথা বল,—গৌর-গুণ-গাথা গান কর—আমি শুনিয়া ধন্য হই!" এই বলিয়া প্রিয়াজি নীরব হইলেন। তখন সখি অমিতা মৃদুকণ্ঠে গান ধরিলেন—

যথা রাগ।

——"প্রভাত হ'লে, গৌর ব'লে, শয়ন হ'তে উঠিয়া
গৌরহরি, স্মরণ করি, হৃদয় উঠে মাতিয়া॥
প্রভাত বায়, বহিয়া যায়, গৌরগান গাহিয়া।
তরুর শাখে, পাপিয়া ডাকে, গৌর-নাম অমিয়া॥
তরুণ রবি, গৌর-ছবি, সোণার রং মাখিয়া।
কিরণ ধারে, অমিয়া ঢালে, জগতময় ছাইয়া॥
আকাশ গায়ে, মেঘের ছায়ে, গৌর-রূপ হেরিয়া।
গৌর-নামে, গৌর-গানে, উঠেছে জীব-মাতিয়া॥
রূপের ডালা, শচীর বালা, চলেছে যেন নাচিয়া।
কিরণ ছটা, রূপের ঘটা, ভুবন আলো করিয়া॥
ভরিয়া আঁখি, সেরূপ দেখি, আপনা হারা হইয়া।
চৌদিকে হেরি, গৌরহরি, নয়ন গেল ধাঁধিয়া॥
ধরিতে নারি, নয়নে বারি, জনম গেল কাঁদিয়া।
হরিদাসিয়ার, পাষাণ হৃদয়, গেল না কেন ফাটিয়া॥"——

গৌরগীতিকা।

গান শুনিয়া প্রিয়াজি প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইলেন,—সখি অমিতার গৌরপ্রেমের গভীরতার প্রভাব দেখিয়া তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হইলেন—কি বলিয়া সখিকে ধন্যবাদ দিবেন—তাঁহার মুখে সে ভাষা আসিতেছে না—প্রিয়াজির চোক্ মুখ দিয়া যেন মূর্ত্ত প্রেমানন্দের পরম কমনীয় জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে—তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া এক হস্তে পরম প্রেমাবেশে সখি অমিতার গলদেশ বেষ্টন করিয়া অপর হস্তে তাঁহার চিবুক খানি ধরিয়া পরমাদরে প্রেমগদগদকণ্ঠে কহিলেন—"সখি! তোমার গৌরপ্রেমের গভীরতার কণাবিন্দুও যদি আমার হৃদয়ে থাকিত, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ

হইতাম। তুমি গৌরময় জগৎ দেখিতেছ—সর্ব্বত্র তোমার গৌরস্ফূর্ত্তি—এ সৌভাগ্য সখি! আমার কি কখনও হবে?', সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া প্রিয়াজি পুনরায় কহিতেছেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমিই বল দেখি, সখি অমিতার মত সর্ব্বভূতে গৌরদর্শনসৌভাগ্য আমার মত হতভাগিনীর যদি হইত, তাহা হইলে তোমাদের নদীয়া-নাগর নবদ্বীপচন্দ্র আর নীলাচলে থাকিতে পারিতেন না।" —এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে বদন লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা এতক্ষণ গৌরকথার শ্রোতা ছিলেন—এখন আর তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কলকণ্ঠে গৌর-রূপ-গুণগান অতি মধুর ঝঙ্কৃত হইল। তিনি তখন তাঁহার গীতের ধুয়া ধরিলেন,—

যথা রাগ।

গৌর হে!

(তব)—রূপ হেরি যবে, সাধ হয় মনে
(যদি) সর্ব্বেন্দ্রিয় আঁখি হ'ত।
আমি—পরাণ ভরিয়া, রূপ নিরখিয়া,
পাইতাম সুখ কত॥
তব—গুণ শুনি সবে, মনে ভাবি আমি
(যদি) সর্ব্বেন্দ্রিয় হ'ত কান।
পরাণ ভরিয়া, গুণ গাথা শুনি,
জুড়াইত মোর প্রাণ॥
তব—গুণ গাহি যবে, মনে হয় মোর,
(যদি) সর্ব্বেন্দ্রিয় হ'ত জিহ্বা।
মনের সাধেতে, গাহিতাম গুণ,
উচ্চৈঃস্বরে নিশি-দিবা।
তব,—সোণার অঙ্গে, মহ মহ করে,
সতত পদ্ম গন্ধ।
মনে ভাবি আমি, ইন্দ্রিয় সকলি,
(কেন) হয় না নাসিকা-রন্ধ্র॥
তব—শ্রীঅঙ্গ-মাধুরী, পরশ লালসে
(যবে) ত্বক হয় লালায়িত।
মনে ভাবি আমি, সর্ব্বেন্দ্রিয় যদি,
ত্বকে হ'ত পরিণত॥
আমি—পরাণ ভরিয়া, অঙ্গ আলিঙ্গিয়া,
জুড়াতাম হৃদি-জ্বালা।
সব সুখ ভুলি, পরশের সুখে,
হইতাম আমি ভোলা॥
আমি—সুখ নাহি পাই, একেন্দ্রিয়ে সেবে
তোমার মাধুরী রাশি।
একই সময়ে, সরব ইন্দ্রিয়
বাদ সাধে কেন আসি॥
আমি—এই বর চাই, একেন্দ্রিয় দ্বারে
(যবে) অনুভবি তব সঙ্গ।
মোর—অন্যেন্দ্রিয়, রোধ করে দিয়ে
(তুমি) কর মোর সনে রঙ্গ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে, একই সময়ে
সেবা নাহি করা যায়।
অপূরণ রহে, হৃদয়ের সাধ,
(মোর) যায় নাক' হায় হায়॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় মোর, এক হয়ে যাক্,
(আমি) যে সেবা যখন করি।
হরিদাসিয়ার জীবনের সাধ
পুরাও গৌরহরি॥"

বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে এখনও শায়িতা—তিনি তাঁহার প্রিয় সখি কাঞ্চনার গৌরপ্রেমের গাঢ়তা এবং গৌরসেবানুরাগের গভীরতার পরম চমৎকার ভাব দেখিয়া পরম প্রেমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি তখন আপনিই উঠিয়া বসিলেন। পরম প্রেমভরে দুই হস্ত দ্বারা সখিদ্বয়কে তাঁহার দক্ষিণ ও বাম ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া প্রেমালিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। নিজ প্রেমাশ্রুসিক্ত বদনখানি সখি কাঞ্চনার বক্ষের বসন মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার আর কোন কথা বলিবার সামর্থ নাই—শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার নয়নাশ্রুধারা গৌর-শূন্য গৌর-গৃহ পরিপ্লাবিত করিয়া যেন প্রেমের বন্যা বহিল। অথচ সকলেই নীরব—নির্জ্জন ভজনের এই ত রীতি—ইহাই ত ফল। কলির ভজনই রোদন—এই রোদনের ধ্বনি নাই—হাহাকার নাই—অঙ্গাস্ফালন নাই,—আছে কেবল আকুল প্রাণের সঘন স্পন্দন—আছে কেবল গৌরবিরহাকুল মন-

প্রাণের মর্ম্মান্তিক বেদনা—যাহার অনুভূতি তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের মত সুখদায়ক।

এইভাবে কিছুক্ষণ গেল—সন্ধ্যাকালেই নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের দাসদাসী পশুপক্ষী সকলেই যেন নীরব—সকলেই যেন বিরহিণী প্রিয়াজির নীরব প্রেমক্রন্দনের অংশীদার—সমবেদনাসূচক গভীর নীরবতার ভাব দেখাইয়া তাহারাও এই সন্ধ্যাকালেই প্রিয়াজির গভীর রাত্রির নির্জ্জন-ভজনের সহায়তা করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি অতি ক্ষীণ ও মৃদুকণ্ঠে প্রিয় সখি কাঞ্চনার দু'টী হস্ত ধারণ করিয়া প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমিই আমার গৌরপ্রেমের শিক্ষয়িত্রী—এত কথা তুমি সখি! কোথায় শিখিলে? আমি ত তোমার এই পরম মধুর ভাবের কথার মর্ম্ম কিছুই জানিতাম না—তোমার এই আত্মনিবেদনে আমার আজি অনেক শিক্ষা হইল—সখি! তুমিই আমার গৌর-প্রেমের গুরু। তুমি আমার মত হতভাগিনীকে কৃপা না করিলে—গৌরকথা বলিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল না করিলে, এত দিন কোন কালে আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম।"

সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির এই দৈন্যকথার কি উত্তর দিবেন তাই ভাবিতেছেন—তাঁহাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই অতি বিনীতভাবে করযোড়ে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহাকে আর একটী গান করিতে অনুরোধ করিলেন। সখি কাঞ্চনা পরম লজ্জিত হইয়া এখন উত্তর করিলেন—"সখি! তুমি এরূপভাবে আমাকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করিলে আমার দ্বারা তোমার আর কোন কাজই হইবে না। আমি তোমার আজ্ঞাবাহিনী দাসী মাত্র—তুমি আদেশ করিতেছ, আমি গান গাই,—তবে শুন"—এই বলিয়া কাঞ্চনা মধুকণ্ঠে গানের ধুয়া ধরিলেন।

যথা রাগ।

"এস গৌর এস!
(আমার) হৃদয় আসনে এসে বস হে!
এস গৌর এস হে। ধ্রু॥
(আমি) নয়ন ভরিয়া তোমায় হেরি হে!
এস হৃদি মাঝে, নব নটবর সাজে
যুগল হইয়ে দাঁড়াও হে!
বামে বিষ্ণুপ্রিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া
রসরাজ বেশে এস হে!
পিরীতের হাসি, প্রেম পরকাশি,
দু'জনার মুখে হেরি হে।
তেরছ নয়নে চাহ কার পানে,
(বড়) রসিক-শেখর তুমি হে!
বিনোদিনী সনে, হৃদয় আসনে,
একবার এসে বস হে!
যুগল মাধুরী দু'নয়ন ভরি,
হৃদি মাঝে আমি হেরি হে!
বড় সাধ মনে, হেরি তোমা সনে,
যুগল রূপের ডালি হে!
সেই রূপে এস, হৃদি-কুঞ্জে বস,
দু'জনারে আমি পূজি হে!
রসিক শেখর তুমি নটবর,
রসরঙ্গে মাতি এস হে!
প্রেমরসে মাতি করিবে আরতি,
চিরদাসী হরিদাসী হে!" গৌর-গীতিকা।

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি এবার তাঁহার মলিন বদনচন্দ্র-খানি বিনত করিয়া অতি ধীর ও গম্ভীরভাবে নিজ হস্তের নখাঙ্গুলি খুঁটিতে খুঁটিতে গান শেষ হইলেই তিনি তদবস্থার থাকিয়াই অতি মৃদু-ক্রন্দনের সুরে সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"ইহা ত প্রকৃত গৌর-গুণ-গান নহে—ইহার সঙ্গে আমার মত অভাগিনীর নাম সংযুক্ত করিয়া তুমি সখি! এমন সুন্দর গৌর-গুণ-গানের মধুরতা নষ্ট করিয়াছ। যাহা হইবার নহে—যাহা একেবারেই অসম্ভব—সে কথা তুলিয়া আমার মত মন্দভাগিনীকে কেন তুমি সখি! লোকচক্ষে উপ-হাসাস্পদ করিতেছ?" এইমাত্র বলিয়া গৌরবল্লভা কান্দিয়া আকুল হইলেন—তিনি আর বসিতে পারিলেন না—ভূমিতলে সর্ব্বাঙ্গ লুণ্ঠিত করিয়া নীরব ক্রন্দনের নয়নধারায় গৌরশূন্য গৌরগৃহের ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তখন বড়ই বিপদে পড়িলেন। বিরহিণী প্রিয়াজিকে এখন শান্ত করা বড় কঠিন—তাই ভাবিয়া প্রগাঢ় চিন্তায়

উভয়েই মগ্ন হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণে পূর্ব্বস্মৃতি সকল উদয় হইয়াছে—তাঁহার প্রাণবল্লভের নবদ্বীপ-লীলার পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে বিরহিণী প্রিয়াজির মনে সমুদিত হইয়া তাঁহাকে বিষম বিরহাকুল করিয়াছে—তিনি নদীয়ায় মহাগম্ভীরা-মন্দিরের অলিন্দের ভূমিতলে ধূল্যবলুণ্ঠিতদেহ হইয়া পরম ব্যাকুলতার সহিত নিরন্তর গড়াগড়ি দিতেছেন— আর "হা নাথ। হা প্রাণবল্লভ !! হা নবদ্বীপচন্দ্র !!!" এই বলিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে করুণ রোদন করিতেছেন! সখিদ্বয় তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না—ক্ষীণকায়া জীর্ণশীর্ণা বিরহিণী প্রিয়াজির গাত্রে যেন আজ বল ধরে না— কাঞ্চনা ও অমিতা ইহা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া সমস্বরে গৌরকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন—

"শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র !
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র !
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর !
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর !!"

নীরবতাপূর্ণ নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে তখন উচ্চসঙ্কীর্ত্তনের রোল উঠিল—অপর সখিগণও তখন সেখানে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। নদীয়ার মহা গম্ভীরা মন্দিরে তখন মহা-সঙ্কীর্ত্তন-রাসরসের প্রেম-প্রস্রবণ ছুটিল—সে প্রেম-প্রস্রবণের তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে জীবজগতের প্রাণে প্রেমানন্দের তুফান উঠাইল—জগজ্জীবের মনে এক অনির্ব্বচনীয় অভূতপূর্ব্ব প্রেমসুধারসের উৎস ছুটাইল। স্থাবর জঙ্গমাদি এই প্রেমতরঙ্গে হাবুডুবু খাইল। নদীয়া-নাগরীবৃন্দ তখন গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে মধ্যস্থলে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বেড়াকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী ॥"

এইভাবে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করার পর বিরহিণী প্রিয়াজি আত্মসম্বরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি আপনা আপনিই উঠিয়া বসিলেন,—সর্ব্ব সখিবৃন্দকে একত্রে দেখিয়া তিনি পরম লজ্জিতা বোধ করিলেন। সখি কাঞ্চনা নিকটেই ছিলেন,—প্রিয়াজি তাঁহাকে আরও নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন—তিনি নিকটে আসিলে দুই সখীতে যেন একাঙ্গীভূত হইলেন এবং অতি মৃদুমধুরস্বরে প্রেমগদগদবচনে কহিলেন,—"সখি! এত লোক এখানে কেন? এত গোলোযোগ কেন? আমি কি কিছু চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম—আমি যে কি করিয়াছিলাম—তাহা ত আমার মনে নাই! সখি! সখি সমাজে আমি আর এ কালা-মুখ দেখাইতে চাহি না।" এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি নিজ বসনাঞ্চলে বদন আবৃত করিয়া সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে মাথা গুজিয়া পড়িয়া রহিলেন! আর কোন কথা নাই। নদীয়া-নাগরীবৃন্দ কীর্ত্তন স্থগিত রাখিয়া কাঞ্চনার ইঙ্গিতে ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে পুনরায় গভীর নীরবতার রাজ্য বিস্তার হইল—কাহারও মুখে কোন কথা নাই—এখন রাত্রি পাঁচদণ্ড হইবে,—প্রিয়াজির নির্জ্জন ভজনের সময় হইয়াছে। সখি কাঞ্চনা সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তখন আর একটী গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ হে!

"কাঁদাতে প্রিয়ায় এত সাধ কেন
বল বল দয়াময়।
আশ্রিত জনে, দুখ দিয়ে এত,
কি সুখ তোমার হয় ॥ধ্রু॥
নয়নে চাহ না কাঁদিলে দেখ না,
এ কেমন ভালবাসা।
মরিলে কি হবে জানিতে চাহি না,
(তুমি তারে) জীবনে না দিলে আশা ॥
(তব) চরণের তলে লুটায়ে লুটায়ে,
কাঁদে সখি নিশিদিন।
(ওহে) দীনের দয়াল, দয়া কি হয় না,
দেখে দশা দীনহীন ॥
একটি আশার কথা কি জান না,
(তার) জুড়াইতে হৃদিজ্বালা।
একবার ফিরে, চাহিয়া দেখিলে,
(বুঝি) মান যাবে শচী-বালা!
তোমার ধরম, তুমিই জান হে,
মোরা কিন্তু মরিলাম।

তোমার দরশ, লাভের আশায়,
প্রাণপাত করিলাম ॥
দেখেও দেখ না দয়াল ঠাকুর,
(লোকে) কেন গো তোমারে বলে।
কি দয়া দেখালে, বিষ্ণুপ্রিয়ারে,
বল দেখি মোরে খুলে ॥
অভিমানে কাঁদি, কখনও বা রাগি
কত কথা বলি তোমা।
(আবার) সাধিয়া সাধিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কতবার চাহি ক্ষমা ॥
দয়া করিবে না, দুখ বুঝিবে না,
ওহে দুখহারী নাথ!
দুখী হরিদাসী, করিছে চরণে,
কোটি কোটি প্রণিপাত ॥" গৌরগীতিকা।

গৌর-পাগলিনী সখি কাঞ্চনার সরল প্রাণের অকপট এবং সকাতর আত্ম-নিবেদন নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল—তখন তিনি ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি ইষ্টগোষ্ঠী ভঙ্গ করিয়া উঠিলেন—ভক্তগণকে বিদায় দিয়া গম্ভীরার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত ভক্তগণের ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই কারণ নাই,—কারণ তাঁহারা জানেন মহাপ্রভুর নির্জ্জন ভজনের সময় উপস্থিত—এরূপ তিনি করিয়াই থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপশক্তির প্রবল আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্ব-স্বরূপের আবির্ভাব হইল। নদীয়ার মহা-গম্ভীরা মন্দিরে অকস্মাৎ মালতীপুষ্পের সুগন্ধি সৌরভে গৌরশূন্য গৌরগৃহ পরিপূরিত হইল—মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের যে স্থানে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার অন্তরঙ্গা মর্ম্মী সখিদ্বয় সহ নীরবে গৌরভজন করিতেছিলেন—ঠিক সেই স্থানের পুরোভাগে বাহির বারান্দার একটী স্তম্ভে হেলান দিয়া বংশীধারী শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি দেখিলেন বংশীধারী, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ভাবে তাঁহার প্রাণবল্লভ তেরছ নয়নে দণ্ডায়-মান—বামে স্বয়ং প্রিয়াজি দক্ষিণে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া,—তাঁহার উভয় পার্শ্বে কাঞ্চনা অমিতা প্রভৃতি নদীয়া-নাগরীবৃন্দ মৃদঙ্গ মন্দিরা বীণা শিঙ্গা ডমরু খোল করতাল লইয়া প্রেমানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান—মধ্যস্থলে যোগপীঠ তদুপরি রত্নসিংহাসন-বেদী—সেই অপূর্ব্ব মণিরত্ন-বিভূষিত বেদিকার উপরে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের নিত্য মহা-রাসলীলা হইতেছে। নদীয়া-নাগরীবৃন্দ কীর্ত্তনলম্পট নদীয়া-নাগর নটনর্ত্তনকারী অপূর্ব্ব শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দমূর্ত্তিকে ঘিরিয়া নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সংযোগে মধুর সুর তাল লয় সংযুক্ত নৃত্যকীর্ত্তনগীতে অনির্ব্বচনীয় প্রেম-রসাস্বাদন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রীনবদ্বীপ যোগপীঠে পুষ্পোদ্যান-রাসলীলারঙ্গ বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতার চক্ষের উপর যেন বিদ্যুৎমালার ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইল—ইহা স্বপ্ন নহে—প্রত্যক্ষে দর্শন—তবে ক্ষণিকের জন্য! বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় এই অদ্ভুত লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—সেখানে আর অন্য কেহ নাই,—কে কাহাকে দেখে—কিছুক্ষণ এই ভাবেই গেল,—তিন জনে তিন দিকে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছেন। এমন সময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দরূপে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র পুনরায় সেখানে আবির্ভূত হইয়া সখি কাঞ্চনার নিকট গিয়া তাঁহার কাণের কাছে মধুর বংশীধ্বনি করিলেন,—এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিবা মাত্র তিন জনেরই প্রেম-মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল—সেই মধুর অপূর্ব্ব মূরতি মূর্চ্ছাভঙ্গে আর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না—কিন্তু তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি যেন তখনও সকলের কর্ণে বাজিতেছে। সখি কাঞ্চনা তখন বিরহিণী প্রিয়াজির হস্ত ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রুবিগলিতনয়নে তাঁহার বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া স্বভাবসিদ্ধ মধুকণ্ঠে গানের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ ধানসী।

"সখি! এত কভু গৌর নয়।
উহার গোরা-রূপের মাঝে মাঝে কাল বরণ ঝলক দেয়।" ধ্রু।

বিরহিণী প্রিয়াজি এতক্ষণ কোন প্রেমরাজ্যে যে ছিলেন তাহার ঠিকানা নাই—তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের অপরূপ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-রূপ দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছেন—আবার সখি কাঞ্চনার গান শুনিয়া তাঁহার মনে একটা বিষম ধন্দও লাগিয়া গেল। তিনি কিছুই বলিতে ও বুঝিতে পারিতেছেন না। সখি অমিতা ইহাঁদের মনোভাব বুঝিয়া কাঞ্চনাকে বলিলেন—সখি কাঞ্চনে! তোমার মনে আজ

এভাব উদয় হইল কেন? আমাদের নদীয়ানাগর নবদ্বীপ-চন্দ্রের নদীয়া-লীলায় ত তিনি মাথায় শিখিপাখা বাঁধিয়া তাঁহার বয়স্যগণের সহিত লীলারঙ্গ করিতেন। এই বলিয়া তিনি একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ সুহই।

"চাঁচর চিকুর চারু ভালে।
বেড়িয়া মালতীর মালে॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
পত্রের সহিত ফুল-শাখা॥
কষিত-কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ॥
চন্দন তিলক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে॥
নটবর বেশ গোরাচাঁদে।
রমণী কুলের কিবা ফাঁদে॥
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।
প্রাণ মোর স্থির নাহি বান্ধে॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিনী।

গান শুনিয়া প্রিয়াজি ও কাঞ্চনার মনের ধন্ধ অনেকটা গেল বটে। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রীহস্তে তাঁহারা বংশী দেখিয়াছেন—সেটাও একটা সন্দেহ। সখি অমিতা মনো-ভাব বুঝিয়া সময়োচিত প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ সুহই।

"কে গো ঐ গৌর বরণ, বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন,
চিন চিন চিন যেন করি।
এই না নন্দের গোপাল, যশোদার জীবন-দুলাল,
আইল করি গোপীর মন চুরি॥
শিরে ছিল মোহন চূড়া, এবে মাথা কৈল নেড়া
কৌপিন পরিল ধড়া ছাড়ি।
গোপীমন মোহনের তরে মোহন বাঁশী ছিল করে,
এবে সে হৈল দণ্ডধারী॥
নীপতরু মূলে গিয়া, অধরে মুরলী লইয়া
রাধানাম করিত সাধন।
এবে সুরধুনী তীরে, বাহু দুটী উচ্চ করে,
সদাই করয়ে সঙ্কীর্ত্তন।
নবীন নাগর সাজে, গোপী সহ কুঞ্জমাঝে,
করিত যে বিবিধ বিলাস।
এবে পারিষদ সঙ্গে, নাম যাচে দীন বেশে,
সেই এই,—কহে কানুদাস॥"

পদকল্পতরু।

সখী অমিতার শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দরূপে আত্যন্তিক প্রীতি দেখিয়া প্রিয়াজি অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"সখি! আরও বল,—তোমরাই আমার গৌরপ্রেমের গুরু-গুরুমুখেই তত্ত্ব শুনিতে হয়"। এই কথা শুনিয়া অমিতা অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া বদন অবনত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; কোন কথাই আর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন পুনরায় অতি মৃদুকণ্ঠে মধুর প্রেমগদগদ-ভাষে কহিলেন,—"প্রাণসখি! লজ্জা কিসের?—তোমরাই আমার জীবন-দাতা—প্রাণ দাতা। গৌরকথা ও গৌরতত্ত্ব বলিয়া তোমাদের মন্দভাগিনী সখির প্রাণরক্ষা কর,"—সখি অমিতা আর কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না—"সখি। আমি তোমার দাসীর দাসীর যোগ্যা নহি—অমন কথা আর মুখে আনিও না—তাহা হইলে আর আমি গান গাহিতে পারিব না"—এই তিনি বলিয়া আর একটী প্রাচীন পদে ধুয়া ধরিলেন—

রাগ সুহই।

"শ্যামের তনু অব গৌরবরণ।
গোকুল ছোড়ি অব, নদীয়া অওল,
বংশী ছোড়ি কীরতন। ধ্রু॥
কালিন্দী-তট ছোড়ি সুর-সরিত-তটে
অব্ঁহু করত বিলাস।
অরুণ বরণ ডোরকৌপিন অব,
ছোড়ি পীতধড়া বাস॥
বামে নহত অব রাই সুধামুখী
ব্রজবধূ নহত নিয়ড়ে।
গদাধর পণ্ডিত, ফিরত বামে অব
সদা সঙ্গে ভকত বিহরে॥
ছোড়ি মোহন চূড়া, শিরে শিখা রাখল
মুখে কহত রাধা রাধা।

কহে হরিবল্লভ, তেরছ চাহনি ছোড়ি
দুনয়নে গলত ধারা ॥”

পদকল্পতরু।

প্রিয়াজি এখন পরমানন্দে সখি অমিতার মুখে রসময় গৌরতত্ত্ব শুনিতেছেন—সখি গৌরপাগলিনী কাঞ্চনার একটী ফুৎকারে গৌরতত্ত্বের উৎস উঠিয়াছে সখি অমিতার মুখে। সেই ফুৎকারটী এখানে আর একবার স্মরণ করুণ—

“সখি এত সুধু গৌর নয়।
উহার গোরা-রূপের মাঝে মাঝে কালবরণ ঝলক্ দেয়।”

এটিও প্রাচীন পদের ধুয়া—জগাইর উক্তি মাধাইর প্রতি—শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিশিষ্ট কৃপায় তাঁহাদের ভাগ্যে তাঁহার শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দরূপ দর্শন হইয়াছিল,—ইহা সেই সময়ের লীলা-কথা। সম্পূর্ণ পদটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

“মাধা! দেখ্‌রে এত সুধু গৌর নয়।
উহার গোরা-রূপের মাঝে মাঝে
কালবরণ ঝলক দেয়। ধ্রু ॥
অরুণ বসন-পরা যেন পীত-ধড়ার প্রায়।
উহার মাথার চাঁচর কেশ চূড়ার মত দেখা যায় ॥
তুলসীর মালা যেন বনমালা শোভা পায়।
করেতে যে দণ্ড ধরে বংশী যেন দেখি তায় ॥
হরি হরি বলে মুখে রাধা রাধা শুনা যায়।
দীন নন্দরায় কহে ব্রজের রতন নদীয়ায় ॥”

গৌরপদকল্পতরু।

গৌর-পাগলিনী কাঞ্চনার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার তুলনা হয় না—কিন্তু তিনি আজ সখী অমিতার মুখে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বকথা শুনিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়াছেন,—বিরহিণী প্রিয়াজিরও মনে স্ব-স্বরূপের পূর্ব্বলীলা-স্মৃতি উদয় হইয়াছে। স্বপ্নবিলাসের মধুর স্বপ্নকথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে পরমানন্দ দান করিতেছে—তিনি আজ অভূতপূর্ব্ব প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়াছেন। সখি কাঞ্চনা আজ যেন তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় পরম স্নিগ্ধপ্রেমোজ্জ্বল মধুররসের নবভাবের একটি মধুর মুরতি দর্শন করিতেছেন—সেই মধুর প্রাণরমণ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তিটি তাঁহার সমগ্র হৃদয়খানি আজ যেন জুড়িয়া বসিয়াছেন—তাঁহার সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে সখি অমিতার গলদেশে দুই বাহু বেষ্টন করিয়া প্রেমানন্দে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া অন্তর্যামিনী প্রিয়াজির মনে আজ বড় আনন্দ—অচিন্ত্য-লীলাশক্তিরূপিনী প্রিয়াজির কৃপাকটাক্ষে আজ নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকটিত হইল, তাহার অতুলনীয়, অভাবনীয় ও অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে জগজ্জীবের প্রাণে অনন্তকালের তরে পরম প্রেমানন্দের উৎস ছুটাইবে—হৃদয়ে প্রেমানন্দলহরীর তুফান উঠাইবে—মনে অশ্রুতপূর্ব্ব অনন্ত প্রেমানন্দ-রস-সাগরের অনন্ত খনি সৃজন করিবে।

বিরহিণী প্রিয়াজির মলিন বদনপ্রান্তে আজ বহুদিনের পর মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়াছে—তিনি আজ স্ব-স্বরূপে পূর্ব্বলীলার স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ লীলা-রস-ভাবিতচিত্তে পরম প্রেমানন্দে পূত পীযুষ-ধারা প্রবাহিত করিয়া নদীয়ার মহাগম্ভীরামন্দিরের নাম সার্থক করিলেন।

গৌরবল্লভা আজিও ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত মাধুর্য্য-ভাবে মর্ম্মী অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় সঙ্গে গৌরতত্ত্ব-সার আস্বাদন করিলেন।

(২)

প্রাচীন মহাজনকবি গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর গুণগান করিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

“চৈতন্যবল্লভা তুমি জগত ঈশ্বরী।
তোমার দাসীর দাসী হৈতে বাঞ্ছা করি ॥”

স্বয়ং ভগবতী প্রিয়াজির দাসীত্ব বড়ই উচ্চ পদ—আমার মত হতভাগ্য কলিহত জীবাধম প্রিয়াজির দাসীত্ব পদপ্রাপ্তির দুরাশা করে না—অভিমানও রাখে না। তবে প্রকট-গৌর-লীলায় নদীয়ার শচী আঙ্গিনার উচ্ছিষ্ট-ভোজী পোষা বিড়াল বা কুকুর সে যে ছিল না—একথা অস্বীকার না করিবার অধিকার তাহার কিছু আছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস। সে বিশ্বাসটী সুদৃঢ় করিবার জন্যই তাহার এই সাধনভজনই বলুন, আর স্বাধ্যায় যোগই বলুন—পূজা পাঠই বলুন—আর আচারপ্রচারই বলুন, যা' কিছু সে

করে—তার এই ভাবপুষ্টির জন্য। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ যদি কাহারও মনে উদয় হয়—তাঁহার চরণে বিনীত নিবেদন—তিনি যেন কৃপা করিয়া "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবিলাপগীতি" গীতিকাব্য খানি মাত্র একবার পাঠ করেন।

পোষা বিড়াল কুক্কুরকে গৃহস্থ আদর করিয়া ভুক্তাবশেষ উচ্ছিষ্ট খাইতে দেয়—গৃহমধ্যে স্থান দান করে—আবার কেহ কেহ স্নেহাতিশয্যে এই অস্পৃশ্য জাতীয় পশুকে স্পর্শ করিয়াও আদর সোহাগও করে। সে আদরের প্রীতি-ব্যবহার—সে সোহাগের মধুর সম্বন্ধ,—সকল পশুর ভাগ্যে ঘটে না—সকল বিড়াল কুক্কুরের ভাগ্যেও ঘটে না। প্রকট নবদ্বীপলীলার এইরূপ পশু-জন্মের অভিমানটী জীবাধম লেখকের হৃদয়ে যিনি অঙ্কুরিত, স্ফুরিত ও পরিপোষিত করিয়া অন্তঃকরণে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার কৃপাকটাক্ষে যেন বঞ্চিত না হই—ইহাই তাহার প্রাণের আত্যন্তিক কাতর প্রার্থনা।

গৌরগৃহের উচ্ছিষ্টভোজী বিড়াল কুক্কুর বহির্দ্বারেও থাকে, গৌরভক্তবৃন্দের ভুক্তাবশেষ ভোজনের সৌভাগ্যও পায়—তাহারা পোষা গৌরগৃহপালিত পশু হইলেও এ সুযোগ ও সৌভাগ্য ছাড়িবে কেন? গৃহী গৌরভক্তগণ তাহাদিগকে বিশেষরূপে কৃপা করেন এবং ভুক্তাবশেষ পাত্র দিয়া কৃপার চরম সীমা প্রদর্শন করেন। অন্তঃপুরেও সদাসর্ব্বদা তাহাদের অবাধ ও নিঃশঙ্কোচ প্রবেশাধিকার আছে—তাহারা গৃহস্থের কোনরূপ ক্ষতি করে না,—সুতরাং কেহ কিছু বলে না। গৌরগৃহে ইহারা শচীমাতা, মালিনীদেবী, সর্ব্বজয়া, নারায়ণী দেবী প্রভৃতি বৈষ্ণবগৃহিণীগণের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হয়—অধিকন্তু প্রিয়াজির পোষা বিড়াল কুক্কুর তাঁহার নিজ শ্রীহস্তের অবশেষ পাত্রও পাইয়া জীবন সার্থক করে। এখন ধীরভাবে বুঝিয়া দেখুন কত বড় উচ্চপদ তাহাদের—কত সৌভাগ্য গৌরগৃহে পালিত বিড়াল কুক্কুরের—এ পদ,—এ সৌভাগ্য শিববিরিঞ্চিরও বাঞ্ছনীয়।

তার পর গৃহস্থের বাড়ীর সকল গৃহেই পোষা বিড়াল কুক্কুরের যাতায়াতের অবাধ অধিকার আছে। তবে শচী-আঙ্গিনার বড় শুচিশুদ্ধ ভাব—কারণ শচীমাতা অতিশয় শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণকন্যা—সদাচার ও সদা শুচিভাবই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিশিষ্টভক্তি ভাব। এজন্য পোষা বিড়াল কুক্কুরকেও শচী-আঙ্গিনায় অতি সাবধানে থাকিতে হয়—সেরূপ শিক্ষাও তাহাদের আছে। অতি সন্তর্পণে ও ভয়ে ভয়ে তাহারা অন্তঃপুরের পাকের ঘরে ও ঠাকুরঘরের দ্বারের বহু দূরে দূরে থাকে। তাহারাও বড় চতুর—অনেক ঘা খাইয়া তাহারা চতুরত শিক্ষা করিয়াছে—শচীমাতার তাড়না বড় সহজ নহে। তবে যাঁহাদের তাহারা আদরের পোষা বিড়াল কুক্কুর,—তাঁহাদের ইঙ্গিতে তাহারা কখন কখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের শয়নমন্দিরে যাইবারও অধিকার পায়। বাল-গৌরাঙ্গ বড় কুক্কুরপ্রিয় ছিলেন—তাঁহার পোষা কুক্কুরের সহিত লীলারঙ্গ বড়ই মধুর। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীও বড় বিড়ালপ্রিয় ছিলেন। শচীর আঙ্গিনাতে দুই ভাবে এই দুইটী পশু গৌর-লীলা দর্শনের বিশেষ সুযোগ ও পরম সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছিল। জীবাধম লেখক এই দুইটি পশ্বাভি-মান হৃদয়ে সাদরে পোষণ করিয়া ধন্য মনে করেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শয়ন-মন্দিরে প্রিয়াজির পোষা বিড়ালের অবাধ গতি ছিল—প্রভুর পোষা কুক্কুরের সেখানে যে স্থান ছিল না—একথা বলিতে দুঃসাহস করি না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়নকক্ষের পর্য্যঙ্কের নিম্নে তাহাদের স্থান ছিল। কখন কখন প্রভুপ্রিয়াজির ইচ্ছামত ইহাদের মধ্যে কাহাকেও আদর করিয়া শয্যার উপরেও স্থান দিতেন। অতি গুহ্য প্রভুপ্রিয়াজির রহোলীল-রঙ্গ দর্শন করিবার সৌভাগ্যও তাহারা পাইয়া ধন্য হইত।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সন্ন্যাসলীলা-রঙ্গের পরে তাঁহাদের এই পোষা বিড়াল কুক্কুরদ্বয় মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সৌভাগ্য-বান কুক্কুরটীর গৌরবিরহ অসহ্য হওয়ায় কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করিয়া গৌরধামে গমন করে। কিন্তু প্রিয়াজির পোষা বিড়ালটি জীবন্মৃত অবস্থায় বরাবর প্রিয়াজির মুখ তাকাইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত ছিল। নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে এক্ষণে সে যৎসামান্য দেহধারণোপযোগী প্রিয়াজির ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পায় এবং গৌরবিরহদগ্ধা প্রিয়াজির গুণগান করে। সে অকৃতজ্ঞ নহে।

এতখানি ভণিতা করিবার প্রয়োজন ছিল না, তবে দীনহীন অযোগ্য লেখকের স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিবার এই ক্ষীণ চেষ্টাটি যে অসাধু নহে,—এই টুকু কৃপানিধি পাঠক ও কৃপাময়ী পাঠিকাবৃন্দের চরণে নিবেদন করাটা অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না।

আশ্বিন মাস,—শরতের অপরাহ্ণ—সুরধুনীতীরচারী নদীয়াবাসী নরনারী, পশুপক্ষী-কীট-পতঙ্গ-স্থাবর-জঙ্গম সকলেই গঙ্গাতীরের সুবিমল সান্ধ্যসমীরণে মন প্রাণ ও দেহ সুস্নিগ্ধ করিয়া গৌর-গুণগানে মত্ত,—কুম্ভ কক্ষে করিয়া সারি সারি অসংখ্য নদীয়া-রমণীগণ গঙ্গাতীরে জল আনিতে আসিয়াছেন—পতিতপাবনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে প্রেমানন্দে তাঁহারা কেবল গৌর-কথাই কহিতেছেন—প্রিয়াজির কঠোর ভজন-কথা তুলিয়া তাঁহাদের কোমলহৃদয় গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গের ন্যায় প্রতিনিয়ত উদ্বেলিত হইতেছে—শত সহস্র নদীয়াবাসিনী গৌরবিরহিণী নারীবৃন্দের নয়নাশ্রুধারা পতিতপাবনী সুরধুনীজলে পতিত হইয়া গঙ্গাসলিল বৃদ্ধি করিতেছে—সাধারণ লোকে অনুমান করিতেছে আশ্বিন মাসের শেষ—শারদীয় পূজার সময় আবার বন্যা আসিবে নাকি? গৌরবিরহিণী নদীয়া-রমণী-গণের মধ্যে বর্ষীয়সী, প্রৌঢ়া এবং যুবতী কুমারী সকলেই আছেন। দুঃখিনী প্রিয়াজির কথা তুলিয়া সকলেই গৌরশূন্য গৌর-গৃহের মহাগম্ভীরা-মন্দিরের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন,—আর মনে করিতে-ছেন যদি একবার গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দর্শন পাই! তাঁহাদের যে সে আশা সফল হইবার নহে, সে বিশ্বাসটুকু তাঁহাদের নাই—কিন্তু এই আশাতেই তাঁহারা এতদিন জীবনধারণ করিয়া আছেন।

এদিকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নামমাত্র কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়া গৌরবল্লভা বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াজি সখি কাঞ্চনা ও অমিতার সহিত নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের বারান্দায় ধরাসনে বসিয়া শরতের জ্যোৎস্নাস্নাত গঙ্গাদেবীর অপূর্ব্ব মৃদুল তরঙ্গভঙ্গী দর্শন করিতেছেন—সান্ধ্য সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া গৌরবিরহ-তাপদগ্ধা গৌরবল্লভার সেবায় নিযুক্ত আছে—সখিদ্বয়সহ গৌরবক্ষবিলাসিনী বিষাদিনী প্রিয়াজি গৌরকথা কহিতেছেন—গৌরবিরহ-শোকরূপ পর্ব্বত যেন তিনজনের উপরেই চাপিয়া

"শোকের পর্ব্বতে যেন সভাকারে চাপে"

গৌর-বিরহ-শোকে জর্জ্জরিতা গৌরবল্লভা তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ গৌরবিরহরসাস্বাদন করিতেছেন—গৌর-গৃহের সকল দ্বারই রুদ্ধ,—সমগ্র গৃহপ্রাঙ্গন যেন জনমানব-শূন্য সেখানে আকাশ বাতাস যেন সকলি নীরব—নিস্তব্ধ—কেবলমাত্র পতিতপাবনী সুরধুনীর গৌরবিরহোচ্ছাসপূর্ণ মৃদু-মন্দ কুলকুল ধ্বনি শ্রুত হইতেছে! নদীয়া-রমণীবৃন্দ গঙ্গাজলের কলসকক্ষে নদীয়ার গৌরশূন্য গৌরগৃহের দ্বার দিয়াই স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন—সকলের দৃষ্টি গৌরশূন্য গৌর-গৃহের প্রতি—সকলেরই বিষাদিত মন—উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়—অশ্রুপূর্ণ নয়ন—গৌরবিরহতাপে জর্জ্জরিত ও এলায়িত দেহ যষ্টি—চরণ আর যেন চলিতেছে না—গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে আসিয়া একে একে সকলেই বহির্দ্বারের প্রাচীরে মস্তক স্পর্শ করিয়া জনে জনে এক একটী প্রণাম করিতেছেন—আর হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ! এই বলিয়া অস্ফুট কাতর-ক্রন্দনস্বরে গৌরগুণগাথা গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছেন—গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি বারান্দায় বসিয়াই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন—কিন্তু তাঁহারা প্রিয়া-জীকে দেখিতে পাইতেছেন না। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সন্ন্যাস গ্রহণের পর কিছুকাল প্রিয়াজি লোকলোচনের গোচরীভূতা ছিলেন—শচীমাতার অপ্রকটের পর হইতেই তিনি আর কাহাকেও দর্শন দেন না। গঙ্গাস্নানকালীন নদীয়ার নর-নারীবৃন্দের নিত্য প্রণামে গৌরশূন্য গৌরগৃহের বহির্দ্বারের দুই পার্শ্বের প্রাচীর-স্তম্ভ একেবারে তৈলাক্ত হইয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নদীয়ার মহাগম্ভীরামন্দির দেবমন্দির অপেক্ষাও পুণ্যস্থানে পরিণত হইয়াছে,—নদীয়ার শত সহস্র নরনারীর নিত্য দর্শনীয় বস্তু এই গম্ভীরা-মন্দির! গৌরবল্লভা প্রিয়াজি স্বয়ং বলিয়াছেন—

যথারাগ।

——"তোমার এ ঘরবাড়ী বৈকুণ্ঠ মম।
নদে ধাম বৃন্দাবন—ব্রজ সম॥
তোমার জনম ভূমি, অপার প্রেমের খনি,
নব নব সুষমায় কান্তি কম।
তোমার শয়ন ঘর, সে মোর ঠাকুর ঘর,
তোমার পাদুকা নিতি করিব নম॥
ধরি ভিখারিণী সাজ, তোমার দাসীর কাজ,
করিবে এ দাসী তব, হর হে তম।
তোমার এ ঘর বাড়ী বৈকুণ্ঠ মম॥"——

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

শ্রীহরিনামের মালা হস্তে করিয়া প্রিয়াজি—গৌরনাম

জপ করিতেছেন। কাঞ্চনা ও অমিতার হস্তেও শ্রীহরিনামের মালা। শরতের সন্ধ্যাকালে—সান্ধ্যগগনে তারকারাজি প্রকাশ হইতেছে মাত্র—মৃদুমন্দ মলয়ানিল বহিতেছে—সংখ্যানাম শেষ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদ ভাবে দুই হস্তে পরম প্রেমভরে সখিদ্বয়ের দুটী হস্ত ধারণ করিয়া অতিশয় বিনয় ও কাতরতার সহিত ধীরে ধীরে কহিলেন—"সখি! প্রাণবল্লভের অদর্শনজনিত উৎকট বিরহ-যন্ত্রণা আর ত আমি সহ্য করিতে পারি না—প্রাণ আমার যায় যায় হইয়াছে। এখন উপায় কি?" এই কথা কয়টি মাত্র বলিয়াই বিরহিণী প্রিয়াজি আকুল ক্রন্দনের সুরে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া করজোড়ে কিরূপ আত্মনিবেদন করিতেছেন. স্থির ও ধীর চিত্তে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমগদগদ ভাবে কহিতেছেন—

প্রাণবল্লভ হে!

"তুমি ত থাকিতে পার নদীয়া ছাড়ি।
আমি যে ছাড়িতে নারি তোমার বাড়ী॥"

অতি কষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে এই কথা কয়টি বলিয়াই বিরহিণী প্রিয়াজি নীরব হইলেন—তাঁহার শরীর নিস্পন্দ,—চক্ষুদ্বয় নিমিলিত—যেন ধ্যানমগ্না। সখিদ্বয় তখন তাঁহাকে দুই দিক হইতে অতি সাবধানে পরম প্রেমভরে ধরিয়া বসিলেন—মস্তকে, চক্ষে ও শ্রীমুখে শীতল জলের ঘন ঘন ছিটা দিতে লাগিলেন—ধীরে ধীরে বীজন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রিয়াজি প্রকৃতিস্থা হইলেন এবং অতি ক্ষীণ কণ্ঠে প্রেমাশ্রুনয়নে সখি কাঞ্চনার হস্ত নিজ দুটি হস্তে ধারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমাদের নদীয়া-নাগর নবদ্বীপচন্দ্র কপট-সন্ন্যাসীবেশে নীলাচলে আছেন—জগতের সর্ব্বসাধারণ লোকে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হইতেছে—কেবল মাত্র একজন অনাথিনী নদীয়ারমণীর অতিশয় দুর্ভাগ্যবশে তাঁহার দর্শন বাধ। তাহার অপরাধ সে তাঁহার শ্রীচরণের দাসী"—এই বলিয়া গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি পূর্ব্ববৎ পুনরায় উর্দ্ধনয়নে করজোড়ে প্রাণবল্লভের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া অতি কাতর কণ্ঠে আত্মনিবেদন করিলেন, যথা—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে!

"এ দুখ জীবনে মোর কভু যাবে না।
(তুমি) একবার এ দাসীরে দেখা দিলে না॥
না হ'তাম যদি আমি, তোমার রমণীমণি,
দরশন দিতে তুমি,—একি ছলনা!
এ দুখ জীবনে মোর কভু যাবে না॥"

——"জগত তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে।
অভাগী পাপিনী বলে দুখে ডারিলে।
মো সম দুখিনী নাই, তাই হে দিলে না ঠাঁই,
দুখহারী সুশীতল চরণতলে।
জগত তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে॥"——

"দাসীর কপালে নাথ! একি লিখিলে!
পদ-সেবা অধিকারে কেন বঞ্চিলে॥
কি সুখে বাঁচিয়া রবে, পতিপদ সেবাভাবে,
তোমার চরণদাসী,—তাকি ভাবিলে?
দাসীর কপালে নাথ! একি লিখিলে॥"

গৌর-গীতিকা।

এই কথা বলিতে বলিতে দশমীদশাগ্রস্থা বিরহিণী প্রিয়াজি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে আছাড়িয়া পড়িলেন—তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবশ—সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল—নয়নজলে ভূমি কর্দ্দমাক্ত—পরিধান-বসন সিক্ত। নাসিকায় নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না বুঝিতে পারা বড় সুকঠিন। কাঞ্চনা ও অমিতা সখিদ্বয় দু'জনে প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন—তাঁহাদেরও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—কখন শীতল জল প্রিয়াজির মস্তকে ঢালিতেছেন—চোখে মুখে সজোরে জলের ছিটা দিতেছেন,—কখন নাসিকারন্ধ্রে তুলা দিয়া পরম উৎকণ্ঠার সহিত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন—দুইজনে বড়ই বিষম বিপদগ্রস্থা হইয়া পরিশেষে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন—মধুকণ্ঠে কাঞ্চনা অগ্রে ধুয়া ধরিলেন—অমিতা তাহাতে যোগ দিলেন।

যথারাগ।

"এস—নদীয়া-নাগর! গৌরসুন্দর! বিষ্ণুপ্রিয়া-চিত্তহারী।
এস—হেম বরণ! প্রাণ রমণ! নটনর্ত্তনকারী॥
এস—বর-নটেন্দ্র! গৌর চন্দ্র! নবদ্বীপ-বনয়ারী।
এস—প্রাণবল্লভ! বিষ্ণুপ্রিয়া-ধব! অপরূপ রূপধারী॥

এস—গৌর-চন্দ্র! ভুবন বন্দ্য! ভকতি-ব্রজবিহারী।
এস—নদীয়া ইন্দু! জগত-বন্ধু! গুপুতকুঞ্জবিহারী॥
এস—শচীনন্দন! জগবন্দন! সঙ্কীর্ত্তন-পরচারী॥
এস—অদোষ-দরশি! নদীয়ার শশি! ভব ভয়-দুখ-হারী॥
এস—রসিক নাগর! শচীর কোঙর! নাগরী-মনহারী।
এস—নদীয়া বিহারি! হের ত্বরা করি,(তব)বিরহদগ্ধা নারী।
তব—রূপে মুগ্ধ, বিরহে দগ্ধ, হরিদাস দুরাচারী॥"

গৌর-গীতিকা।

সখিদ্বয়ের প্রবল অনুরাগের ডাকে ও আকুল আহ্বানে নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরে কপট-সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আসন টলিল—তাঁহারই নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের আধীষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজির এই কঠোর ভজন-কথা যেন অকস্মাৎ কে গিয়া সেখানে তাঁহার কানে কানে বলিয়া দিল—কপট সন্ন্যাসীঠাকুর তখন ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা আলাপন করিতেছিলেন—তিনি হঠাৎ আনমনা হইলেন,—কিন্তু আর কেহ তাঁহার সে ভাবটি বুঝিতে পারিল না। নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দির হঠাৎ ঠিক সেই সময়ে সুগন্ধি মল্লিকা ও মালতী পুষ্পের সৌরভে পরিপূরিত হইল—অকস্মাৎ "গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নমভিঃ" অপরূপ পরম জ্যোতির্ম্ময় গৌরনাগর-রূপ বিদ্যুৎমালার ন্যায় সেখানে ক্ষণিকের জন্য প্রতিভাত হইল। সখি কাঞ্চনা ও অমিতাও তাহা দর্শন করিলেন। দশমীদশাগ্রস্থা গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার বদনের ভাব প্রসন্ন—চক্ষুদ্বয় উন্মিলিত ও যেন প্রেমভরে বিস্ফারিত—বদনপ্রান্তে যেন ঈষৎ হাসির রেখা, কিন্তু মুখে কোন কথা নাই। প্রিয়াজির তাৎকালিক ভাব দেখিয়া অন্তরঙ্গা মর্ম্মী সখিদ্বয় বুঝিলেন "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" এই শাস্ত্রবাক্য সফল করিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব হইয়াছে। এমন মধ্যে মধ্যে হইত—এইরূপ ক্ষণিক দর্শনসুখে কি বিরহিণী প্রিয়াজির বিরহাকুল গৌর-প্রণয়-পিয়াস মিটে? প্রিয়াজির অকুল গৌর-বিরহ-পয়োধির কুল কিনারা পাওয়া যায় না। তবে এরূপ আবির্ভাব দর্শনে ক্ষণিকের জন্য তাঁহার উৎকট গৌর-বিরহ-তাপের কিঞ্চিৎ উপশম হয় বটে!

বিরহিণী প্রিয়াজি এখনও ভূমিশয্যায় শায়িতা—তবে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে—কথা বলিবার শক্তি নাই—কিন্তু শ্রীবদনের ভাব প্রসন্ন—নয়নদ্বয় প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইলেও তত দুঃখভারাক্রান্ত নহে! সখিদ্বয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বিরহিণী প্রিয়াজিকে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন—সখিকাঞ্চনা বসনাঞ্চলে প্রিয়াজির প্রেমাশ্রুপূর্ণ শ্রীবদনখানি মুছাইয়া দিয়া অতি সন্তর্পণে কহিলেন—"সখি! তোমার প্রাণবল্লভের শুভাবির্ভাব হইয়াছিল—তোমার কৃপায় আমরাও তাঁহার নব নটেন্দ্র নদীয়া-নাগর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। সখি! তুমি আর কাঁদিও না—অনুরাগভরে ডাকিলেই তিনি আসেন—প্রেমভরে তাঁহার নামকীর্ত্তন করিলেই তাঁহার আসন টলে। তবে আর চিন্তা কি সখি? আমরা তোমার নিকট দিবানিশি নিরন্তর গৌরনাম কীর্ত্তন করিব।"

ধৈর্য্যবতী বিরহিণী প্রিয়াজি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে বিনতবদনে দুই হস্তে নিজ নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ভূমিতলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুটি মাত্র কথা কহিলেন—"সখি! দুগ্ধের পিপাসা কি ঘোলে মিটে?"—আর কোন কথা নাই—এইভাবে অনেকক্ষণ গেল—তিন জনে বারান্দায় এখনও বসিয়া আছেন—রাত্রি চারিদণ্ড হইয়াছে। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজিকে পরম প্রেম-ভরে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া ধরিয়া হস্তে চিবুক স্পর্শ করিয়া পরমাদরে কহিলেন—"প্রাণসখি! আমার একটী কথা শুনিবে" —বিষাদিনী প্রিয়াজির মুখে কোন কথাই নাই—কোন উত্তর নাই—বিনতবদনে মাথা হেঁট করিয়া তিনি কেবল অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তিনি তাঁহার নয়নদ্বয়ের তপ্তাশ্রুধারায় নিজ বসন সিক্ত করিলেন,—কাঞ্চনারও গাত্র-বসন সিক্ত হইল—তবুও মুখে কোন কথাই নাই। প্রিয়সখির এই ভাববিপর্য্যয় দেখিয়া কাঞ্চনার মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল—তিনি তখন কি বলিবেন, আর কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সখি অমিতার প্রতি একবার সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিলেন। সখি কাঞ্চনার প্রশ্ন কি তাহা অমিতা জানেন—অমিতা ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন—সে কথা এখন থাক্—সে কথা এমন ভাবে এখন বলিবার এ সময় নহে।

সুচতুরা কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির মনোভাব বুঝিয়া তখন একটী রাইগোষ্ঠের প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—শ্রীরাধিকার উক্তি,—সখির প্রতি,—

যথারাগ।

—"বধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি।
চূড়া বেঁধে যাব বনে যথা কমল-আঁখি॥

বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে।
রাখালের বেশে আর হরিষ অন্তরে॥
চূড়াটি বান্ধহ শিরে যত সখিগণ।
পীতধড়া বাঁধ সবে আনন্দিত মন॥
চণ্ডীদাস কহে শুন রাধা বিনোদিনী।
নয়নে হেরিবে সেই শ্যাম গুণমণি॥"—

সখি অমিতা সঙ্গে সঙ্গে আর একটী অনুরূপ গৌরপক্ষের পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"গৌর গেল নীলাচলে সন্ন্যাসী সাজিয়া।
আর না আসিবে ফিরি সে হেন নদীয়া॥
না দেখে রমণী-মুখ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
ভক্তবেশে যাব মোরা সঙ্কীর্ত্তন সাথ।
নদীয়া-নাগরী সবে ধরি ভক্ত সাজ।
চল সবে নীলাচলে ইথে নাহি লাজ।
কাঞ্চনা গাহিবে পদ মধুর রসাল।
মোরা সবে বাজাইব খোল করতাল॥
করতালি দিয়ে সবে বল্‌বো হরিবোল।
গম্ভীরা-মন্দিরে হবে মহা গণ্ডগোল॥
সঙ্কীর্ত্তন নটবর নদীয়া-নাগর।
(তবে) নদীয়া নাগরীগণে করিবে আদর॥
ভক্তবেশে দেখ্‌বে প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
সঙ্গে যাবে হরিদাসী প্রিয়াজির সাথ॥"

বিরহিণী প্রিয়াজি এবার এতক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়া দু'টী কথা কহিলেন—দুটী হস্তে সখি কাঞ্চনার হস্তধারণ করিয়া ক্ষীণ অথচ মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকা রাখাল বেশে গোধেনু লইয়া গোষ্ঠে গিয়া ব্রজনাগর রাখালরাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা ত বুঝিলাম। তোমার পূর্ব্বের পদটী আমার বড়ই ভাল লাগিল, কিন্তু সখি অমিতা এ আবার কি নূতন কথা বলিতেছে? ভক্তবেশে নদীয়া-নাগরীগণ সঙ্কীর্ত্তনসঙ্গে নীলাচলে তোমাদের নদীয়া-নাগর কপট সন্ন্যাসীটিকে দেখিতে যাইবে। আবার বলিতেছে আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে? কৃষ্ণলীলার রাইগোষ্ঠের বড় মধুর ভাব,—নবদ্বীপ লীলার নাগরী-কীর্ত্তন গৌর-নাগর-বরের বড় প্রিয় ছিল, তাহা ত আমার অজানিত নাই সখি!—নীলাচলে কিরূপে তাহা সম্ভব হবে? কৃষ্ণলীলায় রাইগোষ্ঠে ব্রজগোপিনীগণের সাজ সজ্জাটি কিরূপ ছিল বল দেখি সখি কাঞ্চনে!" তখন সখি কাঞ্চনা চণ্ডীদাস ঠাকুরের প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"গায় রাঙ্গা মাটি, কটি তটে ধটি, মাথায় শোভিত চূড়া।
চরণে নূপুর, বাজে সবাকার, গুঞ্জামালা গলে বেড়া॥
সবাকার কুচ, হইয়াছে উচ, এ বড় বিষম জ্বালা।
কমলের ফুল, গাঁথি শতদল, সবাই গাঁথিল মালা॥
ধীরে ধীরে চূড়া, গলে দিল মালা, নামিয়ে পড়েছে বুকে।
ফুলের চাপনে, বুক ঢাকা গেল, চলিল পরম সুখে॥
পরি পীত ধটি, হাতে লয়ে লাঠি, হারে রে রে করি ধায়।
চণ্ডীদাস ভণে, গহন কাননে, শ্যাম ভেটিবারে ধায়॥"—

এই পদটি শুনিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির বদনপ্রান্তে এত দুঃখের মধ্যেও যেন একটু মৃদু মধুর হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি এক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন এবং মর্ম্মী সখিদ্বয় সঙ্গে মন খুলিয়া প্রাণের দু'টী কথা কহিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতার যেন প্রাণ বাঁচিল,—মনে প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিল,—কিন্তু তাঁহাদের মুখে সে ভাব প্রকাশ পাইল না। প্রিয়াজি গান শুনিয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন "সখি! তোমরা নদীয়া-নাগরী-বৃন্দ যে ভক্ত-বেশে সংকীর্ত্তনসঙ্গে নীলাচলে যাইবার সংকল্প করিতেছ,—তোমাদের সাজসজ্জাটি কিরূপ হইবে বল ত শুনি।" এই বলিয়া প্রিয়াজি যেন বদনের হাসি ওষ্ঠাধরে চাপিয়া মহা লজ্জিতভাবে কিয়ৎ কালের জন্য অধোবদনে রহিলেন। সখি কাঞ্চনা সুচতুরা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী,—তিনি বুঝিলেন এ কথাগুলি তাঁহার সখির বড় ভাল লাগিতেছে—গৌর-দর্শন-লালসা-প্রদীপ্ত হৃদয়ের অদম্য প্রেমাবেগে প্রিয়াজি আজ আত্মহারা হইয়াছেন,—তিনি যে কুলবতী নারী—তাঁহার প্রাণবল্লভ যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী—তিনি তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। সখি কাঞ্চনা রসজ্ঞা, সুকণ্ঠী এবং গৌর-ভাবিনী ও গৌর-গর্ব্বিনী,—গৌর-গরবে ও গৌরপ্রেমে তিনি আজ যেন পাগলিনী হইয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় কাঞ্চনমালার নাম দিয়াছিলেন "কৃষ্ণ-পাগলিনী"—নদীয়ারমণীবৃন্দ তাঁহার নাম দিয়াছেন "গৌর-পাগলিনী"। এই গৌরপাগলিনী নদীয়ারমণী নাগরীভাবের পথ-প্রদর্শক। তিনি প্রিয়াজির মনোভাব বুঝিয়া উচ্চকণ্ঠে

নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দির ভেদ করিয়া গীত ধরিলেন,—সখি অমিতা দোহার দিতে লাগিলেন।

যথারাগ।

—"সর্ব্বাঙ্গে চন্দন　　করি বিলেপন,
　হরি-নামাঙ্কিত অঙ্গে।
মস্তকে বাঁধিয়া　　পাগ্ চিকণিয়া,
　বিচিত্রিত নানা রঙ্গে॥
পরিধানে ধুতি,　　গলায় উড়ানি,
　পেটাঙ্গি পরিয়া বক্ষে।
উর্দ্ধে বাহু তুলি　　হরি হরি বলি,
　(প্রেম) ধারা বহিবে চক্ষে॥
নীল সরোজে　　ঢাকিয়া উরজে
　ফুল-হার-ভরা বক্ষে।
প্রেমাশ্রুনয়নে　　গৌর চরণে—
(মোরা) প্রেম করিব ভিক্ষে॥
নদীয়া-বালক　　নদীয়া-বালিকা
　করিব সকলে সঙ্গী।
কীর্ত্তন-লম্পটে　　দেখাব দাপটে
　কীর্ত্তন-রণ-ভঙ্গী॥
নাচিব গাহিব,　　প্রেমধ্বনি দিব
　ভুলাইব গৌরচন্দ্রে।
গম্ভীরা-মন্দিরে　　হুঙ্কার গর্জ্জনে
　"ডাকিব জীমুত মন্দ্রে,—
"এস—নদীয়া-নাগর　　বিষ্ণুপ্রিয়া-বর
　নদীয়া-নাটুয়া বেশে।
এস—কপট সন্ন্যাসী　　স্বরূপ প্রকাশি
(একবার) কথা কহ হেসে হেসে॥"
হরিদাসিয়ার　　জীবনের সার,
　তখনে করিলা কি।
বাহিরিলা ধাই　　নিলাজ নিমাই,
　বহিরঙ্গে করে ছি !!
মস্তক মুণ্ডিত　　গেরু পরিহিত
　(করে) দণ্ডবৎ অষ্ট অঙ্গে।
চৌদিকে আগোরি　　নদীয়া-নাগরী
　(উচ্চ) কীর্ত্তন করে রঙ্গে।
—"জয় শচীনন্দন জয় গৌর হরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥"—
　　　　　　　　　গৌর-গীতিকা।

সখি কাঞ্চনার মধুকণ্ঠের এই অপূর্ব্ব মধুময় গীত শ্রবণে বিরহিণী প্রিয়াজির বদনে অনেক দিনের পর আজি হাসি দেখা দিল। নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দির আজ প্রেমানন্দে মুখরিত—গৌরশূন্য গৌরগৃহের পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত যেন আজ হর্ষোৎফুল্ল। গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজির হাস্যবদন-সন্দর্শন-সৌভাগ্যলাভ বহুদিন তাঁহাদের অদৃষ্টে হয় নাই। প্রিয়াজির প্রফুল্লবদন দেখিয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতার আজ আনন্দের সীমা নাই।

বিরহিণী প্রিয়াজি তখন ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে সখিদ্বয়কে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন—"সখি! সবই ত শুনিলাম—রাইগোষ্ঠ এবং নদীয়া-নাগরী-বৃন্দের বিচিত্র সঙ্কীর্ত্তন-রসরঙ্গের অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করিয়া আজ ধন্য হইলাম। সখি! এ সকলই ভাবের কথা—লীলাশক্তির অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তির অপূর্ব্ব মহিমাবলে এই ভাবের অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন বহু সাধনার ফল। সখি! তোমাদের কৃপায় আজ আমার মত হতভাগিনীর অদৃষ্টে এই অভূতপূর্ব্ব রসাস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ হইল। আমি তোমাদের নিকট এজন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। অভাগিনীর ভাগ্যে নীলাচল-নাথের দর্শন দুর্ঘট,—কারণ আমার প্রাণবল্লভের নিষেধ। আমি তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারি না—নদীয়া ছাড়িয়া,—আমার প্রাণবল্লভের গৃহ ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না। সখি! তাঁহার আদেশ পালন না করিলে তিনি কি মনে করিবেন?"

এতগুলি কথা গুছাইয়া বলিতে ক্ষীণকলেবরা গৌর-বিরহ-তাপ-দগ্ধা প্রিয়াজির অতিশয় কষ্ট হইল—এত কথা একত্রে তিনি পূর্ব্বে কখন কহেন নাই—তিনি অতিশয় ধৈর্য্যবতী এবং মৃদু ও অল্পভাষিণী ছিলেন। তিনি এক্ষণে পুনরায় অবসন্ন হইয়া সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে হঠাৎ শুইয়া পড়িলেন—তাঁহার ঊর্দ্ধ নয়ন—দুর্ব্বল ক্ষীণ হস্তদ্বয় যুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অতিশয় ক্ষীণ ও কাতর কণ্ঠে পুনরায় কহিলেন—

"প্রাণ বল্লভ হে! নবদ্বীপচন্দ্র হে!
　—"তুমি ত থাকিতে পার নদীয়া ছাড়ি।
　আমি যে ছাড়িতে নারি—তোমার বাড়ী॥
নদীয়ার চাঁদ নাই,　　আঁধার হয়েছে তাই
　আঁধারে আঁধারে ডুবি—তোমারে ঢুঁড়ি।

তোমার ঘরের মাঝে, আমার পাতান-সেজে,
নিশি দিন হেরি তোমা—হে গৌরহরি!
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাই, দরশ পরশ পাই,
আমি যে তোমারি নাথ! অবলা নারী।
আমি যে ছাড়িতে নারি,—তোমার বাড়ী॥"—
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপগীতি।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজির সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন—ক্ষণেকের তরে প্রেমানন্দ-সাগরে তাঁহারা ডুবিয়াছিলেন—প্রিয়াজির প্রসন্নবদন দর্শন করিয়া যেন তাঁহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিলেন। এক্ষণে—পুনরায় নিরানন্দ-সাগরে ডুবিলেন—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে পুনরায় চির বিষাদের ছায়া নিপতিত হইল

প্রিয়াজির কৃপাকণার পাইয়া আভাস।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

(৩)

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দির গৌরপ্রেমের মহা-পীঠ-স্থান—বিপ্রলম্ভরস-সমুদ্রের মূলাধার। এই পরমশ্রেষ্ঠ মহা যোগ-পীঠ-স্থানে গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিপ্রলম্ভ রস লীলাটি একেবারেই মূর্ত্তিমতী। গৌর-বল্লভার গৌর বিরহ-পয়োধি বড়ই গভীর—বড়ই গম্ভীর—বড়ই অসীম ও অনন্ত—ইহার কূলকিনারা খুঁজিয়া পাইবার সাধ্য কাহারও নাই। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা পরম প্রেমাবেগে এই গৌর-বিরহ-মহাসাগরে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হইয়া ঝম্প দিয়াছেন—অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া তিনি এ কাজ করেন নাই—গৌরপ্রেম-পাগলিনী গৌর-বিরহ রসার্ণবে একেবারে ডুবিয়াছেন—দণ্ডে দণ্ডে—পলে পলে—তিলে তিলে বিপ্রলম্ভ-রস-তরঙ্গা-বলীর ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার কোমল হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে—গৌর-বিরহানল-শাণিত-বাণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—প্রবলবেগে গৌর-বিরহ-তুফানে তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া পুনরায় ভীষণাকার উত্তাল তরঙ্গোপরি অতি বেগে যেন ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। দৃঢ়ব্রতা গৌর-বল্লভার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই—তিনি গৌর-পাদ-পদ্ম তরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল উপদ্রব, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা অনায়াসে অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন। এই দুর্গম ও দুরধিগম্য অকূল গৌর-বিরহ-পয়োধি-পার-উত্তারণ-তরণীর নাবিক স্বরূপ তাঁহার সঙ্গিনী মাত্র দুইটি—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির এই দুস্তর গৌর-বিরহ-সাগর-পার তরণীর মূল কাণ্ডারী যিনি—তিনি অতি সুচতুর সুদক্ষ ও সুরসিক নাবিকরাজ বটেন,—তবে এক্ষণে তিনিও তাঁহার প্রিয়াজির পথের পথিক—দায়ে ঠেকিয়া নীলাচলের সাগরতীরে নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার অগাধ—অথাই—অসীম ও অনন্ত বিরহ-মহাসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গরাজি গণিতেছেন—তাঁহার বিরহ-বিহ্বলা প্রাণপ্রিয়তমার বিষাদময়ী প্রতিচ্ছবি দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে প্রতিমুহূর্ত্তে তিনি এই সকল প্রত্যেক তরঙ্গমালার শুভ্র ফেনোচ্ছাসের উপরিভাগে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন—তিনি তাহা দেখিয়া—বুঝিয়া—বিচার করিয়া স্বয়ং প্রিয়তমার ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক লীলারসাস্বাদন স্বয়ং করিতেছেন নীলাচলের নির্জ্জন গম্ভীরা-মন্দিরের নিভৃত কক্ষে বসিয়া কেবল দুইটী মাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ মর্ম্মী ভক্তের সহিত—স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ। গৌর-বল্লভার গৌরবিরহ-সমুদ্রের বাড়বানলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর মানস-সরোবর সর্ব্বক্ষণ আলোড়িত, উদ্বেলিত ও বিক্ষুব্ধ করিতেছে। তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সেখানে যে কৃষ্ণ-বিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন—সে রসের মূল উৎস নদীয়ার গৌরশূন্য গৌর-গৃহরূপ মহাগম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তরে অবস্থিত। এই উৎসের কলকাটি তাঁহার স্বরূপ-শক্তি প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী স্বয়ংভগবতী গোলোকের মহালক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীহস্তে সযত্নে রক্ষিত। তাঁহারই অঘটন-ঘটন-পটিয়সী অচিন্ত্য লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহা-প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহারই স্বরূপশক্তি দুই স্বরূপে দুই ভাবে দুই দিক বজায় রাখিয়া—গৌর-বিরহ-পয়োধির দুকূল ভাসাইয়া লীলাময় ও লীলাময়ীর এই অপূর্ব্ব,অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতা-পূর্ণ বিপ্রলম্ভ-রস-লীলারঙ্গ দুই স্থানে—শ্রীনীলাচলে এবং শ্রীধাম নবদ্বীপে একই সময়ে প্রকট করিয়া কলিহত জীবের কাষ্ঠ-পাষাণবৎ কঠিন হৃদয় দ্রব করাইয়া গৌরপ্রেম-রসার্ণবে অবিশ্রান্ত মগ্ন রাখিবার জন্যই এই অলৌকিক এবং অত্যাশ্চর্য্য প্রেমফাঁদ পাতিয়াছেন। এই অত্যদ্ভুত কৌশলজাল ও প্রেমফাঁদে পড়িয়া পুরুষ প্রকৃতি, পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেই মধুর ও উন্নতোজ্জ্বল প্রেম-রসার্ণবে পড়িয়া প্রেমানন্দে হাবুডুবু খাইতেছে। এক

দিকে নীলাচলের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর গম্ভীরা-মন্দির—অপরদিকে তাঁহার প্রাণবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৌরশূন্য গৌর-গৃহরূপ মহাগম্ভীরা-মন্দির,—এই দুই নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে গৌর-ভজনের মূলমন্ত্ররূপিণী মূর্ত্ত বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী স্বরূপশক্তিরই বিশিষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দুই নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে দুই ভাবে শক্তি ও শক্তিমান দুই জন যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিতেছেন—তাহা পরম গম্ভীর—পরম গভীর রহস্যপূর্ণ—রসিক গৌর-ভক্তবৃন্দের পরমাস্বাদ্য এবং কলিহত জীবের পরম মঙ্গলকর। এই অশ্রুতপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব এবং অলৌকিক লীলারসাস্বাদনের অধিকারী অতি বিরল—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনের অধিকারী যে সে হইতে পারে না—শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলারস-সম্ভোগের সৌভাগ্য যার তার হয় না। এ সৌভাগ্য অর্জ্জনের একমাত্র উপায় মহৎ কৃপা—নবদ্বীপ রস-রসিক গৌরভক্ত মহৎসঙ্গ বিনা এ সৌভাগ্য লাভ অতি দুর্ঘট।

শীতকাল—পৌষমাস—বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির তখনও দৈনন্দিন ভজনসাধন শেষ হয় নাই—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ভজন মন্দির-দ্বারে বসিয়া আছেন—তাঁহারাও তখনও ভজন-সাধনরতা—সংখ্যানাম জপে মগ্না।

সখি কাঞ্চনা তখন মনে মনে ভাবিতেছেন—

"অতীত হইল বেলা তৃতীয় প্রহর
তবুও সখির ভজন না হ'ল শেষ।
উঠি চারি দণ্ড রাত্রি শেষে,
বসি তাঁর পতি-দেবতার শয়ন-মন্দিরে
ধরি সম্মুখেতে পতি-দত্ত কাষ্ঠ-পাদুকা দু'খানি,
জপমগ্না গৌর-বিরহিণী।
ধরাসনে আসীনা সখি
নিস্পন্দ শরীর;
দিয়ে গলে বস্ত্র,
দু'টি নয়ন করিয়া মুদ্রিত,
ধ্যান-মগ্না গৌরাঙ্গ-ঘরণী।
দুই পার্শ্বে মৃৎভাণ্ড দু'টি,—
একটি পূর্ণ আতপ তণ্ডুলে।
প্রেম-ধারা বহিতেছে দু'নয়নে তাঁর।
মধ্যে মধ্যে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
হইতেছে গৃহ আলোড়িত।
হস্তে ধরি হরিনামের মালা,
জপমগ্না বিষ্ণুপ্রিয়া সখি।
জপিছেন সংখ্যানাম নাম-নামী এক ক'রে,
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর শেষে,
ল'য়ে একটী তণ্ডুল বাম হস্তে,—
হ'তে এক মৃৎভাণ্ড,
রাখিতেছেন অন্য মৃৎভাণ্ডে অতি সযতনে।
সংখ্যানাম হইলে শেষ,
এই জপশুদ্ধ আতপ তণ্ডুল গুলি
করিবেন তিনি নিজ হস্তে পাক।
ঠাকুরের ভোগ হবে তবে,—
অলবণ অনুপকরণ,—
সেই প্রসাদ সখির জীবন উপায়।
তার মধ্যে অর্দ্ধেকাংশ বণ্টনেতে যায়।
পড়িয়া আছেন মৃতপ্রায় ভক্তগণ—
বাহির্বাটি দ্বারে—
গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী-দত্ত এক কণা
প্রসাদের তরে।
শচীমার অপ্রকটের পর
হয়েছে রুদ্ধ বাটীর বহির্দ্বার।
রুক্ষ কেশদাম—শুষ্ক দেহ—মলিন বসন,—
সেজেছেন সন্ন্যাসিনী আজি
নদীয়ার রাজরাণী।
দেখেছি মোরা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের
সন্ন্যাস-মূরতি—মহা জ্যোতির্ম্ময়—
মহা মহিমাময়—মহা ঐশ্বর্য্যপূর্ণ।
আর দেখিতেছি—
গৌর-বল্লভার এই—মহা জ্যোতির্ম্ময়ী
—মহা গরিমাময়ী—
মহাসমুদ্র মত মহা গম্ভীর—
মহা ধীর,—মহা স্থির—
অটল ধৈর্য্য-শালিনী—
মহতী মূর্ত্তি মনোহরা।
দেখে ভয় হয় মনে,—

ভয়ে প্রাণ করে দুরু দুরু,—
সম্ভাষিতে সখি বলে, মনে হয় ত্রাস।”

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

সখি কাঞ্চনা দ্বারে দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন জপমগ্ন প্রিয়াজি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গলবস্ত্রে করযোড়ে সজলনয়নে আত্মনিবেদন করিতেছেন যথা—

“প্রাণবল্লভ হে! জীবনকান্ত হে!
চরণ কমলে তব অধিনীর এই নিবেদন—
দেখা দিয়ে একবার শিখাও আমারে
রীতি তব কঠোর ভজনের।
শুনেছি আমি লোক মুখে,
ল'য়েছ তুমি কঠোর ভজন-পথ,
ভ্রমিতেছ দেশে দেশে
ধরি ভিখারীর বেশ,—
না জানি কত না পাইতেছ ক্লেশ।
শীতাতপে বৃক্ষতলে বাস তব,
অযাচিত ভিক্ষালব্ধ ফলমূলাহার।
আমি ত গৃহেতে বসে—আছি সুখে,—
ভজনের নাহি গন্ধ মোর।
মনে হ'লে তব কথা
জ্বলে হৃদি মাঝে বিষম অনল,—
ভজনেতে নাহি লাগে মন।
দেখা দিয়ে তুমি নাথ! বলে দাও মোরে
কঠোর ভজন-রীতি।
দিয়েছিলে কৃপা করে কৃপাময়!
শ্রেষ্ঠ কার্য্য মাতৃসেবা তব,
ভাগ্যদোষে মোর
তিনি এবে স্বধামগত।
বঞ্চিত হ'য়েছি তাঁর সেবা-কাজে আমি;
এখন সুধু মাত্র জপি
তব দত্ত মহামন্ত্র হরিনাম,—
করি ধ্যান রাতুল চরণ তব,—
গাই নিশিদিন তব গুণগাথা।
কিন্তু নাথ! ধ্যান ভঙ্গে,—
মধ্যে মধ্যে শূন্য হেরি সব—
চারিদিকে অন্ধকার—নীরব—নিস্তব্ধ
সব দুখ-ময়।
গৌরশূন্য গৌরগৃহ হেরি
নিশি দিন কেঁদে মরি আমি।”

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

এইরূপ কাষ্ঠ-পাষাণ-ভেদী বিলাপধ্বনিতে ভজনগৃহ পরিপূর্ণ করিয়া গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজি গলবস্ত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মন্দিরের দ্বারোন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

সখিদ্বয় দ্বারেই দাঁড়াইয়াছিলেন—নয়নজলে তাঁহাদের বক্ষ ভাসিতেছিল। তাঁহাদের প্রিয় সখির তাৎকালিক মুখের ভাব দেখিয়া তাঁহারা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না—এতক্ষণ তাঁহারা নীরব ক্রন্দন করিতেছিলেন—এক্ষণে “হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। অমনি কৃপাময়ী গৌরবল্লভা তাঁহার দু'টি ক্ষীণহস্তে দুই সখির গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া পরম প্রেমভরে সুধামধুর বচনে কহিলেন—“সখি! প্রাণসখি! আমার জন্য তোমাদের এই দুঃখভোগ দেখিয়া প্রাণ আমার অস্থির হইতেছে—তোমাদের দুঃখ আমাপেক্ষাও অধিক তাহা আমি জানি—তোমরাই ছিলে তোমাদের নদীয়া-নাগর নবদ্বীপচন্দ্রের প্রকৃত সেবাপরায়ণা দাসী—আমি ত তাঁহার নাম মাত্র দাসী ছিলাম। তোমাদের এ দুঃখের কারণ হইলাম আমি অভাগিনী—এখন আমার মরণই মঙ্গল।”

এই বলিয়া পরমা ধৈর্য্যবতী গৌরবল্লভা ক্ষণকালের জন্য ধৈর্য্য হারাইলেন। তিন জনে মিলিয়া সেই ভজন-মন্দির-দ্বারে যে কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান অতিশয় করুণ-রসাত্মক একটী বিষাদ-পূর্ণ অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিলেন,—তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত।

পরম করুণাময়ী গৌরশক্তির অসীম কৃপাবলে কিছুক্ষণ পরে সখিদ্বয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল—তাঁহাদের হাত ধরিয়া লইয়া কোন গতিকে গৌরবল্লভা অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। তখন দিবা অবসান প্রায়। পাকের সকল উদ্যোগই ছিল—তখনও তপস্বিনী প্রিয়াজির দৈনন্দিন ভজন ক্রিয়া কিছু বাকি ছিল—তিনি হাতে মুখে একটু জল দিয়া শ্রীতুলসীদেবীকে পরিক্রমা এবং গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থ হিরণ্ময়বপু ইষ্টদেবকে পুনরায় প্রণাম করিলেন।

তাহার পর পাকগৃহে গিয়া স্বপাকে তাঁহার জপ-সংখ্যালব্ধ আতপ তণ্ডুলগুলি সিদ্ধ করিলেন। একখানি কদলীপত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ লাগাইলেন—প্রাণরক্ষা হেতু মাত্র একমুষ্টি প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কিছু অবশিষ্ট রাখিলেন।

তপস্বিনী গৌরবল্লভার কঠোর ভজনকথা শ্রীঅদ্বৈতদাস ঈশান নাগর তাঁহার "অদ্বৈতপ্রকাশ" শ্রীগ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন—তাহা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

"বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবী অন্তর্দ্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তারে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎভাণ্ডে রাখয়।
হেন মতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করেন মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগান কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করিয়া দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥"—

"প্রেমবিলাস" শ্রীগ্রন্থেও গৌরবল্লভার এইরূপ কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে,—

যথা,—

ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
নবীন মৃৎ ভাজন আনি দুই পাশে ধরি।
এক শূন্য পাত্র—আর পাত্র তণ্ডুল ভরি॥
একবার জপি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান।
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥
রাত্রিদিন হরিনাম প্রভুর সংখ্যা যত।
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতি হত॥
প্রভুর প্রেয়সী যিঁহো তাঁহার কি কথা।
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা।
তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি।
নাম লয়েন তাতে রোপন করেন প্রভুর শক্তি॥"

প্রাচীন "অনুরাগবল্লী" * শ্রীগ্রন্থেও লিখিত আছে—

"অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসীমঞ্জরী॥
পিড়াতে বসিয়া করেন হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপ তণ্ডুল কিছু রাখেন নিজ স্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হইলে একটী তণ্ডুল।
রাখেন সরাতে অতি হৈয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্ব্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখেন পাত্র শেষ।
ভক্ত সব আসে তবে পাইয়া আদেশ॥
বাড়ীর বাহিরে চারি দিকে ধ্বনি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণ মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত কোন গ্রামে কেহ আছে আশ পাশ।
একত্র হঞা অভ্যন্তর যান সব দাস॥
তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্যশরণ যাতে অতি কৃপাপাত্র॥"

শ্রীঈশান নাগর লিখিয়াছেন—

"নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎভাণ্ডে রাখয়।"

আর "প্রেমবিলাসে" লিখিত আছে—

"একবার জপি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর॥"

* অনুরাগবল্লী গ্রন্থকার মনোহর দাস শ্রীল শ্রীনিবাসআচার্য্য ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। ১৬১৮ শকে চৈত্র শুক্লাদশমী-তিথিতে বৃন্দাবনে বসিয়া এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। কাটোয়ার নিকট বেড়ন-কোলা গ্রামে তাঁহার জন্ম। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব গৌরবল্লভার বিশিষ্ট কৃপাপাত্র। শ্রীগুরু-কৃপাবলে তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ভজন সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীগ্রন্থে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন

এই দুই মহাজন-বাক্যের সামঞ্জস্য করিয়া কৃপাময় পাঠকবৃন্দ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন। শ্রীঈশান নাগরের বাক্যই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়—কারণ তিনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আদেশে শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া বিশিষ্ট অনুসন্ধানে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত স্বয়ং জানিয়া তবে লিখিয়াছেন।

অপরাহ্ণে প্রসাদ পাইয়া গৌর-বল্লভা যথারীতি প্রতিদিন একবার ঠাকুরমন্দিরের পিঁড়ায় আসিয়া দাঁড়াইতেন। প্রাচীন মহাজন মনোহরদাস প্রণীত "অনুরাগ-বল্লী" শ্রীগ্রন্থে লিখিত আছে,—

পিঁড়াতে কাঁড়ার টানা বস্ত্রের আছয়ে।
তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হঞা॥
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে।
দাসী যাই কাঁড়ার রঞ্জেক ধরি তোলে॥
চরণ-কমল মাত্র দর্শন পাইতে।
কেহ কেহ ঢলিয়া পড়ে কোন ভিতে॥"

এই শ্রীগ্রন্থে আরও লিখিত আছে—

"দেখিতে চরণ-চিত্র করায়ে প্রতীত।
উপমা দিবারে লাগে দুঃখ আর ভীত॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শাখাচন্দ্র ন্যায়।
না কহি রহিতে চাহি—রহা নাহি যায়॥
উপরে চমকে শুদ্ধ সোণার বরণ।
দশ নখ দশ চন্দ্র প্রকাশে কিরণ॥
চরণের তল অরুণের পরকাশ।
মধুরিমা সীমা কিবা সুধার নির্য্যাস॥"

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! কৃপাময় পাঠিকাবৃন্দ! একবার মনসাধে প্রাণ ভরিয়া বিরহিণী গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই রাতুল শ্রীপাদপদ্মদ্বয় হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন,—আর সকলে সমস্বরে বলুন—"জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ"।

গৌর-বল্লভার আদেশে ক্ষণকালের জন্য বহির্দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে,—দ্বারদেশে নদীয়াবাসী গৌরানুরাগী অনন্যশরণ গৌরভক্তগণ গৌরবল্লভার প্রদত্ত কণিকা-প্রসাদের অপেক্ষা করিতেছিলেন—তাঁহারা আসিয়া শচী-আঙ্গিনায় একত্রিত হইলেন,—তখন—

——"তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করিয়া।
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি।
যে কেহ আইসে তার হয়ে বরাবরি॥"

গৌরবল্লভাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহারা শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত তাঁহার শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়া কান্দিতে কান্দিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশবর্ষীয় বয়স্ক নবীন পরম সুন্দর বিপ্রকুমার শ্রীনিবাস আচার্য্য এই সময় প্রবল গৌরানুরাগে গৌরশূন্য নদীয়ার গঙ্গাতীরে প্রতপ্ত বালুতটের উপর পড়িয়া "হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন এবং অঙ্গ আছাড়িয়া বক্ষ চাপড়িয়া হাহাকার করিতেছিলেন—সেই সময় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের পুরাতন ভৃত্য অতিবৃদ্ধ ঈশান গঙ্গাস্নানে গিয়া এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। নবীন বিপ্রকুমারের মুখে "হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ" এই নাম শুনিয়া তিনি পরম প্রেম-বিহ্বলভাবে গৌরবল্লভার চরণান্তিকে আসিয়া এই সংবাদটি নিবেদন করিলেন।* পূর্ব্ব রাত্রিতে বিরহিণী প্রিয়াজিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ স্বপ্নযোগে বলিয়াছেন—"আমার একটী একান্ত অনুরাগী ভক্ত বিপ্রকুমার নদীয়ায় আসিবেন—তাঁহাকে তুমি কৃপা করিবে—এই আমার শেষ আদেশ জানিবে।" গৌরবল্লভা কাহাকেও এ স্বপ্নাদেশ এপর্য্যন্ত বলেন নাই—কিন্তু তিনি এই বিপ্রকুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঈশানের মুখে এই বিপ্রকুমারের কথা শুনিবামাত্র তাঁহাকে এই সময়ে অন্তঃপুরে আনিতে অনুমতি দিলেন।

অতি দীনহীন কাঙ্গালবেশে ধূল্যবলুণ্ঠিত কলেবরে গৌর-বিরহানলদগ্ধ-হৃদয় এই পরম সুন্দর বিপ্রকুমারটী গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্তঃপুর-প্রদেশে আনীত হইলেন। তিনি নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রতি পদক্ষেপে দণ্ডবৎ নতি-প্রণতি করিতে করিতে গৌর-বল্লভার সম্মুখীন হইবামাত্র ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রেমাবেগে মহা আর্ত্তনাদধ্বনি উঠাইয়া "হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরম করুণাময়ী গৌরবল্লভা ঈশানকে ইঙ্গিতে কহিলেন—"বিপ্রকুমারকে

* "অনুরাগ-বল্লী" গ্রন্থে এই সংবাদ-দাতা প্রিয়াজির একজন দাসী বলিয়া লিখিত আছে।

তাঁহার নিকটে লইয়া এস।" আজ্ঞাবহ ভৃত্য তাঁহার ইষ্টদেবীর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করিলেন। তখন গৌর-বিরহ-কাতর নবীন যুবক শ্রীনিবাস ধুল্যবলুণ্ঠিত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজির চরণতলে একেবারে দীঘল হইয়া পড়িয়া শিশুর মত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। পরম দয়াময়ী বৈষ্ণব-জননী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী তখন স্বহস্তে কাণ্ডাপট কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিয়া এই দীনহীন গৌরবিরহ-কাতর বিপ্রকুমারের প্রতি একবার শুভদৃষ্টিপাত করিয়া পরম স্নেহভরে প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে মৃদুমধুরভাষে কহিলেন—

"শুন শুন ওহে বাপু তুমি ভাগ্যবান।
তোমাতে চৈতন্য-শক্তি ইথে নাহি আন॥
তবে শান্তিপুরে যাই খড়দহে যাবে।
আচার্য্য গোসাঞি দেখি পরিচয় পাবে॥
খড়দহ যাইয়া দেখিবে নিত্যানন্দ।
তোমা পাঞা জাহ্নবার হইবে আনন্দ॥
বিলম্ব না কর কভু যাও শীঘ্র করি।
অনেক দেখিবে শুনিবে রূপের মাধুরী॥
সর্ব্বত্র মিলন করি যাও বৃন্দাবন।
সর্ব্বসিদ্ধি হবে পথে করিবে স্মরণ॥" প্রেমবিলাস।

গৌরবল্লভা এই কয়টী কথা বলিয়া তারপর কি করিলেন তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

—"এত কহি বস্ত্রে বেষ্টিত চরণ অঙ্গুলি।
শ্রীনিবাসে ডাকি চরণ দিলা মাথে তুলি।"

তখন মহা ভাগ্যবান শ্রীনিবাসের কিরূপ অবস্থা হইল, তাহাও শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন,—

——"চরণ পরশে অতি প্রেমাবেশ হৈলা।
লোটাঞা ধরণীতলে কান্দিতে লাগিলা॥" প্রেঃ বিঃ।

অযাচিতভাবে এরূপ প্রিয়াজির কৃপা আর কোন গৌর-ভক্তই পান নাই—এ সৌভাগ্য একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্ত্যাবেশাবতার মহা মহা ভাগ্যবান শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরই পাইয়া বৈষ্ণবজগতে ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদেশে এই ভাবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীনিবাসআচার্য্য ঠাকুরকে যে কৃপার অবধি দেখাইলেন—তাহারই ফলে শ্রীপাট খেতরিতে ঠাকুর নরোত্তম যখন প্রিয়া সহিত শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন—সেই যুগল শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ভার পড়িল এই মহা ভাগ্যবান শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিশিষ্ট কৃপাপাত্র বিপ্রকুমারের উপর। গৌড়মণ্ডলের তাৎকালিক যাবতীয় প্রভুসন্তান গোস্বামিগণ, মোহান্তগণ সেই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া এই ভুবনমঙ্গলকর শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন—সেই শুভদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের একটি বিশিষ্ট স্মরণীয় দিন। তারপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানস-পুত্র শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দনঠাকুরের পরম সৌভাগ্যবান পুত্র কানাইঠাকুর শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈষ্ণবজগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এ সকল কথা এখানে অতি সংক্ষেপে বলিতে হইল—এ গ্রন্থে এসকল বিষয় আলোচ্য নহে—তবে এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নদীয়ার মহাগম্ভীরা-লীলার অন্তর্গত বলিয়াই তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া বোধ হয়।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি একণে তাঁহার দৈনন্দিন ভজনাদি সমাপন করিয়া তাঁহার ভজন মন্দির-দ্বারে মালা হস্তে বসিয়া সংখ্যানাম জপে মগ্না। সখিদ্বয়ও নিকটে বসিয়া নিজ নিজ সংখ্যানাম জপ করিতেছেন।

অস্তাচলগামী সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনপ্রান্তে ডুবুডুবু হইয়াছেন—সুরধুনীতীরবর্ত্তী প্রদেশ সকল অরুণ বর্ণ ধারণ করিয়াছে—মৃদুতরঙ্গায়িত গঙ্গাসলিল দূর হইতে রক্তাক্ত মনে হইতেছে—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া গঙ্গাভক্তা প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় সহ অরুণাক্ত সান্ধ্য-গগন-চুম্বিত সুর-তরঙ্গিনীর ধীরললিত-তরঙ্গাবলীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছেন—এমন সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল,—

"শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমারে কহিল ইহা
যখন যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই, থাকিব তোমার ঠাঁই,
এই সত্য করিলাম দঢ়॥" শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি তখন নয়ন মুদ্রিত করিয়া জপমগ্না ছিলেন, তিনি অকস্মাৎ এই অপূর্ব্ব দৈববাণী শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন—দৈববাণীর কণ্ঠস্বর তাঁহার প্রাণবল্লভের কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইল—বহুদিন সে মধুর কণ্ঠস্বর তিনি শুনেন নাই,—তাঁহার কর্ণ অতিশয় পিপাসিত ছিল—এখন যেন তাঁহার সেই বহুদিনের পিপাসিত কর্ণ শীতল হইল। উদাসনয়নে আকুলপ্রাণে তিনি

এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন গঙ্গাতীরের দিকে চাহিলেন,—ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে নদীয়া-গগনের প্রতি চাহিলেন—হস্তের মালা হস্তেই আছে—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—পুনরায় সতৃষ্ণনয়নে চতুর্দ্দিকে চাহিলেন—কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। সখিদ্বয় প্রিয়াজির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন—কিছু বলিতে সাহস করিতেছেন না—গৌরবল্লভা ধীরে ধীরে ঠাকুর বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন—আর যেন অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতেছেন—কাহারও মুখে কোন কথা নাই—এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল। পুনরায় আর একবার সেই মধুর স্বরে দৈববাণী হইল,

"বিষ্ণুপ্রিয়ে !"

"যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে॥"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

গৌর-বিরহ-বিদগ্ধা প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমুখে তাঁহার নাম শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি "হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ !! হা নবদ্বীপচন্দ্র !!!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে কান্দিতে ভূমিতে অঙ্গ আছাড়িয়া পড়িলেন। শ্রীহস্তের মালা ঝোলা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল—তিনি আজ বড়ই কাতর ও অসম্বর হইয়া পড়িলেন—ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে অঙ্গ আছাড়িয়া কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান পরম করুণ স্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কান্দিতে লাগিলেন,—

শূন্য হেরি তোমা বিনা এ ঘর বাড়ী॥
"কোথা তুমি গেলে নাথ! নদীয়া ছাড়ি।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, গৌরহারা ধরা দেখি,
পশুপাখী সকলেরই নয়নে বারি।
বৃক্ষ লতা তৃণ কাঁদে, না হেরি নদের চাঁদে,
ফুকারি ফুকারি কাঁদে কুলের নারী॥
শিশুতে না স্তন খায় গাভীতে না গোঠে যায়,
উঠেছে রোদনধ্বনি হৃদি-বিদারী।
কেন তুমি গেলে নাথ! নদীয়া ছাড়ি॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপগীতি।

বিরহিণী প্রিয়াজির এরূপ করুণ হইতেও করুণ বিলাপের ভাব এই যে তাঁহার প্রাণবল্লভের অদর্শনজনিত বিরহজ্বালায় তিনি সর্ব্বক্ষণ জর্জ্জরিত—এখন আর তাঁহার আবির্ভাবে বা দৈববাণীতে, কিম্বা তাঁহার কণ্ঠস্বরে তাঁহার তাপিত প্রাণ আর শীতল হয় না—তাঁহার বিরহসন্তপ্ত অশান্ত মন আর তাহা মানিতে চাহে না। তিনি এখন তাঁহার প্রাণবল্লভের সাক্ষাৎ দর্শন ও নিত্য সঙ্গাভিলাষিণী—এখন তিনি গৌরপ্রেম-পাগলিনী—এখন তাঁহার প্রেমোন্মাদ-দশা। তিনি এবং তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের গৌরানুরাগের অভাব নাই—তাঁহাদের প্রাণের প্রত্যেক ডাকটিই অকপট এবং গভীর গৌরানুরাগ-পরিপূরিত মূর্ত্ত আত্মনিবেদন। অতএব মধ্যে মধ্যে এরূপ দৈববাণীতে তাঁহাদের মনে গৌর-ভজনের নব নব বল সঞ্চার করিতেছে সত্য—কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। গৌরবল্লভা যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-স্বরূপের নিত্য নবদ্বীপলীলার নিত্য-লীলা-সঙ্গিনী গৌরবিরহোন্মত্তা আত্মহারা প্রিয়াজি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রিয়াজির এই সর্ব্বোত্তম নরলীলায় তাঁহার স্বরূপানুভূতির লেশাভাসও নাই—থাকিলে লীলারস পুষ্টি হইত না। ইহাই তাঁহার অপূর্ব্ব লীলারহস্য, ইহাই সর্ব্বোত্তম নরলীলার বিশিষ্ট।

নদীয়াবাসীর প্রাণগৌরাঙ্গের নদীয়ার যুগলবিলাস শচী-আঙ্গিনায় পুনঃ প্রকটিত হউক—ইহাই নদীয়াবাসী নরনারী-বৃন্দের প্রাণের ইচ্ছা—এ ইচ্ছা যে সন্ন্যাসীধর্ম্ম-বিরুদ্ধ—এ ইচ্ছা যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ভগবত্তা হানিকর—তাহা তাঁহারা বুঝিতে চান না—শচীনন্দন গৌরহরিকে তাঁহারা নদীয়ানাগর শচীনন্দন বলিয়াই জানেন—তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ যে নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে—সে সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোন সন্দেহই নাই।

যাহা হউক গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির মনের ভাব তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় ভাল করিয়াই বুঝেন—তাঁহাদের ভাব গৌর-বল্লভার ভাবানুরূপ—বিরহিণী প্রিয়াজির করুণ বিলাপ ও আর্ত্তনাদে তাঁহারাও যোগদান করিয়া সেখানে একটী ভীষণ করুণরসাত্মক মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা প্রিয়াজির কায়ব্যূহ—তাঁহারাও দৈববাণী শুনিয়াছেন—তাঁহারাও বুঝিয়াছেন তাঁহাদের প্রিয় সখির দুগ্ধের তৃষ্ণা এখন আর ঘোলে মিটিতেছে না। তাঁহারা দুইজনে তাঁহাদের প্রিয় সখির সঙ্গে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া এবং তাঁহার ক্রন্দনের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—

—"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

তিন জনের বিষম ক্রন্দনের রোলে গৌর-শূন্য গৌর-গৃহে দাসদাসীদিগের মধ্যে নীরব হাহাকার ধ্বনি উঠিল—কিন্তু কাহারও সম্মুখে আসিবার আদেশ নাই। তখন সন্ধ্যাকাল—ঠাকুরমন্দিরে প্রদীপ দিতে একজন দাসী আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—হাতের প্রদীপ পড়িয়া গেল—ঠাকুরঘর অন্ধকার—সর্ব্ব নদীয়া অন্ধকার—সর্ব্বজগত অন্ধকার দেখিতেছেন গৌরশূন্য গৌর-গৃহের দাসদাসীগণ—তাঁহাদের প্রাণে আজ বড় আতঙ্ক হইয়াছে—বুঝি বা কি বিপদ ঘটে! অতি বৃদ্ধ দামোদর পণ্ডিত এবং ততোধিক বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য ঈশান প্রাচীরের উপরে উঠিয়া মুহুর্মুহু অন্দর মহলের সমাচার লইতেছেন—একে তাঁহাদের জরাতুর বৃদ্ধ শরীর স্বাভাবিকভাবে সর্ব্বদাই কম্পবান—তার উপর এই উপস্থিত বিপদাশঙ্কায় উচ্চ প্রাচীরের উপর উঠিয়া তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে—এরূপ অবস্থায় তাঁহারা গৌর-বল্লভার এবং তাঁহার সখিদ্বয়ের কি সেবা করিবেন, তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতেছেন না—তাঁহাদের মনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা নাই—অন্দরমহলে যাইবার আদেশ নাই—দূর হইতে অন্ধকারে যাহা শুনিতেছেন—তাহাতেই তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—স্বচক্ষে কিছু দেখিবার কিম্বা স্বহস্তে কোন সেবা করিবার অধিকারে তাঁহারা বঞ্চিত। এ দুঃখ তাঁহাদের রাখিবার স্থান নাই এবং মরিলেও যাইবে না।

কতক্ষণ পরে উচ্চ ক্রন্দনের রোল হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া প্রাণঘাতী করুণ ক্রন্দনের অস্ফুটধ্বনিতে পরিণত হইল—এখন পর্য্যন্ত অতি বৃদ্ধ দামোদর পণ্ডিত এবং ঈশান প্রাচীরের উপর বসিয়া থর থর কাঁপিতেছেন এবং দরদরিত নয়নধারায় তাঁহাদের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। ঈশান তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি এবার ধৈর্য্য হারাইলেন—উন্মাদের ন্যায় প্রকাণ্ড একটি ঝম্প দিয়া ভিতর আঙ্গিনার মাঝে পড়িলেন—অতি বৃদ্ধ শরীরে বিষম আঘাত লাগিল—কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রুক্ষেপও নাই—তিনি ভূমিতল হইতে উঠিয়া গায়ের ধুলা গায়ে করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে অতি মৃদু পদবিক্ষেপে ভজন-মন্দিরের বারান্দার নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল—তিনি দেখিলেন গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি উপুড় হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া সজোরে নিজ মাথা কুটিতেছেন—আর কান্দিতে কান্দিতে বিলাপ করিতেছেন—

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে সুস্থির করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা দুইজনে দুই দিক হইতে প্রেমোন্মাদ-দশাগ্রস্থা প্রিয়াজির আলুলায়িত রুক্ষ কেশপূর্ণ মস্তক সজোরে ধরিয়া আছেন—আজ গৌর-প্রেম-পাগলিনীর জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ শরীরে যেন পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী যুবতীর মত বল—যতই সখিদ্বয় বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতেছেন—ততই তিনি অদ্ভুত বলপ্রদর্শন পূর্ব্বক মাথা কুটিতেছেন—আর কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন,—

—"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।"

পরিশ্রান্তা গৌর-বল্লভার ক্ষীণকণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে—গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আর যেন কথা কহিতে পারিতেছেন না,—তথাপি সেই ক্ষীণদেহে তিনি প্রচুর বলের কার্য্য করিতেছেন—গ্রহগ্রস্তের ন্যায় এক একবার ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিতেছেন—ছুটিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন—সখিদ্বয় তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া কোন গতিকে ধরিয়া বসাইতেছেন—তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় মস্তক ঢুলাইয়া দুই হস্তে নিজ কেশদাম ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া কান্দিতেছেন আর অস্ফুটস্বরে সেই এক কথাই বলিতেছেন,—

—"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"

অবশেষে অতি সাবধানে সখিদ্বয় প্রেমোন্মাদ-দশাগ্রস্থা প্রিয়াজিকে তোলা-তুলি করিয়া ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরের উন্মুক্ত বাতাসে একটী নির্জ্জনস্থানে লইয়া গিয়া শয়ন করাইলেন—তিনি এখন নীরব নিস্পন্দ,—জড়বৎ—তাঁহার এখন স্তম্ভভাব।

ঈশানকে কেহ দেখিতে পান নাই—ঈশান কিন্তু সকলি দেখিয়াছেন। তিনিও মূর্চ্ছিত হইয়া আঙ্গিনায় পড়িয়া আছেন—নীরব রোদনই তাঁহার ভজন-সম্বল—আর

এই ভজনই গৌরাঙ্গ-ভজন-সার। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং বলিয়াছেন—

"ব্রজের খেলা ছিল বন ভ্রমণ।
নদের খেলা এবার কেবলই রোদন॥"—
প্রাচীন পদ।

প্রভুপ্রিয়াজির ইচ্ছায় ঈশানের ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বহিরাঙ্গণে আসিলেন—তাঁহার অবস্থা কেহ দেখিতে পাইলেন না—তিনিও কাহাকেও বলিলেন না—কিন্তু তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার গৌরাঙ্গ-ভজন-বিধি দৃঢ়তর হইতে দৃঢ়তম বলবান হইল।

কেবলমাত্র দামোদর পণ্ডিত ঈশানের এই কাণ্ডকারখানার সকলি জানেন—তিনি তাঁহাকে দেখিয়া পরম প্রেমভরে দুই হস্তে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া গলাগলি করিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন এবং পরম স্নেহভরে তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। কোন কথা আর কহিতে পারিলেন না—কেবল ক্রন্দনের রোল—আর নয়নের ধারাতেই তাহাদের মনের ভাব পরিস্ফুট হইল।

প্রসঙ্গক্রমে, ঈশানের কথা—যাহা গৌরবল্লভা তাঁহার সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভকে জানাইয়াছিলেন—এখানে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার বিলাপ-গীতিতে ঈশানের কথা কি বলিতেছেন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

"প্রাণবল্লভ হে!
"ঈশানের দশা দেখি পরাণে মরি।
কোন মতে আছে সে যে পরাণ ধরি॥
জলবিন্দু নাহি খায়, কোথাও নাহিক যায়,
পাছু পাছু ফিরে যার দেহ আগোরি।
আমি যদি একা থাকি, পুরনারী দেয় ডাকি,
কি কাজ দিয়েছ তারে—কি দয়া মরি!
মাতা কিছু খেলে পরে, তবে সে আহার করে,
রাতে শুয়ে ডাকে সদা "হে গৌরহরি!"
ঈশানের দশা দেখি পরাণে মরি॥"
(সে যে) "মানুষ করেছে তোমা,—কোলে করিয়া।
না হেরে নদের চাঁদে মরে কাঁদিয়া॥
না দেখায় আঁখি-বারি, না যায় কাহারও বাড়ী,
কাহাকে বলে না দুখ,—রহে সহিয়া।
মুখ তুলে নাহি চায়, করে না সে হায় হায়,
মায়ের চরণ পানে রহে চাহিয়া॥
কথা ক'লে মুখ তুলে, বুক ভাসে আঁখি জলে,
অবনত মুখে যায়—কাজ করিয়া।
(সে যে) মানুষ করেছে তোমা—কোলে করিয়া॥"
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! কৃপাময়ী পাঠিকাবৃন্দ! বিরহিণী প্রিয়াজির নিকটে একবার চলুন। গৌর-প্রেমোন্মাদ-দশা-গ্রস্তা গৌরবল্লভা তাঁহার ভজন-মন্দির-বারান্দার একপার্শ্বে অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ভূমি-শয্যায় শয়ান আছেন—সখিদ্বয় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিতেছেন—এই অবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়া অতি বৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্য ঈশানের কথা আলোচনায় জীবাধম লেখকের যদি অপরাধ হইয়া থাকে—কৃপাময়ী গৌরবল্লভা সে অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন—তাঁহারই অতিপ্রিয় পুরাতন ভৃত্যের অপূর্ব্ব লীলাকথা—তাঁহারই শ্রীমুখে আমরা শুনিতেছিলাম—সুতরাং আমরা তাঁহার নিকটেই ছিলাম।

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের অন্তরঙ্গ সেবা শুশ্রূষায় এতক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন। তিনি ধীরে ধীরে এখন উঠিয়া বসিয়াছেন—এতক্ষণে তাঁহার মালাঝোলার কথা মনে পড়িয়াছে—তিনি আত্যান্তিক উৎকণ্ঠার সহিত সখি কাঞ্চনার প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"সখি! আমার মালা কোথায়?" কৃপাময় পাঠকপাঠিকার মনে স্মরণ থাকিতে পারে—বিরহিণী প্রিয়াজি যখন দৈববাণী শ্রবণে প্রেমোন্মাদ দশাগ্রস্তা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন—সেই সময়ে তাঁহার জপমালা হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—সখি কাঞ্চনা তাহা সযত্নে উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন—তিনি এক্ষণে তাহা আনিয়া প্রিয়াজির হস্তে দিলেন—তিনি তখন সংখ্যানাম জপারম্ভ করিলেন।

সখিদ্বয় দেখিতেছেন প্রিয়াজির কপাল ভীষণ ফুলিয়াছে—তিনি নিজেই তখন বেদনা অনুভব করিতেছেন এবং আপনিই আপনার কপালে হাত বুলাইতেছেন, আর বলিতেছেন—'সখি! আমি কি আজ কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ

করিয়াছিলাম—আমার কপাল ফুলিল কেন? কিছু বেদনাও অনুভব হইতেছে।" তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার অদ্ভুত কাষ্ঠ-পাষাণ-দ্রবকারী লীলাকথা বিস্তারিত কহিলেন,—শুনিয়া প্রিয়াজি লজ্জিতা হইলেন—আর কোন কথা কহিলেন না—সখিকাঞ্চনার ইঙ্গিতে একজন দাসী চূণ-হরিদ্রা গরম করিয়া আনিয়া দিল—সখিকাঞ্চনা তাহা প্রিয়াজির কপালে দিতে গেলে, গৌরবল্লভা ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিবার সাহস ও শক্তি সখিদিগের নাই। তবুও তাঁহাদের মন বুঝে না—তাই এ সকল করেন। প্রিয়াজি নবদ্বীপ-রজ নিজ হস্তে লইয়া কপালে দিলেন।

গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পরম প্রেমাবেগে তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া তখন কহিলেন—

সখি! রাগ-গাহিড়া।

'সন্ন্যাসী হৈয়া গেলা, পুন যদি ব হুড়িলা
নাহি আইলা নদীয়া নগরে।
হৃদয়ে হৃদয় ধরি, নিজ পর এক করি,
তার মুখ দেখিবার তরে॥
হরি হরি! গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা।
সবারে সদয় হৈয়া, মুঞি নারীরে বঞ্চিয়া,
এ শোক-সাগরে ভাসাইলা॥ ধ্রু॥
এ নব যৌবন কালে, মুড়াইলা চাঁচর চুলে,
কি জানি সাধিল কোন সিদ্ধি।
কি জানি পরাণ সে, পশুবৎ পণ্ডিত সে,
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসে দিলা বিধি॥
অক্রুর আছিলা ভাল, রাজা বোলে লৈয়া গেল,
থুইল লৈয়া মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়,
ভারতী করিলা দেশান্তরী।"
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, মরমে বেদনা পাঞা,
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
বাসুদেব ঘোষ কয়, মো সম পামর নাই,
তবু হিয়া না বিদরে আমার॥

গৌর পদ-তরঙ্গিণী।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে গৌরবিরহদগ্ধা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে প্রেমাবেগে অতিশয় কাতরভাবে ঢলিয়া পড়িলেন। তখন পুনরায় সখিদ্বয় মিলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

পদকর্ত্তা বাসু ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ—তিনি স্বচক্ষে প্রিয়াজির এই সকল কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহার পদে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার বিরহিণী প্রিয়াজির উক্তি আর একটী প্রাচীন পদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

রাগ-পাহাড়ী।

—"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতি তলে।
ওহে নাথ! কি করিলে, পাথারে ভাসাঞা গেলে,
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মুঞি অনাথিনী এড়ি,
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ,
তবে সে করিলা বনবাস।
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদ-মুখ না হেরিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাহি আশ।"

পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চিহ্নিত দাস। বিরহিণী গৌরবল্লভার অন্তরের ভাব বুঝিয়াই তাঁহারই বিশিষ্ট চেষ্টায় পণ্ডিত জগদানন্দ এবং দামোদর দ্বারা নীলাচল হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সংবাদ গৌর-বিরহ-শোকাকুলা গৌর-জননী ও গৌর-ঘরণীকে দিবার ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। এই পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের রচিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর উক্তি আর একটী প্রাচীন পদ শ্রবণ করুন,—

রাগ-ভূপালী।

—"হাদেরে পরাণ নিলজিয়া।
এখনও না গেলি তনু ত্যজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥

আর কি গৌরাঙ্গ-চাঁদে পাবে।
মিছা প্রেম আশ-আশে রবে ॥
সন্ন্যাসী হৈয়া পঁহু গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল ॥
কান্দি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণি ॥ গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌরবিরহোন্মত্তা প্রিয়াজিকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া সখিদ্বয় তাঁহাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা করাইলেন। তখন তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে ভজন-মন্দিরের দিকে চলিলেন। দুই সখি দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ টলমল করিতেছে—তিনি থর থর কাঁপিতেছেন। শীতল জলে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া এবং বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গৌর-বল্লভা ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এক্ষণে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে।

শ্রীধাম নবদ্বীপ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ।
২০শে আশ্বিন গৌরাব্দ ৪৪৪
মঙ্গলবার পূর্ণিমা।

(৪)

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির পরম করুণ-রসাত্মক লীলাকথা অত্যদ্ভুত—অশ্রুতপূর্ব্ব—অনন্ত এবং অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্ট চমৎকারিতাপূর্ণ। গৌর-বল্লভার গৌর-বিরহোন্মাদ-দশা বর্ণনা করিয়া যে সকল প্রাচীন মহাজনগণ পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে মহা ভাগ্যবান গৌরাঙ্গ-পার্ষদভক্ত শ্রীল বাসুদেব ঘোষ সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার ভ্রাতা মাধব ঘোষ লিখিত পাঁচটী পদ আছে—বৈষ্ণবকবি প্রেমদাসেরও দুটী পদ আছে। প্রাচীন পদকর্ত্তা রাধামোহন দাস, পরমানন্দ দাস, বল্লভদাস, জগন্নাথদাস, বসু রামানন্দ, গোবর্দ্ধন দাস ভুবন দাস এবং বংশীদাস রচিত কয়েকটী পদও দেখিতে পাওয়া যায়। পূজ্যপাদ নরহরি সরকার ঠাকুর এবং তাঁহার শিষ্য ঠাকুর লোচনদাসেরও এসম্বন্ধে পদাবলী আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বারমাস্যা—গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদ। এতগুলি প্রাচীন পদকর্ত্তার পদাবলী বর্ত্তমান থাকিতে বর্ত্তমান কীর্ত্তনগায়কগণ কেন যে এসকল বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক গৌর-লীলা গান করেন না—এ বড় দুঃখের কথা—এ বড় রহস্য-কথাও বটে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসগ্রহণের পর গৌর-বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কিরূপ ভজন-পদ্ধতি ছিল,—তাহা গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য শ্রীঈশান নাগর তাঁহার অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি শান্তিপুর-নাথের আদেশে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া স্বচক্ষে যাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। তখন শচীমাতা প্রকট ছিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদভক্ত। তিনি মধ্যে মধ্যে গৌর-শূন্য গৌরগৃহের সমাচার লইয়া গিয়া নীলাচলে সন্ন্যাসীঠাকুরকে দিতেন এবং সেখানকার সংবাদ আনিয়া শ্রীনবদ্বীপে শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিয়া তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিতেন। দামোদর পণ্ডিত মহাশয়ও কখন কখন এই কার্য্যে ব্রতী হইতেন। পণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর অভিমানী ভক্ত—তিনি সন্ন্যাসীঠাকুরকে তত ভয় করিতেন না—বরং সন্ন্যাসী ঠাকুরই তাঁহাকে ভয় করিতেন। দামোদর পণ্ডিত নিরপেক্ষ এবং উচিতবক্তা লোক ছিলেন, এই দুইজনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে গৌর-শূন্য গৌরগৃহের সকল সমাচারই দিতেন। তাঁহারা কিরূপভাবে দূতীর কার্য্য করিতেন তাহার নমুনা কিছু দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলে জীবাধম লেখক কৃতকৃতার্থ হইবে। পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবাধম লেখকের কাতর প্রার্থনা—

—"সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা' সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু কর মস্তক ভুষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সকল হবে শ্রম ॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মূলকথা ভুলিয়া গিয়া আত্ম-নিবেদন-রসে মত্ত হইয়াছি—ইহা "স্ব-সৌভাগ্য প্রখ্যাপন" মাত্র। আত্মশ্লাঘা ও প্রতিষ্ঠার দাস এই জীবাধম লেখক—তাহাকে আপনারা কেশে

ধরিয়া শাসন করুন—উদ্ধার করুন—ইহাই গৌরভক্তবৃন্দের চরণে তাহার কাতর প্রার্থনা।

জগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া ভক্ত-মণ্ডলী-বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে নদীয়ার গৌরশূন্য গৌরগৃহের কিরূপ হৃদিবিদারক সংবাদ দিতেছেন তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

এসকল লীলা-কথা শ্রবণে কঠিন চিত্ত আর্দ্র হয়—মলিন চিত্ত নির্ম্মল হয়,—দু' ফোঁটা অশ্রুজল পড়িলে হৃদয়ের মলিনতা বিধৌত হয়—এক কথায় কলিহত জীবের চিত্ত-শুদ্ধ হয়। সর্ব্বোপরি লাভ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলে দৃঢ়া ভক্তি হয়।

দামোদরপণ্ডিত কি বলিতেছেন এখন শ্রবণ করুন,—

—"তবে করযোড়েতে পণ্ডিত ক্রমে বোলে।
নদীয়ার ভক্তগণ আছয়ে কুশলে॥
শচীমাতার বৎসলতা নিরুপম হয়।
তোমার মঙ্গল লাগি দেবে আরাধয়॥
সাধুস্থানে আশীর্ব্বাদ লহয়ে মাগিয়া।
আশীষ করয়ে নিজে ঊর্দ্ধবাহু হঞা॥
বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার কথা কি কহিমু আর॥
তান ভক্তিনিষ্ঠা দেখি হৈনু চমৎকার॥
শচীমাতার সেবা করেন বিবিধ প্রকার।
সহস্রেক জনে নারে ঐছে করিবার॥
প্রত্যহ প্রত্যুষে গিয়া শচীমাতা সহ।
গঙ্গাস্নান করি আইসেন নিজ গৃহ॥
দিনান্তেই আর কভু না যান বাহিরে।
চন্দ্র সূর্য্যে তান মুখ দেখিতে না পারে॥
প্রসাদ লাগিয়া যত ভক্তবৃন্দ যায়।
শ্রীচরণ বিনা মুখ দেখিতে না পায়॥
তান কণ্ঠধ্বনি কেহ শুনিতে না পারে।
মুখপদ্ম ম্লান সদা চক্ষে জল ঝরে॥
শচীমাতার পাত্রশেষ মাত্র সে ভুঞ্জিয়া।
দেহ রক্ষা করেন ঐছে সেবার লাগিয়া॥
শচী-সেবা কার্য্য সারি পাইলে অবসর।
বিরলে বসিয়া নাম করেন নিরন্তর॥
হরিনামামৃতে তাঁর মহা রুচি হয়।
সাধ্বী-শিখা-মণি শুদ্ধ প্রেমপূর্ণ কায়॥
তব শ্রীচরণে তাঁর গাঢ় নিষ্ঠা হয়।
তাহান্ কৃপাতে পাইনু তাঁর পরিচয়॥
তব রূপ-সাম্য চিত্রপট নির্ম্মাইলা।
প্রেমভক্তি মহা মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
সেই মূর্ত্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদপদ্মে করি আত্ম-সমর্পণ॥
তান্ সদ্গুণ শ্রীঅনন্ত কহিতে না পারে।
এক মুখে মুঞি কত কহিমু তোমারে॥"

শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু বিনতবদনে নদীয়ার এই মর্ম্মান্তিক কাহিনীগুলি শুনিতেছেন—অলক্ষ্যে তাঁহার নয়নদ্বয় জল-ভারাক্রান্ত হইতেছিল—তাহা উপস্থিত ভক্তগণ কেহ দেখিবার সৌভাগ্য পাইলেন না। চতুর চূড়ামণি সন্ন্যাসী-ঠাকুরটি একটু বিরক্তির সহিত পণ্ডিত জগদানন্দকে কি বললেন তাহাও শ্রবণ করুন,—

—"মহাপ্রভু কহে—"আর না কহ এই বাত।
শান্তিপুরে আচার্য্যের কহ সুসম্বাদ॥"— অঃ প্রঃ

ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রকৃতির নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন না—কাজেই তাঁহার প্রাণবল্লভার ভজন-কথা পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রবণ নিষিদ্ধ। এই বাহ্যিক উক্তি তাঁহার আশ্রমোচিত বটে—কিন্তু ভক্তভাবোচিত নহে—কারণ প্রিয়াজি তাঁহার ভক্ত—তাঁহার ভজন-কথা তাঁহার নিকট অপ্রিয় হইবার কথা নহে।

গৌর-বল্লভা প্রিয়াজি সর্ব্বগুণের গুণমণি ছিলেন—তিনি রাজপণ্ডিতের কন্যা হইয়াও সর্ব্ববিধ গৃহকার্য্যে সুনিপুনা ছিলেন—গৃহশিল্প কার্য্যে সুদক্ষা ছিলেন—চিত্রকলা-বিদ্যায় তাঁহার বিশিষ্ট পারদর্শিতা ছিল। অদ্বৈতপ্রকাশ শ্রীগ্রন্থের পূর্ব্বোদ্ধৃত বর্ণনায় একস্থানে লিখিত আছে—

—"তব সাম্যরূপ চিত্রপট নির্ম্মাইলা।
প্রেমভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা॥
সেই মূর্ত্তি নিভৃতে করেন সুসেবন।
তব পাদপদ্মে করি আত্ম সমর্পণ॥"—

এই যে গৌর-বল্লভার স্বহস্তে অঙ্কিত চিত্রপটখানি ইহা গৌরভক্ত মাত্রেরই পরম সম্পত্তি—পরম ধন—পরম অমূল্য বস্তু। এই চিত্রপটখানি কলিহত দুর্ভাগ্য জীবের দুরদৃষ্ট বশতঃ এক্ষণে লুপ্ত কি গুপ্তভাবে কোথাও কিভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গৌর-বল্লভার

ভজনীয় এবং উপাস্য দেবতা ছিলেন—পূর্ব্বলীলার স্বপ্নদৃষ্ট—পরম মাধুর্য্যময় পরম সুন্দর বংশীধারী গৌর গোবিন্দমূর্ত্তি। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিশিষ্ট কৃপাপাত্র এবং চিহ্নিত দাস ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্য্যের স্বপ্নদৃষ্ট পুষ্পোদ্যানশোভিত শ্রীমায়াপুর যোগপীঠস্থ নদীয়া-নাগরীবেষ্টিত শ্রীরাসমণ্ডলস্থ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি। "ভক্তিরত্নাকর" শ্রীগ্রন্থে শ্রীনিবাসআচার্য্য ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব স্বপ্নবৃত্তান্তটি অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। গৌর-শূন্য গৌরগৃহে গিয়া তিনি এই অপূর্ব্ব স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন।

—"ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষয়।
স্বপ্নে প্রভু-গৃহে শোভা-বিলাস দেখয়॥
আগে দেখে স্বর্ণময় নদীয়া-নগর।
সুরধুনী-ঘাট রত্নে বাঁধা মনোহর॥
তারপর দেখে গৌরচন্দ্রের আলয়।
ইন্দ্রাদির সে স্থান শোভার যোগ্য নয়॥
কৈছে কুন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলা ভবন।
চতুর্দ্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর আবরণ॥
পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড সংখ্যা নাহি তার।
যবে যথা ইচ্ছা তথা প্রভুর বিহার॥
অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্প উদ্যান শোভয়।
তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময়॥
মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ।
তার তলে শোভাময় রত্ন সিংহাসন॥
সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলসয়।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া বাম দক্ষিণে শোভয়॥
নানা অলঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর॥
ভুবন মোহন শোভা করি নিরীক্ষণ।
লক্ষ লক্ষ দাসী—করে চামর ব্যজন॥
যোগায় তাম্বুল মালা চন্দন সকলে।
প্রিয়া সহ প্রভু বিলসয়ে সখি মেলে॥"

ভক্তি-রত্নাকর।

শ্রীধাম নবদ্বীপের ধামেশ্বর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের বাম পার্শ্বে স্বনামধন্য সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজির নবনির্ম্মিত সমাধি-মন্দিরের একটী প্রকোষ্ঠে সিদ্ধ বাবাজি মহাশয় পূজিত ও সেবিত এই ভাবের একখানি প্রাচীন চিত্রপট অদ্যাবধি তাঁহারই সেবকগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও সেবিত হইতেছেন। এই প্রাচীন চিত্রপট খানির ইতিহাস কেহ কিছু বলিতে পারেন না—সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় ইহা কোথায় পাইয়াছিলেন—তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন। ইহা আধুনিক মুদ্রিত চিত্রপট নহে। দেখিয়া বোধ হয় রসরাজ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ উপাসক কোন রসিক গৌরভক্তের দ্বারা এই অপূর্ব্ব চিত্রপটখানি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল। যাহা হউক শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি—আর গৌরবিরহিণী প্রিয়াজিসেবিত "রূপ সাম্য" শ্রীচিত্রপট মূর্ত্তির যে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা অনুভবী র[illegible] গৌরভক্তবৃন্দের আলোচনার বিষয় বটে।

এই অপূর্ব্ব চিত্রপট-সেবা গৌরশূন্য গৌরগৃহে সর্ব্বপ্রথমে গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পরে ধামেশ্বর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বর্ত্তমান প্রাচীন দারু-বিগ্রহ তাঁহারই আদেশে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌর-জন্ম-ভূমিতে ঠাকুর বংশীবদন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন—যাঁহার বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্যালক শ্রীযাদবাচার্য্যগোষ্ঠী। এই সকল লীলাকথা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

গৌর-বল্লভার এই অপূর্ব্ব চিত্রপট প্রতিষ্ঠার মহামন্ত্র হইল প্রেমভক্তি—আর নিভৃত ভজন হইল ইহার সাধন পদ্ধতি। আত্মনিবেদন এবং শরণাগতি হইল এই প্রেম-সেবার মুখ্য উপকরণ। তাই মহাজন ভক্তকবি লিখিলেন—

—"প্রেমভক্তি মহামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করিলা।"—

অন্যত্র,—

"সেই মূর্ত্তি নিভৃতে করেন সুসেবন;
তব পাদপদ্মে করি আত্ম সমর্পণ॥"—

গৌর-বল্লভার ভজন-রহস্য গৌরভজনবিজ্ঞ রসিকভক্ত মহাজনগণের নিজস্ব সম্পত্তি—নিজ গুপ্তবিত্ত—তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক যাঁহাকে এই সম্পত্তি কিঞ্চিৎ দান করেন, মাত্র তিনিই ইহার অধিকারী। ইহার নাম অনুরাগ ভজন—ইহার মন্ত্রাদি স্বতন্ত্র—সাধন-ভজন স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্রতার পরাকাষ্ঠা এই ভজনপ্রণালীতে দৃষ্ট হয়—ইহা গুরুমুখী বিদ্যা,—এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের ভজন শ্রীগৌর-সুন্দরের রসিকভক্ত সদ্গুরুচরণাশ্রয়েই শিক্ষণীয়। গৌরবল্লভার এই ভজন-সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী তাঁহারই কায়ব্যূহ

"নদীয়া-নাগরী" নামধারিণী অন্তরঙ্গা মর্ম্মী অষ্ট সখিবৃন্দ—তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধানা সখি কাঞ্চনা ও অমিতা—তাঁহাদেরই আনুগত্যে এই মধুর ভজন শিক্ষা করিতে হয়। এই অষ্ট সখির প্রত্যেকের আটটি করিয়া মঞ্জরী আছেন—তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের প্রেমসেবায় সখিগণের সহায়িনী। এ সকল ভজনরহস্য কথা—"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-মনন পদ্ধতি" গ্রন্থে বিবৃত আছে।

গৌর-বিরহিণী তপস্বিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দিবা-ভজন-পদ্ধতি কিছু কিছু পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার পট মূর্ত্তিসেবার কথা কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীতুলসীসেবা করিয়া তবে প্রিয়াজি ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বেই এ সকল কাজ শেষ হইত। তৎপরেই সখিদ্বয় তুলসী ও পুষ্পচয়ন এবং পূজোপকরণ প্রভৃতি সকলই উদ্যোগ করিয়া দিতেন। কটরা ভরা সুবাসিত চন্দন—ধূপ ধুনা দীপ—নবীন তুলসীপত্র এবং দলসহ নবীন মঞ্জরী—মল্লিকা মালতী কুন্দ প্রভৃতি সুগন্ধি শ্বেতপুষ্প—নৈবেদ্য—এই সকল গৌর-বল্লভার গৌর-গোবিন্দ-পূজার উপকরণ। সম্মুখে শ্রীপট-মূর্ত্তির পাদপীঠে তাঁহার প্রাণবল্লভের কাষ্ঠপাদুকা—সামান্যাকার একখানি মলিন আসনে উপবিষ্টা হইয়া গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী প্রেমানন্দে তাঁহার প্রাণবল্লভের অনুরাগ ভজন করিতেন। শ্রীপাদ জগন্নাথমিশ্র ঠাকুরের গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণশিলা সেই গৃহে প্রিয়াজি দ্বারাই পূজিত ও সেবিত হইতেন। যথা—

—"অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসী মঞ্জরী॥
মন্দিরে বসিয়া করেন হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপ তণ্ডুল কিছু রাখেন নিজস্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হইলে একটী তণ্ডুল।
রাখেন সরাতে অতি হৈয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্ব্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখেন পাত্র শেষ।
ভক্ত আইসে সবে পাইয়া আদেশ॥
বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণ মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আস্ পাশ।
একত্র হ'য়ে অভ্যন্তর যান সব দাস॥
তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্ত শরণ যাতে অতি কৃপাপাত্র॥"—

* * * *

—"তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করয়ে।
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি।
যে কেহ আইসে তার হয়ে বরাবরি॥
প্রসাদ পাইয়া যথা স্থানে যাইয়া।
রহে যথা কথঞ্চিৎ আহার করিয়া॥"—

অনুরাগ-বল্লী।

গৌর-বিরহকাতর নদীয়ার একান্ত গৌরনিষ্ঠ ভক্তগণ গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কঠোর ভজনাদর্শ এবং উৎকৃষ্ট বৈরাগ্যাচরণের ভাবসম্পদ লাভের জন্য দিবানিশি গৌর-চরণে মাথা কুটিয়া কুটিয়া কত না প্রার্থনা করিতেছেন,—তাঁহারাই গৌরবক্ষ-বিলাসিনীর নির্জ্জন-ভজনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছেন—তাঁহারাই প্রিয়াজির কৃপায় বুঝিয়াছেন—গৌর বড় দুঃখের ধন—সুখে আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই—দুঃখে তাঁহাকে পাই,—কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণচরণে দুঃখই প্রার্থনা করিয়াছিলেন— দুঃখ না থাকিলে সুখের অনুভব হয় না—অন্ধকার না থাকিলে আলোকের কদর নাই—দুঃখ না থাকিলে সুখের অস্তিত্বই থাকে না। জীব নিরবচ্ছিন্ন সুখ চায়—দুঃখের লেশাভাসও তাহাদের সহ্য হয় না। নিরবচ্ছিন্ন সুখাশা ভ্রমাত্মক ধারণা।

এই যে গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর কঠোর গৌর-ভজন-প্রণালী,—এই যে তাঁহার বিকট-বৈরাগ্য—ইহা তপ্ত-ইক্ষু চর্ব্বণবৎ পরম সুখপ্রদ। শ্রীভগবান সম্বন্ধে বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনে সাধকের অন্তর্বাহ্যে যে একটা দুঃখের আবরণ দেখা যায়—তাহা অত্যাত্মিক দুঃখ নহে—জাগতিক হাহাকার নহে—প্রাকৃতিক মায়ার প্রাপঞ্চিক ক্রীড়া নহে। ইহা আধ্যাত্মিক সুখাবস্থা—যাহাকে শাস্ত্রে ভজন-রহস্য-সার পরাবস্থা বলে। শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির মূলমন্ত্রই বৈরাগ্য—ইহা

জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে সাধক-হৃদয়ে পরমানন্দ দান করে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্ত এবং প্রাণপ্রেয়সী সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার কৃপাসিন্ধু পার্ষদভক্তরাজ পূজ্যপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—

—"বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ—
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষপুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীর-ধারী—
কৃপাম্বুধি র্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

গৌরবল্লভা যখন ভজনে বসিতেন একাসনে বসিয়া তৃতীয় প্রহর কাল সংখ্যা শ্রীনামজপে তিনি মগ্ন থাকিতেন। পূজার সময় অগুরুচন্দনসিক্ত কোমল দলসহ এক একটী তুলসী-মঞ্জরী তাঁহার প্রাণের প্রাণ সর্ব্বস্বধন শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দচরণে অর্পণ করিতে বহু সময় লাগিত—তিনি নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের চরণে যখন এইভাবে তুলসী অর্পণ করিতেন, তখন তাঁহার নয়নদ্বয় যেন শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-সরোজে লিপ্ত হইয়াই থাকিত–তাঁহার প্রেমাশ্রু তাঁহার প্রাণবল্লভের চরণ-দর্শন-সুখের বাদী হইত। তাই বিরহিণী গৌরবল্লভা বাম হস্তে নিজ বসনাঞ্চলে এক একবার নয়ন মুছিতেছেন আর মনে মনে কহিতেছেন,—

—চাহিনা প্রেমাশ্রু, যাও দূরে যাও,
চাহি না তোমাকে আমি।
(আমার) গৌর-চরণ, গৌর-বদন
দরশনে তুমি বাদী" ॥

গৌর-গীতিকা

এই ভাবে গৌর-বল্লভার অভীষ্টদেবের প্রেমপূজা সমাপন করিতে বহু সময় লাগিত,—তাহার উপর তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রাণবল্লভের গৃহদেবতা নারায়ণেরও পূজা করিতেন। গোলোকের মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের নারায়ণের পূজা এবং উপাসনা করিতেছেন—এ বড় নিগূঢ় রহস্য-কথা—শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের স্বরূপশক্তি লীলাময়ী সনাতন-নন্দিনীর এ বড় অদ্ভুত নর-লীলারঙ্গ। তিনি আদর্শ পতিপ্রাণা সতিসাধ্বী বৈষ্ণব-গৃহিণী—স্নেহবাৎসল্যময়ী আদর্শ বৈষ্ণবজননী—তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের সর্ব্বোত্তম নরলীলার সহায়িনীরূপে সর্ব্বভাবে তাঁহার গৃহস্থ-লীলার যে আচরণ করেন, তাহা কেবল লোকশিক্ষার জন্য। স্ত্রীলোকের শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিতে নাই—এই স্মার্ত্তমতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন পূজ্যপাদ গোস্বামিচরণগণ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার প্রাণবল্লভের আদেশে স্বয়ং আচরণ করিয়া তৎপূর্ব্বেই সে বিধি প্রচলন করিয়াছিলেন নিজ মন্দিরে এবং তাৎকালিক নবদ্বীপবাসী মুষ্টিমেয় প্রাচীন বৈষ্ণব-গৃহে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃতে লিখিত আছে,—

—"বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তবে সমাপি রন্ধনে।
শচীর আদেশে গেলা ভোগের সদনে॥
উভারিলা ভাত বহু সুবর্ণ থালেতে।
সারি সারি রাখিলেন সিক্ত করি ঘৃতে॥
ব্যঞ্জনাদি যত কিছু রন্ধন করিল।
ক্রম করি তাহা সব পাশেতে ধরিল।
পক্কান্নাদি করি আর যতেক আচারে।
নি-সকড়ি প্রথম ধরিল থরে থরে॥
সুবর্ণ ভাজনে জল সুবাসিত করি।
কর্পূর সহিত ছানি রাখিলেন ধরি॥
রতন সম্পুটে ধরি উত্তম তাম্বুল।
লবঙ্গ এলাচি আদি যত অনুকূল॥
তুলসী মঞ্জরী অন্ন উপরে ধরিল।
শালগ্রামে সমর্পিয়া আচমন দিল॥
তবে শচীদেবী বড় হরষিত মনে।
গণ সহ পুত্র বোলাইলেন ভোজনে॥"—

গৌর-বল্লভার ভজনরীতি ও সাধনপদ্ধতি আনুষ্ঠানিক সদাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—শচীমাতার নিকট তিনি সদাচার শিক্ষা করিয়াছিলেন—আর সেই সদাচার তিনি আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন

শ্রীচিত্রপট-সেবা করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিতেন। সখিদ্বয় মালা গাঁথিয়া দিতেন! বিরহিণী প্রিয়াজি যখন তাহার প্রাণ-বল্লভকে সুগন্ধি মালতী ফুলের মালা পরাইয়া দিতেন, নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত—তিনি কাতরকণ্ঠে প্রেম-গদগদ বচনে আত্মনিবেদন করিতেন,—

যথারাগ।

"প্রাণবল্লভ হে!
—"কি দিয়ে আমি, সাজাব তোমা,
চির দিন তুমি সুন্দর।

বস হে তুমি, উজল করি,
মম মানস-মন্দির ॥
মাধুরী-মাখা, করুণা-ভরা
তোমার বদন-ইন্দু।
যখনি চাহি উথলি উঠে
মহান্ ভাব-সিন্ধু ॥
সুন্দর দুটি নয়নদ্বয়ে,
বহিছে ধারা নিত্য।
প্রাণ-মাতান সঙ্কীর্ত্তনে
মনোহর তব নৃত্য ॥
বাহু দোলনি তেরছ চাহনি,
মহাভাবে তুমি মত্ত।
চারু চরণে, বাজে নূপুর,
তুমি হে পরম তত্ত্ব ॥
কুঞ্চিত কেশ, প্রসর ভাল,
অপরূপ তব সজ্জা।
সুন্দর রূপ, কান্তি-নিলয়,
কামিনী কুলের লজ্জা ॥
বক্ষ বিশাল স্বর্ণ-বরণ
রাতুল চরণ দ্বন্দ্ব।
লম্বিত ভুজ ক্ষীণ কটিতট
অঙ্গে পদ্ম-গন্ধ ॥
বাক্য রসাল, প্রেম-বিহ্বল,
রসিকরাজ নটেন্দ্র।
করুণা-সিন্ধু পতিত-পাল,
প্রেমময় গৌর-চন্দ্র ॥
হৃদি-মন্দিরে, দাঁড়ায়ে নাথ!
কর হে মধুর নৃত্য।
বক্ষ উপরে, পাদ-পরশ,
হরিদাস তব ভৃত্য ॥"—

গৌর-গীতিকা।

গৌর-বল্লভার এই ভাবের গৌর-ভজন-পদ্ধতি,—এই ভাবের প্রেম-সেবা-রীতি—এই ভাবের আত্মনিবেদন ও শরণাগতি তাঁহার সখিবৃন্দের আনুগত্যে শিক্ষণীয়—একথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। রাগমার্গের এই ভজন সম্বন্ধে সকলের অধিকার নাই। নদীয়ার এই মহাগম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার এই জন্য রুদ্ধ—সাধারণ ভক্তের এখানে প্রবেশ নিষেধ।

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির দিবাভজনের সর্ব্বশেষ আত্ম-নিবেদনটি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

প্রাণবল্লভ হে!
—"তোমার বিরহ, বড়ই অসহ, তুমিই কর হে শান্ত।
তুমি বিনে আর, কে আছে আমার, তুমি হে পরাণ কান্ত ॥
তোমার বদন, তোমার নয়ন, তোমারি মাধুরী কান্তি।
মানসে ভাবিয়া, স্বপনে হেরিয়া, পাই আমি হৃদে শান্তি ॥
ও চারু চরণ, করিয়ে স্মরণ, ভুলে যাই আমি বিশ্ব।
ও সুধা বচনে, ছুটে যে পরাণে, অমিয়া ধারার উৎস ॥
শুনিতে শুনিতে, পারি না থাকিতে, প্রাণ হয়ে উঠে মত্ত।
ব্যাকুল হৃদয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, ভাবিহে তোমারি তত্ত্ব ॥
চকিতে আসিয়া, রূপ ঝলসিয়া, কর তুমি আঁখি অন্ধ।
দেখি দেখি করি, দেখিতে না পারি, হয়ে যাই আমি ধন্ধ ॥
বলি বলি করি, বলিতে না পারি, হয়ে যায় স্বরভঙ্গ।
অধিনীর সনে, বসিয়া নিজনে, একি হে তোমার রঙ্গ ॥
শুনি শুনি করি, শুনিতে না পারি, প্রেমকথা এক বর্ণ।
প্রাণ কেঁদে উঠে, আঁখি-ধারা ছুটে, বধির হয় সে কর্ণ ॥
তুমি মম নাথ, লয়ে মোরে সাথ, করহে বিরহ শান্তি।
এ হরিদাসিয়া, তোমারি রসিয়া, করনাক' মনে ভ্রান্তি ॥"—

গৌর-গীতিকা।

এইভাবে আত্মনিবেদনের পর গৌর-বল্লভা কিছুক্ষণ গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগ্ন থাকিতেন—এই কীর্ত্তনে কাহারও যোগ দিবার অধিকার ছিল না—আপন মনে আপনার ভাবে গৌরবল্লভা গৌর-কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিতেন। তাঁহার আদেশ-বাণী নির্জ্জনে প্রচার করিতেন, যথা,—

"গাওরে মন, গৌরাঙ্গ-গুণ,
গৌর-নাম কর সার।
জনে জনে ধরি জাতি না বিচারি,
(গৌর) নাম কর পরচার ॥"

গৌর-গীতিকা।

ইহার পরই তাঁহার শ্রীমুখে যে ভাবে গৌর-কীর্ত্তনের শুভারম্ভ হইত তাহার আভাস মাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

—"গৌর আমার—প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-মন-চোরা।
গৌর আমার—মানিক-মালা, আলো-ভুবন-ভরা ॥

গৌর আমার—সাজের তারা, উজল পরশ-মণি।
গৌর আমার—কণ্ঠ-ভূষণ, বিমল হীরক-খনি ॥
গৌর আমার—পরাণ সখা, সদাই থাকেন সঙ্গে।
গৌর আমার—হৃদয়ে ব'সে, খেলেন নানা রঙ্গে ॥
গৌর আমার—নয়ন-তারা, হারাই যেন পলকে।
গৌর আমার—সাধন ধন, হেরি হৃদয়-ফলকে ॥
গৌর আমার—ক্ষুধা তৃষ্ণা, জীবনের জীবন।
গৌর আমার—আহার নিদ্রা, হৃদয় প্রাণধন ॥
গৌর আমার—ভাই বন্ধু, পুত্র-কন্যা জননী।
গৌর আমার—পিতার পিতা, তিনিই ঘরের ঘরণী।
গৌর আমার—বসন ভূষণ, সম্পদ অভিমান।
গৌর আমার—জনম মরণ, ভজন সাধন জ্ঞান ॥
গৌর আমার—হৃদয়-চাঁদ, শিশুর মুখের হাসি।
গৌর আমার—পরাণ-কান্ত, স্বরগ অমিয়া রাশি ॥
গৌর আমার—হৃদয়ানন্দ, প্রেমের সুধার ধারা।
গৌর আমার—কণ্ঠ-মালা, বদন চাঁদের পারা ॥
গৌর আমার—হৃদয়-রতন, চঞ্চল চিতচোরা।
গৌর আমার—অষ্টসিদ্ধি, ভক্তিরসে গড়া ॥
গৌর আমার—মোক্ষ মুক্তি—ত্রিবর্গ ফলদাতা।
গৌর আমার—ত্রিতাপহারী, পাতকী পরিত্রাতা ॥
গৌর আমার—দেবের দেব, সর্ব্বসিদ্ধি দাতা।
গৌর আমার—পরম তত্ত্ব, জগজ্জন-বিধাতা ॥
গৌর আমার—সাধন ধন, গৌরময় এ দেহ।
গৌর আমার—শান্তি সুখ, প্রেম-মিলন-বিরহ ॥
গৌর আমার—আমি গৌরের শ্রীচরণের দাসী।
গৌর-বিরহে—সতত দহে, পাতকী হরিদাসী ॥"—
গৌর-গীতিকা।

তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সংখ্যানাম জপ,—তার পর এইরূপ অনুরাগপূর্ণ আত্মনিবেদন ও কাতর প্রার্থনা-বাণী শেষ করিয়া তবে ভজনানন্দী গৌর-বল্লভা ভজনমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। অতঃপরও পুনরায় তুলসী পরিক্রমা—প্রণাম—স্তুতি-বন্দনা প্রভৃতি—সর্ব্বশেষে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থ "কিরিটী-হারী-হিরণ্ময়বপু" শ্রীগৌর-গোবিন্দের ঐশ্বর্য্যময় শ্রীমূর্ত্তিকে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রণাম। তার পর অন্তঃপুরে গিয়া হস্তপদাদি ধৌত করিয়া পাকগৃহে গমন—তাহার পরের দৈনন্দিন কৃত্য পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে জীবাধম লেখকের কপট ক্রন্দনপূর্ণ তথাকথিত আত্মনিবেদনের পদটি শ্রবণ করিয়া কৃপাময় পাঠক ও কৃপাময়ী পাঠিকাবৃন্দ নিজ নিজ মনের কপটতা পরিহার করুন। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন প্রাণের আবেগে নিম্নলিখিত পদটী রচনা করিয়াছিলাম—

"অয়ি মঙ্গলময়ি! প্রেম-রূপিণী
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়ে।
দীনহীন আমি, প্রেমধন নাহি,
পূজিব তোমায় কি দিয়ে ॥
পুষ্পাঞ্জলি, প্রার্থনা-বাণী,
প্রেম না থাকিলে কিছু না ॥
প্রেমময়ী তুমি, প্রেমাকাঙ্ক্ষী আমি,
অধমে কর গো করুণা ॥
জগভরি খুঁজি, পাবে নাক' তুমি,
মো সম পাতকী দুইটী।
জগতের মাঝে, ধরমের সাজে,
পতিত অধম কপটী ॥
তোমার কৃপায়, পা'ব প্রেমধন,
পাব প্রেমময় গৌরাঙ্গ।
(এই) আশার আশায়, বান্ধিয়া বুক,
তাই লইয়াছি সঙ্গ ॥
ছাড়িব না ওগো, তোমার চরণ,
না করিলে কৃপা অধমে।
চরণের রেণু, করে রাখ তুমি,
ঠেল না দাসীরে চরণে।
মনের ভরমে, জানি নাই তোমা,
বৃথায় জীবন কাটানু ॥
মরমে মরিয়া, কাঁদিতেছি তাই,
পরাণের কথা কহিনু ॥
ধরম করম, ভজন সাধন,
কিছু নাই মোর নারকী।
শিশুর সম্বল, কেবল রোদন,
তুমি শিখায়েছ তাই কি?
সাধনের পথ, খুঁজিয়া না পাই,
শিশুর সম্বল ধরিব।
চরণ ধরিয়া, ধূলাতে লুটায়ে,
শিশুর মতন কাঁদিব ॥

দয়াময় তুমি, আমি গো কাঙ্গাল,
(আর) কতদিন ভবে কাঁদাবে।
কেঁদে হরিদাসী, প্রাণে গেল মরি,
মরে গেলে আর কি দিবে?
জীবন থাকিতে, যা কিছু দিবার,
দাও তারে কৃপা করিয়া।
শেষের সম্বল, গৌর-প্রেমধন,
পায় যেন হরিদাসিয়া॥"—
গৌর গীতিকা।

মহা কপটীর এই কপট প্রার্থনা গৌর-বল্লভার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না—তাহা তিনিই জানেন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলাকথা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ,
২৩এ আশ্বিন, সন ১৩৩৭।
শুক্রবার।

(৫)

পৌষ-সংক্রান্তির শেষ রাত্রি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণ,—নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার বন্ধ—দারুণ শীত—গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার ভজন-মন্দিরে তখনও নির্জ্জন ভজন-মগ্না। মন্দিরের দ্বারের দুই পার্শ্বে এই দারুণ শীতে সামান্ত একখানি ছিন্ন কম্বলের উপর ছিন্নকন্থা গাত্রে দিয়া সখি কাঞ্চনা এবং অমিতা শয়ন করিয়া আছেন—তাঁহারা নদীয়ার মহ-গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার-রক্ষিকা। তাঁহারাও নির্জ্জন ভজনরতা—তাঁহাদেরও নয়নে নিদ্রা নাই—দেহানুসন্ধান নাই—গৌর-বল্লভার ভজন-কঠোরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহারা বিষম শঙ্কিতা এবং মর্ম্মাহতা ও মহা চিন্তিতা। শেষ রাত্রির সেই দারুণ শীতে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি মন্দির মধ্যে ভূমিতলে শায়িতা—ছিন্ন একখানি কম্বল মাত্র তাঁহার শীতের সম্বল—সেখানিও দূরে পড়িয়া রহিয়াছে—গবাক্ষদ্বার দিয়া সখি কাঞ্চনা দেখিতেছেন তাঁহার প্রিয়সখি পাগলিনীর ন্যায় একবার উঠিতেছেন—একবার বসিতেছেন—আর আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে প্রেমগদগদ বচনে গুণগুণ শব্দে করুণ-স্বরে গৌর-বিরহ-গীতির ধুয়া ধরিয়াছেন,—

রাগ-বিভাস।

—"সো বহুবল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমার করিতে চাই এক্কা।
হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সজনি গো! মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ-মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
কে চুরি করিল মন-চোরে॥
লও কুল, লও মান, লও শীল, লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দাও মোরে গোরা নিধি, যাহে চাহি নিরবধি
সেই মোর সরবস ধন॥
ন তু সুরধুনীনীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণ,
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা॥"
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখিদ্বয় উভয়েই অলক্ষিতে গবাক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া গৌ[illegible] বিরহিণী প্রিয়াজির এই সকরুণ গৌর-বিরহোচ্ছাসপূর্ণ মর্ম [illegible] বেদনার দুঃখ-কথা শুনিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতে[illegible] ছেন—আমাদের প্রিয় সখি আমাদেরই সম্বোধন করি[illegible] তাঁহার বিরহ-কাহিনী বলিতেছেন—অথচ আমরা কেহ [illegible] তাঁহার নিকটে নাই—এ বড় দুঃখের বিষয়—আমাদে[illegible] এ বড় মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা। বাহিরে আসিলে আ[illegible] প্রিয়সখিকে জিজ্ঞাসা করিব যখন তিনি আমাদের না[illegible] স্মরণ করেন আমাদের ডাকেন,—তখন ভিতরে প্রবেশাধিকার দেন না কেন? এই অধিকারে আমর[illegible] বঞ্চিত কেন? এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় নদীয়াবাসী গৌরভক্তগণ গৌর শূন্য গৌর-গৃহদ্বারে আসিয়া প্রভাতী কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

ভৈরবী-রাগ।

জাগহ জগজীবন নব নদীয়াপুর চান্দ হে!
মঙ্গলময় মঙ্গল ভূপ, গোরোচনা রুচির রূপ,
রসময় রস-বিবশ, রসিকভূষণ রস-কন্দ হে॥ ধ্রু॥
সুন্দর-বর-কুন্দ-রদন, রমদ-মৃদু-মঞ্জু-বদন,
চারু চপল, লোচন-জন, লোচন-মন-ফন্দ হে!

বন্ধুর-উর-মধুর-দাম, চঞ্চল নয়নাভিরাম,
ধৃতি-ভর-হর ধৈর্য্য-ধাম, কাম-দলত শন্দ হে।
শোভাকর-কুটিল-কেশ, নিরুপম-ধৃত-ললিত-বেশ,
ভকত-হৃদয়-সরসি হেম, সরসিজ কৃত দ্বন্দ্ব হে।
সিংহগ্রীব-বিমল-কর্ণ, তিলকিত-চন্দন-সুবর্ণ,
মেঘাম্বর-ধর নটেন্দ্র-নন্দিত, প্রিয়বৃন্দ হে।
গুণমণি-মন্দির-মনোজ্ঞ, গতি-জিত কুঞ্জর কৃতজ্ঞ,
ভব-ভয়-হর-ভঞ্জন-পদ, বৃন্দারক-বন্দ্য হে।
নরহরিপ্রিয়-হিয়াকি বাত, কি কহব কছু কহি ন জাত,
আজু তোহারি শয়ন হেরি, লাগত মোহে ধন্ধ হে॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

আর একদল কীর্ত্তন আসিল—তাহারা গাহিতে লাগিল—

রাগ-ধানসী।

—"উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল॥
কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি।
কত নিদ্রা যাও ওহে গোরা-গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
শশধর তেজল কুমুদিনী বাস॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গৌর প্রেমের অলসে॥"—

গৌর পদ-তরঙ্গিণী।

তৃতীয় কীর্ত্তনের দল আসিয়া গাইল,—

রাগ ভৈরব একতালা।

—"সোঙর নব, গৌর সুন্দর, নাগর বনোয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু, করুণা-সিন্ধু, ভকতবৎসল-কারী॥
বদনচন্দ, অধরকন্দ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ
চন্দ্র-কোটি-ভানুমুখ, শোভা বিছুয়ারী।
কুসুম-শোভিত চাঁচরচিকুর, ললাটে-তিলক নাসিকা উপর
দশন-মোতিম-অমিয়-হাস, দামিনী ঘনয়ারী॥
মকর-কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড, মণি-কৌস্তভ দীপ্তকণ্ঠ,
অরুণ-বসন, করুণ-বচন, শোভা-অতি-ভারি।
মালা-চন্দন-চর্চ্চিত-অঙ্গ, লাজে-লজ্জিত-কোটি-অনঙ্গ,
চন্দন-বলয়া রতণ নূপুর, যজ্ঞসূত্রধারী॥
ধায়ত গাওত ভকতবৃন্দ, কমলা-সেবিত-পদদ্বন্দ্ব,
ঠমকে-চলত-মন্দ-মন্দ, যাউ বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর-চরণে করত আশ,
পতিতপাবন নিতাইচাঁদ, প্রেমদানকারী॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

চতুর্থ কীর্ত্তনের সর্ব্বদল শেষে আসিয়া মধুরস্বরে আর একটী প্রভাতী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"জাগ জাগ ওহে জীবন গোরা, জগজন-মন-নয়ন-চোরা,
না জানিয়ে কিসে হইয়ে ভোরা, ঘুমাএগ্রা রয়েছ বিয়ান বেলে।
আঁখি খুলি দেখ পোহাইল নিশি, জাগিল এসব পড়বাসী,
ত্যেজি দুখ সুখ-সাগরে ভাসি, হাসি করে তারা কতেক ছলে।
আর বলি এই নদীয়াপুরে,
কতরূপে সভে প্রশংসা করে,
ধাইয়া আইসে তারা তোমার ঘরে,
ইথে কিছু লাজ না বাস মনে।
একি বিপরীত অলস ধর,
প্রভাত হইলে উঠিতে নার,
বল দেখি রাতে কি কাজ কর,
সুঘর হইয়ে এমন কেনে॥
ময়ূর ময়ূরী পৃথক্ আছে,
কেহ না আইসে কাহারও কাছে,
বিরস হৈয়া রৈয়াছে গাছে,
তুমি না নাচিলে না নাচে তারা।
ভ্রমরা ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে,
ভুলি না বৈসয়ে কুসুমপুঞ্জে,
কারে শুনাইব বলি না গুঞ্জে,
ফিরয়ে বিপিনে ব্যাকুল পারা॥
চকোর ও মুখ শশীর ছাঁদে,
রত হৈয়া ছিল গগন চাঁদে,
সে হৈল ম্লান এ পড়িয়া ধান্দে,
কান্দে অতি দুখে বলে কি হবে।
তারে সুখী কর সুখের রাশি,
উঠি আঙ্গিনাতে দাঁড়াহ আসি,
নহিলে বিষম মনেতে বাসি,
নরহরি দোষ ধুলে না যাবে॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্যামের বাঁশির ন্যায় কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতি ব্যস্ত হইয়া আলুথালু বেশে

তাঁহার ভজন-মন্দিরের অর্গল খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে—আলুলায়িত কেশদাম,—উন্মাদিনীর ন্যায় কীর্ত্তনের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিতেছেন—এবং উৎকর্ণ হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। সখিদ্বয়ের অবস্থাও তদ্রূপ—তাঁহাদের মুখেও কোন কথা নাই—অন্য কোন কাজ নাই। দলে দলে নদীয়াবাসী কীর্ত্তনীয়া আসিয়া গৌরশূন্য গৌর গৃহদ্বারে কীর্ত্তন করিয়া নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইল—এই সকল কীর্ত্তনীয়া গৌরভক্তবৃন্দ প্রত্যহ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেন। গৌর-বল্লভা সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিয়া সখি কাঞ্চনাকে অস্ফুট ক্রন্দনের স্বরে রুদ্ধকণ্ঠে প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—সখি! প্রিয় সখি! এ অভাগিনীর প্রতি প্রাণ-বল্লভের আদেশ—নবদ্বীপে সঙ্কীর্ত্তন যেন বাদ না পড়ে'—তোমাদের নদীয়া-নাগর সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের আদেশ তোমরা নবদ্বীপবাসিনী নারীবৃন্দ আপন গৃহে গৃহে পালন করিয়া আমাকে বিনিমূলে কিনিয়া লও"—এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনা ও অমিতার গলদেশে দুই বাহু বেষ্টন করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সখিদ্বয় প্রিয়াজির এই সকাতর অনুরোধ এবং সনির্বন্ধ প্রার্থনাটি নদীয়াবাসিনী রমণীবৃন্দকে জানাইয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ ঠাকুর জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আছে যথা—

—"নিত্য সঙ্কীর্ত্তন করে, বিহার নদীয়াপুরে
ভোজন-শয়ন-সুখ ছাড়ি।
বৈষ্ণবী মালিনী সীতা, নারায়ণী ধাত্রী মাতা,
গদাধর জগদানন্দে বেড়ি॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া, হরিনাম মন্ত্র দিঞা,
সভারে কহিল একে একে।
শুন রে নদীয়ার লোক, ছাড়িয়া সংসার শোক,
কীর্ত্তন করহ প্রেম-সুখে॥
কীর্ত্তন সকল কর্ম্ম, কীর্ত্তন সকল ধর্ম্ম,
কীর্ত্তন সকল ব্রহ্মজ্ঞান।
কীর্ত্তন আগম বেদ, রাজসূয় অশ্বমেধ,
কীর্ত্তন শ্রবণ গঙ্গাস্নান॥
কীর্ত্তন সকল তীর্থ, কীর্ত্তন আবেশ নৃত্য,
শিব-শুক-নারদ গোচর।
কীর্ত্তন বৈকুণ্ঠ-পদ, কীর্ত্তন সমুদ্র নদ,
কীর্ত্তন সভার পরাপর॥
কীর্ত্তন শ্রবণ মাত্রে, অধর্ম্ম না রহে গাত্রে,
কীর্ত্তন-দর্শন পাপক্ষয়।
কীর্ত্তন রসের ভক্তি, কীর্ত্তন নর্ত্তক মূর্ত্তি,
কীর্ত্তন মার্জ্জনে সর্ব্বজয়॥
কীর্ত্তন গায়ন সর্প্প, সে সব হয় গন্ধর্ব্ব,
নৃত্যক ইন্দ্রপদ পান।
কীর্ত্তন ভারত পুরাণ, তপ জপ দান ধ্যান,
কেহ নহে কীর্ত্তন সমান॥
এই কথা কহি রঙ্গে, প্রিয় গদাধর সঙ্গে,
কৌতুকে ভ্রমিলা নবদ্বীপে।
সতী সনাতন-সুতা, বিষ্ণুপ্রিয়া পতিব্রতা,
ডাকিয়া আনিল সমীপে"—

সখি কাঞ্চনার প্রতি গৌর-বল্লভার আদেশ-বাণী নদীয়া-বাসিনী রমণীবৃন্দের মধ্যে প্রচারিত হইলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মাতৃতুল্যা পূজনীয়া শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী, অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী, ধাত্রীমাতা নারায়ণী প্রভৃতি বর্ষীয়সী বৃদ্ধা রমণীগণ জগদানন্দ ও গদাধরকে সঙ্গে করিয়া নদীয়ার গৃহে গৃহে গিয়া হরিনাম মহামন্ত্র ও কীর্ত্তনমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-নাটুয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ পালন করিয়াছিলেন—তাঁহার বক্ষবিলাসিনী, বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রাণে অসীম আনন্দ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে আরও বুঝা গেল তৎকালেও স্ত্রী-প্রচারকের অভাব ছিল না। স্ত্রীপুরুষে ভিন্নভাবে স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী গৌরধর্ম্ম প্রচার, হরিনাম মহামন্ত্র দান দ্বারা কলিজীবোদ্ধার কার্য্যে তাঁহারা সকলেই সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

সখিদ্বয় প্রিয়াজিকে লইয়া তখন অন্তঃপুরে গমন করিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের আত্মনিবেদনের পদটীর কথা তুলিয়া সখি কাঞ্চনা অতি সন্তর্পণে প্রিয় সখিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি! প্রিয়সখি! তুমি যে রুদ্ধদ্বার ভজনগৃহে বসিয়া আমাদের সম্বোধন করিয়া বলিলে—

—"সজনি গো! মনের মরম কহি তোরে।"—

আমরা ত বাহিরে থাকি—তোমার নিকটে থাকিবার অধিকার ত তুমি আমাদিগকে দাও নাই—তবে "সজনি গো" বলিয়া ডাক কেন? সখি কাঞ্চনার ইহা অভিমানের কথা—প্রিয়াজি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "প্রাণ সখি! তোমরা ত আমার ভজন-মন্দিরের মধ্যেই সর্ব্বক্ষণ আমার সঙ্গেই থাক—আমি ত তোমাদের সঙ্গ ছাড়া এক তিলার্দ্ধও থাকি না—আমার ভাব দেখিয়া তোমরা বুঝিয়া লও—তোমাদের অনুরাগ এবং শক্তি কত প্রবল। সখি! তোমরাই আমার প্রাণ রাখিয়াছ। এখন গৌর গৌর। বল"—এই বলিয়া গৌর-বল্লভা সখি কাঞ্চনার হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে যাইতেছেন—পথে এই সকল কথা হইল তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দামোদরপণ্ডিত আনীত দুই কলসী গঙ্গাজলে স্নান করিয়া শ্রীতুলসী দেবীকে পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়া জপমালা হস্তে ভজনমন্দির দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সখিদ্বয় অগ্রে আসিয়াই সেখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই,—গৌর-বল্লভার বদন প্রসন্ন—তিনি সখিদ্বয়ের সঙ্গে মন্দিরদ্বারে কিছুক্ষণ বসিলেন—উদ্দেশ্য দু'একটী কথা বলিয়া তাঁহাদের তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করা। তিনি তাঁহাদের বদনের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদবচনে কহিলেন "সখি! তোমাদের কঠোর ভজনপদ্ধতি দেখিয়া আমি পরম প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছি—তোমরা যে ভাবে শ্রীনাম শ্রবণ এবং আমার প্রাণবল্লভের লীলা স্মরণ-মনন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরম প্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীব্রজযুগলের অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ মনন করিতেছ—আমি যে সখি! তাহা পারিতেছি না—কৃপা করিয়া সখি! আমাকে তোমাদের ভজনপদ্ধতি শিক্ষা দাও—তোমরাই আমার গৌরভজনের গুরু"—এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে প্রেমাবেগে বিরহিণী প্রিয়াজির যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল—তিনি অবনত বদনে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। সখিদ্বয় প্রেমাবেগে পরম বিহ্বল হইয়া তাঁহাদের নয়ন-সলিলে গৌর-বল্লভার শ্রীচরণ-কমল বিধৌত করিয়া অতি মৃদুবচনে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! তোমাকে আমরা আর কি বলিব—আর কিই বা বলিতে জানি। তুমি ত সখি! অন্তর্য্যামিনী। তুমি ত আমাদের মনের ভাব সকলি জান—তবে যে আমাদের সঙ্গে এ সকল ছল কর—সে তোমার অসীম করুণা—অপার দয়া। তুমি স্বতন্ত্রা,—স্বেচ্ছাময়ী—তোমার এই কঠোর গৌর-ভজনের প্রভাব বিশ্ববাসীকে গৌরপ্রেমে উন্মত্ত করিবে—তোমার এই ভজনাদর্শ ঐকান্তিক গৌরভক্তগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনাদর্শ রূপে পরিণত হইবে। কিন্তু সখি! আমরা যে এখন প্রাণে মরিলাম। তোমার এই কঠোর হইতে কঠোরতম উৎকট তপস্যা—বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনের রীতি ও পদ্ধতি, ইহা আমাদের মত দুর্ব্বল হৃদয় কলিজীবের অনুকরণীয় নহে। পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর অত্যদ্ভুত লীলারঙ্গ ইহা—পরমাস্বাদ্য হইলেও কলিহত জীবের আচরণীয় নহে। স্বয়ং ভগবতী ও স্বয়ং ভগবানের এই পরমাশ্চর্য্য লীলারঙ্গ জীবের স্মরণীয় বটে—অনুকরণীয় নহে"। এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা বদন অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নীরবে সখি কাঞ্চনার সকল কথাই শুনিলেন—একটি মাত্র উত্তর দিয়া তিনি ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে গম্ভীরা মন্দিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সখি! এ সকল অবান্তর কথা—আন কথা। তোমাদের নিকট আমি আমার জীবনসম্বল গৌর-কথার প্রত্যাশী—এ সকল কথার প্রয়োজন কি?"—এই বলিয়াই তিনি উঠিয়া ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিলেন।

মন্দির-দ্বারে বসিয়া সখিদ্বয় অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহাদের হাতের মালা হাতেই আছে। তাঁহাদের নয়ন-সলিল-সম্পাতে মন্দিরদ্বারে গৌর-প্রেম-নদীর সৃষ্টি হইল—সে নদীতে স্নান করিবার লোক নাই—গৌরশূন্য গৌরগৃহে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার নাই—স্নান করিবে কে? অলক্ষিতে দেব দেবীগণ আসিয়া এই গৌর-প্রেম-তরঙ্গিনীর পূতসলিলে অবগাহন করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র মনে করেন, গৌরভক্তি-ধন প্রার্থনা করিয়া মন্দির দ্বারে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যান।

সর্ব্বোত্তম নরলীলার প্রচ্ছন্ন-অবতার-নারীকে তাঁহার সখি "জগদীশ্বরী" বলিয়াছেন—"স্বয়ং ভগবতী" বলিয়াছেন—আর কি রক্ষা আছে? প্রচ্ছন্ন-অবতার-নারীর প্রচ্ছন্নত্বই বড় মধুর—তাঁহার এই ভাবটি মধু হইতেও মধু। কিন্তু

মর্ম্মী সখিগণের পক্ষে গৌরবল্লভার এই প্রচ্ছন্নতা—এই আত্মগোপন প্রচেষ্টা বড়ই মর্ম্মন্তুদ। অন্তরঙ্গা সখিগণ পর্য্যন্তও গৌরবল্লভা প্রিয়াজির এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাব দেখিয়া মনে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেন। তাঁহারা আজ তাঁহাদের প্রিয় সখির ব্যবহারে দুঃখিতভাবে বসিয়া নানা-বিধ চিন্তায় মহা চিন্তান্বিতা আছেন।

এক্ষণে সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুইজনে বসিয়া তাঁহাদের মর্ম্মবেদনার কথা পরস্পরে অতি গোপনে আলোচনা করিতে লাগিলেন—এই উদ্দেশে তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য কিছু দূরে গিয়া নির্জ্জনে বসিলেন। সখি কাঞ্চনা সজল-নয়নে প্রেম-গদ-গদ-বচনে অতিশয় দুঃখব্যঞ্জক করুণ-ক্রন্দনের স্বরে কহিতেছেন—"সখি অমিতে! এ প্রাণ রাখিয়া আর কোন ফল নাই—প্রিয়াজির কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত শুনিয়া কাষ্ঠপাষাণ দ্রব হইল—পশুপক্ষী স্থাবর জঙ্গম স্তম্ভিত হইল,—কিন্তু আমাদের কঠিন হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল না—আমরা এমনই মন্দভাগিনী—এখন আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদানে এই ঘৃণিতপ্রাণ পরিত্যাগ করা। আর এক কথা, এখন প্রিয়াজির গৌর-বিরহের দশম দশা উপস্থিত—তাঁহার দৈহিক অবস্থা দেখিয়া মনে বড়ই আতঙ্ক হয়—হৃদয়ে মহা শঙ্কা হয়—কখন কি হয় বলা যায় না। গৌরবক্ষবিলাসিনীর সেই শেষ লীলারঙ্গটী যেন আমাদের দেখিতে না হয়—তাহার পূর্ব্বেই আমাদের প্রাণত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি—হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া প্রাণ বহির্গত হইয়া যাওয়া অপেক্ষা এই সময়ে সুর-তরঙ্গিনীদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চিরনিদ্রা যাওয়াই আমি সমীচীন মনে করি—এই ভাবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীচরণকমলে এই তুচ্ছ ও ঘৃণিত দেহটী উৎসর্গ করিতে পারিলেই আমি পরম মঙ্গল মনে করি। প্রিয় সখি অমিতে! তুমি কি বল?"—এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা অমিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন প্রিয়াজির ভজন-মন্দির অতি সন্নিকটে—তাঁহার মন্দিরের গবাক্ষ উন্মুক্ত—এই ক্রন্দনের রোল সেখানে অনায়াসে পৌঁছিতে পারে। এই মনে করিয়াই হঠাৎ তিনি নীরব হইলেন। সখি অমিতা তাঁহাকে সাবধান করিয়া কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! চুপ কর—এ সকল কথা আলোচনা করিবার সময় এখন নহে—পরে বিচার করিয়া উত্তর দিব।" এই বলিয়া তাঁহারা ভজন-মন্দিরদ্বারে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। মন স্থির করিয়া উভয়েই সংখ্যানাম জপে মগ্না হইলেন।

অন্তর্য্যামিনী গৌর-বল্লভা সকলি জানেন—সখিদ্বয়ের মনোভাব তাঁহার কিছুই অবিদিত নাই—তাঁহারা মনে দুঃখ পাইতেছেন—তাঁহার কথায় তাঁহাদের ভজনের বিঘ্ন হইবে—এই ভাবিয়া গৌর-বল্লভা প্রাতঃকালীন সংখ্যানাম সমা-পনান্তে তাহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এক প্রহরের সময় ভজন-মন্দিরের দ্বার খুলিয়া হঠাৎ বাহিরে আসিয়া সখিদ্বয়ের নিকটে বসিলেন। গম্ভীরা-মন্দিরদ্বারে গৌরবল্লভা পরম গম্ভীর ভাবে বসিলেন—সখিদ্বয় বিস্মিত হইলেন—তাঁহারা এ আশা কখন করেন নাই—হঠাৎ তাঁহাদের প্রিয়সখির দর্শন পাইয়া তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল—কিন্তু ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। কিছু বলিতেও সাহস করিলেন না।

অল্পক্ষণ পরেই গৌরবিরহিণীর ভাবের পরিবর্ত্তন হইল—এখন আর তাঁহার সে গম্ভীর ভাব নাই—তিনি দুই হস্তে পরম প্রেমভরে সখিদ্বয়ের দুই হস্ত ধারণ করিয়া প্রেমাশ্রু-পূর্ণলোচনে প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে! প্রাণসখি অমিতে! তোমরা আমার প্রাণ-বল্লভের একান্ত অনুরাগিনী দাসী—অতএব তোমরা দুটী আমার অতি প্রিয়তম,—পরম আদরের ধন—তোমরাই এখন আমার জীবন-সম্বল—তোমরা না থাকিলে আমি এত দিন কোন কালে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতাম। সুতরাং তোমাদের এই দেহটা আমার পরম প্রিয়—আমার নিজস্ব সম্পত্তি। পতিধন স্ত্রীর প্রাপ্য—তোমরা আমার পতি-পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ—তোমরা তাঁহারই সম্পত্তি,—উত্তরাধি-কারিণী সত্বে আমি তাহা পাইয়াছি। আমার প্রাণবল্লভের নিজ গুপ্তবিত্ত গোলোকের প্রেমধন তোমাদের হৃদয় মধ্যেই গুপ্তভাবে গচ্ছিত আছে—তোমরা কৃপা করিয়া তাহা দিলে তবে আমি পাইব। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার প্রাণ-বল্লভের নিজ গুপ্তবিত্ত গোলোকের প্রেমধনের অধিকারিণী আমি হইতে পারি নাই—কিন্তু তাঁহার পরম প্রিয় দাসদাসীর দেহরূপ সম্পত্তির উপর আমার মত মন্দভাগিনীর কিছু অধিকার বোধ হয় আছে—পূর্ব্বে বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি—ইহাই আমার প্রাণ-

পতি-দত্ত স্ত্রী-ধন।" এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি কাঁদিয়া আকুল হইলেন—আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রাণসখির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বিষম লজ্জিতা হইলেন—অমিতার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—পরম প্রেমভরে প্রিয়াজির গাত্রে ধীরে ধীরে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন—বসনাঞ্চলে তাঁহার অশ্রুজলসিক্ত বদনখানি মুছাইয়া দিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—সকলেই নির্ব্বাক। নীরব ও নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া সখিদ্বয়ের প্রাণে যেন একটা প্রবল গুপ্ত হাহাকারের ঝড় উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে গৌরবল্লভা আপনিই উঠিয়া বসিলেন,—আপনার মলিন বসনাঞ্চলে আপনার জলভারাক্রান্ত চক্ষুদ্বয় মুছিলেন। অতি কষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে অতি ধীরে ধীরে পুনরায় তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"প্রিয়সখি! প্রাণসখি! তোমাদের এ অসাধু সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর—আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া সপথ কর—এ পাপকথা আর কখন মুখে বা মনেও আনিবে না—স্বপ্নেও ভাবিবে না। তোমাদের নবদ্বীপ-সুধাকর তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম ভক্তবর শ্রীমুরারিগুপ্ত এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া মনকে শান্ত কর—হরিনাম কর—আন চিন্তা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিও না—ভজন নষ্ট করিও না—এরূপ করিলে এখানে তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইবে না"—

এতগুলি কথা গুছাইয়া বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির দুর্ব্বল শরীর অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।—ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অধিকতর ক্ষীণ হইল—প্রেমাবেশে সর্ব্ব শরীর প্রকম্পিত হইল—তিনি শীতকালে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন। সখিদ্বয় তখন মহা বিপদে পড়িলেন—তাঁহারাই তাঁহাদের প্রিয়সখির এই নিদারুণ মনঃকষ্টের কারণ,—সখি কাঞ্চনা ত মরমে মরিয়া গেলেন—লজ্জায়, ক্ষোভে, মনস্তাপে তাঁহার মনপ্রাণ বিষম অনুতপ্ত হইল,—কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দুই জনে প্রিয়সখির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন—আর মুখে গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

যথা রাগ।

"বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ হে!
—"তোমার চরণ, করিয়ে স্মরণ, তোমারই নাম গাই হে!
তোমারই নামে, তোমারই ধ্যানে, কত সুখ আমি পাই হে!
(সে সুখ—সে আনন্দ,—)
কারে বা জানাব, কারে বা বুঝাব,—হেন জন নাহি পাই।
মনের হরিষে, দিবস রজনী,—তব নাম আমি গাই॥
ডুবে যাই আমি, আনন্দ সাগরে,—সুখের নাহিক ওর।
কোথা দিয়ে যেন, দীর্ঘ পৌষের,—নিশি হয়ে যায় ভোর॥
শ্রম নাহি জ্ঞান, মান অপমান,—সম্পদে নাহিক রুচি।
নাহি সদাচার, পূজার ব্যাপার,—তবু ভাবি আমি শুচি॥
তোমার নামের, মহিমা-কাহিনী,—কত সুধা লীলা-গানে!
করুণা করিয়ে, তুমিই আমারে,—বলে দেও কানে কানে॥
ত্রিজগতে কেহ, নাহি আপনার,—জানি শুধু তব নাম।
নামের ভিতরে, দেখি হে তোমায়,—গৌরহরি রসধাম॥
তুমিই আমার, সবরসধন, (মোর) নিজজন গৌর-দাস।
গৌর-গরবে, গরবিনী আমি,—কিছু নাহি অভিলাষ॥
ভরসা কেবল, চরণ দু'খানি,—সুখের একটী কথা।
শুনাবে না তুমি, প্রাণ-রমণ,—ঘুচাবে না মন-ব্যথা?
বড় সাধ করে, ডাকি হে তোমায়,—গৌর-গোবিন্দ ব'লে।
যুগল রূপের, মাধুরী হেরি হে!—তিলে তিলে পলে পলে॥
হৃদয়-আসনে, যুগলে বস হে!,—বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে।
করুণা করিয়ে, পাদ পরশ,—হরিদাসিয়ার মাথে॥"—

গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে শায়িতাবস্থাতেই অতিশয় মনোযোগের সহিত গানটী শুনিলেন—একবার বদন তুলিয়া প্রেমাশ্রুলোচনে অনুরাগভরে প্রিয়সখির বদনের প্রতি চাহিলেন—কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলেন না। পরম উদাসভাবে সখির মুখের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে তিনি কেবল মাত্র চাহিয়াই আছেন—তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে—সেই পরম পবিত্র নয়নধারার সহিত সখিদ্বয়ের নয়ন সলিল সম্পাতে গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম মহাযোগ হইয়াছে।

কতকক্ষণ পরে পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি স্বয়ং আত্মসম্বরণ করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে সখি কাঞ্চনার দু'টী হস্ত ধারণ করিয়া

পরম প্রেমাবেগে ধীরে ধীরে কহিলেন—"সখি! প্রিয় সখি! তুমি পরম সৌভাগ্যবতী—তোমার হৃদয়খানি গৌর-প্রেমের উৎস—এমন গৌর-প্রেমের গভীরতাব্যঞ্জক গৌর-গীতি আমি ত কখন শুনি নাই,—এই গৌর-গীতি-কুসুমাঞ্জলি দিয়া তুমি আমার প্রাণবল্লভের প্রেমপূজা কর—আর আমি বৃথায় বিধিনিয়মের অনুষ্ঠানে সময় ক্ষেপ করি। সখি কাঞ্চনে! তুমি আর একটী তোমার নিজস্বধন গৌর-গীতি-কুসুমাঞ্জলি আমার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণ-কমলে অর্পণ কর—আমি মন্দভাগিনী তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া সুখী হই!

সখিকাঞ্চনা মহা লজ্জিতভাবে পুনরায় কলকণ্ঠে তাঁহার গৌরগীতির ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

"গৌরাঙ্গ গুণ, গাও রে মন,
গৌরনাম কর সার।
জনে জনে ধরি, জাতি না বিচারি,
নাম কর পরচার॥
গৌর কিশোর, রূপ মনোহর,
ভাব মনে দিবানিশি।
সোনার বরণ, গৌর রতন,
উজলিছে দশ দিশি॥
যে দিকে নেহারি, গোরা রূপ হেরি,
অন্তরে বাহিরে গোরা।
ভাব অনুক্ষণ, সাধনের ধন,
গৌর-হরি-চিত্ত-চোরা॥
হা গৌরাঙ্গ বলি, সব কাজ ফেলি,
ডাক গৌরাঙ্গ-ধনে।
প্রেম-রস-ধাম, লহ গৌর-নাম,
বিলাইতে জনে জনে॥
সকল ভুলিয়া, পরাণ খুলিয়া,
ডাক তাঁরে প্রাণভরে।
পরম রতন, শ্রীশচীনন্দন,
নামে তাঁর সুধা ঝরে।
যে আছ যেখানে, মধুময় তানে,
গৌরনাম সবে গাও।
গৌর-মহিমা, গৌর-গরিমা,
প্রেম-তরঙ্গ ছুটাও॥
সর্ব্বধর্ম্ম সার, নাম পরচার,
কর সবে জগ ভরি।
নাম-ব্রহ্ম হয়, বিপদ সময়,
ভব-পারাবার-তরি॥
হা গৌরাঙ্গ বলি, দুটি বাহু তুলি,
সবে মিলি কর নাম।
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ, পদযুগে কর,
কোটী কোটি পরণাম॥
যে বলে গৌর, তাঁর হৃদে মোর,
গৌরহরি পরকাশ।
প্রসাদ তাঁহার মাগে অনিবার,
অকিঞ্চন হরদাস।"—গৌর-গীতিকা।

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি তন্ময় হইয়া গৌর-গুণগান শুনিতেছেন—আর তাঁহার হৃদি-সমুদ্রে কত না ভাব-তরঙ্গাবলীর উদ্ভব হইতেছে—কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না,—তাঁহার হৃদয়-সমুদ্র মধ্যেই ভাব তরঙ্গগুলি আপন মনে প্রেমানন্দে ছুটাছুটি খেলা করিতেছে—বাহিরে তাহাদের প্রকাশ নাই। গৌর-বল্লভার করুণ শুভদৃষ্টি কেবলমাত্র সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি,—কি প্রসন্নতাপূর্ণ—কি অপূর্ব্ব শান্তিময়—কি মধুর জ্যোতির্ম্ময় সখি কাঞ্চনার তাৎকালিক বদনমণ্ডলের ভাব—তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন গৌর-প্রেমময়—গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি এই গৌর-প্রেমময়ী সখির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া গৌর-প্রেম-সুধাপানে প্রমত্ত আছেন। তাঁহার প্রিয় সখির মুখে গৌর-গীতি শুনিয়া তাঁহার যেন প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না। তিনি তাঁহার মনের কথা যেন খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না। মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌর-প্রেমের অফুরন্ত উৎস—তিনি তাঁহার প্রিয়সখির মন বুঝিয়াই পুনরায় গৌর-গীতির ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

——"শান্তি! শান্ত!! শান্ত!!!
কোথা নাহি পাই, ত্রিজগতে নাই,
কেবল মনের ভ্রান্ত॥
বৃথা অন্বেষণ, এ তিন ভুবন,
কোন খানে ইহা নাই।
নহে জগতের, এ ধন তোদের,
গোরা-পদে এর ঠাঁই।

ভুনিয়া খুজিয়া, এ খনি-অমিয়া,
পাবে নাক' তুমি ভাই!
গৌর-চরণ, করিলে স্মরণ,
তবে ত এ ধন পাই॥
ত্রিতাপের দুখ, ধরমের ভুখ,
শান্তি-পিপাসা যত।
ঘুচিবে মিটিবে, হৃদয়ে বহিবে,
সুধাধারা অবিরত॥
নদীয়ার গোরা, প্রেমভাবে ভোরা,
পদ তাঁর সুশীতল।
চির শান্তিময়, তাঁর পদদ্বয়,
পরানন্দ অবিকল॥
সোনার বরণ, গৌর চরণ,
চিরশান্তি নিকেতন।
জগত আনন্দ, গোরাপদ দ্বন্দ্ব,
কর সবে আবাহন॥
শান্তি পাইবে, দুঃখ যাইবে,
ঘুচে যাবে হাহাকার।
হা' গৌরাঙ্গ বলি, দু'টি বাহু তুলি,
নাচ দেখি একবার॥
গৌর নিতাই, বল দেখি ভাই,
অকপটে হৃদি খুলে।
করতালি দিয়ে, লাজ মান থুয়ে,
নাচ দেখি দুলে দুলে॥
নাচিয়া নাচিয়া, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
বল দেখি সবে মিলে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার, প্রাণ গৌরাঙ্গ,
না রহিবে নীলাচলে॥
দেখিবে কেমন, চারু সুশীতল,
গৌর-চরণ-তল।
ত্রিতাপ জ্বালায়, শান্তি নিলয়,
তৃষায় পানীয় জল॥
শান্তি না মিলে, ভুনিয়া খুঁজিলে,
বিনা গোরা-পদাশ্রয়।
না জানিল ইহা, ভব-মদ-লেহা,
হরিদাস নীচাশয়॥ গৌর-গীতিকা।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি একেবারে গৌরপ্রেম-সাগরে ডুব দিয়াছেন—পূর্ব্বকথা তাঁহার আর কিছুই স্মরণ নাই—সখি কাঞ্চনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পরম প্রেমভরে কেবল কান্দিতেছেন—সকলেরই নয়নে অবিরল প্রেমধারা বহিতেছে—নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির দ্বারে যেন প্রেমের পাথার বহিতেছে।

এইভাবে বহুক্ষণ গেল—বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয় হয়—সখিদ্বয় ভাবিতেছেন গৌরবল্লভা তাঁহার নিয়মিত ভজন নষ্ট করিয়া আজি এ কি অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিলেন! হঠাৎ তাঁহাদের মনে যেন একটা চমক আসিল—সখি কাঞ্চনা তখন বিরহিণী প্রিয়াজিকে তাঁহার ক্রোড় হইতে অতি সন্তর্পণে উঠাইলেন—তিনিও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু মুখে কোন কথা নাই—তবে তাঁহার বদন সুপ্রসন্ন—মন অতিশয় প্রফুল্ল। সখি কাঞ্চনা মহা লজ্জিত ও শঙ্কিতভাবে তখন কহিলেন—"সখি! প্রাণের সখি! তোমার অদ্যকার ভজন নষ্ট করিয়া এতক্ষণ আবল তাবল যাহা আমি বলিলাম—তাহা আমার মত পাগলিনীর প্রলাপ মনে করিয়া অপরাধ ক্ষমা করিবে।"

এই কথা বলিবামাত্র গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন। তিনি যেন সমাধিস্থ,—নিশ্চল, নিস্তব্ধ জড়বৎ আকাট তাঁহার দেহযষ্ঠীখানি—সখিদ্বয়ের মনে তখন মহা শঙ্কা উপস্থিত হইল—তাঁহারা তখন প্রিয়সখির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কতক্ষণ প্রিয়াজি এই ভাবে থাকিলেন—সখিদ্বয় কর্ণে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতেই গৌর-বল্লভার চৈতন্য হইল—তিনি ধীরে ধীরে নয়নদ্বয় উন্মিলিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথা কহিবার আর সামর্থ নাই।—এরূপ ভাবেও কিছুক্ষণ গেল—তখন পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি স্বয়ং আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন—সখি কাঞ্চনার গলদেশ দু'টী ক্ষীণ বাহুতে পরম প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিয়া অতি কষ্টে দু'টী কথা বলিলেন। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে প্রেমগদগদভাবে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! তুমি একথা বলিয়া আমার প্রাণে কষ্ট দিলে কেন? গৌরনাম শ্রবণে—গৌর-গুণগান শ্রবণে যদি আমার ভজন নষ্ট হয়—তবে আমার মরণই পরম মঙ্গল"—এই বলিয়া তিনি পুনরায় অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—তিনি যে আজ হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা

পাইয়াছেন, এরূপ ভাব সুস্পষ্ট দেখাইলেন,—তাঁহার বদনে যেন এই ভাবটিই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট রহিয়াছে। সখি কাঞ্চনার মর্ম্মবেদনার আর পরিসীমা নাই,—তিনি আজ এমন কর্ম্ম কেন করিলেন—এই অনুতাপানলে তাঁহার মনপ্রাণ তুষানলে দগ্ধ হইতেছে—এখন উপায় কি? সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার প্রিয় সখিকে নিজ ক্রোড়ে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া দুইজনে মিলিয়া খুব কান্দিলেন—তাঁহাদের মনের প্রচণ্ড অগ্নি প্রবল নয়নধারা-সম্পাতে কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু কোন কথা কেহ কিছুই বলিতে পারিলেন না। উভয়ের মর্ম্মব্যথা ও মনোবেদনা উভয়েই বুঝিলেন—তখন দুই জনেই কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। অনেক সময় কথার বান-কাটাকাটিতে কার্য্য সিদ্ধি হয় না,—নীরব ক্রন্দনে মনদুঃখ প্রসমিত হয়। সুচতুরা কাঞ্চনা সর্ব্বভাবময়ী—সর্ব্বকার্য্য-কুশলা ও সর্ব্বজ্ঞা। তাহা না হইলে তিনি গৌর-বল্লভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রিয়তমা সখি হইবেন কেন? তিনি আর একটী কথা তাঁহার প্রিয়সখির কানে কানে বলিয়া তবে নিজ মনকে শান্ত করিলেন। সে কথাটি কি তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না—তবে সখিগণ সর্ব্বজ্ঞা—তাঁহাদের অবিজ্ঞাত বস্তু জগতে নাই।

"মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই"

এ ভাবটি তাঁহাদের আছে—এই অভিমানটী না থাকিলে সর্ব্বোত্তম নরলীলা-রস পুষ্টি হয় না। লীলা-রস পুষ্টি ও লোক-শিক্ষার জন্য তাঁহারা এরূপ লীলাভিনয় করিয়া থাকেন।

সখি কাঞ্চনা তখন অবসর বুঝিয়া পূর্ব্বকথা তুলিয়া প্রিয়াজির কানে কানে আরও বলিলেন,—"সখি! প্রাণ-সখি! লীলাময়ী তুমি। কত লীলারঙ্গই তুমি জান। আমাদের মনের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে তুমি যে ভাবটি জাগাও—তাহার জন্য তুমিই দায়ী—আমরা নহি!"—গৌরবল্লভা এই ঐশ্বর্য্যভাবের কথাগুলি শুনিলেন বটে—কিন্তু ইহা তাঁহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিল না—তিনি গম্ভীরভাবে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং পুনরায় দ্বাররুদ্ধ করিলেন। এখন বেলা আড়াই প্রহর।

সখিদ্বয়ের মনে নানাবিধ চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এখন বেলা আড়াই প্রহর—তাঁহাদের প্রিয়-সখির সংখ্যানাম শেষ করিতে আজ সন্ধ্যা হইবে,—তিনি কত কষ্ট পাইবেন—গৌরভক্তগণ বহির্দ্বারে বসিয়া কণিকা-প্রসাদের জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন—এই সকল চিন্তায় সখি কাঞ্চনা ও অমিতার হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ স্মরণ করিয়া নিজ নিজ ভজনে মনোনিবেশ করিলেন।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন শেষ হইতে আজ অপরাহ্ন হইল—এমন তাঁহার মাসের মধ্যে দশ দিন হয়—তাহাতে তাঁহার মন বিক্ষুব্ধ নহে। তিনি তাঁহার নিয়মিত সংখ্যানাম শেষ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহিরে আসিয়া যথারীতি স্বপাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ লাগাইয়া যৎকিঞ্চিৎ মুষ্টিপ্রসাদ পাইয়া গৌরভক্তগণকে দর্শন ও কণিকাপ্রসাদ দানে তুষ্ট করিলেন।

যথানিয়মে সন্ধ্যার পর পুনরায় তিনি তাঁহার ভজন-মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া গঙ্গা দর্শন এবং প্রণাম করিয়া সংখ্যানামে জপে মগ্ন হইলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার সঙ্গেই আছেন। তাঁহারাও সংখ্যানাম জপমগ্না।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গকুঞ্জ।
২৬এ আশ্বিন ১৩৩৭ সোমবার।

(৬)

মাঘ মাস—সূর্য্য অস্তাচলে গিয়াছেন—সন্ধ্যাকাল—নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বারদেশে বিরহিণী গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জপমালা হস্তে বসিয়া গৌরনাম জপ এবং গৌররূপ চিন্তা করিতেছেন—সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা নিকটেই বসিয়া আছেন—তাঁহাদের হস্তেও জপ-মালা। সন্ধ্যাকালীন নিয়মিত সংখ্যানাম জপ শেষ হইলে বিরহিণী প্রিয়াজি গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার মুখের দিকে চাহিয়া কি যে বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না—তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলভারাক্রান্ত, এমন সময় সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির

মন বুঝিয়াই মধুকণ্ঠে একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—অমিতা দোহার দিতে লাগিলেন।

রাগ—ধানসী।

"গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার কুল শীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি॥
গৌরাঙ্গ আমার পরাণ পুতলি, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন, তাঁহার দাসী যে আমি॥
হরিনাম-রবে কুল মজাইল, পাগল করিল মোরে।
যখন যে রব করে যে বন্ধুয়া, রহিতে না পারি ঘরে॥
গুরুজন বোল কানে না করিব, কুলশীল তেয়াগিব।
জ্ঞান দাস কহে বিনিমূলে সেই গোরা পদে বিকাইব॥

গৌর-পদ-তরঙ্গিনী।

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি একমনে আকুল প্রাণে গানটী শুনিলেন—আর প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। গৌরানুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে এই প্রাচীন পদটীতে। বিরহিণী গৌরবল্লভার নিকট গৌরানুরাগের পদগুলি মধু হইতেও মধু—তাঁহার প্রাণপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু গৌর-গুণ-গান—ইহাই এখন তাঁহার জীবন-সম্বল—জীবন সঞ্জীবনী-সুধা। পরম প্রেমভরে তিনি তাঁহার প্রিয় সখি কাঞ্চনার দুটী হস্ত ধারণ করিয়া—প্রেমগদগদ-বচনে প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন—"সখি! প্রিয়সখি কাঞ্চনে! তোমাদের মত গৌরানুরাগ আমার এ জীবনে ত সম্ভব নহে—পর জীবনে যাহাতে তাহা হয়, সেই আশীর্ব্বাদ আমি চাই! তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি—দয়া করিয়া সখি! তোমরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর তোমাদের মত আমি অকপটে একবারও যেন বলিতে পারি—

"গুরুজন বোল কানে না করিব, কুলশীল তেয়াগিব॥"

আমার প্রাণবল্লভের দর্শন-প্রাপ্তির জন্য আমি অভাগিনী এ সকল প্রেমানুরাগের অনুষ্ঠান কিছুই করিতে পারি নাই, আর এ জনমে পারিবও না। তোমরা সখি! ব্রজগোপিনী দিগের মত কুল শীল মান ত্যাগ এবং গুরুজন-গঞ্জনা সকলি সহ্য করিয়া গৌরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছ। সখি! আমি ত তাহা পারি নাই—আমার তবে কি হবে সখি? তোমাদের গৌর কি আমাকে তবে কৃপা করিবেন না?"

সখি কাঞ্চনা বড়ই সুচতুরা—তাঁহার প্রিয়সখি গৌর-বল্লভার মনভাব বুঝিয়া তিনি সুকৌশলে প্রকারান্তরে তাঁহার তত্ত্বটি বলিতেছেন আর একটি গানে—এটিও প্রাচীন পদ—শ্রীরাধাবল্লভের উক্তি তাঁহার প্রাণবল্লভা বৃষভানুনন্দিনীর প্রতি। যথা—

—"এস ধনী রাধা তুমি তনু-আধা
অনন্ত ভাবিয়ে ভাবে।
ভব-বিরিঞ্চি, তারা নিরন্তর
যে পদ-পল্লব লবে॥
শুক সনাতন, পরম কারণ,
ও পদ-পঙ্কজ আশ।
ব্রজপুরে হেথা, হয়ে গুল্মলতা
ইহাতে করিয়ে বাস॥
হইয়ে দেবতা, হবে তরুলতা,
কিসের কারণে হেন।
ও পদ-পঙ্কজ রেণুর লাগিয়ে
তাঁহাদের ধায় মন॥
ধেয়ানে না পায়, যাহার চরণ
সে জনা দানের ছলে।
আজ শুভ দিনে পাইনু দর্শন
তোমারে পেয়েছি ক্রোড়ে॥
তুমি সে পরম, আমার মরম,
তোমারে ভাবি গো সদা।
হৃদয় ভিতরে, ভাবি গো তোমারে,
আছি যে সদাই বাধা॥
কত ছলা কলা তোমারই কারণে
দানের আরতি তাই।
চণ্ডীদাস বলে ঐছন পিরীতি
খুঁজিয়া পাইবে নাই।

পদকল্পতরু।

এটী রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দান-লীলার পদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া রায় রামানন্দ ও স্বরূপদামোদরের সঙ্গে রাধাতত্ত্বও প্রেমরসাস্বাদন করিতেছেন—রসরাজ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখে—এ বড় অদ্ভুত রাধাতত্ত্ব—অপূর্ব্ব শাস্ত্রকথা!

সখি কাঞ্চনার মুখে গান শুনিয়া গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি বিনতবদনে প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে প্রেমগদগদ-বচনে একটী

মাত্র কথা বলিলেন—"সখি! ইহা ত গোকুল-চন্দ্রিমা রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেয়সীঅনুরাগের কথা—বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার একটী কৃষ্ণানুরাগের পদ গান কর দেখি শুনি"—এই বলিয়া গৌরবল্লভা নীরব হইলেন। সখি কাঞ্চনা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া গানের ধুয়া ধরিলেন—বৃষভানু-নন্দিনী সখি ললিতাকে বলিতেছেন,—

"শুন গো সজনি সই!
কেমনে রহিব, কানু না দেখিয়া
নিশি নিশি যাপি রোই॥
হর দেখ রূপ, নয়ন ভরিয়া,
করেতে মোহন বাঁশী।
হাসিতে ঝরিছে, মোতিম মাণিক,
সুধা ঝরে কত রাশি॥
হেন মনে করে, আচল থাপিয়া
আঁচল ভরিয়া রাখি।
পাছে কোন জনে, ডাকা চুরি দিয়া,
পাছে লয়ে যায় সখি॥
এ রূপ-লাবণ্য, কোথায় রাখিব,
মোর পরতীত নাই।
হৃদয় বিদারি, পরাণ যথায়,
সেথানে করেছে ঠাঁই॥
সবার গোচর, না করি বেকত
রাখিব যতন করি।
পাছে দিয়া সিঁদ, হবে যাই নিঁদ,
কেহ না করয়ে চুরি॥
চণ্ডীদাস বলে, হেনক সম্পদ
গোপনে রাখিবে বটে।
আছে কত চোর, নাহি তার ওর
জানে সিদ দিয়া কাটে॥"—

সখি কাঞ্চনার একটী নাম কৃষ্ণ-পাগলিনী,—বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধিকার শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গৌর-বিরহিণী প্রিয়সখির প্রাণে সুখ বোধ হইয়াছে বুঝিয়া তিনি পুনরায় আর একটী শ্রীরাধিকার পূর্ব্ব রাগের ধুয়া ধরিলেন—কৃষ্ণ-পাগলিনী কাঞ্চনা বড় গান-পাগলা মেয়ে ছিলেন—গৌর-কৃষ্ণবিষয়ক গীত গাহিতে তিনি শতমুখা হইতেন—আর আমাদের বিরহিণী প্রিয়াজিও এ সকল গান শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। সখি কাঞ্চনা আর একটী প্রাচীন গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথা রাগ—

——"বদন হেরিয়া, গদ গদ হৈয়া
কহে বিনোদিনী রাই।
শুন লো সজনি, হেন মনে গণি,
আন ছলে পথে যাই॥
হেরি শ্যাম রূপ, নয়ন ভরিয়া,
আঁখির নিমিষ নয়।
এক আছে দেখি, গুরু-জন রোষ
তাহাই বাসিয়ে ভয়॥
আঁখির পুতলি, তারার সে মণি,
যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরিষ কুসুম, জিনিয়া কোমল,
পাছে বা গলিয়া ঝরে॥
ননীর অধিক শরীর কোমল,
বিষম ভানুর তাপে।
জানি বা ও অঙ্গ, গলি পানি হয়,
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
কেমন যশোদা নন্দ ঘোষ পিতা,
হেনক সম্পদ ছাড়ি।
কেমনে হৃদয়, ধরিয়া আছয়,
এই ত বিষম বড়ি॥
ছারখারে যাক্ এ সব সম্পদ,
অনলে পুড়িয়া যাকু।
এ হেন ছাওয়ালে, ধেনু নিয়োজিয়া
পায় কত সুখ পাকু॥
চণ্ডীদাস বলে, শুন ধনি রাধা
সকল গুপত মানি।
এ সকল ছলা, যাহার কারণে,
আমি সে সকল জানি॥"—

পদকল্পতরু

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদয়ের অন্তস্তলে মর্ম্মে মর্ম্মে কৃষ্ণবিরহিণী বৃষভানুনন্দিনীর এসকল কথা বর্ণে বর্ণে প্রবেশ করিল,—তিনি আকুল প্রাণে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন,—তাঁহার অবিশ্রান্ত নয়নধারায় ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিতেছে।

কিন্তু তিনি ধীরভাবে বসিয়া আছেন। সখি কাঞ্চনার গান শেষ হইলে গৌর-বল্লভা প্রিয়সখির বদনের প্রতি একটীবার করুণ-নয়নে চাহিলেন,—সে চাহনির মর্ম্ম,—"সখি! আমার ত গৌরানুরাগের লেশাভাসও নাই—তবে কি আমার মত হতভাগিনীর ভাগ্যে প্রাণবল্লভের দর্শনলাভ হইবে না?"

সখি কাঞ্চনা সর্ব্বজ্ঞা—তিনি তাঁহার প্রিয় সখির মনোভাব বুঝিয়াই অতিশয় চতুরতা ও সাবধানতার সহিত কহিলেন—"প্রিয়সখি! তুমি গৌর-বল্লভা—মুখ্যা গৌরশক্তি—গৌরানুরাগের মূল উৎস তোমারই হৃদয়ে অবস্থিত—এই স্থান হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসীর হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে গৌরানুরাগের শান্তিবারি সিঞ্চিত হয়—তবে তাহাদের সেই হৃদয়ক্ষেত্রে গৌরপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়—সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গৌরপ্রেমকল্পতরুরূপে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রাণসখি! তোমার প্রাণবল্লভ তোমাকে যে দীনতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তদুপযুক্ত ভাবই তুমি হৃদয়ে পোষণ কর এবং মুখে ব্যক্ত কর। ইহাতে আমরা ভুলি না।" গৌর-বল্লভা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না বা বলিতে ইচ্ছা করিলেন না।

গৌরবিরহবিহ্বলা প্রিয়াজিও নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া তাঁহার প্রিয় সখিদ্বয়ের সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা-রস-কথা আস্বাদন করিতেন—নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যাহা করিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভা এখানেও তাই করিতেছেন—অধিকন্তু গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-সুখসম্ভোগ তিনি সতত করিতেছেন। তাঁহার গৌর-সুখতাৎপর্য্য কৃষ্ণকথায় এবং কৃষ্ণভজনে তাঁহার প্রাণবল্লভের মনে বড় সুখ এবং বড় আনন্দ হইত—তাঁহার প্রাণবল্লভাও তাঁহার পদানুসরণে তদ্রূপই আনন্দ পাইতেছেন—তাঁহার গৌরানুরাগরূপ গৌর-প্রেম-তরঙ্গিণী অন্তঃসলিলা। কৃষ্ণবল্লভা বৃষভানুনন্দিনী তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় ললিতা ও বিশাখার সহিত যেরূপ প্রকাশ্যে তাঁহার কৃষ্ণানুরাগের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতেন,—সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাহা করিতে পারেন না। ইহার নিগূঢ় রহস্য আছে। যশোদা মাতার কথা তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী বৃষভানুনন্দিনী যাহা বলিলেন, তাহা গৌরবক্ষবিলাসিনী সনাতননন্দিনী বলিতে পারেন না—তাঁহার প্রকট নবদ্বীপলীলায় স্বকীয়-ভাবই প্রবল এবং এইরূপ ভাবের তাহা বিষম অন্তরায়। কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা মা যশোদাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রিয়সখি ললিতাকে বলিতেছেন,—

যথা রাগ।

—"সখি! কি আর বলিব যায়।
তিলে দয়া নাই, তাঁহার শরীরে,
একথা বলিব কায়।
মায়ের পরাণ, এমনি ধরণ,
দয়া নাহি তাঁর চিতে।
এমন নবীন, কুসুম কোমল,
বনে নাহি পাঠাইতে॥
কেমনে ধাইবে, ধেনু ফিরাইবে,
এ হেন নবীন তনু।
অতি খরতর, বিষম উত্তাপ,
প্রখর গগন ভানু॥
বিপিনে যে কত, ফণি গর্ত্ত শত,
কুশের অঙ্কুর তায়।
সে রাঙ্গা-চরণে, ছেদিয়া ভেদিবে,
মোর মনে এই ভায়॥
আর সব আছে, কংশের অরাতি,
জানিবা ধরিয়া লয়।
সঘনে সঘনে, লয় মোর মনে,
সদাই উঠিছে ভয়॥
চণ্ডীদাস কয়, না ভাবিহ ভয়,
সে হরি জগত-পতি।
তারে কোন জন, করিবে তাড়ন,
নাহি হেন দেখি কতি॥" পদকল্পতরু।

মহাভাব-স্বরূপিণী বৃষভানুনন্দিনীর কৃষ্ণানুরাগের এই অপূর্ব্ব ভাব সনাতননন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৌরানুরাগের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। কারণ গৌরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দের শ্রীমুখের আদেশই গৌর-বল্লভা প্রিয়াজির এরূপ ভাবের প্রতিবাদী। শচীমাতা তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার অন্ধের যষ্টি,—নয়নের মণি—জীবন-সম্বল প্রাণপ্রিয়তম একমাত্র পুত্রের নবীন যৌবনে তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম পালনের বিরোধী হন নাই। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে সন্ন্যাস গ্রহণের পর কিছু দিন অবস্থানকালীন নদীয়ার সকল ভক্তগণ যখন একত্রিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী শচীমাতাকে

বিশিষ্টভাবে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তাঁহার মাতৃভক্ত-চূড়ামণি পুত্ররত্নটী পুনরায় নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা তিনি করুন—তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী কি উত্তর করিলেন পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

—"তিঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
*　　　*　　　*
আপনায় দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি॥"

পূর্ব্বলীলায় মা যশোদা তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বস্তু প্রাণ-কানাইকে গোষ্ঠে পাঠাইতেন—গোপরাজ নন্দ-দুলাল শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয় বস্তু ছিল গোষ্ঠে গোচারণ-লীলা—পরম স্নেহবতী যশোদা মাতা রাজরাণী হইয়াও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দূর বনে গোষ্ঠে পাঠাইতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতেন না—বাধা দিতেন না—কারণ ইহাতে কৃষ্ণের সুখ—যাহাতে কৃষ্ণের সুখ—কৃষ্ণ-জননীর তাহাতেই সুখ। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাতেও গৌরাঙ্গ-জননী স্নেহময়ী শচীমাতার সেই একই ভাব—তাঁহার পুত্ররত্নটী সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিয়া মনে সুখ পাইবে—ইহাতে জগতের পরম মঙ্গল হইবে—গৌরাঙ্গ-সুখেই তাঁহার সুখ—এখানেই বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাবেরই অপূর্ব্ব পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তি,—কারণ এখানে আত্মসুখ-তাৎপর্য্য একেবারে নাই—স্ব-সুখগন্ধশূন্য এই যে বাৎসল্যভাব,—ইহার পরম চমৎকারিতা পরমাস্বাদনীয়। অপর পক্ষে গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁহার প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসধর্ম্মাচরণে অনুমতি দিয়াছিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

প্রভু আজ্ঞাবাণী শুনি, বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গণি,
স্বতন্ত্র ঈশ্বর এই প্রভু।
নিজসুখে করে কাজ, কে দিবে তাহাতে বাধ,
প্রত্যুত্তর না দিবেন তভু"—

"মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বুঝিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার মুখ্যাশক্তির আত্মসুখ-তাৎপর্য্যবিহীনতার ভাব দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণবল্লভা বৃষভানু-নন্দিনী আর গৌরবল্লভা সনাতন-নন্দিনীর মধ্যে গৌর-কৃষ্ণ প্রেমানুরাগের অবশ্যই কিছু বৈশিষ্ট আছে, এবং এই লীলা বৈশিষ্ট-বৈভব প্রদর্শনের জন্যই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ এবং তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শ্রীধাম নবদ্বীপে বিশিষ্ট আবির্ভাব। শ্রীগৌরসুন্দর যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট আবির্ভাব, তদ্রূপ গৌর-বল্লভাও কৃষ্ণবল্লভার বিশিষ্ট আবির্ভাব। কলিযুগে স্বয়ংভগবানের সহিত তাঁহার স্বরূপশক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব-লীলা-বৈভব দুই ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের মুখ্যাশক্তির অনন্তপ্রকাশের অনন্ত লীলারঙ্গ অনন্তভাবে প্রকাশিত হইয়া মধুর রসলোলুপ রসিক ভক্ত-বৃন্দের প্রাণে নানা ভাবে প্রেমানন্দ দান করিতেছে। তবে এই লীলাময়ীর লীলা-বৈভবের বিশিষ্ট-ভাব-সম্পত্তি শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের মুখ্যা শক্তির নিজস্ব বস্তু—নিজ গুপ্তবিত্ত। এই বিশিষ্ট-ভাব-সম্পদ কাহারও নিকট তাঁহার ধার করা বস্তু নহে—বা কাহারও গচ্ছিত ধনও নহে। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গৌরগোবিন্দস্বরূপে তাঁহার পূর্ব্বলীলার স্বরূপশক্তির ভাবকান্তি চুরি করিয়া কলিযুগে যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিলেন, তাঁহার পরিপূর্ণ রসমাধুর্য্য-সম্ভোগ এবং আস্বাদন করিয়াও পুনরায় তাঁহার স্বরূপ-শক্তি সনাতন-নন্দিনীর গৌর-প্রেয়সীভাবের স্বতন্ত্রতা ও অপূর্ব্ব লীলারঙ্গরসাস্বাদনের লোভ কোন কোন প্রাচীন গৌরভক্ত পদকর্ত্তা নিত্যপার্ষদগণের মনে উদয় হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার স্থান এখানে নাই—প্রয়োজন হইলে প্রবন্ধান্তরে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

মনে তত্ত্বানুশীলন ভাবের তরঙ্গ উঠিলে লীলারসাস্বাদন-সুখ ভঙ্গ হয়, তজ্জন্য জীবাধম লেখক নিজেই লজ্জিত এবং দুঃখিত। কৃপানিধি পাঠকপাঠিকাবৃন্দের চরণে নিবেদন তাঁহারা নিজগুণে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

গৌর-বল্লভা সখি কাঞ্চনার মুখে বৃষভানুনন্দিনীর অপূর্ব্ব কৃষ্ণানুরাগের পূর্ব্বোক্ত পদটি শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন—তাঁহার কোমল প্রাণে কৃষ্ণানুরাগিণী বৃষভানুনন্দিনীর এই কথাগুলি বড়ই বাজিল—

—"মায়ের পরাণ, এমন ধরণ,
দয়া নাই তাঁর চিতে"—

মাতৃভক্তচূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দরের জননী শচীমাতা

তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম একমাত্র পুত্রের সন্ন্যাসধর্ম্মাচরণের বিরোধী ছিলেন না। গোচারণের কষ্ট অপেক্ষাও বৈরাগ্য-ধর্ম্মপালনে কঠোরতা ও শারীরিক কষ্ট অধিক, তথাপিও পুত্রস্নেহবৎসলা শচীমাতা তাঁহার প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রকে সন্ন্যাস ধর্ম্মাচরণের কঠোরতা ত্যাগ করিতে কখনও অনুরোধ করেন নাই।

আরও একটী ভাব গৌরবল্লভার মনে উদয় হইয়াছে যে তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রাণবল্লভের জননীর প্রতি এরূপ ভাব পোষণ করিতে পারেন না, কারণ তাঁহার প্রাণবল্লভের আদেশ তাঁহার মাতৃসেবা তাঁহার নিজ সেবা অপেক্ষাও বড়। একদিকে যেমন গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির মনে কৃষ্ণবল্লভা বৃষভানুনন্দিনীর অপূর্ব্ব কৃষ্ণানুরাগের গভীরতার অনুভূতি এবং প্রভাব উদয় হইল—অপর দিকে তেমনি তাঁহার স্বপক্ষে এই ভাবটী হৃদয়ে পোষণ করিতে বিষম শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি এই ভাবটী মনে মনেই রাখিলেন। সুচতুরা ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্না সখি কাঞ্চনার তাঁহার প্রিয়সখির তাৎকালিক মনোভাব বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না—তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে পরম প্রেমভরে প্রিয়সখির হাতখানি নিজ হস্তের মধ্যে টানিয়া ধরিয়া মৃদুমধুর বচনে কহিলেন—"সখি! শ্রীরাসলীলার গোপীগীতায় প্রাচীন শ্লোকে (১) কৃষ্ণপ্রেমপাগলিনী মহাভাববতী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার উক্তি এই মাতৃস্নেহভাবের কৃষ্ণপ্রেমম্লানতাব্যঞ্জক ভাব সূচিত হইয়াছে। গোচারণ-সুখ-লোলুপ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের স্ব-সুখের অনুভূতিস্থলেও তাঁহার শারীরিক ক্লেশানুভব আশঙ্কায় মহাভাববতী ব্রজগোপিনীশ্রেষ্ঠা কৃষ্ণবল্লভা বৃষভানু-নন্দিনার মন বিষণ্ণ হয়—ইহাই শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা। পরম পুত্রবৎসলা স্নেহময়ী মা যশোদার পুত্রস্নেহের ম্লানতা অনুভবে মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা মহাভাবময়ী কৃষ্ণপাগলিনী শ্রীরাধিকারই উপযুক্ত—তিনি এবং তাঁহার কায়ব্যূহ সখিগণের এই ভাবসম্পত্তি তাঁহাদেরই নিজস্ব ধন।"

বিরহিণী গৌরবল্লভা সখি কাঞ্চনার ভজনবিজ্ঞতা এবং রস-জ্ঞান-পারিপাট্য দেখিয়া পরম মুগ্ধ হইযা ধীরে ধীরে মৃদু মধুর বচনে কহিলেন—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে। তুমি আমার মনের কথা—মনের ভাব—প্রাণের ব্যথা কি করিয়া বুঝিলে সখি! আমি মনে মনে মহাভাবময়ী বৃষভানুনন্দি-নীর এই ভাবটী লইয়া নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতেছিলাম—এবং ইহার জন্য মানসিক ক্লেশই অনুভব করিতেছিলাম। সখি! প্রিয়সখি! তুমি আমার প্রাণের সখি। তুমিই আমার এই বিপদে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিতেছ। তোমার ঋণে আমি চিরবদ্ধ,—শত জন্মেও আমি তোমার ঋণ শোধ করিতে পারিব না,—তোমার নিকট আমি বহুভাবে ভজনবিজ্ঞতা লাভ করিতেছি—তুমিই আমার গৌর-কৃষ্ণ-প্রেমের গুরু।"—এই বলিয়া বিরহিণী গৌর বল্লভা তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার গলদেশ পরমপ্রেমাবেশে তাঁহার ক্ষীণ দুই হস্তে পরিবেষ্টন করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রেমাশ্রুজলে ভূমিতল সিক্ত হইল।

সখি অমিতা স্থিরচিত্তে ধীরভাবে এতক্ষণ সকল কথাই শুনিতেছিলেন—এখন গৌরবিরহিণী দুই সখিকে লইয়া তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন—দুই জনেই প্রেমাবেগে অসম্বর হইয়াছেন—দুই জনেরই প্রেম-মূর্চ্ছনা-ভাব। নানাপ্রকার সুশ্রূষার পর দুই জনের কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইল—তাঁহারা তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং স্ব স্ব জপমালার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সখি অমিতা তাঁহাদের হস্তচ্যুত জপমালাদ্বয় সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে যত্নে রাখিয়া-ছিলেন—তিনি তাঁহাদের হস্তে তাহা দিলেন। তখন পুনরায় তিন জনে বসিয়া সংখ্যাজপ করিতে লাগিলেন।

সখি কাঞ্চনা গৌরনাম জপ করিতে করিতেই তাঁহার হৃদয়ে নামনামীর একত্ববোধক-শ্রীগৌর গোবিন্দমূর্ত্তি প্রকটিত হইল। তিনি নামের সঙ্গে নামীর দর্শনলাভ করিয়া প্রেমানন্দে গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ গুঞ্জরী।

"মধুকর-রঞ্জিত মালতি-মণ্ডিত জিত-ঘন-কুঞ্চিত-কেশং।
তিলক-বিনিন্দিত শশধররূপক যুবতী-মনোহর-বেশং॥

(১) চলসি যদ্ ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিন-সুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিল তৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ।
কলিলতাং মনঃকান্ত গচ্ছতি॥
* * * *
যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু—
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ। শ্রীগোপী-গীতা।

সখি কলয় গৌরমুদারং ॥
নিন্দিত-হাটক-কান্তি-কলেবর গর্ব্বিত-মারক-মারং। ধ্রু ॥
মধু-মধুরস্মিত শোভিত-তনুভূতমনুপম ভাব-বিলাসং।
নিধুবন-নাগরী মোহিত-মানস বিকসিত গদগদ ভাবং ॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন নরগণ করুণা বিতরণশীলং।
ক্ষোভিত দুর্ম্মতি রাধামোহন নাম নিরুপম-লীলং ॥

পদকল্পতরু।

গান শুনিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভা ও সখি অমিতার হৃদয়েও সেই সঙ্গেসঙ্গে নাম ও নামীর একত্ববোধক শ্রীগৌরগোবিন্দমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইল—তাঁহারাও প্রেমানন্দে অধীর হইলেন—গৌরবল্লভা প্রিয়াজি প্রেমাবেশে তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন—তাঁহার বদনচন্দ্র পরমজ্যোতিপূর্ণ—শুষ্ক ওষ্ঠপ্রান্তে যেন মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। সখি কাঞ্চনা ইহা দেখিয়া পরম প্রেমানন্দভরে তাঁহার কলকণ্ঠে পুনরায় ভৈরবী রাগিণীতে গোরা-রূপ গানের ধুয়া ধরিলেন—

—"পশ্য শচীসুতমনুপম রূপং।
খণ্ডিতামৃতরস নিরুপম কূপম্ ॥
কৃষ্ণরাগ কৃতমানস তাপং।
লীলাপ্রকটিত রুদ্র প্রতাপম্ ॥
প্রকটিতং পুরুষোত্তম সবিষাদম্।
কমলাকর কমলাঙ্কিত পদম্ ॥
রোহিত বদন তিরোহিত ভাবং।
রাধামোহন কৃত চরণাশম্ ॥" পদকল্পতরু।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে সুকণ্ঠা ও সুগায়িকা সখি কাঞ্চনার প্রাণের মধ্যে গৌরকৃষ্ণরস-গানের অনন্ত ও অফুরন্ত উৎস আছে—তিনি যখন গৌরকৃষ্ণগুণগানে প্রমত্ত হন, তখন তাঁহার দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না—প্রেমাবেশে আলুথালু ও অসম্বর হইয়া তিনি পরম প্রেমানন্দে গৌর-রূপ-গুণগান করিতেছেন—তাঁহার প্রেমরসে ঢলঢল বদনের ভাব সুপ্রসন্ন—তাঁহার নয়নদ্বয়ে যেন গৌরপ্রেমের বিজলী খেলিতেছে,—তাঁহার অন্তর যেন গৌরপ্রেমে গরগর। বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া এক দৃষ্টে অনিমেষ নয়নে তাঁহার প্রাণসখির বদনের প্রতি চাহিয়া আছেন—তিনি ধীর স্থির এবং পরম গম্ভীরভাবে তাঁহার প্রাণবল্লভের অপরূপ হৃৎকর্ণ-রসায়ন রূপ-গুণগান শ্রবণ করিতেছেন। সখি অমিতা নিকটে বসিয়া উভয়ের এই পরম মধুর ও মহান্ ভাবসম্পত্তি পরমানন্দে ভোগ করিতেছেন।

গৌরপাগলিনী সখি কাঞ্চনা আজি প্রকৃতই পাগলিনীর মত বহুবিধ অঙ্গভঙ্গী ও নয়নভঙ্গী করিয়া মনের সাধে নদীয়ার নীরব গম্ভীরা-মন্দির কাঁপাইয়া—নিস্তব্ধ নদীয়া-গগন ভেদ করিয়া সপ্তস্বর্গ ও পাতালভেদী গৌর-রূপ-গুণ গানের ধ্বনি তুলিয়াছেন—সে ধ্বনি নীলাচলের গম্ভীরামন্দিরেও ধ্বনিত হইতেছে—যাঁহার নামের—যাঁহার রূপ-গুণ-গানের ধ্বনি যেখানে হইতেছে—তিনিও সেখানে উপস্থিত হইয়া "মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই শাস্ত্রবাক্যের সফলতা করিতেছেন। এই ভাবে নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরে তখন শ্রীগৌর-গোবিন্দের আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং সকলের আর আনন্দের সীমা নাই—সকলেই পরম প্রেমানন্দ সাগরে মগ্ন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—পরমানন্দ-সাগরে সকলেই ভাসমান। সখি কাঞ্চনা কলকণ্ঠে পুনরায় গান ধরিলেন—

রাগ-কল্যাণী।

"দেখ দেখ সখি! গোরা বর দ্বিজমণিয়া।
নিরুপম রূপ, বিধি নিরমিলা, কেমনে ধৈরজ ধরিয়া ॥
আজানুলম্বিত সুবাহুযুগল, বরণ কাঞ্চন জিনিঞা!
কিয়ে সে কেতকী, কনক-অম্বুজ, কিয়ে বা চম্পক মণিয়া ॥
কিয়ে গোরোচনা, কুসুম বরণ, জিনি অঙ্গ ঝলমলিয়া।
মধুর বচনে অমিয়া বরিখে, ত্রিজগৎ মন-ভুলিয়া ॥
কত কোটি চাঁদ, বদন নিছনি, নখ চাঁদে পড়ে গলিয়া।
বাসু ঘোষে কহে,গৌরাঙ্গ-বদন,কে দেখি আসিবে চলিয়া ॥"

গৌর-পদ তরঙ্গিনী।

সখি অমিতা অবশ্যই দোহার দিতেছেন এবং এই শীতকালেও পরিশ্রান্তা গায়িকা সখিকে মৃদুমন্দ পাখার বাতাস দিতেছেন—সখি কাঞ্চনা ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়াছেন—প্রেমাশ্রুধারা তাঁহার ঘর্ম্মজলে মিশ্রিত হইয়া পরম পবিত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ধারা-রূপে তাঁহার ক্রোড়স্থা গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পরিধান বস্ত্র ও শ্রীঅঙ্গ পরিসিঞ্চন করিতেছে। বিরহিণী প্রিয়াজি সখিক্রোড়ে নিশ্চল—নীরব—যেন জড়প্রায়। তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার প্রফুল্ল বদনের প্রতি—তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইলেও মনে মনে ভাবিতেছেন—সখি কাঞ্চনার মত সৌভাগ্য আমার কবে

হবে—কবে আমি গৌররূপ-গুণ-গানে প্রিয়সখির মত শতমুখী হইব—কবে আমি লজ্জা মান ভয়ের মাথা খাইয়া এরূপ ভাবে উচ্চৈঃস্বরে গৌর-গুণ-গান করিবার সৌভাগ্য পাইব—কবে আমি কুলশীল মানে তিলাঞ্জলি দিয়া গৌর গৌর বলিয়া পাগলিনীর মত এই নদীয়ার পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইব—দ্বারে দ্বারে গিয়া গৌরাগ্রজ নিতাইচাঁদের ন্যায় সকল লোকের চরণ ধরিয়া বলিব—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥"

কবে আমার ভাগ্যে এমন শুভদিন উদয় হইবে? গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির মানস-সরোবরে এইরূপ ভাব-তরঙ্গাবলী উত্থিত হইয়া তাঁহার হৃদি-সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্ছলিত করিতেছে। তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনা তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াই যেন আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

শ্রীরাগ।

—"গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু॥
একুলে ওকুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদ ছায়া দিয়া॥"

গৌরপদতরঙ্গিণী।

এতক্ষণের পর সখি কাঞ্চনা পরিশ্রান্তবোধে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের ভান করিয়া তাঁহার প্রিয়সখিকে ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে উঠাইয়া বসাইলেন—চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় গৌর-বল্লভা ভজন-মন্দিরের দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন,—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই জনেই তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন,—বিরহিণী গৌরবল্লভার নয়নদ্বয় আরক্তিম—নয়নের তারাদ্বয় গৌরপ্রেমরসে ডুবুডুবু, অবিশ্রান্ত নয়নধারায় তখনও তাঁহার বক্ষ প্লাবিত—তিনি যেন স্তম্ভভাবাপন্না। মুখে কোন কথা নাই—নয়নদ্বয় নিমিলিত—সর্ব্বাঙ্গ অবশ—যেন জড়বৎ। সখিদ্বয় বিপদ গণিয়া শ্রীগৌরচরণ স্মরণ করিয়া গৌররূপানুরাগ কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন। এবার দুই জনে মিলিয়া গান ধরিলেন—

নটরাগ।

"বিহরত সুর-সরিত-তীর, গৌর-তরুণ-বয়স-থির
তড়িত-কনক-কুঙ্কুম-মদ-মর্দ্দন-তনু-কাঁতি॥
মদন-কদন-বদন-চন্দ্র, নিখিল তরুণী নয়ান ফন্দ,
হসত লসত-দশন-বৃন্দ-কুন্দ-কুসুম-পাঁতি॥
অঞ্জন-ঘন পুঞ্জ বরণ, কুঞ্চিত-কচ ধৈর্য্য-হরণ,
বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অনুপম।
ভাল-তিলক ঝলকত অতি, ভাঙভুজগ-মঞ্জুল-গতি,
চঞ্চল-দিঠে-অঞ্চল রসরঞ্জিত-ছবিধাম॥
কুণ্ডল-শ্রুতি-গণ্ড-কলিত, কণ্ঠহি বনমাল-বলিত,
বাহু বিপুল-বলয়া-কর-কোমল-বলিহারি।
পরিসর-বর-বক্ষ-অতুল, নাশত-কত-কুলবধূ-কুল,
ললিত-কটি সুকৃশ কেশরী-গরব খরবকারী॥
জগমগ ভুজ-জানু-তরুণ, অরুণাবলী-কিরণ-চরণ,
কমল-মধুর-সৌরভ-ভরে ভকত-ভ্রমর ভোর।
করুণা ঘন-ভুবন-বিদিত, প্রেম-অমিয়া বরখত নিত,
নরহরি মতি-মন্দক বহু পরশত নাহি থোর॥"

পদকল্পতরু

গৌররূপ-গানের মধুর ঝঙ্কার শুনিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভার বাহ্যজ্ঞান হইল—তাঁহার প্রাণে যেন নব বলের সঞ্চার হইল—মনে পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে উদয় হইতে লাগিল। সেই নদীয়া—সেই গঙ্গাতীর—সেই সব নদীয়াবাসী ভক্তগণ—নদীয়ার সেই আকাশ—সেই পবন—সেই সলিল—সেই ঘাট—কিন্তু কোথায় আমার সেই—

"তড়িত-কনক-কুঙ্কুম-মদমর্দ্দন-তনু-কাঁতি"

নাগরেন্দ্র নবদ্বীপচন্দ্র? কোথায় আমার সেই—

"মদন-কদন-বদনচন্দ্র, নিখিল তরুণী নয়ান-ফন্দ"

গৌরচন্দ্র গুণমণি? কোথায় আমার সেই—

"কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ডকলিত,
কণ্ঠহি বনমাল-বলিত,
বাহু-বিপুল-বলয়া-কর কোমল বলিহারি"

শচীনন্দন গৌরহরি কোথায়?

এই বলিয়া গৌরবিরহাকুল ব্যাকুলপ্রাণে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি পরম প্রেমাবেশে তাঁহার দুইখানি ক্ষীণ হস্তে দুই

সখির গণ্ডস্থল পরিবেষ্টন করিয়া বালিকার ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌর-বল্লভার সে করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি নাই—হতাসের সে দীর্ঘ শ্বাস নাই—আছে কেবল নাড়ি মোচড়ান হৃদিবেদনার বিষম কন্‌কনানি—আছে কেবল শত শূচীভেদ্য বুকের বেদনাভরা মর্ম্মান্তিক যাতনার অনুভব। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই জনে মিলিয়া গৌরবক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজিকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছেন—প্রিয় সখির ভাঙ্গা বুকের শত সহস্র বেদনাপুঞ্জ তাঁহারা নিজ বুকে লইয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর-বিরহ-ভাব কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেছেন—এই সময় এইরূপভাবে যদি নদীয়া-নাগর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ একটীবার নদীয়ায় আসিয়া তাঁহার বিরহ-বিহ্বলা প্রাণবল্লভাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া একটী রসকথা কহিয়া তাঁহার তাপিত প্রাণ শীতল করিতেন—তাহা হইলে কত সুখের হইত সে প্রেমালিঙ্গন—কত মধুর হইত, সে রসকথা—কত মধুর হইত সে মধুমিলন! সখিদ্বয় মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন—আর অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—গৌরবল্লভাকে বুঝাইবার কিছু নাই—তাই কেবল হতাশের নীরব রোদন—মধ্যে মধ্যে করুণ হইতেও সকরুণ আত্মগ্লানিপূর্ণ এক একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের মৃদু সকরুণ ধ্বনি শ্রুত হইতেছে—সে ধ্বনির প্রভাব—সে নীরব দীর্ঘশ্বাসের প্রবল প্রতাপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী—সে ধ্বনির মৃদু ঝঙ্কারের সহিত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবজগতের হাহাকার বিজড়িত রহিয়াছে। নীলাচলের গম্ভীরামন্দির-বাসী ন্যাসীচূড়ামণি ও তাঁহার পার্ষদভক্তবৃন্দও এই ধ্বনির প্রবল প্রভাবের কবলীভুত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একদিন নীলাচলে বসিয়া বলিয়াছিলেন,—যথা - শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

—"ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে মুঞি করিয়ে আকুলি॥"—

বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রেমালিঙ্গনমুক্ত হইয়া তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—নিজ মলিন বসনাঞ্চলে চক্ষুদ্বয় মুছিলেন—বসন সম্বরণ করিলেন—ভূমিতলে বামহস্তে শরীরের ভর দিয়া স্বয়ং উঠিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু উঠিতে পারিলেন না—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইলেন—গৌর-বিরহ-ব্যাধি-পীড়িতা গৌরবল্লভা চলৎশক্তি রহিতা—মুখে কোন কথা নাই—নয়নদ্বয় প্রেমাবেশে ঢুলু ঢুলু—সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি যেন চাহিতে পারিতেছেন না—নয়নে নয়নে মিলন হইলেই প্রিয়াজির নয়নে পুনরায় প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে—মুক্তাফলের ন্যায় বড় বড় অশ্রুবিন্দু তাঁহার নয়নকোণ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া পড়িয়া কপোল ও গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিতেছে—বেন শত চেষ্টাতেও পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি তাহা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অবস্থায় মৃদু পদবিক্ষেপে অতি ধীরে ধীরে দুই হস্তে সখিদ্বয়ের কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া তিনি নিজ ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সখি কাঞ্চনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমরা কেহ কি মন্দিরাভ্যন্তরে আজ থাকিতে পারি?"—উত্তর হইল—"না"। ভজন-মন্দিরের দ্বারে অর্গল বদ্ধ করিয়া গৌর-বিরহিণী নিজ আসনে বসিলেন। তখন রাত্রি এক প্রহর।

বিষ্ণুপ্রিয়া পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ।
২৮এ আশ্বিন ১৩৩৭
বুধবার। রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(৭)

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া গভীর রাত্রিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভা নির্জ্জনে গৌরভজন করিতেছেন। অমাবস্যা নিশি—ঘোর অন্ধকারে গৌরশূন্য গৌরগৃহ সমাচ্ছন্ন—গৌরশূন্য গৌরগৃহে অমাবস্যা চিরদিনই—তবে গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রতিভারূপ ঘৃত-প্রদীপটি এখনও সেখানে মিটি মিটি নিত্য জ্বলিতেছে—ধুপ ধুনার বিশিষ্ট আয়োজন নাই,—কিন্তু গৌর-অঙ্গ-পদ্ম-গন্ধে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির সদাসর্ব্বদা মহ মহ করিতেছে। গৌরবিরহিণী গৌরাঙ্গিনী গৌর-বল্লভার শ্রীঅঙ্গজ্যোতিতে নির্জ্জন ভজন-মন্দির যেন সর্ব্বদা আলোকিত রহিয়াছে। গৌরশূন্য গৌরগৃহে গৌর নাই,—গৌরবল্লভা আছেন—নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ নাই—নবদ্বীপময়ী মহালক্ষ্মী

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আছেন—শক্তিমান নাই—গৌর-শক্তি আছেন। এখনও নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের প্রাণ জুড়াইবার একমাত্র স্থান গৌরপদাঙ্কসেবিত—গৌরপদরজস্পৃষ্ট নদীয়া-যুগল-বিলাসস্থলী সেই গৌর-গৃহটি বর্ত্তমান আছে—সেই গৃহে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী বৈষ্ণব-জননী নবদ্বীপময়ী গোলোকের মহালক্ষ্মী এখনও বিরাজমানা। মহা তপস্বিনীবেশে তিনি কঠোর বৈরাগ্য-ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রাণবল্লভের কৃপাদেশে। গৌরচরণস্পৃষ্ট প্রতি ধূলিকণা গৌরভক্তবৃন্দের প্রাণস্বরূপ,—গৌরপদাঙ্ক-বিলসিত নদীয়ার সেই সুরধনীতট—গৌরাঙ্গ-অঙ্গস্পর্শপ্রাপ্ত নদীয়ার সেই বৃক্ষ-লতা তৃণগুল্ম—গৌর-কৃপা-দৃষ্টিপাত-সৌভাগ্য-প্রাপ্ত নদীয়ার সেই স্থাবর জঙ্গমাদি এখনও সকলই বর্ত্তমান,—কিন্তু "জন-মনচোর-নাগরবর-সুন্দর-নদীয়া-বিহারী" গৌরহরির সেই নদীয়া-বিহারস্থলীগুলি যেন গৌর বিরহে শোভাহীন ও ম্রিয়মান। নদীয়ার চতুর্দ্দিক দিবাভাগেই যেন ঘোরান্ধ-কারাবৃত—হা হুতাশ ও হাহাকারপূর্ণ বিষাদের একটা ভীষণ ছায়া পড়িয়াছে যেন সকলের উপরেই—রাত্রিকালের ত কথাই নাই—তদুপরি আজ অমাবস্যার ঘোরা রজনী।

এই অমাবস্যার ঘোরা রজনীতে গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ-দ্বার গৌরশূন্য গৌরগৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া মলিনবদনা, রুক্ষকেশা, জীর্ণাশীর্ণা গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচিত্রপটখানি এবং শ্রীচরণ-পাদুকাদ্বয় রাখিয়া গলবস্ত্রে করযোড়ে প্রেমগদগদ অস্ফুট কাতর বচনে দরদরিত নয়নধারায় নিজ বক্ষ এবং তাঁহার প্রাণবল্লভের শয়ন-কক্ষ ভাসাইয়া কাষ্ঠপাষাণ-দ্রবকারী পরম করুণ ক্রন্দনের স্বরে কিরূপ প্রাণস্পর্শী আত্মনিবেদন করিতেছেন ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুন,—

প্রাণবল্লভ হে! প্রাণকান্ত হে!! জীবনধন হে!!

—"চরণ ধরিয়া করি এই মিনতি।
কি করে ভজিব তোমা দেখাও রীতি॥
ল'য়েছ কঠোর ব্রত, পাইতেছ ক্লেশ কত,
আমি ত ঘরেতে আছি—সুখেতে অতি।
তব কথা মনে হ'লে, হৃদয়ে আগুন জ্বলে,
কি করে ভজন করি—দাও সুমতি॥
সেবাবিধি ব'লে দিয়ে, সুশীতল কর হিয়ে,
আমি ত গৃহেতে আছি—তুমি যে যতি।
কি করে সেবিব তোমা—শিখাও রীতি॥

—"কাঁদিলে কাটিলে তুমি দেখা দিবে না।
জানি আমি তবু মোর মন বুঝে না॥
পাষাণে বেঁধেছি বুক, না দেখাব কালা মুখ,
গৃহে বসি তব নাম,—করি সাধনা।
কঠোর ভজন-রীতি, যতনে শিখাও অতি,
এ দাসীর প্রতি নাথ! করি করুণা॥
তোমার চরণ-মধু, আমার সাধন সুধু,
পিব আর পিয়াইব—ভকত জনা।
কাঁদিলে কাটিলে তুমি দেখা দিবে না॥

—"অনুরাগী হয়ে যদি ডাকিতে পারি।
নাম-নামী এক করে জপিতে পারি॥
লইতে পারি গো যদি, হরিনাম নিরবধি,
এ বিপদ যাবে মোর—বিপদ হারি!
কর নাথ! শক্তি দান, যাক্ মোর অভিমান,
জনম-দুখিনী আমি—দাসী তোমারি।
অভিমানে হৃদি ভরা, কি সাধ্য ভজন করা,
দূর কর অভিমান—দরপ-হারি!
অনুরাগী হয়ে যাতে ডাকিতে পারি॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপগীতি।

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দির ভেদ করিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভার গৌর-বিরহ-কাতর করুণ হইতেও করুণ এই আত্মনিবেদনের বিষাদপূর্ণ বিলাপধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিল নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে কৃষ্ণবিরহকাতর দশমদশাগ্রস্থ ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কর্ণে। তিনি তখন দিব্যোন্মাদদশাগ্রস্থ,—স্বরূপদামোদর এবং রায় রামানন্দ তখন তাঁহার নিকটে নাই—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—তাঁহারা নিজ নিজ বাসায় গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যেন তখন দিগবিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কৃষ্ণবিরহানলে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ে তখন ভীষণ কৃষ্ণবিরহানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে—একবার উঠিতেছেন,—একবার বসিতেছেন—কখনও বা গম্ভীরা-মন্দিরের ভিতে এবং অর্গলরুদ্ধ দ্বারে উন্মাদের ন্যায় মস্তক ঠুকিতেছেন—কখনও ভীষণ পরিশ্রান্ত হইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছেন—কখনও বা ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহার এই সময়ের কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ-দশার

প্রলাপোক্তি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। যথা,—

"—সখি হে! না বুঝি যে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈলুঁ প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায় না রহে পরাণ॥
কুটিল প্রেম অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রুর শঠের প্রেমডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে,
রাখিয়াছে নারী উকাশিতে॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি করে জরজরে,
দুঃখ দেয় না লয়ে জীবন॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাঁহা লেখি, না জানয়ে প্রাণসখি,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবার॥
"কৃষ্ণ কৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার"
সখি! তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্র-জল,
তত দিন জীবে কোন জন॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহনা বিচারি।
নারীর যৌবন ধন, যাতে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন দুই চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজ ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥"—
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ বিলাপ-ধ্বনির সহিত নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরের রাধাভাবে-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর এই প্রলাপোক্তির মূলতঃ কোন সৌসাদৃশ্য সাধারণ চক্ষে পরিলক্ষিত না হইলেও, এই দুইটী বিলাপ-ধ্বনির একত্র সংমিশ্রণে যে ভাবকল্পবৃক্ষের বীজ ভাব-গম্ভীর ভজনবিজ্ঞ সাধকবৃন্দের হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়—সেই বীজ হইতে কালক্রমে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়,—তাহারই স্কন্দদেশে পরমার্থ-প্রেম-সম্পত্তি-সার মহাভাবের অবস্থিতি। এই ভাব কল্পদ্রুমের শাখা প্রশাখা ও পল্লব-ফুল-ফলের অপরূপ শোভা-সৌন্দর্য্যে, সুঘ্রাণ-সৌরভে এবং অপূর্ব্ব রসাস্বাদনে কলিহত জীবের পাপ-কলুষিত চিত্তেও শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের অপূর্ব্ব নদীয়া-যুগল-বিলাস-বৈভবের যৎকিঞ্চিৎ অনুভূতির উন্মেষ ও উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী গৌর-বল্লভার করুণ হইতে সকরুণ লীলা-রস-সম্ভারের বিষাদময়ী স্মৃতি সকল একে একে তাহাদের শুষ্ক ও কঠিন হৃদয় মধ্যে উদিত হইয়া যে চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, তাহাতেই তাহাদের চিত্তপ্রসন্ন হয় এবং আধ্যাত্মিক পরম মঙ্গল সাধিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার প্রাণবল্লভার ভাবকান্তি চুরি করিয়া অগাধ কৃষ্ণবিরহ-সাগরে মগ্ন হইয়া নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরে যে অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন লীলারঙ্গ করিতেছেন, তাহার মূল উৎস কোথায় তাহা তিনি ভুলেন নাই। তিনি যাঁহার ভাবকান্তি চুরি করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু সাজিয়াছেন—তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া শ্রীভগবানের পক্ষেও বড় কঠিন কথা। কৃতজ্ঞতার মূর্ত্তি-বিগ্রহ যিনি—তিনি কি অকৃতজ্ঞ হইতে পারেন? অকৃতজ্ঞতার ভাণ দেখাইলেও তাঁহার পরম পবিত্র নামে যে কলঙ্ক হইবে।

রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কর্ণে যখন তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকাস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সকরুণ বিলাপ-ধ্বনির প্রতিধ্বনি পৌঁছিল—তিনি অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমি যাঁহার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছি—আমি যাঁহার নিজস্বধন প্রেম ও নিজ ভাব-সম্পত্তি চুরি করিয়া অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় ব্রজ-রসাস্বাদন করিতেছি—এবং তিনিও নদীয়ায় আমার গৃহে বসিয়া যে মধুর বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদন করিতেছেন এবং যে বিপ্রলম্ভ-রসপুষ্টির জন্য নদীয়ায় তাঁহার বিশিষ্ট আবির্ভাব,—সেই মহাভাবময়ী বৃষভানুনন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব সনাতননন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আমারই ইচ্ছায় স্ব-স্বরূপে নদীয়ার যে অপূর্ব্ব

লীলারঙ্গ প্রকট করিতেছেন, তাহারই অভিনয় মাত্র আমি এখানে কিঞ্চিৎ প্রকট করিতেছি। অহো! আমার পরম শ্রেষ্ঠ প্রেয়সীভাবের মূলাধার—আমার এই পরমাস্বাদ্য বিপ্রলম্ভরসের মূল উৎস ত নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে অবস্থিত। আমি সর্ব্বক্ষণই সেখানে আছি—সর্ব্বক্ষণই আমি সেই পরম শ্রেষ্ঠ বিপ্রলম্ভ-রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছি। আমার প্রেয়সীভাব চতুরা ও মধুর-ভজন-রস-রসিকা প্রিয়সখী নদীয়া নাগরী-বৃন্দ এই মহাভাবের পুষ্টিসাধন করিতেছেন। সেই সনাতন-নন্দিনী প্রেমভক্তি-স্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াই আমার প্রেমের গুরু"।

মনে মনে ঐশ্বর্য্যবোধক এই সকল ভাব-রস-কদম্বগুলি সৃষ্টি করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু অধিকতর কৃষ্ণ-বিরহরস-সাগরে নিমগ্ন হইলেন—তিনি গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার খুলিয়া বাণবিদ্ধ হরিণীবৎ সেই গভীর অর্দ্ধরাত্রিতে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন—বহিরাঙ্গনের তিনটী দ্বার বন্ধ ছিল তাহা খুলিতে যাইয়া দেওয়ালের ভীতে শ্রীবদন ঘর্ষিত হইল—অদূরে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে তৈলঙ্গী গাভী সকল শয়ন করিয়া আছে—সেই গভীর রাত্রিতে অন্ধকারে তিনি তাহাদের মধ্যে গিয়া অজ্ঞানাবস্থায় পতিত হইলেন—তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাববিকার সকল একে একে উদয় হইতে লাগিল—তিনি কখনও কূর্ম্মাকৃতি—ভাব-সাবল্যে তাঁহার পদাদির গ্রন্থি সকল শিথিল—এই-ভাবে তিনি সেখানে পড়িয়া আছেন।

এদিকে নদীয়ার মহা-গম্ভীরামন্দিরে গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কিরূপ অবস্থা হইয়াছে কৃপানিধি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ কৃপা পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহা শ্রবণ করুন।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ—রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—অমাবস্যার নিশি—সূচীভেদ্য ঘনান্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন—তদুপরি আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন—মধ্যে মধ্যে বিজলী খেলিতেছে—বিন্দু বিন্দু সলিল পাতও হই-তেছে—ঘনবর্ষণেরও আশঙ্কা রহিয়াছে। বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার রুদ্ধদ্বার ভজন-গৃহে নির্জ্জন ভজনানন্দে আছেন—বাহিরের কোন সমাচার তিনি রাখেন না। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ভজন-মন্দিরের বহির্ভাগে বসিয়া সংখ্যানাম জপ করিতেছিলেন—তন্দ্রাবেশে ভূমিতলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন দৈবদুর্ব্বিপাকে দুই জনেই গাঢ় নিদ্রাভিভূতা।

বিরহিণী প্রিয়াজিও এখন বিরহের দশমীদশাগ্রস্থা। এই দশ দশা কি কি তাহা জানিয়া রাখুন। (১) চিন্তা (২) জাগরণ (৩) উদ্বেগ (৪) তানব (৫) মলিনাঙ্গ (৬) প্রলাপন (৭) ব্যাধি (৮) উন্মাদ (৯) অনুক্ষণ মোহ (১০) মৃত্যু।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার এখন বিরহোন্মাদ দশা—তাঁহার যখন যে দশা হয় তাহাই মর্ম্মান্তিক এবং প্রাণঘাতী গৌর-বিরহ-জ্বালা-ব্যঞ্জক। তাঁহার প্রাণবল্লভের অদর্শনজনিত বিরহ-সাগরোত্থ ভীষণ উদ্বেগ-তরঙ্গগুলি একে একে তাঁহার হৃদিসমুদ্রকে অতি ভীষণভাবে উদ্বেলিত ও আলোড়িত করিতেছে। তিনি সেই গভীর অন্ধকারময় অমাবস্যা নিশীথে দ্বাররুদ্ধ ভজন-মন্দিরে বসিয়া তাহার গৌর-বিরহ-দগ্ধ হৃদয়ের মর্ম্মব্যথাপূর্ণ মনঃকথা গুলি তাঁহার প্রাণবল্লভের চরণে একে একে নিবেদন করিতেছেন। গৌর-বল্লভার গৌরচরণে আত্মনিবেদনের পদগুলি পরম শিক্ষাপ্রদ। কৃপা-নিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! তাহা ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আত্মশোধন করুন। গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজি তাঁহার আসন হইতে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে শ্রীপট-মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া করযোড়ে করুণ ক্রন্দনের প্রাণঘাতী-স্বরে তাঁহার প্রাণনাথকে কহিতেছেন,—

"প্রাণবল্লভ হে!
—"শেষ কথা ব'লে দিবে—নারবে র'ব।
তব কথা ভিন্ন আন্ কথা না ক'ব॥
তব নাম করি সার, বহিব এ দেহভার,
তোমার ঘরেতে বাস (তব) মহিমা গাব।
তোমার চরণ সেবা, ভাগ্যে নাই নিশি দিবা,
তোমার চরণ ধূলি—খুঁটিয়া খাব॥
যত দিন রবে দেহ, দেখিতে না পাবে কেহ,
তব-নাম-সুধা-পানে—মত্ত হ'ব।
তব কথা ভিন্ন আন্ কথা না ক'ব॥"—

—"তোমার এ ঘরবাড়ী—বৈকুণ্ঠ মম।
নদে ধাম বৃন্দাবন—বরজ সম॥
তোমার জনম-ভূমি, অপার প্রেমের খনি,
নব নব সুষমায়—কান্তি কম।

তোমার শয়ন ঘর, এ মোর ঠাকুর ঘর,
তোমার পাদুকা নিতি—করিব নম।
ধরি কাঙ্গালিনী সাজ, তোমার দাসীর কাজ,
করিবে এ দাসী তব—হর হে তম।
তোমার এ বাড়ী ঘর—বৈকুণ্ঠ মম॥"—

—"আমার সাধন ধন,—চরণ তব।
না পান যেখানে যাহা বিরিঞ্চি ভব॥
এ ধন হারায়ে আমি, হ'য়েছি গো পাগলিনী,
দুখজ্বালা সহিতেছি—নিত্য নব।
শেষ কথা বলে রাখি, অন্তিমে দিও না ফাঁকি,
দাসীরে চরণে রেখ—হে ভব ধব॥
ত্রিজগত নাথ তুমি, অবলা রমণী আমি,
মরম যাতনা আর, কত বা কব।
আমার সাধন ধন—চরণ তব॥"—
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

এই ভাবে আত্মনিবেদন করিতে করিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার সর্ব্বাঙ্গ যেন বিরহ-জ্বরে থর থর কাঁপিতে লাগিল—মস্তক ঘূর্ণিত বোধ হইল,—তিনি ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার শরীর অবশ—অঙ্গগ্রন্থি সকল শিথিল—মস্তক ঘূর্ণায়মান—তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার আসন হইতে ভূমিতলে ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন—কতক্ষণ যে তিনি এই অবস্থায় ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার সখিদ্বয়ও জানেন না—কারণ তাঁহারা ভজন-মন্দিরের বহির্দ্বারে প্রিয়াজির ইচ্ছায় আজ কাল-নিদ্রাগতা।

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির একটু তন্দ্রা আসিয়াছে,—এই সময়ে স্বপ্ন দেখিতেছেন—নীলাচলে তাঁহার প্রাণবল্লভের গম্ভীরা-লীলারঙ্গ। তিনি দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণবল্লভ গভীর অন্ধকারে নীলাচলের পথে পথে প্রেমোন্মত্ত-ভাবে নিঃসঙ্গ হইয়া গ্রহগ্রস্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছেন এবং "হা কৃষ্ণ! হা দয়িত! হা করুণৈক সিন্ধু!" এই বলিতে বলিতে সমুদ্র তীরাভিমুখে অতি দ্রুতবেগে ছুটিতে-ছেন—বিস্তীর্ণ তরঙ্গাকুল সমুদ্রতটে এই ঘোরান্ধকারে তিনি একাকী দাঁড়াইয়া কৃষ্ণবিরহব্যঞ্জক কত কি প্রলাপ করিতেছেন—তিনি যেন সমুদ্রে পতনোন্মুখ।

গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি ভূমি-শয্যা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আলুথালু বেশে উঠিয়া ভজনমন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পাগলিনীর মত মহা শঙ্কা ও উদ্বেগের সহিত বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার সখিদ্বয় নিদ্রিতা—কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে আঙ্গিনায় নামিতে গিয়া সিঁড়িতে সর্ব্বপ্রথমে এক ভীষণ ওছট খাইলেন—কোন গতিকে তাহা সামলাইয়া অন্ধকারে আঙ্গিনায় ছুটাছুটি করিয়া বহির্দ্বার অন্বেষণ করিতে গিয়া তুলসীকানন সম্মুখস্থ উচ্চ তুলসী-মঞ্চোপরি তাঁহার মস্তক ঠুকিয়া গিয়া পুনরায় ভীষণ আঘাত পাইলেন—সেখানেই তিনি প্রথমে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—পরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূমিশয্যায় শায়িত হইলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তখন তিনি পুনরায় উঠিয়া বহির্দ্বারের অনুসন্ধানে দ্রুতবেগে অন্ধকারে ছুটিলেন—কোন গতিকে বহির্দ্বারের সন্ধান পাইয়া অর্গল খুলিয়া বহিরাঙ্গনে গিয়া দ্বিতীয় দ্বারের অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করিতে গিয়া মস্তকে পুনর্ব্বার আঘাত পাইলেন—এমন সময় তাঁহার প্রাণবল্লভের পুরাতন ভৃত্য অতিবৃদ্ধ ঈশান একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ হস্তে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—"ঠাকুরাণি! এত রাত্রিতে এই অন্ধকারে আপনি এখানে?"—

গৌর-প্রেমোন্মাদ-দশা-গ্রস্থা গৌর-বল্লভার কর্ণে এ কথা গেল না—ঈশানকে তিনি যেন দেখিয়াও দেখিতে পাইতে-ছেন না—উন্মাদিনী প্রিয়াজির তাৎকালিক মনের ভাব,—তিনি নীলাচলের সমুদ্রতীরে তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রাণ-রক্ষার জন্য ছুটিতেছেন—সুর-তরঙ্গিণীকে সমুদ্র-ভ্রম—বিস্তীর্ণ গঙ্গাতটকে সমুদ্রতট-ভ্রম—এইরূপ-ভাবে ভাবিত হইয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি নিজ ভজন-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিতেছেন। তিনি ঈশানকে দেখিয়া একবার মাত্র বহিরাঙ্গণে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—পুনরায় যেমন তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিবেন—এমন সময় সেখানে তিনি আছাড় খাইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন;—তখন ঈশান উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি উঠাইয়া দাসদাসী সকলকে জাগরিত করাইলেন। কালনিদ্রাগতা

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা এবং বহির্বাটিস্থ অতি বৃদ্ধ দামোদর পণ্ডিত এবং বংশীবদন ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সখিদ্বয়ের চক্ষে তখনও বিষম ঘুমঘোর—তাঁহারা দেখিলেন ভজন-মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত—ক্ষীণ ঘৃত-প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে—মন্দিরে প্রিয়াজি নাই—বহিরাঙ্গণে কোলাহল। তাঁহারা দৌড়িয়া গিয়া বহিরাঙ্গণে যাহা দেখিলেন—তাহাতে তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল—দেখিলেন বিরহিণী প্রিয়সখি বহিরাঙ্গণে ধরাসনে শায়িতা—সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃতা ঈশান তাঁহার নিজ গাত্রবস্ত্র দিয়া গৌর-প্রেমোন্মাদিনী গৌর-বল্লভার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়াছেন—তিন জনে তখন প্রিয়াজির নিকটে দাঁড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। সখিদ্বয়ের তখন আর কাঁদিবার সময় নাই—তাঁহাদিগকে দেখিয়াই দামোদর পণ্ডিত ও বংশীবদন ঠাকুর সেখান হইতে কিছুদূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন—ঈশান নিকটেই রহিলেন।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা গিয়া তখন তাঁহাদের দশম-দশাগ্রস্তা প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। মুখের আবরণ-বস্ত্র খুলিয়া দেখিলেন—সর্ব্বাঙ্গ শীতল এবং বিবর্ণ। প্রাচীন ভক্তকবি মনোহর দাস তাঁহার অনুরাগ-বল্লী শ্রীগ্রন্থে প্রিয়াজির প্রেমোন্মাদদশার যে চিত্রটী অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল যথা,—

—"পুলকে পূর্ণিত নেত্রে বহে জলধার।
মধ্যে মধ্যে স্বরভঙ্গ কম্প অনিবার॥
কখন প্রস্বেদ পড়ে বস্ত্র সব ভিজে।
নানাবর্ণ হয় তনু স্তম্ভিত সহজে॥
প্রলয় হইলে মন্ত্র জিহ্বা নাহি নড়ে।
চীৎকার করিয়া তখনি ভূমে পড়ে॥
নাসিকাতে শ্বাস নাই উদর স্পন্দন।
দেখি দাসীগণ বেড়ি করয়ে ক্রন্দন॥
কতক্ষণ থাকি পুন চেতন পাইয়া।
গড়াগড়ি যায় ধুলি ধুসর হইয়া॥
সম্বিত পাইয়া উঠে হাসে খলখলি।
কি বোলে কি করে কিছু বুঝিতে না পারি॥
তবে পুন নাম লয় ঘর ঘর স্বরে।
দেখি তার মনব্যথা পরাণ বিদরে॥"—

প্রিয়াজির এই অবস্থা দেখিয়া সখিদ্বয় এবং দাসীগণ হাহাকার করিয়া সেখানে ভীষণ আর্ত্তনাদের ধ্বনি উঠাইলেন। ওদিকে ঈশান দামোদর পণ্ডিত এবং বংশীবদন ঠাকুর মহা শঙ্কিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ভাবে দূরে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ঈশান তাঁহার কুটীরের অগ্নিভাণ্ড জ্বালাইয়া দিলেন—সখিগণ প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গ অগ্নিতাপে উষ্ণ করিতে লাগিলেন। গৌর-বল্লভার চৈতন্যোৎপাদনের বহুবিধ চেষ্টা হইল—কিন্তু কিছুতেই কোন ফল না পাইয়া সকলেই সবিশেষ চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলেন। সখি কাঞ্চনা নাসিকায় তুলা দিয়া দেখিলেন—অতি ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ পরে পরে বিরহিণী প্রিয়াজির মৃদুশ্বাস বহিতেছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—কেবলমাত্র করুণ ক্রন্দনের অস্ফুটধ্বনি মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতেছে। সখিদ্বয় আজ বড়ই বিপদে পড়িয়া শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের চরণে স্মরণ লইলেন—তখন সকলে মিলিয়া সেই গভীর নিশীথে বহিরাঙ্গণে বসিয়া গৌর-কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠাইলেন।

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-নাথ নদীয়া-বিহারি॥"

দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর বংশীবদন ও ঈশান দূর হইতে এই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। নদীয়ার নিশীথগগন ভেদ করিয়া এই কীর্ত্তনধ্বনি চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিল—প্রতিবেশী গৌরভক্তবৃন্দ অনেকেই জাগিয়া উঠিলেন—তাঁহারাও গৌরশূন্য গৌর-গৃহের দিকে ছুটিয়া আসিলেন।

গৌরকীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি ধরাশায়িনী ধুল্যবলুণ্ঠিতা গৌর-বল্লভার কর্ণে প্রবেশমাত্র তাঁহার প্রেমমূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল —তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন—সখিদ্বয় তাঁহার মুখের উপর মুখ দিয়া তখনও অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত আছেন—তখনও মৃদু মৃদু কীর্ত্তন চলিতেছে—অনেকেই এই নৈশ-কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। বিরহিণী প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞানের উদ্রেক হইলে তাঁহার নিমিলিত আঁখিদ্বয় যখন কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইল—তিনি দেখিলেন তাঁহার মর্ম্মীসখিদ্বয় তাঁহার মুখের উপর মুখ দিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহাদের অবিশ্রান্ত উষ্ণ নয়ন-ধারায় তাঁহার নিজ বক্ষ ও বসন সিক্ত হইয়া ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিতেছে—বহিরঙ্গ লোক সমাগম দেখিয়া তিনি বিশেষ লজ্জিত বোধ করিতেছেন,—তিনি সকলই বুঝিতে পারিতেছেন—পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইতেছে—

তাঁহার স্বপ্ন-কথাও মনে হইতেছে—তিনি যে ভজন-মন্দিরে নাই,—একথা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। গাত্র-বেদনা অনুভব করিতেছেন, কিন্তু কোন কথা কহিবার শক্তি নাই।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা লজ্জায় অধোবদনে মনদুঃখে কেবল ঝুরিতেছেন—গৌর-বিরহিণী প্রিয়সখির বিষাদ-মাখা মলিন বদনখানির প্রতি যেন তাঁহারা চাহিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন—চোকোচোখি হইলেই লজ্জায় মুখ ফিরাইতেছেন। প্রিয়াজির কপাল ফাটিয়াছে—অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে—তাহা তাঁহারা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন—তাঁহার মনোবেদনাও বুঝিতে পারিতেছেন—এসকল দেখিয়া ও বুঝিয়া সখিদ্বয়ের হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কারণ তাঁহাদেরই অসাবধানতায় আজ এই যে এই অঘটন-ঘটন ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল—আর যাহা লোক-জানাজানি হইল,—তাহার জন্য তাঁহারাই সম্পূর্ণ দায়ী। সখিদ্বয় নদীয়ার-মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার-রক্ষিকা—তাঁহারা যদি নিদ্রাগতা না হইতেন—এই স্বপ্নাতীত সাংঘাতিক কাণ্ড সংঘটিত হইত না। এক্ষণে কি করিয়া এ অবস্থায় তাঁহাদের প্রিয় সখিকে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে লইয়া যাইবেন—ইহাই তাঁহাদের বিষম চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

অন্তর্য্যামিনী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রিয় সখিদ্বয়ের মর্ম্ম-বেদনা সকলই বুঝিতেছেন। তিনি ধীরে ধীরে আত্ম-সম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন,—সখিদ্বয়ের স্কন্ধে দুই বাহুর ভর দিয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি অতি কষ্টে দাঁড়াইলেন। সুচতুরা সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে বহিরাঙ্গণের সকল লোক সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সেখানে রহিলেন কেবল সখিদ্বয়, দাসীগণও ঈশান। তখন সখিদ্বয় তাঁহাদের গৌর প্রেমোন্মাদ-দশা-গ্রস্তা প্রিয়সখিকে অতি সাবধানে ক্রোড়ে উঠাইয়া ভজন-মন্দিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু গৌর-বল্লভা তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শনচ্ছলে ঘাড় নাড়িলেন। তখন তাঁহাকে দুই পার্শ্বে দুই সখিতে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন,—ঈশান প্রদীপ হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—সকল কাজই ইঙ্গিতে চলিতেছে। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে গৌরবল্লভা তাঁহার নিজ ভজন-মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন—তিনি যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—অতিশয় ক্লান্তভাবে সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন—এই অবস্থায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া তিনি অতি মৃদুস্বরে সখি কাঞ্চনার মুখের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন—"সখি! গৌরকথা কহ—গৌরনাম কীর্ত্তন কর"—তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। সখি কাঞ্চনা মধুকণ্ঠে আজ নবভাবে ভাবিত হইয়া নবভাবে গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ।
গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া॥"

অমিতা এই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন—সমস্বরে এই কীর্ত্তনটী কিয়ৎক্ষণ চলিল। বিরহিণী প্রিয়াজি সখি-ক্রোড়ে শায়িত হইয়াই এই কীর্ত্তন শুনিতে ছিলেন—তাঁহার মনে হইতেছিল—"শেষ কথাটি কি সত্য?"—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ" সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু—"গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া" এই কথাটি লইয়াই প্রিয়াজির মনের সন্দেহ,—যদি তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রাণই হইতেন—কি করিয়া তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া আছেন? এইরূপ একটী ভাব-তরঙ্গ বিরহিণী প্রিয়াজির মনে মনে খেলিতেছে। প্রিয়াজির নাম তাঁহার প্রাণ-বল্লভের নামের সহিত যোগ করিয়া যখন কেহ গৌর-কীর্ত্তন করেন, তাহা শুনিয়া গৌর-বল্লভার প্রাণে অবশ্যই সুখ হয়—এই জন্য তিনি নিষেধ করেন না। আজ তাঁহার প্রিয় সখি কাঞ্চনাকে অতি মৃদু মধুরভাষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমরা যে কীর্ত্তন করিলে—"গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া"—ইহা কি সত্য কথা সখি।" এই কথা বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির নয়নদ্বয় জলভরাক্রান্ত হইয়া আসিল—তিনি দুই বাহু দ্বারা সখি কাঞ্চনার গলদেশ পরম প্রেমাবেগে জড়াইয়া ধরিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া তখন সখিদ্বয় প্রিয়াজিকে লইয়া বড় বিপদেই পড়িলেন—কত প্রকার সান্ত্বনা এবং আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সন্ন্যাসোচিত ব্যবহারে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই—তিনি সন্ন্যাসীই হউন, আর ভগবানই হউন—তিনি যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-বল্লভ এ কথা ধ্রুবসত্য—তিনি বহুবল্লভ হইলেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ নামে তাঁহার

বিশেষ প্রীতি—এই নামে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। গৌর-বল্লভা প্রিয়-সখির কথা গুলি স্থিরভাবে শুনিয়া গেলেন বটে,—আর কোন কথা কহিলেন না।

কতক্ষণ পরে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি প্রকৃতিস্থ হইলেন—তিনি পিপাসা-কাতর ছিলেন—একটু চরণামৃত চাহিলেন—সখি অমিতা তাহাতে সুবাসিত গঙ্গা জল মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিলেন—পিপাসা-কাতর শুষ্ককণ্ঠ গৌর-বল্লভা চরণামৃত-জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলেন।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহাদের প্রিয়সখির বদনের প্রতি চাহিতে আজ লজ্জাবোধ করিতেছেন—অন্ধকার রাত্রির এই ভীষণ কাণ্ড-কারখানাটি তাঁহাদিগের অসাবধানতার দোষেই ঘটিয়াছে—এই জন্যই লজ্জা, ক্ষোভ ও অনুতাপে সখিদ্বয় মরমে মরিয়া আছেন, অন্তর্যামিনী গৌর-বল্লভা তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া পরম প্রেমভরে দুটী হস্তে দুইজনের হস্ত ধারণ করিয়া প্রেম-বিগলিত মধুর মৃদুবচনে কহিলেন,—"প্রাণসখি কাঞ্চনে! প্রিয়সখি অমিতে! তোমরা না থাকিলে আমার অদৃষ্টে আজ যে কি হইত জানি না,—কেমন করিয়া আমি বহির্বাটির প্রাঙ্গনে গিয়া পড়িলাম?—কি লজ্জার কথা! কত লোক সেখানে দেখিলাম—কি ঘৃণার কথা! মনে করিয়াছিলাম এ কালামুখ আর কাহাকেও দেখাইব না—আমার দুর্দ্দৈব—আমার অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে?—আমি যে কুলবধূ—কি করিয়া তাহা ভুলিয়া গেলাম?" এই কথা বলিতে বলিতে প্রিয়াজির নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত অশ্রুধারা পতিত হইল।

সখিদ্বয় লজ্জায়, ক্ষোভে এবং মনঃদুখে অধোবদনে রহিলেন। তাঁহাদেরই অসাবধানতায় আজ রাত্রিতে যে কাণ্ড হইল, তাহা নদীয়াবাসী গৌরভক্তগণ শুনিয়া কি বলিবেন? তাঁহারা এই কথাই ভাবিতেছেন—আর মরমে মরিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞা প্রিয়াজি সকলি জানেন—সকলি বুঝেন। সখিদ্বয়ের মর্ম্মব্যথা বুঝিয়া তিনি তাঁহার ক্ষীণহস্ত দু'টি সখিদ্বয়ের বদনে দিয়া তাঁহাদের মুখ তুলিয়া দেখিলেন তাঁহাদের মনোবেদনার সীমা নাই—মর্ম্মব্যথার সূচীভেদ্য যন্ত্রণায় তাঁহারা যেন বাণবিদ্ধ হরিণীবৎ ছটফট করিতেছেন। প্রিয়াজি নিজ মলিন বসনাঞ্চলে সখিদ্বয়ের নয়নাশ্রুধারা মুছাইয়া দিলেন এবং সাদরে সহাস্যবদনে পরম প্রেমভরে স্নেহবাক্যে কহিলেন—"সখি! প্রিয়সখি! তোমরা যদি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর—তবে আমার আর বাঁচিয়া সুখ কি? তোমাদের মুখে হাসি দেখিলে আমার প্রাণবল্লভের শ্রীমুখের হাসি মনে পড়ে—তোমাদের মুখের গৌরকথা আমার জীবন-সঞ্জীবনী-সুধা—বলিতে কি তোমরাই এখন আমার জীবন-সম্বল। আমার সঙ্গে এ সময়ে তোমাদের এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার কেন? মরার উপর খাঁড়ার আঘাত মারিয়া তোমাদের লাভ কি বল দেখি সখি?"—

এই কয়টী মর্ম্মান্তিক কথা তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা—সখির মুখে শুনিয়া সখিদ্বয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাঁহারা আপন আপন মলিন বসনাঞ্চলে স্ব স্ব চক্ষুজল বারম্বার মুছিতে লাগিলেন—তবুও তাঁহাদের চক্ষুর জল ফুরায় না। তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাদের ব্রীড়াকুঞ্চিতবদন এবং জলভারাক্রান্ত রক্তিমাভ নয়ন উঠাইয়া তাঁহাদের প্রিয়সখির বিষণ্ণ ও কাতর বদনচন্দ্রের প্রতি একবার করুণ-নয়নে চাহিলেন—কিন্তু লজ্জায় এবং আত্মগ্লানিপূর্ণ ঘৃণায় তখনি আবার বদন অবনত করিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। পরম ধৈর্য্যবতী এবং বুদ্ধিমতী গৌর-বল্লভা তখন তাঁহার প্রিয়তমা সখিদ্বয়কে পরম প্রেমাবেগে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! আমি অভাগিনীই তোমাদের এই মনোদুঃখের মূল কারণ! আমার জীবনে ধিক! আমার প্রাণবল্লভের আদেশ "জীব মাত্রে উদ্বেগ না দিবে"—কিন্তু আমি আজ এ কি করিলাম? আমার মরণই মঙ্গল!" এই বলিয়া প্রিয়াজি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন সখিদ্বয়ের লজ্জা, ক্ষোভ ও অনুতাপের বাঁধ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল—আর তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। সখি কাঞ্চনা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"প্রাণসখি! বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমাকে কি আর আমাদের বলিবার আছে? কালামুখী আমরা,—তোমার জীবনরক্ষার ভার যাহাদের হাতে দিয়াছেন স্বয়ং নবদ্বীপচন্দ্র—তাঁহারই ইচ্ছায় কাল-নিদ্রার প্রভাবে তাহারা আজ তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটিজনিত মহাপাতকে লিপ্ত—তাহাদের নরকেও স্থান হইবে না—তাহাদেরই মরণ মঙ্গল।"—এই কথা বলিয়া তাঁহারা দুইজনেই প্রিয় সখির ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া পুনরায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে

লাগিলেন—এখন তিন জনে মিলিয়া করুণ ক্রন্দনের রোল উঠাইলেন।

—"কোথা গেলে তুমি নাথ! নদীয়া ছাড়ি।
শূন্য হেরি তোমা বিনা এ ঘর বাড়ী"—

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে অমাবস্যার সেই গভীর ঘোরা রজনীতে যে করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল—তাহার প্রতিধ্বনি গিয়া নীলাচলের গম্ভীরা মন্দির আলোড়িত করিল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তখন কি করিলেন তাহা বারম্বার বলিবার প্রয়োজন নাই—সুচতুর পাঠক পাঠিকাবৃন্দ মনে মনে বুঝিয়া লউন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছায় তিন জনেই কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন,—তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কাহারও মুখে কিন্তু আর কোন কথা নাই—জপতপ সকলি বন্ধ—বিরহিণী প্রিয়াজি আজ বড়ই অসম্বর—কিছুতেই যেন তাঁহার মন আর শান্ত হইতেছে না—তিনি পাগলিনীর মত উদাস নয়নে এদিক ওদিক কেবল চাহিতেছেন—কখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি—কখন অধোদৃষ্টি—নয়নের উদ্‌ভ্রান্ত তারা দুটী যেন তাঁহার উদাসীনতার জলন্ত মূর্ত্ত দৃষ্টান্ত। তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া যেন কাহাকেও বলিতেছেন,—

—"তুমি যদি আমি হও বুঝিবে তবে।
আমার দুখের কথা শুনিবে যবে॥"—
বিলাপ-গীতি।

এই কথা বলিয়াই প্রেমোন্মাদ-দশাগ্রস্তা গৌরবল্লভা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া যেন কাহাকেও কত না আদর সোহাগভরে ডাকিতেছেন—

"আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসিয়া বৈস,
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।"—

গৌর-বল্লভার বদনে এখন যেন কিঞ্চিৎ হাসির রেখা দেখা দিয়াছে—ক্ষীণ অঙ্গে যেন কতই বল হইয়াছে,—প্রেমানন্দে যেন তিনি আজ টলমল করিতেছেন। সখিদ্বয় হঠাৎ প্রিয়াজির এই ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া মহা বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা সুচতুরা, এবং রসজ্ঞা সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির নিকটে গিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন—কিন্তু তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না,—আজ এত বল হইয়াছে জীর্ণশীর্ণা বিরহিণী প্রিয়াজির মনে, হৃদয়ে এবং অঙ্গে। মহা তপস্বিনী—মহা ধৈর্য্য-শালিনী মহা ধীরা ও গম্ভীরা সনাতন-নন্দিনী আজ উন্মাদিনীর ন্যায় যেন অসীম বলশালিনী এবং অধৈর্য্যভাবে যথেচ্ছাচারিণীর মত কার্য্য করিতেছেন। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা শিরে করাঘাত করিতে করিতে অমিতাকে কহিলেন—"সখি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমাদের ভাঙ্গাকপাল আজ প্রকৃতই আবার বুঝি ভাঙ্গিল। প্রিয়সখি উন্মাদিনী হইয়াছেন—এস দু'জনে মিলিয়া ধরিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাই—বহির্বাটিতে ঈশান দাদাকে সংবাদ দাও—আমরা স্ত্রীলোক কি করিয়া এই উন্মাদিনীকে রক্ষা করিব? গৌর-প্রেমোন্মাদিনী গৌরবল্লভার পরিধান বসন অসম্বর—দুই হস্তে নিজের মাথার কেশদাম ছিঁড়িতেছেন আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

—"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥"—

এই বলিতে বলিতে ভজনমন্দিরদ্বারের ভিতে অনবরত মাথা কুটিতেছেন,—দুইজন সখি মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না—এত বল হইয়াছে তাঁহার দুর্ব্বল অঙ্গে আজ। তখন সখিদ্বয় ও দাসীগণে মিলিয়া কোন গতিকে ধরপাকড় করিয়া উন্মাদিনী প্রিয়াজিকে আনিয়া বারান্দার মুক্ত বাতাসে বসাইলেন—তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান হরাইয়াছেন—সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। আজ নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজিকে লইয়া সখিদ্বয় বড়ই বিপদে পড়িলেন—বিপ্রলম্ভ-রসের দশদশার মধ্যে উন্মাদটি অষ্টমদশা,—তারপরেই অনুক্ষণ মোহ,—শেষে দশমদশা,—মৃত্যু। দশটি দশার সকল লক্ষণগুলিই বিরহিণী প্রিয়াজির শরীরে মনে ও হৃদয়ে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে—এক্ষণে তিনি উন্মাদ এবং অনুক্ষণ মোহ,—এই শেষ দুইটি দশার সন্ধিস্থলে আছেন—কখন কি হয় বলিতে পারা যায় না। সখি কাঞ্চনা বড়ই বুদ্ধিমতী এবং সুচতুরা—অমিতাকে দিয়া অন্তঃপুরের প্রিয়াজির সকল দাসীগণকেই ডাকাইলেন—ঈশানকে সংবাদ দিলেন। গৌরপ্রেমোন্মাদিনী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে শায়িতা—তাঁহার এখন মূর্চ্ছিতাবস্থা—সখিদ্বয় ও দাসীগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত আছেন,—মধ্যে মধ্যে গৌরবল্লভা প্রলাপ বকিতেছেন,—

—"পিয়ার পিরীতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবু তো দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু॥"—
চণ্ডীদাস।

আর যেন মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেছেন—কখন বা অঙ্গ মোড়া দিয়া কাতরকণ্ঠে করুণ ক্রন্দনের সুরে বলিতেছেন—

—"আর না করিব পাপ পিরীতের লেহা।
পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা॥"—
চণ্ডীদাস।

গৌর-প্রেমোন্মাদিনী গৌর-বল্লভা এখন পর্য্যন্ত সখি-ক্রোড়ে শায়িতা—সখিদ্বয় পুনরায় গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিয়াছেন—দাসীগণও তাহাতে যোগ দিয়াছেন,—

যথারাগ।

"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ! এস এস হে!
শচীমাতার দুলালিয়া! এস এস হে!
একবার এস এস হে!
(তোমার) বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণে মরে একবার দেখে যাও হে!
বিষ্ণুপ্রিয়ার মন-চোরা,
নদেবাসীর প্রাণ-গোরা,
একবার এস এস হে।" গৌরগীতিকা

উন্মাদিনী প্রিয়াজি এখনও প্রেমোন্মাদ-দশাগ্রস্থা। তিনি অতি ক্ষীণকাতর ক্রন্দনের সুরে গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিতেছেন—

—"বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥"
চণ্ডীদাস।

এই বলিয়াই উন্মাদিনী গৌর বল্লভা অকস্মাৎ উঠিয়া বসিয়া উদাস নয়নে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন—কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সখিদ্বয়ের কাহারও প্রতি লক্ষ্য নাই—তাঁহারা আশে পাশে প্রিয়াজিকে ধরিয়া আছেন—গৌর-পাগলিনী প্রিয়াজি ভজনমন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গঙ্গা দর্শন করিতে করিতে আজ উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিলেন—

রাগ—কামোদ।

(ঐ)—"দেখহ নাগর নদীয়ায়!
গজবর-গতি জিনি, গমন সুমাধুরী
অপরূপ গোরা দ্বিজ রায়। ধ্রু॥
চরণ কমল যেন, ভকত ভ্রমর গণ,
পরিমলে চৌদিকে ধায়।
মধুমদে মাতল, সব মহী-মণ্ডল,
দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি পায়।
রসভরে গর গর অধর মনোহর,
ঈষৎ হাসিয়া ঘন চায়॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিত বর নয়নে কোণের শর
কত কোটি কাম মুরছায়॥
আভরণ বহুমণি বসন অরুণ জিনি
বাজল নূপুর রাঙ্গা পায়।
জগভরি জয়ধ্বনি জয় গোরা দ্বিজমণি
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়॥"—
পদকল্পতরু।

গৌর-বল্লভার শ্রীমুখে এই প্রথম গীত শুনিলেন সখিদ্বয়—তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু কখন কেহ তাঁহার শ্রীমুখের গান শুনে নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও সুচতুরা সখি কাঞ্চনা বুঝিলেন তাঁহার অনুমান ঠিকই হইয়াছে—তাঁহাদের ভাঙ্গা কপাল আবার ভাঙ্গিয়াছে,—তাঁহাদের প্রিয় সখির ঘোর উন্মাদ দশা। বহির্বাটীতে সংবাদ গিয়াছে—পণ্ডিত দামোদর ও ঠাকুর বংশীবদন সশঙ্কিত ভাবে বহিরাঙ্গনে বসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে প্রিয়াজির সংবাদের অপেক্ষা করিতেছেন,—অতিবৃদ্ধ ঈশান অন্তঃপুর প্রাঙ্গণেই আকাট-হইয়া দণ্ডায়মান আছেন—সখিদ্বয়ের পুনরাদেশ অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু গৌর-প্রেমোন্মাদিনী প্রিয়াজির কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপও নাই। কুলবধুর কুলের বাঁধ আজ ভাঙ্গিয়াছে। সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ভজন মন্দিরের মধ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না। গৌর-বল্লভা আজ গৌর-প্রেমোন্মাদদশাগ্রস্তা হইয়া গৌরদর্শন করিতেছেন। গৌরময় জগত দেখিতেছেন—সখি কাঞ্চনার চরণ ধরিয়া নিজ মলিন অঞ্চল পাতিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—প্রাণবল্লভ! প্রাণকান্ত! এসেছ—এস আমার কাছে বস—কতদিন তোমাকে দেখি নাই—প্রাণ ভরিয়া—নয়ন ভরিয়া তোমাকে আমি একবার দেখি—

"আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসিয়া বৈস,
নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি"—

সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির হস্ত দু'খানি সজোরে ধরিয়াছেন,—চরণ ছাড়াইয়া পলাইতেও পারেন না—প্রিয়াজিকে ঐ অবস্থায় তিনি দেখিতেও পারেন না—তিনি মহা বিপদে পড়িয়া সখি অমিতার ও দাসীগণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজিকে যেন সেখান হইতে ছিনিয়া লইয়া ভজন-মন্দির দ্বারে বসাইলেন। উন্মাদিনী প্রিয়াজির শরীর তখন বড়ই অবসন্ন—কাতর ক্রন্দনের বিকট করুণ স্বরে তিনি কহিলেন- "তোমরা কে? আমাকে আমার প্রাণবল্লভের চরণ-সেবায় বঞ্চিত করিলে?—এই বলিয়াই সেইখানেই ভূমিতলে পুনরায় শুইয়া পড়িলেন—পুনরায় সেই প্রেম মূর্চ্ছা—পুনরায় সেই দশমীদশার লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। উন্মাদিনী প্রিয়াজিকে লইয়া সখিদ্বয়ের আজি মহা বিপদ—কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দামোদরপণ্ডিত এবং বংশীবদন ঠাকুরকে অন্তঃপুরে ডাকাইলেন—তাঁহারা ভিতরে আসিলে সকল কথা খুলিয়া সখি কাঞ্চনা তাঁহাদিগকে বলিলেন—সকলেই মহা শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতিবৃদ্ধ ঈশান তখন করযোড়ে নিবেদন করিলেন—"কাঞ্চনা দিদি! তোমার উপর ঠাকুরাণীর সকল ভার দিয়াছেন প্রভু আমার—তুমিই দিদি! প্রিয়াজির এই উৎকট ব্যাধির প্রকৃত ঔষধ জান—দিদি গো! বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া ঠাকুরাণীর কানের কাছে নিরন্তর গৌরনাম করুন—এ ব্যাধির ঐ একমাত্র ঔষধ—আমরাও সকলে মিলিয়া গৌরকীর্ত্তন করি"। পণ্ডিত দামোদর ও ঠাকুর বংশীবদন ঈশানের কথা শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন—সখি কাঞ্চনাকে তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন—কাঞ্চনে! এ রোগের বৈদ্যরাজ একমাত্র তুমি,—গৌর-বল্লভার প্রাণরক্ষার ভার তোমাদের হাতে প্রভুই দিয়াছেন—আমরা তোমাদের মুখ চাহিয়াই এই গৌরশূন্য গৌরগৃহে কোনরূপে বাঁচিয়া আছি মাত্র,—যাও কাঞ্চনে! ঈশানের পরামর্শ-মত কাজ কর।"—এই বলিয়া তাঁহারা সখি কাঞ্চনাকে বিদায় দিয়া ঈশানকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া বহিরাঙ্গনে আসিয়া বসিয়া গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ঈশান পণ্ডিত—দাদার ব্যবহারে মহা লজ্জিত ও শঙ্কিত হইয়া তাঁহার চরণে দীঘল হইয়া পড়িয়া কত কি দৈন্যবচনে বলিলেন। পণ্ডিত দামোদর তাঁহাকে পরম স্নেহভরে হাতে ধরিয়া উঠাইয়া বহির্বাটীতে লইয়া গিয়া তিন জনে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"—

এদিকে সখিদ্বয় এবং দাসীগণ বিরহিণী গৌর-বল্লভার ভজন-মন্দির-দ্বারে বসিয়া কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠাইলেন,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী॥"—

সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে বিরহিণী প্রিয়াজি শায়িতা—তাঁহার এখন ভাবসমাধি-অবস্থা—তিনি পূর্ব্বে স্বয়ং যে গানটি গাহিয়াছেন,—তাহার অপূর্ব্ব ভাবটীতে তাঁহার মন-প্রাণ লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে—তিনি অপরূপ গৌর-রূপ-ধ্যান-মগ্না। বাহিরের কীর্ত্তন তাঁহার কাণের ভিতর পোঁছিতেছে না—কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করিতেছে,—তাঁহার হৃদয়ে অপরূপ গৌর-রূপের অপূর্ব্ব মাধুরীরাশি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে—গৌর-রূপের প্রবল আকর্ষণে সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল হইয়াছে—গৌর-রূপাকর্ষণে অন্যান্য ভাব সকল স্তম্ভিত হইয়াছে। কাজেই অন্য ভাবের গৌর-কীর্ত্তন বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণে এখন প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সখি কাঞ্চনা ভজন-বিজ্ঞা এবং সর্ব্বজ্ঞা,—তাঁহার প্রিয়সখির মনোভাব সকলি তিনি জানেন। গৌর-বিরহোন্মাদ দশা-গ্রস্তা বিরহিণী প্রিয়াজির তাৎকালিক মনোভাবোচিত গানের ধুয়া ধরিলেন তাঁহার কলকণ্ঠে তখন সখি কাঞ্চনা। যথা,—

রাগ ধানসী।

"—গৌর-রূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে, সে রস-ধাধস-সুখে,
অনিমিষে দেখহ নয়নে॥ ধ্রু॥
পরিয়া পাটের জোড়, বান্ধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন, লেপিয়াছে চন্দন,
দেখিয়া জিউ করিলুঁ নিছনি॥
মৃগ-মদ-চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম
মাজিয়া কে দিল ভালে ফোঁটা।
আছুক আনের কাজ, মদন মুগধ ভেল,
রহল যুবতী কুলের খোঁটা॥

প্রাণ সরবস দেহ, অবশ সকল সেহ,
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গ-রূপ কেশর লেপিয়া গো—
ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া,
কামনা সায়রে মরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে তবে সে,
দুখের সাগরে তরি॥ পদকল্পতরু।

কলকণ্ঠা সখি কাঞ্চনার গানটি গৌর-রূপ-মুগ্ধা বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদয়ে তখন প্রবেশ করিল—গৌর-রূপ-ধ্যান মগ্না গৌরবল্লভার তখন মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মিলিত করিলেন—সখি কাঞ্চনার মুখের দিকে একটীবার মাত্র চাহিলেন—এ চাহনির মর্ম্ম—"এতক্ষণে তুমি আমার মনোভাব বুঝিয়াছ—অপরূপ গৌর-রূপের কথা আরও কিছু বল"—দ্বিতীয়বার তিনি তাঁহার সজল নয়নকোনে যখন কাতরভাবে সখি কাঞ্চনার প্রতি প্রেমাকুললোচনে চাহিলেন—মর্ম্মী সখি সে চাহনিরও মর্ম্ম বুঝিলেন—যথা—

"সখি! গোরা-রূপের নাহিক তুলনা"—

সখি কাঞ্চনা তখন নিজ রসনাঞ্চলে প্রিয়সখির চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে দিতে কলকণ্ঠে পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ কল্যাণী।

শারদ কোটি চাঁদ, সঞে সুন্দর,
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতী পিরীতি-রসে মাতল,
ভাগল গুরুজন-গৌরব-লাজ॥
সজনি! কিয়ে আজু পেখলু গোরা।
মনমথ-মথন, অরুণ নয়নাঞ্চল,
চাহনি ভৈ গেলু ভোরা॥ ধ্রু॥
মৃদু মৃদু মধুর মধুরস্মিত শোভিত,
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী,
ভেল অনুরাগিণী পরশ-আমোদ॥
কেশরী-শাবক জিনি, ভঙ্গুর মাজা খানি,
তাহে বিলাসে মনমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ, নিধুবন গতমন,
মুগধে-মাতল কত করু অভিলাষ॥
কুটিল সুকেশ, কুসুমময় লোঠন,
জোটন রসবতী রস পরিণাম।
গোবিন্দদাস কহে, ঐছে বর রসিয়া,
নাগর হেরি কহয়ে গুণ-গান॥"— পদকল্পতরু

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি গান শুনিয়া যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন তিনি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন—তাঁহার সতৃষ্ণ নয়নদ্বয় সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি—পিপাসিত কর্ণ যেন গোরা-রূপ-পিপাসায় এখনও কাতর,—কিন্তু মুখে তিনি কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। মর্ম্মীসখি সুচতুরা কাঞ্চনা প্রিয়সখির মন বুঝিয়া আর একটী গৌর-রূপাভিসারের পদের ধুয়া ধরিলেন॥

রাগ তুড়ী।

—"বিহরে আজি রসিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্জকেশর পুঞ্জ উজোর, কনকরুচির কাঁতিয়া।
কোটি কামরূপ-ধাম, ভুবন মোহন লাবণি ঠাম,
হেরত জগত যুবতী উমতি ধৈরজ-ধরম ত্যজিয়া॥
অসীম পুণিম শরদচন্দ, কিরণ মদনবদন ছন্দ,
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম, মঞ্জুমদন পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি, বমই কতহি অমিয়া রাশি,
সুধই সিধু নিকর ঝিকর বচন ঐছন ভাঁতিয়া॥
মধুর বরজ বিপিন কুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতি পুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিয়া॥
আবেশে অবশ অলসবন্দ, চলত চলত খলত মন্দ,
পড়িত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
করুণ নয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুঠত ভ্রমত, ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবহুঁ প্রেম অমিয়া পীব,
তঁহি বলরাম বঞ্চিত একলে, সাধুঠামে অপরাধিয়া॥"*

বিরহিণী প্রিয়াজি গানটী শুনিয়া পরমানন্দ পাইলেন—তিনি এখন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন—এখন আর তাঁহার পূর্ব্ব ভাব নাই—এই ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সখি-দ্বয়ের ধড়ে প্রাণ আসিল—মৃত প্রাণে যেন জীবন সঞ্চার

* এই প্রাচীন পদটি জীবাধম লেখকের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম ঠাকুর বিরচিত।

হইল। সখি কাঞ্চনা তখন দাসী দ্বারা বহির্বাটীতে এই শুভ সংবাদ দিলেন,—আর তাঁহার ঈশানদাদাকে বিশেষ করিয়া বলিতে বলিলেন, ভয়ের আর এখন কোন কারণ নাই—ইহা শুনিয়া পণ্ডিত দামোদর এবং বংশীবদন ঠাকুরও নিশ্চিন্ত হইলেন। ঈশানের ধড়ে যেন প্রাণ আসিল।

এখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—উন্মাদিনী গৌর-বল্লভার মনেই নাই এখন দিবা কি রাত্রি—তিনি অতি ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে সখি কাঞ্চনার হস্ত ধারণ করিয়া উঠিয়া প্রেমাবেশে বলিতেছেন—"সখি! প্রিয়সখি! সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, এখনও ঠাকুরভোগের ব্যবস্থা কর নাই"—সখি কাঞ্চনা বুঝিলেন গৌর-বল্লভা এখনও প্রকৃতিস্থা হন নাই। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! গত রাত্রির কথা কি তোমার কিছু মনে নাই?" গৌর-পাগলিনী প্রিয়াজি উদাসিনীর মত এদিক ওদিক চতুর্দ্দিক উদাস নয়নে চাহিলেন—একবার গঙ্গার দিকে—একবার আকাশের দিকে—একবার আঙ্গিনার দিকে তাঁহার উদাস ও বিষাদমিশ্রিত নয়নদ্বয় যেন ঘুরিতেছে—কিছুই উত্তর দিতে পারিতেছেন না। তখন সখি কাঞ্চনা একে একে সকল কথা প্রিয়াজিকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—প্রিয়াজি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রিয়সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি কেবলমাত্র উদাস নয়নে চাহিয়াই আছেন—কোন কথাই তাঁহার স্মরণ নাই—এত যে আছাড় খাইয়াছেন—মাথা কুটিয়াছেন—অঙ্গে আঘাত পাইয়াছেন—দেহে কোন বেদনারও অনুভব নাই—দেহানুসন্ধান তাঁহার একেবারেই নাই। মহাজনকবি প্রিয়াজি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

—"অলৌকিক শক্তি তাঁর অলৌকিক রীতি।"—

বিরহিণী গৌরবল্লভা তখন বুঝিতে পারিলেন এখন শেষ রাত্রি—তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহার রাত্রি-ভজনে বড় ব্যাঘাত হইয়াছে—তাঁহার সংখ্যানাম পূর্ণ হয় নাই—তখন তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইল—জপের মালার অনুসন্ধান করিতেছেন—কোথায় ফেলিয়াছেন মনে নাই,—সখি কাঞ্চনাকে মৃদুমধুর উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সখি! আমার মালা কোথায়?" সখি অমিতার প্রতি কাঞ্চনা চাহিলেন—অমিতা ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রিয়াজির মালা খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তাঁহার মালার অনুসন্ধান হইতে লাগিল—প্রিয়াজির বদন অপ্রসন্ন—তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্বধন জপ-মালা হারাইয়াছেন—কিছু মনে নাই কোথায় ফেলিয়াছেন। ঠাকুর মন্দিরের প্রদীপ লইয়া তখন অমিতা প্রাঙ্গনের এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রিয়াজির জপের মালা ঝোলা তুলসী-মঞ্চের নিকট পাইলেন—আনিয়া তাঁহাকে দিলেন যখন, তখন প্রিয়াজির প্রাণে যেন জীবন আসিল—তাঁহার বদন প্রসন্ন বোধ হইল—তিনি বারম্বার তাঁহার মালা-ঝোলা মস্তকে স্পর্শ করিয়া সংখ্যানাম জপে বসিলেন। তখনও কিছু রাত্রি আছে। প্রিয়াজির মনে বড় দুঃখ,—রাত্রিটা বৃথায় গেল—সংখ্যানাম পূর্ণ হইল না—কি করিবেন দুর্দ্দৈব সকল দিকেই—তিনি আজ যে কি প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়াছেন তাহা তিনি কিছুই জানেন না—সখিদ্বয়ও এখনও কোন কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলেন নাই—তাঁহারা নিজেদের অসাবধানতার জন্যই মহা সন্তপ্ত,—তাহাদের মনোবেদনার অন্ত নাই।

জপমগ্না প্রিয়াজি কিছুক্ষণ পরেই কি জানি কেন মালা-জপ বন্ধ করিয়া সখি কাঞ্চনাকে তাঁহার রাত্রির অভিসার-কাহিনী সকল বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। সখি কাঞ্চনার এখন তাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু প্রিয়াজির আদেশ বলবান,—তাহা তিনি অমান্য করিতে পারেন না। তিনি তখন একে একে আদ্যোপান্ত সকল কথাই প্রিয়াজিকে কহিলেন। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভারও মনে তখন তাঁহার রাত্রিকালের লীলারঙ্গ-স্মৃতি সকল একে একে স্মৃতিপথে উদয় হইল। সেই তাঁহার স্বপ্ন কথা—আঙ্গিনায় তুলসী-মঞ্চের নিকট আছাড় খাওয়া—পুনরায় স্বপ্ন কথা—তাঁহার প্রাণবল্লভের গম্ভীরা-লীলারঙ্গের কথা—বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে তাঁহার গমন ও পতনের কথা—লোকসংঘট্টের কথা—তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে আনয়নের কথা—তাঁহা উন্মাদ-দশার কথা—একে একে সকলই স্মৃতিপথে উদিত হইয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজিকে পুনরায় যেন উন্মাদিনী করিয়া তুলিল। প্রিয়সখির মুখেও তাঁহার এই সকল প্রাণঘাতী এবং হৃৎপিণ্ড ছিন্নকারী আত্ম-কাহিনী শ্রবণ করিয়া মহা শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া লজ্জায়, ক্ষোভে এবং আত্ম-গ্লানিজনিত মহা দুঃখে প্রিয়াজি বদন অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ও তাঁহাদের নয়নধারায় ভূমিতল সিক্ত করিতেছেন—তখনও অন্ধকার আছে,—অন্ধকারে কেহ কাহারও বদন ও নয়নজল

দেখিতে পাইতেছেন না—কিন্তু তিনজনের নয়নজল যখন ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া তাঁহাদের পরিধান বস্ত্র সিক্ত করিল—দারুণ শীতে তাঁহারা যখন কাঁপিতে লাগিলেন—তখন প্রিয়াজি বুঝিলেন ব্যাপারটি কিরূপ গুরুতর—এবং ইহা কিরূপ বহিরঙ্গভাব ধারণ করিয়াছে।

গৌর-বল্লভা তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি তাঁহার ক্ষীণ বাহুদ্বয় দ্বারা সখিদ্বয়ের গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাদের মস্তক দুইটী নিজ বদনের নিকট আনয়ন করিয়া পরম প্রেমভরে আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন—আর অস্ফুট ক্রন্দনের সুরে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার কোন কথা বলিবার শক্তি নাই—সখিদ্বয়কে সান্ত্বনা দিবারও কোন ক্ষমতাই নাই। তখনকার এই গৌর-বিরহিণীত্রয়ের অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের গৌর-বিরহ-কাতর জীর্ণ প্রাচীরগুলি পর্য্যন্ত যেন অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরাজিতে একটা কথা আছে—Dead walls have ears—অর্থাৎ দেওয়ালের কান আছে—এখানেও ঠিক তাই হইল।

মেঘাবৃত গগন হইতে তখনও দুই এক ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছে—প্রাচীরের ভিতের যে স্থানে গৌর-বিরহিণীত্রয় বসিয়া গৌর-বিরহ রসাস্বাদন করিতেছেন—সেই স্থানে যেন জড়বস্তু প্রাচীরেরও নয়ন-জল গড়াইয়া আসিয়া তাঁহাদিগের নয়ন-সলিলের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রবলবেগে অঙ্গিনার দিকে ছুটিয়াছে। আজ এই বৃষ্টি-সলিলেরও বড় সৌভাগ্য—নদীয়া-গগনের মেঘাবলীরও ভাগ্য সুপ্রসন্ন—দেবরাজ ইন্দ্রেরও মহা সৌভাগ্য—বরুণ দেবের ভাগ্যের ত কথাই নাই—গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার গৌরপ্রেম পরিপূরিত প্রেমাশ্রুজলের সহিত তাঁহার গৌর-পাগলিনী সখিদ্বয়ের অপূর্ব্ব গৌরানুরাগপরিপূরিত নয়ন-সলিল-ধারাসম্পাতে যে অভিনব ত্রিবেণীসঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার বিন্দুমাত্র জলস্পর্শে দেব দেহ সুপবিত্র করিবার আশায় শিব-বিরিঞ্চি এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ শিবলোক, ব্রহ্মলোক এবং স্বর্গ ছাড়িয়া সেই ঘোরা-রজনীশেষে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পঞ্চবদন দেবাদিদেব মহাদেব—চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি ব্রহ্মা—সহস্রচক্ষু দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাদিগের কান্তা এবং পরিকরগণ সহ গৌরশূন্য গৌরগৃহের প্রাঙ্গণে আজ দীঘল হইয়া পড়িয়া সখিদ্বয় সহ গোলোকের মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী গৌর-বল্লভার শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছেন। শচী-আঙ্গিনা তাঁহাদিগের অপরিচিত স্থান নহে, নদীয়া তাঁহাদের পক্ষে গোলোক,—সে কথা ধ্রুব সত্য—তাঁহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যথা,—

—"শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,—
প্রণাম হইয়া পড়িলা।
গহন অন্ধকারে দেখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য-খেলা।
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারও হাতে ছাতি
কেহ চামর ঢুলায়।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ কেহ নাচে গায়।"—

ইহা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব-কালের কথা। নদীয়ার এই আনন্দোৎসবে দেবদেবীগণ অলক্ষ্যে যোগ দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন,—এখন গৌর-বিরহোৎসবের সময়ও তাঁহারা শুভাগমন করিয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীচরণ-দর্শন-সৌভাগ্য লাভে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার গৌর-বিরহ-সাগর-তরঙ্গোত্থ পরম পূতপ্রেমোচ্ছ্বাসিত নয়নবারিপুঞ্জ তেত্রিশকোটি গৌর-দাসদাসী দেবদেবীগণের এবং তাঁহাদের পরিকরবৃন্দের নয়ন-জল ধারা-সম্পাতে নদীয়ার গৌর-শূন্য গৌর-গৃহ দ্বারে এক অভিনব মহা-সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে—এই মহাসমুদ্রের নাম—**"গৌর-বিরহ পয়োধি"**। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-স্থানের গৌর-ভক্তি-সুর-তরঙ্গিনী-সকল এই গৌর-বিরহ-পয়োধির পরম পবিত্র সলিল-তরঙ্গে মিলিবার জন্য আকুল প্রাণে পরম প্রেমাবেগে- নানা ভাব-তরঙ্গ-ভূষণে ভূষিত হইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ যোগপীঠের সাগর-সঙ্গমাভি-মুখে উচ্চ ও উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গী করিয়া ছুটিতেছে—তাহাদের উদ্দণ্ড নৃত্য-ভঙ্গী দেখিয়া দেবদেবীগণ প্রেমানন্দে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন। এই আনন্দমিশ্রিত বিষাদ-নৃত্য-বিলাসে বিষামৃত মিশ্রণ আছে,—তপ্তইক্ষু চর্ব্বণের ন্যায় সুখানুভূতি আছে। শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলাস্থলী নিত্য-ধাম নদীয়ার নিত্য পুষ্পোদ্যান-রাস-লীলা দর্শনের প্রবল

আশা ও আকাঙ্ক্ষা বুকে বাঁধিয়া গৌরভক্তি-তরঙ্গিনীর উচ্ছসিত প্রবল প্রেমতরঙ্গে ভাসমান পরম সৌভাগ্যবান গৌরভক্তসকল পরম প্রেমানন্দরসে মগ্ন আছেন। ইঁহাদিগের ভাব-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়া জীবাধম লেখক বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছে—কোন অজানা দেশে যে সে আসিয়াছে—তাহা জানিবার উপায় নাই—জানিবার প্রয়োজনও নাই।

এখনও গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়কে প্রেমালিঙ্গনে দৃঢ়াবদ্ধ করিয়া নীরব ক্রন্দনের অস্ফুট-করুণ-স্বর-লহরীতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হাহাকারের ধ্বনি উঠাইতেছেন। তাঁহার কায়ব্যূহ সখিদ্বয়ও তদবস্থাপন্না এবং তদ্ভাবে বিভাবিতা হইয়া কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান-করুণ-বিলাপ-ধ্বনি দ্বারা কলিহত জগজ্জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইতেছেন। পাষাণ-হৃদয় জীবাধম নরপশু লেখকের ক্ষীণ লেখনী এখানে স্তম্ভিত, কম্পিত, এবং স্তব্ধ।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গৌর-বল্লভা প্রকৃতিস্থা হইলেন—সখিদ্বয় তাঁহাকে কোন গতিকে ধরাধরি করিয়া ভজন মন্দিরে লইয়া গেলেন। তিনি আজ আর আসনে বসিতে পারিলেন না—তাঁহার মন বড়ই অস্থির—সমস্ত রাত্রি তাঁহার ভজন হয় নাই—তাঁহার পাষাণের রেখার ন্যায় নিয়ম সকল ভঙ্গ হইয়াছে,—এই দুঃখে ও অনুতাপে তাঁহার হৃদয় আজ বড়ই ব্যথিত। আর এক দুঃখ, তাঁহার গুপ্ত ভজন-কথা সকলই ব্যক্ত হইল—লোক কানাকানি জানাজানি হইল। এই দুঃখই তাঁহাকে অতিশয় কাতর করিয়াছে।

ভজন-মন্দিরে বসিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের চিত্রপট-খানি এবং কাষ্ঠ পাদুকা দুখানির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন,—আর মনে মনে ভাবিতেছেন—যাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনপ্রাপ্তির জন্য এত কাণ্ড—এত লোকজানা-জানি গণ্ডগোল—তিনি ত এখানেই বিরাজ করিতেছেন—আমার হৃদি-নদীয়ায় নিরন্তর বিহার করিতেছেন—আমি ত তাঁহার জন্য আমার হৃদি-বৃন্দাবনে নিভৃত কুঞ্জ বাঁধিয়াছি—সেই আমার হৃদি-নদীয়া-বিহারী নদীয়া-নাগরী—সেই আমার হৃদিবৃন্দাবন-বিলাসী গৌর-গোবিন্দ ত এখানে পুষ্পোদ্যানে নিত্য রাস-লীলা করিতেছেন—তবে কেন আমার এ ভ্রম। নিত্যধামে নিত্য-মিলন, সেখানে বিরহ নাই—নিরবচ্ছিন্ন মিলন-সুখ সম্ভোগ—তবে আমার এ বিরহ-জ্বালা কেন? বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনের জন্য ধরাধামে লীলাময়ের এই লীলারঙ্গ—তাহাতে আমার কি? তিনি তাঁহার বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করুন—আমি দর্শক মাত্র—আমি দেখি,—তাঁহার এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ নয়ন ভরিয়া দেখি,—আমি কেন এই মনঃকল্পিত বিরহজ্বালা ভোগ করিয়া প্রাণে মরি। শাস্ত্রে বলে নরলীলা সর্ব্বোত্তম—নরলীলা শ্রীগৌরভগবান এখন মহাবৈরাগ্যবান সন্ন্যাসী-ঠাকুর—নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরে তিনি যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিতেছেন, তাহারই পুনরভিনয় হইতেছে নদীয়ায়;—তবে সন্ন্যাসীঠাকুর স্ব শরীরে কেন এখানে আসেন না—এ করুণ-লীলার সূত্রধর তিনি—লীলাশক্তির শক্তিমান তিনি—লীলা-সূত্র তাঁহার হাতে—তাঁহার লীলা তিনি এখানে স্বয়ং অভিনয় করুন,—এইরূপ একটী মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাভিমানযুক্ত মধুর নব ভাব প্রিয়াজির মনে আজ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভই উদিত করাইয়াছেন,—তাঁহারই প্রেরণায় প্রিয়াজির মানস-সরোবরে এই ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য মিশ্রিত সম্পূর্ণ অভিনব একটি ভাবতরঙ্গ আজ খেলিতেছে। এভাব তাঁহার হৃদয়ের গুপ্তভাব—গৌরবল্লভার ইহাও এক অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ। এভাবের প্রকাশ বাহিরে নাই।

বিরহিণী প্রিয়াজি ভজন-মন্দিরে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন—সখিদ্বয় মন্দিরদ্বারে বসিয়া নিজ নিজ ইষ্টচিন্তা করিতেছেন—এমন সময় প্রভাতী সঙ্কীর্ত্তনের দল গৌর-শূন্য গৌর-গৃহদ্বারে আসিয়া কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিল,—

রাগ গৌরী।

—"জয় নন্দ নন্দন, গোপী-জন-বল্লভ রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচী-নন্দন, নদীয়া-পুরন্দর, সুর-মুনিমোহন-ধাম॥
জয় নিজ কান্তা-কান্তি-কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী-ভাববিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী লোচনমঙ্গল, জয় নদীয়া বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম-সুদাম-সুবলার্জ্জুন, প্রেমবর্দ্ধন নবঘনরূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌরঅনুপ॥
জয় অতিবল-বলরাম-প্রিয়ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জনগণ-ভয়-ভঞ্জন, গোবিন্দদাস আশ অনুবন্ধ॥"

পদকল্পতরু।

আর একদল আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিল,—

—"ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচী-সুত হৈল সেই,
বলরাম হৈল নিতাই।

দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে, রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ-বিষয়-বিষে, সতত মজিয়া রহিনু
মুখে দিলে জলন্ত অঙ্গার ॥
হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে, জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে। ধ্রু ॥
এমন দয়াল দাতা, আর না পাইব কোথা,
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দ দাসিয়া কয়, অনলে পড়িনু নয়,
সহজেই আঘাত পাইনু"—
পদকল্পতরু।

সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে গৌর-বল্লভা ভজন-মন্দির হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন—সুরতরঙ্গিণী গঙ্গাদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের উদ্দেশে আর একটী দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া গৌর-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পিপাসিত কর্ণ শীতল করিলেন। সখিদ্বয় সঙ্গেই আছেন। গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনাকে নিভৃতে ডাকিয়া মৃদু মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি কাঞ্চনে! ইহারা কি বলিতেছেন ভাল বুঝিতে পারিলাম না,—

—"জয় জয় নন্দ-নন্দন, গোপী-জন-বল্লভ,
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচী-নন্দন, নদীয়া পুরন্দর,
সুর মুনি-মোহন ধাম॥"

আর—

—"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই
বলরাম হৈল নিতাই।"—

ইহা কি সত্য? আমার মনে যে বড় ধাঁধা লাগিল সখি!—

সুচতুরা সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"প্রাণ সখি! ইহাই তোমার প্রাণবল্লভের ভক্তগণের অনুভব"—প্রিয়াজি কথাটি শুনিয়া নীরব রহিলেন—যেন কি ভাবিতেছেন—তাঁহার স্বরূপানুভূতি একেবারে নাই—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ কখন কখন ঐশ্বর্য্যভাবে "মুঞি সেই—মুঞি সেই" বলিয়া ভক্তগণের নিকট স্ব-স্বরূপের কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন—কিন্তু প্রিয়াজি কখন কাহার নিকট স্ব-স্বরূপের পরিচয় দেন নাই—ইহাই তাঁহার অত্যুত্তম নব-লীলার বৈশিষ্ট,—ইহাই তাঁহার বিশিষ্ট-আবির্ভাবের বৈশিষ্ট।

গৌরবল্লভা আর কোন কথা না কহিয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে সখিদ্বয় সহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদ-পদ্ম-হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা কহে হরিদাস ॥
শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গকুঞ্জ—১লা কার্ত্তিক ৩৭
রাত্রি দ্বিপ্রহর, শ্রীএকাদশী তিথি।

(৮)

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রেমোন্মাদ-দশা গ্রস্থা গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কাষ্ঠ-পাষাণ গলান এবং হৃৎপিণ্ড ছিন্নকারী তাণ্ডব লীলারঙ্গ দেখিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় বড়ই ভীতা ও শঙ্কিতা এবং চিন্তান্বিতা হইয়াছেন। তাঁহাদের মনের আত্যন্তিক ক্ষোভ এবং প্রাণের মর্ম্মান্তিক দুঃখ রাখিবার স্থান নাই,—তাহা বলিবার কথা নহে,—লজ্জায়, ক্ষোভে এবং মনোদুঃখে তাঁহারা মরমে মরিয়া আছেন। এক্ষণে কি উপায়ে এরূপ ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে তাঁহাদের প্রাণ কোটি সর্ব্বস্বধন প্রিয়সখিকে রক্ষা করা যাইতে পারে—তাহার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের প্রবল চিন্তায় সখি কাঞ্চনা এবং অমিতা সবিশেষ চিন্তিতা এবং দুঃখান্বিতা।

পূর্ব্বরাত্রির উৎকট গৌর-বিরহ-যন্ত্রণায় এবং শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ নিদারুণ কষ্টে বিরহিণী প্রিয়াজি সবিশেষ ক্লিষ্টা এবং পরিশ্রান্তা হইয়া প্রাতঃকালে অন্দরমহলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে গিয়াছেন। সখি কাঞ্চনা ভাবিতেছেন আজ তাঁহারা দুই সখিতে মিলিয়া প্রিয়াজির একটু বিশেষ ভাবে অন্তরঙ্গসেবা করিবেন—কিন্তু প্রিয়াজি কাহারও নিকট কোনরূপ সেবা লইবার পাত্রী নহেন—এবং তাঁহার সেবা-গ্রহণ-প্রবৃত্তিও নাই—তাঁহারা একথা না জানেন এমন নহে। একথা জানিয়া শুনিয়াও মর্ম্মী সখিদ্বয় পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের প্রিয়সখির নিকটে গিয়া বলিলেন—"সখি! প্রিয়-সখি! আজ একটু বিশ্রাম কর না কেন? সমস্ত রাত্রির

যন্ত্রণা ও উদ্বেগে তোমার ভগ্ন শরীর আজ আরও যে ভগ্ন বোধ হইতেছে,—শরীর সুস্থ না থাকিলে ভজন কি করিয়া করিবে সখি?" বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার একটী কথার উত্তর দিলেন। তিনি অতি গম্ভীরভাবে কহিলেন —"সখি! দুর্লভ মনুষ্যজীবন কেবলমাত্র শরীর রক্ষার জন্য শ্রীভগবান সৃজন করেন নাই,—ভগবদ্ভজনের জন্যই দুর্লভ মানব জন্মের সৃষ্টি। যিনি শরীরের সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনিই তাহার রক্ষাকর্ত্তা"—সখি কাঞ্চনা আর অধিক কথা বলিতে সাহস করিলেন না।

গৌরবল্লভা যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিজ ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সখিদ্বয় বিষণ্ণমনে ভজন-মন্দিরের কিছু দূরে একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া কিছু গুপ্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সখিদ্বয়ের বিষণ্ণ বদন—নয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা। সখি কাঞ্চনা তাঁহার বাম হস্ত কপোলদেশে বিন্যস্ত করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন—তিনি যেন আজ মহা চিন্তামগ্না—অমিতা তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়া বিনতবদনে নখাগ্রভাগ দিয়া ধীরে ধীরে ভূমিতলের মৃত্তিকা খুঁড়িতেছেন;—উভয়েই মহা চিন্তা-জ্বরে জর্জ্জরিতা। সখি কাঞ্চনা তখন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরম স্নেহভরে অমিতার অঙ্গস্পর্শ করিয়া মৃদু-ক্রন্দনের করুণস্বরে কহিলেন—"সখি অমিতে! এখন এরূপভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নহে। অদ্যই রাত্রিতে যাহাতে প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে আমরা কেহ একটু স্থান পাই, তাহার প্রস্তাব প্রিয়াজির নিকট করিতেই হইবে। দিবসে তিনি যেরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে-ছেন করুন—কিন্তু রাত্রিকালে তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় রুদ্ধদ্বার গৃহে একাকী রাখা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য—আমার প্রাণ থাকিতে তাহা তাঁহাকে করিতে দিব না! একথা আমি অদ্যই প্রিয়াজিকে সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া সুস্পষ্ট কথায় বলিব। এসম্বন্ধে তোমার মত কি?"—

সখি অমিতা অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি—তাঁহার ভাবটি বড় সুন্দর, বড়ই মধুর। তিনি অধিক কথা কহেন না—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবাঙ্গ-ভক্তির প্রথমাঙ্গ যে শ্রবণ, তাহাই তিনি যাজন করেন—তিনি ভক্তিকথার সর্ব্বোত্তম শ্রোতা। অতি ধীরে ধীরে মৃদুমধুর বচনে তিনি কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমার এই প্রস্তাবটি অতি সাধু,—আমি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। শুনিয়াছি জগদানন্দ পণ্ডিতের মুখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার মর্ম্মী-ভক্তগণের অনুরোধে শঙ্কর পণ্ডিতকে রাত্রিতে তাঁহার নিকটে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ হইলেও ভক্তবশী—ভক্তবাৎসল্যে ভক্তবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করিয়াছেন! কিন্তু তাঁহার প্রাণবল্লভা আমাদের প্রিয় সখিটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা। সখি কাঞ্চনে! তাহা ত তোমার অবিদিত নাই—প্রতিদিন প্রতি দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে, তাঁহার স্বতন্ত্রতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বহুবিধ পরিচয়ই আমরা পাইয়াছি ও পাইতেছি—তবে তুমি তাঁহার প্রধানা অন্তরঙ্গা সখি—তোমার কথা স্বতন্ত্র। তুমি বিবেচনা করিয়া স্থিরভাবে কার্য্য করিবে। আমি ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—অদ্য হইতে রাত্রিতে আর বসিয়া ভজন করিব না—এখন হইতেই গবাক্ষ দ্বারে দাঁড়াইয়া মালাজপ করিয়া রাত্রি কাটাইব—তাহা হইলে বোধ হয় কালনিদ্রার হাত হইতে রক্ষা কথঞ্চিৎ পাইব"—

সখি কাঞ্চনা অমিতার অতি সারবান ও মূল্যবান কথা-গুলি অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন—তাঁহার প্রতি কথার গুরুত্ব অনুভব করিয়া সবিশেষ চিন্তান্বিতা হইলেন—তবে নির্ভরসা হইলেন না। সখি অমিতার হস্ত ধারণ করিয়া সজল নয়নে পরম স্নেহভরে তিনি কহিলেন—"সখি অমিতে! তোমার সংকল্প অতি সাধু,—তোমার সুচিন্তিত এইরূপ ভবিষ্যৎ ভজন পদ্ধতি তোমারই উপযুক্ত। সখি! তোমার দেহানুসন্ধান নাই—গৌর-বিরহিণীর অন্তরঙ্গ-সেবায় তুমিই সিদ্ধহস্তা। আমার সে সৌভাগ্য নাই—কালনিদ্রাকে জয় করা আমার সাধ্যাতীত। আমার কর্ত্তব্য আমি করিব—আমার প্রস্তাব যদি তোমার স্বতন্ত্রা প্রিয়সখি স্বীকার না করেন—আমি গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব—একথা স্পষ্টই আমি তাঁহাকে বলিব,—এ সংকল্প আমার দৃঢ়, তাহা তুমি দেখিবে।"—

কতক্ষণ এইভাবের কথোপকথন হইলে পর দুই সখিতে মিলিয়া ভজন-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া বসিলেন—তাঁহাদের হস্তে জপমালা—বিষণ্ণ বদন। তখন বেলা চারি দণ্ড মাত্র।

গৌর-বল্লভা ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে জপমগ্না—চক্ষুর্দ্বয় নিমিলিত—নয়নকোণে শ্রাবণের ধারা বহিতেছে—সম্মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভের চিত্রপটমূর্ত্তি এবং তাঁহার চন্দন-চর্চ্চিত

কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়,—দূর হইতে সখিদ্বয় দেখিতেছেন এই চিত্র-পট শ্রীমূর্ত্তির কমল-নয়নদ্বয় দিয়াও যেন টপ টপ করিয়া মুক্তা-ফলের ন্যায় বারিবিন্দু পতিত হইতেছে—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কমল-নয়নের এক বিন্দু প্রেমবারিকণা ত্রিজগত প্রেমে ভাসাইতে পারে—এক বিন্দুতে শত শত প্রেমসিন্ধুর সৃষ্টি হইতে পারে।

মহাজন কবি তাই লিখিয়াছেন—

——"এক বিন্দু জগত ভাসায়"—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রেমে ডুবাইবার এমন মহা কৌশলজাল এই এক বিন্দু বারিকণাতে সুবিস্তৃত আছে – যে তাহা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাসীর প্রাণ বিশ্বপ্রেমে পরিপ্লাবিত হয়—তাহারা এই অপূর্ব্ব প্রেমজালে বিজড়িত হইয়া অখিল রসামৃতসিন্ধু গৌর-কৃষ্ণ-প্রেমরস-তরঙ্গের অনুসন্ধান পাইয়া কৃতকৃতার্থ হয়। শ্রীশ্রীগৌরভগবানের এই প্রেমাশ্রুবিন্দুর সহিত তাঁহার স্বরূপশক্তি বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কমল-নয়নের বারিধারা-সম্পাতের সংমিশ্রণে যে অভিনব এক প্রেমমহাসিন্ধুর উদ্ভব হইয়াছে নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে—তাহার কণাবিন্দুর লোভে শিব-বিরিঞ্চি এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ অলক্ষ্যে গৌরশূন্য গৌর-গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কর-যোড়ে দণ্ডায়মান আছেন,—অসংখ্য দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি এবং সিদ্ধ মুনি ও ঋষিগণ সেখানে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া মাথা কুটিতেছেন—কিন্তু পরম গম্ভীরা—পরম স্বতন্ত্রা—পরম তপস্বিনী ও পরম বৈরাগ্যবতী মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী গৌরবল্লভার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই—সুতরাং তাঁহার ভজন-বিঘ্নের কোন সম্ভাবনাও নাই।

সখিদ্বয় ভজন-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীহস্ত অঙ্কিত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপূর্ব্ব চিত্রপট-শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণ-শোভা দর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের নয়ন শ্রীমূর্ত্তির চরণে যেন লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রেমানন্দে সখি কাঞ্চনা কলকণ্ঠে মধুবর্ষিণী-সুরে গান ধরিলেন,—

যথা রাগ।

—"কি মধু আছে যে ওই চরণেতে,
কি যে মাদকতা চরণ-রেণুতে,
কে বা ব'লে দিবে অধম পতিতে,
কার কাছে আমি যাই

মন-ভৃঙ্গ মোর হ'য়েছে পাগল,
দরশনে ওই চরণ-যুগল,
মন-প্রাণ হারী রাতা-শতদল,
তুলনা যাহার নাই॥

ওই—চরণের শোভা কত মধুরিমা,
চরণ-রেণুর কত বা মহিমা,
অষ্টসিদ্ধি যত অনিমা লঘিমা,
(ঐ) পদে গড়াগড়ি যায়।

মানসে উদিলে ও চরণ-শোভা,
হৃদয়ে ফুটয়ে গোলোকের বিভা,
কোটি ভাগ্যবলে চরণের সেবা,
ভাগ্যবান জীবে পায়॥

জগত জুড়িয়া চরণ-প্রসাদ,
দুখী তাপীদের ঘুচায় বিষাদ,
ওই—চরণ স্মরিলে যায় অবসাদ,
দূর হয় জ্বালা তাপ।

যে করে গৌর-চরণ আশ্রয়,
তার নাহি হয় শমনের ভয়,
গৌর আমার বড় দয়াময়,
দূরান্ সব্ব পাপ॥

ওই—চরণের রেণু পাইবার তরে,
শিব বিরিঞ্চি আরাধনা করে,
সবে মিলে বল "জয় গৌর হরে",
জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।

ওই—চরণের তলে নির্জনে বসিয়া,
কাঁদিয়া মরিবে দিবস রাতিয়া,
চরণের দাসী—এ হরিদাসিয়া,
(ঐ চরণে করে কোটি প্রণিপাত॥"—

গৌরগীতিকা।

গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়দেবী তাঁহার প্রাণবল্লভের নয়ন কোণে বারিবিন্দু দর্শন করিয়া সমাধিস্থা ছিলেন,—গৌর-গুণগান শ্রবণে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি তাঁহার আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে ভজন-মন্দির-দ্বারের বাহিরে আসিয়া সখিদ্বয়ের নিকটে বসিলেন—জপমালা তাঁহার শ্রীহস্তে—তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা একটি আধুনিক স্ত্রীকবি অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—যথা,—

—"মৃদু মৃদু কম্পিত অরুণ অধর।
অশ্রুজলে গণ্ডযুগ ভাসে নিরন্তর॥
মলিন কমল আঁখি তারা ডুবু ডুবু।
রুদ্ধকণ্ঠে হরিনাম জপিতেছেন তবু॥"—

বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরে ধীরে তাঁহার পদ্ম হস্তখানি দ্বারা সখি কাঞ্চনার অঙ্গস্পর্শ করিয়া মৃদুমধুর করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"প্রিয় সখি কাঞ্চনে! তোমার গান শুনিয়া আমার পিপাসিত কর্ণ শীতল হইল। সখি! তুমি যেন আমার মনের ভাবটি এবং প্রাণের কথাগুলি টানিয়া বাহির করিয়া গান কর। কি সুন্দর ভাবমাধুর্য্যে এই গানটি পরিপূর্ণ—কি সুন্দর প্রাণস্পর্শী আত্মনিবেদন—গান শুনিয়া তাপিত প্রাণ আমার যেন জুড়াইয়া গেল। সখি! তুমি আর একটী গান কর।"

সখিদ্বয় আজ তাঁহাদের প্রিয়সখির পাষাণের মত বিধি নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইলেন—প্রাতঃকালে এরূপভাবে তিনি তাঁহার নিয়মিত ভজন-ছাড়িয়া বাহিরে কখন আসেন না—আজ এ বিপরীত রীতি কেন? এই ভাবিয়া তাঁহারা হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন—তাঁহাদের মুখে আর কোন কথা নাই,—কেবলমাত্র তাঁহারা দুই জনেই প্রিয়াজির বদনচন্দ্রের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন পুনরায় বলিলেন—"সখি! তোমরা আমার গত রাত্রের স্ব সৌভাগ্য-প্রখ্যাপনের ধৃষ্টতা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া মনঃকষ্ট পাইয়াছ—সেজন্য আমি মরমে মরিয়া আছি। আমাকে কৃপা করিয়া তোমরা ক্ষমা কর এবং গৌর-গুণগান শুনাইয়া জনমের মত কিনিয়া লও। আমার প্রাণবল্লভের অভিন্নাত্মা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দন্তে তৃণ করিয়া সকলকে বলিতেন,—

—"আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি"

আমি মন্দভাগিনী,—বৈষ্ণবীয় দৈন্যের কিবা জানি—তবে তোমাদের কৃপায় যদি কিছু শিখিতে পারি—সে আমার পরম সৌভাগ্য।"—সখি কাঞ্চনা তখন মহা লজ্জিতা হইয়া শ্রীপটমূর্ত্তির শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া তাঁহার মধুকণ্ঠে পুনরায় গান ধরিলেন,—

যথা রাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ হে!

—"অপরাধী ব'লে দাও পদে দলে,
মার' শিরে লাথি,—পড়ে পড়ে কাঁদি,
(ঐ) চরণ তবুও ছাড়িব না।
(ঐ) চরণের তলে বসিয়া বিরলে,
ভিজাইব মাটি নয়নের জলে,
তাহাকেও কিছু বলিব না॥
মনে মনে ক'ব, কিসে যোগ্য হ'ব,
চরণের রেণু চরণে মিশাব,
ঐ পদ হ'তে দূ[illegible]।
দূর দূর করে তাড়াইয়া দিলে,
(ঐ) পদতল হ'তে যাইব না চলে
মারিলেও মোরা মরিব না।
প্রাণবল্লভ হে!
তোমার চরণে জীবনে মরণে,—
চির দাসী মোরা জেন তুমি মনে,
দূরে যেতে নাথ! বলিও না
ত্রিলোকের সুখ—মনে ভাবি দুখ,
জগত-সংসার মনে করি ছার,
(ঐ) চরণের ছায়া ছাড়িব না।
(ঐ) চরণের তল,—বড় সুশীতল,
সব জ্বালা যায়,—বার বার চায়,
(তুমি) পদরজ দিতে ভুলিও না।
হরিদাসীর জীবনের সার,
পদ পাখালন চরণ সেবন,
বঞ্চিত তাতে করিও না"—

গৌর-গীতিকা।

সখি কাঞ্চনার এই অপূর্ব্ব আত্মনিবেদনের পদগুলি শ্রবণ করিয়া গৌর-বল্লভার বদনচন্দ্র যেন প্রফুল্ল বোধ হইল—মুখে ঈষৎ হাসির রেখাও দেখা দিল—নয়ন কোনে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল,—তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া সখি কাঞ্চনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। প্রিয় সখির কন্ঠকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া চতুরা কাঞ্চনার আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে চতুর-চূড়ামণি গৌরবক্ষবিলাসিনী তাঁহার সখিদ্বয়ের মর্ম্মবেদনা ও প্রাণের ব্যথা বুঝিয়াই যেন তাঁহাদের প্রাণে শান্তিদান করিবার জন্য আজ এই অপূর্ব্ব প্রেম-ফাঁদ পাতিয়াছেন। গৌর-বল্লভা সখিদ্বয়কে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া আজ কতই না প্রীতি-কলারঙ্গে প্রেম-কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া সর্ব্বভাবে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি করিতেছেন। অনেক দিনের পর তাঁহাদের প্রিয়সখির এই অসম্ভব ভাব-বিপর্য্যয় দেখিয়া মর্ম্মী

সখিদ্বয়ের আজ মনে বড় আনন্দ—আজ তাঁহাদের সকল দুঃখ যেন দূর হইয়াছে।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা অতঃপর পরম স্নেহভরে সখি কাঞ্চনার হাতখানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া মৃদুমধুর বচনে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! তোমার হৃদয়খানি গৌর-প্রেমের উৎস—তোমার মুখে গৌর-গুণ-গান শ্রবণ করিলে আমি আত্মহারা হই—আমার বিধি-নিয়ম সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। সখি কাঞ্চনে! বল দেখি তোমার মত গৌর-পাগলিনী আমি কবে হব?"—এই কথা বলিতে বলিতে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির প্রেমাবেগে কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিল—তাঁহার কমল-নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া বক্ষ প্লাবিত করিল। সখি কাঞ্চনা পরম প্রেমভরে নিজ বসনাঞ্চলে প্রিয় সখির অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া মৃদু-মধুর বচনে কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার নিকটেই আমাদের গৌর-প্রেম শিক্ষা—তুমিই সখি! আমাদের গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী—তুমিইত আমার গৌর-নাম-গুণ-গানের ওস্তাদ।"—এই কথা কয়টী বলিয়াই সখি কাঞ্চনা তাঁহার মধুকণ্ঠে পুনরায় আর একটী গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথা রাগ।

—"হৃদে আমার গৌরপ্রেমের তুফান উঠেছে।
প্রেম-তরঙ্গ রঙ্গে ভঙ্গে নেচে চলেছে॥
(আমার) কুলের বাঁধ, সকল সাধ ভেসে গিয়েছে।
(প্রেম)—সাগর পানে, প্রাণের টানে পরাণ ছুটেছে॥
সরব অঙ্গ, চূর্ণ-ভঙ্গ, (বড়) আঘাত লেগেছে।
আঘাত চোটে ঝঞ্ঝাবাতে মরম ভেঙ্গেছে॥
প্রেমের তরি, গৌর-হরি, আমায় ডেকেছে।
ভয় কি হরির? (সে যে) চরণ-তরির নাগাল পেয়েছে॥"

গৌর-গীতিকা।

সখি অমিতা সঙ্গীত-কলায় তত পারদর্শী নহেন। তবুও প্রেমানন্দে তাঁহারও প্রাণে আজ গৌর-গুণ-গানের তুফান উঠিয়াছে। তিনি কোন কথা না বলিয়াই একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ পহিড়া।

—"নাচিতে না জানি তবু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে না জানি তবু গাই।
সুখে বা দুখেতে থাকি, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি,
নিরন্তর এই মতি চাই"— পদকল্পতরু।

এই পদাংশ গান করিয়াই সখি অমিতা আর কোন ভণিতা না করিয়াই পুনরায় আর একটী গানের সুর ধরিলেন,—

যথারাগ।

(আমি)—"লাগ পেয়েছি, গৌরধনের, পিছন ছাড়িনে।
পালিয়ে গেলে জড়িয়ে ধরি, তরাস জানিনে॥
যেথায় সে যায় (তার) পিছনে ছুটি, গহন কাননে।
সাগর মাঝে খুঁজিগো তারে, না ডরি তুফানে॥
অনলে ঝাঁপি, সে থাকে যদি, লুকায়ে সেখানে।
ছায়ার মত, ছুটিয়ে বেড়াই, বিশ্ব ভুবনে!
তাড়িয়ে দিলে, যাইনে ফিরে, ধরেছি চরণে।
(কোন) বাধা বিঘ্ন মানবো না গো, জীবনে মরণে॥
কৃপা করি, গৌরহরি! রাখ চরণে॥"

গৌর-গীতিকা।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণে আজ ভরপুর আনন্দ—তিনি সখি অমিতার প্রত্যেক কথার মর্ম্মভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্ব রাত্রির স্মৃতি সকল তাঁহার মনে উদয় হইতেছে—তিনি ভাবিতেছেন—সখি অমিতা যাহা বলিতেছে সেই চেষ্টাতেই ত তিনি গতকল্য রাত্রিতে ব্যাপৃত ছিলেন—গৌরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়ই ত এই—কিন্তু তাঁহার অপরাধজনিত দুর্দ্দৈববশতঃ তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্বধন প্রাণগৌরাঙ্গের লাগ পান নাই—এই তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। সখি অমিতার মনের জোর কত—প্রাণে ভজনের বল কত—তিনি বলিতেছেন—

—"লাগ পেয়েছি গৌর-ধনের পিছন ছাড়িনে"

সখি আমার পরমা ভাগ্যবতী—তাহার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। এইরূপ মনোভাব লইয়া গৌর-বল্লভা অকস্মাৎ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের উদ্দেশে গলবস্ত্রে একটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এই প্রণামটির মূল উদ্দেশ্য সখি অমিতার গৌরপ্রেমের গভীরতার পুরস্কার স্বরূপ প্রিয়াজির মনে মনে তাঁহাকেই লক্ষ্য। পাছে এই কার্য্যে সখি অমিতা কিছু মনে দুঃখ পান এই ভাবিয়া সুচতুরা গৌরবক্ষ-বিলাসিনী কৌশলে এক কার্য্যে দুই কার্য্য সিদ্ধ করিলেন। সখি অমিতা কিন্তু তাঁহার প্রিয়

সখির মনের ভাব বুঝিয়া তিনিও প্রতিপ্রণাম করিয়া তাঁহার নিজ স্বাভাবিক চতুরতার পরিচয় দিলেন। সখি কাঞ্চনা সর্ব্বজ্ঞা—তিনি সময় ও শুভ সুযোগ বুঝিয়া শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশে দুই জনকে দুটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মুখে কাহারও কোন কথা নাই, অথচ কৌশলে সকলের মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ! জয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ !!

অন্তর্য্যামিনী প্রিয়াজি মনে মনে সকলই বুঝিলেন,—মর্ম্মী অন্তরঙ্গা সখিদ্বয়ের সঙ্গে এত কৌশলজাল বিস্তার করিলে প্রকৃত প্রেম-সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না—ইহা বুঝিয়াই ধীরে ধীরে সখিদ্বয়ের হস্ত দুখানি নিজ দুই হস্তে ধারণ করিয়া পরম প্রেমাবেগে করুণ স্বরে কহিলেন—"সখি! প্রিয়সখি! তোমরা ধন্য—পরম সৌভাগ্যবতী—তোমরা আমার প্রাণ-বল্লভের লাগ পাইয়াছ—ইহা তোমাদেরই নিজ মুখের কথা—ভব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত অমূল্য ধন তোমাদের করতলগত—আমি তোমাদের চরণ ধূলির প্রয়াসী—গৌর-প্রেমের দীনা ভিখারিণী এই মন্দভাগিনী—গৌর-প্রেমের অযোগ্যা কাঙ্গালিনী এই হতভাগিনী—এ অধমা তোমাদের দাসীর দাসীর যোগ্যাও নহে। প্রিয়সখি! তোমরা এ মন্দ-ভাগিনীকে কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া তোমাদের সঙ্গিনী করিয়াছ,—ইহাতে তোমাদের মহত্ব ও কৃতীত্ব সূচিত হই-য়েছে—গৌর-প্রেম-ভাণ্ডারের চাবি তোমাদের হাতে সখি! নদীয়া-নাগরীবৃন্দের মনচোরা প্রাণ-গৌরাঙ্গ তোমাদেরই নিজস্ব ধন—বহুবল্লভ নদীয়ার গৌরাঙ্গ তোমাদেরই প্রেম-পিপাসী—তোমাদের প্রেমেই তিনি বশীভূত—গৌর-প্রেম-দানকর্ত্রী তোমরাই সখি! আমি একজন দীনহীনা ভিখারিণী,—একবিন্দু গৌরপ্রেমের কাঙ্গালিনী। আমি তোমাদের চরণে ধরিয়া সকাতরে করযোড়ে মিনতি করিতেছি—আমার মত মন্দভাগিনীকে গৌর-প্রেম-ধনে ধনী করিয়া বিনামূল্যে কিনিয়া লও—তোমাদের নিকট আমার আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই।"

প্রিয়াজির কথাগুলি সখিভাবের মত কথা নহে—পূর্ব্বে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন সখিদ্বয়ের সহিত প্রেম-সম্বন্ধ-সূচক সখিভাবের কথা কহিয়া তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টি করিব—কিন্তু এ সঙ্কল্প তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না, কারণ—"অহেরিব গতিঃ প্রেম্ন স্বভাব কুটিলা ভবেৎ"—এই বিধি অনুসারে তিনি চিরপ্রসিদ্ধ কুটিল পন্থারই অনুসরণ করিলেন। সখিদ্বয় এই কথাগুলি তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা প্রিয়সখির মুখে শ্রবণ করিয়া কষ্টই পাইলেন—তাঁহাদের গৌর বিরহ তাপদগ্ধ-হৃদয়ে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। প্রিয়াজির দীনতার কিন্তু ইহাতেও নিবৃত্তি নাই। অতঃপর তিনি কি করিলেন তাহাও শ্রবণ করুন।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে গৌরবিরহ-কাতরা প্রিয়াজি সখিদ্বয়ের চরণতলে পতিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া আছাড়িয়া বিছাড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। সেই প্রাণঘাতী মর্ম্মন্তুদ করুণ রোদনধ্বনি সখিদ্বয়ের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তাঁহারা তখন বড়ই বিপদে পড়িলেন—নানা ভাবে ও নানা কথায় তাঁহারাও কান্দিতে কান্দিতে তাঁহাদের প্রাণের সখিকে কত না সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভা তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্যা—তাঁহার শরীর নিস্পন্দ—সখিদ্বয় তখন তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন। বিরহিণী সনাতননন্দিনী মধ্যে মধ্যে "গৌর গৌর" বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন—এই অস্ফুট গৌর-ধ্বনিই গৌরনাম কীর্ত্তনের ইঙ্গিত বুঝিয়া সখি কাঞ্চনা গৌর-আবাহনের ধুয়া ধরিলেন,—

মল্লাররাগ।

"এস—নদীয়া-নাগর, গৌর-সুন্দর
চিত-প্রাণ-মনোহারী।
এস—হেম বরণ প্রাণ-রমণ,
নট-নর্ত্তন-কারী॥
এস—শচীনন্দন জগ বন্দন
গুপুত-কুঞ্জ-বিহারী।
এস—রসিক নাগর শচীর কোঙর
সঙ্কীর্ত্তন-প্রচারী॥
এস—বর-নটেন্দ্র গৌরচন্দ্র
নবদ্বীপ-বনোয়ারী।
এস—বিষ্ণুপ্রিয়া-ধব প্রাণ বল্লভ,
জগজন হিতকারী॥
এস—হরিদাসিয়ার প্রণয় আধার
এসহে নদীয়া-পুরী।
ডাকিছে তোমায় কাঞ্চনা অমিতা
(তোমার) বিষ্ণুপ্রিয়া কোলে করি॥"—

গৌরগীতিকা।

সখি কাঞ্চনার এই প্রেমাকুলাহ্বানের করুণ ধ্বনি—এই গভীরতম প্রেমানুরাগের প্রাণের ডাক—নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর সখির এই মহান্ প্রেমাহ্বানধ্বনি নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে সমাসীন ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল—তিনি তখন অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছিলেন—অকস্মাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—আজানুলম্বিত দুটী বাহু ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া পরম প্রেমাবেগে সর্ব্বভক্তগণসঙ্গে অকস্মাৎ উচ্চ-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"বৃন্দাবন-বিলাসিনী দয়াময়ী রাধে!
(একবার) দয়া কর গো!
কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে!
(একবার) দেখা দাও গো!
বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাধে রাধে!
বৃষভানু-নন্দিনী রাধে রাধে!
রাস-রস-রঙ্গিনী রাধে রাধে!
শ্যাম-সোহাগিনী রাধে রাধে!
ললিতার জীবন রাধে রাধে!
বিশাখার প্রাণধনি রাধে রাধে!
গোপীকুল-শিরোমণি রাধে রাধে।
অপার করুণাময়ি রাধে রাধে!
দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও রাধে রাধে॥
কতদিনে দয়া হবে রাধে রাধে!
কতদিনে দেখা হবে রাধে রাধে!
সবে মিলে বল গো রাধে রাধে!
জয় রাধে শ্রীরাধে বল রাধে রাধে॥"—

উপস্থিত ভক্তগণ সকলেই এই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। রাধা-ভাবে ভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে হঠাৎ কেন কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইলেন আজ এ সময়ে অকস্মাৎ এরূপ ভাব-বিপর্য্যয়ের কারণ কি? এখন প্রাতঃকাল—বেলা চারিদণ্ড মাত্র—রাত্রিকালে গম্ভীরা-মন্দিরে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহ রসাস্বাদন করিতেন—দিবাভাগে কৃষ্ণকথা কহিতেন—আজ তিনি এখন স্ব-স্বরূপে বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার বিরহে আকুল হইয়া রাধা রাধা করিয়া পরম ব্যাকুল হইয়াছেন—তিনি বিলাপ করিতেছেন—

—"কতদিনে দয়া হবে রাধে রাধে।
কতদিনে দেখা হবে রাধে রাধে!"

ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অকস্মাৎ এই অপূর্ব্ব ভাব-পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় রহস্য আছে—তাহা সেই পরম-স্বতন্ত্র পরম-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ ভিন্ন অন্য কেহ জানেন না—এ নিগূঢ় রহস্য "লীলাভেদে প্রকাশভেদ" সিদ্ধান্তের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্র শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের একান্ত নবদ্বীপ-রসরসিক ভক্তগণ কেহ কেহ ভেদ করিতে সমর্থ। প্রাচীন রসিকভক্ত মহাজন কবি ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রতি একটী পয়ার শ্লোকে এই নিগূঢ় রহস্য কিছু ভেদ করিয়াছেন, যথা—

—"ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে মুঞি করিয়ে বিকলি॥"

এস্থলে "ঘর" শব্দের অর্থ "গৃহিণী" শাস্ত্রে বলে—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিত সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

যাহা হউক নীলাচলে গম্ভীরা মন্দিরে এই অপূর্ব্ব শ্রীরাধা কীর্ত্তনে উপস্থিত ভক্তগণ যোগদান করিলেন,—এই উচ্চকীর্ত্তনের ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিল গিয়া নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে—যেখানে ভূমিতলে শায়িতা ধুল্যবলুণ্ঠিতা বৃষভানু-নন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় দেবী গৌরপ্রেমোন্মাদদশাগ্রস্থা হইয়া সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়া আছেন। সখি কাঞ্চনা উপায়ান্তর না দেখিয়া নদীয়া-যুগল-আহ্বান-গীতির ধুয়া ধরিলেন — অমিতা সমস্বরে দোহার দিতে লাগিলেন—

যথা রাগ।

"জয়—শ্রীশচীনন্দন, জগ-জন-বন্দন,
জগন্নাথ-নন্দন, সরব-গুণনিধিয়া।
জয়—সনাতন-নন্দিনী, গৌর-সোহাগিনী,
ত্রিভুবন বন্দিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
জয়—নদীয়া-পুরন্দর, গৌর-বিশ্বম্ভর,
রস-সাগর-নাগর, নবদ্বীপ-ইন্দু।

জয়—নবদ্বীপেশ্বরী, পর-পরমেশ্বরী,
পদ-যুগলে ধরি, দেহ করুণাবিন্দু ॥
জয়—বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ, নবদ্বীপ-মাধব,
কান্তি নব নব, ভকতহৃদি-বিহারী।
জয়—বিশ্বপ্রেম-রূপিণী, পতিতোদ্ধারিণী,
জীব-দুঃখ-হারিণী, দেবী নবদ্বীপেশ্বরী ॥
জয়—নাগর-গৌরহরি, প্রেম-রস-মাধুরী,
বন্দিত নরনারী, নট নর্ত্তনকারী।
জয়—চির শান্তিময়ী, প্রেমদাত্রী অয়ি!
দীন দয়াময়ী, হ্লাদিনী বর-নারী ॥
কোটি—চন্দ্র বিনিন্দিত, অনুরাগ-রঞ্জিত
প্রেমাশ্রু-বিগলিত, বদন মনোহারী।
জয়—ভক্তি-স্বরূপিণী, রাস-বিলাসিনী
প্রেম-প্রদায়িনী, অবতার-নারী ॥
জয়—নটবর নাগর, সুবেশ মনোহর
সর্ব্বগুণাকর, প্রেমময় মূর্ত্তি।
জয়—রাজরাজেশ্বরী, মরি মরি মাধুরী,
গৌরাঙ্গ-চিত্তহারী, প্রেমরসদাত্রী ॥
জয়—স্বনাম-গায়ক, প্রেম-রস-নায়ক
প্রীতি-প্রদায়ক নাগর বনয়ারী।
জয়—(গৌর) প্রেম-ভাণ্ডারী মহাভাব-রস তরী
সর্ব্বমঙ্গলকারী জগদীশ্বরী ॥
জয়—গৌর-মন-মোহিনী গৌর বিরহিণী,
নদীয়া-বাসিনী বিপ্রলম্ভ-রসসিন্ধু।
বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী, ভণয়ে হরিদাসী
যুগলে পরকাশি, দেহ করুণাবিন্দু ॥"—
গৌর-গীতিকা।

এখন বেলা চারিদণ্ড অতীত হইয়াছে—বিরহিণী গৌর বল্লভা তখনও ভজন মন্দির-দ্বারের ভূমিতলেই নিপতিতা আছেন—সখিদ্বয় দুই পার্শ্বে বসিয়া গৌর-কীর্ত্তন করিতেছেন,—তাঁহাদের বিষণ্ণ বদনমণ্ডল প্রেমাশ্রুধারা-বিগলিত মুক্তাফল-শোভিত অপূর্ব্ব প্রেম-রস-মাধুর্য্যে যেন পরিপূর্ণ। গৌর-পাগলিনী কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখি গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—গৌর-বল্লভার নয়নদ্বয় নিমিলিত—কিন্তু তাঁহার কমলনয়নদ্বয়ের পার্শ্ব দিয়া দরদরিত প্রেম-ধারা পড়িতেছে—সখি কাঞ্চনা ও অমিতার নয়নের মুক্তাফল সদৃশ ফোটা ফোটা উষ্ণ বিন্দুগুলি টপ্ টপ্ করিয়া গৌর-বিরহিণীর বদনমণ্ডলে পড়িতেছে—প্রিয়াজির নয়নধারার সহিত সখিদ্বয়ের নয়ন-ধারা মিলিত হইয়া সেখানে গৌর প্রেম-তরঙ্গিণীর সৃষ্টি করিয়াছে।

কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে ন্যাসী-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলারঙ্গের কথা স্মরণ করিবেন—ভুলিলে চলিবে না—সেখানে রাধা-প্রেমোন্মত্ত রাধা-ভাব-কান্তি-ধারী কপট সন্ন্যাসী বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীরাধার নাম করিয়া কান্দিয়া আকুল হইয়াছেন। নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরেও সেই মহান ব্রজগোপী-প্রেম-রস মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব করুণ রসাত্মক দৃশ্য প্রকটিত। শক্তি শক্তিমানের অভেদতত্ত্ব এই খানেই ভাল করিয়া বুঝুন।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণ-বল্লভাকে বলিয়াছেন—

—"যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেইক্ষণ তুমি মোর দরশন পাবে ॥
শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

এক্ষণে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে এই অনুরাগের মহা ডাক পড়িয়াছে—এই আকুল প্রেম-আহ্বানের ধ্বনির যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,—আর যিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাঁহার কর্ণে সেই আকুল অনুরাগের ডাক পৌঁছিল। তাই কীর্ত্তনের মধ্যে তাঁহার প্রাণের এই আকুলি-বিকুলি। আজি শ্রীরাধাবল্লভের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সর্ব্বার্থসাধিকা শ্রীরাধাকে মনে পড়িয়াছে—যাঁহার ভাবকান্তি চুরি করিয়া তিনি কপট সন্ন্যাসী সাজে নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন সুখানুভব করিতেছেন,—তাঁহারই বিশিষ্টাবির্ভাব গৌর-প্রেম মুকুটমণি সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরপ্রেম-রসাস্বাদনের প্রবল লালসা আজ ন্যাসী চূড়ামণির মনে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। ভাগ্যে নিরপেক্ষ বিচারক এবং বাক্য-দণ্ড-দাতা পণ্ডিত দামোদর এখন নীলাচলে উপস্থিত নাই—থাকিলে এই কপট সন্ন্যাসী-ঠাকুরের "ঘর-মনে-পড়া" ভারিভুরি ব্যাপারটি লইয়া নীলাচলে একটা মহা হুলস্থূল কাণ্ড ঘটাইতেন।

যাহা হউক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী-স্বরূপের

লীলারঙ্গ নীলাচলে প্রকট রাখিয়া তিনি স্ব-স্বরূপে নবনটবর নদীয়া-নাগর-বেশে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বারদেশে তাঁহার স্বরূপশক্তি বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্মুখে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন। নদীয়া-নাটুয়া নাগরেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে গম্ভীরামন্দির পরিপূরিত হইল—মহ মহ করিতে লাগিল। সুগন্ধি মল্লিকা যূথি যাতি পুষ্পসৌরভে গৌরশূন্য গৌরগৃহ পরিপূর্ণ হইল। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ ভজন-মন্দির-দ্বারে ভূমিলুণ্ঠিত অবস্থায় পড়িয়া আছেন—তিন জনেই অনুরাগভরে গৌরনাম-জপ-মগ্না। অকস্মাৎ তাঁহাদের সকলেরই মন প্রাণ যেন অপূর্ব্ব পুষ্পসৌরভে আকুলিত হইল—কিন্তু তাঁহাদের সকলের নয়ন নিমিলিত। এই অবস্থায় তাঁহারা কি দেখিতেছেন তাহা জীবাধম লেখকের পূর্ব্বপুরুষ প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর রচিত একটী প্রাচীন পদে শ্রবণ করুন,—

রাগ তুড়ি।

—"বিহরে আজু রসিকরাজ, গৌর-চন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্জ-কেশর-পুঞ্জ-উজোর, কণক-রুচির-কাঁতিয়া।
কোটি-কাম রূপ-ধাম, ভুবনমোহন লাবনি-ঠাম
হেরত-জগত-যুবতী-উমতী, ধৈরজ ধরম ত্যজিয়া॥
অসীম-পূর্ণিম শরদ-চন্দ, কিরণ-মদন-বদন-ছন্দ,
কুন্দ-কুসুম-নিন্দি সুষম, মঞ্জু সদন-পাঁতিয়া;
বিম্ব-অধরে মধুর হাসি, বমই কতহি অমিয়া-রাশি,
সুধুই সিধু-নিকর-ঝিকর, বচন ঐছন ভাঁতিয়া॥
মধুর ররজ-বিপিন-কুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতি-পুঞ্জ,
সোঙরি-সোঙরি-অধিক-অবশ, মুগধ-দিবস-রাতিয়া॥
আবেশে অবশ-অলস-বন্দ, চলত-চলত-খলত-মন্দ,
পতিত-কোর-পড়ত-ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণ-নয়নে-করুণ-চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত-উমত-লুঠত-ভ্রমত, ফুটত-মরম ছাতিয়া।
উত্তম-মধ্যম-অধম জীব, সবহুঁ-প্রেম-অমিয়া পীব,
তঁহি বলরাম বঞ্চিত একলে সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥

পদকল্পতরু।

গৌরবক্ষবিলাসিনী গৌরবল্লভা তাঁহার কায়ব্যূহ মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ তাঁহার প্রাণবল্লভকে স্ব-স্বরূপে ও স্ব-স্বভাবে নদীয়ায় আবির্ভূত দর্শন করিয়া বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। প্রেমবিহ্বল ভাবে অকস্মাৎ তিনি উঠিয়া বসিয়া তাঁহার মলিন বসনাঞ্চল পাতিয়া তাঁহার প্রাণকোটিসর্ব্বস্বধনকে অনুরাগভরে প্রেমাহ্বান করিলেন কি বলিয়া তাহা শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

—"আইস আইস বন্ধু, আঁচরে আসিয়া বৈস,
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
সফল করিয়ে আঁখি॥
বন্ধু! আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে, যেখানে পরাণ,
সেখানে রাখিয়া থোব॥"

পদকল্পতরু।

এই পদাংশটুকু বলিতেই প্রেমাবেগে বিরহিণী গৌর-বল্লভার বাক্‌রুদ্ধ হইয়া আসিল,—শেষাংশটুকু আর বলিতে পারিলেন না, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

—"কাল কেশের মাঝে তোমায় বন্ধু রাখিব
পুরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে, তাহারে প্রবোধিব,
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহে ত নেতের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥"

পদকল্পতরু।

এই পদটির শেষাংশটুকু কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকার উক্তি—গৌর-বল্লভার পক্ষে প্রযোজ্য নহে। নবদ্বীপ-লীলায় গৌর-বল্লভার গুরুগঞ্জনা নাই—তাঁহার পরকীয়াভাব নাই। এখানে সনাতন নন্দিনী গৌর বল্লভার স্বকীয়াভাব।

শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্টাবির্ভাব শ্রীগৌর-সুন্দর তাঁহার বাসনাত্রয় পূর্ণ করিবার জন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার বিশিষ্টাবির্ভাব সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। বৃষভানু-নন্দিনী কৃষ্ণবল্লভাকে পূর্ব্বলীলায় পরকীয়াভাবে তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত গুপ্তপ্রণয় এবং গোপনে বৃন্দাবিপিনে নিকুঞ্জবিহার ও বিলাসাদি করিতে বড়ই দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়া-

ছিল। তাঁহার অভিসারের কষ্টের কথা তুলিয়া সখি ললিতা বলিতেছেন—

—"ধীরে ধীরে চল গজগামিনি!
একে বিষাদে তোর কৃষ তনু,
মরি মরি হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।
না জানি কোন গহন বনে প্রাণ হারাবি।
কত কণ্টক আছে গো বনে,
ও রাই ফুটিবে দুটি চরণে,
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে,
ও তোর কোমল পদে দংশে পাছে গো।
(গহন কানন মাঝে)"—
রাই উন্মাদিনী।

এই জন্য পূর্ব্বলীলায় এই নিদারুণ দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্যই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত পত্নী সত্যভামা রূপে দ্বারকায় স্বকীয়াভাবে লীলারঙ্গ। শ্রীধাম নবদ্বীপেও তাঁহার ঠিক সেই ভাবেরই স্বকীয়া-লীলারঙ্গ তাঁহারও বাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রকটিত হইয়াছিল। শক্তিমানের বাঞ্ছা যেমন পূর্ব্বলীলায় অপূর্ণ ছিল—শক্তিরও তদ্রূপ কিছু অবশ্যই ছিল। বৃষভানু-নন্দিনীর সেই অপূর্ণ বাঞ্ছা কতক পরিমাণে পূর্ণ হইয়াছিল পূর্ব্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীসত্য-ভামারূপে—আর বাকিটুকু তাঁহার বিশিষ্টাবির্ভাব গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ারূপে নদীয়ায় পূর্ণ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের গৌর গোবিন্দস্বরূপের স্বরূপশক্তিরূপে শ্রীরাধিকার নদীয়ায় বিশিষ্টাবির্ভাবের ইহাও একটী কারণ এবং ইহাও যে বিদ্বদনুভব, তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই।

সে যাহা হউক তত্ত্ববিচার এ সময়ে অপ্রাসঙ্গিক। কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! নিজগুণে লীলা-রসভঙ্গজনিত জীবাধম লেখকের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা গৌর বিরহিণী প্রিয়াজির কায়ব্যূহ। তাঁহারাও আজ নদীয়ানাগর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব-লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন—তাঁহাদেরও গৌর-বিরহ-বেদনা প্রশমিত হইয়াছে,—তাঁহারাও দুইজনে প্রেমানন্দে সমস্বরে গৌরাবাহন-গীতির ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"ওহে প্রাণরমণ, শচীনন্দন
করি বন্দন, তব চরণে।
তুমি—দীন শরণ, তাপ-হরণ
আনন্দ-ঘন চিত-রমণে॥
তুমি—পরশ-মণি, অমিয়া-খনি,
গীতে রাগিণী সুধার-ধার।
তুমি—চিন্তা-হরণ, মন-রঞ্জন,
হৃদি-মোহন মাণিক-হার॥
তব—চরণ-দ্বন্দে, ললিত-ছন্দে
পরমানন্দে, গাহিব গান।
তব—পাদ-পরশে, ভাব-আবেশে
প্রেম-হরিষে, ধরিব তান॥
তুমি—পরমানন্দ, প্রেম-কন্দ
মৃদুল-মন্দ, দখিণ-বায়।
তুমি—চির সুন্দর, নিখিলেশ্বর,
বিশ্বম্ভর রসিক-রায়॥
তব—রূপ-মাধুরী, হৃদয়-হারী
দুখ পাসরি পদ-পরশে।
তব—পাদ-যুগল, ফুল্ল কমল
হেরি নিরমল, হৃদি-সরসে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ! কর হে সাথ,
অনাথ-নাথ, নাম তোমারি।
এস—নদীয়া-নাটুয়া, শচী-দুলালিয়া
মন-মোহনিয়া, গৌরহরি॥
হরিদাসী অধমা, চাহিতেছে ক্ষমা,
করহে করুণা, প্রিয়াজি প্রতি।
তুমি—হও প্রসন্ন, (তিনি) বড় বিপন্ন,
(তাঁর) ও পদ ভিন্ন, নাহিক গতি॥"
গৌর-গীতিকা।

এই ভাবের আবাহন-গীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সখি কাঞ্চনা নদীয়ার মহা-গম্ভীরামন্দির-দ্বারে দাড়াইয়া করযোড়ে গৌর-আবাহন করিলেন। সখি অমিতাও অতি স্বল্প কথায় তাঁহার মনোভীষ্ট সাধন করিলেন—প্রসন্নতা ভিক্ষা করিলেন যথা,—

—"শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোর-চন্দ্র,
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্ত-চোর,
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর॥"—

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির-দ্বারে ক্ষণকালের জন্য এই যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব লীলারঙ্গ,—ইহাতেই গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয়ের গৌর-বিরহ-জ্বালার অনেক উপসম হইল। এই যে ক্ষণিক মিলন-সুখ—এই যে বিদ্যুৎমালার ন্যায় ক্ষণিক দর্শনানন্দ—ইহাই বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রাণ রক্ষার উপায়। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের এরূপ আবির্ভাব-লীলারঙ্গ নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরে মধ্যে মধ্যে প্রকটিত হইত। তিনি স্বয়ং ভগবান—সন্ন্যাস তাঁহার একটী লীলা মাত্র—তাঁহার অনন্ত কোটী লীলার মধ্যে ইহাও একটী অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ। সন্ন্যাসমূর্ত্তি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এরূপ নাগরবেশে আবির্ভাব লীলারঙ্গ তাঁহার ভক্তবাৎসল্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় শ্রীভগবানের প্রকট লীলারঙ্গ নানা ভাবে ও নানারূপে জগতে প্রকটিত হয়। শ্রীগৌরভগবানের সন্ন্যাস-লীলার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাঁহারা ব্যস্ত—অপর কথায় শ্রীভগবানের চরিত্র রক্ষা করিতে যাঁহারা চিন্তান্বিত, এবং তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্ম নষ্ট হইবার ভয়ে যাঁহারা সশঙ্কিত, তাঁহারা মনে রাখিবেন শ্রীভগবানের ভক্ত-বৎসলতা-গুণই সর্ব্ব প্রধান এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহার অন্যান্য সকল গুণই এই ভক্ত-বাৎসল্য গুণের নিকট ম্লান এবং পরাজিত। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সন্ন্যাসলীলা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি গৌর-ভক্তগণের বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত প্রণিধান যোগ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

—"স্বামীহীনা দেবহুতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা—উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী হেন জননী ছাড়ি একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসীমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এসকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এসকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যে ইহার শ্রবণে॥"---

বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখিদ্বয়সহ স্বপ্নের মত প্রেমানন্দে . য়া-বল্লভের আবির্ভাব-লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহাদের গৌর-বিরহ-জ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিলেন।

এক্ষণে তিন জনে একত্রে বসিয়া এই আবির্ভাব-লীলা-রঙ্গের আলোচনা করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনাই প্রথমে ইহার অবতারণা করিলেন। তিনি প্রিয়াজিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সখি! তোমার প্রাণবল্লভ তোমার অনুরাগের ডাকে আসেন—তোমার প্রতি তাঁহার কত অনুরাগ—তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও নদীয়া-নাগরবেশে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিয়া গেলেন—ইহাই তাঁহার অপার কৃপার প্রকৃষ্ট পরিচয়।"

বিরহিণী গৌর-বল্লভা বিনতবদনে একটী কথার উত্তর দিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তিনি ত চকিতের ন্যায় মাত্র একটিবার দেখা দিয়াই অদর্শন হইলেন—কথা ত একটিও কহিলেন না।" সখি কাঞ্চনা তখন মৃদু হাসিয়া বলিলেন "প্রিয়সখি! দর্শন, ধ্যানের ফল,—কথাবার্ত্তা, রসরঙ্গাদি স্বপ্নের ফল। তুমি কি কখন তোমার প্রাণবল্লভকে স্বপ্নেও দেখ নাই"?—বিরহিণী প্রিয়াজি নীরব রহিলেন। তখন সখি কাঞ্চনা তাহার নিজের পূর্ব্বদিনের স্বপনের কথাটি বলিলেন।

যথারাগ।

—"শুন শুন সই স্বপনে দেখিনু নিকুঞ্জ-কাননে গোরা।
তুয়া পথপানে নিরখি কাতরে ঝরয়ে লোচন-লোরা॥
মোর মুখে তুয়া গমন শুনিয়া কত না সাধিল মোরে।
অতি তরাতরি হেরি তার দশা আসিয়া কহিনু তোরে॥
শুনিয়া উলসে বেশ বনাইয়া ভেটিলা নিকুঞ্জ মাঝ।
দূরেতে আদরি ধরি করে কোরে করিল রসিকরাজ॥
উপজিল কত কৌতুক ছলেতে মানিনী হৈলা তুমি।
নরহরি পঁহু করয়ে মিনতি জাগি বিয়াকুল আমি॥"

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি লজ্জায় বদন অবনত করিলেন—তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার এই স্বপ্ন-কথা শুনিয়া মনে মনে

বড় সুখ হইল, অন্তরে আনন্দ উপজিল, কিন্তু তিনি মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বিপ্রলম্ভ-রসপুষ্টির জন্য নায়ক-নায়িকার মিলন এরূপভাবে মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে সংঘটিত হয়—সম্ভোগ-সুখও স্বপ্নে অনুভূত হয়। এ সকল রসশাস্ত্রের বিধি। সখি কাঞ্চনার স্বপ্ন যে অলীক নহে তাহার প্রমাণ বিরহিণী প্রিয়াজি স্বয়ং দিতে সমর্থ—কিন্তু তিনি তাহা দিলেন না। তিনি অতিশয় গম্ভীর-প্রকৃতি এবং সাবধান।

গৌর-বল্লভা ধীরে ধীরে ভজন-মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে উঠিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সখি কাঞ্চনার সহিত আর কোন কথাই হইল না। তখন বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রিয়াজির প্রাতঃভজনে আজও বিঘ্ন ঘটিল—সংখ্যানাম জপ পূর্ণ হইতে আজ অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হইবে, এই ভাবিয়া সখিদ্বয় মহা চিন্তিত হইলেন।

সখি কাঞ্চনার মূল প্রস্তাব, অর্থাৎ রাত্রিতে তাঁহাদের কাহারও প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে শয়নের প্রস্তাব, প্রিয়াজির নিকটে উত্থাপন করিবার আর অবসর, সুযোগ বা সুবিধা ঘটিল না—ইহাতে সখিদ্বয়ের মনে বড় দুঃখ। অপরাহ্ণে এই অত্যাবশ্যকীয় প্রস্তাবটি নিশ্চয়ই করিতে হইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা তখন সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া পাদ পদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ—
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ কুঞ্জ
১০ই কার্ত্তিক ১৩৩৭।
সোমবার, প্রাতঃকাল।

(৯)

গৌর-বিরহোন্মাদ-দশা-গ্রস্তা বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মর্ম্মন্তুদ ও প্রাণঘাতী লীলারঙ্গ-কথাগুলি তাঁহার প্রিয় মর্ম্মী ও অন্তরঙ্গা সখিদ্বয়ের জীবন মরণের সাথী। সর্ব্বক্ষণই তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরশূন্য গৌর-গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর গুরু-গম্ভীর গৌর-বিরহোদ্বেগপূর্ণ আত্মনিবেদনের মর্ম্মস্পর্শী গুরুগর্জ্জন বিলাপধ্বনির গভীর ও প্রবল ঝঙ্কার দিতেছে। রাত্রিকালে প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে সখিদ্বয়ের মধ্যে কাহারও শয়নের ব্যবস্থার প্রস্তাবটি,—যাহা সখি কাঞ্চনা ও অমিতা মনে মনে জল্পনা কল্পনা করিতেছেন—তাঁহাদের মনের সেই গুপ্ত কথা—বুকের সেই গুপ্ত ব্যথা—প্রাণের সেই মর্ম্মবেদনা অন্তর্যামিনী গৌর-বল্লভা সকলি জানেন—কিন্তু তাঁহাদিগকে মুখ ফুটিয়া বলিবার সুযোগ ও অবসর তিনি দেন নাই। কাজেই তাঁহাদের মনের ব্যথা মনেই রহিয়া গিয়াছে—জগদ্দল পাথরের মত সেই বুকের ব্যথা বুকে করিয়াই সর্ব্বক্ষণ তাঁহারা নিদারুণ মনঃকষ্টেই আছেন। তাঁহাদের বুকের আগুন বুকের মধ্যেই দাউ দাউ জ্বলিতেছে—বুকের ব্যথা বুকের মধ্যেই সূচীভেদ্য যন্ত্রণা দিতেছে,—মুখে তাহার বিন্দুমাত্র আভাস দিবার তাঁহাদের অবসর নাই। কারণ গৌরবল্লভা গৌরকথা ভিন্ন আন্ কথায় কর্ণপাত করেন না—তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনের ব্যথা এবং মনের কথা যাহাতে তাঁহার আত্ম-সম্বন্ধ আছে—তাহাই গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির পক্ষে আন্ কথা। সখিদ্বয়ের প্রাণের এই দুঃখ,—হৃদয়ের এই মনস্তাপ রাখিবার স্থান নাই। তাঁহারা যেন জীবন্তে মরিয়া আছেন।

আজ প্রাতে গৌর-বল্লভা তাঁহার পাষাণের রেখার মত ভজন সাধনের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহার ভজন-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সখিসঙ্গে যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার সখিদ্বয় স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন। তদুপরি গৌর-গুণ-গান-মধুপানে তাঁহারাও প্রমত্ত ছিলেন—যদিও আত্মকথা বলিবার অবসর ছিল না—তথাপি মনে তাঁহাদের একটা প্রবল অশান্তি ছিল।

এক্ষণে সন্ধ্যার প্রাক্কাল—সূর্য্যদেব অস্তাচলগামী হইয়াছেন—সান্ধ্য-নদীয়া-গগনের পশ্চিমপ্রান্ত এখনও অরুণাভ—কলনাদিনী সুর-তরঙ্গিনীর স্বচ্ছ সলিলে সেই রক্তিমাভা পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—সুরধুনীর মৃদুমন্দ তরঙ্গাবলী সন্ধ্যার পর স্বল্প আলো-আঁধারে ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের মত লুকোচুরি খেলিবার জন্য যেন সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বার রুদ্ধ। কার্ত্তিক মাস,—নদীয়াবাসিনী ভক্তি-মতি কুলনারীবৃন্দ সন্ধ্যাকালে পতিত পাবনী সুরধুনীতীরে নিয়মসেবার নিয়মিত দীপদান করিতে আসিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই গৌর-শূন্য গৌর-গৃহদ্বারে এক একটী প্রদীপ দিয়া যাইতেছেন,—আর গলবস্ত্রে এক একটী করিয়া সভক্তি প্রণাম করিয়া নয়নজলে ভূমিতল সিক্ত করিতেছেন।

গৌর-বিরহ-কাতরা নদীয়ার শত সহস্র গৌর-বিরহিণী কুল-রমণীবৃন্দের নয়ন-সলিলসম্পাতে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের বহির্বাটীর দ্বার দেশে গৌর-বিরহ-তরঙ্গিনীর উদ্ভব হইয়াছে। এই নবীনা গৌর বিরহ-তরঙ্গিনী গৌর-শূন্য গৌর-গৃহদ্বার-চুম্বিতা সুরতরঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবল প্রেমাবেগে উচ্ছসিত তরঙ্গভঙ্গীতে লহর তুলিয়া গৌর-বিরহ-মহাসাগরোদ্দেশে রঙ্গে ভঙ্গে নাচিয়া চলিয়াছে। এই নবোদ্ভূতা গৌর-বিরহ-তরঙ্গিনীর অনন্ত প্রেম-তরঙ্গোচ্ছাসের শুভ্র ফেনপুঞ্জের উপরিভাগে গৌর-বিরহিণী নদীয়া-নাগরী-বৃন্দের গৌর-বিরহ-ব্যঞ্জক শুভ্রবসনাবৃতা প্রতিচ্ছবি সকল ভাসিতে ভাসিতে দ্রুতবেগে নীলাচলে যেন গৌরদর্শনে ছুটিয়াছেন। গৃহে প্রত্যাগমনকালীন তাঁহাদের স্থূল শরীরের হৃদয় মধ্যে কত শত ভাব তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। ভাবনিধি গৌর-কিশোরের মহাভাবময়ী প্রাণ-বল্লভার কঠোর ভজনকথাগুলি পথে তাঁহাদের এই সময়ের আলোচ্য বিষয়। তাঁহাদের প্রাণে গৌর-বিরহ-সাগরোত্থ ভাব-তরঙ্গরাজি নানা ভাবে কত কি খেলা করিতেছে,—সে তরঙ্গাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতে বিশ্ববাসীর প্রাণে সূচীভেদ্য মর্ম্মান্তিক গৌর-বিরহ-বেদনার স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর নির্জ্জন ভজনের এমনি মহান্ প্রভাব—এমনি প্রবল শক্তি!

গৌর-বল্লভার নিয়মিত দৈনন্দিন নিত্য নাক্রিয়া সমাপন করিতে অগু সন্ধ্যা উত্তা হইয়াছে সন্ধ্যার পর আজ ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছেন। এখন তিনি ভজন-মন্দির-দ্বারে বসিয়া সংখ্যানাম জপ করিতেছেন। এখন রাত্রি চারি দণ্ড—সখিদ্বয় তাঁহার নিকটে বসিয়া সংখ্যানাম-জপানন্দে মগ্না আছেন।

এই সময় বিরহিণী প্রিয়াজির সঙ্গে সখিদ্বয়ের গৌর-কথার ইষ্টগোষ্ঠির কাল। সুতরাং সখি কাঞ্চনা গৌর-কথার প্রসঙ্গ তুলিলেন। তিনি অমিতাকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু-মধুর বচনে কহিলেন—"সখি অমিতে! বল দেখি, এখন বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া কি লীলা-রঙ্গ করিতেছেন?"—সখি অমিতাও চতুরা ও ভজনবিজ্ঞা। তিনি সখি কাঞ্চনার মনের ভাব এবং এরূপ প্রশ্ন উঠাইবার উদ্দেশ্য বুঝিয়া অতি মৃদুস্বরে কানে কানে উত্তর দিলেন—"সখি কাঞ্চনে! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কঠোর ভজন-কথা এখানে না বলিলেই ভাল হয়,—পণ্ডিত জগদানন্দ সকল কথা এখানে প্রকাশ করেন নাই—কিন্তু আমি সকলই শুনিয়াছি লোকমুখে।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি সংখ্যানাম জপ করিতেছিলেন,—তিনি সখি অমিতার গুপ্ত কথার আভাস মাত্র পাইয়া সংখ্যা-নাম জপ শেষ করিয়া পরমোৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন—"সখি! তোমাদের নদীয়া-নাগর গৌরসুন্দরের কঠোর ভজনকথা আমাকে কৃপা করিয়া বল। পণ্ডিত জগদানন্দের পরিপূর্ণ কৃপাদৃষ্টি এ মন্দভাগিনীর প্রতি পড়ে নাই—আমার পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য—আমার শিক্ষার জন্য—তুমি সখি! আমার প্রাণবল্লভ সম্বন্ধে সকল কথাই আমাকে অকপটে বলিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর"—এই বলিয়া পরম প্রেমভরে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার দুটী ক্ষীণ হস্তে সখি অমিতার হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিলেন। অমিতা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না—তিনি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! সকল কথা তোমার না শুনাই উচিত—তবে তোমার অনুমতি লইয়াই আজ দু'একটী কথা তোমাকে বলিব—কিন্তু সে কথা বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হয়।"—এই বলিয়াই তিনি বিরহিণী প্রিয়াজির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বালিকার ন্যায় ফঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌর-বল্লভাও তাঁহার প্রিয়সখির নয়ন-বারিধারার সহিত নিজ নয়ন-বারি-ধারা মিশাইয়া ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা আপনা আপনিই প্রকৃতিস্থা হইলেন। সখি কাঞ্চনা নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন,—আর বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর বিরহ ভাব-তরঙ্গ সকল লক্ষ্য করিতেছেন। সখি অমিতা তখন তাঁহার কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমাদের নাগরেন্দ্রচূড়ামণি নীলাচলের গম্ভীরামন্দিরে এখন একেবারেই রাধা হইয়াছেন—তাঁহার রাধাভাবটি এখন সেখানে মূর্ত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণবিরহ-সাগর-বাড়বানলে তিনি এখন সর্ব্বক্ষণ দগ্ধীভূত। সখি! তোমারই মত এখন তিনি কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ-দশাগ্রস্থ। গম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমারই মত রাত্রিকালে তিনি নির্জ্জন ভজন করিতেছেন—সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা নাই—স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে থাকিয়া

কৃষ্ণকথা-রসরঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত কৃষ্ণ-বিরহানল কথঞ্চিৎ প্রসমন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুপস্থিতি-কালই তোমার প্রাণবল্লভের এখন কাল-স্বরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণ-বিরহাবেগে তিনি অধীর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় অন্ধকার গম্ভীরা-মন্দিরের অভ্যন্তরে ছুটাছুটি করিয়া দ্বারোন্মোচনের চেষ্টা করিতে গিয়া একদিন রাত্রিতে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি "হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ"! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভূমিতলে অঙ্গ আছাড়িয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সখি অমিতা তখন বিষম লজ্জিতা ও শঙ্কিতা হইয়া সখি কাঞ্চনার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"সখি! কেন তুমি আমাকে এ সকল প্রাণঘাতী গৌর-কথা বলিতে ইঙ্গিত করিলে? এখন উপায় কি? আমার মত পাষাণ-হৃদয় মহাপাপিনী ত্রিজগতে আর একটী তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। এরূপ ভাবে গৌর-কথা শুনাইবার অধিকারিণী মর্ম্মী সখিগণ নিশ্চয়ই নহেন।"—এই বলিয়া সখি অমিতা মর্ম্মান্তিক দুঃখে ও অনুতাপের সহিত নিজ কপালে বারম্বার করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং ভূমিতলে পড়িয়া তিনিও মাথা কুটিতে লাগিলেন। এখন সখি কাঞ্চনা বড় বিপদেই পড়িলেন—এক দিকে গৌর-বল্লভা মূর্চ্ছাগতা—অন্যদিকে সখি অমিতার আত্মগ্লানিব্যঞ্জক গভীর ও ভীষণ আর্ত্তনাদ, আর প্রাণঘাতী মাথা কুটাকুটি। সর্ব্বাগ্রে তিনি সখি অমিতাকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন—কত সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার মনের উদ্দেশ্য বুঝাইলেন—কিছুতেই অমিতার মন আর শান্ত হইতেছে না—তখন সখি কাঞ্চনা বিপদে পড়িয়া গৌর-চরণ স্মরণ করিলেন। তিনি তখন গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ হে!

"তোমার বিরহ, বড়ই অসহ,
তুমিই কর হে শান্ত।
তুমি বিনে আর, কে আছে আমার,
তুমি হে পরাণ-কান্ত॥
তোমারই বদন, তোমারই নয়ন,
তোমারই মাধুরী-কান্তি।
মানসে ভাবিয়া, স্বপনে হেরিয়া,
পাই মোরা হৃদে শান্তি॥
ও চারু চরণ, করিয়ে স্মরণ,
ভুলে যাই মোরা বিশ্ব।
ও সুধা-বচনে, ছুটে যে পরাণে,
অমিয়-ধারার উৎস॥
শুনিতে শুনিতে, পারি না থাকিতে,
প্রাণ হয়ে উঠে মত্ত।
ব্যাকুল হৃদয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
ভাবি যে তোমারই তত্ত্ব॥
চকিতে আসিয়া, রূপ ঝলসিয়া,
কর তুমি আঁখি অন্ধ।
দেখি দেখি করি, দেখিতে না পারি,
হয়ে যাই আমি ধন্ধ॥
বলি বলি করি, বলিতে না পারি,
হয়ে যায় স্বর ভঙ্গ।
দাসীদের সনে, বসিয়া নির্জ্জনে,
একি হে তোমার রঙ্গ॥
শুনি শুনি করি, শুনিতে না পারি,
(তব) প্রেম-কথা এক বর্ণ।
প্রাণ কেঁদে উঠে, আঁখি-ধারা ছুটে,
বধির হয় যে কর্ণ॥
তুমি প্রাণনাথ, ল'য়ে সবে সাথ,
করহে যাতনা শান্তি।
এ হরিদাসিয়া তোমারি রসিয়া
ক'র না'ক মনে ভ্রান্তি॥"

গৌর-গীতিকা।

সখি কাঞ্চনার মুখে তাঁহার আত্মনিবেদনের এই পদটি শুনিয়া সখি অমিতার মনদুঃখ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল—বিরহিণী গৌর বল্লভার গৌর-বিরহানল-প্রতপ্ত নিস্পন্দ হৃদয় কন্দর স্পন্দিত হইল।

এক্ষণে দুই সখিতে মিলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজিকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় ব্রতী আছেন—তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান হইয়াছে মাত্র—কিন্তু চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করিতে পারিতেছেন না—কথা কহিবার শক্তি নাই। ভাবগতিক দেখিয়া সুচতুরা সখি কাঞ্চনা নিদারুণ রোগের শেষ ঔষধ

দিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। বিষস্য বিষমৌষধং—গৌর-বিরহের ঔষধই গৌর-বিরহ-গীতি। গৌর-বিরহ-গানের ঝঙ্কার তুলিয়া সখি কাঞ্চনা ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে!

—"গৌরাঙ্গ বলিয়া, পরাণ ত্যজিব,
চির জীবনের আশ।
মিটাবে কি তাহা, ওহে প্রাণধন,
পুরাবে কি অভিলাষ?
(মোর) কোন আশা নাই, কিছুই না চাই,
(শুধু) চাই এই বর দান।
গৌরাঙ্গ বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে,
যায় যেন মোর প্রাণ॥
মানব জনম, বিফলে কাটাইনু,
না লইনু তব নাম।
বিষয়ের বিষে, মজিয়া সতত,
করি শুধু অভিমান॥

প্রাণকান্ত হে!

(তোমায়) দিনান্তে বারেক, ডাকিতে পারি না,
অকপটে হৃদি খুলে।
জীবনে হ'ল না, প্রেমের উদয়,
অঙ্কুর নাহি যে মূলে॥
কি হবে আমার, বল বল নাথ!
দিন গেল মোর বৃথা।
যত দিন যায়, ততই বাড়িছে
প্রাণের মরম ব্যথা॥
কাহাকে বা বলি, কেহ না শুনিবে,
কোথা গেলে বাঁচে প্রাণ।
(তাই) মরিতে বাসনা, হয়েছে আমার,
গেয়ে তব নাম-গান॥
জীবনে হ'ল না মরিলে কি হবে,
নামে রুচি তব, নাথ!
গৌর ভকত, কৃপা করি কর,
(মোর) মাথায় চরণাঘাত॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, জীবন ত্যজিব,
এ বড় উচ্চ আশা।
হবে কি কপালে, এ হেন সুদিন,
হরি যে করম-নাশা॥
হরিদাসিয়ার, বাঁচিবার সাধ,
প্রিয়াজির মুখ চাহি।
প্রিয়াজি থাকিতে, মরিবে না সে যে,
(মরিবার) অবসর তার নাই॥

গৌর-গীতিকা।

এতক্ষণে গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রেমালিঙ্গন-ভুজবন্ধন ছিন্ন করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু তাঁহার কোন কথা কহিবার শক্তি নাই—আলুথালু বেশ—উন্মুক্ত রুক্ষকেশদামে মলিন বদনখানি সমাবৃত। দুখিনী প্রিয়াজির মলিন বদনচন্দ্রখানি আর দর্শনের সুযোগ নাই—শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় নয়নজলে তাঁহার বক্ষ পরিপ্লাবিত—পরিধান বস্ত্রখানি পরিসিক্তি,—তিনি যেন আজ বড়ই অসম্বর। তাঁহার মস্তকের নিজ নয়ন-জল-সিক্ত রুক্ষকেশ-দাম গৌর-চরণ-স্পৃষ্ট ভূমিচুম্বিত ও কর্দ্দমাক্ত। গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের ভূমিতল গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার পক্ষে বড় সুশীতল। উহা গোলোকভূমি অপেক্ষাও তাঁহার প্রিয় বস্তু। তিনি নিত্য গৌর-পদ-রজ-সিক্ত গৌর-গৃহের ধূলি খুঁটিয়া খাইতেন—শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত গৌর-পদরজস্পৃষ্ট ভূমিতে পরম প্রেমভরে দিবা রাত্রি গড়াগড়ি দিতেন—গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের ভূমিতলই তাঁহার শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ সকলই—ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে ধূলিমাখা বসনে তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রেম-সেবা করেন—আর তাঁহার চরণে তিনি সর্ব্বক্ষণ সকরুণ কাতর প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করেন,—

ঐ—"চরণের তলে বসিয়া বিরলে,
ভিজাইব মাটি নয়নের জলে,
কাহাকেও কিছু বলিব না।
মনে মনে ক'ব, কিসে যোগ্য হব
ঐ—চরণের রেণু, চরণে মিশাব
পদ হ'তে দূরে থাকিব না।
ঐ—চরণের তল, বড় সুশীতল,
সব জ্বালা যায়, যায় হায় হায়,
পদ রজ দিতে ভুলিও না॥

হরিদাসিয়ার জীবনের সার,
পদ পাখালন চরণ-সেবন,
নদীয়ার রজে অঙ্গ বিলেপন,
বঞ্চিত তাতে করিও না "

গৌর-গীতিকা।

গৌরশূন্য গৌর-গৃহের গৌর-পদ-রজকণার লোভে চতুর্ম্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রলোচন প্রভৃতি দেবগণ নদীয়ার মহা-গম্ভীরা মন্দিরের বহির্দ্বারে দীঘল হইয়া পড়িয়া আছেন—শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত দেবদেবী-দুর্লভ গৌর-পদরজের একমাত্র সত্বাধিকারিণী সনাতন নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। নদীয়া-মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে তিনি আজ মহা তপস্বিনীর বেশে এই দেবদুর্লভ বস্তু এক চেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন।—নদীয়ার মহা-গম্ভীরার দ্বার বন্ধ—এখানে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—ব্রহ্মাদি দেবগণও বহির্দ্বারে বাঙ্গালির কাঙ্গাল ঠাকুরের এক বিন্দু পদরজের জন্য এক বিন্দু চরণামৃতের জন্য কাঙ্গাল বেশে ধুল্যবলুণ্ঠিত-দেহে অলক্ষ্যে পড়িয়া ধন্না দিতেছেন। সখি কাঞ্চনা নিজ ভাবোচিত গানের ধুয়া ধরিলেন—

মহাবাগ।

"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিবর্ত্ত-বিলাস-যুগল হে!
ব্রহ্মাদি শঙ্করে, যে লীলা দর্শন করে,
করযোড়ে শচীমায়ের দ্বারে হে।
যাহারও মহিমা, বেদে না পায় সীমা,
সেই ধন নদীয়ায় উদয় হে!"—

এখনও বিরহিণী-গৌর-বল্লভা নিব্বাক, নিস্পন্দ! সখিদ্বয় তাঁহার নয়ন-সলিল-সিক্ত, গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের গৌরপদ-রজ কর্দ্দমাক্ত আলুলায়িত রুক্ষ কেশদাম-গুচ্ছগুলি দুই হস্তে দুই জনে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সরাইয়া দিতেছেন।—কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা নিজ বসনাঞ্চলে গৌরবিরহিণীর অশ্রুজলসিক্ত মলিন বদনখানি ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিতেছেন—কিন্তু বিরহিণী প্রিয়াজির তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই—এক্ষণে তাঁহার স্তম্ভ ভাব,—তিনি জড়বৎ যথাস্থানে বসিয়াই আছেন—আজ তাঁহার শুষ্ক বদনখানি মলিন হইতেও মলিন—বিষাদ-ভরা সমগ্র বদনমণ্ডলের ভাবই আজ যেন অন্যরূপ—বৈরাগ্যের একটা নবনবায়মান অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশক নবীন ছাঁদে আজ যেন গৌর বিরহিণী প্রিয়াজির ক্ষীণ দেহখানি গঠিত। সখিদ্বয় সকলি বুঝিতেছেন—তাঁহাদের আত্মগ্লানির আজ সীমা নাই,—বিশেষতঃ সখি অমিতা ত জীবন্মৃতা হইয়াছেন,—তিনি মরমে মরিয়া আছেন।

এই ভাবে অনেকক্ষণ গেল—তখন রাত্রি ছয় দণ্ড হইয়াছে—শারদীয়া শুক্লা পঞ্চমীর রাত্রি—কার্ত্তিক মাস—পরদিন সারদীয় উৎসবের ষষ্ঠীর বোধন—নদীয়া নগরে বহু স্থানে সারদীয় উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে—পূজার বাদ্য বাজিতেছে—কে কার খবর রাখে—নদীয়া-বাসী গৌর-ভক্তগণ জীয়ন্তে মৃতবৎ হইয়া নিজ নিজ গৃহমধ্যে লুক্কায়িত আছেন—নদীয়া বিনোদিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সন্যাস গ্রহণের দিন হইতেই তাঁহারা সর্ব্ববিধ আনন্দ উৎসব একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের সকল আনন্দোৎসবের যেন সমাধি হইয়াছে সেই দিন—সেই কাল রাত্রি হইতে। গৌর-শূন্য গৌর গৃহদ্বারে তাঁহাদের সকল আনন্দোৎসবের সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সেখানেই তাঁহারা রাত্রি দিন পড়িয়া থাকেন—তাঁহাদের মুখে সর্ব্বক্ষণ,—

"শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোর চন্দ্র!
শ্রীনাথ-বিশ্বম্ভর-নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন-চিত্ত-চৌর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!!

এই গৌর-বিরহ-গীতিই তাঁহাদের সম্বল—তাঁহাদের ভজন-সার।

অনেকক্ষণ এই ভাবে প্রিয় মর্ম্মী সখিদ্বয়ের অন্তরঙ্গ-সেবা গ্রহণ করিয়া দয়াময়ী গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী সখী-দ্বয়ের মর্ম্মান্তিক দুঃখ বুঝিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মলিন বদন খানি একবারে তুলিলেন,—গৌরানুরাগ-রঞ্জিত রক্তবর্ণ উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয় একবার উন্মিলন করিলেন। গৌরবিরহিণী গৌর-বল্লভার চক্ষে আজ একটী অপূর্ব্ব নবভাবের জ্যোতি প্রতিভাত হইল—সে জ্যোতি পরম স্নিগ্ধকর—পরম তৃপ্তি-কর—পরম প্রেমানন্দ-ব্যঞ্জক! দু'টি ক্ষীণ হস্তে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের কণ্ঠদেশ পরম প্রেমভরে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া দুই জনেরই মলিন ও বিষাদময় বদনের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া মনে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন—কি বলিয়া তাঁহা-দিগকে সান্ত্বনা করিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না—আজ এই মূর্ত্তিমতী গৌর-বিরহ-বিগ্রহটির যেন স্বরূপ ও স্বভাবের

বিস্মৃতি হইল। তিনি আকুল প্রাণে এবং পরম ব্যাকুলিত অন্তঃকরণে স্বহস্তে গৌর-বিরহতাপদগ্ধ-নয়ন-সলিল-সিক্ত মলিন বসনাঞ্চলে স্বয়ং একে একে সখিদ্বয়ের নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিতেছেন—এ দৃশ্যটি বড়ই প্রাণস্পর্শী—বড়ই মর্ম্ম-ঘাতী—বড়ই মর্ম্মন্তুদ। যদি জীবাধম লেখক চিত্রকর হইতেন—নদীয়া-গম্ভীরা-মন্দিরের এই বিষাদময় অপূর্ব্ব চিত্রটি অঙ্কণ করিয়া কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দকে প্রেমোপহার প্রদান করিয়া ধন্য হইতেন। চিত্রাঙ্কণ পারদর্শী যে গৌর-ভক্তবরের সে সৌভাগ্য আছে—তিনি তাহা করিবেন—করিলে জীবাধম লেখক আজীবন তাঁহার চরণের দাস হইয়া থাকিবেন।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি এতক্ষণ পরে অতি ক্ষীণ স্বরে মৃদু মধুর বচনে মাত্র একটী কথা কহিলেন—"সখি! প্রিয়সখি। তোমরা যে বলিলে—

"গৌরাঙ্গ বলিয়া পরাণ ত্যজিব,
এ বড় উচ্চ আশা।"

একথা অতি সারবান কথা—সর্ব্ব ভক্তিশাস্ত্রে তার-স্বরে এই কথারই ধ্বনি দিয়াছেন। সখি! এখন আমার দশমী দশার-শেষ দশা,—সেই শেষের দিনের শেষ সম্বল আমার গৌর-নাম। সখি! প্রাণ সখি! মরিতে ত হবেই—তবে মরণকালে তোমরা আমার একটী উপকার করিবে। এই উপকারের ক্ষীণ আশাটুকু আমি অভাগিনী বহুদিন ধরিয়া এই পাপ-হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি—আজ সুযোগ ও সুবিধা পাইয়া কহিতেছি—সখি! মন দিয়া শুন। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা বিপ্রলম্ভরসাত্মক দশমী দশার সীমা দেখাইয়া স্বয়ং গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
গোরা হেন গুণনিধি কাকে দিয়া যাব॥
তোমরা প্রাণের সখি থেকো মোর সঙ্গে।
মরণ কালে গৌর নাম লিখো মোর অঙ্গে॥
কাঞ্চনা প্রাণের সখি (গৌর) নাম দিও কানে।
মরা দেহ নড়ে যেন গৌর নাম শুনে॥
না পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখ নিম্ব বৃক্ষ ডালে।
কবহুঁ যদি পিয়া আসে নিজ জন্মভূমে।
পরাণ পাওব হাম পদ দরশনে॥
পুন যদি চাঁদ মুখ হেরি এক বার।
গৌর গৌরাঙ্গ বলি উঠিব আবার॥"

সখিদ্বয় উৎকর্ণ হইয়া আজি তাঁহাদের বিরহিণী প্রিয়াজির মৃদুমধুর ক্ষীণ কণ্ঠের উৎকট গৌর-বিরহ-রস-সীমার চরম বিরহগীতি শুনিতেছেন—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহাদের নয়ন-সলিল-সম্পাতে সেখানে প্রেম-মন্দাকিনীর একটী উৎস উঠিয়াছে—তাঁহাদের প্রেমাশ্রু-ভারাক্রান্ত বিপ্রলম্ভরস-লোলুপ নয়নদ্বয় গৌর-বল্লভার বদনমণ্ডলের প্রত্যেক অংশে এবং প্রতি অঙ্গে যেন লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বিরহিণী প্রিয়াজিরও নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তিনি পরমা ধৈর্য্যবতী হইয়াও আজ পরম অধৈর্য্য হইয়া প্রেমাবেশে সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন—তাঁহার শেষ কথা বলা আর হইল না—যেন প্রাণের কথার কিয়দংশ প্রাণের মধ্যেই রহিয়া গেল।

এরূপ অবস্থায় যে কতক্ষণ চলিয়া গেল—তাহা কাহারও জানিবার উপায় নাই—গৌর বল্লভা ও তাঁহার সখিদ্বয়ের সান্ধ্য-গৌরভজন আজ এই ভাবেই হইল—জপমালা নিকটেই আছে—কিন্তু কেহ তাহা স্পর্শ করিবার অবসর পাইলেন না।

পরম ধৈর্য্যশালিনী নবদ্বীপময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আপনা আপনিই আত্মসংবরণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কোমল প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল তিনি তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—করুণাময়ীর করুণাকণা তাঁহার নয়ন-জলে মিশ্রিত হইয়া জগজ্জীবের ত্রিতাপ জ্বালা নাশ করিতেছে—দয়াময়ী গৌর-বক্ষ-বিলাসিনীর দয়ার সীমা নাই—তিনি আপন দুঃখ সব ভুলিয়া গিয়া সখিদ্বয়ের কণ্ঠদেশ তাঁহার দুটী ক্ষীণ বাহু দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাদের কর্ণের নিকট বদন লইয়া গিয়া কোন গুপ্ত কথা বলিবার যেন একটা ক্ষীণ চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তাহা বলিতে পারিলেন না—তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন রোধ হইয়া আসিল। নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার প্রাণ-বল্লভ রাত্রিতে একাকী থাকেন—তাঁহার এত অনুরাগী ভক্তবৃন্দ থাকিতে কেহ তাঁহার নিকট রাত্রিতে শয়ন করেন না কেন? এ

বিষয়ে তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য—পণ্ডিত দামোদর এবং পণ্ডিত জগদানন্দকে দিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে এই কথাটি নীলাচলের ভক্তবৃন্দের চরণে নিবেদন করিবার বাসনা গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদয়ে জাগরিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইতিপূর্ব্বে সখি অমিতার মুখে তিনি যে মর্ম্মন্তুদ প্রাণঘাতী কথাটি শুনিয়াছেন—তাহা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে নিরন্তর ক্ষণে ক্ষণে শেল বিদ্ধ করিতেছে। সেই কথাটি অতি গোপনে মর্ম্মী সখিদ্বয়কে বলিবার জন্য বিরহিণী গৌর-বল্লভার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় প্রেমাবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল—মনের কথা মনেই রহিয়া গেল—প্রাণের ব্যথা প্রাণেই রহিল—আর বলা হইল না।

সখিদ্বয় পরম ব্যাকুল হইয়া বিরহিণী প্রিয়াজিকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কত না সাধ্য সাধনা করিতে লাগিলেন—কিন্তু পরমা ধৈর্য্যবতী গৌর-বল্লভা আর কিছু বলিলেন না। তিনি নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—তাঁহার উষ্ণ-নয়ন-সলিলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনঃকথা ও মনব্যথা যেন দ্রবীভূত হইয়া তরল পদার্থের ন্যায় বাহির হইয়া পড়িল—গৌর শূন্য গৌর-গৃহের পূত ভূমিতল তাহাতে সিক্ত হইল। গৌর-পদরজ-স্পৃষ্ট ভূমিতলে গৌর-বক্ষবিলাসিনীর মনোবাসনা চিরতরে প্রোথিত হইল,—সেই খানেই তাহার পূর্ণ সমাধি হইল।

অন্তর্য্যামিনী গৌর-বল্লভার কায়ব্যূহ তাঁহার সখিদ্বয়ও অন্তর্য্যামিনী—শুধু জগজ্জীবের অন্তর্য্যামিনী তাঁহারা নহেন—গৌর-বল্লভারও অন্তর্য্যামিনী—কারণ তাঁহারা ব্রজগোপিনী স্বরূপা "নদীয়া নাগরী" নামধারিণী নিত্যসিদ্ধা,— অনাদি অনন্ত কাল হইতে গৌর-কৃষ্ণ-বল্লভার নিত্য সখি। গৌর-বল্লভার মনে যে ভাবটী যখন উত্থিত হয়—তখনই তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন—এবং তদ্ভাবানুযায়ী সেবা দ্বারা তাঁহার মনস্তুষ্টি করেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির তাৎকালিক মনোভাব বুঝিয়াই গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মলিন বদনখানি নিজ বসনাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া অতি গোপনে মৃদু মধুর বচনে কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রিয়সখি! প্রাণের সখি! তোমার প্রাণ-বল্লভের প্রাণপ্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সে ব্যবস্থা করিয়াছেন—শঙ্কর নামক মহা ভাগ্যবান একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সাধুমহাপুরুষ নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে এখন তোমার প্রাণ-বল্লভের নিকটে রাত্রিকালে শয়ন করিবার অধিকার পাইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার ভক্তগণের কাতর প্রার্থনায় এই সেবা অঙ্গীকার করিয়া ভক্তগণের মনে সুখ দিয়াছেন। তাঁহার ভক্তগণ শঙ্কর ঠাকুরের নাম রাখিয়াছেন—"প্রভুর পাদোপধান"। এক্ষণে তোমার চরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা,—তুমি তোমার এই দাসীদিগের অনুরূপ প্রার্থনাটি মঞ্জুর করিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে কিনিয়া লও—তাহাদের প্রাণে শান্তি-বারি পরিসিঞ্চন করিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচাও। তোমার পূর্ব্ব রাত্রির মর্ম্মভেদী ও প্রাণঘাতী লীলাকথা স্মরণ করিয়া দেখ দেখি সখি! আমাদের মধ্যে এক জনকে কৃপা করিয়া রাত্রিকালে তোমার শয়ন-মন্দিরে শয়নের অধিকার দান করিয়া কৃতার্থ কর।"

পরমা ধৈর্য্যবতী গৌর-বল্লভা অতি ধীর ভাবে একে একে সকল কথাগুলিই শুনিলেন—হঠাৎ কোন উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবিলেন—যেন তিনি ধ্যানমগ্না। তাহার পর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সখিদ্বয়ের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! প্রাণসখি! তোমার একটী কথায় মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম—তুমি বলিলে "আমার চরণে" প্রার্থনা করিতেছ। সখি! প্রাণসখি! তোমরা আমার গৌর-প্রেমের গুরু—গৌর-কথা-সুধা-রসের মূল ভাণ্ডারী তোমরা,—তোমরাই আমার জীবন-সম্বল। গৌর-কথা-সুধা নিরন্তর সিঞ্চন করিয়া এই তুচ্ছ প্রাণটীকে এখন পর্য্যন্ত তোমরাই জীবিত রাখিয়াছ—তোমাদের চরণে আমি শত অপরাধিনী—এমন কথা তুমি মুখে আনিলে কি করিয়া সখি! তাহা আমিত বুঝিতে পারি না।"

দ্বিতীয় কথা—"তুমি যে শুভ সংবাদটী আমাকে দান করিলে ইহার প্রতিদান দিবার আমার কিছুই নাই—তোমাদের নদীয়া-নাগর গৌরকিশোর তোমাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করুন,—তাঁহার চরণে ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা।"

তৃতীয় কথা—"তোমাদের মনবাঞ্ছা ও প্রার্থনা আমি সখি! কি করিয়া পূর্ণ করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। আমি তোমাদের নদীয়া-নাটুয়া গৌর-সুন্দরের দাসীর দাসীরও যোগ্যা নহি—যদি কোন জন্মে সে যোগ্যতা লাভ করিতে পারি—এই জন্যই এই কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমার মত অভাগিনী ত্রিজগতে আর একটী খুঁজিয়া পাইবে না।

তোমাদের জীবন-সর্ব্বস্ব-ধন নবদ্বীপচন্দ্রের আদেশেই আমার এই কঠোর তপস্যার সূত্রপাত। আমার মত মন্দভাগিনীর পক্ষে তিনিই উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়াছেন—ইহাতে তিনি আমার প্রতি তাঁহার অসীম কৃপার পরাকাষ্ঠাই দেখাইয়াছেন। আমি তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তাঁহার অপেক্ষাও কঠোর ভজন-প্রণালী আমার পক্ষে বিধান করিতে,—দীন দয়াময় প্রাণ-বল্লভ আমার এই দীনার প্রতি করুণা করিয়াই এইরূপ কঠোর বিধিবিধানের আদেশ করিয়াছেন। সখি! প্রিয়সখি! ক্ষমা করিবে আমি আমার প্রাণ-বল্লভের আদেশ যেন যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই,—এই আশীর্ব্বাদ তোমরা আমাকে কর। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধিলাভ হইবে।"

এই কথা কয়েকটী গুছাইয়া বলিতে দুর্ব্বলশরীর গৌর-বল্লভার যেন প্রাণান্ত হইল। এত কথা একত্রে তিনি পূর্ব্বে কখন বলেন নাই। তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম হইয়া আসিল দেখিয়া সখি কাঞ্চনা তাঁহার বদনখানি নিজ হস্তে সস্নেহে চাপিয়া ধরিয়া আর কথা কহিতে দিলেন না। সখিদ্বয়ও আর কোন কথা না কহিয়া দুই জনে মিলিয়া গৌর-বল্লভার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির তৃষ্ণা লাগিয়াছিল,—ঠাকুরের চরণামৃত আনিয়া দিলেন। চরণামৃত পান করিয়া তিনি একটু তন্দ্রার ভান দেখাইলেন—সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের চরণচিন্তা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি গৌর-কান্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা—তাঁহার প্রাণকান্ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ স্বতন্ত্রপুরুষ—স্বয়ং ভগবান,—তাঁহার স্বরূপশক্তিও স্বতন্ত্রা পরাপ্রকৃতি এবং স্বয়ং ভগবতী। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে যে ভাবে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা কঠোর হইতেও কঠোরতম। পতিব্রতা-শিরোমণি প্রিয়াজি পতি-আজ্ঞা যথাযথ পালন করিতেছেন—তাঁহার নিয়ম-নিষ্ঠা পাষাণের রেখার মত,—তবে যে দিবাভাগে কখন কখন তিনি তাঁহার রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দিরের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া সখিসঙ্গে গৌরকথা কহেন বা শুনেন—সেটি তাঁহার বিশিষ্ট ভজনাঙ্গ। তাঁহার আত্মসেবা-তাৎপর্য্যময়ী সখিদের বাসনা পূরণকে তিনি ভজনাঙ্গ বলিয়া মনে করেন না। তবে ভক্তবাৎসল্যে তাঁহার প্রাণ-বল্লভ যেরূপভাবে অন্তরঙ্গসেবা গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার অনুকরণ করিতেও তাঁহার প্রাণ-বল্লভার ইচ্ছা হয় না। এই কারণেই স্বতন্ত্রা গৌর-বল্লভার এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে গৌর-বল্লভার কায়ব্যূহ সখিদিগের মনে আত্মসুখ তাৎপর্য্যময়ী এইরূপ বাসনার উদ্রেক হইল কেন? তাঁহাদের ত সকল বাসনাই গৌর-কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্যময়ী। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—এই আত্মসুখে নিত্যসিদ্ধা সখিদিগের প্রকৃত পক্ষে আত্মসুখ তাৎপর্য্য নাই—ইহা স্বয়ংভগবতী গৌর-প্রিয়া-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী বাসনা। কিন্তু এই সময়ে বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন প্রলুব্ধচিত্তা গৌর-কান্তা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পক্ষে তাঁহার আত্মসুখ তাৎপর্য্যময়ী সখিদের এই বাসনা তাঁহাদের পক্ষে দূষণীয় না হইলেও প্রিয়াজির পক্ষে তাঁহার কঠোর ভজন সাধন-প্রণালীর প্রতিকুল। এই জন্য তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গা মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অক্ষম বলিয়া তিনি নিজে পরম দুঃখিত এবং মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট পাইয়া নীরবে গৌর-পাদ-পদ্ম স্মরণ করিয়া মর্ম্মী সখিদিগের প্রাণে শান্তি দানের জন্য তাঁহার চরণে কাতর প্রার্থনা করিতেছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা সকলই বুঝিয়াছেন—তাঁহারাও সর্ব্বজ্ঞা—তাঁহাদের প্রিয়সখির মনের কথা তিনি মুখে সকল প্রকাশ করিতে না পারিলেও তাঁহারা তাহা সকলই জানেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভার এই অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-লীলারসাস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণের ন্যায় তাঁহাদের পরমাস্বাদনীয়।

এক্ষণে রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা আপনা আপনিই ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—সখিদ্বয় সুশীতল জল আনয়ন করিলেন—তিনি হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন এবং ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সখিদ্বয় মন্দির-দ্বারে বসিয়া তাঁহাদের প্রাণসখির অন্তকার লীলারঙ্গ-রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। সংখ্যানাম জপও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া পাদ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ দেওঘর
১লা অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ সাল
সোমবার—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(১০)

গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বহির্দ্বারে আসিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের একান্ত অন্তরঙ্গ মর্ম্মী-ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইরা নিত্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় গৌর-কীর্ত্তন করিতেন। কীর্ত্তন-লম্পট নদীয়া-নাটুয়া গৌর-সুন্দরের আদেশ ছিল তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার প্রতি—

—"শুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব-জননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্ত মনে গুণি॥
কলিকাল-সর্পে দংশিবে সর্ব্ব জীবে।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা কিছু না করল সবে॥
তুমি না থাকিলে হবে সঙ্কীর্ত্তন বাদ।
নবদ্বীপ লৈয়া হৈবে বড়ই প্রমাদ॥"

জঃ চৈঃ মঃ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের এই আদেশবাণী তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের কিছু পূর্ব্বের কথা।

পতিব্রতা-শিরোমণি গৌর-বল্লভা তাঁহার প্রাণবল্লভের এই আদেশবাণী জীবনান্ত পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহারই কৃপাকটাক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ কীর্ত্তনে সর্ব্বদা মুখরিত। তাঁহার প্রাণবল্লভের এই গুপ্ত উপদেশ ও আদেশবাণী প্রচার না করিলে পতি-আজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে পালন হয় না—এই ভাবিয়া তাঁহার পুরাতন ভৃত্য ঈশানের দ্বারা নদীয়ার ভক্তবৃন্দের মধ্যে এই আদেশবাণী প্রচার করিতে প্রিয়াজি অনুমতি দিয়াছিলেন। গৌর-বিরহ-দগ্ধ ভক্তগণ এই জন্ম এত দুঃখের মধ্যেও নিত্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় নগর-কীর্ত্তনের দল লইয়া গৌরশূন্য গৌরগৃহ পরিক্রমা করিতেন।

অন্ত গৌর-শূন্য গৌর-গৃহদ্বারে তাঁহারা প্রভাতী কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিয়াছেন,—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ভজন-মন্দিরে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণে এই কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি প্রবেশ করিল। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা উৎকর্ণ হইয়া এই মধুর কীর্ত্তন শুনিতেছেন—আর তাঁহারা প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া মনে মনে ভাবিতেছেন "বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ" নামটী কি মধুর—বিরহিণী প্রিয়াজি এই কীর্ত্তন শ্রবণে পরমানন্দ পাইবেন। এই ভাবটী মনে উদয় হইতেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গৌর-বল্লভা তাঁহার সখিদিগের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্মই যেন তাঁহার ভজন-মন্দিরের দ্বারোন্মোচন করিয়া হটাৎ বাহিরে আসিলেন গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির হস্তে জপমালা—গাত্রে নামাবলী—কণ্ঠদেশে ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা, এবং তৎসঙ্গে লম্বমান আর একগাছি ছোট তুলসীর জপমালা,—গৌরপ্রেমোন্মাদ রসে তাঁহার নয়নদ্বয় ঢুলুঢুলু এবং সর্ব্বক্ষণ গৌরানুরাগ-রঞ্জিত। সমস্ত রাত্রি জাগরণে তিনি অবশাঙ্গ—প্রতি পদবিক্ষেপে তিনি যেন ঢলিয়া পড়িতেছেন। বাহিরে আসিয়াই প্রিয়াজি গঙ্গা দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—সুরতরঙ্গিনী-তটের প্রাতঃকালীন মৃদুমন্দ বায়ু সেবনে যেন তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন—সখিদ্বয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। বিপ্রলম্ভ-রস-ভাবোন্মত্তা প্রিয়াজির মুখে কোন কথা নাই —তিনি মৃদু মন্দপাদবিক্ষেপে শ্রীমন্দির-বারান্দায় পাদচারণ করিতেছেন। এবং সংখ্যানাম জপও করিতেছেন। আনুসঙ্গিকভাবে গৌরকীর্ত্তন শ্রবণও হইতেছে।

কীর্ত্তনের দল পুনরায় ধুয়া ধরিলেন,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী।"

গৌরশূন্য নদীয়ার নিস্তব্ধ প্রভাত—গগনভেদী সুমধুর এই কীর্ত্তনধ্বনি প্রাতঃসমীরণসহ নদীয়ার পথ ঘাটে এবং নদীয়াবাসীর গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সে ধ্বনির প্রভাবে সর্ব্ব নর নারীবৃন্দের প্রাণে যেন আজ একটা নব-ভাবের গৌর-প্রেমানুরাগের নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। "বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ" "বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ", "বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ", নদীয়াবাসী নরনারীর বড় প্রিয় নাম। এই নাম-কীর্ত্তনে নদীয়া-বাসিনী কুলনারীবৃন্দেরও বিশিষ্ট অনুরাগ। তাঁহারাও গৃহে গৃহে এই গৌরনাম কীর্ত্তন পারিবারিক উপাসনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ পাইতেছেন।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি সখিদ্বয়সহ তাঁহার ভজন-মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই অপরূপ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন —কাহারও মুখে কোন কথা নাই—তাঁহাদিগের মানস-সরোবরে যে আজ একটী নবভাবের অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গ খেলিতেছে। তাঁহারা সকলেই নীরব—যেন তিনটী ধ্যান-মগ্না চিত্রপুত্তলিকা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সর্ব্বশেষে উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে আর একটি নূতন গৌরকীর্ত্তন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ,
(ঐ) নেচে চলে যায়।
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়॥
নদের পথে নিতাই সাথে—
(ঐ) নেচে চলে যায়।
হেমদণ্ড বাহু তুলে, হরে কৃষ্ণ হরি ব'লে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ
(ঐ) নেচে চলে যায়।
নবীন নাটুয়া সাজে, চরণে নূপুর বাজে
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গোরা
(ঐ) নেচে চলে যায়॥
পরণে কোঁচান ধুতি, কটিতে উড়ানি বাঁধি,
বিষ্ণুপ্রিয়ার মন-চোরা,
নদেবাসীর প্রাণ-গোরা,
(ঐ) নেচে চলে যায়।
মালতীর মালা গলে, পবন হিল্লোলে দোলে,
উর্দ্ধবাহু হ'য়ে গোরা
হরি নাম গায়॥
চন্দন-চর্চ্চিত-দেহে, কুসুমের গন্ধ বহে,
জগজন মুগ্ধ হয়
বদন শোভায়।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গোরা
(ঐ) নেচে চলে যায়।
তোরা দেখবি যদি আয়।
ওগো সব নদেবাসী
ছুটে চলে আয়॥
হরে কৃষ্ণ হরি বলি, দু'টি বাহু উর্দ্ধে তুলি,
(সোনার গৌরাঙ্গ আমার)
পতিত জীবেরে ডাকে
আয় আয় আয়।
প্রেমভরে ডেকে ডেকে
(গোরা) দেয় কোল যাকে তাকে,
(ও তার) নয়নেতে ধারা বহে
(দেখে) প্রাণ ফেটে যায়।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গোরা
(ঐ) নেচে চলে যায়।
তোরা দেখবি যদি আয়॥

প্রেমেতে পাগল পারা, জীব দুখে কাঁদে গোরা,
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে,
(পুনঃ) ধরাতে লুটায়

(গোরা) হুঙ্কার করিয়া বলে,
পাপী-তাপী আয়রে চলে,
গোলোকের ধন দিব
(তোরা) আয় চলে আয়।

সোনার অঙ্গে ধূলি মেখে,
নদের পথে নিতাই সাথে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ,
(ঐ) নেচে চলে যায়।

ছুটে আয় হরি বলি,
নদে বাসী নর নারী
(তোরা) দেখবি যদি আয়॥

(কলিজীবের হাতে ধরে, গৌরহরি বলেরে—)
প্রেমধন এনেছি আমি, অসাধন চিন্তামণি,
গোলোক হ'তে তোদের তরে
(তোরা) আয় ছুটে আয়।

(গোরা) উর্দ্ধ বাহু হ'য়ে ডাকে,
(বলে) বিলাইব যাকে তাকে,
গোলোকের প্রেমধন—
(আচণ্ডালে) দিব সবে আয়।

(যে) বল্‌বে হরি একটিবার,
সেই ত পাবে সুধাধার,
(তবে) মিটবে তার ভবক্ষুধা,
যাবে হায় হায়।
(তোরা সবে) আয় আয় আয়॥

হরে কৃষ্ণ হরে রাম, বল্‌রে মুখে অবিরাম,
পরমায়ু অল্প তোদের
সময় ব'য়ে যায়।
(তোরা) আয় চলে আয়।

দু'হাত যুড়ি বলে হরি,
ভজিলে গৌরাঙ্গ হরি,
কলিজীবে অনায়াসে
প্রেম ধন পায়।
(তাঁর) চরণে শরণ নিলে,
গোলোকের ধন মিলে,
ত্রিতাপের জ্বালা যায়
যায় হায় হায়।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গোরা
(ঐ) নেচে চলে যায়॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

এই অপূর্ব্ব নবভাবের গৌরকীর্ত্তন লইয়া নদীয়ার গৌর-ভক্তগণ প্রেমানন্দে নাচিয়া নাচিয়া আত্মহারা হইয়া গৌর-শূন্য গৌর-গৃহ পরিক্রমা করিলেন এবং বহির্দ্বারে সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নগরকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। এই অপূর্ব্ব গৌর-কীর্ত্তনধ্বনি দূর হইতে যতক্ষণ শুনা গেল,—গৌর-বল্লভা সখিদ্বয় সহ ততক্ষণ সেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া প্রেমানন্দে শুনিতে লাগিলেন।

সূর্য্যদেব নদীয়া-গগণে উদিত হইয়াছেন—স্নিগ্ধ প্রাতঃ-সূর্য্যকিরণে নদীয়ার ঘাট-বাট তরু-তৃণ-লতা, জীব-জন্তু, স্থাবর জঙ্গমাদি উদ্ভাসিত,—নগরে আজ কীর্ত্তন খুব জমিয়াছে—অসংখ্য লোক প্রেমানন্দে কীর্ত্তনের সঙ্গে চলিয়াছে—নদীয়া-বাসিনী কুলনারীবৃন্দ গৃহের উপরিভাগে এবং দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শঙ্খ বাজাইয়া শুভ হুলুধ্বনি দিতেছেন—বাল বৃদ্ধ-নারী সকলের মুখেই আজ সেই এক কথা—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ
(ঐ) নেচে চলে যায়।"

আজি কীর্ত্তনে নদীয়া-নাটুয়া সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব হইয়াছে—সকলেই যেন দেখিতেছে তিনি যেন কীর্ত্তনের পুরোভাগে শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-হরিদাসাদি ভক্তবৃন্দসহ প্রেমাবেশে কটি দোলাইয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। এই যে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বরের সঙ্কীর্ত্তনে আবির্ভাব ইহা শাস্ত্র বাক্য,—

"মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"—

সর্ব্ব নদীয়ায় আজ প্রেমানন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে,—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ
(ঐ) নেচে চলে যায়"—

গৌর-প্রেমানন্দ-সাগরে আজ নবদ্বীপবাসী নর নারীবৃন্দ হাবুডুবু খাইতেছে। নব ভাবের এই গৌর-কীর্ত্তনে আজ নবদ্বীপবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছে।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার আজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে কিছু বিলম্ব হইল। তিনি এই অপূর্ব্ব গৌরনাম-কীর্ত্তন শ্রবণে আজ গৌর-বিরহ-জ্বালা কথঞ্চিৎ ভুলিয়াছেন—তাঁহার বদনে প্রসন্ন ভাব লক্ষিত হইতেছে—নয়নের প্রেমধারায় মধুর স্নিগ্ধতা প্রকাশ পাইতেছে—তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ সখিদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া পরম প্রেমভরে মহা লজ্জিতভাবে চুপি চুপি বলিলেন—"সখি! আজ আবার একি এক নবভাবের কীর্ত্তন শুনিলাম—আমার যে বড় লজ্জা করিতেছে সখি! আমার মত মন্দভাগিনীর নাম আমার প্রাণবল্লভের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া আমাকে এত লজ্জা দিবার প্রয়োজন কি বুঝিলাম না। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ যে এমন বহুবল্লভ হইয়াছেন, তাহা কি ভক্তগণ জানেন না?" এই বলিয়াই প্রিয়াজি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্দর মহলে প্রবেশোদ্যত হইলেন। কিন্তু সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন—"প্রিয় সখি! তোমার প্রাণবল্লভ বহুবল্লভ হইয়াও তোমারই প্রাণনাথ তিনি—সখি! তুমিও তাঁহার কান্তাশিরোমণি—কান্ত-মুকুটমণি—যেমন বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা যশোদানন্দন গোপী-জনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কান্তাশিরোমণি—সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও নাগরীজন-বল্লভ শচীনন্দন শ্রীগৌর-চন্দ্রের কান্তাশিরোমণি। ইহা নূতন কীর্ত্তন নহে—নব-ভাবও ইহাতে কিছু নাই,—যুগে যুগে শ্রীভগবতকান্তাগণের নামের সহিত শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন পরম শ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া বহু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।"

গৌর-বল্লভা এই কথা শুনিয়া হঠাৎ যেন আনমনা হইলেন—ঐশ্বর্য্যভাবের কথা শুনিলে প্রিয়াজির মনে এইরূপ ভাবই উদয় হইত। কিছুক্ষণ তিনি আনমনা রহিলেন—পরে সখি কাঞ্চনার দু'টী হস্ত ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে নির্জ্জনে গিয়া মৃদুমধুর বচনে কহিলেন—"প্রিয়সখি! তোমাদের নদীয়া-নাগর শচীনন্দনকে আর সকলে ভগবান বলে বলুক—

তোমরা ওকথা কখন মুখে আনিও না—তোমাদের মুখে ওকথা একেবারেই শোভা পায় না—তিনি আমাদের শচীনন্দন গৌর-হরি—শচীর দুলাল গৌর-কিশোর—নদীয়া-নাটুয়া গৌর-সুন্দর—নদীয়া-বিনোদিয়া নাগরেন্দ্রচূড়ামণি—নদীয়া বাসীর প্রাণগৌরাঙ্গ—সঙ্কীর্ত্তন-লম্পট—নদীয়া-নাগর। আর শেষ কথা তিনি তোমাদের অভাগিনী সখি **বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ**। ইহার অধিক আর কোন ভাবই সখি! তোমাদের মনে উদয় হইতে পারে না। তোমাদের ভাব বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়—ব্রজগোপীদিগের মত ঐশ্বর্য্যগন্ধ শূন্য —আমার প্রাণবল্লভকে আমার প্রাণবল্লভ বলিয়াই আমি জানি—স্বপ্নেও কখন ভগবান বলিয়া মনে করিতে পারি না। তুমি সখি! কি করিয়া কোন সাহসে তাঁহাকে ভগবান ও আমাকে ভগবত-কান্তা মনে করিলে? ছি সখি! এমন কথা আর কখনও মুখে আনিও না। তোমাদের ভাব—

—"যার মনে লেগেছে যারে
তারে ভজুক তারা গো।
মোর মনে লেগেছে কেবল
শচীর দুলাল গোরা গো॥"—

এইবার সখি কাঞ্চনার চতুরতা আর খাটিল না—তাঁহার সকল ভারিভুরি এবার ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মহা লজ্জিতা ও অপ্রতিভ হইয়া প্রিয়াজির একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অধোবদনে নিজ হস্তে নিজ নখাগ্রভাগ খুঁটিতেছেন—আর মনে মনে ভাবিতেছেন—"গৌরাঙ্গ-ভজন-বিজ্ঞতার খুব পরিচয় দিলাম আজ বিশুদ্ধ মাধুর্য্যভাবময়ী নবদ্বীপেশ্বরী গৌর-বল্লভার নিকট। ধিক্ আমার জীবনে।"—মনে মনে এই ভাবিয়া লজ্জায় ক্ষোভে এবং অনুতাপে তিনি যেন মরমে মরিয়া গেলেন। স্বতন্ত্রা গৌর-বল্লভা এ সকল কিছু দেখিয়াও যেন দেখিলেন না—বুঝিয়াও যেন বুঝিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা—চতুর-চূড়ামণি,—মহা তেজস্বিনী। একদিকে যেমন কুসুমাদপি কোমল তাঁহার হৃদয়খানি—অন্যদিকে তিনি কখন কখন বজ্রাদপি-কঠিন হৃদয়ের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন না। গৌর-বল্লভা আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন।

সখিদ্বয় গৌর-বল্লভার এই কথাগুলি লইয়া নিভৃতে বসিয়া অনেকক্ষণ আলোচনা করিলেন,—ফলে স্থির হইল প্রিয়াজির ভজনাদর্শই তাঁহাদের সিদ্ধ গুরু-প্রণালী। এ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী নবদ্বীপময়ী গৌর-বল্লভার ভাব-গম্ভীর স্বতন্ত্র স্বভাব এবং স্বতন্ত্রতা অনুকরণীয় নহে,—আচরণীয় নহে,—শিক্ষনীয়—এ শিক্ষাও সদ্‌গুরু-চরণান্তিকে বসিয়া গ্রহণীয়। সখি কাঞ্চনা প্রগল্‌ভা আর সখি অমিতা অত্যন্ত গম্ভীরা। সখি অমিতা সখি কাঞ্চনাকে সাবধান করিলেন।

যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রিয়াজি শ্রীতুলসী রাণীকে প্রণাম করিয়া ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার শুভদৃষ্টিপাত পড়িল প্রাঙ্গনস্থ তুলসীমঞ্চের নিম্নদেশে,—তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভের পুরাতন ভৃত্য অতিবৃদ্ধ ঈশান দীঘল হইয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া কান্দিতেছেন। ইহা দেখিয়া করুণাময়ী গৌর-বল্লভার কোমলহৃদয় দ্রব হইল—তিনি তাঁহার ভজন-মন্দির দ্বারে থমকিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন—"সখি! ঈশানের আজ একি হইল? আহা! অতিবৃদ্ধ ঈশানের দুঃখ দেখিলে আমার প্রাণ যে ফাটিয়া যায়।" ঈশানের প্রতি গৌরবক্ষবিলাসিনীর এই স্নেহমাখা ভাবটি "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি"তে অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিরহিণী প্রিয়াজির আত্মবিলাপের পদে ঈশানের নামোল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভকে কি বলিতেছেন শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

যথা রাগ।

—"ঈশানের দশা দেখি পরাণে মরি।
কোন মতে আছে সে যে পরাণ ধরি॥
জলবিন্দু নাহি খায়, কোথাও নাহিক যায়,
পাছু পাছু ফিরে মা'র দেহ আগোরি।
আমি যদি একা থাকি, পুরনারী দেয় ডাকি,
কি কাজ দিয়েছ তারে—কি দয়া মরি।
মাতা কিছু খেলে পরে, তবে সে আহার করে,
রাতে শুয়ে ডাকে সদা "হে গৌরহরি।"
কোন মতে আছে সে যে পরাণ ধরি॥

(সে যে) মানুষ করেছে তোমা কোলে করিয়া।
না হেরে নদের চাঁদে—মরে কাঁদিয়া॥
না দেখায় আঁখি বারি, না যায় কাহারও বাড়ী
কাহাকে না বলে দুখ রহে সহিয়া।

মুখ তুলে নাহি চায়, করে না সে হায় হায়,
মায়ের চরণ পানে—রহে চাহিয়া ॥
কথা ক'লে মুখ তুলে, বুক ভাসে আঁখি জলে,
অবনত মুখে যায়—কাজ করিয়া ॥
(সে যে) মানুষ করেছে তোমা, কোলে করিয়া ॥*—

শচী মাতা এক্ষণে অপ্রকট হইয়াছেন—প্রিয়াজি এখন কঠোর হইতেও কঠোরতম ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,—তাঁহাকে কিছু বলিবার এখন আর কেহ নাই—তিনি এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা,—মর্ম্মী সখিগণও তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করেন না। সে দিনের গভীর রাত্রির কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান বহিরাঙ্গনের করুণ লীলারঙ্গ দৃশ্যটি অতিবৃদ্ধ ঈশানের মনে নিদারুণ আঘাত দিয়াছে—সে আঘাতে ঈশানের মত অতিবৃদ্ধের দুর্ব্বল হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছেন এ সম্বন্ধে গৌর-বল্লভার চরণে কিছু নিবেদন করিবেন। ইতিমধ্যে সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহাদের মনব্যথা ঈশানের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে প্রিয়াজিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে বলিয়াছেন। কারণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের এই অতিবৃদ্ধ পুরাতন ভৃত্যটিকে প্রিয়াজি বড় ভালবাসেন—অত্যন্ত স্নেহ করেন। এই জন্য অবসর বুঝিয়া ঈশান আজ অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় দীঘল হইয়া পড়িয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বালকের মত কাঁদিতেছেন—আর তুলসী তলার রজে গড়াগড়ি দিয়া ধুলায় লুটোপুটি খাইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধুলিমাখা—নয়নে দরদরিত অশ্রুধারা—পরিধানের মলিন ছিন্ন বসন খানি অশ্রুসিক্ত হইয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া করুণাময়ী গৌর-বল্লভার কোমলহৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—তিনি আর সখি কাঞ্চনার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সখিদ্বয় সহ ধীরে ধীরে আঙ্গিনায় নামিয়া তুলসী-মঞ্চের নিকট ঈশানের নিকটে আসিয়া একেবারে সেখানে বসিয়া পড়িলেন।

রোরুদ্যমান অতিবৃদ্ধ ঈশান সখিদ্বয় সহ গৌর-বল্লভাকে তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কখন মনে আশাও করেন নাই যে এই অবস্থায় প্রিয়াজি নিজ ভজন ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া এই ভাবে ভূমিতলে বসিবেন। করুণাময়ী নবদ্বীপেশ্বরীর অসীম করুণাধারার তাঁহার প্রতি অতি বর্ষণ দেখিয়া ঈশানের মন আজ প্রেমানন্দে অধীর হইয়াছে—প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে—সর্ব্বদেহ পুলকাঞ্চিত হইয়াছে। ঈশান তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রথমে সসম্ভ্রমে গৌরবল্লভার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পরে সখিদ্বয়কে সেইরূপ প্রণাম করিয়া করযোড়ে দূরে সরিয়া গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থরথর কাঁপিতেছেন আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহার অতিবৃদ্ধ কুব্জ ও কম্পবান ক্ষীণ দেহযষ্টিখানি দেখিলে কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রব হয়। কোন কথা বলিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই—তিনি কেবল কাঁদিতেছেন আর আত্মগ্লানিতে দুই হস্তে নিজ গালে চপটাঘাত করিতেছেন। সখি কাঞ্চনা তখন নিকটে গিয়া তাঁহার হাত দু'খানি ধরিয়া সস্নেহে প্রিয়াজির সম্মুখে আনিলেন। ঈশানের তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া পরম দয়াময়ী প্রিয়াজির কোমলহৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে মধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন—"ঈশান দাদা! তোমার বক্তব্য কি বল। প্রিয়াজি তোমার দুঃখে কাঁদিতেছেন—অকপটে আজ তুমি তোমার মনদুঃখ প্রিয়াজির চরণে নিবেদন কর।"

প্রিয়াজিরও নয়ন-ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তিনিও করুণ নয়নে ঈশানের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিতে তাঁহার প্রার্থনা জানাইতে বলিলেন। তখন ঈশান করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার প্রার্থনাটি জানাইলেন। তিনি অস্ফুট ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"ঠাকুরাণি! মুঞি বড়ই অধম—বড়ই মহাপাপী—এ বাড়ীর উচ্ছিষ্টভোজী অধম কুক্কুর মুঞি। প্রভু আমার নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হইলেন—তাহাও এই পাপ চক্ষে দেখিতে হইল,—স্নেহময়ী শচীমাতার সেবা-সুখে বঞ্চিত হইলাম,—ভাগ্য আমার বড়ই মন্দ,—আপনার সেবা-সুখেও বঞ্চিত—এখন আমার মরণই মঙ্গল,—কিন্তু মরণত আমার নাই,—আপনার সেদিন রাত্রি-কালের অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ত্রাস হইয়াছে,—তাই একটী কথা শ্রীচরণে নিবেদন করিতে আসিয়াছি",—এই বলিয়া বৃদ্ধ ঈশান গৌর-বিরহে কাঁদিয়া আকুল হইয়া পুনরায় প্রিয়াজির চরণতলে দীঘল হইয়া পড়িলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে অতিকষ্টে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন। করুণাময়ী প্রিয়াজির আদেশে ঈশান তখন করযোড়ে তাঁহার প্রাণের কথাটী নিবেদন করিলেন—"ঠাকুরাণি! আমাকে আপনাদের পুরাতন ভৃত্যজ্ঞানে ক্ষমা করিবেন—আপনি

রাত্রিকালে আপনার ভজন-মন্দিরে কখনও একাকিনী থাকিবেন না—কাঞ্চনা দিদি বা অমিতা দিদি কাহাকেও ভজন-মন্দির ভিতরে আপনার চরণতলে স্থান দিবেন।"—

ঈশানের কথা শুনিয়া দয়াময়ী গৌর-বল্লভার বদনে কি যেন একটা পরম বিষাদময়ী ছায়ার প্রতিবিম্ব নিপতিত হইল—যাহা সখিদ্বয় মাত্র লক্ষ্য করিলেন। সকলেই বদন অবনত করিয়া অশ্রুজলে ভূমিতল সিক্ত করিলেন—ঈশান ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় করযোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ গেল। করুণাময়ী প্রিয়াজি তখন তাঁহার প্রেমাশ্রুসিক্ত মলিন বদনখানি তুলিয়া ঈশানের প্রতি করুণনয়নে শুভদৃষ্টিপাতে কহিলেন—

—"ঈশান! তোমার প্রার্থনা আমি স্বীকার করিলাম—তুমি শান্ত হও",—এই আশ্বাসবাক্যে ঈশানের আনন্দের আর সীমা রহিল না—তিনি তখন প্রেমাবেগে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইয়া প্রিয়াজির বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—স্বতন্ত্রা গৌরবল্লভা আর কোন কথা না বলিয়া ধীর পদবিক্ষেপে সেখান হইতে উঠিয়া ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

পুরাতন ভৃত্য ঈশানের সৌভাগ্য দর্শনে সখিদ্বয়ের বিস্ময়ের আর সীমা নাই—আনন্দেরও অবধি নাই,—বিস্ময়, গৌর-বল্লভার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার কথা স্মরণ করিয়া—আর আনন্দ তাঁহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া। রোরুদ্যমান ঈশানকে তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া বিধিমত সান্ত্বনা করিলেন,—কত না আশীর্ব্বাদ করিলেন,—ঈশান ত কাঁদিয়াই আকুল—কাঁদিয়াই তিনি জিতিলেন—সখিদ্বয়ও ত কাঁদিতে কিছু কম করেন নাই—তাঁহাদের প্রার্থনা তখন ত প্রিয়াজি মঞ্জুর করেন নাই,—এখনই বা কেন করিলেন? এ "কেন"র উত্তর নাই। স্বতন্ত্রা গৌর-বল্লভা তাঁহার প্রাণ-বল্লভের ন্যায় পরমোদার কিন্তু পরম নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতাই স্বয়ং ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্বভাব—এই স্বতন্ত্র স্ব-ভাবের উপর অন্য কোন ভাবের কথাই আসিতে পারে না। ঈশানের মত মহা সৌভাগ্যবান পুরুষ চৌদ্দভুবনে কেহ নাই—শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা লিখিয়াছেন—তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে যিনি শিশুকাল হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন—গৌর-বল্লভার পরম প্রিয়পাত্র এবং সবিশেষ কৃপাপাত্র তিনি যে হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। সখিদিগের অপেক্ষাও তাঁহার প্রাণবল্লভের এই পুরাতন অতিবৃদ্ধ ভৃত্যটিকে প্রিয়াজি অধিকতর সম্মান দিলেন।

গৌর-বল্লভা ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিলে সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ঈশানকে পরম স্নেহভরে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া মধুর বচনে কহিলেন—"ঈশান দাদা! তুমি আজ আমাদের যে উপকার করিলে জীবনে মরণে আমরা তাহা কস্মিনকালেও ভুলিব না। তোমার গৌরাঙ্গ-প্রীতি অতুলনীয়—এই গুণেই গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তোমার কথা রাখিলেন—আমাদের গৌরাঙ্গ-প্রীতি ও গৌরানুরাগ নিঃস্বার্থ নহে—অকপট নহে—তাই গৌর-বল্লভা আমাদের কথা রাখেন নাই! ঈশান দাদা! তুমি আমাদের আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মত গৌরাঙ্গ-প্রীতি ও গৌরানুরাগ আমরা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হই। অদ্য হইতে তুমি আমাদের গৌরপ্রেমের গুরু,—তুমি আমাদিগকে গৌর-প্রেম শিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—আমরা দীনা ভিখারিণী।"

ঈশানের সর্ব্বাঙ্গ তখনও থরথর কাঁপিতেছে—প্রেমাবেগে তিনি কোন কথাই কহিতে পারিতেছেন না—অতি কষ্টে তাঁহার অদম্য হৃদয়াবেগ কোন মতে কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া তিনি করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিলেন—"দিদি গো দিদি! মুঞি আর কি বলিব,—কিই বা বলিতে জানি—মুঞি মহা পাপী,—মহা মূর্খ,—গৌরপ্রেমের নাম গন্ধও আমার প্রাণে নাই। তোমাদেরই কৃপায় গৌর-প্রেম লাভ হয়—তোমরাই দিদি গৌর-প্রেমের একমাত্র ভাণ্ডারী—মুঞি অধমকে গৌর-প্রেমে বঞ্চিত করিও না! দিদি! ঠাকুরাণীর নিকটে রাত্রিতে তোমরা কেহ শয়ন করিও—উনি এখন গৌর-বিরহে একেবারে পাগলিনী হইয়াছেন—উঁহার ঠিক ঠিকানা কিছুই নাই!" এই বলিয়া পুনরায় ঈশান কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সখি কাঞ্চনা তখন পুনরায় সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"ঈশান দাদা! তুমি বড় ভাগ্যবান—অদ্য হইতে তোমার নাম রাখিলাম আমরা "**শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস**"। অতিবৃদ্ধ ঈশান কম্পিত মস্তকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে অতীব বিনয়নম্র সদৈন্য বচনে কহিলেন—"দিদি! "**শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দাস**" নামের মুঞি অধম সম্পূর্ণ অযোগ্য। দামোদর পণ্ডিত দাদা

আমার এই সর্ব্বোচ্চ ভক্তিপদবীর যোগ্যাধিকারী। তোমাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় করিয়া আমি এই সর্ব্বোচ্চ পদবিটী তাঁহাকেই দিব,,—মুঞি ঈশান,—ঈশানই থাকিব।" সখি কাঞ্চনা তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—ঈশান দাদা! আচ্ছা তাই হউক—তোমাকে তাহা হইলে আর একটি মধুর নামে আজ হইতে আমরা ডাকিব—তোমার নাম হইল—"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-দাস"। ঈশান এবার মস্তক অবনত করিরা অধোবদনে সুধু করযোড়ে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন—মুখে আর কিছুই বলিলেন না—এই অপূর্ব্ব নাম শুনিয়া মনে মনে তাঁহার বড় আনন্দ হইল,—তিনি তখন প্রেমাশ্রুনয়নে সখিদ্বয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সখিদ্বয় বুঝিলেন "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" ঈশান তখন "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" বলিয়া আপন কাজে চলিয়া গেলেন—সখিদ্বর প্রিয়াজির ভজন মন্দির-দ্বারে আসিয়া মালা হস্তে জপে বসিলেন।

আজ সখি কাঞ্চনা ও অমিতার মনে বড় আনন্দ—যেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখ-সাগরে তাঁহারা ভাসিতেছিলেন—তেমনি অপার আনন্দ-সাগরে এখন তাঁহারা হাবুডুবু খাইতেছেন। সখি কাঞ্চনা তখন অমিতাকে অতি মৃদু মধুর বচনে নিঃশব্দে কহিলেন—সখি অমিতে! পতি-পরায়ণা বিরহিণী গৌর-বল্লভার অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দেখিলে? অতিবৃদ্ধ ঈশানের প্রতি তাঁহার অভূতপূর্ব্ব কৃপার পরিচয় দিয়া তাঁহার পতিভক্তির যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ দেখাইলেন—তাহা তাঁহার ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য সুবর্ণাক্ষরে খোদিত রহিবে। ঈশান যে তাঁহার প্রাণবল্লভ গৌরকিশোরকে **কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে** এই কথাটি মনে হইবামাত্র পতিগত-প্রাণা গৌর-বল্লভার সকল সত্য সংকল্প,—সকল বিধি-নিয়ম-সকল কঠোরতার বন্ধন যেন মুহূর্ত্তমধ্যে শিথিল হইয়া গেল,—তিনি যেন আপনা ভুলিয়া একেবারে ঈশানের হইলেন। ঈশানের ভাগ্যে তাঁহার অকপট দাস্যভাবের শ্রীগৌরাঙ্গসেবার সুপরিপক্ক ফল,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কৃপা, তাঁহার প্রতি অত্যাধিক,—কাজেই তিনি গৌর-বল্লভার বিশিষ্ট কৃপাপাত্র হইলেন।*

এইরূপ ভাবে তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া চুপি চুপি পরম ভাগ্যবান ঈশানের গুণ গাইতেছেন আর ভজনানন্দে আছেন।

এমন সময় অতিবৃদ্ধ মাজাভাঙ্গা দামোদর পণ্ডিত মৈ দিয়া অন্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অতি সন্তর্পণে আঙ্গিনায় আসিয়া দীঘল হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নীরব-ক্রন্দনের রোল নাই—মুখখানি গুঁজিয়া গৌরশূন্য গৌর-গৃহের প্রাঙ্গনে মৃতবৎ তিনি পড়িয়া আছেন। দামোদর পণ্ডিতের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনে আসিবার অধিকার আছে—তিনি একবার মাত্র প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গৌর-বল্লভার অলক্ষিতে দুই ঘড়া গঙ্গাজল আনিয়া প্রিয়াজির স্নানের জন্য দিয়া যাইতেন। আর একবার অপরাহ্নে কণিকা প্রসাদ লইতে তিনি ভক্তগণের সহিত আসিতেন। আজ এই অসময়ে তাঁহার এরূপভাবে অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় পড়িয়া নীরব ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া সখিদ্বয় বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। নিরপেক্ষ তেজস্বী বৈষ্ণব দামোদরপণ্ডিতকে তাঁহারা সকলেই বিশেষ সম্ভ্রম ও ভয় করিতেন—এজন্য এক্ষণে সখিদ্বয় তাঁহার নিকটে যাইতেও যেন সন্ত্রস্থ হইলেন। তথাপি ভয়ে ভয়ে উভয়েই তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন। অতিবৃদ্ধ দামোদর আজ বালকের ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন—তাঁহার জন্মরাশিগত প্রচণ্ড প্রভাব—তাঁহার নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিত্ব আজ যেন চূর্ণীকৃত ও বিধ্বস্থ। সখি কাঞ্চনা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—"পণ্ডিত দাদা! আজ তোমার এ ভাব কেন? উঠ দাদামণি আমার! তোমার এই বিষম দৈন্য দেখিয়া আমাদের প্রাণ যে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা অনেক অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি ও করিতেছি—আর যে পারি না দাদা! উঠ দাদামণি আমার! কি হইয়াছে খুলিয়া বল দাদা!" এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন দামোদরপণ্ডিত ধুল্যবলুণ্ঠিতদেহে উঠিয়া বসিয়া নীরবে অধোবদনে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কোন কথা নাই—নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—ভূমিতল সিক্ত হইতেছে—করযোড়ে নতজানু হইয়া সখিদ্বয়ের সম্মুখে বসিয়া তিনি কেবল কাঁদিতেছেন। সখি

* এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে মধুর ভাবের নিত্যসিদ্ধা সখিদিগের সম্মানের খর্ব্বতাসূচক এইরূপ দাস্যভাবের আদর শাস্ত্রযুক্তি সিদ্ধ কি না এবং গৌরবল্লভার উপযুক্ত কার্য্য কি না? উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারা যায় স্বয়ং ভগবান ও স্বয়ংভগবতীর লীলারঙ্গ শাস্ত্রযুক্তির অতীত। গৌর-বল্লভা সখিদিগের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া ঈশানের কথা রাখিলেন ইহাতে তাঁহার পরমৈশ্বর্য্যোচিত স্বতন্ত্রতারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

কাঞ্চনা ও অমিতা মহা বিপদে পড়িয়া তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ স্মরণ করিলেন—এত বড় প্রবল প্রতাপ পণ্ডিতের আজ একি দশা! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকেও বাক্যদণ্ড দাতা—এত বড় নিরপেক্ষ স্বাধীনচেতা আজীবন অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর একি দশা! এই ভাবিয়া পরম বিহ্বলভাবে তাঁহারাও সেখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পুনঃ পুনঃ করযোড়ে তাঁহাদের প্রিয়তল পণ্ডিত দাদাকে কত না সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গৌরশূন্য গৌর-গৃহ-প্রাঙ্গণে আজ যে এই অভিনব গৌর-প্রেমলীলারঙ্গের অভিনয় হইতেছে—যদি চিত্রকর হইতাম এই করুণ চিত্রটী অঙ্কন করিয়া কৃপাময় পাঠকবৃন্দকে প্রেমোপহার দিয়া ধন্য হইতাম।

এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল—অতিকষ্টে অতিবৃদ্ধ দামোদর পণ্ডিত নিজভাব নিজেই সম্বরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে প্রেমগদগদ বচনে অতি দীনাতিদীনভাবে সখি কাঞ্চনাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দিদি গো! দিদিমণি গো! তোমরা কৃপা করিয়া আজ তোমাদের ঈশানদাদার মারফৎ আমাকে যে উপাধিটি দিয়াছ—আমার মত অযোগ্যের তোমরা যে নামটি রাখিয়াছ—আমি অধমাধম পুরীষের কীট তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য—তাই তোমাদের চরণে ধরিয়া নিবেদন করিতে আসিয়াছি—শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ভুবন-মঙ্গল পরম মধুময় এই পরম বস্তুটি তোমারা যোগ্যতম গৌরভক্তকে দান কর। বাঁদরের গলায় মুক্তামালা দিয়া আর এই বৃদ্ধবয়সে আমাকে হাস্যাস্পদ করিও না।" এই বলিয়া নিরপেক্ষ পণ্ডিত শিরোমণি দামোদর পুনরায় প্রেমাবেশে আকুল হইলেন—পুনরায় সখিদ্বয়ের চরণে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অতিশয় শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যে কি বলিবেন,—কি করিবেন ভাবিয়া চিন্তিয়া আর স্থির করিতে পারিতেছেন না। তখন সখি অমিতা বলিলেন—"পণ্ডিত দাদা! আমাদের নিকটেই তুমি এই নামে পরিচিত হইবে—আমরাই তোমাকে এ মধুর নামে ডাকিয়া জীবন সার্থক করিব—আমার কাঞ্চনা দিদি বড় সাধ করিয়া ঈশানদাদার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এই মধুময় নামটী তোমাকে দিয়াছেন—"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস"—এই মধুর হইতে মধুর নামের যোগ্য অধিকারী কেহই যে নাই দাদা! কাহাকে আমরা আমাদের এই অমূল্য সম্পত্তি—কাঞ্চনা দিদির বড় আদরের ধন,—দিয়া নিশ্চিন্ত হইব দাদা! আমাদের গৌর-বক্ষ-বিলাসিনীর ইচ্ছাতেই তাঁহার অভিন্না-হৃদয়া কাঞ্চনা দিদি তোমাকে আদর করিয়া এই অমূল্য রত্নটি দিয়াছেন। তুমিই এই অমূল্য সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী—তুমি দাদা! ইহার যথেচ্ছা ব্যবহার কর—এ সম্পত্তি গৌর-বল্লভার নিজস্ব ধন—তিনিই তোমাকে দান করিয়াছেন—পণ্ডিত দাদা গো! দাদামণি গো! আর কোন কথা বলিও না।"

নিরপেক্ষ তেজস্বী অতিবৃদ্ধ বৈষ্ণবচূড়ামণি পণ্ডিত দামোদর আজ বড়ই বিপদে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর চরণ স্মরণ করিলেন—চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্পগন্ধে আমোদিত হইল—উপর হইতে আকাশে দৈববাণী হইল—"পণ্ডিত দামোদর! তোমাকে শ্রীনবদ্বীপ পাঠাইবার উদ্দেশ্য আমার সফল হইয়াছে,—তুমি ধন্য।" পণ্ডিত দামোদরের চক্ষের উপর দিয়া যেন বিদ্যুতমালার মত ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু চকিতে চলিয়া গেলেন—তিনি যেন তাঁহার শ্রীমুখের বাণী স্বকর্ণে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া "হা শচীনন্দন! চিত্তচোর বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!" বলিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিলেন না—তাঁহারা তাঁহাদের অতিবৃদ্ধ পূজনীয় পণ্ডিত দাদার সেবাশুশ্রূষার নিযুক্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে পণ্ডিত দামোদর প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি আর যেন চাহিতে পারিলেন না। বিনতবদনে প্রেমাশ্রুলোচনে অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"আজ্ঞা বলবান" আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। সখিদ্বয় তাঁহার মর্ম্মকথা বুঝিলেন।*

---

* "আজ্ঞা বলবান" কথাটির এখানে দ্ব্যর্থ আছে—এই বাক্যটির মর্ম্ম দুই ভাবে প্রযুক্ত। নিত্যসিদ্ধা গুরুরূপা সখির আজ্ঞা নিশ্চয়ই বলবান এবং তাহা অবিচারণীয়া। অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর দৈব-বাণীর আদেশও বলবান। নিত্যসিদ্ধা গুরুরূপা সখিদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন পূজ্যপাদ গোস্বামিচরণগন। পণ্ডিত দামোদর গৌরাঙ্গ-পার্ষদভক্ত—তিনি যে আদর্শ দেখাইলেন—এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যাহা দৈববাণী দ্বারা অনুমোদন করিলেন তদপেক্ষা উত্তম সিদ্ধান্ত আর কোথায় মিলিবে? **শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস** বড়ই উচ্চ উপাধি,—ইহা একমাত্র পূজ্যপাদ পণ্ডিত দামোদরেই উপযুক্ত।" সখি কাঞ্চনা ইহা বিশিষ্টভাবে বিচার করিয়াই তাঁহাকে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর নামটি দিয়াছেন। পণ্ডিতদাদার দৈন্য এবং সখিদিগের প্রতি গুরুবুদ্ধি প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত এবং তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধিকর।

তাঁহারাও আর কোন কথা কহিলেন না। ধীরে ধীরে পণ্ডিত দামোদর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন—সখিদ্বয়ও ভজন-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া জপে বসিলেন।

এখন বেলা এক প্রহর—গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন-মন্দির-দ্বার রুদ্ধ—তিনি তাঁহার নিয়মিত ভজন-সাধন-প্রণালীর কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করেন নাই,—দিন দিন তাহা যেন কঠোরতর হইতে কঠোরতমই হইতেছে,—শরীর তাঁহার দিন দিন ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতমই হইতেছে—কলের পুতুলের মত তিনি তাঁহার দৈনন্দিন ভজন সাধন করিয়া যাইতেছেন,—তাঁহার দেহানুসন্ধান নাই—ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই—বাহ্য বিষয়ের কোন অনুভূতিই নাই—আন্ কথা তিনি একটিও বলেন না—শুনেনও না—আত্মসুখ তাৎপর্য্যকর কর্ম্মে তাঁহার বিষম বিরক্তি। তিনি এখন বৈরাগ্যের চরম সীমাতে উপনীত।

দামোদর পণ্ডিতের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে আগমন—সখিদ্বয়ের সহিত তাঁহার অদ্ভুত অপূর্ব্ব মধুর ব্যবহার,—এ সকল বিষয়ে গৌর-বল্লভার কোন লক্ষ্যই নাই—তিনি ইহার কিছুই জানেন না—সখিদ্বয় এ সকল কথা তাঁহাকে বলিতেও সাহস করেন না। গৌরকথা ভিন্ন আন্ কথায় তিনি কর্ণপাত করেন না। তবে তিনি অন্তর্য্যামিনী—তাঁহার অজানিত কিছুই নাই।

বহির্বাটীতে ঈশান এবং পণ্ডিত দামোদর দুইটী অতিবৃদ্ধ গৌরাঙ্গপার্ষদভক্ত আজ প্রেমানন্দে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেছেন। একটী অতিবৃদ্ধ পরম পণ্ডিত ভজনবিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ নিরপেক্ষ তেজস্বী বৈষ্ণব,—অপরটী নিরক্ষর, সরল, পরম বিশ্বাসী অতিবৃদ্ধ প্রভুর পুরাতন সেবক। দুইজনে পরম প্রেমভরে পরম বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ—ঈশান পণ্ডিত দামোদরকে "পণ্ডিত দা" বলিয়া প্রেম-সম্ভাষণ করেন—বৃদ্ধ পণ্ডিতজি ঈশানকে সোদর তুল্য পরম স্নেহ করেন। আজ গৌর-বল্লভার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয়ের সাক্ষাৎ কৃপার নিদর্শনস্বরূপ শিরোপা পাইয়া তাঁহারা প্রেমানন্দে পরমোৎফুল্ল হইয়া মনের সাধে নৃত্য করিতেছেন। ঈশানের "পণ্ডিত দা" আজ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদাসাভিমানী—আর পণ্ডিতজির প্রাণ অপেক্ষাও পরম প্রিয়তম সোদর তুল্য ঈশান আজ নদীয়া-যুগল-দাসাভিমানী—দুইজনের মনে আজ দুইটী মধুর ভাবের অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ-তরঙ্গ খেলিতেছে—দুই জনেই আজ পরম প্রেমানন্দে বিভোর—তাঁহাদের আজ কথা কহিবার অবসর নাই—কেবলই প্রেম-ক্রন্দন—মধ্যে মধ্যে এই প্রেম-ক্রন্দনের অস্ফুট এক একটা করুণ ধ্বনি উঠিতেছে। এক্ষণে বংশীবদন ঠাকুর সেখানে নাই—কোন বিশেষ কার্য্যে গত রাত্রিতে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি আসিয়া দুইটি বৃদ্ধকে এরূপ পরম প্রেমবিহ্বলভাবে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। তিনি বয়সে দুই জন অপেক্ষা অনেক ছোট—তাহা হইলেও বৈষ্ণবের ছোটবড় নাই—এই বিশ্বাসে দুইটী অতিবৃদ্ধ গৌরাঙ্গপার্ষদভক্তরাজ তাড়াতাড়ি প্রেমালিঙ্গনবন্ধন মুক্ত হইয়া বংশীবদন ঠাকুরকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে দীঘল হইয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। ঠাকুর বংশীবদন তখন তাঁহার বাহুদ্বয় দ্বারা দুই জনকে ভূমিতল হইতে উঠাইয়া তাঁহাদের কণ্ঠদেশ পরম প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিয়া উভয়কে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। পুনরায় গৌর-শূন্য গৌর-গৃহে প্রেম-ক্রন্দনের অস্ফুট ধ্বনি উঠিল—এবার তিন জনে একত্রে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—অথচ ঠাকুর বংশীবদন এই অপূর্ব্ব প্রেমানন্দোৎসবের মূল কারণ কিছুই জানেন না। এই ভাবে অনেকক্ষণ গেল। অতঃপর প্রিয়াজির ইচ্ছায় সকলেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন মণ্ডলী করিয়া বাহির আঙ্গিণায় তিন জনে মুখোমুখী করিয়া একত্রে বসিলেন। ঠাকুর বংশীবদন মহা ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপারটা কি বল দেখি দাদা!" এতদিন তোমাদের মুখে একবিন্দু হাসির রেখাও দেখি নাই—তোমাদের বদনমণ্ডলে আজ এত প্রসন্নতার ভাব দেখিতেছি কেন দাদা? বল দেখি! গৌর-বল্লভার সমাচার কি?"

পণ্ডিত দামোদর তখন সকল কথা ধীরে ধীরে নিবেদন করিলেন। ঈশানের অনুরোধে প্রিয়াজি রাত্রিকালে তাঁহার ভজন-মন্দিরে সখিদ্বয়ের মধ্যে এক জনকে কৃপা করিয়া শয়ন করিবার অধিকার দান করিয়াছেন—ইহাতে সখিদ্বয় মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যে পুরস্কার দিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। ঈশানের কৃপায় সখি কাঞ্চনা তাঁহাকেও যে অমূল্য ধন দিয়াছেন - সে কথাও তিনি নিজেই তাঁহাকে বলিলেন। ঠাকুর বংশীবদন এই সকল আনন্দের সংবাদ শুনিয়া প্রেমানন্দে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের ঘন

ঘন জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন। তিন জনে তখন একত্র হইয়া পরম প্রেমাবেগে গৌর কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"

প্রেমানন্দে এই কীর্ত্তন চলিতে লাগিল—তিনজনেই বহিরাঙ্গণে এমন কীর্ত্তন জমাইয়া দিলেন যে বাহিরের লোক আসিয়া তাহাতে যোগদান করিল। বহিরাঙ্গণে আজ কীর্ত্তনের ধুয়া উঠিয়াছে—কিন্তু গৌর-বল্লভা তাঁহার রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দিরে জপমগ্না—সখিদ্বয় দ্বারে বসিয়া সংখ্যানাম জপ করিতেছেন,—আর কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন।

অতি বৃদ্ধ পণ্ডিত দামোদর ইতিমধ্যে ধুয়া ধরিলেন,—

—"জয় দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপেশ্বরী।
কৃপা করি কৃপাময়ী কর গো কিঙ্করী॥"

বৃদ্ধ ঈশান দেখিতেছেন আজ তাঁহার পণ্ডিত দাদার আনন্দের সীমা নাই—তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন—বহু গৌরভক্ত আসিয়া ইতিমধ্যে তখন কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন—তাহার মধ্যে বাসুদেব ঘোষ আছেন,—তাঁহার ভ্রাতা মাধব ঘোষ আছেন, জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় আছেন—আরও অনেকেই আছেন। তাঁহারা পণ্ডিত দামোদরের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে যোগ দিলেন—সকলেই পণ্ডিত দামোদরের ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমানন্দে আজ প্রাণ খুলিয়া বদন ভরিয়া প্রিয়াজির নাম-গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার আজ বড় আনন্দ—তাঁহারা ভাবিতেছেন এই সময়ে যদি তাঁহাদের প্রিয়সখি একবার ভজন-মন্দির হইতে বাহির হইতেন, তবে বড় ভাল হইত।

গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বহিরাঙ্গণে আজ কীর্ত্তনের খুব ধুম উঠিয়াছে। ঠাকুর বংশীবদন সর্ব্বশেষে ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
কলিহত জীব প্রতি দেখ গো চাহিয়া॥
তোমার চরণ বিনা নাহি আন্ গতি।
কৃপা করি কলিজীবে দাও গো সুমতি॥
প্রকৃত ভজনপথ দেখাইয়া দিয়া।
ভক্তিহীন সন্তানের শুদ্ধ কর হিয়া॥
কলির-জীবের হৃদে নাহি প্রেমগন্ধ।
প্রেম-ভক্তিশূন্য তারা তার্কিক ভ্রমান্ধ॥
কলির অধম জীব না চিনি তোমারে।
ভাসিতেছে অবিরত দুখের পাথারে॥
শান্তিময়ী তুমি ওগো শান্তি দাও মনে।
অধম সন্তান বলি রাখ গো চরণে॥
দূর করি ভ্রম তম দাও প্রেম-ভক্তি।
গৌর-শক্তি কৃপাময়ি! সঞ্চারহ শক্তি॥
গৌরাঙ্গ-ভজন পথে তুমি গো আশ্রয়।
তোমার চরণ চিন্তা সুখের আলয়॥
কাতর কলির জীবে কর গো করুণা।
আন্ নাহি জানে হরি তব পদ বিনা॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

কীর্ত্তন যখন শেষ হইল—তখন সকলে মিলিয়া প্রেম-ধ্বনি দিলেন "জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের জয়"—"জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের জয়"।

অতঃপর ঠাকুর বংশীবদন যখন শুনিলেন ঈশানের পুরস্কারের কথা এবং ঈশানের অনুকম্পায় পণ্ডিত দামোদরের সৌভাগ্যের কথা—আর তাঁহাদের অপূর্ব্ব নামকরণ—তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পরম সৌভাগ্যবান ঈশানকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, অতিবৃদ্ধ ঈশান দৌড়িয়া পলায়ন করিতে গিয়া বহিরাঙ্গনের প্রান্তদেশে ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন—তখনই দৌড়িয়া গিয়া বংশীবদন ঠাকুর তাঁহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে সমগ্র আঙিণাটী প্রদক্ষিণ করিলেন। লজ্জায় ঈশান মরমে মরিয়া গেলেন—কি করিবেন নিরুপায় হইয়া তিনি কেবল কাঁদিতেছেন আর বলিতেছেন—'ঠাকুর! রক্ষা কর—রক্ষা কর,—তুমি ব্রাহ্মণ—আমি শূদ্রাধম—তোমার অঙ্গে আমার পদস্পর্শ হইলে আমার নরকেও স্থান হইবে না। দয়া করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে ছাড়িয়া দিন,—আমি ম'লাম—ম'লাম'। তখন বংশীবদন ঠাকুর ঈশানকে ছাড়িলেন এবং সস্নেহবচনে পরম প্রেমাবেশে কহিলেন—"ঈশান দাদা! তোমার মত মহা ভাগ্যবান পুরুষ চৌদ্দ-ভুবনের মধ্যে কেহ নাই,—তুমিই "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ দাস" নামের প্রকৃত অধিকারী। দাদা গো! তোমার ভাগ্য শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত। তুমি আমার মত

জীবাধমের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিও।”—বৃদ্ধ ঈশান ত আত্মগ্লানিতে মরমে মরিয়া গেলেন—এবং সেখানে দীঘল হইয়া পড়িয়া ঠাকুর বংশীবদনের চরণের ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন।

দামোদর পণ্ডিত মহাশয় দুরে দাঁড়াইয়া ঈশানের সৌভাগ্য দেখিতেছিলেন। ঠাকুর বংশীবদন ঈশানকে ছাড়িয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া প্রথমেই একটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে “শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস” দাদা বলিয়া মধুর ভাষে সম্বোধন করিয়া পরম প্রেমভরে কহিলেন—“দাদা গো দাদা! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা দুইজনে মিলিয়া যে অপূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলে—তাহার ত ভাগ আমি কিছু চাই! না দিলে এখানে খুনোখুনি হইবে—সহজে ছাড়িব না দাদা গো! “শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস” গৌরভক্তের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ উপাধি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ! তুমি দাদা! আজ এই অতুল ও অমূল্য সম্পদের অধিকারী,—বিলাও দাদা! এই অমূল্য ধন—এই দুর্লভ রত্ন—কলিহত জগজ্জীবকে দুই হস্তে বিলাও—অবিচারে বিলাও। তাহারা বড় কাঙ্গাল—বড় দুখী—গৌর-প্রেম-ভাণ্ডারের চাবিকাটি আজ তোমার হাতে পড়িল দাদা! ভাণ্ডারীর আদেশ হইয়াছে—আজ গৌর-প্রেম-ভাণ্ডার আচণ্ডাল সর্ব্বসাধারণ জীবকে ডাকিয়া হাঁকিয়া যাচিয়া যাচিয়া লুটাইয়া দাও। আমি জীবাধম গৌরপ্রেমের কাঙ্গাল—দরিদ্র ভিখারী—দয়া করিয়া একবিন্দু গৌর-প্রেম-সুধা আমাকে দিয়া কৃতকৃতার্থ করিও! তোমার চরণে এই আমার শেষ প্রার্থনা।”

এই বলিয়া ঠাকুর বংশীবদন পণ্ডিত দামোদরের চরণ ধরিয়া দীঘল হইয়া পড়িয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর বংশীবদনের দৈন্য ও কাতরতা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও আছাড়িয়া অঙ্গনে পড়িয়া ঠাকুর বংশীবদনকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া নদীয়া-রজে দুই জনে মিলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। ঈশানও দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে এই কার্য্যে যোগদান করিলেন—তখন তিন জনে ধুল্যবলুণ্ঠিতদেহে আঙ্গিণায় প্রেমানন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন,—আর মধ্যে মধ্যে “জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ” ধ্বনি দিতে লাগিলেন। এই ভাবে কতক্ষণ গেল তাহার হিসাব কে রাখিবে?

সখিদ্বয় সকলি দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন কিন্তু বিরহিণী প্রিয়াজি এ সকল ব্যাপারের বিন্দুমাত্র জানিলেন না। তিনি তাঁহার রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দিরে সংখ্যানাম জপে মগ্না আছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার মনে আজ বড় আনন্দ। বহিরাঙ্গণে আজ প্রেমানন্দের ছড়াছড়ি—আজ যেন গৌর-শূন্য গৌর-গৃহে প্রেমের পাথার হইয়াছে—গৌরপ্রেমের তুফান উঠিয়াছে।

এক্ষণে বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে—বিরহিণী প্রিয়াজি নিজ ভজন-মন্দিরে জপমগ্না—সখিদ্বয় দ্বারদেশে জপে বসিয়াছেন—বহিরাঙ্গণের প্রেম-কোলাহলের এতক্ষণে নিবৃত্তি হইয়াছে সখি কাঞ্চনা অমিতাকে চুপি চুপি কহিতেছেন—রাত্রিতে কে গৌর-বল্লভার ভজন-গৃহে শয়ন করিবে,—এক্ষণে তাহা স্থির করা হউক। অমিতা ধীরে ধীরে কহিলেন—“সখি! তুমি ভিন্ন আর কে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের উপযুক্ত? তুমিই থাকিবে—আমি যেমন আছি তেমনিই থাকিব”—সখি কাঞ্চনা উত্তর দিলেন—“সখি অমিতে! তুমি বেশী কথা কও না,—অতি ধীর প্রকৃতি—প্রিয়াজি এখন নির্জ্জন-ভজন-রতা—তুমিই তাঁহার এখন উপযুক্ত সঙ্গিনী—আমি গান করিয়া করিয়া গৌর-পাগলিনীকে আরও পাগল করি—আমার এই কু-অভ্যাসটা আমি ছাড়িতে পারি না—এই আমার ব্যাধি”—সখি অমিতা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—“সখি তোমার সঙ্গগুণে তোমার ঐ ব্যাধিটি আমারও বুঝি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল—তোমার সঙ্গের এমনি গুণ—আমার গলাও নাই—সুর তাল জ্ঞান ত পরের কথা—তবুও গৌর-গুণ-গান গাইতে ইচ্ছা করে—এবং দুই একটা গানও গাইয়া আত্মানন্দ অনুভব করি। সখি কাঞ্চনে! তুমি বোধ হয় মনে মনে কতই হাস”। সখি কাঞ্চনা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—সখি অমিতে! তোমার গান প্রিয়াজির বড় ভাল লাগে—আমারও বড় ভাল লাগে—সখি! তুমি একটি গান গাও, আমি শুনি।” সখি অমিতা তখন মৃদু হাসিয়া ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ বিভাস।

—“গৌরাঙ্গ নহিত, কি মেনে হইত, কেমনে ধরিত দে।
রাধার মহিমা, প্রেম-রস-সীমা, জগতে জানাত কে॥

মধুর বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী-প্রবেশ চাতুরী-সার।
বরজ যুবতী, ভাবের ভকতি, শকতি হইত কার॥
গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে এক জন॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
নরহরি হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে॥"

গৌরপদতরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি ভজন-মন্দিরের ভিতরে বসিয়াই অমিতার গান শুনিলেন। গানটি শেষ হইলে তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন,—সেই সঙ্গে সঙ্গে "হা প্রাণবল্লভ! হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে!" এই বলিতে বলিতে প্রেমাবেশে ভূমিতলে ঢলিয়া পড়িলেন। রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দির—সখিদ্বয়ের ভিতরে যাইবার অধিকার নাই—তাঁহারা বাহিরে গবাক্ষ-দ্বারে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে প্রিয়াজির অবস্থা দেখিতেছেন আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার ভজন-মন্দিরের ভূমিতলে রজে গড়াগড়ি দিতেছেন, আর কেবল মুখে "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা প্রাণবল্লভ! হা করুণাসিন্ধো!" এই বলিয়া নয়নজলে ভূমিতল সিক্ত করিতেছেন। সখি অমিতার মনে আজ বড় দুঃখ হইয়াছে—কারণ তাঁহার গান শুনিয়াই প্রিয়াজির এই অবস্থা হইয়াছে—ইহা তিনি বুঝিয়াছেন। সখি কাঞ্চনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন এবং আত্মগ্লানিতে তাঁহার প্রাণ দগ্ধ হইতেছে। প্রিয়াজির নিয়ম ভঙ্গ হইল এবং তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইল—ইহাই তাঁহার আত্মগ্লানির কারণ। সখি কাঞ্চনা নীরবে কাঁদিতেছেন।

গৌর-বল্লভা কতক্ষণ পরে আপনা আপনিই প্রকৃতিস্থা হইলেন—নিজেই আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার কোন দিকে লক্ষ্য নাই—কোন দিকে দৃষ্টি নাই! এখনও তাঁহার সংখ্যানাম জপ শেষ হয় নাই। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন মৃদুমন্দ স্বরে মন্দ মন্দ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

তাঁহার দুইটি কমল নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—প্রত্যেক নামটি সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া সংখ্যানাম করিতে কত সময় লাগে—সাধক গৌরভক্তগণ বুঝিয়া লউন—তদুপরি নাম-নামী এক করিয়া যে নামজপ কত সময় সাপেক্ষ, তাহাও এই সঙ্গে চিন্তা করুন। এইরূপে ষোল-নাম-বত্রিশ-অক্ষর তারকব্রহ্ম হরিনাম মহামন্ত্র বিরহিণী প্রিয়াজি একবার জপ করিয়া একটী করিয়া আতপ-তণ্ডুল মৃৎভাণ্ডে রাখিতেছেন—সেই তণ্ডুলগুলি পাক করিয়া তাঁহার প্রাণ-বল্লভের ভোগ লাগাইবেন—তাহার অৰ্দ্ধেক তিনি মাত্র দেহরক্ষার জন্য প্রসাদ পাইতেন—আর অৰ্দ্ধেক প্রসাদ ভক্তগণকে বণ্টন করিবেন। এরূপ কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত কেহ কখন শুনিয়াছেন কি? মহাজন কবি কি সাধ করিয়া লিখিয়াছেন—

—"অলৌকিক লীলা তাঁর অলৌকিক রীতি"—
—"প্রভুর প্রেয়সী যিঁহো তাঁহার কি কথা।
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥"—

প্রেম-বিলাস।

সাধ করিয়া কি মহাজন কবি প্রার্থনা করিয়াছেন,—

—"তোমার দাসীর দাসী হৈতে মুক্তি চাই।
সেই সে আমার ওগো জানিহ বড়াই॥" ঐ

সাধ করিয়া কি জীবাধম মূর্খ লেখক পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে "শ্রীগৌর-গীতিকায়" একটী পদে লিখিয়াছিল—

—"ওগো বিষ্ণুপ্রিয়ে, করুণা করিয়ে,
অধমের প্রতি চাহ গো!
তোমার চরণে, জীবনে মরণে,
মতি যেন মোর থাকে গো॥
তুমি গো আমার, জীবনের সার,
ভজনের বল-দায়িনী।
তোমারি কৃপায়, পাই গোরারায়,
তুমি গো ভবের তরণী।" —

গৌর বিরহিণী প্রিয়াজি এক্ষণে গৌর-বিরহ-সমুদ্রে ভাসিতেছেন,—অকুল গৌর-বিরহ-সমুদ্রের কুল-কিনারা নাই—মহাজন কবি লিখিয়াছেন—

"প্রভু অদর্শনে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী।
বিরহ-সমুদ্রে ভাসে দিবস রজনী॥" অঃ নঃ।

গৌর-বিরহ-সাগরে ভাসিবার মূলমন্ত্র বিরহিণী গৌর-বক্ষ-বিলাসিনীর পাদপদ্ম স্মরণ এবং তাঁহার গৌর-বিরহ-লীলা নিরন্তর ধ্যান।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস ॥

বৈদ্যনাথ-দেওঘর,
৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১ সাল,
সোমবার, রাত্রি ১২॥০ টা।

(১১)

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছায় গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী তাঁহার ভজন-মন্দিরে রাত্রিতে তাঁহার একজন সখীকে এখন হইতে শয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের পুরাতন ভৃত্য অতিবৃদ্ধ ঈশানের কৃপায় এই অনুমতি সখিগণ অর্জ্জন করিয়াছেন,—এজন্য তাঁহারা ঈশানের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ—সকলেই ঈশানের গুণ গাহিতেছেন—ঈশান সর্ব্বদাই কিন্তু লজ্জায় অধোবদন—যেন কত অপরাধী,—তিনি মুখ তুলিয়া কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে সাহস করেন না। পণ্ডিত দামোদর ঈশানকে এত দিন ঈশান বলিয়া ডাকিতেন—এখন ঈশান-দাদা বলেন—ইহাতে ঈশানের আরো লজ্জা—তিনি তাঁহার নিকট সর্ব্বদা শত অপরাধীর ন্যায় হাতযোড় করিয়া থাকেন। বংশীবদন ঠাকুর সকলই শুনিয়াছেন—তিনি ঈশানকে দণ্ডে দণ্ডে মাথায় হাত দিয়া কত না আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—আর ঈশানও দণ্ডে দণ্ডে দীঘল হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধুলি লইয়া মাথায় দিতেছেন। ঈশান সর্ব্ব নদীয়াবাসীর প্রেমপাত্র—নদীয়াবাসী নর-নারী-বৃন্দ তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করেন—গৌরভক্তগণ তাঁহাকে রীতিমত সম্মান করেন,—তাঁহারা অনেকেই এই সংবাদটি লোকমুখে শুনিয়াছেন—এবং তাঁহারা জনে জনে বহিরাঙ্গণে আসিয়া ঈশানকে প্রেমানন্দে অভিনন্দন করিতেছেন,—ঈশান লজ্জায় প্রাণে মরিয়া যাইতেছেন—আর সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন—ন্যুজাভাঙ্গা অতিবৃদ্ধ ঈশানের দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার ভাঙ্গা মাজা প্রায় সোজা হইয়া গেল।

গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বহিরাঙ্গণে আজ এইরূপ একটী নীরব প্রেমানন্দ-স্রোত বহিতেছে। অন্তঃপুরের দাসীগণের আজ আনন্দের আর সীমা নাই—তাঁহারাও বাহিরে আসিয়া ঈশান দাদাকে জনে জনে প্রণাম করিতেছেন—ঈশানও তাঁহাদিগকে জনে জনে প্রণাম করিতেছেন—এ দৃশ্য বড়ই মনোরম,—বড়ই প্রাণারাম। ঈশানের নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ গৌরশূন্য গৌর-গৃহের প্রত্যেক দাস-দাসী, জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গকে প্রণাম করিতেন—গৌর-গৃহের ধুলিকণা তাঁহার পক্ষে চিন্তামণি মণি-স্বরূপ—এই ধুলিকণায় মুল্য ও মর্ম্ম একমাত্র ঈশানই জানিতেন ও বুঝিতেন।

নদীয়া-নাগরী-বৃন্দকে ঈশান অতিশয় ভক্তি সহকারে গলবস্ত্রে প্রণাম করিতেন—তাঁহাদিগের সহিত কথা বলিতে তিনি সাহস করিতেন না—দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণ-কমল দর্শন করিতেন—তাঁহাদের বদনের প্রতি কখন তিনি চাহিতেন না। আজ গৌর শূন্য গৌর-গৃহের বহিরাঙ্গণে প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানের সময় তাঁহারা অনেকেই ঈশানকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন—ঈশান ভয়ে ও লজ্জায় কোথায় যে লুকাইবেন, তাহা খুজিয়া পাইতেছেন না। তিনি জড়বৎ আকাট হইয়া আঙ্গিণার একটী নিম্ব বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—নদীয়া-নাগরী-বৃন্দ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে খুজিয়া বাহির করিলেন,—কত প্রকার স্তুতিবাক্য তাঁহারা বলিলেন—ঈশান মরমে মরিয়া গেলেন—করযোড়ে সকলকেই জনে জনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক নদীয়া-বালিকাও ছিলেন। নদীয়া-বালক বালিকাগণ,—তাহারাও ঈশানের বড় প্রিয়পাত্র। তাহারাও ঈশানকে ঘেরিয়া করতালি দিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল—

"আনন্দে বল জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
যুগল পীরিতি গাও নাচিয়া নাচিয়া॥"

ঈশান ত মহাবিপদে পড়িলেন—তিনিও করতালি দিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন—দামোদর পণ্ডিত ও বংশীবদন দূরে দাঁড়াইয়া রহস্য দেখিতেছেন—তাঁহারাও ভাবিতেছেন—এই কীর্ত্তন বালক-বালিকাদিগের শিখাইল কে?

এই ভাবে সে দিন প্রাতে গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বহিরাঙ্গণে প্রেমানন্দের স্রোত বহিল। নদীয়াবাসী নরনারী-বৃন্দ যেন আজ অভুতপূর্ব্ব প্রেমানন্দে উৎফুল্ল—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সন্ন্যাস গ্রহণের দিন হইতে নদীয়াবাসীর মুখে কেহ কখন হাসি দেখিতে পায় নাই,—আজ সকলের মুখে

হাসি দেখা দিয়াছে। কারণ আজ গৌর-বক্ষবিলাসিনী তাঁহার কঠোর ভজনের কঠোর প্রণালী কিছু শিথিল করিয়া রাত্রিতে তাঁহার ভজন-মন্দিরে একজন তাঁহার প্রিয় সখীকে শয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছেন—এই শুভ সংবাদ শ্রবণে নদীয়াবাসী নরনারী-বৃন্দের প্রাণে এত আনন্দ। কে এই শুভ সংবাদ তাহাদিগকে দিল, তাহা কেহই জানেন না,— কেহ বলিতেও পারেন না। নারদের নিমন্ত্রণের মত নদীয়াবাসীর গৃহে গৃহে এ শুভ সংবাদ নারদ ঠাকুরই বোধ হয় দিয়াছেন। নারদের অবতার শ্রীবাসপণ্ডিতের এই কাজ, ঈশান এইরূপ মনে করিতেছেন।

সন্ধ্যাকাল—যথা রীতি সখিদ্বয়সহ গৌর-বল্লভা ভজন-মন্দির-দ্বারে বসিয়া মালা জপ করিতেছেন এবং গঙ্গাদর্শন করিতেছেন। সখি কাঞ্চনা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া প্রিয়াজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রিয় সখি! তোমার নিকট রাত্রিতে কে শয়ন করিবে?"—বিরহিণী প্রিয়াজি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—"শয়নের ব্যবস্থা ত ভজন-মন্দিরে নাই—সেখানে ভজনের ব্যবস্থাই আছে"—সুচতুরা সখি কাঞ্চনা অপ্রতিভ হইয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। করুণাময়ী প্রিয়াজি বুঝিলেন কথাটা কঠিন হইয়াছে। তিনি তখন পুনরায় বলিলেন "প্রিয় সখি। বৈষ্ণবের শয়নেও ভজন—ভোজনেও ভজন—নিদ্রায়ও ভজন আছে—তোমাদেরও কঠোর ভজন-প্রণালী আমি সকলি জানি—তোমরা যে কেহ আমার নিকটে থাকিতে পার"—এই বলিয়া আর কোন কথা না বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার দু'টি হাত ধারণ করিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন—

"সখি! কহ না গৌরকথা।"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল—তিনি প্রেমাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—

—"সখি! চরণে তোমার ধরি।
গৌরকথা কও, পরাণ জুড়াও,
গোরার বিরহে মরি।
সকল সময়, কথা রসময়,
শুনাও আমার কাণে।
বাঁচাও পরাণে, সুধা বরিষণে,
জুড়াও তাপিত প্রাণে॥"—গৌরগীতিকা।

সখি কাঞ্চনা তখন নিজ বসনাঞ্চলে বিরহিণী প্রিয়াজির নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিয়া সদৈন্য বচনে কহিলেন—"প্রাণ সখি! এত দৈন্য ব্যবহার আমাদের নিকট তোমার শোভা পায় না। আমরা তোমার চরণের দাসী—আদেশ করিলেই কৃতার্থ মনে করি। প্রিয় সখি! তুমি কেন বলিলে—"চরণে তোমার ধরি"—এসকল কথা বলিয়া আমাদিগকে অপরাধিনী কর কেন?" গম্ভীরপ্রকৃতি প্রিয়াজি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন,— পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"সখি! তুমিও ত আমায় যে কাটায় মাপ—সেই কাটায় শোধ দিলে—তুমি বলিলে তোমরা আমার চরণের দাসী—ছি! সখি! ও কথা আর মুখে আনিও না—তোমরা যে আমার গৌরপ্রেমের গুরু"। এই বলিয়াই পুনরায় সখিকে কোন উত্তর দিবার অবসর না দিয়া নিজ হস্তে দুই কপালে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিলেন—"ধিক্ আমাকে! অন্যকথায় বৃথায় সময় নষ্ট করিলাম—সখি! গৌরকথা কও—আমার পিপাসিত কর্ণ শীতল কর"—

সখি কাঞ্চনা আর কোন কথা না বলিয়া তখন নদীয়া-যুগল কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"এস গৌর এস হে!
(আমার) হৃদয়-আসনে এসে বস হে!
নয়ন ভরিয়া তোমা হেরি হে! ধ্রু॥
এস হৃদি মাঝে, নটবর সাজে,
যুগল হইয়ে দাঁড়াও হে।
বামে বিষ্ণুপ্রিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া,
রসরাজ বেশে এস হে!
পিরীতের হাসি, প্রেম পরকাশি,
দু'জনার মুখে দেখি হে!
তেরছ নয়নে, চাহ কার পানে,
(বড়) রসিকশেখর তুমি হে!
বিনোদিনী সনে হৃদয়-আসনে
একবার এসে বস হে!
যুগল-মাধুরী দু'নয়ন ভরি,
হৃদি-মাঝে আমি হেরি হে!
বড় সাধ মনে, হেরি তোমা সনে,
যুগল রূপের ডালি হে!

সেই রূপে এস, হৃদি-কুঞ্জে বস,
তু'জনারে আমি পূজি হে!
রসিক শেখর, তুমি নটবর,
রস-রঙ্গ করি এস হে!
প্রেম-রসে মাতি, করিবে আরতি,
চির-দাসী হরি-দাসী হে!"

গৌর-গীতিকা।

গৌর-বল্লভা প্রিয়াজির নয়নদ্বয়ে শ্রাবণের ধারার ন্যায় প্রেমাশ্রু-ধারা বিগলিত হইতেছে—তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে উদাস-নয়নে চাহিয়া আছেন সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি—সে বদনখানি আজ বড়-সুন্দর—বড়-উৎফুল্ল,—বড়ই প্রেম-পূর্ণ। গানটি শেষ হইলে বিরহিণী প্রিয়াজি বদন অবনত করিয়া সখি কাঞ্চনাকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"সখি! যাহা হইবার নহে—যে আশা পূর্ণ হইবার নহে—সে কথা বলিয়া—সে আশা বুকে পোষণ করিয়া বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন কি? প্রাণ ভরিয়া আমার প্রাণ-বল্লভের গুণ গাও—তাঁহার রূপের কথা বল—আমার তাপিতপ্রাণ শীতল হউক"—সখি কাঞ্চনা এ কথার উত্তর দিতে গেলেন—বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন এবং পুনরায় বলিলেন—

—"সখি! নাহি কহ আন্ কথা।
চরণেতে ধরি, ছাড়হ চাতুরী,
মনে দিওনাক' ব্যথা॥"

সখি কাঞ্চনার মুখ বন্ধ হইল—তিনি আর নদীয়া-যুগল-রূপের কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি অন্যভাবে গৌর-কথার অবতারণা করিয়া একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

শ্রীরাগ।

—"গোরারূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করে সাধ, না পিছলে আঁখি॥
কি ক্ষণে দেখিলাম গোরা কি না মোর হৈল।
নিরবধি গোরারূপ নয়নে লাগিল॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ॥
বাসু ঘোষ বলে গোরা রমণী-মোহন॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

বিরহিণী প্রিয়াজি উৎকর্ণ হইয়া গৌর-রূপের বর্ণনা শুনিতেছেন—আর ভাবিতেছেন এমন সৌভাগ্য তাঁহার কবে হবে—কবে তিনি গৌরময় জগত দেখিবেন—এই রূপ ভাবিতেছেন, আর সখি কাঞ্চনার প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিতেছেন—সে চাহনির মর্ম্ম—"সখি! আরও বল"—

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌর-প্রেমের উৎস—গৌর-নাম-রূপ-গুণ-গান করিতে তিনি শতমুখী হন। পরম আনন্দে প্রেমাবেশে তিনি পুনরায় গৌর-গীতির ধুয়া ধরিলেন—সখি অমিতা দোহার দিতে লাগিলেন,—

রাগ—সুহই।

—"সজনি লো। গোরা-রূপ জনু কাঁচা-সোনা।
দেখিতে নারীর মন ঘরেতে টিকে না॥
বাঁকা ভুরু বাঁকা নয়ন চাহনিতে যায় চেনা।
ওরূপে মন দিলে সই কুল মান থাকে না॥
নয়নে লেগেছে রূপ না যায় পাসরা।
যে দিকে চাই দেখিতে পাই শুধুই সেই গোরা॥
চিন চিন লাগে কিন্তু চিন্‌তে না যায় পারা।
বাসু কহে নাগরি! ঐ গোপীর মন-চোরা॥"

গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা স্থিরভাবে বসিয়া গান শুনিতেছেন—তাঁহার এখন স্তম্ভ-ভাব। মনে মনে ভাবিতেছেন—পদকর্ত্তা বলিতেছেন গোরা-রূপ একবার দেখিলে—"নারীর মন ঘরে টিকে না"—আমার মন ত বাহিরে যেতে চাহে না—আমি ত ঘরেই আছি—তবে কি আমি গৌর পাব না? পদকর্ত্তা পুনরায় বলিতেছেন—"ওরূপে মন দিলে কুল মান থাকে না"—আমার ত কুল মান সকলি আছে—অমি যে কুলের কুলবধু—আমার যে সে অভিমানটুকু আছে—তবে কি আমি গৌর পাব না"—এইরূপ মনোভাব লইয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রিয় সখির মুখে গৌররূপের অপূর্ব্ব বর্ণনা শুনিতেছেন,—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন।

সখি কাঞ্চনার তখন গৌর-রূপ-গুণ-গানে মন প্রমত্ত হইয়াছে—তাঁহার হৃদয় খানি গৌরপ্রেমের অফুরন্ত উৎস—তিনি তাঁহার প্রিয়সখির মন বুঝিয়াই পুনরায় গান ধরিলেন—

রাগ-কামোদ।

—"নিরমল গৌর-তনু, কষিত-কাঞ্চন জনু,
হেরইতে পড়ি গেলুঁ ভোর।
ভাঙ-ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন,
অন্তর কাঁপয়ে মোর।
সজনি! যব হাম পেখনু গোরা।
অকুল দিগ বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদন-লালসে মন ভোরা। ধ্রু।"
অরুণিত লোচনে, তেরছ অবলোকনে,
বরিষে কুসুম শর সাথে।
জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাওব,
জনু পড়ু গঙ্গা অগাধে॥
মন্ত্র-মহৌষধি তুহুঁ যদি জানসি,
মঝু লাগি করহ উপায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে, শুন শুন হে সখি!
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিনী।

গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা স্তম্ভ-ভাবে বিভাবিত হইয়া ভজন-মন্দিরের দেওয়ালের ভিতে হেলান দিয়া নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছেন। সখি অমিতা তাঁহার নিকটেই আছেন—এক্ষণে তাঁহার ক্রোড়ে প্রিয়াজি যেন প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন—তাঁহাকে সখি অমিতা পরম প্রেমভরে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। সখি কাঞ্চনার কলকণ্ঠে গৌর-প্রেমের অফুরন্ত উৎসের ঝরণা ঝরিতেছে,—তিনি পুনরায় আপন মনে গান ধরিলেন,—

রাগ—বিভাস-দশকুশি।

—"নিশি পরভাতে, বসি আঙ্গিনাতে,
বিরস বদন খানি।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের, এ কি ব্যবহার,
এ মতি কভু না জানি॥
সই! এমতি করিল কে?
গৌর গুণনিধি, বিধির অবধি
তাঁহারে পাইল সে। ধ্রু॥
কস্তুরি চন্দন, করি বরিষণ,
গাঁথিয়া ফুলের মালা।
বিচিত্র পালঙ্কে, শেজ বিছাইনু,
শুইবে শচীর বালা॥
হেদে গো সজনি, সকল রজনী,
জাগিয়া পোহানু বসি।
তিলে তিন বার, দণ্ডে শতবার,
মন্দির বাহিরে আসি॥
বাসু ঘোষ বলে, গৌরাঙ্গ আইলে,
এখনি কহিব তাহে।
হেথা না আওল, রজনী বঞ্চল,
আছিল কাহার ঘরে॥"

গৌরপদতরঙ্গিনী।

গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী নিস্তব্ধভাবে এখনও সখি অমিতার ক্রোড়ে শায়িতা—তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত,—অন্তরে বাহ্য জ্ঞান আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ-গুণ-গান শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন এবং বদন প্রফুল্ল বোধ হইতেছে—মধ্যে মধ্যে তিনি এক এক বার চক্ষুরুন্মিলন করিয়া সখি কাঞ্চনার মুখের প্রতি সজল নয়নে চাহিতেছেন—মনে কত কথা বলিবার সাধ হইতেছে,—কিন্তু কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির মনভাব বুঝিয়াই যেন আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

"প্রাণ-বঁধুয়া হে!
কত যে বাখানি, সুন্দর মু'খানি,
কি ক'রে তোমায় বলি।
রূপ-রসে তব, ভুলিয়াছি ভব,
কুলেতে দিয়াছি কালি॥
নয়নের আড়, করিলে আঁধার,
দেখি যে ত্রি-সংসার।
(আমি) মানস-পটেতে, আঁকিয়া তুলিতে,
হেরি গো ওরূপ-সার॥
যে দিকে নেহারি, গৌররূপ হেরি,
অন্তরে বাহিরে তুমি।
নয়নানন্দ, প্রেম-কন্দ,
তোমার রূপের খনি॥
চন্দ্র-বদনে, তেরছ নয়নে,
চাহিয়া আমার পানে।

কি কহিলে তুমি, শুনা নাহি গেল,
বরজ পড়ুক কানে॥
চির অন্ধ কর, গৌর গুণাকর,
চিরনিদ্রা দাও মোরে।
স্বপনে ডুবিয়ে, পিয়াস মিটায়ে,
(তব) রূপ হেরি প্রাণভরে॥
মনশ্চক্ষু-সার, দরশাধিকার,
(তুমি) দিয়েছ যাহার প্রাণে।
বাহ্য ইন্দ্রিয়, ওহে প্রাণপ্রিয়,
(সে) তুচ্ছ বলিয়া জানে॥
চির অভাগিনী, এ হরিদাসিরা,
স্বপনে হেরিবে তোমা।
দু'টী পদে ধরি, ওহে গৌর-হরি,
(তুমি) করিও না তারে মানা॥"

গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা এতক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া দু'একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সখি কাঞ্চনার প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন—"সখি! প্রিয়সখি! আত্মারাম ঋষিগণের ভগবত সাক্ষাৎকার হয় প্রাণে প্রাণে—শ্রীভগবান তাঁহাদিগের আত্মার সহিত রমণ করেন—সাধারণ জীবের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? সাক্ষাৎ দর্শনে বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহারা কায়মনবাক্যে প্রিয়তমের সেবা করিয়া প্রেমানন্দ পান—স্বপ্নের মিলনে সে সুখ ও সে আনন্দের তুলনা হয় না। তাহা ক্ষণিক ও অস্থায়ী সুখ মাত্র—তাহাতে কি আমাদের মত মায়িক জীবের প্রাণ বাঁচে?—দুগ্ধের তৃষ্ণা কি ঘোলে মিটে?"

সখি কাঞ্চনা এবার বড় বিপদে পড়িলেন—গৌর-বল্লভার স্বরূপ-তত্ত্ব তিনি জানেন—গৌর-বল্লভাও তাহা জানেন—কিন্তু সর্ব্বোত্তম নরলীলায় প্রচ্ছন্ন-অবতার-নারীর প্রচ্ছন্নত্বই যে বড় মধুময়—কেহ কাহাকেও ধরা ছোঁয়া দেন না। অপ্রকট নিত্যলীলায় গোলোকে সর্ব্বক্ষণ যুগল-বিলাস—মিলন-সম্ভোগাদি হইতেছে—প্রকট-গৌর-লীলায় তাহা লীলারস-পুষ্টির উদ্দেশে লোক-লোচনের গোচরীভূত নহে। গৌর-বল্লভার এই যে বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন,—ইহা একটী অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ, জীবজগতের শিক্ষা ও মঙ্গলের জন্য। এ সকল কথা প্রকট-লীলায় লীলাময় ও লীলাময়ীকে বলিবার কাহারও অধিকার নাই—ইহাই সর্ব্বোত্তম নরলীলার সর্ব্বোত্তম মধুরত্ব ও অভিনবত্ব। লীলা পুরুষোত্তম ও শ্রেষ্ঠা লীলাশক্তির সহিত কোন রূপ "কেন" প্রশ্ন নাই।

সখি কাঞ্চনা বিপদে পড়িয়া কি উত্তর দিবেন—তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না—এমন সময়ে চতুরচূড়ামণি এবং সর্ব্বরসবতী প্রিয়াজি আপনার প্রশ্ন আপনিই সমাধান করিয়া শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিধ সম্ভোগের কথা তুলিলেন,—সংকীর্ণ, সংক্ষিপ্ত, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান,—স্বপ্নে প্রিয়তমের সহিত মিলনে এই চারি প্রকার সম্ভোগে যে সুখোদয় হয়—তাহা ক্ষণিক এবং অস্থায়ী হইলেও নায়িকার জীবন রক্ষার প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য। সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগও স্বপ্নে কথঞ্চিৎ সম্পন্ন হয়। বিরহের পর সাক্ষাৎ মিলন ও সাক্ষাৎ সম্ভোগ অবশ্য প্রয়োজন—কিন্তু সর্ব্বত্র তাহা সম্ভব নহে। এই ভাবের কথা বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—সুচতুরা সখি কাঞ্চনা সুযোগ বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার প্রাণসখিকে অতি গোপনে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! মনের কথা আমাদের নিকট লুকাইও না—তোমার সুখেই আমাদের সুখ—তোমার সুখের জন্যই আমাদের গৌর-আরাধনা—স্বপ্নে তোমাদের মিলনের কথা শুনিলেও আমাদের প্রাণে প্রেমানন্দের তুফান উঠে—বল বল সখি! তুমি আজ কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?"

বিরহিণী গৌর-বল্লভার বদন প্রসন্ন—চিত্ত প্রফুল্ল—কিন্তু মুখে কোন কথা নাই—তিনি লজ্জায় অধোবদনে নীরবে রহিলেন—নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—মর্ম্মী সখিদিগের নিকটেও তিনি নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না—মনের দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতেছে—বিরহিণী প্রিয়াজি আজ বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। এই এক অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ।

সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে অনবরত তাঁহার অশ্রু-সিক্ত বদনখানি মুছাইয়া দিতেছেন,—আর কত না সাধ্য সাধনা করিতেছেন—কিন্তু কিছুতেই গৌর-বল্লভার মুখে কথা ফুটিতেছে না,—তাঁহার মনের ভাব মনেই রহিল,—পেটের কথা পেটেই রহিল। তখন সর্ব্বজ্ঞা ও সুচতুরা

সখি কাঞ্চনা অতি মৃদুমধুরস্বরে নিজেই একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ বিভাস।

—"নিশি শেষে ছিনু ঘুমের ঘোরে।
গৌর নাগর পরিরম্ভিল মোরে॥
গণ্ডে করল সোই চুম্বন দান।
কয়ল অধরে অধর-রস পান॥
ভাঙ্গল নিদ নাগর চলি গেল।
অচেতনে ছিনু চেতনা ভেল॥
লাজে তেয়াগিনু শয়ন-গেহ।
বাসু কহে তুয়া কপট লেহ॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

বিরহিণী প্রিয়াজি মলিন বসনাঞ্চলে বদন ঝাঁপিয়া গান শুনিতেছিলেন—তিনি বালিকার মত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সখি কাঞ্চনার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। সখি কাঞ্চনা গৌর-বল্লভার কায়ব্যূহ—তিনি তাঁহার মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিলেন। এক্ষণে প্রাণের আবেগে পরম প্রেমভরে দুই সখিতে গলা-জড়াজড়ি করিয়া প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইলেন। সখি অমিতা এসকল দেখিয়া শুনিয়া এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিলেন,—এক্ষণে তিনিও দুই সখির গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরিয়া ডুকরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। নদীয়ার মহা গম্ভীরামন্দিরের অতি নির্জ্জন ও নিভৃত স্থানে এই যে করুণরসাত্মক অপূর্ব্ব দৃশ্যটি সংঘটিত হইল,—এই যে শ্রীশ্রীনদীয়া যুগলের অপূর্ব্ব মধুর স্বপ্নবিলাস লীলাটি বর্ণিত হইল—ইহা আস্বাদন করিবার অধিকারী অতি বিরল,—ইহা রসিক ভক্তজনের গুপ্ত ভজন-সম্পত্তি।

সখি কাঞ্চনা এই সময়ে ধীরে ধীরে তাঁহার প্রিয়সখির প্রেমপরিসিঞ্চিত ভুজবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আর একটি এই ভাবের স্বপ্নবিলাসের প্রাচীন পদ গাইলেন—

রাগ ধানশী।

—"আজুক প্রেম কহনে নাহি যায়।
শুতি রহল হাম সেজ বিছায়॥
রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু নুপুর পায়।
পেখলু গৌরাঙ্গবর নটরায়॥
আঁচলে রাখনু আচল ছাপই।
বিদগধ নাগর চৌদিকে চাই॥
বহু সুখ পাওল গোরা নটরায়।
বাসুদেব কহে রস কহনে না যায়॥"

গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

এ সকল গৌরানুরাগিণী গৌর-নাগরীদিগের পদ গৌরাঙ্গ-পার্ষদ ভক্ত মহাজন কর্ত্তৃক রচিত। নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে গৌর বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী ও অন্তরঙ্গা সখিদিগের সহিত এ সকল পদের রসাস্বাদন করিতেন—করিয়া মনে বড় সুখ পাইতেন।

রসশাস্ত্রে বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনের মধ্যে মধ্যে নায়ক-নায়িকার মিলন-সুখ-বর্ণনার ব্যবস্থা আছে—এইরূপ রসাস্বাদন দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়—এক স্বপনে, আর সাক্ষাৎ ভাবে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় সাক্ষাৎভাবে এই মিলন-সুখ-রসাস্বাদন সম্ভব নহে বলিয়া রসপুষ্টির জন্য যে সকল রসিকভক্ত মহাজনগণ স্বপ্নে সম্ভোগ-রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করিয়া পদ লিখিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে ঠাকুর নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, ঠাকুর লোচনদাস অগ্রণী।

সখি কাঞ্চনা আজ কিছু সাহস পাইয়াছেন—তাঁহার প্রাণে আজ বড় আনন্দ—তাঁহার বিরহিণী প্রিয়সখি যে এইরূপ স্বপ্ন-বিলাস ও তজ্জনিত মিলন-সুখানন্দ অনুভব করিয়া স্থিরচিত্তে বসিয়া তাঁহার গানগুলি শুনিতেছেন—ইহাতেই তাঁহার পরমানন্দ। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ-ভাবে পরম প্রেমাবেগে আর একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ ধানশী।

—"কি কহব রে সখি! রজনিক বাত।
শুতিয়া আছিনু হাম গুরুজন সাথ॥
আধ-রজনী যব পূরণ চন্দা।
সুমলয়-পবন বহয়ে অতি মন্দা॥
গৌরক প্রেম ভরল মঝু দেহা।
আকুল জীবন না বান্ধই থেহা॥
গৌর গরব করি উঠল রোই।
জাগল গুরুজন কাহো পুনরাই॥
গৌর-নাম সব শুনল কাণে।
গুরুজন তবহি করল চিত আনে॥

চোর চোর করি উঠায়ল ভায়।
বাসুদেব ঘোষে কহে ঐছে বিলাস ॥"
গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

বিরহিণী প্রিয়াজি সকল গানগুলিই অতিশয় আগ্রহের সহিত শুনিলেন,—পরিশেষে অতি গোপনে পরম প্রেমভরে সখি কাঞ্চনার গলা ধরিয়া কাণে কাণে বলিলেন—"সখি! প্রাণের সখি! এ সকল অতি গুহ্য পরম গৌরানুরাগের কথা তোমাদের মুখেই শোভা পায়—তোমরা পরম গৌরানুরাগিণী—আমার মত মন্দভাগিনীর পক্ষে এ সকল রস-কথা আকাশ-কুসুমের মত—বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার দুরাশা মাত্র। এ সকল বেদ-গোপ্যকথা সাধারণে প্রকাশ-যোগ্য নহে—প্রকাশ করিলে ইহার মর্ম্ম কেহ বুঝিবে না—বরঞ্চ লোকে মন্দ বলিবে।"

প্রিয়াজির মুখে এই কথাটি শুনিয়াই গৌর-গরবিণী সখি কাঞ্চনার মনে আর একটি গানের ভাব উদয় হইল। তিনি পুনরায় ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ এড়াই॥
বলে বলুক পাড়ার লোকে তাহে নাহি ডর।
না বলুক না ডাকুক না যাব কার ঘর॥
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বঁধুরে হারাই॥"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। সখি কাঞ্চনার গৌরানুরাগ অতি তীব্র—এইরূপ গৌরানুরাগিণীর মত সৌভাগ্য লাভাশায় তিনি জীবনপাত করিবেন মনে মনে এই সংকল্প করিলেন। মুখে সখি কাঞ্চনাকে বলিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমি ধন্য! তোমার এই অকপট সহজ গৌরানুরাগপূর্ণ অপূর্ব্ব গৌর-সঙ্গ-লালসা দেখিয়া আমার মনে হিংসার উদ্রেক হয়। কবে আমি তোমার মত হইব?—তোমার মত সৌভাগ্য আমার কবে হবে? তাই ভাবিতে ভাবিতে আমি এই জীবন কাটাইতে পারিলেই কৃতকৃতার্থ মনে করিব। তুমি সখি! আমাকে কৃপা করিবে।"—

এই বলিয়া গৌর-বল্লভা সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন,—তাঁহার সখিদ্বয়ও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। প্রিয়াজি ভজন মন্দিরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন—এই সময়ে সখি কাঞ্চনা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—সখি! আজ আর দ্বার রুদ্ধ করিও না—আমরা একজন তোমার ভজন-মন্দিরে রাত্রিতে থাকিব"। গৌর-বল্লভা এ কথায় কোনরূপ উত্তর না দিয়াই ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিলেন না। ইহাতেই সখিদ্বয় বুঝিলেন প্রিয়াজির অনুমতি আছে,—এখন রাত্রিতে প্রিয়াজির সঙ্গে কে থাকিবেন সেই কথা লইয়া দুই সখিতে আলোচনা করিতে লাগিলেন—প্রিয়াজি ত কিছুই এ সম্বন্ধে বলেন নাই। সখি অমিতা কাঞ্চনাকে বলিলেন—"সখি! তুমিই রাত্রিতে প্রিয়াজির সঙ্গে থাকিও—আমি যেমন মন্দির-দ্বারে থাকি সেই ভাবেই থাকিব"—অমিতার এরূপ উদারতা দেখিয়া সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া প্রেমাবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুই জনে কতক্ষণ নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্ম-সম্বরণ করিয়া ভজন-মন্দির-দ্বারে বসিয়া সখিদ্বয় নিজ নিজ সংখ্যানাম জপে রত হইলেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমেই আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের শয়ন-গৃহের প্রত্যেক বস্তুটী স্বহস্তে অতিশয় প্রীতির সহিত সংস্কার করিতেছেন। সেই মণিময় রত্ন-খচিত পর্য্যঙ্ক—সেই মখমলের গদি—সেই রেশমী ঝালর-দেওয়া বালিশ—সেই জরির ঝালর-দেওয়া নেটের মসারি—সেই চন্দনের স্বর্ণ কটোরা—সেই রৌপ্য-নির্ম্মিত পানের বাটা—সেই স্বর্ণ-ঝারি—সেই কৃষ্ণকেলি ধুতি—সেই ঢাকাই সূক্ষ্ম উড়ানি—সেই স্বর্ণ থালি, গ্লাস ও বাটি—তাঁহার প্রাণবল্লভের সেই পুঁথিপত্র—শয়ন-গৃহের দেওয়ালে ঝুলান সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল বিলাসের বহু মূল্যবান অতি সুন্দর তৈলচিত্রগুলি—সেই মণিরত্ন-খচিত বিচিত্র দর্পণ—যে দর্পণে প্রভুপ্রিয়াজি একত্রে শ্রীমুখ দেখিতেন—দেওয়ালের সুন্দর কাচের আলমারিতে সেই সুবাসিত চন্দন তৈলের স্বর্ণ পাত্রটি,—নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যের রৌপ্যাধারগুলি—যাহা তাঁহার প্রাণবল্লভ নিত্য ব্যবহার করিতেন—সেই সকল যুগল-বিলাসের অতি যত্নের বড় সাধের সামগ্রীগুলি আজ বিরহিণী প্রিয়াজি নিজ হস্তে সংস্কার করিতেছেন—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—আর অস্ফুট ক্রন্দনের স্বরে বলিতেছেন—

—"যে ঘরে শুইতে তুমি—কেউ খোলেনি।
বিছানা, বালিশ, খাট,—কেউ তোলেনি॥"
বিলাপ-গীতি।

শচীমাতার অপ্রকটের পর তাঁহার প্রাণবল্লভের সেই শয়ন-মন্দির খোলা হইয়াছে—সেই গৌরশূন্য গৌর-শয়ন-গৃহই প্রিয়াজির এখন ভজনমন্দির—নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির। এই নদীয়া-যুগল-বিলাসস্থলীই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ—নদীয়ার রাসস্থলী—গৌরভক্তবৃন্দের পক্ষে মহা-পীঠস্থান—মহা আদরের বস্তু—মহা মূল্যবান রত্ন।

শচীমাতা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সন্ন্যাসগ্রহণের পর মধ্যে মধ্যে তাঁহার এই শয়ন-গৃহে আসিয়া অঙ্গ আছাড়িয়া বক্ষ চাপড়িয়া করুণ ক্রন্দনের রোলে গৌরশূন্য গৌর-গৃহ পূর্ণ করিতেন—ইহা দেখিয়া বুদ্ধিমতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার প্রাণবল্লভের শয়নগৃহ একেবারে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন—জানালা মাত্র কখন কখন খোলা থাকিত—গভীর রাত্রিতে আসিয়া পুত্রশোকাতুরা পাগলিনী শচীমাতা সেই উন্মুক্ত গবাক্ষ-দ্বারে দাঁড়াইয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেন—আর উচ্চৈঃস্বরে আকুল ক্রন্দন করিতেন—তখন বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মহা বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিয়া ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার শয়ন-গৃহে আনিতেন, আর অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহার প্রাণবল্লভকে বলিতেন,—

"যে ঘরে শুইতে তুমি—কেউ খোলেনি।
বিছানা বালিশ খাট কেউ তোলেনি॥
গভীর নিশায় উঠি, সেই ঘরে যান ছুটি
উঁকি মেরে কি দেখেন,—আমি কি জানি।
আমার ত ঘুম নাই, সকলি দেখিতে পাই,
জননীর দশা দেখি—কাঁদে পরাণি।
চরণ ধরিয়া মা'র, বলি আমি বারম্বার,
"শোবার ঘরেতে মাগো! যেয়ো না তুমি।
যে ঘরে শুইতে তুমি—কেউ খোলেনি॥"
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ গীতি।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনে আজ সেই পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইতেছে—তাঁহার পুত্র-শোকাতুরা অতিবৃদ্ধা শাশুড়ীর দুঃখের কথা—অপূর্ব্ব পুত্রস্নেহের কথা আজ তাঁহার স্মরণ হইতেছে—সেই পূর্ব্বস্মৃতির জাগরণে তাঁহার হৃদি-সমুদ্র শোকে ও দুঃখের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইতেছে—আজ গৌর-বল্লভার গৌর-ভজনের সহায়িনী—তাঁহার গৌর-বিরহ-শোকাকুলা নিত্যধামগতা স্নেহবতী শাশুড়ী শচীমাতার পূর্ব্ব-স্মৃতি সকল একে একে তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে। পুত্র-শোকাতুরা শচীমাতা গৌরশূন্য গৌরগৃহে বসিয়া কি করিতেন কেবলই তাই আজ বিরহিণী প্রিয়াজির মনে সর্ব্বক্ষণ উদয় হইতেছে—তাঁহার গৌর-বিরহ-রূপ হৃদি-সমুদ্রে তরঙ্গের উপর আজ তরঙ্গ উঠিতেছে—তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার গৌর-বিরহ-দগ্ধ মনপ্রাণ ও দুর্ব্বল দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। তিনি তাঁহার পুত্রশোকাতুরা শাশুড়ীর দুঃখে আকুলপ্রাণে একদিন তাঁহার প্রাণবল্লভকে দুঃখিনী শাশুড়ীর দুঃখকথা কিছু কিছু জানাইয়াছিলেন—তাহা শ্রবণ করিলে কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রব হয়—কিন্তু তাহাতে কলিহত জীবের পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় দ্রব হইল না। এই দুঃখে সেই পুরাতন স্মৃতিকথা সকল এখানে প্রিয়াজীর ইচ্ছায় পুনরায় বর্ণিত হইল—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার প্রাণবল্লভকে দুঃখিনী মাতার কথা কহিতেছেন—

—"ভোরে উঠে ধেয়ে যান গোয়ালা বাড়ী।
গোয়ালাকে দিতে চান পাটের সাড়ী॥
"ক্ষীর, সর, ননী দিবে, নিমাই আমার খাবে,
বলিতে বলিতে বসেন ধরিয়া ধারি।
গোয়ালিনী কেঁদে মরে, জননীকে কোলে ধরে,
গৃহেতে লইয়া আসে—নয়নে বারি।
বুঝিলে না দুখ তুমি, কি আর বলিব আমি,
সকলি বুঝিতে পারে,—অবলা নারী।
(মা) ভোরে উঠে ধেয়ে যান গোয়ালা বাড়ী॥"

—"কোথা হ'তে শাক তুলি' দেন রাঁধিতে।
বলেন "নিমাই মোর চেয়েছে খেতে॥"
ভালবাস তুমি যাহা, যেখানে দেখেন তাহা,
যতনে আনিয়া মাতা—থোন ঘরেতে।
তুমি যে গৃহেতে নাই, সে জ্ঞান তাঁহার নাই,
রন্ধন করিতে যান—হরিষ চিতে।
সকলি বুঝিতে পারি, দেখে শুনে কেঁদে মরি,
ভুলে যান মা তোমার—কিসে কি দিতে।
কোথা হ'তে শাক তুলি, দেন রাঁধিতে॥"

—"রাধা বাড়া পড়ে থাকে উনান পাড়ে।
তোমারে ডাকিতে যান গঙ্গার ধারে॥
ঘাটে-ঘাটে ছুটে যান, কণ্ঠগত হয় প্রাণ,
প্রখর রোদের তাপে পিপাসা বাড়ে।
ঘাটে বাটে পান যারে, কাঁদিয়া সুধান তারে
"কোথায় নিমাই মোর?—বলে দে ওরে।
সকলে ধরিয়া মায়, বাড়ী পানে নিয়ে যায়,
দূর হ'তে দেখে মোর—নয়ন ঝরে।
রাধা বাড়া পড়ে থাকে—উনান পাড়ে॥"—

—"গৃহেতে যখন মাতা আসেন ফিরে।
আধমরা দেখি তাঁরে,—মাথার কিরে॥
কত লোক সঙ্গে আসে, ধ'রে মাকে আশে পাশে,
বুক ভাসে সকলের আঁখির নীরে।
কি সুখ নদীয়াবাসে, দেখে যাও তুমি এসে,
দেখাব হৃদয়াগুন হৃদয় চিরে।
যে দুখ হৃদয়ে ধরি, মুখে তা বলিতে নারি,
বুক চিরে দেখাইব—আসিলে ফিরে।
একবার এস ফিরে,—মাথার কিরে॥"—

—"রোজ আসে মার কাছে মালিনী মাসী।
নিমাইয়ে কহে তব গুণের রাশি॥
প্রাণের সখিরে দেখি, ঝরে মার দু'টী আঁখি,
দুহুঁ জনে কত কাঁদে ঘরেতে বসি।
লুকায়ে আমাকে ঘরে, মনাগুণে দোঁহে ঝুরে,
সকলি দেখিতে পায় তোমার দাসী।
ঘরেতে রেখেছ তারে এই সব দেখিবারে,
কেন বা দিলে না তার গলায় ফাঁসি।
রোজ আসে মার কাছে মালিনী মাসী॥"—

—"নিজ সেবা অধিকার দিলে না তুমি।
মাতৃসেবা করিতে যে না পারি আমি॥
কারে বা যতন করি, কি যাতনা হরি হরি!
দিনান্তে না দিতে পারি অন্ন পানি।
রাতে তার ঘুম নাই, সর্ব্ব অঙ্গে মাখে ছাই,
মাথায় ধুলার রাশি,—মুখে নাই বাণী।
রাজমাতা ভিখারিণী, তোমা তরে পাগলিনী,
কি ক'রে যতন করি,—আমি কি জানি।
(মোরে) নিজ সেবা অধিকার দিলে না তুমি॥"
যদি ধুলা ঝাড়ি দিয়ে নাইতে বলি।
"নিমাই নিমাই" বলি কাঁদেন ফুলি॥
তেলের বাটিটি নিয়ে, কাছে যদি যাই ধেয়ে,
তথা হ'তে কোথা যান—উঠিয়া চলি।
ছিন্ন বসনখানি, না ছাড়েন কভু তিনি,
জপ, তপ, পূজা পাঠ—গেছেন ভুলি॥
তব নাম করি সার, বহেন জীবন ভার,
শয়নে স্বপনে শুধু "নিমাই" বুলি।
যখন তখন তিনি কাঁদেন ফুলি॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

এই সকল পূর্ব্বস্মৃতি গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির মনে আজ উদিত হইয়া তাঁহাকে পরম বিহ্বল করিয়াছে—তিনি আকুলপ্রাণে নয়নাশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত করিয়া আজ এই ভাবেই গৌর ভজন করিতেছেন। তিনি আজ আর আসনে বসেন নাই—জপের মালা যথাস্থানেই আছে—তিনি আনমনা হইয়া আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের ব্যবহৃত প্রিয় বস্তুগুলির সংস্কার করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝরিতেছেন।

সখিদ্বয় গবাক্ষদ্বার দিয়া সকলি দেখিতেছেন—বিরহিণী প্রিয়াজির মুখে কথা নাই—নীরবে নয়নজলে গাত্রবসন সিক্ত করিয়া, উষ্ণ অশ্রুসলিলে তাঁহার প্রাণবল্লভের শয়ন-মন্দির বিধৌত করিয়া আজ গৌরবক্ষবিলাসিনী তাঁহার ভজন-মন্দিরে যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছেন, তাহা বড়ই মর্ম্মন্তুদ—বড়ই প্রাণঘাতী। সখিদ্বয় কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন—কিন্তু প্রিয়াজির এই অপূর্ব্ব গৌর-ভজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সাহস করিতেছেন না—তাঁহারা দূর হইতে এই অপূর্ব্ব গৌরানুরাগের অদ্ভুত ভজন পদ্ধতি দেখিতেছেন এবং শিক্ষা করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নবদ্বীপ-লীলাময়ী,—এই অপূর্ব্ব লীলাময়ীর লীলাভঙ্গীও অপূর্ব্ব। কলিহত জীবের শিক্ষার জন্য পাষাণ-হৃদয় কলিজীবের কঠিন প্রাণে গৌরানুরাগ সঞ্চার করিবার জন্যই গৌর-বল্লভার এই সর্ব্বোত্তম নরলীলার অপূর্ব্ব লীলাভিনয়।

রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গৌর বিরহিণী প্রিয়াজি এইরূপে তাঁহার গৌর-ভজনের গৌর-চন্দ্রিকা করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মলিন ছিন্নাসনে আসিয়া বসিলেন। আত্ম-সম্বরণ করিয়া তখন তিনি সংখ্যানাম গ্রহণে মনোনিবেশ করিলেন। এই ভাবে রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইলে সখি

কাঞ্চনা নিঃশব্দে প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরের দ্বার ঠেলিয়া ধীরে ধীরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন! পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রিয়াজি আজ আর তাঁহার ভজন-মন্দির-দ্বারের অর্গল বন্ধ করেন নাই। সখি কাঞ্চনা যে ভজন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—তাহা বিরহিণী প্রিয়াজি জানিতেও পারিলেন না,—তিনি তখন জপমগ্না। সখি কাঞ্চনাও অতি সন্তর্পণে ভজন-মন্দিরের এক প্রান্তে বসিয়া সংখ্যানাম জপে মগ্না হইলেন—টিপি টিপি একটী ঘৃতের দীপ জ্বলিতেছে—ক্ষীণালোকে প্রিয়াজিকে তিনি ভাল করিয়া দেখিতেও পাইলেন না।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে দিবারাত্রি গভীর নিস্তব্ধতা ও নীরবতার রাজ্য বিস্তার রহিয়াছে—সে রাজ্যে জন-কোলাহলের লেশাভাসও নাই—নির্জ্জন—নীরব—নিস্তব্ধ—গৌর-শূন্য গৌর-গৃহে তিনটি মাত্র একান্ত গৌরনিষ্ঠা গৌর-বিরহিণী গৌর-ভজন-রতা,—দুইজন মন্দির মধ্যে এবং এক জন বাহিরে মন্দিরদ্বারে সংখ্যানাম জপ-মগ্না। এইভাবে রাত্রি শেষ হইয়া গেল—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাহারও শয়ন নাই—আসনে বসিয়াই গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি এবং তাঁহার গৌর-পাগলিনী সখি কাঞ্চনা শেষ রাত্রিটা গৌর-নাম-জপ-ধ্যানে কাটাইয়া দিলেন। প্রভাতে টহলিয়া নগরকীর্ত্তনের দল আসিয়া প্রভাতী কীর্ত্তনের সুর ধরিল—

রাগ কামোদ।

—"শেষ রজনী মাহা, শুতল শচীসুত,
তত্তহি ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগরণ কিয়ে, দুঁহু নাহি সমঝই,
নয়নহি আনন্দ লোর॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল-নায়ক—কোরহি,
নায়রী শয়ন-বিভঙ্গ॥ ধ্রু॥
বাম চরণ ভুজ, পুনঃ পুনঃ আগোরই,
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আঁখি মুদি,
বচন রসাল সহাস॥
যা কর ভাবহি প্রকট নন্দসুত,
গৌরবরণ পরকাশ।
সতত নবদ্বীপে সোই বিহরই,
কহ রাধামোহন দাস॥"

গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

দ্বিতীয় দল আসিয়া কীর্ত্তন গাহিল—

যথারাগ।

"তেজহ শয়ন গৌর-গুণ-ধাম।
চাঁদ মলিন গত যামিনী যাম॥
পুরুষ দিশা সখি সব ভুলি গেল।
অনুরাগহি রক্তাম্বরি ভেল॥
মুদিত কুমুদ তহি মধুপ নিবাস।
বিকশিত কমল চলত তছু পাশ॥
চক্রবাকী-উলসিত পতিসঙ্গ!
নরহরি হেরি হসত বহু রঙ্গ॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

তৃতীয় দল আসিয়া কীর্ত্তন গাহিল—

রাগ—সুহই।

প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ।
হেরই সকলে আন ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন রাতা।
অলসে ঈষৎ মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলি মুড়িয়া মোড়য়ে তনু।
যৈছন অতনু কনক-ধনু॥
দেখিতে আওল ভকতগণে।
মিলিল বিহানে হরিষ মনে॥
মুখ পাখালিয়া গৌর-হরি।
বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি॥
নদীয়া নগরে হেন বিলাস।
যদুনাথ দেখে সদাই পাশ॥"

পদকল্প-তরু।

চতুর্থ দল আসিয়া গাহিল,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী"—

সখিদ্বয় সহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভজন-মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রভাতী কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন এবং প্রাতঃ-কালীন গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। একে একে কীর্ত্তনের দল গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বার হইয়া নগর ভ্রমণে বাহির হইল—নদীয়াবাসী সেই কীর্ত্তনে যোগদান করিল। কীর্ত্তনের পুরোভাগে সংকীর্ত্তন যজ্ঞেশ্বরের আবির্ভাব হইল—সর্ব্ব নদীয়ায় প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিল।

প্রিয়াজিকে লইয়া সখিদ্বয় অন্দর মহলে গেলেন—প্রাতঃকৃত্যাদি-সমাপন করিয়া প্রিয়াজি স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পুনরায় ভজন-মন্দিরে আসিলেন। সখিদ্বয়ও তাঁহার সঙ্গেই আছেন—তুলসী দেবীকে পরিক্রমা ও প্রণাম করিয়া প্রিয়াজি জপমালা হস্তে সখিদ্বয় সহ ভজন-মন্দিরদ্বারে বসিলেন।

ফাল্গুন মাস,—আগামী কল্য গৌরপূর্ণিমা—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের জন্মোৎসবে বৈষ্ণব-সেবাদির কিছু ব্যবস্থা করাইতে প্রিয়াজির মনে বাসনা হইয়াছে। তিনি সেই কথাটি চুপে চুপে তাঁহার অন্তরঙ্গা মর্ম্মীসখি কাঞ্চনাকে বলিলেন। সখি কাঞ্চনা কহিলেন "প্রাণসখি। সে ব্যবস্থা নদীয়া-বাসী গৌরভক্তগণ অগ্রেই করিয়াছেন—যথাযোগ্য ব্যবস্থাই করা হইয়াছে"। বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের আদেশ-বাণী আজ বিশিষ্টভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার আদেশ—

—"সঙ্কীর্ত্তন-করাইহ বৈষ্ণবেরে অন্ন দিহ,
এই সত্য পালিহ আমার"—

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞারম্ভ হইয়াছে—বৈষ্ণবদিগকে অন্নদান অর্থাৎ প্রসাদ দান প্রিয়াজির নিত্যকৃত্য,—সে কণিকা মাত্র—তাহাকে প্রকৃতপক্ষে অন্নদান বলে না—গৌর-বল্লভার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে—তাই তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনাকে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে বৈষ্ণব-সেবার বিশিষ্ট ব্যবস্থা করাইতে বলিলেন—কিন্তু তাঁহারই প্রেরণায় সে ব্যবস্থা নদীয়াবাসী গৌরভক্তবৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। মহামহোৎসবের উপযোগী খাদ্য-দ্রব্য-সম্ভার গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের বহির্বাটীতে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে—বহির্বাটির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ সুবৃহৎ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হইয়াছে—সম্মুখে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান সকলও পরিস্কৃত করা হইয়াছে। দ্রব্যাদিতে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছে—এই মহামহোৎসবের সমস্ত ভার লইয়াছেন নদীয়ার জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান। ঠাকুর বংশীবদনের উপর বৈষ্ণব নিমন্ত্রনের ভার আছে। শ্রীবৈষ্ণব-গৃহিণীগণ পাকশালার সমস্ত ভার লইয়াছেন—ইহার মধ্যে শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী আছেন। শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী আছেন,—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-গৃহিণী সর্ব্বজয়া দেবী আছেন এবং আরও অনেক বৈষ্ণব-শক্তি আছেন। নদীয়া-বাসী গৌরভক্তবৃন্দ সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন—পর্ব্বত প্রমাণ রাশীকৃত চাউল, ডাউল, শাক তরকারী—দধি দুগ্ধ, মিষ্টান্ন বহিরাঙ্গণে স্তূপীকৃত হইয়াছে—সর্ব্ব নদীয়াবাসী দোকানদার ও ব্যবসায়ী মহাজন বণিক এবং ধনী সম্প্রদায় এই মহামহোৎসবের উদ্যোক্তা—ইহার মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান প্রধান—মুকুন্দ সঞ্জয় আছেন—শিবানন্দ সেন প্রভৃতি ধনী ভক্তবৃন্দ আছেন। এত বড় মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান নদীয়ায় ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই;—এত প্রচুর আয়োজন—এত অপরিমিত দ্রব্যসম্ভার—এত লোক নিমন্ত্রণ,—এত উৎসাহ নদীয়ায় ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শুভ বিবাহে যাহা হইয়াছিল—তাঁহার জন্মোৎসবে তদপেক্ষা অনেক অধিক আয়োজন হইয়াছে।

এ সকল সংবাদ সর্ব্বজ্ঞা প্রিয়াজির কিছুই অবিদিত নাই,—তবুও তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে তিনি তাঁহার মনোভাব জানাইতেছেন—ইহাই তাঁহার অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ—ইহাই তাঁহার লীলারহস্য।

এই যে নদীয়ার গম্ভীরা-মন্দিরের নির্জ্জনতা নষ্ট করিয়া এই মহামহোৎসবের ব্যাপার—এই যে জন-কোলাহলপূর্ণ মহান লোক-সংঘট্ট—ইহা গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিরহিণী গৌর-বল্লভার অনুমত্যানুসারেই ব্যবস্থিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শুভ জন্মউৎসবের দিনে কিন্তু গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও তাঁহার সখিদ্বয় নির্জ্জন ভজনে দিনাতিপাত করিলেন। বহির্বাটীর মহোৎসব-ব্যাপারে তাঁহাদিগের কোন সংস্রব নাই—সে দিন সমস্ত দিবা রাত্রি গৌর-বল্লভা ও তাঁহার মর্ম্মীসখিদ্বয় নির্জ্জনে গৌরভজন করিলেন!

ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথি ব্রহ্মাদিদেবগণের আরাধ্য—গৌরভক্ত মহাজনগণ এই সর্ব্বমঙ্গলা তিথির নাম দিয়াছেন—"গৌর-পূর্ণিমা"। গৌর-পূর্ণিমা তিথিতে গৌর-বল্লভার গৌর-আরাধনার বিশিষ্ট পদ্ধতি এবং গৌরোপাসনার বিশিষ্ট-রীতি ও প্রণালী তাঁহার স্ব-ভাবসিদ্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক। তিনি গৌর-পূর্ণিমা তিথিতে মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন—দিবারাত্রি কোন সময়ের জন্য কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধই রাখিলেন না—রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দিরে বসিয়া তিনি একাকিনী

কি ভাবে যে আজ গৌরারাধনা করিতেছেন, তাহা তাঁহার মর্ম্মী অন্তরঙ্গ সখিদ্বয়কেও জানিতে দিলেন না। ভজন-মন্দিরের গবাক্ষ দ্বার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আজ প্রিয়াজির সমস্ত দিবারাত্রি উপবাস—রাত্রিতে তাঁহার ভজন-মন্দিরে আজ আর ঘৃতের প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বলল না—অন্ধকার রুদ্ধগৃহে বসিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি নিঃশব্দে একান্তে নীরব গৌরভজন করিতেছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা এবং অন্তঃপুরের সখীগণ সকালেই এই আনন্দের দিনে আজ মহা উদ্বিগ্ন—কাহারও মুখে কথাটি নাই—সকলেরই মুখে যেন একটি মর্ম্মান্তিক বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে—কেহ কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না—সকলেই আজ উপবাসী—সকলেই নির্জ্জনে বসিয়া গৌর-পূর্ণিমা তিথিতে নীরবে গৌর-ভজন করিতেছেন! এদিকে বহির্বাটিতে এবং বিস্তীর্ণ গঙ্গাতটে দলে দলে চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তনের দল আসিতেছে—লোকে লোকারণ্য—পথে-ঘাটে কেবল অগণিত নরমুণ্ড দেখা যাইতেছে—আর সংকীর্ত্তনের একটী অপূর্ব্ব মহাধ্বনি উঠিয়াছে—"বিষ্ণুপ্রিয়ার-প্রাণগৌর"।

এই মহা মহোৎসবে বৈষ্ণব-ভোজন—সে একটি বৃহৎ ব্যাপার—অসংখ্য লোক গৌরশূন্য গৌর গৃহের বহির্বাটিতে এবং সম্মুখে চন্দ্রাতপ-শোভিত বিস্তীর্ণ গঙ্গাতটে সারি সারি মণ্ডলী করিয়া পঙ্গতে বসিয়াছে—তাঁহারাও প্রেম-ধ্বনি দিতেছে—"জয় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ"। বহিরাঙ্গণে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলিয়াছে—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥"—

কিন্তু গৌর-বিরহিণী-প্রিয়াজির আদেশে অন্তঃপুরের দ্বার রুদ্ধ—তিনি এবং তাঁহার সখিগণ ও দাসীগণ একান্তে নির্জ্জন ভজন করিতেছেন—তাঁহারা যে কি করিতেছেন, তাহা কেহই জানেন না—অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দেরও তাহা জানিবার কোন উপায় নাই! এমন কি ঈশান, দামোদর পণ্ডিত এবং বংশীবদন ঠাকুর পর্য্যন্ত পরম বিস্মিত হইয়া প্রিয়াজির এরূপ স্বতন্ত্রতার ভাব লক্ষ্য করিয়া মহা চিন্তান্বিত হইয়াছেন। নদীয়াবাসী গৌর-ভক্তবৃন্দ বড় আশা করিয়াছিলেন গৌর-বল্লভা তাঁহাদের এই উৎসবটি একটীবার দর্শন করিবেন এবং তাঁহাদিগকে একবার আজ দর্শন দান দিয়া কৃতকৃতার্থ করিবেন। কিন্তু সে আশা তাঁহাদের দুরাশা মাত্র। এমন কি তাঁহারা আজিকার এমন শুভদিনে তাঁহাদের দৈনন্দিন ভজনফলের পুরস্কার স্বরূপ গৌর-বল্লভার শ্রীচরণ দর্শনেও বঞ্চিত হইলেন—এ দুঃখ তাঁহাদের আর রাখিবার স্থান নাই। সকলেই স্রিয়মান—এই আনন্দোৎসবের দিনে ভক্তবৃন্দের মনোদুঃখের সীমা নাই—তাঁহাদের মুখে কথা নাই—বুকের বেদনা এত অধিক যে মুখ ফুটিয়া কথা বাহির হইতেছে না!

এই ভাবে গৌরশূন্য গৌর-গৃহে গৌরপূর্ণিমা-তিথির আরাধনা হইল—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের জন্মোৎসব গৌর-ভক্তবৃন্দের নয়নজলে সম্পূর্ণ হইল।

গৌর-বল্লভা কেন যে এরূপভাবে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শুভ জন্মতিথির আরাধনা করিলেন,—এ প্রশ্নের উত্তর নাই। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা,—তাঁহার লীলা-রহস্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য—ইহা ভিন্ন এই প্রশ্নের অন্য কোনরূপ সমাধান নাই। এমন শুভ দিনে নদীয়ার একান্ত গৌরভক্তবৃন্দের এই যে নিদারুণ মনঃকষ্ট,—ইহাও তাঁহাদের ভজনাঙ্গ,—দয়াময়ী সনাতন নন্দিনার দয়ার ইহাই প্রকৃষ্ট পরিচয়। শ্রীগৌর-সুন্দর সনাতন গোস্বামীপাদকে বলিয়াছিলেন "সনাতন! কৃষ্ণ বড় দুঃখের ধন"। গৌর-বল্লভা তাঁহার এই কঠোর হইতেও কঠোরতম আচরণে গৌরভক্তবৃন্দকে শিক্ষা দিলেন "গৌর বড় দুঃখের ধন,—দুঃখে তাঁহাকে পাওয়া যায়,—সুখে তাহাকে ভুলিয়া যাই"। এই তত্ত্বই পরম তত্ত্ব ও চরম তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বটি শিক্ষা দিবার জন্যই স্বতন্ত্রা গৌর-বল্লভার এই অপূর্ব্ব লীলা-রঙ্গ।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ-দেওঘর
১৩৩৭।১২ই অগ্রহায়ণ, শনিবার,
রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(১২)

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের জন্মোৎসবের পরদিন প্রভাতে অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া ভক্তগণ শেষে নগর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"—

গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বহির্বাটিতে কীর্ত্তনের ধুম উঠিয়াছে—নদীয়াবাসী সর্ব্বলোকে এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছে—এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞস্থলের মধ্য দিয়া প্রেমানন্দে নাচিতে নাচিতে ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

(জয়) "বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর বলে, সবে মিলে ডাক গো
সবে মিলে ডাক।
যুগল চরণধুলি, সবে শিরে মাখ গো
সবে শিরে মাখ॥
নদীয়া-মাধুরী যত, দোঁহেতে মিলন গো
দোঁহেতে মিলন।
রূপের ছটায় ফোটে সোণার কিরণ গো
সোনার কিরণ॥
নদীয়ার চাঁদ গোরা, রসের সাগর গো
রসের সাগর।
রসময় রসরাজ, নদীয়া-নাগর গো
নদীয়া-নাগর॥
(গোরা) করুণার অবতার, বড় দয়াময় গো
বড় দয়াময়।
ডাকিলে একটীবার, সদা কাছে রয় গো
সদা কাছে রয়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ বলে, ডাকিলে তাহারে গো
ডাকিলে তাহারে।
ছুটে এসে কাছে বসে, বদন নেহারে গো
বদন নেহারে।
মন দিয়া কথা শুনে, কত হাসি হাসে গো—
কত হাসি হাসে।
শুনিতে শুনিতে কভু, আঁখিজলে ভাসে গো
আঁখিজলে ভাসে।
কি মধু সে আঁখি-জলে, হাসিতে কি সুধা গো
হাসিতে কি সুধা।
সে হাসি দেখিলে ভাই, মিটে ভব ক্ষুধা গো।
মিঠে ভব-ক্ষুধা।
কে মোরে মিলায়ে দিবে, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া গো
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাই ভেবে কেঁদে মরে, এ হরিদাসিয়া গো
এ হরিদাসিয়া॥"—

গৌর-গীতিকা।

এই কীর্ত্তনটি ক্রমশঃ খুব জমিয়া উঠিল,—কীর্ত্তনীয়াকে সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন—গৌরভক্তগণ তাঁহাকে জনে জনে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতকৃতার্থ করিলেন—বৃদ্ধ ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া মহা কুণ্ঠিত ও লজ্জিতভাবে সকলের চরণ-ধুলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন,—নয়নের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তিনি অবনত মস্তকে করযোড়ে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। এই মহাপুরুষটি কে? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দাস বৃদ্ধ দামোদরপণ্ডিতই এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনীয়া।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাহাদের প্রিয় সখির জন্য মহা উদ্বিগ্ন—তখনও বিরহিণী গৌরবল্লভার গৌরপূর্ণিমার গৌর-আরাধনা শেষ হয় নাই। তিনি তাঁহার ভজনমন্দিরের দ্বার তখনও খুলেন নাই। ভজন মন্দিরদ্বারে বসিয়াই সখিদ্বয় এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনটী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহারাও এখন পর্য্যন্ত মৌনী আছেন,—কাহারও মুখে একটা কথা নাই—গৌরপূর্ণিমার নির্জ্জন গৌর-ভজনে তখনও তাঁহারা মগ্ন,—বাহিরের কোন কথাই তাঁহাদের কানে যায় নাই—তবে এই প্রভাতী কীর্ত্তনটী তাঁহাদের প্রাণের মর্ম্মকথা—এজন্য বড় আদরের বস্তু—বিশেষতঃ এই পদটি সখি কাঞ্চনার যেন নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়াই বোধ হইল। তাই তিনি এত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছেন।

দধিমঙ্গলাদি মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী গৌরশূন্য গৌর-গৃহ হইতে নগর ভ্রমণে বাহির হইল। নদীয়া-নগরে গগনভেদী মহা সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিল—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী।"

বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর পুরোভাগের দল এই কীর্ত্তন-ধ্বনি উঠাইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে নদীয়ার পথে চলিয়াছেন—পশ্চাতে আর একদল ধুয়া ধরিয়াছেন,—

"জয় নন্দনন্দন জয় বংশীধারী।
জয় রাধা-বল্লভ নিকুঞ্জ-বিহারী॥"

এই বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী নদীয়ার রাজপথে সুরধুনী তীরে কি ভাবে চলিয়াছে তাহা মহাজনী পদে শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন। যথা—

—"তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই ঝনর ঝনর করতাল।
তন তন তম্বুর, বীণা সুমধুর বাজত যন্ত্র রসাল॥
ডমক থমক কত, ররাব বাজত, পদতল তাল সুমেলি।
নাচত গৌর, সঙ্গে প্রিয় গদাধর, সোঙরিয়া পূরবক কেলি॥
তীরে তীরে ফুলবন, যেন বৃন্দাবন, জাহ্নবী যমুনা ভাণে।
কীর্ত্তন মণ্ডল, শোভা অতি ভেল, চৌদিকে ভকত করু গানে॥
পূরবক লালস, বিলাস রাসরস, সোই সখিগণ-সঙ্গ।
এ কবিশেখর, হোয়ল ফাঁপর, না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ॥"
গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

এই মহা-সঙ্কীর্ত্তনে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর নদীয়া-নাটুয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ-গদাধর সঙ্গে নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছেন—এই অপূর্ব্ব আবির্ভাব-লীলারঙ্গ সকলে দেখিতে পাইতেছেন না,—ইহা অতি অদ্ভুত রহস্য—

—"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"—

গৌরাঙ্গ-লীলায় এই যে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ—ইহাই মহারাস—ব্রজগোপিনীগণ পুরুষরূপে ভক্তভাবে এই রাস মণ্ডলীতে প্রেমানন্দে অপূর্ব্ব নৃত্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—এই রাসলীলায় গদাধরপণ্ডিত বৃষভানু-নন্দিনীর ভাব অঙ্গীকার করিয়া রাসমণ্ডলী মধ্যে গৌর-নাগরবরের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া অপূর্ব্ব নয়ন-রঞ্জন নৃত্যভঙ্গী দেখাইতেছেন—রসিক-শেখর গৌর-কিশোরও কটি দোলাইয়া অপূর্ব্ব নৃত্য-বিলাস করিতেছেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপের শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে পুষ্পোদ্যানে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দরূপে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া সমন্বিত নদীয়া নাগরীবৃন্দপরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ আর এক অপূর্ব্ব রাসলীলারঙ্গ প্রকট করিয়া তাঁহার রসিক ভক্তবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেছেন। এই পুষ্পোদ্যানের রাসলীলারঙ্গ-কথা "শ্রীভক্তিরত্নাকরে" লিখিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিশিষ্ট কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর নদীয়ার গৌর-শূন্য গৌরগৃহে স্বপ্নে যে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের রাসলীলা-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন—নদীয়ার সেই নিত্য রাস-স্থলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৃষভানুনন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব শ্রীগৌরগোবিন্দের স্বরূপশক্তি সনাতন-নন্দিনী প্রকাশভেদে লীলাভেদের শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে এখন তিনি নদীয়ার মহা গম্ভীরামন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহা তপস্বিনী বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

এই পুষ্পোদ্যান-বিহারী রসরাজ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তিই বিরহিণী গৌর-বল্লভার উপাস্য। নদীয়ার এই পুষ্পোদ্যান-রাসস্থলীর একটী অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত শ্রীগ্রন্থে,—সেই অপূর্ব্ব চিত্রটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

—"হেন মতে গৌরচন্দ্র" আসি পুষ্পোদ্যানে।
নিরীখয়ে বনশোভা অরুণ নয়নে॥
সেই ত কুসুম বন সুবিস্তার স্থল।
চতুর্দ্দিকে উচ্চ অতি কদম্ব-মণ্ডল॥
কদম্বতলাতে ঘন কেতকী কাননে।
সেই ত কণ্টকে চারিদিকে আবরণে॥
ভিন্ন লোক গতি তাহা না হয় কখন।
দূর হৈতে দেখয়ে কণ্টকময় বন॥
মাধবী মালতী উঠে কদম্ব বেড়িয়া।
বহয়ে মলয় বায়ু পরাণ লইয়া॥
চারিদিকে চারি পথ রতনে বন্ধন।
দুই দিকে বকুলের শ্রেণী সুশোভন॥
কুন্দ করবীর কুরুবক সুটগর।
রতনে কলাপ গন্ধরাজ নাগেশ্বর॥
যাঁথি যুথি আদি আর মল্লিকা সুবাস।
কেশর নবজলতা-নিকর প্রকাশ॥
পাটল কিংশুক বৃক্ষ শোভে সারি সারি।
পুন্নাগ চম্পক বহু অশোকাদি করি॥
স্থানে স্থানে রত্নবেদী অতি মনোহর।
ছত্রাকৃতি তরুলতা তাহার উপর॥

তমালে শোভয়ে ঘন পল্লব নূতন।
বেড়িয়া কনকলতা তাহে আরোহন॥
প্রফুল্ল মন্দির তরু অরুণ-বরণে।
মকুলিত আম্রচারা শোভে স্থানে স্থানে॥
বৃক্ষতলে পিণ্ড বান্ধা দেখিতে সুন্দরে।
জম্বু পনসাদি কত সুরস জম্বীরে॥
বন অন্তভাগ বেড়ি কদলক বন।
প্রফুল্লিত কেহ পক্ক হরিত বরণ॥
সারি সারি নারিকেল ধরে বহু ফল।
গুবাকের শ্রেণী মাঝে খর্জ্জুর শ্রীফল॥
মিষ্ট বদরিকা আর কমলা নারঙ্গ।
ধাত্রী হরিতকী আদি এলাচী লবঙ্গ॥
ফল ফুলে নম্র ডাল পৃথিবী পরশে।
দাড়িম্ব ফাটিয়া স্থল সিক্ত করে রসে॥
সারি সারি সুবদরী সফরী শোভন।
কতেক প্রকার বৃক্ষ না যায় বর্ণন॥
মধ্য স্থানে আছে এক বিচিত্র মন্দির।
সম্মুখে তড়াগ তার সুশীতল নীর॥
স্ফাটিক পাথরে হয় সোপান বন্ধন॥
চারিদিকে চারি ঘাট—রতনে খিচন॥
কাঞ্চনাদি স্থলপদ্ম পুষ্প শেফালিকা।
কনক চম্পক লতা সুচন্দ্র মল্লিকা।
সরোবর তটে সব শোভে সারি সারি।
নিরমল জলে পুষ্প কানন নেহারি॥
ফুলভরে নম্র ডাল পরশয়ে জল।
শ্বেত নীল অরুণাদি প্রফুল্ল কমল॥
মধুর তরঙ্গ চলে সুধীর সমীরে।
পদ্ম টলমল অলি বসিতে না পারে॥
মধু লোভে উড়ে কত লাখে লাখে ভৃঙ্গ।
বিহরয়ে হংসরাজ সারস বিহঙ্গ॥
চক্রবাক আদি আর টিটিপক্ষী কত।
জলচরগণ জলে ফিরে শত শত॥
কণক বেদিকা সহ কণক মন্দির।
তাহে বসি আছে গোরা কণক শরীর॥
চারি দিকে প্রিয়াগণ কণক বরণ।
প্রেমে ডগমগ অঙ্গ সজল নয়ন॥
দ্বাদশ দুয়ারে শোণ কনকের স্তম্ভ।
বাহ্যে স্বর্ণ দণ্ডে চন্দ্রাতপ অবলম্ব॥
দুয়ারে গ্রথিত সব মল্লিকার হারে।
উর্দ্ধে নীলমণি থোপ দোলে থরে থরে॥
পূরব প্রাঙ্গণে দিব্য তুলসী কানন।
পশ্চিম প্রাঙ্গণে মল দমনক বন॥
উত্তর দক্ষিণে দূর্ব্বা শ্যামল বরণ।
কোমল আসন প্রায় হেন লয় মন॥
পালিত কুরঙ্গ সব ফিরে তৃণ আশে।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ লোচন প্রকাশে॥
নীপ বৃক্ষ হইতে ময়ূর নামিয়া।
সুখে নৃত্য করে গোরা-মাধুরী দেখিয়া॥
দ্রুম লতা আদি সব কনক পুষ্পিত।
ষড়ঋতুগণে বন সদাই সেবিত॥
চাতক ডাকয়ে ঘন কোকিল কুহরে।
ডাহুক ডাহুকীগণ ভূমেতে বিহরে॥
পক্ক বিম্ব দেখি কীর চঞ্চু দিয়া রয়।
চাষপক্ষী কপোতাদি বৃক্ষে বিলসয়॥
সারী শুক ডাকে জয় শ্রীশচীনন্দন।
জয় নরহরি গদাধরের জীবন॥
জয় জয় নদীয়ানগর পুরন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণেশ্বর॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ মিলি এক তনু।
জয় জয় প্রকট কল্পতরু জনু॥
বৃন্দাবনবাসী মোরা পুরুষে পুরুষে।
অধিক বাড়য়ে প্রেম নদীয়া-বিলাসে॥
শুনি বিশ্বম্ভর দেব শুকের পঠন।
রাধাকৃষ্ণলীলা মনে হইল স্মরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত।

এই পুষ্পোদ্যান যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া এবং নদীয়ানাগরীবৃন্দ সহ নিত্য রাসলীলারঙ্গ করিতেছেন। তথাপি প্রভুবাক্যং—

"যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা ন যযৌ নন্দনন্দনঃ।
নবদ্বীপং পরিত্যজ্য তথা যাস্যামি ন ক্বচিৎ।"

শ্রীচৈতন্যতত্ত্বদীপিকা।

এই পুষ্পোদ্যান যোগপীঠে যে শ্রীগৌর-গোবিন্দের

নিত্য রাসলীলারঙ্গ হইতেছে, তাঁহার প্রমাণ শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও আছে যথা—

"অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্প-উদ্যান শোভয়।
তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময়॥
মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ।
তার তলে শোভাময় রত্নসিংহাসন॥
সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলময়।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বাম দক্ষিণে শোভয়॥
নানা অলঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর॥
ভুবনমোহন শোভা কবি নিরীক্ষণ।
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন॥
যোগায় তাম্বুল মালা চন্দন সকলে।
প্রিয়া সহ প্রভু বিলসয়ে সখি মেলে॥"

এই যে ভক্তিব্রজ শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের নিত্যরাসলীলারঙ্গ,—ইহা গোপীব্রজ শ্রীবৃন্দাবনেরই অনুরূপ—বরং ইহাতে কিছু বিশিষ্টভাব আছে—যথা শ্রীঅচ্যুতানন্দ বাক্যং—

"যদ্যপি শ্রীগোপীব্রজ নিত্যানন্দময়।
তার উত্তমাঙ্গ এই ভক্তিব্রজ হয়॥"—

কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ এখন একবার নদীয়ার গম্ভীরা-মন্দির-দ্বারের দৃশ্যটি মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দুই এক ফোঁটা অশ্রুজলে নিজ নিজ হৃদয়-মন্দির অভিষিক্ত করুন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার গৌর-পূর্ণিমার গৌরারাধনা সম্পূর্ণ হইল বেলা এক প্রহরের পর—যখন গৌরশূন্য গৌর-গৃহ-প্রাঙ্গণের লোকসংঘট্ট এবং জন-কোলাহলের নিবৃত্তি হইল।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা মহা উদ্বিগ্নচিত্তে রুদ্ধদ্বার ও রুদ্ধ-গবাক্ষ ভজন-মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিতেছেন এবং গৌরনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তাঁহারা মহা চিন্তান্বিত হইয়াছেন—দাসীগণ মুহুর্মুহু প্রিয়াজির সংবাদ লইতেছেন—ঈশান, দামোদর পণ্ডিত এবং ঠাকুর বংশীবদনের দেহে যেন প্রাণ নাই—বদন শুষ্ক। অতিবৃদ্ধ ঈশান ত মস্তকে হাত দিয়া অন্দর মহলের নিম্ব বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িয়াছেন এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। সখি কাঞ্চনা বড়ই বিপদে পড়িয়া দামোদর পণ্ডিত ও ঠাকুর বংশীবদনকে অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে ডাকিতে ঈশানকে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা আসিলে তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"এখন আপনারা দেখুন—বেলা এক প্রহর অতীত হইতে চলিল, প্রিয়াজির কোন সাড়া শব্দ পাইতেছেন না,—রুদ্ধ-দ্বার ও রুদ্ধগবাক্ষ ভজন-মন্দিরে সমস্ত রাত্রি গৌর-বল্লভা একাকিনী কি জানি কি ভাবে গৌর-ভজন করিয়াছেন, তাহা ত আমরা জানিনা, কিন্তু এত বেলা পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়াছে। এখন আপনারা সকলে মিলিয়া যথাকর্ত্তব্য করুন"—এই বলিয়া সখিদ্বয় কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

তখন পণ্ডিত দামোদরের পরামর্শে সকলে মিলিয়া আজ প্রিয়াজির গুণগান কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজন-মন্দির সাতবার পরিক্রমা করিলেন।

যথারাগ।

—"বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী চরণ স্মরিয়া।
ভজহ কলির জীব শচী-দুলালিয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণনাথ বিষ্ণুপ্রিয়া বিনা।
অন্য কেহ চিনাইতে পারে না পারে না॥
নদীয়া-বিনোদ গোরা রসিক নাগর।
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ বলে করহ আদর॥
যুগলে আছেন ব'সে নিত্য নদীয়ায়।
নিত্য রাস হয় তাঁর শচী-আঙ্গিনায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁর প্রিয় নাম।
এ নাম লৈলে হয় সর্ব্ব সিদ্ধি কাম॥
জয় বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর সবে মিলে বল।
এ যুগল নাম হয় কলির সম্বল॥
কলি জীব তরাইতে যুগল প্রকাশ।
কলির জীবের নাম "বিষ্ণুপ্রিয়া-দাস॥"
গৌর-দাস হৈতে বড় হয় এই নাম।
ইথে যে সন্দেহ করে গোরা তাহে বাম॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বকথা বিষম কঠিন।
যেই ভাগ্যবান বুঝে সেই ত প্রবীণ॥
কলির ভজন-সার গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
দাস হরিদাস গায় আনন্দে মাতিয়া॥"

গৌর-গীতিকা।

এমন সময়ে প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরের ভিতরে কেমন একটা যেন কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর বংশীবদন ও ঈশান অন্তঃপুর হইতে বহিরাঙ্গণে গমন করিলেন। সখিদ্বয় তখন অন্যান্য দাসীগণকেও অন্দর মহলে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলে চলিয়া গেলে সখি কাঞ্চনা কুঞ্জদ্বারে বসিয়া মধুবাক্যে একটী প্রাচীন গৌরলীলার পূর্ব্বাভাস কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"নিধুবনে দুঁহুজনে, চৌদিকে সখিগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী উঠিলেন স্বপ্ন দেখি,
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গোউর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটি কাম,
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি, ভাব-ভূষা নিরবধি,
নাচে গায় মহামত্ত হইয়া।
অনুরূপ রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি,
মন ধায় তাহারে দেখিয়া॥
নব জলধর রূপ, রসময় রসকূপ,
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি যত, বনের দেবতা যত
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন,
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনি, মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥"

গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

সখি কাঞ্চনার কলকণ্ঠের মধুর গানই গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রাণ—একথা অনেকবার তিনি স্বমুখেই বলিয়াছেন। রুদ্ধ-দ্বার ভজন-মন্দিরই বিরহিণী প্রিয়াজির বিলাস-কুঞ্জ—তিনি এই নিভৃত কুঞ্জে তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের সহিত বিলাসরঙ্গে আছেন, সখিগণ কুঞ্জ-সেবায় আছেন। এই ভাবেই সখিগণের আনুগত্যে ভজনে সিদ্ধি লাভ হয়। সখি কাঞ্চনা এইভাবেই বিভাবিত হইয়া এই প্রাচীন পদটি গাইলেন।

বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণে যখন এই মধুর পদের ধ্বনিটি প্রবেশ করিল, তখন তিনি তাঁহার রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দিরে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির সেই করুণ কণ্ঠধ্বনি সখি কাঞ্চনার কর্ণে শেল সম বাজিতেছিল। তিনি যেন স্বচক্ষে দেখিতেছেন—

—"গৌর বলিতে চাহে বারে বারে,
মুখে নাহি সরে শুধু গোঁ গোঁ করে।
আজ বুঝি প্রিয়াজিরে বাঁচান না যায়॥"

নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর এইরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থার একটি করুণ চিত্র পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী অঙ্কিত করিয়াছেন—যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে,—

প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥

ইহা দিব্যোন্মাদের চিহ্ন। গৌর বিরহিণী প্রিয়াজির এখন এই ভাব। সখি কাঞ্চনার আজ বড় বিপদ—রুদ্ধদ্বার মন্দিরে বিরহিণী প্রিয়াজির এই অবস্থা—আর তিনি ত বাহিরে—প্রিয়াজির পক্ষে এ বড় বিষম বিপদের কথা। সখিকাঞ্চনা ও অমিতা কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন—তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া ভজন-মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে প্রথমে সজোরে করাঘাত—পরে মাথা সেখানে কুটিতে লাগিলেন।

অন্তর্য্যামিনী প্রিয়াজির অলৌকিক শক্তিবলে ভজন-মন্দির-দ্বার আপনা আপনিই উদ্ঘাটিত হইল। সখিদ্বয় তখন দেখিলেন তাঁহাদের প্রিয় সখির দশমদশা—ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া অচৈতন্য অবস্থায় কেবলমাত্র গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন—তাঁহার পরিধান-বসন অসম্বর—নয়ন সলিলে ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত,—সমস্ত শরীর কম্পবান—এবং পাণ্ডুবর্ণ—যেন দেহে একবিন্দুও রক্ত নাই। সনাতন-

নন্দিনী বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার এই যে গৌরবিরহব্যাধি ইহা বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ-ব্যাধির অনুরূপ। ললিতা সখি ব্রজনাগর শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

যথারাগ।

—"রাইক ব্যাধি শুনহ বরকান।
যাহা শুনি গলি যায় দারুণ পাষাণ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বাজিছে দশনা।
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল, কি আর ভাবনা॥
কণ্টকীর ফল যেন পুলক মণ্ডলী।
ফুটিয়া পড়ল সব মুকুতার গুলি॥
নয়নের জল বহে নদী শত ধারা।
পাণ্ডুর বরণ দেহ জড়িমার পারা॥
তুয়া-নাম শ্রবণে ডাকিছে কোন সখি।
শুনিলে বিকল হিয়া না মেলে যে আঁখি॥
সখিগণ বেড়িয়া ডাকয়ে চারি পাশে।
কি কহিতে কি কহব রসময় দাসে॥"—

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার প্রাণবল্লভের শুভ-জন্মতিথিতে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি আজ দিব্যোন্মাদ-দশাগ্রস্থা—তাঁহার গৌর-বিরহ-ব্যাধির বৈদ্যরাজ সখি কাঞ্চনা রোগিনীর নিকটে গিয়া বসিয়া মহা উৎকণ্ঠার সহিত ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী দেখিতেছেন—তাঁহার সহকারিণী আর একটী বিশেষজ্ঞ বৈদ্যও সঙ্গে আছেন—তিনিও রোগিনীর রোগ-নির্ণয়ের সহায়তা করিতেছেন। সখিদ্বয় ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে প্রিয়াজির অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন—পরে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—বিরহিণী গৌরবল্লভার কর্ণের উপর মুখ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে গৌরনাম কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

"গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে!
এস বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌর হে।"
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর! বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর!
তোমার প্রিয়া তোমায় ডাকে—এস এস এস হে!"—

সখি অমিতাও এই উচ্চ গৌর-নাম কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। সখিকাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির নাসিকাদ্বারে তুলা ধরিয়া দেখিলেন, মৃদুমন্দ নিঃশ্বাস পড়িতেছে। উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন চলিতেছে—অকস্মাৎ বিরহিণী প্রিয়াজি পাশমোড়া দিয়া অঙ্গসঞ্চালন করিলেন—কিছুক্ষণ পরেই "গৌরহরি" এই নামটি তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া অতি কষ্টে উচ্চারিত হইল—সখিদ্বয় তখনও উচ্চৈঃস্বরে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। বিরহিণী প্রিয়াজি অতঃপর ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নের পল্লব কিঞ্চিৎ উঠাইয়া একবার সকরুণ সজল উদাস নয়নে সখিদ্বয়ের প্রতি চাহিলেন,—সখি অমিতা প্রিয়াজির চক্ষে তখন ঘন ঘন শীতল জলের ছিটা দিতে লাগিলেন,—শীতকাল,—মুহুমুহু পাখার বীজনও চলিতেছে। বৈদ্যরাজ সখি কাঞ্চনা তখনও তাঁহার ঔষধি প্রয়োগ করিতেছেন,—মন্দ মন্দ গৌরনাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে। গৌরশূন্য গৌর-গৃহের অন্তঃপুরের দাসীগণ ও বহিরাঙ্গণে ঈশান, দামোদরপণ্ডিত এবং ঠাকুর বংশীবদন দূরে দাঁড়াইয়া মুহুর্মুহু প্রিয়াজির সংবাদ লইতেছেন।

কতক্ষণ পরে বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ভাবে নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া ভজনমন্দিরের পর্য্যঙ্কের সুসজ্জিত শয্যার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। সুচতুরা ও রসজ্ঞা সখি কাঞ্চনা তাঁহার বিরহিণী প্রিয়সখির তাৎকালিক মনভাবোচিত একটা কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার উক্তি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ সুহই।

—"কানুর লাগিয়া জাগি পোহায়িলুঁ,
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এতদিনে সই নিশ্চয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
মেঘ ডুর ডুর দাদুরীর রোল
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি রোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরীর ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে॥
যতনে সাজালুঁ ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।
অঙ্গ ছট্‌ফট্ সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জ্বরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
কেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥"—

পদকল্পতরু।

সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াই এই পদটী গান করিলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভার তখন বাহ্য-জ্ঞান হইয়াছে—তিনি চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করিয়াছেন—কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অক্ষম। তবুও অতিকষ্টে দক্ষিণ হস্তখানি কোন গতিকে উঠাইয়া সখি কাঞ্চনার মুখ চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে সেকথা প্রকাশের প্রয়োজন কি? তাঁহার নির্জ্জন ভজনমন্দিরে লোকের মধ্যে দুইজন অন্তরঙ্গা মর্ম্মী সখি—সেখানেও বিরহিণী প্রিয়াজির এত সাবধনতা—এত সঙ্কোচ! ভজন-রহস্য এতই গোপনীয় এই ভাবটি দেখাইবার জন্য গৌর-বল্লভার এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা। যাহা হউক সখিদ্বয়ের অন্তরঙ্গ-সেবায় কথঞ্চিত সুস্থ হইয়া বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহার দাঁড়াইবার শক্তি নাই।

সখিদ্বয় দেখিতেছেন গৌরবল্লভার জীর্ণশীর্ণ শরীর সমস্ত দিনরাত্রি উপবাসে, অনিদ্রায় এবং নিদারুণ গৌর-বিরহতাপে নিতান্ত কাতর,—দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় তিনি পৌঁছিয়াছেন—সমস্ত শরীর যেন থর থর কাঁপিতেছে—বদন পাণ্ডুবর্ণ—চক্ষুদ্বয় কোঠরাগত—এমন শোচনীয় অবস্থা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার কখন হয় নাই। তখন সখিদ্বয় ভূমিতল হইতে প্রিয়াজিকে অতি সাবধানে ধরাধরি করিয়া কোন গতিকে দাঁড় করাইলেন—তাঁহার সমস্ত শরীর যেন টলমল করিতেছে,—যেন অবশ, কিছুক্ষন তিনি দাঁড়াইয়াই রহিলেন,—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সখিদ্বয়ের নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—কিন্তু প্রিয়াজির নয়নে জল নাই—তিনি আকাট হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহার উদাস নয়নদ্বয় তাঁহার প্রাণবল্লভের শয়ন-কক্ষের সর্ব্বত্র যেন ঘুরিতেছে—সর্ব্ব বস্তুতে যেন তাঁহার দৃষ্ট সঞ্চালিত হইতেছে। সখিদ্বয় দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সমস্ত শরীরের ভার নিজ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া ভজনমন্দিরের দ্বারদেশে আসিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির অতি ক্ষীণ কমল চরণদ্বয় নিজ কার্য্য সাধনে আজ অসমর্থ—তাঁহাকে যেন টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে,—তাঁহার চরণদ্বয় যেন নেংড়াইয়া পড়িতেছে—দূর হইতে একটী দাসী ইহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া গৌরবল্লভার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সেখানেই তাঁহার চরণ-সেবায় নিযুক্ত হইল। ইহাতে কেহ কিছু বাধা দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে প্রিয়াজিকে লইয়া সখিদ্বয় ভজনমন্দিরের বাহিরে আসিয়া অতি ধীরে ধীরে এই ভাবেই অন্দর-মহলের দিকে চলিলেন। সেখানে গিয়া সকলে মিলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভার শ্রীঅঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার মস্তকে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে বহু কলস গঙ্গাজলে উত্তম করিয়া স্নান করাইলেন। উদাসিনী প্রিয়াজি তৈল ত্যাগ করিয়াছিলেন—কিন্তু আজ আর তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই—কিছু বলিবার শক্তিও তাঁহার আজ নাই।

এক্ষণে বেলা এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—সখি কাঞ্চন প্রিয়াজিকে সেইখানেই বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া আসনে বসাইয়া তাঁহার হস্তে জপমালা দিলেন—সম্মুখে শ্রীতুলসীর টব আনিয়া দিলেন—একটী পঞ্চপাত্র এবং কিছু পুষ্পচন্দন পূর্ণ একখানি পাত্র সম্মুখে রাখিলেন। গৌরবল্লভা যেন কলের পুতুলের ন্যায় তাঁহার প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। সখি অমিতা তখন চরণামৃতের সহিত কিছু চিনির সরবৎ আনিয়া গোপনে সখি কাঞ্চনার হাতে দিলেন। সখি কাঞ্চনা জানেন তাঁহার প্রিয়সখি ভজন-মন্দিরে গিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের পাদুকা ও শ্রীপটমূর্ত্তির সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না—এজন্য চরণামৃতের পাত্রটি সখি অমিতার হস্তে দিয়া গোপনে কহিলেন—"এখন রাখ"—

এইভাবে কতক্ষণ গেল—তখন সখি কাঞ্চনা বলিলেন—"প্রিয় সখি! উপবাসের পর একটু চরণামৃত পান করিয়া তবে তোমার প্রাণবল্লভের শ্রীচিত্রপট সেবা করিলে ক্ষতি কি?"—এই কথা শুনিবামাত্র প্রিয়াজির কমল নয়নে অশ্রুধারাধারা দৃষ্ট হইল—তিনি সজলনয়নে সখি কাঞ্চনার দু'টি হাত ধরিয়া নীরব ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! ইষ্টপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিব—একথা তুমি আমাকে কি করিয়া বলিলে? এই দেহটা পাত হইলে ক্ষতি কি? আমার ভজন বড় না আমার এই অনিত্য দেহটা বড়।"—এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি কাঁদিয়া পুনরায় আকুল হইলেন। সখি কাঞ্চনা মহা লজ্জিত হইলেন—বড়ই বিপদে পড়িলেন। আর কোন কথা না বলিয়া সখি অমিতাকে ইঙ্গিত করিলেন—চল—প্রিয়াজিকে তাঁহার ভজনমন্দিরে পুনরায় লইয়া যাই—

এখন তিনি কিছু সুস্থির হইয়াছেন। দুইজনে মিলিয়া দুই বাহু ধরিয়া তখন গৌর-বল্লভাকে সেস্থান হইতে উঠাইলেন—অতি ধীরে ধীরে মৃদুপাদবিক্ষেপে প্রিয়াজি তখন সখিদ্বয়ের স্কন্ধদেশে শরীরের ভার দিয়া অন্দর মহল হইতে ভজন-মন্দিরে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহাকে তাঁহার আসনে বসাইয়া দিলেন—পূজার সকল উদ্যোগই সেখানে ছিল। প্রিয়াজি যথারীতি তাঁহার ইষ্টপূজাদি সমাপন করিয়া বেলা দ্বিতীয় প্রহরে কিঞ্চিৎ চরণামৃত পান করিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহার দৈনন্দিন সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন। সখিদ্বয় ভজন-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া বাহির হইতে দ্বার ভেজাইয়া দিয়া তাঁহারাও দ্বারে বসিয়া সংখ্যা নাম জপে মগ্ন হইলেন। এখন আর প্রিয়াজি তাঁহার ভজন-গৃহদ্বারের অর্গল বদ্ধ করিলেন না। কারণ তাঁহার পুনরায় উঠিবার শক্তি নাই।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা সেখানে বসিয়া তাঁহাদের প্রিয় সখি গৌর-বল্লভার কঠোর ভজন, গম্ভীর চরিত্র এবং বিকট বৈরাগ্যের কথা আলোচনা করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন—এইভাবে এরূপ কঠোরতা করিলে প্রিয়াজির শরীরটা আর কয়দিন বা টিকিবে? কিন্তু উপায়ান্তর নাই—এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? সখি কাঞ্চনা বড় সুচতুরা—তিনি চতুর চূড়ামণি সখি ললিতার বিশিষ্ট অবতার,—অনেকক্ষণ নীরবে তিনি কি চিন্তা করিলেন—পরে সখি অমিতার বদনের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"সখি অমিতে! ধন্ত আমাদের সনাতননন্দিনী গৌরপ্রিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁহার অন্তরঙ্গসেবার কিঞ্চিৎ অধিকার আমরা পাইয়াছি—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত প্রেমিক ভক্তকোটি,—যোগী ঋষি ও মুনিগণ সকলেই শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-মাধুর্য্যরসাস্বাদনের জন্ত পরম ব্যাকুল, কিন্তু সেই অনন্ত অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য পরিপূর্ণ নিখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ আবার সনাতন-নন্দনা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রেমরসাস্বাদনের জন্ত পরম ব্যাকুল। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার একটী প্রাচীন পদে আছে,—সখি ললিতার উক্তি,—বৃষভানুনন্দিনীর প্রতি,—

যথারাগ।

—"ধনি ধনি রমণী, জনম ধনি তোর।
সব জন কানু কানু করি ঝোরয়ে,
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক নাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি বহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন কারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা"॥—

এই প্রাচীন পদটি শ্রীবিদ্যাপতিঠাকুরের রচিত। পদকর্ত্তা বলিতেছেন চাতকই "ফটিক জল" "ফটিক জল" বলিয়া মেঘের নিকট কাতরকণ্ঠে পিপাসা জানায়—মেঘ কখন চাতকের জন্ত ব্যাকুল হয় না—চকোরেই চন্দ্রের সুধা পানের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়, কিন্তু চন্দ্র কখনও চকোরের জন্ত ব্যাকুল হয় না।

এই কথা বলিয়াই সখি কাঞ্চনা আজি সময় ও অবসর বুঝিয়া তাঁহার প্রিয়সখি অমিতার কানে কানে অতি গোপনে প্রিয়াজির নিগূঢ় তত্ত্ব কিছু বলিতেছেন। তিনি সখি অমিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সখি অমিতে! তুমি ত জানই আমাদের প্রিয়সখি সনাতন-নন্দিনী বৃষভানু-নন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব—যেমন গৌর-সুন্দর শ্যামসুন্দরের বিশিষ্ট আবির্ভাব। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ন্যাসী চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণবিরহরসাস্বাদন করিতেছেন,—ইহা পূর্ব্বলীলায় তাঁহার একটী বাসনা,—যাহা পূর্ণ করিবার জন্ত তাঁহার এই বিশিষ্ট অবতার। যাঁহার ভাবকান্তি চুরি করিয়া তিনি আজ গৌর হইয়াছেন—আর যাঁহার প্রেমে ঋণী হইয়া তিনি পূর্ব্বলীলার ঋণপরিশোধ করিবার জন্ত পরম ব্যাকুল—সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ গৌরাবতারে আজ কপট সন্ন্যাসী বেশে নীলাচলের গম্ভীরামন্দিরে অত্যদ্ভুত লীলারঙ্গ প্রকট করিতেছেন, যাহা আমরা পণ্ডিত দামোদর এবং জগদানন্দের মুখে শুনিতেছি।

"সখি অমিতে! শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব বড়ই গভীর—গৌর-বল্লভার যেমন অপূর্ব্ব ভাবগম্ভীর চরিত্র—তদ্রূপ তাঁহার তত্ত্বটিও বড় গভীর। নদীয়ার এই মহা গম্ভীরামন্দিরে যিনি গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনের জন্য নিত্য নব নব অদ্ভুত লীলারঙ্গ প্রকট করিতেছেন—তাঁহার স্বরূপ তত্ত্বটিও পরম চমৎকার ও নিগূঢ়। কলিহত জগজ্জীব এখন তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না—গৌরভক্ত আচার্য্যসন্তান-গণের মস্তিষ্কে—এই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রবেশ করিতে বহু কাল লাগিবে। কদাচিৎ কোন কোন মহা ভাগ্যবান প্রিয়াজির

বিশিষ্ট কৃপাপাত্র, এই নিগূঢ় ও গম্ভীর তত্ত্বের কিছু কিছু আভাস পাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা জীবজগতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন।

"সখি অমিতে! তুমি জান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার প্রেমঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা এই জন্য তাঁহাকে তাঁহার হৃদি-কারাগারে চিরদিনের জন্ম আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজবিধি অনুসারে উত্তমর্ণ শ্রীরাধা অধমর্ণ তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ঋণের দায়ে কারাগারে দিলেন—অর্থাৎ তাঁহার হৃদয় রূপ সিভিল-জেলে তাঁহার প্রাণবল্লভকে আবদ্ধ করিলেন। সিভিল জেলে আবদ্ধ করিলেন রাজবিধি অনুসারে উত্তমর্ণের ভরণপোষণ ব্যয়ভার অধমর্ণকে গ্রহণ করিতে হয়। মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধা তাঁহার নিজ গুপ্তবিত্ত প্রেমধন দিয়া তাঁহার অধমর্ণ শ্যামসুন্দরকে হৃদি-কারাগারে আবদ্ধ করিয়া পোষণ করিতে লাগিলেন। "অন্তঃ কৃষ্ণ বহি র্গৌরঃ" আর "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপং" এই যে গৌর-তত্ত্ব,—ইহা বৃষভানুনন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব সনাতননন্দিনীর প্রাণ-বল্লভের স্বরূপ-তত্ত্ব। শ্রীরাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তিখানির উপর পুনরায় আর একটী অভিনব গৌরবর্ণের অপূর্ব্ব আবরণ পড়িয়া বড়ই প্রিয়দর্শন হইয়াছে। এই অপূর্ব্ব আবরণের মর্ম্মার্থ, মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধিকার বিশিষ্ট আবির্ভাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীরাধালিঙ্গিত তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দকে পুনরায় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে যিনি বিবর্ত্ত-বিলাসমূর্ত্তি একীভূত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-বিগ্রহকে পরম প্রেমভরে হৃদি-মন্দিরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার প্রাণবল্লভ সুধু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—আর সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-বপু শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র। শ্রীশ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব এক বস্তু হইলেও—এইভাবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বের কিছু বৈশিষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীরাধিকার বিশিষ্ট আবির্ভাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কিছু বৈশিষ্ট অবশ্যই আছে। শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট আবির্ভাব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের যেরূপ ঔদার্য্য ভাব-বৈশিষ্ট আছে, তাঁহার স্বরূপশক্তির তদ্রূপ স্বতন্ত্রতা ভাব-বৈশিষ্ট-সম্পদ থাকিবারই কথা।

"সখি অমিতে! এ সকল তত্ত্বকথা তোমার অবিদিত কিছুই নাই,—তবুও যে আমার মুখ হইতে এ সময়ে এসকল তত্ত্বকথা কেন প্রকাশ হইল, তাহা অন্তর্য্যামিনী গৌর-বল্লভাই জানেন। এ সকল বেদগোপ্য তত্ত্বকথা এখন প্রকাশ যোগ্য নহে।

—"চারি বেদ গুপ্তকথা প্রিয়াজির তত্ত্ব"—

তবে গৌর-বল্লভার ইচ্ছায় তাঁহার একান্ত চিহ্নিত দাস এবং বিশিষ্ট কৃপাপাত্র একনিষ্ঠ গৌরভক্ত মহাজনগণের দ্বারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রমশঃ ধীরে ধীরে প্রকাশ হইবে। স্ব-প্রকাশ বস্তুর প্রকাশ ভগবদিচ্ছায় উপযুক্ত সময়েই হয়।"

শ্রীভগবতকান্তা গৌরবল্লভার তত্ত্ব সম্বন্ধে এতগুলি গুপ্ত রহস্যকথা সখি কাঞ্চনার মুখে অমিতা আজ প্রথম শুনিলেন, তাঁহার মন প্রেমানন্দে ভরিয়া উঠিল,—তিনি কাঞ্চনার বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে। এই সকল নিগূঢ় গুপ্ত রহস্য-কথা সকল সখিগণেরই নিজস্ব ধন—নিজ গুপ্ত বিত্ত। তাঁহাদের এই অমূল্য ভজন-সম্পত্তি গুরুরূপে তাঁহারা যাহাকে দিবেন, তিনিই পাইবেন—অন্য কেহ এই গুপ্ত ধনের অধিকারী নহেন।

সখি অমিতা তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বিনীতভাবে কহিলেন "সখি কাঞ্চনে! তুমিই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্বের একমাত্র গুরু—তোমার দ্বারাই জগতে এই পরম ও চরম তত্ত্ব প্রকাশ হইবে,—প্রিয়াজির ইচ্ছায় তুমিই উপযুক্ত সময়ে কোন কোন ভাগ্যবান একান্ত গৌরভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এই বেদগোপ্য তত্ত্বকথা কলিহত জীবজগতে প্রকাশ করিবে।"

সখি কাঞ্চনা অমিতার কথা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিলেন এবং গোপনে আরও কিছু বলিলেন। এ সকল গুপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রিয়াজির ইচ্ছায় এখন প্রকাশ হইতেছে। সখি কাঞ্চনা বলিলেন—"সখি অমিতে! তুমি যথার্থই বুঝিয়াছ নদীয়া-যুগল-ভজন-রহস্য অতিশয় দুর্ব্বোধ্য এবং পরম গোপ্য বস্তু। এই পরম শ্রেষ্ঠ ভজন-রহস্য-কথা গুপ্ত রাখিবার জন্য পূজ্যপাদ গোস্বামিচরণগণ এবং প্রাচীন মহাজনগণ বিশেষ সতর্ক ও সাবধান ছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের এরূপ আদেশই ছিল। রায় রামানন্দ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে কিছু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব একবার বলিতে গিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। স্ব-প্রকাশ বস্তুর

প্রকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট শুভ কাল আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বিশিষ্ট প্রেমপাত্র ঠাকুর নরোত্তমদাসের উপর শ্রীপাট খেতরিতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশের ভার অর্পিত আছে—শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর বংশের ঠাকুর কানাই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের বামে প্রিয়াজিকে বসাইবেন। তারপর কিছুকাল পরে কোন বিশিষ্ট শিক্ষিত স্বনামধন্য একজন গৌরভক্ত চূড়ামণি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-যুগল ভজন-রহস্য কিছু কিছু প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগল মূর্ত্তি প্রকাশ করিবেন। আচার্য্যসন্তানগণ এই ভজনের বিরোধী হইবেন—কিন্তু প্রিয়াজির ইচ্ছায় তাঁহার প্রাণ-বল্লভের আদেশে শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজন তত্ত্ব "নীচ শূদ্রের দ্বারা ধর্ম্মের প্রকাশ" এই মহাজনবাক্য সফল করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে কোন বিশিষ্ট সাধুপুরুষের দ্বারা অগ্রে প্রচার হইবে। বহুস্থানে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগল শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ হইবেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ নামকীর্ত্তনে বঙ্গদেশ মুখরিত হইবে। এই অপূর্ব্ব নামযজ্ঞের অষ্টপ্রহর, চব্বিশ প্রহর, নবরাত্রি, প্রভৃতি মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র হইবে। বৈষ্ণবী-শক্তি কুললক্ষ্মী বঙ্গরমণীগণ এই শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজনের প্রধান সহায়িনী হইবেন। তাঁহাদের প্রেম-ভক্তি দ্বারা মধুর ভাবে এই শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজন-পথ সবিশেষ পুষ্টিলাভ করিবে এবং ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে সর্ব্বত্র এই অপূর্ব্ব ভজন রহস্য ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইবে।"

সখি অমিতা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সখি কাঞ্চনার মুখে এই অপূর্ব্ব ভবিষ্যৎবাণী সকল শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। তাঁহার বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই—কারণ তিনিও সর্ব্বজ্ঞা ও নিত্যসিদ্ধা—তিনি সকলি জানেন তবে এ সকল গুপ্ত রহস্য প্রকাশ ও প্রচারের ভার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহাকে দেন নাই। প্রিয়াজির প্রধানা সখি কাঞ্চনার উপরই এই গুরুতর ভার দিয়াছেন স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ। পরবর্ত্তী একান্ত গৌরভক্তদিগের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য প্রভু প্রিয়াজির আদেশে সখি কাঞ্চনা এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন। গুরুরূপা সখিদ্বয়ের এই যে গুপ্ত-কথন, ইহা একান্ত গৌরনিষ্ঠ ভক্তগণের পক্ষে বড় আশার বাণী—বড়ই অত্যাশ্চর্য্য ভজন-রহস্যমূলক অপূর্ব্ব বাণী।

প্রিয়াজির মর্ম্মী সখিদ্বয় স্বয়ং আচরণ করিয়া শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজন-প্রণালী গৌরভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও আবির্ভাব, প্রকাশ, প্রবেশ, ও শক্তিসঞ্চার প্রভৃতি অলৌকিক শক্তি দ্বারা এই পরম মঙ্গলকর শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল-ভজন-তত্ত্ব তাঁহাদের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র-দিগকে শিক্ষা দিবেন। শাস্ত্রে তারস্বরে বলিতেছেন,—

—"সবে এক সখিদিগের ইহা অধিকার।
সখি হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখি বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখি লীলা বিস্তারিয়া সখি আস্বাদয়॥
সখি বিনু এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখি ভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধা-কৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ যুগলভজন রহস্য এবং কুঞ্জসেবা ইহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবার অনুরূপ,—কোন অংশে ন্যূন নহে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ অদ্বয় তত্ত্ব—এক বস্তু। সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ে এই তত্ত্বজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয়।

সখি কাঞ্চনা আজ স্বরূপে এবং স্ব-ভাবে এ সকল বেদ-গোপ্যকথা কহিতেছেন—সখি অমিতাও স্বরূপে ও স্ব-ভাবে শুনিতেছেন। নিভৃত স্থানে বসিয়া দুইজন মধুরভাবে গৌরভজনের সখিরূপা গুরু আজ মনের কথা খুলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞা গৌর-বল্লভার ইচ্ছায় তাঁহার কায়ব্যূহ মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনে আজ এইরূপ একটি ভাব-তরঙ্গের উদয় হইয়াছে। সনাতন-নন্দিনী প্রিয়াজির স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশক স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভ। তিনি তাঁহার নিত্য পার্ষদ ভক্তগণকে যাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এক্ষণে নদীয়া-নাগরীগণের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেছেন। ঋষিকল্প বৈষ্ণব সাধু মহাজনগণ এক্ষণে এই ভজন-তত্ত্বের শাস্ত্র-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন।

সখি অমিতা এতক্ষণ নীরবে তাঁহার প্রিয়সখির সকল কথাই অতিশয় মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। সখি কাঞ্চনার কথা শেষ হইলে তিনি মৃদু হাসিয়া মৃদুভাবে

কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমি এ তত্ত্ব জান—তোমার মুখে আজ আমি অনেক নূতন তত্ত্ব—নূতন কথা শুনিলাম। প্রিয় সখি! আমাদের ভাগ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-যুগল-ভজননিষ্ঠ গৌরভক্তগণের দর্শন লাভ বিধাতা লিখেন নাই—আমরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের চরণে প্রার্থনা করিব যেন তিনি আমাদিগকে সেই সময়ে পুনরায় এখানে জন্ম দান করেন। "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" ধ্বনিতে যখন দিগন্ত পরিপূরিত হইবে—সর্ব্বলোকের গৃহে গৃহে যখন শ্রীশ্রীনদীয়া যুগল শ্রীমূর্ত্তি পূজিত ও সেবিত হইবেন—কি আনন্দের দিন, তখন হইবে সখি! তখন আমরা নদীয়ার পথে পথে কীর্ত্তন-ধ্বনি শুনিব—

—"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিবর্ত্ত-বিলাস যুগল হে"—

তখন আমরাও সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিব—

—"ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, কহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
লহ গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম রে।
যে জন গৌর-প্রিয়া ভজে
সে হয় আমার প্রাণ রে।"—

সখি কাঞ্চনে! সে শুভদিন আসিবে—কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে কি সখি, সে মধুর অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য ঘটিবে?

সখি কাঞ্চনা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সখি অমিতে! আমার মনে বড় সাধ তখন যেন আমি কোন আচার্য্যসন্তানের গৃহে পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-ভজন-রহস্য প্রচার করি।" অমিতা উত্তর করিলেন—"সখি! আমি কায়মন-বাক্যে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের চরণে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। আমি সখি! এত উচ্চ আশা এ ক্ষুদ্র পাপহৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না,—তবে আমার সাধ হয় তোমার এই প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতে আসিয়া যে কোন কুলে যেন তোমার সঙ্গে তখন আমার জন্ম হয়"—

সখি কাঞ্চনা এই কথা শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইলেন—সখি অমিতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বৈষ্ণবোচিত দীনতাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—"সখি অমিতে! তুমি-আমিত একই—তোমার প্রার্থনা ও আমার প্রার্থনাও ত একই—শ্রীগৌরাঙ্গ যুগল-ভজন প্রচার তাৎপর্য্য-মূলক আমাদের এই প্রার্থনাটি সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রথমে গৌর-বল্লভার চরণে জানাইতে হইবে—ইহাতে প্রিয়াজির অনুমোদন না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।"

এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা সেখান হইতে যখন উঠিলেন তখন বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রিয়াজির ভজন-মন্দির-দ্বার হইতে কিয়দ্দূরে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া সখিদ্বয়ের এই সকল অতি গুপ্ত কথোপকথনের ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছিল। এক্ষণে তাঁহারা ভজন মন্দির-দ্বারে আসিয়া দেখিলেন—দ্বারের অর্গল বদ্ধ—ইতিপূর্ব্বে বিরহিণী প্রিয়াজিকে যখন তাঁহারা ধরাধরি করিয়া আনিয়া তাঁহার ভজন-মন্দিরের ভিতরে আসনে বসাইলেন—তখন দ্বার বদ্ধ ছিল না। এতক্ষণ তাঁহারা প্রিয়াজির কোন সংবাদ লয়েন নাই—বিশেষতঃ তাঁহাকে এই অবস্থায় এরূপ ভাবে একাকিনী রাখিয়া অন্যত্র যাওয়া যে বিশেষ গর্হিত কাজ হইয়াছে—তাহা তাঁহারা এমন বুঝিতে পারিয়া মহা সন্তপ্ত হইলেন। গবাক্ষদ্বার খোলা ছিল—সখিদ্বয় সেখানে গিয়া উঁকি দিয়া দেখিলেন—গৌরবল্লভা তাঁহার উপাস্য দেবের শ্রীচিত্রপটমূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া করযোড়ে মহা-করুণ ক্রন্দনের স্বরে আত্মনিবেদন করিতেছেন,—

যথারাগ।

"ওহে ত্রিজগত নাথ!
—"জগত তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে।
অভাগী পাপিনী বলে দুখে ডারিলে॥
মো সম দুখিনী নাই, তাই হে দিলে না ঠাঁই,
দুখহারী সুশীতল চরণ-তলে।
(তুমি) জগত তারিতে এসে মোরে ছাড়িলে॥
(আমি) —"এ দুখ কাহারে বলি তা'ত জানিনে।
দিবানিশি জ্বলি তাই হৃদি-দহনে॥
ত্রিজগত-নাথ তুমি, চরণের দাসী আমি
কি সুখ পাইলে নাথ! ঠেলি চরণে।
এ দুখ কাহারে বলি তাত' জানিনে॥
(কেন) —"দয়ার সাগর সবে বলে তোমারে।
কি দয়া দেখালে তুমি বল আমারে॥
বঞ্চিত দরশনে, করিলে দাসীরে কেনে,
কি পাপে এমন তাপ দিলে দাসীরে।
দয়ার সাগর কেন বলে তোমারে॥

—"দাসীর কপালে নাথ! একি লিখিলে।
পদ-সেবা-অধিকারে কেন বঞ্চিলে॥
কি সুখে বাঁচিয়া রবে, পতিপদ সেবাভাবে,
তোমার চরণদাসী,—তা' কি ভাবিলে।
দাসীর কপালে নাথ! একি লিখিলে॥
—"এ দুখ জীবনে মোর কভু যাবে না।
একবার এ দাসীরে দেখা দিলে না॥
না হ'তাম যদি আমি, তোমার রমণী মণি,
দরশন দিতে তুমি—একি ছলনা।
এ দুঃখ জীবনে মোর কভু যাবে না॥
—"উচ্চপদ দিয়ে তুমি নীচে ফেলিলে।
সে কথা ভাবিয়ে ভাসি আঁখি-সলিলে।
কি করি জীবন ধরি, বল বল গৌরহরি,
কি দোষে দাসীরে তুমি পদে ঠেলিলে।
উচ্চপদ দিয়ে নাথ! নীচে ফেলিলে॥
—"দেখে যাও গুণমণি! হেথা আসিয়া।
রাজরাণী ভিখারিণী—সে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
(শুধু) কাঁদিতে রাখিলে তারে, দুখভরা এ সংসারে,
দুখ দিলে মনসাধে—হৃদি ভরিয়া।
(গৌর) প্রিয়া-দুখে কেঁদে মরে হরিদাসিয়া॥"

গৌর-গীতিকা।

সখিদ্বয় বিরহিণী প্রিয়াজির এই মর্ম্মভেদী আত্ম-নিবেদনের করুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণে প্রাণে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন,—তাঁহাদের প্রিয়-সখির প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইল,—হৃদিবেদনায় কাতর হইয়া তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িলেন—তাঁহাদের নয়নধারায় সেখানে প্রেম-নদী প্রবাহিত হইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা আত্মসম্বরণ করিয়া ভজন-মন্দির-দ্বারে পুনরায় আসিয়া বসিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—গতকল্য গৌর-পূর্ণিমার সমস্ত দিবারাত্রি উপবাসের পর মাত্র কিঞ্চিৎ চরণামৃত গ্রহণ করিয়া গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির নিয়মিত দৈনন্দিন ভজন ও সংখ্যানাম শেষ করিতে এখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া সখিদ্বয় মহা চিন্তিতা হইলেন। তাঁহার প্রাতের ভজন আজ হয় নাই—কাজেই এই বিলম্ব। সখি কাঞ্চনা ভাবিতেছেন এখন কি করিলে তাঁহার প্রিয়সখি দ্বার খুলেন—এই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার প্রাণে যেন একটী আনন্দ-স্পন্দন হইল—তাঁহার কানে কানে যেন কেহ বলিয়া দিল—"গৌর নাম কর" তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে উচ্চ গৌরকীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"করতালি দিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে,
(ঐ) আসিতেছে গোরা রায়।
ভকত সঙ্গে, নাচিছে রঙ্গে,
(আজি) কি উৎসব নদীয়ায়॥
আপন জনম, উৎসবে মাতি,
(গোরা) আপনারই নাম গায়।
একি এ রঙ্গ, করে গৌরাঙ্গ,
প্রেমেতে মাতিয়ে ধায়॥
(নিজ) জনম-তিথির পূজা করিবারে
সাজিয়াছে গোরা রায়।
প্রেমধারা আঁখে, হরিবোল মুখে,
বলিতেছে উভরায়॥"—

গৌরগীতিকা।

গানটী শেষ করিয়া গৌর-পাগলিনী সখি কাঞ্চনা এই গানটির প্রথম চরণটি পুনরাবৃত্তি করিয়া পুনরায় ধুয়া ধরিলেন—

—"করতালি দিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে,
(ঐ) আসিতেছে গোরা রায়।

সখি অমিতা আখর দিলেন,—

তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।
ওগো সব নদেবাসি!
তোরা দেখবি যদি আয়॥"—

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির নির্জ্জন-ভজন-মন্দির-দ্বারে এই উচ্চকীর্ত্তনের মধুর রোল উঠিল যখন, গৌর-বল্লভা তখন তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আলুথালু-বেশে পরম প্রেমাবেগে সখি কাঞ্চনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন,—"সখি! প্রাণসখি! কই আমার প্রাণবল্লভ কই,—কোথায় তিনি? সখি! একবারটি তাঁহাকে দেখাও—আমাকে প্রাণে

বাঁচাও"—তখন সখি কাঞ্চনাও পরম প্রেমভরে প্রিয়াজির গলা জড়াইয়া ধরিয়া নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন—"সখি। প্রাণসখি! শুন,—মন দিয়া শুন—তোমার প্রাণবল্লভ তোমাকে কি বলিতেছেন—এই বলিয়া তিনি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের উক্তি আর একটি পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"তুমি—ডাক দিয়েছ, আকুল প্রাণে
(আমি) রইতে নারি ঘরে।
আমি যে—যাইতে নারি তোমার কাছে
(তাই) ছুঃখে আছি ম'রে॥
তোমায়—দুখ দিয়েছি পরাণ-ভরা
হৃদয়-ভরা জ্বালা।
আমি—কেঁদে যে মরি আপন মনে
(তোমার নাম) ক'রেছি জপ মালা॥
আমি—লইতে নারি তোমার নাম
(তাই) বলি রাধা রাধা।
আমার—রাধা নামে সাধা বাঁশি
এবার—পেয়েছে বড় বাধা॥
(পদকর্ত্তার উক্তি)
"বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ হে!
—"হরিদাসিয়ার কথাটি শুন
ওহে নদীয়া-নাটুয়া।
শচীর অঙ্গনে আসিয়া গোপনে
(একবার) বল জয় বিষ্ণুপ্রিয়া॥"—
গৌরগীতিকা।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা প্রেমাবেগে সখি কাঞ্চনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—তখন সখি-দ্বয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্দর মহলে লইয়া গেলেন। সেখানে কতক্ষণ অন্তরঙ্গসেবার পর প্রিয়াজি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তারপর যথারীতি স্বপাকে তাঁহার প্রাণবল্লভের ভোগ লাগাইয়া প্রাণরক্ষা হেতু কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইলেন। তারপর সন্ধ্যার পরে ভক্তবৃন্দকে যথারীতি প্রসাদ বণ্টন হইল—সেদিন আর কাহাকেও প্রিয়াজি দর্শন দিলেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ দেওঘর
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।
সোমবার শ্রীএকাদশী
রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(১৩)

দৈনন্দিন ভজনক্রিয়াতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার দিনটা কোন গতিকে কাটিয়া যাইত—তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে দিবাভাগে ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথায় ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া কৃষ্ণবিরহজ্বালা প্রসমন করিতেন। তাঁহার প্রাণবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সমস্ত দিন একাকিনী তাঁহার রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দিরে বসিয়া ভজন-ক্রিয়া ও সংখ্যানাম জপে অতিবাহিত করেন—কেবল যখন দ্বার খুলিয়া প্রাতে ও অপরাহ্নে বাহির হইতেন—সেই সময়ে সখিদ্বয় তাঁহার সঙ্গে দুই একটী গৌরকথা কহিতেন। সন্ধ্যাকালে কিছুক্ষণ তিনি তাঁহার ভজনমন্দির দ্বারে বসিতেন,—সেই সময়ে গৌরকথার তরঙ্গ উঠিত।

রাত্রিকালে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির যাতনারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে—বিশেষতঃ বিরহ-ব্যাধির যাতনার বৃদ্ধিকাল রাত্রেই! শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"দিবাভাগে ভক্তসঙ্গে থাকেন আনমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদনা॥"

অন্যত্র,—"গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব"। নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে গৌর-বিরহিণী—প্রিয়াজিরও ঠিক সেই ভাব—বরঞ্চ কিছু অধিক। তিনি দিবাভাগের অধিকাংশ সময়ই নির্জ্জনে একাকিনী ভজন করিতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অপেক্ষাও কঠোর ভজন-প্রণালী ছিল প্রিয়াজির। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু দিবাভাগে ভক্তসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীতে কথঞ্চিৎ অন্যমনস্ক থাকিতেন—তাঁহার প্রাণবল্লভা কিন্তু ভক্ত সঙ্গ-বঞ্চিতা বা বর্জ্জিতা হইয়া মাত্র এ দু'টী মর্ম্মী সখির সহিত কখন কখন তিনি গৌর-কথা কহিতেন। বর্ষীয়সী নদীয়া-রমণী বৈষ্ণব-গৃহিণীদিগেরও তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী, শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতা দেবী, চন্দ্রশেখর আচার্য্য-পত্নী সর্ব্বজয়া দেবী, শ্রীগৌরসুন্দরের ধাত্রীমাতা নারায়ণী দেবী প্রভৃতি মাতৃস্থানীয়া বর্ষীয়সী বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ! এ বড় কঠোর ব্রত—এ বড় বিষম সংকল্প। একমাত্র গৌরবক্ষ-বিলাসিনীরই এরূপ দৃঢ় ব্রত ও দৃঢ় সংকল্প শোভা পায়—কারণ তিনি জগদীশ্বরী—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা। শচীমাতার অপ্রকটের পর হইতেই গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এইরূপ উৎকট বৈরাগ্যের

সহিত কঠোর গৌর-ভজন-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন—এরূপ ভীষণ কঠোর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। নদীয়ার এতগুলি বর্ষীয়সী গৌরানুরাগিনী বৈষ্ণবী-শক্তি বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ গৌর-বল্লভার এইরূপ অলৌকিক লীলারঙ্গ শ্রবণ স্তম্ভিত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন—কিন্তু তাঁহাদেরও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির অন্তঃপুর-দ্বারে কড়া পাহারা নিযুক্ত আছে,—দ্বার সর্ব্বক্ষণই বন্ধ, বহির্দ্বারের ন্যায় অন্তঃপুর-দ্বার সর্ব্বদা বন্ধ—দাসী কয়েকজন আছেন—আরও সখি কয়জন আছেন—তাঁহারাও নির্জ্জন ভজনরতা—তাঁহারাও গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বাহিরে যান না—কোন আত্মীয় স্বজনের সহিত জাগতিক কোন সম্বন্ধই রাখেন না। গৌর-কৃষ্ণেতর বিষয়গন্ধ হইতে তাঁহারা সর্ব্বভাবে মুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলের গম্ভীরা মন্দিরে সমস্ত রাত্রি উচ্চসংকীর্ত্তন করিতেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

—"সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"—

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিল শয়ন।
সব রাত্রি করেন প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ কৃষ্ণবিরহ-জর্জ্জরিত হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিলাপ করিতেন—রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গম্ভীরা-মন্দিরে থাকিয়া সুমধুর কৃষ্ণকথা কহিতেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকে কোন গতিকে শয়ন করাইয়া রামানন্দ রায় নিজ বাসায় গমন করিতেন। স্বরূপ গোসাঞি দ্বারে শয়ন করিতেন,—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

—"এই মত বিলাপিতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল॥
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেল ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে, বসি করে জাগরণ॥"—

কোন কোন দিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং শুক্তিশাস্ত্রের শ্লোক পড়িয়া এই দুইজন মর্ম্মী বন্ধু লইয়া তাহার অর্থ আস্বাদন করিতেন—যথা—

—"সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা" ॥—

আবার কোন কোন দিন একাকীই শ্লোক পড়িয়া সেই শ্লোকার্থ স্বয়ং আস্বাদন করিতেন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া,—যথা—

—"কোন দিন কোন ভাবে শ্লোকপঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥"

চৈঃ চরিতামৃত।

এই ভাবে নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ সমস্ত রাত্রি কাটাইতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণবল্লভার রাত্রি-ভজন অন্যরূপ ছিল। তিনি সমস্ত রাত্রি একাকিনী নামনামীর একত্ব ধ্যান করিয়া সংখ্যানাম-জপে মগ্ন থাকিতেন,—মধ্যে মধ্যে কখন কখন আত্মবিলাপ ও আত্মনিবেদন করিতেন,—তাঁহার ভজন-মন্দিরের মধ্যে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না—কিবা রাত্রিতে কিবা দিবাভাগে। বহু সাধ্যসাধনায় সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির ভজনমন্দিরে রাত্রিতে শয়নের অনুমতি পাইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের অতিবৃদ্ধ প্রাচীন ভৃত্য শ্রীঈশানের কৃপায় তাহা পাইয়াছেন,—সে কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই মহাভাগ্যবান ঈশানের কৃপাতেই শ্রীনিবাস আচার্য্যঠাকুর গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কৃপালাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন দাস্যভাবের সাধক গৌরাঙ্গ-পার্ষদের এইরূপ অলৌকিক প্রভাব ও শক্তির পরিচয় পাইয়া গৌরভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন—প্রিয়াজির সখিগণের তাঁহাদের ঈশানদাদার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অপরাহ্নে তাঁহার স্বপাকসিদ্ধ একমুষ্টি অলবন ও অনুপকরণ—প্রসাদান্ন পাইয়া যথারীতি সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার ভজন-মন্দির-দ্বারে আসিয়া বসিয়াছেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা সঙ্গেই আছেন,—তাঁহারা প্রিয়াজির সঙ্গছাড়া এক তিলার্দ্ধও হন না,—সময় ও সুযোগ পাইলেই গৌরকথা রসরঙ্গে প্রিয়াজির মনোরঞ্জন করেন।

ফাল্গুন মাস,—সন্ধ্যাকাল। গঙ্গাতীরে মন্দ মন্দ দক্ষিণ সান্ধ্য-সমীরণ বহিতেছে—সুরতরঙ্গিনীর মৃদুল তরঙ্গভঙ্গীতে

অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে,—কলনাদিনী গঙ্গার মৃদু কুল কুল রবে তটচারী নরনারী-বৃন্দের মন প্রাণ হরণ করিতেছে,—গৌর-পূর্ণিমার পরদিন প্রতিপদ। নদীয়ার সান্ধ্য-গগনে নবদ্বীপ-সুধাকরের শুভাবির্ভাবের প্রেমানন্দে প্রতিপদের চন্দ্রদেব উৎফুল্ল-নয়নে গৌরশূন্য গৌর-গৃহে গৌর-বল্লভার চরণদর্শনাভিলাষে উকি ঝুকি মারিতেছেন। চন্দ্র-সূর্য্যের পর্য্যন্ত গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার নিকটে আসিবার অধিকার নাই—দূর হইতে তাঁহারা তাঁহার চরণ-কমল দর্শন ও বন্দনা করেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি সংখ্যানাম জপে মগ্না,—তাঁহার নয়ন দ্বয় নিমিলিত—সখিদ্বয়ও ভজনরতা—ভজন-চতুরা প্রিয়াজির সঙ্গে কোন কথা বলিবার সুযোগই তাঁহারা পান না। রাত্রিতে তাঁহার ভজন-মন্দিরে শয়ন সম্বন্ধে দু'একটী কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য আছে—কিন্তু প্রিয়াজি তাঁহাদিগকে আন্‌কথা বলিতে অবসরই দেন না—এ সকল কথা তাঁহার পক্ষে গৌর-কুক্ষেতর কথা। সখিদ্বয়ের মনে ইহাতে মহা দুঃখ—তাঁহাদের মহা বিপদ। কি ভাবে, কি রূপে তাঁহারা প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবা করিবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এক গৌরকথা ও গৌর-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কথা উত্থাপন করিলেই প্রিয়াজি সখিদ্বয়ের মুখ চাপিয়া ধরেন। তাঁহারা বড় বিপদে পড়িয়াই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীচরণকমল স্মরণ করেন,—আর নিরন্তর কাঁদেন। সর্ব্বজ্ঞা এবং অন্তর্য্যামিনী প্রিয়াজি সকলি বুঝেন এবং সকলি জানেন,—তবুও তিনি তাঁহার স্ব-ভাব পরিবর্ত্তন করেন না—তাঁহার স্বতন্ত্রতা পূর্ণ ভাবে রক্ষা করেন। ইহাই তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ভাব—ইহাই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের বিশিষ্টতা—ইহাই তাঁহার বিশিষ্ট আবির্ভাবের বৈশিষ্ট।

গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মীসখিদ্বয়ের মনভাব বুঝিয়া—তাঁহা মর্ম্মব্যথায় যেন ব্যথিত হইয়া জপমালা মস্তকে স্পর্শ করিয়া যথা স্থানে বসিলেন—এবং নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুধামধুর বচনে পরম প্রেমভরে সখি কাঞ্চনার হস্ত ধারণ করিয়া স্বয়ং কলকণ্ঠে একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ সুহই।

—"সখি হে! কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া, দিয়া সেই পদ-ছায়া,
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে॥ ধ্রু॥
গৌর-প্রেমে সঁপি প্রাণ, জিউ করে আনচান্
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম, পিরীতি না করিতাম,
যাচিয়া না দিতু প্রাণ পরে॥
আমি ঝুরি যার তরে, সে যদি না চায় ফিরে,
এমন পিরীতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে, বরজ ফেলিল তাহে
যায় ফাটি যায় কি না বুক॥
মুরারি গুপুতে কয়, পিরীতি সহজ নয়,
বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিনী।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতার আজ আর আনন্দের সীমা নাই—তাঁহাদের প্রিয়সখি আজ তাঁহার মনের ব্যথা খুলিয়া বলিয়াছেন এবং গৌরাঙ্গ-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন—

"কুল মান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর,
তবে সে পাইবা শচীর বালা।"—

এই পদটী গৌরাঙ্গপার্ষদ শ্রীল মুরারী গুপ্ত রচিত—প্রিয়াজির উক্তি। গানটি শেষ হইলে বিরহিণী প্রিয়াজি নিজেই বলিতেছেন—"সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! আমার প্রাণ-বল্লভের প্রাণপ্রিয়তম ভক্ত মুরারি গুপ্ত ঠাকুর বলিতেছেন,—

"কুল মান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর,
তবে সে পাইবা শচী-বালা।"

সখি! প্রিয় সখি! আমি ত কুল মান কিছুই ছাড়িতে পারিলাম না,—তবে কি আমি তোমাদের শচীনন্দন গৌর-হরির চরণাশ্রয় পাইব না?" এই বলিয়া প্রেমাবেগে সখি কাঞ্চনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রিয়াজি অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে প্রিয় সখির নয়ন জল মুছাইতে মুছাইতে তাঁহার স্বাভাবিক কলকণ্ঠে একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"গৌরাঙ্গ-চাঁদের এইরূপ সব, ইথে না বাসিহ দুখ।
বেকত বিষয়ে, বিষাদ ঘটয়ে, গুপতে অধিক সুখ॥

পরাণ অধিক, গুপত করয়ে, পাইয়া অলপ ধনে।
যদি বল ইহা, অসম্ভব তাতে, দেখহ জগতজনে॥
পিরীতি পরম রতন, ইহাতে গুপত করিলে কাজ।
বেকত করিলে, রসিক জনার, অন্তরে উপজে লাজ॥
নরহরি পহুঁ সুঘড়-শেখর, জানে কি এমন জনা।
গুপত-বিহার করে অবিরত, জানায় সুঘড়-পনা॥"—
গৌরপদতরঙ্গিনী।

এই বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া সখি কাঞ্চনা পুনরায় আর একটী স্বপ্নবিলাস-গীতের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"স্বপনে বন্ধুয়া মোর, পালঙ্কে বসিল গো,
বারেক চাহিনু আঁখি কোনে।
পিরীতি-মুরতি গোরা, কত আদরিয়া গো,
আপনা অধীন করি মানে॥
সে চাঁদ বদনে মোরে, বারে বারে কয় গো,
পরাণ অধিক মোর তুমি।
ইহা বলি কোলেতে করিয়া, সুখে ভাসে গো,
লাজেতে মরিয়া যাই আমি॥
সাজায়ে তাম্বুল মোরে, বদনে সঁপিয়া গো,
হরষে বিভোর হয়ে চায়।
সে কর-পল্লবে পুনঃ অধর পরশি গো
কিবা সে সুরসিক-পনা।
নরহরি প্রাণ-পিয়া, হিয়ার পুতলি গো
যুবতী মোহিতে এক জনা।"—
গৌরপদতরঙ্গিনী।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সখি কাঞ্চনার মুখ চাপিয়া ধরিলেন—এবং স্বয়ং লজ্জায় অধোবদন হইলেন—কারণ মর্ম্মসখি কাঞ্চনা আজ তাঁহার মনের গুপ্তকথাগুলি টানিয়া বাহির করিয়াছে। এই পদটি প্রিয়াজিরই উক্তি—সখি কাঞ্চনা তাঁহার কায়ব্যূহ—তাঁহার মুখেই গৌরবল্লভার গুপ্ত মনঃকথা ব্যক্ত হইল দেখিয়া তিনি সখির মুখ চাপিয়া ধরিলেন। পদকর্ত্তা শ্রীল মুরারি গুপ্তও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল-ভজনের রসিক ভক্ত—তাঁহার করচায় তিনি তাঁহার নদীয়া-যুগল-ভজন-রসাত্মক একটী উত্তম শ্লোক লিখিয়াছেন—যথা—

—"সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমৈঃ
ব্রজাজরাজদ্বর হেম-গৌরঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-লালিত পাদপঙ্কজো
রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্র মৌলিঃ॥"—করচা।

প্রিয়াজির উক্তি সখি কাঞ্চনার গীতরত্নটি স্বপ্নাবস্থার সম্ভোগ-রসাত্মক পদ। নায়ক নায়িকার স্বপ্নে এরূপ সম্ভোগ স্বাভাবিক যৌনভাবের পরিচায়ক। বিরহিণী নায়িকার বিরহাবস্থায় নায়কসম্বন্ধে স্বপ্নও তাঁহার বিরহ-জ্বালা নিবারক এবং সাময়িক শান্তিপ্রদায়ক। বিরহিণী নায়িকার হৃদয়ে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের বিরহাগুণ নিরন্তর ধু ধূ জ্বলিতেছে—অসহ্য-বিরহ-যাতনায় দিবারাত্রি বিরহিণী ছট্‌ ফট্‌ করিতেছেন। এই অবস্থায় এরূপ স্বপ্ন যত অধিক কাল স্থায়ী হয় ততই মঙ্গল। এরূপ স্বপ্নই বিরহিণী নায়িকার বিরহদগ্ধ জীবনের একমাত্র সম্বল—প্রণয়ীর সহিত পুনর্মিলন ও সম্ভোগাশার উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা স্বরূপ। যে অবস্থায় নির্জ্জন-বাস বিরহিণী নায়িকার ভাল লাগে—অন্ধকারে গৃহাভ্যন্তরে একাকিনী লুকায়িতে ইচ্ছা করে—সেই অবস্থাতেই এরূপ স্বপ্ন সম্ভব হয়। রাত্রি কাল,—নির্জ্জন অন্ধকার গৃহ,—এইরূপ স্বপ্ন-দর্শনের প্রশস্ত কাল ও স্থল। এইরূপ স্বপ্নাবেশে মিলন ও সম্ভোগ-সুখই বিরহিণী নায়িকার প্রাণরক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায় এবং এই অকথন বিরহ-ব্যাধির ইহাই নিদান ঔষধ।

কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার উক্তি চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রাচীন পদেও দেখিতে পাই স্বপ্নে মিলন ও সম্ভোগ বিপ্রলম্ভরসপুষ্টির সনাতন রীতি। রসশাস্ত্রে এরূপ স্বপ্নবিলাসের বহু দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। এরূপ একটী প্রাচীন পদ এখানে উদ্ধৃত হইল।

যথারাগ।

—"পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পীত বরণ, বসন খানিতে
মু'খানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটি রাখিয়া,
শুতল আমার কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।

চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বলে॥
অঙ্গ-পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জানিয়ে হইনু হারা।
কপোত পাখীকে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমন হৈলে—
আর কি পরাণ রয়॥"—

পদকল্পতরু।

এই যে স্বপ্নে মিলন ও সম্ভোগরসবিলাস, ইহাও প্রাপ্তি-বিশেষ। শাস্ত্রে ইহাকে গৌণ-প্রাপ্তি কহে। সামান্য ও বিশেষ ভেদে এইরূপ স্বপ্ন চতুর্ব্বিধ। বিশেষ স্বপ্নগুলি ঠিক জাগ্রত অবস্থার মতই—উহা যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না—ঠিক জাগ্রতাবস্থার মিলন-সুখের ন্যায় বোধ হয়। এই ব্যাপারটী অপূর্ব্ব চমৎকারিতা-পূর্ণ এবং বিশিষ্ট ভাব-সম্পদে পরিপূর্ণ। নায়ক-নায়িকার এই জাগ্রতাবস্থার তুল্য স্বপ্ন-বিলাস জ্ঞানটী লইয়া রসশাস্ত্রকারগণ অনেক প্রকার বিচার করিয়াছেন। এই বিশিষ্ট-অবস্থাপন্ন স্বপ্নে সম্ভোগ চারি প্রকার—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও স্বাপ্ন সমৃদ্ধিমান। উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা আছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, শুদ্ধসত্ত্ব-তনু আনন্দচিন্ময়-রস-ভাবিতমূর্ত্তি ব্রজদেবীগণের এবং নদীয়ানাগরী-বৃন্দের বিশেষতঃ বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এবং সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পক্ষে রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এরূপ সাধারণ নায়িকার ন্যায় স্বপ্নবিলাস শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ এবং অসিদ্ধ কি না? ইহার উত্তরে প্রাচীন রসশাস্ত্রকার পণ্ডিতগণ বলেন—"বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এই তিন অবস্থায় স্বপ্ন সম্ভাবিত হয়। স্থূলতম জাগতিক ব্যাপার বিশ্বনামে অভিহিত—ইহা হইতে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম, তথাপি স্থূল মধ্যে গণ্য তৈজস স্বপ্নাবস্থা—ইহা হইতেও সূক্ষ্ম তথাপি প্রাকৃত বিজ্ঞান-ব্যাপারোত্থ স্বপ্নই প্রজ্ঞাবস্থার স্বপ্ন। ইহার পরের অবস্থা—স্বরূপানুভব সমাধিজাত স্বপ্ন। সচ্চিদানন্দময়ী ব্রজদেবী-দিগের স্বপ্ন এই চারি অবস্থাকে অতিক্রম করে, নচেৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব।"*

এই সকল তত্ত্বকথার অবতারণা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে। আকর মূল রস-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা এখন বড় একটা নাই। প্রাকৃত রস-প্রকরণ লইয়াই এখন সকলেই প্রাকৃত রস-বিস্তারে চেষ্টিত। এখন স্থিরচিত্তে এই সকল তত্ত্ব-কথা বিচার করিয়া একবার বুঝিতে চেষ্টা করুন,—প্রাকৃত স্বপ্নগুলির গুরুত্ব কত লঘু—ভগবতসম্বন্ধ তাহাতে থাকিলেও কত সাবধানে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে হয়। প্রাকৃত শরীরধারীর স্বপ্নে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণদর্শন এক প্রকার অসম্ভব—মিলন ও সম্ভোগ ত বহু দূরের কথা।

কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! প্রিয়াজির অপূর্ব্ব লীলাকথা হইতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি,—লীলা-রস ভঙ্গ করিয়া তত্ত্ব-কথার অবতারণার জন্য জীবাধম লেখকের অপরাধ ক্ষমা করিবেন—কিন্তু মনে রাখিবেন পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর কথা—

—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
যাহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় লালস॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী অন্তরঙ্গা সখি কাঞ্চনার সহিত আজ সন্ধ্যার পর নির্জ্জনে ভজন-মন্দিরের বাহিরে বসিয়া যে ভাবে রসকথা কহিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন, এরূপ ইতিপূর্ব্বে কখন করেন নাই। সখিদ্বয়ের আজ প্রাণে অভুতপূর্ব্ব আনন্দ—তাঁহারা এখন সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার ভজন-মন্দিরে রাত্রিতে তাঁহাদের শয়নের কথা তুলিলেন। সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীহস্তখানি তাঁহার নিজ বদন হইতে সরাইয়া দুই হস্তে পরম প্রেমভরে তাহা ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, বলিলেন—"সখি! প্রাণসখি! আচ্ছা! এসকল কথা রাত্রিতে হইবে—এখন থাক—এখন এ সকল কথার সময় নহে"—কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দের স্মরণ থাকিতে পারে সখি কাঞ্চনা যখন গান করিতেছিলেন—

'স্বপনে বন্ধুয়া মোর পালঙ্কে বসিল গো'—

* "ধ্যাতিত্যা তুর্য্যমপি-সংশ্রিতানাং
তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্।
ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং
স্বপ্নো রজোবৃত্তি বিজিম্ভিতো যঃ॥

এই গানটী শেষ হইতে না হইতে বিরহিণী প্রিয়াজি হাত দিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। সখি কাঞ্চনা তাই এখন ধীরে ধীরে প্রিয়াজির হাতখানি ধরিয়া এই কথাগুলি কহিলেন। প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া তাঁহার ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন।

সখিদ্বয় মন্দির-দ্বারে বসিয়া নিজ নিজ সংখ্যা-নাম পূর্ণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়াজি আজ আর দ্বার রুদ্ধ করিলেন না।

সখি কাঞ্চনার সংখ্যানাম পূর্ণ হইলে সখি অমিতাকে কহিলেন—"চল সখি। একটু বিরলে বসিয়া মনের কথা কিছু বলিব। এ স্থান নির্জ্জন নহে"। এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা অমিতার হাত ধরিয়া ভজন-মন্দির-সংলগ্ন একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গিয়া দুই জনে বসিলেন।

সখি কাঞ্চনা বলিলেন—"সখি অমিতে! প্রিয়াজির কঠোর ভজন-প্রণালী দেখিয়া মনে আমার বড় ভয় হয়—এখন যাহাতে গৌর-কথার ইষ্টগোষ্ঠীতে অধিকক্ষণ তাঁহার মন নিবিষ্ট রাখিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—রাত্রিতে যাহাতে তাঁহার একটু নিদ্রা হয়, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কৌশলে এসকল ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেখি আজ রাত্রিতে কি হয়"—সখি অমিতা উত্তর করিলেন—"সখি কাঞ্চনে! এ বড় কঠিন কাজ—পাষাণের রেখার মত প্রিয়াজির কঠোর ভজনরীতি। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা—তবে তোমার মত মর্ম্মী-সখির অসাধ্য কিছুই নাই,—দেখ কতদুর তুমি করিতে পার।"

সখি কাঞ্চনা আর এসম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া অন্য ভাবের কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন—"দেখ সখি অমিতে! আমার গীত শ্রবণে প্রিয়াজির মনে গৌর-বিরহ-ভাব-তরঙ্গ সমুচ্ছসিত হইয়া তাঁহার যেরূপ মর্ম্মন্তুদ দশা উপস্থিত হয়, তাহাতে আমার গান এখন বন্ধ রাখাই উচিত।" সখি অমিতা উত্তরে বলিলেন—"সখি কাঞ্চনে। তোমার গানই প্রিয়াজিকে এখন পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছে—তুমি কি জান না তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণে কত সুখ তোমার গান শুনিলে প্রিয়াজির যে গৌর-বিরহ-যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাই তাঁহার পক্ষে পরম সুখ। সে যাতনার মধ্যে যে আনন্দানুভূতির স্পর্শ আছে—তাহাতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হয়—তাহাই তাঁহার এই অকথন গৌর-বিরহ-ব্যাধির মহৌষধি। তুমিই তাঁহার এই ব্যাধির উপযুক্ত বৈদ্যরাজ—এবং তোমার গানগুলি রোগিনীর নিদান কালের বিষ-বটিকা। এই জন্যই তাঁহার যে দশা হয়, তাহা দশম-দশার পূর্ব্বাবস্থা হইলেও তোমার মত সুচীকিৎসকের চিকিৎসায় অসাধ্য রোগ নহে"।

সখি অমিতার কথাগুলি বড় সারবান কথা। সখি কাঞ্চনা এই সদুপদেশপূর্ণ-কথাগুলি শুনিয়া নিজ মত পরিবর্ত্তন করিলেন এবং সখি অমিতাকে বলিলেন—"চল সখি। চল বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে এই সময়ে দুটি গান শুনাইয়া ধন্য হই। তোমার মত ভজনবিজ্ঞা সখির পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ আমি করিব না"—এই বলিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া সখিদ্বয় ভজন-মন্দির-দ্বারে গিয়া দেখেন প্রিয়াজি মন্দিরে নাই—একটী ঘৃতের দীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে—গৌর-বল্লভাকে তাঁহার ভজন-মন্দিরে না দেখিয়া সখিদ্বয় বিষম চিন্তিত হইয়া মহা শঙ্কিতচিত্তে এদিক ওদিকে অনেক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি আঙ্গিনায় নামিয়া দেখিলেন নিবিড় তুলসী-কাননের মধ্যে বিরহিণী প্রিয়াজি অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন।

তখন রাত্রি দেড় প্রহর উর্ত্তীর্ণ হইয়াছে—বিরহিণী প্রিয়াজি ভজন-মন্দিরে বসিয়া সংখ্যানাম জপমগ্না ছিলেন। তার পর তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছে—সখিদ্বয় তাহা জানেন না—কারণ তাঁহারা নিকটে ছিলেন না। ইহাই এখন তাঁহাদের মহা অনুতাপের কারণ হইল। গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির এখন দিব্যোন্মাদ-দশা। নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ-দশার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন পুজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে অন্ত্যলীলার উপসংহারের সূচীপত্রে যথা,—

—"চতুর্দ্দশে দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন।
শরীর হেথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥
তহিমধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থিসন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্গম॥
চটক পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।
তহিমধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাসে।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশে॥
তহিমধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
তহিমধ্যে কৈল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ॥
সপ্তদশে গাভী মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম॥
কৃষ্ণের রূপগুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।
"কাস্ত্যঙ্গতে" শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥
ভাবশাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলপন।
কর্ণামৃত শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণগোপী জলকেলি তাঁহা দরশন॥
তাঁহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জাগিয়া উঠাইলা,—প্রভু আইলা স্বভবন॥
উনবিংশে প্রভুর ভিত্তে মুখ সংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন॥
বসন্তরজনী পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ-বিবরণ॥"—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর এই দিব্যোন্মাদ-লীলা-রঙ্গের প্রতি লীলারঙ্গই নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার প্রাণ-বল্লভা বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রকট করিতেছেন। এই সকল প্রবন্ধে—জীবাধম লেখক বিরহিণী গৌর-বল্লভার গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনের রসশাস্ত্রমত ক্রম স্থির করিতে পারেন নাই;—বিপ্রলম্ভ-রস-পর্য্যায়ের দশ-দশার ক্রম-রক্ষা স্থির-চিত্তের কথা—জীবাধম লেখকের পক্ষে প্রিয়াজির এ সকল কাষ্ঠপাষাণভেদী লীলাকথা লিখিবার সময় চিত্ত স্থির থাকে না,—থাকিতেও পারে না। চিত্তের আবেগে যখন যে পদটীতে চিত্তে আকৃষ্ট ও নিবিষ্ট হইয়াছে—সেই পদটিরই আস্বাদন ও আলোচনা করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ-মনে করিয়াছি। কৃপানিধি শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক পাঠিকাবৃন্দ এই ত্রুটির জন্য জীবাধম লেখককে ক্ষমা করিবেন—মূর্খের শত দোষ,—একথাটি আপনারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

গৌর-বল্লভা প্রিয়াজির সিদ্ধান্তমতে আত্মকথা "আনুকথা"। জীবাধম লেখকের আত্মকথার অবতারণায় লীলাকথার রসভঙ্গ হইল,—এজন্যও তাহার মহা অপরাধ হইল।

—"দয়ার ঠাকুর মোর শ্রোতা মহাজন।
কৃপাকরি অপরাধ না কর গ্রহণ॥"—

এক্ষণে আসুন আমার কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ—আসুন একবার গৌরশূন্য গৌর-গৃহের অন্তপুরের অঙ্গিনার মধ্যে দিব্য তুলসী-কাননে—বিস্তৃত ঘনকৃষ্ণ তুলসীর কানন-প্রান্তে গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভূমিতলে পড়িয়া আছেন—সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা নিকটে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যা প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন গৌর-বল্লভার শরীরের অস্থি-সন্ধি-সকল শিথিল হইয়াছে—কোন কোন স্থানের অস্থি-সন্ধি-গুলি একেবারেই স্খলিত হইয়া চর্ম্মগুলি শিথিল হইয়া দীর্ঘাকৃতি ধারণ করিয়াছে—দেখিলে মনে ভয় হয়—সমস্ত শরীর বিবর্ণ—মুখে গোঁ গোঁ শব্দ এবং ফেনোদ্গার হইতেছে। সখিদ্বয় লজ্জায়, ক্ষোভে এবং ভয়ে মরমে মরিয়া তাঁহাদের প্রিয়সখির অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের প্রাণে বড় ভয় হইয়াছে। বিরহিণী প্রিয়াজীর এই অলৌকিক অনুভাবের উদ্গম হইয়াছে তাঁহার প্রাণবল্লভের নীলাচলের গম্ভীরা-লীলারঙ্গ স্মরণে। তিনি তাঁহার ভজন-মন্দির হইতে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া একেবারে "তুলসী কাননং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ" এইরূপ ভাবে বিভাবিত হইয়া সেখানে পতিত হইয়াছেন। সখিদ্বয় অন্যত্র নির্জ্জন কথোপকথনে অন্যমনস্ক ছিলেন—এদিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না—এজন্য তাঁহাদের মনে সন্তাপের পরিসীমা নাই! পূর্ব্বেও আর একবার এইরূপ তাঁহাদের অসাবধানতার জন্য বিরহিণী প্রিয়াজির এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল। সখি কাঞ্চনা নিরুপায় হইয়া প্রিয়াজির উক্তি একটি গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—অমিতা দোহার দিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

—"সখি! বলে দে আমায়।
কাঁহা মেরা মন-চোরা, গোরা রসময়॥
(যত) ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি ফিরত, (তত) ছুটি ছুটি ভাগত,
রোই রোই বুক ফাটে, পেখন না হয়।
তবু ঢুঁড়ত ফিরত, কিবা দিন কিবা রাত,
কাঁহা মেরা মনচোরা গোরা রসময়॥

ওগো সখি! তোরা বলে দে আমায়।
হরিদাসী বোলত, হৃদি-কুঞ্জে ঢুড়ত,
মন-চোরা গোরা (তেরা) হৃদে বিলসয়॥"
গৌর-গীতিকা।

দিব্যোন্মাদ-দশা-গ্রস্থা গৌর-বিরহিণী গৌরনাম শ্রবণ মাত্রেই গ্রহগ্রস্থার ন্যায় একেবারে উঠিয়া বসিলেন,—আলুথালু কেশদাম—অসম্বর তাঁহার পরিধান বসন,—ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহ—উদাস নয়নদ্বয়ে শ্রাবণের ধারা বহিতেছে—তিনি দুই হস্তের নখাগ্রভাগ দ্বারা নিজ বক্ষ চিরিয়া রক্তপাত করিলেন। তাড়াতাড়ি সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির দুই হাত দৃঢ়ভাবে ধরিলেন—উন্মাদিনী প্রিয়াজির জীর্ণ শরীরে আজ যেন শত হস্তীর বল—তিনি নিজ হস্ত ছিনাইয়া লইয়া নিজ বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন,—ইহা দেখিয়া বিষম বিপদে পড়িয়া সখিদ্বয় তাঁহাকে সজোরে ক্রোড়ে ধরিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল—পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া করুণ হইতেও করুণ প্রেম-ক্রন্দনের স্বরে প্রেমাবেগে সখি কাঞ্চনার দুটি হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—

—"সখি! তোরা বলে দে আমায়।
কাঁহা মেরা মন-চোরা গোরা রসময়॥"

এই কথা বলিতে বলিতে প্রিয়াজি পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইলেন।

নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরেও ঠিক এই সময়েই এইরূপ একটী অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রকট করিয়াছিলেন,—সেখানেও স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বিধিমত সান্ত্বনা করিয়াছিলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহানলে জর্জ্জরিত হইয়া ব্যাকুলভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন,—

—"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চাঁদবদন॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘনশ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর যেন কোটি কাম॥
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটিন্দু শীতল
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা নিরমল॥
ঐছন প্রলপিতে ভেল মুরছিত।
এ রাধামোহন গায় বিরহ-চরিত॥ পদকল্পতরু।

দিব্যোন্মাদ-দশা-গ্রস্থা গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেম-মূর্চ্ছাবস্থায় সখি-ক্রোড়ে শায়িতা—মধ্যে মধ্যে হৃদিবিদারক প্রলাপধ্বনি তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া বাহির হইতেছে—"হা প্রাণবল্লভ! হা নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র! হা নাথ বিশ্বম্ভর!" ইত্যাদি।

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুরূপ প্রলাপ বাক্য—

"ক নন্দ-কুল-চন্দ্রমা ক শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক মন্দমুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক রাসরস-তাণ্ডবী ক সখি জীবরক্ষৌষধি
নির্ধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হন্ত হা ধিগ্ বিধিং॥*
ললিতমাধব নাটক।

এই দিব্যোন্মাদ-লীলারঙ্গ শ্রীনীলাচলধামে এবং শ্রীনবদ্বীপধামে যুগপৎ প্রকট করিতেছেন যিনি,—তিনি শক্তি-শক্তিমানভাবে অদ্বয়-তত্ত্ব। একজন সর্ব্বভাবনিধি সর্ব্বেশ্বর অখিল-রসামৃত-সিন্ধু পরম পুরুষোত্তম পরতত্ত্ব হইয়াও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিরূপিনী মহাভাবস্বরূপিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন নীলাচলে গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া কপট সন্ন্যাসী বেশে দুইটি অন্তরঙ্গ মর্ম্মী-ভক্ত সঙ্গে,—আর একজন তাঁহার স্বরূপশক্তি স্ব-স্বরূপে এবং স্ব-ভাবে বিভাবিত হইয়া নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া দু'টী অন্তরঙ্গা সখিসঙ্গে গৌরবিরহরসাস্বাদন করিতেছেন। বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন উভয়েই করিতেছেন—রসটির রসন অর্থাৎ আস্বাদন এক অখণ্ড ভাবেই হইতেছে—কিন্তু লীলার উদ্দেশে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন স্বরূপে ইহার প্রকাশ ও বিস্তার হইতেছে। নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির-দ্বার একেবারে তালাবদ্ধ ছিল—তাঁহার অভ্যন্তরে যে বিপ্রলম্ভ-রসের অদ্ভুত একটী উৎস ছিল,—তাঁহার সন্ধান যে গৌর ভক্তগণ জানিতেন না—এমন কথা নহে,—তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

---

* অর্থ—শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু বিলাপ করিতেছেন "সখি! নন্দকুল-চন্দ্রমা কোথায়? সেই শিখিশিখণ্ড-ভূষণ কোথায়? সেই সুগম্ভীর মুরলীরবকারী আমার প্রাণবল্লভ কোথায়? সেই ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কোথায়? সেই রাসরসতাণ্ডবী নৃত্য কোথায়? আমার প্রাণরক্ষার সেই মহৌষধি কোথায়? হায় হায়! আমার সেই দয়িতের নিধি সুহৃত্তম কোথায়? হা হা! এতাদৃশ প্রাণ-প্রিয়তমের সহিত যে বিধি আমার বিচ্ছেদ ঘটাইল তাহাকে শত ধিক।

মহাপ্রভু এবং তাঁহার প্রাণবল্লভা শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ইচ্ছায় নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের তালার চাবি খুলিবার এতদিন আদেশ ছিল না,—কি কারণে ও কি উদ্দেশে যে এতদিন নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের এই অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-রসভাণ্ডারের ভাণ্ডারী যিনি—তিনি তাঁহার এই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ রসভাণ্ডারটি বুকে করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করার অধিকার কাহারও আছে কিনা জানি না,—যদি কাহারও এ অধিকার থাকে এবং তিনি যদি কৃপা করিয়া এই অধিকার কাহাকেও দান করেন, তবে এ রহস্য কোন কালে কাহারও দ্বারা প্রকাশ হইতে পারে।

লীলারস ভঙ্গ করিয়া অন্য কথার অবতারণা পুনরায় হইল যাঁহার ইচ্ছায়,—তাঁহার চরণকমলে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পুনরায় তাঁহারই লীলাপ্রসঙ্গ অনুসরণ করিতেছি।

সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে বিরহিণী প্রিয়াজি এখনও মূর্চ্ছিতাবস্থায় শায়িতা। সখিদ্বয়ের অন্তরঙ্গসেবার কোনও ত্রুটি নাই—তবুও এখন পর্য্যন্ত বাহ্যজ্ঞান হয় নাই দেখিয়া বৈদ্যরাজ কাঞ্চনা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহের একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—যথা—

রাগ—গান্ধার।

—"যো শচীনন্দন, ভুবন আনন্দন,
করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি— কলারসে নিমগন,
সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি! ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে, বেয়াকুল অন্তর,
করতহি কত এ প্রলাপ।
গদ গদ কহত, কাঁহা মঝু প্রাণনাথ,
ব্রজ-জন-নয়ন-আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন, ধারণ-মহৌষধি,
কাঁহা মঝু সুধা মকরন্দ॥
পুন পুন ঐছন, পুছত নিজজনে,
রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখী, ভকত বচন দেখি,
কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ॥"

গৌরপদতরঙ্গিনী।

গানটি শেষ হইতে না হইতেই বিরহিণী গৌরবল্লভা মূর্চ্ছিতাবস্থাতেই প্রলাপ বাক্যে কহিতেছেন,—

—"কাঁহা মঝু জীবন-ধারণ মহৌষধি
কাঁহা মঝু সুধারসকন্দ"—

তিনি একণে অঙ্গমোড়া দিয়া পাশ ফিরিলেন—বিরহিণী প্রিয়াজির নিমিলিত নয়নের কোনে দরদরিত অশ্রুধারা,—ঘর্ম্মাক্ত কলেবর—বদনে ফেনপুঞ্জ—কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ। সখি কাঞ্চনা পুনরায় আর একটী এই ভাবের প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন, যথা,—

রাগ—নাটিকা।

সজনি! অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।
যো শচীনন্দন, পুরুবহি গোকুলে,
আনন্দ সকল নিদান। ধ্রু॥
সোই নিরন্তর, কাতর অন্তর,
বিবরণ বিরহক ধুমে।
ঘামহি ঝর ঝর, সকল কলেবর,
অহর্নিশি শুতি রঁহু ভুমে॥
নিরবধি বিকল, জলত মঝু মানস,
করতহি কৈছন রীত।
কৈছে জুড়ায়ত, সোই যুকতি কহ,
তিলে এক হোত সম্বিত॥
এত কহি গৌর, ফুকরি পুন রোয়ত,
ডুবত বিরহ-তরঙ্গে।
রাধা মোহন, কছু নাহি বুঝত,
নিমগন যো রসরঙ্গে॥" গৌরপদ-তরঙ্গিনী।

এই গানটি শুনিতে শুনিতে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি সখি-ক্রোড়ে শয়ন করিয়াই ডুকরিয়া ডুকরিয়া সেখানে একটি মহা করুণ ক্রন্দনের রোল উঠাইলেন,—

—"কাঁহা মোর প্রাণনাথ গোরা রসময়।"

তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে ক্রন্দন করিলেন—আর একবার অঙ্গমোড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। পুনরায় করুণ ক্রন্দনের স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন—

যথারাগ।

—"কে মোরে মিলায়ে দিবে সে চাঁদবয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥

কাল রাত্তি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥
উঠি বসি আর কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধু জন।
প্রিয়া বিনা শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কতদূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
দুঃখ জানাইতে চলে বলরাম দাস।"

পদকল্পতরু।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তখন ধীরে ধীরে প্রিয়াজিকে ক্রোড় হইতে উঠাইয়া বসাইলেন—গৌর-প্রেমোন্মাদিনী প্রিয়াজির সর্ব্বাঙ্গ, তখন গৌর-বিরহাবেশে টলমল করিতেছে,—প্রেমাবেশে তাঁহার নয়নদ্বয় তখনও ঢুলু ঢুলু। তিনি তখন ধীরে ধীরে চক্ষুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্মীলন করিয়াছেন —কোন কথাই স্মরণ হইতেছে না—তখনও তিনি দিব্যোন্মাদ-ভাবাবেশে সখি কাঞ্চনার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া নিজ বক্ষ ভাসাইয়া গৌর-বিরহ-বেদনা জানাইতেছেন, যথা—

যথারাগ।

"সখি! পুন নাহি হেরব সে চাঁদ বয়ান।
দিন দিন ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হলো পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখ-সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে ফাটি যায় মোর হিয়া॥"—

বিরহিণী প্রিয়াজিকে লইয়া সখিদ্বয় আজ বড় বিপদেই পড়িয়াছেন,—ভজন-মন্দিরে তাঁহাকে পুনরায় কি করিয়া লইয়া যাইবেন এই ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে,—চাঁদিনী রাত্রি—চতুর্দ্দিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নালোকে তুলসী-কানন যেন ঝলমল করিতেছে—অন্তঃপুরের বিস্তৃত আঙ্গিনা চন্দ্রালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সখি কাঞ্চনা এবং অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজিকে লইয়া সেই তুলসী-কাননের প্রান্তে বসিয়া নির্জ্জনে তিন জনে নিগূঢ় বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন করিতেছেন।

ওদিকে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে গাভীগণ মধ্যে পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ঠিক এই সময়েই যে দিব্যোন্মাদ-লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছেন, তাহার অনুরূপ লীলাই এক্ষণে নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরে প্রকট হইতেছে।

বিরহিণী প্রিয়াজির বদনে ইতিমধ্যে একবার ভাবাবেশে উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপ বাক্য বহির্গত হইল, যথা—

—"সোনার গৌরাঙ্গ মোর নেচে চলে যায়।
(ঐ) নেচে চলে যায়॥"—

এই বলিয়াই তিনি সজোরে সখিদ্বয়ের হস্ত ধারণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সুধু দাঁড়ান নহে—তাঁহাদিগকে টানিয়া আঙ্গিনার ভিতর ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন, যেন তাঁহার প্রাণবল্লভকে ধরিবার জন্য পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন—তাঁহার বদনে কেবল—"ঐ নেচে চলে যায়"—"ঐ নেচে চলে যায়।" এই কয়টি শব্দমাত্র শ্রুত হইতেছে। ঊর্দ্ধে নয়নদ্বয় উদাসভাবে যেন কাহার প্রতি চাহিয়া আছে;—যেন কোন হারাধন খুঁজিতেছে। বিরহিণী প্রিয়াজির মুখে তখন—"সখি! পেয়ে ধন হারাইলাম এমনি মন্দভাগিনী আমি—এমনি মহাপাপিনী আমি"—এই কথা বলিয়া তিনি প্রেমাবেশে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং দুই হস্তে নিজ কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া যখন তিনি বুঝিলেন, ইহা তাঁহার বিষম ভ্রম যে তাঁহার সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভ পুনরায় নদীয়ায় আসিবেন,—তখন বিরহিণী প্রিয়াজি অতি ধীর পদবিক্ষেপে লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া সখিদ্বয় সহ তাঁহার ভজন-মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার হাত ধরিয়া মন্দির ভিতরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভার তাৎকালিক মনের ভাবটি তাঁহার কৃষ্ণবিরহ-দগ্ধ সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভের মনের অনুরূপ ভাব যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

—"প্রাপ্তরত্ন হারাইঞা ঐছে ব্যগ্র হৈল।
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইল॥

ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমে লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥
"পাইনু বৃন্দাবন-নাথ পুন হারাইনু।"
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কোথা মুঞি আইনু॥"

বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে মিটি মিটি ঘৃতের একটী প্রদীপ জলিতেছে—আর তিনি আসনে বসিয়া দক্ষিণ হস্তের নিজ নখ দ্বারা মাটীতে কি দাগ পাড়িতেছেন,—তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া অশ্রুগঙ্গা বহিতেছে—মুখে মধ্যে মধ্যে—

"হারাধন পেয়ে মুঞি পুন হারাইলাম।
মুঞি অভাগিনী নারী বিধি মোরে বাম॥"

এক একবার সকরুণ নয়নে সখিদ্বয়ের প্রতি চাহিয়া তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—আর কখন কখন সখিদ্বয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া পরম করুণ-ক্রন্দনের সুরে কহিতেছেন—

—"কতদিন সখি, রহিবে গৌরাঙ্গ,
নীলাচল-ধামে আর।
দিন গণি গণি, কত বরষ গেল,
(মোর) ভাবনার নাহি পার॥"

পরক্ষণেই পুনরায় বলিতেছেন,—

(মোর) "রহি রহি মনে পড়ে নদীয়া-বিহার"

নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে গভীর রাত্রিতে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধিকার উক্তি বিদ্যাপতি ঠাকুরের ঠিক এই ভাবেরই একটী প্রাচীন পদের রসাস্বাদন করিতেছেন তাঁহার দুইটী মর্ম্মী অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে যথা—

যথারাগ।

—"কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর,
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি! কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পুরব পিয়ারি, নারী হাম আছনু,
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরি ভ্রমি, সবহু কুসুমে বসি,
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশা নিগড় করি, জীউ কত রাখব;
অবহি যে করত পরাণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান॥"

পদকল্পতরু।

এখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরের এই যে বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক লীলারঙ্গ,—ইহার মূল উৎস নদীয়ায় তাঁহার বিলাস-মন্দিরে—যাহার নাম নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির—এবং যেখানে তাঁহার স্বরূপশক্তি স্বয়ংভগবতী বৃষভানু-নন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন তাঁহার দুইটী অন্তরঙ্গা মর্ম্মী সখি সঙ্গে। মহাভাবময়ী নবদ্বীপময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বয়ংরূপে এবং স্ব-ভাবে যে রস এখানে আস্বাদন করিতেছেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহারই ভাব এবং তাঁহারই কান্তি চুরী করিয়া সেই রসই নীলাচলে বসিয়া আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে এবং নীলাচলে এই দুই স্থানের গম্ভীরা-লীলারঙ্গ অনুরূপ হইলেও অবশ্যই বৈশিষ্ট কিছু আছে—সে বৈশিষ্টের প্রকাশ নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে—যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া—এবং তিনি বিপ্রলম্ভ-রসের মূর্ত্ত-বিগ্রহ—এই অপূর্ব্ব রসটি এখানে মূর্ত্তিমতী।

এই গভীর রাত্রিতে বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে আজ তিনটি প্রাণী—তিনটিই গৌর-বিরহিণী—তিনটিই এক প্রাণ, এক মন। ইতিপূর্ব্বে বিরহিণী প্রিয়াজি রাত্রিতে তাঁহার ভজন-মন্দিরে প্রবেশাধিকার দান করিয়াছিলেন সখি কাঞ্চনাকে—সখি কাঞ্চনার এজন্য বিশিষ্ট সাধ্য সাধনা ও সুপারিশের প্রয়োজন হইয়াছিল। সখি অমিতার প্রতি কৃপাময়ী গৌর-বল্লভার অহৈতুকী কৃপা। অযাচিতভাবে প্রিয়াজি আজ তাঁহাকে তাঁহার নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে রাত্রিতে প্রবেশাধিকার দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। সখিদ্বয় উভয়েই ইহাতে বিস্মিত ও কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। সখি অমিতার প্রাণে আজ বড় আনন্দ,—তিনি বড় গম্ভীর প্রকৃতি—নদীয়ার মহা গম্ভীরামন্দিরে এই

এই গম্ভীর প্রকৃতি সখিটি গম্ভীর-স্বভাবা গৌর-বল্লভার নির্জ্জনভজনের উপযুক্ত সঙ্গিনী। সখি অমিতার মুখে কথা নাই—কিন্তু বদন-মণ্ডলে সতত গৌর-প্রেমানন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে—নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে—তাঁহার নয়নদ্বয় বিরহিণী প্রিয়াজির বদনের সর্ব্বস্থানে যেন ঘুরিতেছে—কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন কি বলিয়া তাই তিনি ভাবিতেছেন। অন্তর্য্যামিনী প্রিয়াজি তাঁহার প্রিয়সখির মনোভাব বুঝিয়া নিজেই দুই বাহুদ্বারা তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া প্রেম-গদগদ বচনে করুণ-ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—

"প্রাণসখি অমিতে!

যথা রাগ।

—"এই ঘরে বসি, নদীয়ার শশী,
কত রস-কেলি কৈল।
কোথা গেল গোরা, মোর মন-চোরা,
বুকে মারি মোর শেল॥
কে লইল হরি, কহ সহচরি,
(মোর) নদীয়া-নাগর-রাজ।
পরাণের পিয়া, লইল ছিনিয়া,
(মোর) মুণ্ডে পাড়িয়া বাজ॥
পিয়ার প্রেয়সী, কান্দে দিবানিশি,
(কেন) না শুনে নাগর রায়।
বিধির বিধান, কে করে খণ্ডন,
(বল) কি করে পরাণ রয়॥
নিলাজ পরাণি, কেন নাহি জানি,
রয়েছে এখনও দেহে।
আগে সে মরিবে, (এ) লীলা না দেখিবে,
দাসী হরিদাসী কহে॥"

গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজি এতদিন পরে আজ প্রাণ খুলিয়া সখি সঙ্গে তাঁহার মর্ম্মান্তিক হৃদিবেদনার কথাগুলি বলিয়া যেন কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন। সখিদ্বয় কান্দিয়া আকুল হইলেন—আজ সেই নির্জ্জন ভজন মন্দিরে গভীর নিশীথে তিন জনে মিলিয়া গলা জড়াজড়ি করিয়া যে কি একটা করুণ হইতেও করুণ ক্রন্দনের অস্ফুট রোল উঠাইলেন—তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—শ্রবণ করিবার শক্তি নাই—তাঁহার বুঝিবার সামর্থ নাই—চিন্তা করিবার শক্তি নাই—মুনি-ঋষিগণের তাহা ধ্যান ধারণার বস্তু—সমাধির বিষয়—শিববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত ধন সেই অপূর্ব্ব প্রেম-সম্পত্তি।

সখি কাঞ্চনার মনে আজ বড় আনন্দ—তাঁহার মনের একটা প্রবল সন্দেহ আজ দূর হইল। তিনি মনে মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন এবং তাঁহার প্রিয়সখি অমিতাকেও মধ্যে মধ্যে বলিতেন গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মনের কথা ও প্রাণের ব্যথা তাঁহাদের নিকট কেন গোপন করেন? আজ গৌর-বল্লভা প্রাণ খুলিয়া তাঁহার প্রাণের কথাগুলি একে একে বলিতেছেন—তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের মর্ম্মব্যথাগুলি প্রকাশ করিয়া মর্ম্মি সখিদ্বয়কে বলিতেছেন—এ বড় সৌভাগ্যের কথা—এ বড় আশার কথা—এ বড় আনন্দের কথা মর্ম্মি সখিদ্বয়ের পক্ষে। আজ তাঁহাদের প্রিয় সখির স্বতন্ত্রতার আবরণ উন্মোচন হইয়াছে,—ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—ইহা সখিদ্বয়ের পক্ষে পরমানন্দের বিষয়। তাঁহারা প্রেমাবেগে কাঁদিতেছেন বটে—কিন্তু তাঁহাদের এই প্রেমক্রন্দনের মধ্যে প্রাণে একটা অভুতপূর্ব্ব আনন্দানুভূতির সঞ্চার হইয়াছে,—মনের মধ্যে একটা শান্তির ক্ষীণালোকের আভাস দেখা দিয়াছে—হৃদয়ের মধ্যে একটা উজ্জ্বল আশার দীপ জ্বলিয়াছে।

কতক্ষণ পরে বিরহিণী প্রিয়াজি সখিদ্বয়ের প্রেমালিঙ্গন মুক্ত হইয়া তাঁহার প্রধান মর্ম্মীসখি কাঞ্চনার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া পুনরায় করুণ-ক্রন্দনের সুরে প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের গুপ্ত মর্ম্মবেদনাটি খুলিয়া বলিলেন—

যথারাগ।

"সখি!
যে মোর অঙ্গের, পবন পরশে,
অমিয়া-সাগরে ভাসে।
এক আধ তিল, মোরে না হেরিলে
যুগ শত হেন বাসে॥
সই! সে কেন এমন হলো।"—

এই একটি কথা বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির বাক্ রুদ্ধ হইয়া গেল,—সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল—তিনি সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। সখিদ্বয় তখন পরম ব্যস্ততা সহকারে তাঁহার অঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন।

আজ পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি ধৈর্য্যহারা হইয়াছেন—তাঁহার গম্ভীরা-প্রকৃতির আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সখিদ্বয়ের প্রাণ প্রেমানন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে,—এত দুঃখের মধ্যেও তাঁহারা আজ উৎফুল্ল মনে প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন।

নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর লীলারঙ্গ-কথা বেদবিধির অগোচর—শিববিরিঞ্চির অগোচর। এই জন্যই—

—"বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলাকথা জানিয়া গভীর।
নিষেধিলা প্রকাশিতে গৌর-নটবীর॥
নদীয়া গম্ভীরা-লীলা অগাধ অথাই।
ছন্ন-অবতার নারী বিষ্ণুপ্রিয়া রাই॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গল।

প্রেমভক্তিস্বরূপিনী প্রিয়াজিকে চিনিতে হইলে প্রচুর প্রেমভক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে—

"প্রিয়াজি চিনিতে চাই প্রেম পরচুর॥"

এইভাবে সেদিন সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। গৌর-বল্লভার গৌর-ভজন পদ্ধতির বিধিনিয়ম এখন হইতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

ক্রমে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত—প্রভাতী কীর্ত্তনের দল আসিয়া গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিল—

যথারাগ।

"প্রভাত সময়ে গৌরাঙ্গ সুন্দর শচীর অঙ্গনে নাচে।
শুন ওগো শচীমাতা, গৌর আমার প্রেমদাতা,
জগত ভরিয়া প্রেম যাচে।
(গোরার) রাতুল চরণে সোণার নুপুর
রুণু রুণু ঝুণু ঝুণু বাজে॥"—

বিষ্ণুপ্রিয়া পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ, দেওঘর।
২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭,
মঙ্গলবার, রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(১৪)

রসশাস্ত্রকারগণ বিরহকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—ভাবী, ভবন্ ও ভূত। গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিরহ ভাবী ও ভবন্ বিরহ নহে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ যখন পিতৃকার্য্য করিতে গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই কথা শুনিয়া তাঁহার যে পতি-বিরহ-জ্বালা হইয়াছিল, তাহার নাম ভাবী বিরহ। প্রবাস ও প্রবাস-জনিত বিরহই তিন প্রকার। উপস্থিত-ঘটন যে বিরহ তাহার নাম ভবন্-বিরহ। বিরহিণী প্রিয়াজির বিরহ ভবন্ বিরহও নহে,—কারণ তাঁহার প্রাণ-বল্লভ বহুদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ভাবী ও ভবন্ বিরহের কাল উত্তীর্ণ হইয়া এখন বিরহিণী প্রিয়াজির ভূত-বিরহাবস্থা। প্রবাস আবার দুই প্রকার,—বুদ্ধি-পূর্ব্ব-প্রবাস এবং অবুদ্ধি-পূর্ব্ব-প্রবাস। বুদ্ধি-পূর্ব্ব-প্রবাসও আবার দ্বিবিধ—কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস। এই সুদূর প্রবাসজনিত বিরহই ত্রিধা বিভক্ত—ভাবী, ভবন্ ও ভূত।

কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহে আর গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার গৌর-বিরহে কিছু পার্থক্য আছে—বিশেষত্ব আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা-প্রবাসে গিয়াছিলেন,—এই কিঞ্চিদ্দূর প্রবাস-জনিত বিরহ এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-প্রবাসে গিয়াছিলেন, তাঁহার সেই দূর প্রবাস-জনিত বিরহের মর্ম্মস্পর্শী ভাব—অর্থাৎ ভাবী ও ভবন্ বিরহের ভাবসম্পত্তি লইয়াই প্রাচীন মহাজন কবিগণ সহস্র সহস্র অপূর্ব্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহ-গীতি রচনা করিয়া গিয়াছেন—যাহা এখন ভগবৎ-বিরহসন্তপ্ত-হৃদয় বহু প্রেমিক ও ভাবুক ভক্তবৃন্দের প্রধান ভজনাঙ্গের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ভূত-বিরহও প্রবাসজনিত—এই বিরহাবস্থাতেও বিরহিণী নায়িকার মিলনের আশা আছে—সেই আশার পথ চাহিয়াই তিনি প্রাণ রাখিয়াছেন। দিব্যোন্মাদ-দশা এই ভূত-বিরহের অন্তর্গত। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ প্রবাসে গিয়াছেন—রাজা হইয়াছেন—তিনি পরম সুখে আছেন—তিনি আবার শ্রীবৃন্দাবনে আসিবেন,—বিরহিণী কৃষ্ণ-বল্লভা শ্রীরাধিকা এই আশাটি হৃদয়ে পোষণ করিয়া এত বিরহজ্বালার মধ্যেও মনে কিঞ্চিৎ সুখ পান—ইহাই "আনন্দামৃত"—ইহাই বিরহিণী কৃষ্ণ-বল্লভার জীবনোপায়—

জীবাতু। কিন্তু বিরহিণী গৌর-বল্লভা—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন—তিনি যে আর কখন শ্রীনবদ্বীপে ফিরিবেন, সে আশাটুকুও বিরহিণী প্রিয়াজির একেবারেই নাই। সুতরাং ভাবী, ভবন্ ও ভূত এই যে তিন প্রকারের প্রবাস-জনিত বিরহ,—তাহার অতীতাবস্থার যে বিরহ-জ্বালা, তাহাই গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর। প্রবাস শব্দের অর্থ নিজ বাসভূমি ত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্ম বা দীর্ঘকালের জন্য অন্যত্র বাস। প্রবাস গমন একবার করিলে প্রবাসীর নিজবাসে ফিরিয়া আসিতে যে কোন বিধিনিষেধ আছে,—এমন কোন কথা নাই—এমন কোন শাস্ত্রবিধিও নাই। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া যাঁহারা গৃহত্যাগ করেন—যতিধর্ম্মাবলম্বন করিয়া যাঁহারা চিরতরে গৃহবাস পরিত্যাগ করেন—তাঁহারা গৃহের কথা—গৃহবাসের বাসনা—গৃহে প্রত্যাগমনেচ্ছা—আত্মীয় স্বজন দর্শনেচ্ছা একেবারে মনেও স্থান দেন না। গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৌর-বিরহ, এই তথা-কথিত প্রবাস জনিত বিরহ-ভাব দ্যোতক হইলেও তাঁহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বটুকু বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তাঁহার গৌর-বিরহের গুরুত্ব অধিক বলিয়া অনুমিত হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ বিশিষ্ট-ভাবের অত্যুন্নতোজ্জ্বল বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার বিশিষ্ট আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ হয়। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে জন্য শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিশিষ্ট আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকারও সেই জন্যই বিশিষ্ট আবির্ভাবের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। বিশিষ্টভাবে বিপ্রলম্ভ-রসপুষ্টির জন্য যে স্বয়ংভগবান্ এবং স্বয়ং ভগবতীর উভয় স্বরূপের বিশিষ্ট আবির্ভাব, তাহা গোস্বামি-শাস্ত্রযুক্তি সম্মত এবং পরবর্ত্তী পরতত্ত্বের সমুৎকর্ষতাবোধক।

গৌর-বল্লভার কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান নদীয়ার গম্ভীরা-লীলা-কথা পাঠে যাঁহার হৃদয় বিগলিত না হয়,—নয়নে প্রেমাশ্রুধারা নিপাতিত না হয়—তাঁহার মনুষ্যজীবন বিফল,—একথা ধ্রুব-নিশ্চিৎ। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

—"এসকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥"—

তাই বলি কলির জীব! কাঁদ—প্রাণ ভরিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদ—জগৎ সংসার ভুলিয়া,—আপনা ভুলিয়া একটী বার গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির দুঃখে মাত্র দুটি ফোটা অশ্রু-জল বিসর্জ্জন করিয়া দেখ দেখি,—প্রাণে কেমন অপূর্ব্ব শান্তি পাইবে—মনে কেমন অনির্ব্বচনীয় সুখ পাইবে,—এই দুই ফোটা অশ্রুজলেই তোমার চিত্তের শতজন্মের মলিনতা মুহূর্ত্ত মধ্যে দূর হইয়া যাইবে,—যাহা শত প্রায়শ্চিত্তেও হইবে না—যাহা শতসহস্র চিত্তশুদ্ধির কঠোর বিধিনিয়ম পালন করিলেও একান্ত অসম্ভব। প্রেমভক্তিস্বরূপিনী দয়াময়ী বৈষ্ণব-জননী গৌর-বল্লভা তোমাদের মাত্র এইটুকু সহানুভূতি-সূচক কার্য্যে তোমাদের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিবেন,—তাঁহার ব্যথিত-বেদনার দরদিয়া দাদী বলিয়া তোমাদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন হইবেন,—তবে তোমাদের গৌরাঙ্গ-ভজনে সিদ্ধি-লাভ হইবে। বিরহিণী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহকাহিনী যেমন কৃষ্ণভজনের মূল-মন্ত্র,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াজির গৌর-বিরহ-কাহিনীও তেমনি গৌর-ভজনের মূল-মন্ত্র। কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ-সঙ্গীত-সুধায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে,—গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৌর-বিরহ-গীতির গভীর ঝঙ্কারে এই অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের আর একটী অপূর্ব্ব পর্য্যায় খুলিবে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-রস-সম্ভার-মাধুরী শ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া-বিরহ-মিশ্রিত মধুর পদাবলী রসশাস্ত্রকে বিমণ্ডিত করিবে। এই মহৎ উদ্দেশে—গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন মহাজন কবিগণের পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণব-সাহিত্যের একটা দিক যেন শূন্য ছিল—এই অপূর্ব্ব সাহিত্য-ভাণ্ডারের বিস্তৃত কক্ষের পাশের ঘরের একদিকের দ্বার যেন বন্ধ ছিল—এই দ্বার কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কয়েক জন গৌর-বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চিহ্নিত দাস একান্ত গৌরভক্ত প্রাচীন মহাজনকবি,—যাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় নাম ও মধুর পদাবলী পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আত্মশোধন করিয়াছি। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-বিরহ-রসাস্বদ পরিপূর্ণ ভাবে আস্বাদন করিতে হইলে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধকের দুইভাবে দুই দিকে প্রখর অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন—একদেশদর্শী জ্ঞানে প্রেমভক্তিসাধনা পূর্ণ হইতে পারে না। সম্ভোগরস-বিগ্রহ এবং বিপ্রলম্ভ-রস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর-

কৃষ্ণের উভয় স্বরূপের স্বরূপশক্তির স্বরূপতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম না হইলে এই অত্যুন্নতোজ্জ্বল বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনে পরিপূর্ণ অধিকার লাভ হয় না। সদ্‌গুরুর কৃপাবলে এই অধিকার অর্জ্জনীয়।

এতক্ষণ ভণিতা গেল। এক্ষণে বিরহিণী গৌর-বল্লভার গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিয়া কিঞ্চিৎ আত্মশোধনের চেষ্টা করিব।

নদীয়ার মহা-গম্ভীর'-মন্দিরে রাত্রিকালে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মসখিদ্বয় সহ বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন করিতেছেন। এতদিন পরমা গম্ভীরপ্রকৃতি এবং পরমা ধৈর্য্যবতী গৌর-বল্লভা তাঁহার মনের ব্যথাগুলি মনে মনেই রাখিতেন—বুকের আগুন বুকেই চাপিয়া রাখিতেন,—যাহা তুঁষের আগুনের মত সর্ব্বক্ষণ ধিকিধিকি জ্বলিতেছে এবং যাহা তাঁহার দুর্ব্বল ও কোমল হৃদয়খানিকে নিশিদিন পোড়াইয়া খাক্ করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে করুণাময়ী প্রিয়াজির অসীম করুণাবলে এবং মর্ম্মসখিদ্বয়ের আত্যন্তিক প্রেমভক্তি সাধনবলে তাঁহার কিঞ্চিৎ ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিরহিণী গৌর বল্লভার মর্ম্মান্তিক মনোদুঃখ প্রাচীন মহাজন-কবি বাসুদেব ঘোষ কি ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন। বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—

যথারাগ।

—"হ্যাদেরে পরাণ নিলজিয়া।
এখনও না গেলি তনু ত্যজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাব।
মিছা প্রীতি-আশ আশে রব॥
সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কান্দি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণি॥"—

গৌরপদতরঙ্গিণী।

পদকর্ত্তা বাসু ঘোষ প্রিয়াজির এই সকল কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান লীলারঙ্গ তাঁহার দাস দাসীগণের মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া তবে সূত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—এখন এই সকল পদ-রত্নের ভাষ্য লিখিত হইতেছে।

সখি কাঞ্চনাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদে তাঁহার উক্তি কহিতেছেন,—

যথারাগ।

—"কহ সখি! জীবন উপায়।
ছাড়ি গেলা গোরা নট-রায়॥
ঝুরি ঝুরি তনু ভেল ক্ষীণ।
এ দুঃখে বঞ্চিব কত দিন॥
যদি চাই সুরধুনী ঘাটে।
কত কি দেখিয়া হিয়া ফাটে॥
আন গিয়ে গোরা গল-মালা।
অনলে পশিব জুড়াইব জ্বালা॥
কহে বাসু না সরে বয়ান।
গোরা বিনে না বাঁচে পরাণ॥"—

গৌরপদতরঙ্গিনী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা গভীর নিশীথে তাঁহার ভজন-মন্দিরে বসিয়া নির্জ্জনে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের সহিত আজ তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্ম-ব্যথাগুলি একে একে কহিতেছেন—আর নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসাইতেছেন।

দ্বিতীয় পদটিতে একটি কথা লিখিত আছে—ইহার গূঢ় মর্ম্ম আছে,—প্রিয়াজি সখিকে অনুরোধ করিতেছেন,—

"আন গিয়ে গোরা-গল-মালা।"—

এই পয়ারাংশের সরলার্থ—সখি কাঞ্চনে! তুমি নীলাচলে গিয়া আমার প্রাণ-বল্লভের গলার প্রসাদী মালা এক গাছি লইয়া এস—তাহা পাইলেও আমার প্রাণ-বল্লভের শ্রীঅঙ্গগন্ধের সন্ধান আমি পাইব—সে গন্ধসৌরভ এখনও যে আমার নাসিকারন্ধ্রে নিত্য নব নবায়মান ভাবে সুবাসিত করিতেছে,—তাঁহার বিলাস-গৃহ মহ মহ করিতেছে। বিরহিণী প্রিয়াজির এই কথাটির আর একটী নিগূঢ় অর্থও আছে।

প্রিয়াজির মনের ভাব এই রূপ।—"সখি! আমার গলার হারস্বরূপ যে গৌর-সুন্দর,—তাঁহাকে তুমি স্বয়ং নীলাচলে গিয়া আমার পক্ষ হইতে কাতর স্তুতি মিনতি করিয়া নবদ্বীপে আনয়ন কর। প্রাণসখি! তুমি যদি এ কাজ না কর—আমি জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণ-বল্লভের বিরহ-জ্বালা চিরতরে জুড়াইব—এরূপ মনে মনে সংকল্প করিয়াছি।"—

সখি কাঞ্চনা বড় চতুরা এবং রসিকা—তিনি এতক্ষণ নীরবে বিরহিণী প্রিয়াজির নিজ মুখে তাঁহার বিরহ-ব্যথার মর্ম্মান্তিক কাহিনীগুলি শুনিতেছিলেন। এক্ষণে অবসর বুঝিয়া দুই একটী কথা কহিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয় সখির হাত দু'খানি ধারণ করিয়া প্রেমাবেশে কহিলেন—"সখি! প্রাণ-সখি! এ বড় ভাল কথা—উত্তম পরামর্শ—নদীয়ার ভক্তগণ সস্ত্রীক কল্যই নীলাচলে গমন করিবেন। শিবানন্দ সেন মহাশয় সকল উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন—শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও সস্ত্রীক যাইতেছেন। সখি! তোমার আদেশবাণীর মর্ম্ম আমি বুঝিয়াছি—তোমার আজ্ঞা পালনই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। এখন বল দেখি সখি! তোমার প্রাণ-বল্লভকে তোমার পক্ষ হইতে কি বলিতে হইবে?"

তখন বিরহিণী প্রিয়াজি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন—

যথারাগ।

—"সখি!

দিন গণি গণি, দিন ফুরাইল,
আর কত কাল জীব।
থাকিতে জীবন শ্রীগৌরাঙ্গ-ধন
আর কি দেখিতে পাব॥
পথ চাহি চাহি, আঁখি আঁধা হ'ল,
জীয়ন্তে হইনু মরা।
শুন মোর বাণী, পরাণ সজনি,
নীলাচলে যাও ত্বরা॥
করিয়ে যতন, ধরিয়ে চরণ,
কহিও সজনি! তাঁরে।
তোমার লাগিয়া, মরে বিষ্ণুপ্রিয়া
চল ত্বরা নদেপুরে॥"—

সখি কাঞ্চনা পরদিনই নদীয়া-রমণী-গণের সঙ্গে নীলাচল যাত্রা করিলেন—তাঁহার সঙ্গে লইলেন গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির তপ্ত-অশ্রু-সলিল-কলস। তাঁহার প্রাণের বাসনা নীলাচলে গিয়া প্রিয়াজির এই তপ্ত অশ্রু-সলিলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অভিষেক করিবেন। শতসহস্র পবিত্র তীর্থোদক হইতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার নয়নরূপ উষ্ণ প্রস্রবণের সলিল পরম পবিত্র। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, কাবেরী প্রভৃতি নদীসলিল সকলের উৎপত্তি গৌর-বল্লভার নয়ন-সলিল-সম্পাত-ধারা হইতে। এই পরম পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ-তীর্থোদকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের অভিষেক হইলে তাঁহার পরম সুখ হইবে—এই বাসনা সখি কাঞ্চনার হৃদয়ে উদ্রেক করিয়া দিলেন যিনি—তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভকে আর কিছু বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন বুঝিলেন না।

কাঞ্চনা সখি নীলাচলে গিয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন—ন্যাসী চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু প্রকৃতির মুখ দর্শন করেন না—বাক্যালাপ ত পরের কথা। তবে তিনি তাঁহার মাতৃস্থানীয়া শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী, শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী, চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন-গৃহিণী সর্ব্বজয়া দেবী প্রভৃতি বর্ষীয়সী বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। ব্রাহ্মণ কুমারী—চতুরা কাঞ্চনা তিনি সীতাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন—কিন্তু মনের কথা তাঁহাকে কিছুই খুলিয়া বলিলেন না। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বাসায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভিক্ষার দিন তিনি সেখানে একাকী আসিয়াছেন,—সীতাদেবী রন্ধন করিতেছেন—সখি কাঞ্চনা তাঁহার সহকারিণী—অন্যান্য বৈষ্ণব-গৃহিণীগণও সেখানে আছেন। চতুরা কাঞ্চনা সকলের অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধৌত করিবার সলিল সুযোগ বুঝিয়া একটী ঝারিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভৃত্য ঈশান নাগর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধৌত করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে প্রথমে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন—কারণ তিনি ব্রাহ্মণ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ ব্রাহ্মণকে বড় ভক্তি করিতেন—ঈশান-নাগর বড় আশা করিয়া সন্ন্যাসীঠাকুরের শ্রীচরণ ধৌত করিতে গিয়াছিলেন—তাঁহার এত বড় আশায় ছাই পড়িল দেখিয়া তিনি মনোদুঃখে নিজ উপবীত ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া শূদ্র হইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বহস্তে সেই জলপূর্ণ ঝারিটি লইয়া স্বয়ং পাদ ধৌত করিলেন। এই সলিল যে তাঁহার বিরহিণী প্রিয়াজির নয়ন-সলিল, তিনি তাহা জানিতেন—কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী—তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার বিরহিণী প্রিয়তমার এই পরম পবিত্র নয়নসলিল স্পর্শ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন—তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার প্রাণবল্লভা বিরহিণী প্রিয়াজির নয়ন-জল

স্থাসী চূড়ামণির শ্রীচরণস্পর্শ মাত্রেই সন্ন্যাসী-ঠাকুরের নয়নদ্বয়ে পিচ্‌কারীর স্থায় প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল,—উপস্থিত ভক্তসকলে মনে করিলেন—ঈশান নাগরের দুঃখ দর্শনে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কোমল হৃদয়ে এইরূপ করুণ-ভাবোদ্গম হইল। সখি কাঞ্চনা দূর হইতে সকলি দেখিতেছেন—তিনি ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। ন্যাসী চূড়ামণি আজ যেন বড়ই অন্যমনস্ক—তিনি প্রসাদ ভোজনে বসিলেন,—শ্রীমুখে কোন কথা নাই—কমল নয়নদ্বয় অশ্রুজলভারাক্রান্ত,—যেন একটী কলের পুতুলের স্থায় কোন গতিকে ভোজন ব্যাপার শেষ করিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তগণ তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার পাদোদক লুণ্ঠন করিলেন—সকলেই আজ প্রেমোন্মত্তভাবে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—কেহ কিছু বলিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদোদক আজ কেন এত লবণাক্ত লাগিল—সকলেই ভাবিতেছেন সমুদ্রজলে তাঁহার শ্রীচরণ ধৌত কেন করা হইল। অভূতপূর্ব্ব প্রেমানন্দে আজ তাঁহারা অধীর হইয়াছেন—সকলে মিলিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া সেখানে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"—

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু গৃহমধ্যে ভোজনে বসিয়াছিলেন—প্রিয়াজির নামটী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি যেন অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন—কোন গতিকে ভোজন-ব্যাপার সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া ভক্তগণের প্রতি কপট ভ্রূকুটি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—"আজ এ আবার কি নূতন কীর্ত্তন করিলে? ছি! তোমরা সকলে প্রবীণ এবং ভব্য ভব্য লোক—পণ্ডিত হইয়া মূর্খের মত কাজ করিলে কেন?"—এই কথা বলিয়া কপট-সন্ন্যাসীঠাকুর শান্তিপুরনাথকে নিকটে ডাকিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যও এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। দুই জনে কি কথা হইল কেহ জানিতে পারিলেন না।

—"দুই প্রভু কি কহিল শুনা নাহি গেল"—

সখি কাঞ্চনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল—তিনি সন্ন্যাসী-ঠাকুরের ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ চতুর চূড়ামণি—নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের চতুরতা প্রিয়াজির সখিগণের কিছু অবিদিত নাই। সখি কাঞ্চনা মনে মনে নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরের-দ্বারদেশে গিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়াছেন—কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাথা কুটিয়াছেন—তাঁহার মনঃকথা—তাঁহার প্রাণের ব্যথা নীরব অস্ফুট ক্রন্দনের স্বরে মনে মনে সকলি বলিয়াছেন—অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু সকলি শুনিয়াছেন—সকলি জানিয়াছেন। লোকচক্ষে গম্ভীরা মন্দিরে সন্ন্যাসীর রাজদরবারে বিরহিণী প্রিয়াজির সখি দুখিনী কাঞ্চনার কথার শুনানি হয় নাই—হইতেও পারে না—তাহা তিনি জানেন—এজন্য তিনি মানসিকে সব কাজ সমাধান করিয়া—নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। জনমানব কেহ জানিতে পারিল না কোথায় কি হইল এবং কি ভাবে এই চতুরা দূতীর দৌত্য-কার্য্য সম্পন্ন হইল। চতুরে চতুরে পরম চাতুরালির সহিত নিজকার্য্য সমাধা করিয়া সখি কাঞ্চনা যথা সময়ে নবদ্বীপে ফিরিলেন। শ্রীধামে আসিয়াই সর্ব্ব প্রথমে সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়-সখি অমিতার নিকট নিজ দৌত্যকার্য্যের কিছু পরিচয় দিতেছেন একটী পদে—

যথারাগ।

—"কতই সাধিনু, কতই কাঁদিনু,
গম্ভীরা-মন্দির-দ্বারে।
একবার এসে, নদীয়া-নগরে,
দেখা দিয়ে যাও তারে॥
নাম না লইনু, পাছে নাহি শুনে,
কথাগুলি অবলার।
মনে মনে তাঁরে, কত না বলিনু,
নদীয়ার সমাচার॥
সকলি শুনিল, কত না পুছিল,
ছাড়া শুধু এক ধনি।
(তাঁর) মুখের ভাবেতে, বুঝিলাম তাঁরে,
চতুরের শিরোমণি॥
নির্জ্জনে পাইয়া, ভয়ে ভয়ে আমি,
বিরলে পুছিনু তাঁরে।
নারীর চাতুরী, খেলিনু তখন,
সখির প্রবোধ তরে॥

পুছিনু তখন, "ওহে উদাসীন,
(বড়) বিষ্ণুভক্ত শুনি তুমি।
বাঞ্ছা মোর বড়, বিষ্ণুনাম-সুধা,
তব মুখে কিছু শুনি ॥
নদীয়ায় আছে, অভাগিনী এক,
নাম তার **বিষ্ণুপ্রিয়া**।
সখি তার আমি, পাঠায়েছে মোরে,
মাথার দিব্য দিয়া।
শুনিতে নামের, আঁখির চারিটী,
তোমার বদনচন্দ্রে ;
আসিয়াছি আমি, নদীয়া হইতে,
তোমার চরণ-গন্ধে ॥
বল দেখি যতি! সেই সে নামটি,
ললিত মধুর ছন্দে।
আর কিছু নাই, বলিতে আমার,
(তার) নাম কর একবার।
পুরাও বাসনা, ওহে ন্যাসীবর,
মনসাধ অবলার ॥"—

* * * * *

(তখন) চমকি উঠিল, সখির নামেতে,
বিনত হইল আঁখি।
আর না চাহিল, কথা না কহিল,
মরমে হইল দুখী ॥
আইনু চলিয়া, সম্মুখ হইতে,
(আর) কিছু নাহি বলিলাম।
প্রিয়ার নামের, মোহিনী শকতি,
ভাল করি বুঝিলাম।
হরিদাসী বলে, কাঞ্চনা দিদি,
সখিরে যাইয়া কহ।
গৌর-হৃদয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী,
জাগিতেছে অহরহ ॥"

গৌর-গীতিকা।

এ সকলি বৈষ্ণবীয় মানসিক ভজন ব্যাপার—বৈষ্ণব-ধর্ম্মে মানসিক উপাসনা—মানসিক পূজা—মানসিক ভোগরাগাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রে লিখিত আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বিরক্ত বৈষ্ণবসন্ন্যাসী—প্রকৃতির নাম পর্য্যন্ত তিনি মুখে আনেন না—তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ সকল কথাবার্ত্তা সম্ভব নহে—তাহা ভজন বিজ্ঞা সুচতুরা সখি কাঞ্চনা সকলি জানেন। কিন্তু ভগবন্তভজনে ভক্তের ইচ্ছামত ভাব ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল শ্রীভগবান গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার শ্রীমুখে অতি সুস্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম্ ॥"

শ্রীভগবান এই আশ্বাসের বাণী দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার অনন্যশরণ ভক্তগণ তাঁহাকে যে যে ভাবেই ভজন করুন না কেন, তাহা তাঁহার নিকট সবিশেষ আদরণীয়। অন্যে যে যাহা বলুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অলৌকিক এবং অদ্ভুতচরিত্র শ্রীভগবানের দুর্ব্বোধ্য চরিত্র রক্ষা করিতে যাঁহারা সমুৎসুক, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতোক্ত এই পরমোদার ভগবদ্বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিবেন।

সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর গলার প্রসাদী মালা লইয়া আসিয়াছেন—তাঁহার শ্রীচরণোদক লইয়া আসিয়াছেন—এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথের প্রসাদের সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের প্রসাদান্ন কিছু সংগ্রহ করিয়া প্রিয়াজির জন্য ভেট আনিয়াছেন। এ সকলি তিনি বিরহিণী প্রিয়াজিকে দিয়াছেন—গৌর-বল্লভা সকলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিয়া ঝুরিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। সখি কাঞ্চনার এই দৌত্য-কার্য্যের ফলে প্রিয়াজির প্রাণে নব নব ভজন-বলের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি যতই তাঁহার সন্ন্যাসী-প্রাণবল্লভের কঠোর ভজন-কথা শুনিতেছেন,ততই তিনি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিতেছেন—তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলের অন্তরতম প্রদেশ হইতে হৃদি-বিদারী কাষ্ঠপাষাণদ্রবকারী প্রাণঘাতী মর্ম্মব্যথার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনির প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ফিরিয়া নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দির মধ্যেই ধীরে ধীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে কি হইতেছে, তাহা এখন ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে দিব্যোন্মাদদশাগ্রস্থ হইয়া রাধাভাবে প্রলাপ করিতেছেন—

—"কানুর লাগিয়া, জাগি পোহাইনু,
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এতদিনে মুঞি, নিশ্চয় জানিনু,
নিঠুর পুরুষ জাতি ॥"—

সন্ন্যাসীঠাকুর পুরুষ হইয়া স্ত্রীভাব গ্রহণ পূর্ব্বক

বিরহাবেগে পুরুষের নিন্দা করিতেছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া উন্মাদের মত গম্ভীরা-মন্দিরের ভিতে মস্তক ঠুকিতেছেন, আর শ্রীবদন ঘর্ষণ করিতেছেন। এখানে নদীয়ার মহা-গম্ভীরামন্দিরে তাঁহার প্রাণবল্লভা তাঁহার স্বকীয় স্ব-ভাবসিদ্ধ রমণীদেহে স্ব-স্বরূপে তাঁহার স্বরূপশক্তির স্ব-ভাবে যে কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতাপূর্ণ লীলাভিনয় করিতেছেন—তাহার আর তুলনা নাই—তুলনা দিবার ধৃষ্টতাও বাঞ্ছনীয় নহে। সুচতুর ভজনবিজ্ঞ সুধী রসিক গৌরভক্তবৃন্দ তাহা মনে মনে বুঝিয়া লউন—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া স্ব স্ব ভজন-পদ্ধতির উৎকর্ষতা সাধন করিয়া ধন্য হউন। ইহাই তাঁহাদিগের চরণে জীবাধম লেখকের কাতর প্রার্থনা ও বিনীত নিবেদন।

"চারিবেদ গুপ্তধন গৌরাঙ্গের লীলা" ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং মহাজনবাক্য—অতএব পরম বিশ্বাস্য। বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে বসিয়া তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের সহিত নিজ হৃদয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া যে সকল প্রাণের মর্ম্মবেদনাগুলি একে একে কহিতেছেন—তাহাও পরম গোপ্য—চারিবেদ গুপ্তধন,—শিব-বিরিঞ্চির অগোচর—সুদুর্লভ মহামণিরত্ন। এই মহামূল্য তালাবদ্ধ গুপ্তরত্ন-ভাণ্ডারের চাবির এখন সন্ধান হইয়াছে। যাঁহার হস্তে এই গুপ্ত-ভাণ্ডারের চাবিকাটি আছে—তিনি স্বয়ংভগবতী গৌর-বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। তিনি সখি কাঞ্চনাকে বলিতেছেন,—

যথারাগ।

—"প্রাণসখি।
কাহারে কহিব, মনের বেদন,
কেবা যাবে পরতীত।
গোরার পিরীতে, ঝরি দিবারাতি,
সদাই চমকে চিত॥
সখি! ভুলিতে না পারি গোরা।
কুল তেয়াগিয়ে, ধরম ছাড়িয়ে,
(এখন) লব কি কলঙ্ক-ভারা।
সখি! আমি যে কুলের নারী।
পিয়ার নিষেধ, নাহি প্রতিষেধ,
কাঁদি আমি প্রাণ ভরি॥
(তাঁর) গৃহে বসি আমি মরি।
সখি! সেই মোর বাহাদুরী॥
যতির রমণী, সাজিয়ে যোগিনী,
যতি পাশে কেন যাবে।
এ ত নহে বিধি, নিজ কাম সাধি,
কি কাজ আমার হবে॥"

গৌর গীতিকা।

সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণের মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলি শ্রবণ করিয়া পরম চতুরতার সহিত রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর পূর্ব্বোক্ত প্রাণের কথাটি গৌরপক্ষে একটু ঘুরাইয়া কহিলেন,—

—"গোরার লাগিয়া, জাগি পোহাইনু,
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে মুক্তি নিশ্চয় জানিনু,
নিঠুর পুরুষ জাতি॥"—

এই কথাটি শুনিয়াই বিরহিণী গৌর-বল্লভা পরম প্রেমাবেগে অতিশয় কাতরভাবে সখি কাঞ্চনার দুই খানি হস্ত ধারণ করিয়া করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন,—

যথারাগ।

(১)

—"সজনি! কেন কহ কটু বাণী।
(মোর) প্রাণ-বল্লভ, নদীয়ার চাঁদ,
সর্ব্বগুণের মণি॥
বিপাকে পড়িয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া,
(তিনি) বিরাজেন নীলাচলে।
প্রসাদ সম্ভার, পট্ট সাড়ী আর,
(মোরে) পাঠান সুকৌশলে॥
(তাঁর) নয়নের জল, ঝরে অবিরল,
বিরহে ব্যথিত তিনি।
নদীয়া বাসীর, নামেতে অধীর,
(তাঁর) স্নেহের পরাণ খানি॥

(২)

(তিনি) রেখেছেন মোরে সুখে।
পরাণ ভরিয়া, কত স্নেহ দয়া,
বিলান সর্ব্বলোকে।
আমার সম্বন্ধে, নীরব ক্রন্দনে,
(তিনি) চাহেন লোকের মুখে॥

না কহেন বাণী, ব্যাকুল পরাণি,
কাতর হৃদয় তাঁর।
সর্ব্ব গুণাধার, প্রেম-পারাবার,
(এবে) বহিছেন দুখভার॥
জীবোদ্ধার তরে, প্রাণে মরে মরে,
(তিনি) ভ্রমিছেন দেশে দেশে।
আমি ত গৃহেতে, বসিয়া সুখেতে
দিন যাপি সুখে ব'সে॥
(তিনি) রেখেছেন মোরে সুখে॥

( )

(আমি) তাঁর গৃহে সুখে আছি।
জীব-বন্ধু তিনি, ক্ষুদ্র জীব আমি,
নাহি তাঁর বাছাবাছি॥
সর্ব্বজীব-বন্ধু, করুণার সিন্ধু,
জীব-হৃদে তাঁর বাস।
সে বহুবল্লভে, সর্ব্বজীবে পাবে,
আমি না যাইব বাদ॥
সকলে পাইবে, আমিও পাইব,
এ আশা করিয়া মনে।
সকলের লাগি, হ'য়ে দুখভাগী,
কাঁদি আমি নিশি দিনে॥
গৌর-সুন্দরে, হৃদয়-মন্দিরে,
সবাই ভজিলে বাঁচি।
নারীর জনম, সার্থক জীবন,
তবে গো আমি ত বুঝি।
(সখি!) বড় সুখে আমি আছি॥

(৪)

(সখি!) নিঠুর ব'ল না তাঁকে।
মুঞি ভাগ্যবতী, পেয়ে হেন পতি,
বিলাইনু যাকে তাকে॥
(মোর) এ বড় সৌভাগ্য, যোগ্যাযোগ্য
না বিচারেন গুণ-নিধি।
(অনুরাগে) যে ডাকে তাহারে, যান তার ঘরে,
নাহি তাঁর কোন বিধি॥
নিজ জনে তাঁর, করুণা অপার,
তাই দেন দুখ অতি।
বুঝিতে পারি না, নাথের করুণা,
মুঞি অতি মন্দমতি॥
দুঃখে তাঁরে পাই, সুখে ভুলে যাই,
একথা বুঝিবে কে।
সখি! নিঠুর ব'ল না তাঁকে॥
ভণে হরিদাসী, আঁখিনীরে ভাসি,
এ সুখ বুঝাবে কে।
প্রিয়াজি চরিত্র, অতীব বিচিত্র,
সুধীরে বুঝিবে সে॥"—

গৌর-গীতিকা।

সখি কাঞ্চনা আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। গৌর-বল্লভার অতি বিচিত্র গৌরানুরাগ এবং গম্ভীর চরিত্রের কথাগুলি পুনঃ পুনঃ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতেছেন গৌরানুরাগের এই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ জীব-জগতে প্রচার হইলে বড় মঙ্গল হয়—ভুবনমঙ্গলা গৌর-বল্লভার নাম-গুণ-লীলা-রহস্য জগজ্জীবে জানিলে তাহাদের পরম মঙ্গল হয়—সখি কাঞ্চনার মনে তখন এরূপ একটি নব ভাবের উদয় হইল। এই নব-ভাবের প্রেরণা দিলেন যিনি—তিনিই এক্ষণে এই নবভাবের অভিব্যক্তি করিতেছেন তাঁহারই রসিক ভক্তবৃন্দের দ্বারা,—তিনিই তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মহামহিমা ও গুণ-গরিমা গান করাইতেছেন তাঁহারই একান্ত শ্রীচরণাশ্রিত চিহ্নিত দাস নবদ্বীপ-রস-রসিক সাধক ভক্ত-বৃন্দের দ্বারা—তিনিই তাঁহার বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত নানাস্থানে শ্রীযুগল বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহারই প্রাণবল্লভার মহিমা স্বয়ং তিনিই কীর্ত্তন ও প্রচার করাইতেছেন তাঁহারই একনিষ্ঠ রসিক ভক্তবৃন্দের দ্বারা। তাঁহার অনন্ত নামের মধ্যে একটী নাম স্বনাম-গায়ক। এই নামের সার্থকতা তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রকট লীলারঙ্গে করিয়া গিয়াছেন একভাবে—অপ্রকটেও এখনও তাহাই করিতেছেন অন্য ভাবে। "জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" রবে যে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইতেছে,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল-লীলারঙ্গ-রসে পরম প্রেমানন্দে যে জগৎ প্লাবিত হইতেছে—তাহা সেই লীলাময় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভেরই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ।

স্থূলদর্শী গৌরভজনানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না—এ পরম নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়াও জানিতেছেন না। ইহা দুর্দ্দৈবের কথা—তাহাদের পরম দুর্ভাগ্যের কথা।

গৌর-পাগলিনী সখি কাঞ্চনার এই চিন্তাস্রোতের বিপুল তরঙ্গমালা জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তিনি নিত্যসিদ্ধা ও ত্রিকালজ্ঞা। তাঁহার এই অপূর্ব্ব মনোভাবটি তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখিয়া প্রকাশ্যে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজিকে মধুর বচনে কহিলেন,—

—"সখি! প্রিয় সখি! ধন্য তুমি,
ধন্য তব চরিত্র গম্ভীর।
সামান্য রমণী মুঞি—
শক্তি নাহি বুঝিবার
অদ্ভুত চরিত্র তোমাদের।
তুমি লীলাময়ী—তিনি লীলাময়—
নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ গম্ভীর লীলারঙ্গ তোমাদের;
কার সাধ্য প্রবেশিবে
এই ভাব-গম্ভীর—দুরধিগম্য
প্রেমতরঙ্গময় লীলা-সমুদ্র-ভিতরে।
ক্ষমা কর সখি!
ব্যথা যদি দিয়ে থাকি প্রাণে।"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটক।

বিরহবিহ্বলা প্রিয়াজি তখন সখি কাঞ্চনাকে পরম প্রেমভরে নিজ বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া নয়নের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া প্রেম গদগদস্বরে কহিলেন,—

—"নদীয়া-বাসিনী তুমি সবে
নাগরীর গণ—মহা মহা ভাগ্যবতী।
তোমাদেরই প্রণয় সম্বন্ধে,
প্রেমরসে বশীভূত
প্রেমের ঠাকুর নবদ্বীপচন্দ্র।
হ'য়ে তোমাদের অনুগত—
ক'রে চরণাশ্রয় তোমাদের—
যে ভজিবে প্রেমরসে প্রেমের ঠাকুরে,
ভাগ্য তার সুপ্রসন্ন অতিশয়,
তার পক্ষে গৌর-কৃপালাভ
গৌর-চরণ প্রাপ্তি,
অত্যন্ত সুলভ।

তুমি সবে নদীয়া-নাগরী,—
প্রেমের গাগরী—প্রেম-স্বরূপিণী,
পূর্ব্ব লীলায় ব্রজগোপীগণ তুমি সবে,
কর প্রেমদান অকাতরে, জগজ্জীবে।
নদীয়ার ঘরে ঘরে গিয়া,—
কর গৌর-নাম—কহ গৌর-কথা,—
আমি হাতে ধরি জনে জনে,
করি এই অনুরোধ।
প্রেম-বিতরণ-কার্য্য তোমাদেরই এই যুগে;
দেখ সখি! বঞ্চিত না হয় যেন কেহ
গৌর-প্রেমধনে।"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটক।

তখন সখি কাঞ্চনা মহা লজ্জিতা হইয়া সেই নীরব গৌরশূন্য গৌর-গৃহে বসিয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া করুণ-ক্রন্দনের উচ্চরোল উঠাইলেন। প্রিয়াজিও কান্দিয়া আকুল হইলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে চলিল—পরে বিরহিণী গৌর-বল্লভা নিজেই আত্মসম্বরণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে করুণ ক্রন্দনের সুরে নিজ মর্ম্মব্যথাগুলি পুনরায় কহিতে আরম্ভ করিলেন,—

যথারাগ।

—"সখি! মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব।
(কিন্তু) গোরা হেন গুণনিধি কাকে দিয়ে যাব॥
সখি! গৌর নাম লিখে দিও অঙ্গে।
তোমরা সকলে, এই করিও মিলে,
জাহ্নবীর কূলে নিয়ে যেয়ো সঙ্গে॥
আনিবে তুলসী-দল যত্ন করি তুলে,
তারই মালা গেঁথে পরাইও গলে;
মধুর গৌর নাম দিও কর্ণ-মূলে,
প্রাণ যেন যায় মোর গৌর-নামেরই সঙ্গে॥
যখন হবে কণ্ঠরোধ না সরিবে বুলি,
না বলিতে দিবে মোরে গৌর গৌর বুলি,
(সখি!) আমার মাথে বেঁধে দিও গৌর-নামাবলি,
অন্তে যেন পাই মোর প্রাণ-গৌরাঙ্গে॥"—
দাসী হরিদাসী কয়, এ লীলা যেন দেখতে না হয়,
(মোর) প্রাণ যেন বাহিরায় বিরহ-তরঙ্গে॥"

এ সকল লীলাকথা জীব-উদ্ধার-কল্পে বিস্তারিত বর্ণনার

সময় আসিয়াছে—ইহার শ্রবণে কাষ্ঠ পাষাণ দ্রব হয়। কলি-হত জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব করাইবার জন্যই সাধুমহাজন গৌরভক্তগণের গৌর-বিরহ-গীতি প্রচারের এই প্রচেষ্টা—ইহাই "রসো বৈ সঃ"—ইহাই ব্রজরসাস্বাদনরূপ "আনন্দম-মৃতম্"—ইহাই উপনিষদের সার-তত্ত্ব—এই সার-তত্ত্ব রসাস্বাদন ও আনন্দানুভূতি—উপনিষদে ও বেদান্তশাস্ত্রে সূত্ররূপে মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে—তাহার বিস্তার করিয়াছেন ভাষ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর বিশিষ্ট কৃপাপাত্র পূজ্যপাদ গোস্বামিচরণগণ—ইঁহাদেরই শাস্ত্রের নাম গোস্বামিশাস্ত্র।

উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, লঘু ও বৃহৎ ভাগবতামৃত, এবং গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি আকর গোস্বামিশাস্ত্র সকল একবার আলোচনা করিয়া দেখুন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার নিত্যপার্ষদ ভক্তগণ শ্রীপাদ জয়দেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুরের মধুর ব্রজ-রসের পদাবলী আস্বাদন করিয়া কিরূপ চিন্ময়প্রেমানন্দরস উপভোগ করিতেন—বিপ্রলম্ভ-রস-মাধুর্য্য কিরূপ ভাবে আস্বাদন করিতেন এবং তাঁহার অনুগতজনকে আস্বাদন করাইতেন। এই মধু হইতেও মধু রস-সমুদ্রে খাড়া ডুব দেন—কূপোদকে আর স্নান করিবেন না।

আজ বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের গুপ্ত-রুদ্ধ-দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন,—নীলাচল হইতে সখি কাঞ্চনা জানি না কি মহৌষধি আনিয়াছেন—যাহার ফলে বিরহিণী প্রিয়াজির আজ হৃদয়-কবাট একেবারে খুলিয়া গিয়াছে—আজ আর কোন কথা বলিতে তিনি মর্ম্মী সখিদ্বয়কে অবসর দিতেছেন না। তিনি আপন কথাই —আপনার প্রাণের মর্ম্মব্যথাই একে একে প্রাণ খুলিয়া বলিয়া যাইতেছেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভা আজ নির্জ্জনে বসিয়া আত্মকাহিনী বলিতে শতমুখী হইয়াছেন,—সখিদ্বয় শ্রোতা—প্রিয়াজি স্বয়ং বক্তা। সখিদ্বয়ের প্রাণে আজ বড় আনন্দ—কারণ বিরহ-ব্যাধিগ্রস্থা রোগিণী মনের কথা—প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিয়া বলিলে এই অকথন বিরহ-ব্যাধির প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা হয়—রোগিণী নিজ মুখে নিজের রোগের বিবরণ বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছেন্—বৈদ্যরাজ সখি কাঞ্চনা ও তাঁহার সহকারিণী বৈদ্য আর একজন শুনিতেছেন—এই জন্যই বৈদ্যদ্বয়ের আনন্দ। বৈদ্য-রাজ সখি কাঞ্চনা ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিবার উদ্যোগ করিতেছেন—কাগজ কলম লইয়া বসিয়া আছেন—কিন্তু রোগিণী লিখিতে অবসর দিতেছেন না—তিনি বলিতেছেন আরও আমার ব্যাধির বিবরণ আছে—আগে শুনিয়া যাও —পরে ঔষধের ব্যবস্থা করিও। সুচতুরা সখি অমিতা প্রিয়াজির এই ভাববিপর্য্যয়ের আর একটা দিকের কথা চিন্তা করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন গৌর বল্লভার শ্রীমুখে শাস্ত্র কথা শ্রবণ করিতেছেন—অপূর্ব্ব রস শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম-কথার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন—যাহা গুরুমুখে শ্রোতব্য। সখিরূপা-গুরু তাঁহাদের গুরুমুখে রসশাস্ত্রকথা শ্রবণ করিতেছেন। যেমন বাবার উপরও বাবা আছেন—গুরুরও গুরু আছেন—প্রিয়াজি সখিগণের গুরুস্থানীয়া—যদিও তিনি তাঁহার মর্ম্মীসখিগণকে মধ্যে মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বলিয়া থাকেন "তোমরাই আমার গৌরপ্রেমের গুরু।" রসরাজ শ্রীরাধাবল্লভ শ্যামসুন্দর শ্রীরাধিকাকে বলিতেন—"তুমিই আমার প্রেমের গুরু"—সখি অমিতা মনে মনে ভাবিতেছেন আজ তাঁহার বড় সৌভাগ্য—আজ তাঁহাদের গুরুমুখে রসতত্ত্ব-কথা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ হইল,—তাঁহারা ধন্য হইলেন।

বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদয়ে আজ অকস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতি সকল জাগরিত হইয়াছে—তাঁহার প্রাণ-বল্লভের গৃহত্যাগের পূর্ব্ব রাত্রির অপূর্ব্ব সম্ভোগ-বিলাস-রস-কথা মনে পড়িয়াছে —ইহা ভবন্ বিরহ-কথা বলিলে ভ্রম হয়—কারণ বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর এই বিরহ-ব্যথা প্রবাস-জনিত বিরহ-জাত নহে। তাঁহার প্রাণবল্লভ প্রবাসী নায়ক নহেন—গৃহত্যাগী বিরক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণ ও দেহত্যাগ একই বস্তু—ইহা সন্ন্যাসী-পতি-বিয়োগ-বিরহ—ইহাকে শোক নামে অভিহিত করিলেই ভাল হয়। গৌরবিরহিণীর উৎকট গৌর-বিরহ-শোকোচ্ছাস, আর পতিহীনা পতিব্রতা রমণীর পতিবিয়োগ-জনিত মহা শোক—প্রবাসজনিত বিরহাপেক্ষা গভীর এবং মহান্ উচ্চভাবপূর্ণ।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা গৌর-বল্লভার প্রাণের গুপ্ত গৌর-বিরহ-কথাগুলি কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন। আজ বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণের অন্তরাল হইতে গৌর-বিরহ-বারিধি-তলস্থ রুদ্ধ-গুপ্ত-উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে। নদীয়ার মহা-গম্ভারা-মন্দিরের গুপ্ত-দ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল—মর্ম্মী সখি-

গণেরও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না,—সে দ্বার অকস্মাৎ আজ যেমন উন্মুক্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদয়ের অন্তস্তলের রুদ্ধ-গৌর-বিরহ-উৎসটিও কোন অনির্ব্বচনীয় ও অলৌকিক ভাবে ফুটিয়া উঠিল।

বিরহিণী প্রিয়াজি গভীর রাত্রিতে নিজ ভজন-মন্দিরে বসিয়া ছুটী মর্ম্মী অন্তরঙ্গা সখিসঙ্গে প্রাণ খুলিয়া আজ তাঁহার গুপ্ত গৌর-বিরহ-ব্যথা সকল একে একে ব্যক্ত করিতেছেন। বর্ষাকাল, আষাঢ়মাস—কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথি—ঘোর অন্ধকার রজনী—অবিশ্রান্ত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে—গৌরশূন্য গৌর-শয়নকক্ষে বসিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার ছুটি হাত ধরিয়া অশ্রুসিক্তনয়নে করুণ হইতেও করুণ কাষ্ঠপাষাণ-গলান ক্রন্দনের স্বরে প্রেমগদগদ বচনে কহিতেছেন,—

যথারাগ।

"সখি!

—"বহু দিন হল, বঁধু চলে গেল,
কই তো ফিরে এল না।
(মোর) হৃদয়ের নিধি, হরে নিল বিধি,
আর ত ফিরায়ে দিল না॥
এ নদীয়া পুরী, গহন গভীর,
শোক তিমিরে ডারিয়া।
কাঁহা নীলাচল, উজোর করিল,
আমার হৃদয়-মণিয়া॥
(আমি) কি তপ করিয়া, কি মন্ত্র জপিয়া,
পেয়েছিনু প্রাণ-বঁধুয়া।
কি পাপে কি জানি, মন্দ ভাগিনী
(পুন) হারাইনু গুণ-নিধিয়া॥
এ আষাঢ় মাহা, গুরু গুরু মেহা,—
ঝর ঝর দিন রাতিয়া।
হা হা মরি মরি কাঁহা গৌরহরি
কষিত-কাঞ্চন-কাঁতিয়া॥"—

এইরূপ প্রাণঘাতী মর্ম্মভেদী গৌর-বিরহব্যথা বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর-প্রেমবিস্ফারিত এবং প্রেমাশ্রুপরিপূরিত কমল নয়নযুগলের করুণ-দৃষ্টি অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণ-বল্লভের পোষা শুকসারীর উপর পতিত হইল,—তাহারাও গৌর-বিরহে বিষাদমগ্ন—তাহারাও গৌর-বিরহতাপে জর্জ্জরিত—তাহাদেরও রাত্রিতে নিদ্রা নাই—তাহারা আর প্রেমানন্দে—"হরে কৃষ্ণ" বলে না—পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করে না। এইরূপ বিষাদমগ্ন শুকসারী দুইটি পোষাপাখীর প্রতি বিরহিণী প্রিয়াজির শুভদৃষ্টি পতিত হইবা মাত্রই তাঁহার অগাধ গৌর-বিরহ-সমুদ্র যেন একেবারে উথলিয়া উঠিল—তখন তিনি প্রিয়সখি কাঞ্চনার কণ্ঠদেশে গৌরবিরহশীর্ণ ভুজলতাদ্বয় বেষ্টন করিয়া করুণ ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন,—

(তাঁর) "পোষা শুকসারী, না বলে কৃষ্ণহরি,
(ঐ দেখ আছে) পিঞ্জর মাঝারে বসিয়া!
অঝোর নয়নে, ঝুরে দুহুঁ জনে,
(কেবল) ফুকারে রহিয়া রহিয়া॥—

এই ভাবে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইল—মর্ম্মী সুচতুরা সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির কাতর মলিন বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাব বুঝিলেন—কিছু বলিবার জন্য—কিছু শান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রিয়সখির গৌরবিরহাকুল মন সুস্থির করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ চট্ ফট্ করিতেছে—কিন্তু বিরহিণী প্রিয়াজি আজ তাঁহাকে কোন কথাই বলিবার অবসর দিতেছেন না—তিনিও সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছেন না।

গৌর-বিরহ-বিদগ্ধা প্রিয়াজির মনে আজ অনেক দিন পরে সেই তাঁহার প্রাণ-বল্লভের গৃহত্যাগের পূর্ব্বদিনের কালরাত্রির মর্ম্মন্তুদ স্মৃতিকথা সকল একে একে উদিত হইতেছে—সেই কালরাত্রির অপরূপ বিলাসবিভ্রমের কথা—অপূর্ব্ব সম্ভোগ রসলীলারঙ্গ—আজ তাঁহার মানস-পটে উদিত হইয়া তাঁহার গম্ভীর হৃদি-সমুদ্র ঘন ঘন উদ্বেলিত এবং আলোড়িত করিতেছে। প্রিয়াজি তাঁহার মনের ভাব আজ আর কিছুতেই গোপন করিতে পারিতেছেন না। পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি তখন একেবারে সকল ধৈর্য্য হারাইলেন। তিনি প্রাণ খুলিয়া করুণ-ক্রন্দনের স্বরে সখিদ্বয়ের গলদেশ তাঁহার ক্ষীণ দুটী বাহুদ্বয়ে পরিবেষ্টন করিয়া বলিতেছেন,—

"(সখি !) সে বিদায় রাতি, কত না আরতি
(দিলা) পিরীতি-পাথারে বহাইয়া।
(গৌর) বিদগধ-মণি, ত্রিযামা-যামিনী,
(মোরে) পালঙ্কে না দিল নামাইয়া ॥
(সখি !) সে রস-আবেশে, অধিক অবশে,
(গৌর) হিয়ার পরশ লাগিয়া।
(কাল) নিদে নিদাইলুঁ, নিধি খোয়াইলু,
(হায়) আর না হেরিলুঁ জাগিয়া ॥"—

এই মর্ম্মান্তিক প্রাণঘাতী বিরহ-কথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির যেন সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল—তাঁহার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইতে লাগিল। তিনি তখন প্রেমাবেগে সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে অজানিতভাবে ঢলিয়া পড়িলেন। দিব্যোন্মাদিনী গৌর-বল্লভার উদাসভাবপূর্ণ গৌরানুরাগরঞ্জিত কমল নয়নদ্বয় যেন গৌরশূন্য গৌর-বিলাস-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে—তাঁহার প্রেমানুরাগ-ভরা চক্ষুদ্বয় সুরম্য রৌপ্যদানস্থিত তাঁহার প্রাণ-বল্লভের ব্যবহৃত দিব্য চন্দনের ছোট একটী স্বর্ণ কটোরার উপর পতিত হইল। তিনি তখন সখিদ্বয়ের মুখের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া ক্রন্দনের সুরে কহিলেন,—

(সখি !)—"চন্দন কটোরা, সেই আছে ধরা,
কস্তুরি সিন্দুর সহিতে।
(গৌর) চিবুকে ধরিয়া, তিলক রচিল,
(শুধু) শ্রবণ দহনে দহিতে ॥"—

সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে প্রিয়াজির মস্তক—তাঁহার আলুলায়িত রুক্ষ চিকুররাশি ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া কর্দ্দমাক্ত হইতেছে—কয়েকগুচ্ছ কেশ তাঁহার মলিন বিষন্ন বদনখানিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সখি কাঞ্চনা নিজ হস্ত দিয়া তাহা গুছাইয়া অতি যত্নে তাঁহার শিরোপরি চূড়ার মত একটা গুচ্ছ বাঁধিয়া দিলেন—প্রেমোন্মাদ-দশা-গ্রস্তা বিরহিণী গৌর-বল্লভার মস্তকে সেই অপূর্ব্ব চূড়াটির অপূর্ব্ব শোভা হইল,—প্রিয়াজির তাঁহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। সখিদ্বয় তাঁহাদের প্রিয়সখির মুখের উপর মুখ দিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহাদের নয়নের তপ্ত অশ্রুজল ফোটা ফোটা করিয়া প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গে পড়িতেছে—গৌর-বল্লভার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। গভীর রাত্রি, কাহারও মুখে কোন কথা নাই—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে—ঘোর অন্ধকার রজনী—বিরহিণী প্রিয়াজি ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা—সখি অমিতা ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছেন—প্রিয়াজির অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নদ্বয় ক্রমে অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া আসিল—তিনি যেন গভীর চিন্তামগ্না। সখি কাঞ্চনা একদৃষ্টে বিরহিণী প্রিয়াজির মলিন বদনখানি নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন—এ সোনার কমলটিকে এত দুঃখ দিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কি সুখ হইতেছে। মুখে তিনি কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না—তাঁহার বাক্‌শক্তি আশ্চর্য্যভাবে কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছে। এ বড় নিগূঢ় প্রেমরহস্যকথা—এ বড় বিষম কথা! নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু তাঁহার দু'টী অন্তরঙ্গ ভক্তসহ (স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ) রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহ-কথা কহিতেন—বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন করিতেন। মর্ম্মী ভক্তদ্বয়ের সহিত প্রশ্নোত্তরছলে তৎসময়োচিত এবং ভাবোচিত কৃষ্ণ-কথারস বিস্তার করিয়া তাঁহার কৃষ্ণবিরহ-জ্বালা উপশম করিতেন। কিন্তু নদীয়ার এই অপূর্ব্ব মহা-গম্ভীরা-লীলায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। এখানে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখি-দ্বয়ের মুখ বন্ধ করিয়াছেন—তিনি তাঁহাদিগকে কিছু বলিবার কোনরূপ অবসরই দিতেছেন না—সান্ত্বনার কোন-রূপ অপেক্ষাই করিতেছেন না—তিনি স্বয়ং নিজমুখে তাঁহার বিপ্রলম্ভ-লীলা-রস বিস্তার করিতেছেন—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-লীলারঙ্গের ইহাই অভিনবত্ব,—ইহাই বৈশিষ্ট। বৃষভানু-নন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব সনাতন-নন্দিনী গৌর-বল্লভার সকল বিষয়েই একটি বৈশিষ্ট ভাব আছে—স্বতন্ত্রতা আছে—এই বৈশিষ্ট ও স্বতন্ত্রতাই রসিক গৌরভক্ত-বৃন্দের পরমাস্বাদ্য।

গৌর-বিরহিণী বিদগ্ধা শিরোমণি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কিছুক্ষণ পরে স্বীয় স্বতন্ত্রভাবে আপনা আপনিই আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন,—বসিয়া তাঁহার চূড়াবদ্ধ কর্দ্দমাক্ত কেশদাম স্বহস্তে আলুলায়িত করিলেন—তাঁহার পর সখিদ্বয়ের প্রতি একবার করুণ নয়নে চাহিলেন—দেখিলেন তাঁহাদের নয়ন-ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তাঁহাদের মলিন ও দুঃখভারাক্রান্ত বদনমণ্ডলে একটী বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। সর্ব্বজ্ঞা প্রিয়াজি

সকলি জানেন এবং বুঝেন। তাঁহারও নয়নের অবিশ্রান্ত সলিল-ধারায় সেখানে প্রেম-নদী বহিতেছে। সখিদ্বয় দুই জনে মিলিয়া নিজ নিজ বসনাঞ্চলে বিরহিণী প্রিয়াজির দুইটি কমল নয়ন পরম-প্রেমভরে মুছাইয়া দিতেছেন—বিরহিণী প্রিয়াজিও নিজ মলিন বসনাঞ্চলে দুই হস্তে সখিদ্বয়ের নয়নের জল মুছাইয়া দিতেছেন। এ বড় অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব দৃশ্য—বড়ই মধুর ভাব—বড়ই প্রাণস্পর্শী পরম প্রেমাভিনয় রঙ্গ। যদি চিত্রকর হইতাম—এই মধুর অপূর্ব্ব চিত্রটির চিত্রপট আঁকিয়া রাখিয়া সকল গৌরভক্তগণকে প্রেমোপহার দিয়া ধন্য হইতাম। কৃপানিধি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! নিজ নিজ মানস-পটে এই অপূর্ব্ব গৌর-বিরহ প্রেমরসাভিনয়ের পরমাদ্ভুত বিচিত্র চিত্রটী অঙ্কিত করিয়া কিছুক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান করুন—প্রাণ ভরিয়া গৌরবিরহ-রসাস্বাদন করুন,—আর প্রাণ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদুন—দেখিবেন মলিন চিত্ত-দর্পণ স্বচ্ছ হইবে—কাষ্ঠ-পাষাণ-হৃদয় কুসুম-কোমল হইবে—উদ্‌ভ্রান্ত মন শান্ত হইবে। এমনি গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনের অলৌকিক এবং অপূর্ব্ব মহিমা—এমনি উন্নতোজ্জ্বল মধুররসলোলুপা নিত্যসিদ্ধা গৌর-বিরহিণী নদীয়া-নাগরী-বৃন্দের অত্যদ্ভুত শক্তি এবং অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য।

লীলারস ভঙ্গ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি—কৃপানিধি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন—এই গুরুতর বিষয়ে পারি না তাল ঠিক রাখিতে,—পারি না লীলার ক্রম নির্দ্দেশ করিতে—পারি না নিজ মস্তক স্থির রাখিতে। কৃপানিধি গৌরভক্তগণ! অনন্যোপায় হইয়া জীবাধম লেখক আপনাদিগের চরণে আজ শরণাপন্ন,—তাঁহার শত অপরাধ নিজগুণে মার্জ্জনা করিয়া চরণান্তিকে একটু স্থান দিবেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া সাশ্রুলোচনে মৃদুমন্দ কম্পিত স্বরে পুনরায় কহিলেন,—

"সখি!

না বলিয়া গেল, এই বড় শেল,
হিয়ায় রহিল বিঁধিয়া।
এত নাগরালি, রসময় কেলি,
(সে) সকলি কি গেল ভুলিয়া॥"—

এই কথা কয়টী বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির হৃৎপিণ্ড যেন প্রকৃতই ছিন্ন হইয়া গেল,—তাঁহার বদনমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল—তাঁহার বদনের ভাবের যেন একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইল, এরূপ বোধ হইল।

প্রিয়াজি যে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া তাঁহার হারাধন হৃদয়-মণিকে দর্শন করিবেন—সে ভাব তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্থান পায় নাই। এক্ষণে উন্মাদ-দশাগ্রস্তা গৌর-বল্লভা আত্যন্তিক গৌর-বিরহে জর্জ্জরিত হইয়াই নিজ দৃঢ় সংকল্প যেন ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইলেন—তিনি তাঁহার মানসিক প্রেম-বিকারাবস্থার পরিচয় দিয়া সখি কাঞ্চনাকে পুনরায় কহিতেছেন,—

(হায়!)—"অকরুণ বিধি, দয়া করে যদি,
(একবার) নীলাচলে যাই চলিয়া।
সভা অগোচরে, বঁধুয়া-অন্তরে,
(আমি) বারেক দেখিব পশিয়া॥
রাধাভাব রাধা- নাম গাঁথা তার,
হিয়ার পাঁজর খুঁজিয়া।
(এই) বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম, আছে কিনা স্থান,
(কেবল) দেখিয়া আসিব ফিরিয়া॥"—

বিরহিণী প্রিয়াজির এই ভাবটি তাঁহার মানসিক ভজনাঙ্গ। মানসিক ভজন-ক্রিয়া ফলে মনপ্রাণ সর্ব্বত্র যাতায়াত করে—এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুরাগ-ভজনে মনপ্রাণের সর্ব্বত্র অবাধগতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এই জন্য মানসিক ভজন এবং স্মরণ-মননের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিরহিণী প্রিয়াজি পরম প্রেমভরে সখি কাঞ্চনার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া এতক্ষণ এই কথাগুলি বলিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছিলেন,—তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে—সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে অমিতা চরণামৃত আনিয়া দিলেন—সখি কাঞ্চনা অতিকষ্টে প্রিয়াজির মুখে তাহা দিলেন। কাষ্ঠপাষাণভেদী পূর্ব্বোক্ত বিরহ-কাহিনীগুলি বলিতে বলিতে প্রিয়াজির তখন কি দশা হইল, বিশিষ্ট ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন—

(একথা)—"কহিতে কহিতে, পড়িলা মহীতে,
মৃগী যেন বাণ বিঁধিয়া।
(আহা মরি!) সোনার কমলে, জ্বলন্ত অনলে,
ডারি দিল যেন জারিয়া॥

সখিদ্বয় তখন সুস্পষ্টভাবে দেখিতেছেন স্বর্ণপ্রতিমা

প্রিয়াজির সোনার বর্ণ যেন কালিমামাখা বোধ হইল। তাঁহার প্রাণ-বল্লভ জগাইমাধাইকে উদ্ধার করিয়া পাপ সকল স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ক্ষণেকের জন্ম তিনি কালিমাকার ধারণ করিয়াছিলেন। গৌর-বল্লভার প্রতি অশ্রুবিন্দুতে জগজ্জীবের সর্ব্ব পাপ হরণ করিতেছে—প্রতি নিঃশ্বাসে তিনি অযাচিত ভাবে সর্ব্ব জগজ্জীবের পাপরাশি স্বয়ং গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়ত তাহাদিগের হৃদয় শোধন করিতেছেন—এজন্য তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে এরূপ কালিমাবরণ ধারণ করিতে হয়।

সখি কাঞ্চনা কিঞ্চিৎ দূরে গেলেন—সখি অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন—তখন সখি কাঞ্চনা কি করিলেন কৃপানিধি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! একবার নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানানুরত হৃদয়ে মনশ্চক্ষে দর্শন করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদুন,—আর "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" বলিয়া কীর্ত্তন করুণ।

(তখন) "গৌর গৌর বলি, হাহাকার করি,
কাঞ্চনা আইল ধাইয়া।
সখি কোলে করি, কহে "মরি মরি,
(কোথা) গৌরহরি! হের আসিয়া॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়ন-মন্দিরে সেই খাট,—সেই বালিশ—সেই চন্দনের 'কটোর'—সেই মৃগমদকস্তুরীপূর্ণ ঘর্ষিত শুষ্ক চন্দনাবলী,—সেই মালতি-পুষ্পের শুষ্ক ফুলহারের ছিন্নাংশ গুলি, সেখানে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে,—এবং প্রিয়াজি কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই বিরহিণী প্রিয়াজির বিরহাকুলিত হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি সকল উদ্দীপ্ত করিতেছে। সখি কাঞ্চনার মনে ভয় হইল তাঁহার প্রিয়-সখির দিব্যোন্মাদদশার শেষাবস্থা দেখিয়া। তিনিই প্রিয়াজির এই অকথন ব্যাধির বৈদ্যরাজ—তিনি তখন নিরুপায় হইয়া অবস্থা বুঝিয়া শেষ নিদান মহৌষধির ব্যবস্থা করিলেন। সখি কাঞ্চনা নীলাচল হইতে তাঁহার আনীত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর কণ্ঠের প্রসাদী মালতীপুষ্পমালা গাছটি নয়ন-সলিলে অভিষিক্ত করিয়া তখন তিনি শ্রীগৌরাঙ্গনাম স্মরণ করিয়া ভূমি-শয্যা-শায়িতা গৌরবিরহদগ্ধা প্রিয়াজির হৃদয়োপরি অতি ধীরে ধীরে স্থাপন করিলেন—যথা—

(প্রিয় সখির)—সে দশমী-দশা, হেরিয়া বিবশা,
নয়নের জলে ভাসিয়া।
গৌর-গলার, শুষ্ক ফুলহার,
(দিল) হিয়ার উপরে ধরিয়া॥

তৎপরে কি হইল, কৃপানিধি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! প্রেমভক্তিপরিপ্লুতচিত্তে "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" নাম স্মরণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

(সেই)—"গৌর-গন্ধময়, মালতী মালায়,
(প্রাণ) বঁধুয়ার পরশ ভাবিয়া।
"(বঁধু) কৈ কৈ বলি", দুনয়ন মেলি,
(প্রিয়াজি) পুনঃ পুনঃ উঠে কাঁদিয়া॥"—

তখন অমিতাদি সখিগণ আসিয়া নদীয়ার সেই নির্জ্জন মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে আষাঢ়ের সেই ভীষণ বর্ষার অমাবস্যার ঘোর নিশীথকালে সকলে মিলিয়া গৌরনাম উচ্চকীর্ত্তনধ্বনি উঠাইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন ধীরে ধীরে সখি কাঞ্চনার গলদেশ ধারণ করিয়া ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া করুণ ক্রন্দনের অস্ফুটস্বরে গৌরনাম করিতে লাগিলেন।

"(তখন)—ধরি সখি গলে, রোদনের রোলে,
উঠে গৌর-নাম অমিয়া।
শচীর মন্দিরে, গভীর গম্ভীরা—
রস গাহে গুণবতিয়া॥—
নিকটেতে বসি, অশ্রুনীরে ভাসি,
(গৌর) নাম শুনে হরিদাসিয়া॥
(প্রিয়াজির মুখে)—
(গৌর) নাম শুনে হরিদাসিয়া॥

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে—গৌরশূন্য গৌর-গৃহে তখন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের অপূর্ব্ব আবির্ভাব হইল। প্রিয়াজির ভজনমন্দির তখন গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মহ মহ করিতে লাগিল। ন্যাসীচূড়ামণি তখন নবনটবর নদীয়া-নাগরীবেশে নীলাচল হইতে নিজ শয়নগৃহে আবির্ভূত হইলেন।—তখন—

(গৌর-অঙ্গ) গন্ধে মহ মহ, শয়ন-মন্দিরে,
চারিদিকে পুষ্পগন্ধ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ, বসিয়া পালঙ্কে,
হাসিলেন মৃদু মন্দ॥
সখিগণ সহ, প্রিয়াজি হেরিল,
প্রাণনাথ-পদ-দ্বন্দ্ব।

আর কি হইল, দেখিতে নারিনু,
হরিদাসিয়া জন্মান্ধ॥"—গৌরগীতিকা।

এই ভাবে অনুরাগের ডাকে নদীয়ার গৌরশূন্য গৌর-গৃহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাব হইত। বিরহিণী প্রিয়াজির অনুরাগের ডাকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ নীলাচলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

—"যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে।
সেই ক্ষণ তুমি মোর দরশন পাবে॥"—

বিরহিণী প্রিয়াজির এই যে প্রেমাবেশে গৌর-দর্শন,—ইহা ক্ষণিক। বিদ্যুতের রেখার ন্যায় একবার মাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

—"সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ-মালা সনে, তড়িত-লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥"—

তখন সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে বিরহিণী গৌর-বল্লভার নয়ন-সলিল মুছাইয়া দিয়া পরম প্রেমভরে কহিলেন—

যথারাগ—

সখি!
তোমার নাগর, গুণের সাগর,
নারে তোমা ভুলিবারে।
নীলাচল ধামে, যে যায় যখন,
পুছে তারে বারে বারে॥
(তাঁর) ঘর মনে পড়ে * ত্বু'নয়ন ঝরে,
(তব) নাম ল'তে লাগে লাজ।
(আমি) স্বচক্ষে হেরিয়া, মনেতে বুঝেছি,
(তাঁর) কপট ন্যাসীর সাজ॥
প্রসাদী বস্ত্র, পাঠান তোমাকে,
বরষে বরষে তিনি।
গোপনে সংবাদ, লয়েন তোমার,
(তিনি) রসিকের চূড়ামণি॥

বিরলে বসিয়া, জপেন সতত,
রাধানাম কেঁদে কেঁদে।
লোকে বলে তিনি, ব্যাকুল সতত,
আবার দেখিতে নদে॥
বিরহিণী তুমি, বিরহী গৌরাঙ্গ,
দুহুঁ জান দুহুঁ জনে।
দোঁহার বিরহ, দোঁহার অসহ,
(তাই) কাঁদ দু'হে নিরজনে।
সখি! কি আর কহিব আমি!
তুমি জান তারে, সে জানে তোমারে,
(সুধু) করি মোরা কানাকানি।
বিরহ-বিধুর, সে বড় চতুর,
(তাঁর) পদে পদে চতুরালি।
বিরহের মান, পিরীতের গান,
মধুমাখা গালা-গালি॥
বাড়িলে বিরহ, ভাসে জলে আঁখি,
কটু-ভাষে ঝরে মধু।*
এ বড় বেয়াধি, ইহার ঔষধি,
গোরা-গুণ-গান সুধু।"— গৌর-গীতিকা।

এতক্ষণ পরে শেষ রাত্রিতে গৌর-বিরহ-ব্যাধির উৎকট তাড়নায় প্রিয়াজির শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,—তাঁহার আর কথা বলিবার সামর্থ নাই—সুতরাং এক্ষণে তিনি মর্ম্মী সখি কাঞ্চনাকে কিছু গৌরকথা বলিবার অবসর দিয়াছেন। তাই সময় পাইয়া সুযোগ বুঝিয়া সখি কাঞ্চনা দুই একটী প্রবোধবাক্য তাঁহার প্রিয়সখিকে বলিতেছেন।

প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার কথাগুলি সকলি নীরবে শুনিলেন—কোন কথাই বলিলেন না। সখি কাঞ্চনা পুনরায় প্রেমগদগদভাবে কহিতে লাগিলেন—

যথারাগ।

"সখি!
আজ আসিয়াছে, জগদানন্দ,
পণ্ডিত মহাশয়।
তাঁর মুখে শুনি, গৌর গুণমণি,
কাতর অতিশয়॥

মহাপ্রভুর উক্তি—
* ঘর মনে পড়ে তেঞি কান্দি রাধা বলি।
কীর্ত্তনের মাঝে তেঞি করিয়ে বিকলি॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ-স্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তোমার বিরহে, নিশি-দিশি দহে,
রাধা রাধা বলি কাঁন্দে।
ছাড়ি নদে বাস, করিয়ে সন্ন্যাস,
(গোরা) পড়েছে বিষম ফান্দে॥
নদেবাসী গেলে, কত কথা বলে,
কত ছলে পুছে বাত।
বদন লুকায়ে, কাঁদে সে সেখানে,
নাই তার কোন হাত॥
জীবের লাগিয়া, কৌপীন পরিয়া,
কপট-সন্ন্যাসী বেশে।
রাধা রাধা বলে, কেঁদে কহে ছলে,
ল'য়ে চল মোরে দেশে॥
জগদানন্দে, দিয়াছেন সাড়ী,
তোমারে স্মরণ করি।
প্রিয়ার বিরহ, ভুলিতে পারে কি,
প্রেমময় গৌরহরি॥
(সখি!) কাঁদিও না তুমি আর।
নদীয়ার চাঁদ, নদীয়া আসিবে,
দ্বিধা নাহি কর তার॥
ভণে হরিদাসী, আঁখি নীরে ভাসি,
(কবে) শুভ দিন হেন হবে।
নদীয়া-যুগল চরণ-কমলে,
কবে সে শরণ লবে॥ গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে সকলি শুনিলেন—নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—সর্ব্বশরীর যেন কাঁপিতেছে—বড়ই দুর্ব্বল,—কথা কহিবার শক্তি নাই,—তবুও কথা কহিবার যেন চেষ্টা করিতেছেন—এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ গেল। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন—সখিদ্বয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া আসনে বসাইলেন—জপ-মালা হাতে দিলেন,—তখন—

যথারাগ।

—"বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া, হাতে ল'য়ে জপমালা,
রুই রুই জপে গৌরনাম।
নবীনা যোগিনী ধনি, বিরহিণী কাঙ্গালিনী,
প্রণময়ে নীলাচল ধাম॥
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ধূলা, লম্বা কেশ এলো চুলা
সোনার অঙ্গ অতি দুরবল।
বলরাম দাস কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
মুছায়ে দাও দেবী আঁখিজল"॥—

এদিকে সমস্ত রাত্রি এই ভাবে গৌর-কথা-রস-রঙ্গে যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, তিন জনের কেহই তা বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আসিয়া যেন অকস্মাৎ উপস্থিত হইল। জলবৃষ্টি তখন ছাড়িয়া গিয়াছে—নদীয়া-গগনে তখন আর মেঘ নাই—বরষার সুরতরঙ্গিণী গৌরশূন্য গৌর-গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া গৌরচরণস্পৃষ্ট ভূমিতল চুম্বন করিতেছেন—গৌরপ্রেমানন্দে সুরধুনীর তরঙ্গোচ্ছাস-সলিলের শুভ্র ফেনপুঞ্জসকল গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে যেন নৃত্য করিতেছে—নীরব বিস্তৃত তটে সুরতরঙ্গিণীর কুলকুল মধুর স্বর যেন প্রভাতী গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিয়াছে—

—"তেজহ শয়ন গৌর গুণধাম।
চাঁদ মলিন গত যামিনী যাম॥"—

এমন সময় প্রভাতী টহলিয়া কীর্ত্তনের দল গঙ্গার কূলে কূলে গৌর-কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে আসিয়া ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

জাগহ জন-মন-চোর, চতুরবর সুন্দর,
নদীয়া-নগর-বিহারী।
রাধা রমণী-শিরোমণি রসবতী তাকর
হৃদয়-রতন-রুচিকারী॥
কি কহব পুন পুন নিশি ভেল ভোর।
কৈছন অলস, কিছুই নাহি সমঝিয়ে,
হৃদয়ে সন্দেহ রহত বহু মোর। ধ্রু॥
ব্রজপুর-চারু-চরিত-গুণ, শুনইতে ভোজন শয়ন,
করহি নহি ভায়।
ভণইতে দিবস রজনী, বহি যাওয়ে তাহে কৈছে,
অব ঘুম শোহায়॥
প্রাণ অধিক করি, মানহ অনুখন,
নিরূপম সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-কন্দ।
তা বিনু পলক, কল্পসম অনুভব,
ইথে নরহরি চিতে লাগয়ে ধন্দ॥"—
গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

আর একদল আসিয়া কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিল—

যথারাগ—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি"॥—

তৃতীয় কীর্ত্তনের দল আসিয়া গাইল,—

যথারাগ।

"জাগ জাগ ওহে গৌরশশী।
কত নিদ্রা যাও পোহাইল নিশি।
একি বিপরীত অলস ধর,
প্রভাত হইলে উঠিতে নার,
বল দেখি রাতে কি কাজ কর"

সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সখিদ্বয় সঙ্গে ভজন-মন্দির হইতে বাহির হইলেন। সকলেই গৌর-প্রেমে টলমল করিতেছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ দেওঘর।
২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।
শনিবার,—রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(১৫)

গৌরশূন্য গৌর-গৃহ গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির নির্জ্জন ভজনস্থলী—এই মহাযোগ-পীঠে নিশীথে নির্জ্জনে বসিয়া গৌরবক্ষবিলাসিনী যে ভাবে গৌরভজন করেন—তাঁহার সেই ভাবটি অতীব গভীর রহস্যপূর্ণ—বড়ই নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রসিক ভক্তকবি ঠাকুর লোচনদাস গৌর-বল্লভার এই নির্জ্জন-ভজন-কথার নাম দিয়াছেন—"নদীয়া-রহস্য"—যথা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—

—"অধিকারী নহোঁ মুঞি করোঁ পরমাদ।
গোরা-গুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ॥
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে শুন সবে নদীয়া-রহস্য॥"—

ঠাকুর লোচনদাস শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের গার্হস্থ্য-লীলায় যুগল-বিলাসলীলারঙ্গ বর্ণনা করিয়া সম্ভোগ রস-বিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এই "নদীয়া রহস্য" প্রকাশ করিয়া তিনি আত্মশোধন করিয়াছেন এবং বৈষ্ণব-জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নদীয়া-যুগল-ভজন-নিষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রসিক ভক্তবৃন্দ এজন্য ঠাকুর লোচনদাসকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনপন্থার মধুররসের প্রবর্ত্তক ও বর্ত্মোদ্দেশ গুরু বলিয়া সম্মান করেন। ঠাকুর লোচনদাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মাত্র একদিনের যুগলবিলাসরসবঙ্গ তাঁহার শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল-গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন,—ইহা শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব রাত্রির কথা। এই মধুর-লীলারঙ্গ বর্ণনায় রসিকভক্তকবি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের সম্ভোগ-রস-বিলাসের সীমা দেখাইয়াছেন। সেই একদিনের সম্ভোগ রসবিলাস এক্ষণে অফুরন্ত অনন্ত মধুর রস-উৎসের অসংখ্য খনি সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে, এবং ভবিষ্যতে করিবে। কলসে কলসে বিলাইলেও সে অপূর্ব্ব ও অনন্ত মধুর রসভাণ্ডারের পূর্ণতার কোন হানিই হয় না—এমনি অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতাপূর্ণ শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের এই রহোলীলার নিগূঢ় রহস্য। ইহারই নাম দিয়াছেন ঠাকুর লোচনদাস "নদীয়া-রহস্য"। এক রাত্রির শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া গৌরাঙ্গের প্রকট নিত্যলীলার সম্ভোগ রসের উৎস অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া যে অবিশ্রান্ত ও অফুরন্ত রসোদ্গার করিতেছে এবং করিবে তাহার আস্বাদনের পাত্র বহু মহা ভাগ্যবান গৌরভক্তবৃন্দ না হইলেও,—ইহা যে বৈষ্ণবীয় ভজন-রহস্য-সার-কথা, তাহা গোস্বামিশাস্ত্রকারগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সম্ভোগ-রসাস্বাদনাত্মক মিলন-সুখাপেক্ষা বিপ্রলম্ভ-রসাত্মক বিরহ-লীলা-রসাস্বাদন সুখ শ্রেষ্ঠ ভজন এবং এই শ্রেষ্ঠ ভজনই ভগবত-প্রাপ্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

ঠাকুর লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের নিত্যলীলার এই সম্ভোগ-লীলা-রঙ্গটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

"শয়ন-মন্দিরে সুখে শয়ন করিলা।
তাম্বুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা॥
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বোলে।
পরম পিরীতি করি বসাইলা কোলে॥
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুঅঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগোর কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥
তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥

দীর্ঘ কেশ কামের চামর জিনি আভা।
করবী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দনবিন্দু আর।
শশি কোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥
খঞ্জন নয়ানে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম কামানের গুণ করিলেক॥
অগৌর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পরতেখে॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিত তাঁহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥
ত্রৈলোক্যমোহিনীরূপ নিরীখে বদন।
অধর-মাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে।
নবকমলিনী যেন করিবর কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ-নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরি প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস॥
হৃদয় উপরে থোয় না ছুয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥"—

ঠাকুর লোচনদাস সন্ন্যাসের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের তাঁহার প্রাণবল্লভার সহিত এই সম্ভোগ-বিলাস-রসরঙ্গ-লীলা প্রকটনের সমাধান করিয়া কি সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাহাও শ্রবণ করিয়া আত্মশোধন করুন,—যথা,—

—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"—
গীতা।

—"যে জন যেরূপে ভজে তারে তেন প্রভু।
ভজন অধিক ন্যূন না করয়ে কভু॥
তাহাতে অধিক আছে অধিকারী-ভেদ।
অমায়া সমায়া ভক্তি সবেদ নির্ব্বেদ॥
ভক্তি বিনু কৃষ্ণ ভজিবারে নারে কেহো।
অমায়া নিশ্চলা প্রেমভক্তি হয় সেহো॥
বিনি অনুরাগে প্রেমভক্তি হয় যবে।
কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহো তবে॥
ঐছন ঠাকুর গৌর করুণার সিন্ধু।
অনুরাগে প্রেমার ভিখারী দিনবন্ধু॥
করুণায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ।
বিচ্ছেদ-হৃদয়ে যেন জাড়ে তার ভাব॥
ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ।
তার সহ মোর ভাব কভু নহে ভঙ্গ॥
এ হেন করুণা-নিধি আর আছে কে।
আপনা না ধরে নিজ প্রেম অনুরাগে॥
এই সে কারণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ।
এত জানি মনে কেহো না কর প্রমাদ॥
এ প্রেমভকতি প্রভু করিব প্রকাশ।
আনন্দ-হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥"—

এই যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের তাঁহার প্রাণ-বল্লভার প্রতি নিজ অনুরাগভরে স্বীয় অপার করুণা প্রকাশ,—ইহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। রসিকশেখর শ্রীগৌরসুন্দর চতুর চূড়ামণি—তিনি যে নদীয়ায় এই সর্ব্বোত্তম রসোলীলারঙ্গ প্রকট করিলেন—সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্ব রাত্রিতে,— তাহার কারণ এই যে, ইহার পর যে বিচ্ছেদ হইবে—তখন এই অপূর্ব্ব প্রেমানুরাগপূর্ণ সম্ভোগজনিত মধু হইতেও মধুময় স্মৃতি সকল বিরহিণীর প্রাণে তাঁহার প্রাণ বল্লভের জন্য নিত্য নব নবায়মান প্রেমানুরাগের উৎস সৃষ্টি করিবে। এক্ষণে ফলে তাহাই হইয়াছে—রসিকশেখর শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে,—ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরভগবানের স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে—বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর গৌর-বিরহে তাঁহার গৌরানুরাগ দিন দিন বৃদ্ধিই হইতেছে।

ঠাকুর লোচনদাস এই সিদ্ধান্তের ভণিতায় লিখিয়াছেন,—

—"এ প্রেম-ভকতি প্রভু করিব প্রকাশ।"—

অর্থাৎ এইরূপ মধুর-ভজনের মূলমন্ত্র যে প্রেমভক্তি, তাহা নদীয়া-নাগরী-দ্বারে নাগরেন্দ্র শিরোমণি শ্রীগৌর-সুন্দর জগতে

প্রকাশ করিবেন। ঠাকুর লোচনদাসের ধামালির পদাবলী সমূহ মধুরভাবের গৌর-ভজনের পরিপোষক। নদীয়া-নাগরী-ভাব যে অতি বিশুদ্ধ ভাব,—তাহা শাস্ত্র এবং বহু মহাজন কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহা দ্রষ্টব্য।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার দৈনন্দিন ভজন শেষ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভজন মন্দিরের দ্বারে বারান্দায় বসিয়া সংখ্যানাম জপ করিতেছেন—সখি কাঞ্চনার নিজ কার্য্য শেষ করিয়া আসিতে আজ একটু বিলম্ব হইয়াছে,—সখি অমিতা প্রিয়াজির নিকটে বসিয়া আছেন—কাঞ্চনা সখির আগমন প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহারা প্রতীক্ষা করিতেছেন—কারণ প্রিয়াজি এই সময়ে সখি কাঞ্চনার কলকণ্ঠে সুধামাখা গৌর গুণ-গান-কীর্ত্তন শ্রবণ করেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি আজ সখি অমিতাকে পরম প্রেমভরে পরমানন্দের সহিত মিনতি করিয়া বলিলেন—"সখি অমিতে! আজ তুমি একটী গৌর-কীর্ত্তন কর—আমি তোমার মুখে গৌরকীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসি"। সখি অমিতার কণ্ঠস্বর তেমন সুন্দর নহে,—কিন্তু তাঁহার হৃদয়খানি গৌর-প্রেমের অফুরন্ত উৎস। তিনি লজ্জায় বদনখানি অবনত করিয়া উত্তর দিলেন—"প্রিয়সখি! আমি ত গানও জানি না—গান গাহিতেও জানি না—কাঞ্চনা দিদিকে আমি ডাকিয়া আনি"। প্রিয়াজি সদৈন্যবচনে কহিলেন—"সখি অমিতে! আমি গৌর-কথার বড় কাঙ্গালিনী—তোমার মুখে গৌর-গুণ-গান ত আমি শুনিয়াছি,—তাহা আমার ত বড় ভাল লাগে—কেন তুমি আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিতেছ সখি?" এই কথা বলিয়া সস্নেহে তিনি সখি অমিতার হাত দু'খানি ধরিলেন—তখন অমিতা আর এড়াইতে না পারিয়া গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

সখি!
(গৌর) বিরহ অনলে, ধিকি ধিকি জ্বলে,
(মোর) দগধ সরব অঙ্গ।
ঝলসিল আঁখি, কিছু নাহি দেখি,
ইহ কি বিষম রঙ্গ॥

সখি! গোরা বড় চিত-চোর।
(তার) গুপুত পিরীতি, না জানি কি রীতি,
দহিল হৃদয় মোর।
তবু না টুটল, পিরীতি শিকল,
(সে যে) অটুট-প্রেমের ডোর॥
দুরাশা মিলন, পদ দরশন,
তবু না ছোড়ল আশ।
গোরা মোর প্রাণ, গোরা মোর ধ্যান,
যত দিন রবে শ্বাস॥
মু বড় অভাগী, গৃহবাস ত্যাগী,
গোরার পিরীতে মজি।
ধরম করম, সরম ভরম,
সব ত্যজি গোরা ভজি॥
না ছোড়ব গোরা, মোর চিত-চোরা,
যায় যাক্ পুড়ে প্রাণ।
পরাণ ছোড়ব, পিরীতি রাখব,
নাহি ইথে অভিমান॥
গোরার পিরীতি, মধুময় অতি,
(করি) গৌর-বিরহ সার।
'আমি' অনলে পুড়িব, জলে ঝাঁপ দিব,
(সখি) ধারি না কাহারও ধার॥
গৌর-বিরহ, গাব অহরহ,
(এ যে) বিষামৃত-পারাবার॥
(এই) বিরহ-পয়োধি, পার হবে যদি,
(কর) প্রিয়াজি-চরণ সার।
এ তত্ত্ব শিখাতে, এ কথা বলিতে,
(আছে) হরিদাসিয়ার অধিকার॥"—

গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে সখি অমিতার গান শুনিতেছেন,—তাঁহার নয়নের ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—সখি অমিতার কথাগুলি তাঁহারই প্রাণের কথা,—তাঁহারই মনের কথাগুলি যেন প্রিয় সখির মুখে তিনিই বলিতেছেন বা বলাইতেছেন। গৌর-বল্লভা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন—তাঁহার নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি যেন সখি অমিতার বদন-মণ্ডলে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে,—অমিতা ইহা লক্ষ্য করিয়া লজ্জায় নিজ বদন অবনত করিলেন,—তখন

প্রিয়াজি আত্মসম্বরণ করিয়া মৃদুমধুর স্বরে কহিলেন,—"সখি অমিতে! প্রিয় সখি! তুমি আমার মনের কথাগুলি কি করিয়া জানিলে? **তুমি কি আমি,—না আমিই তুমি**? এই সন্দেহটি আমার মনে আজি হঠাৎ উদিত হইয়াছে—ইহার সমাধান তুমিই কর সখি।"—সখি অমিতা অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতি—তিনি ইহার উত্তর কি দিবেন বুঝিতে পারিতেছেন না,—এমন সময় সখি কাঞ্চনা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সখি অমিতার মনে সাহস হইল,—তখন তিনি উত্তর করিলেন—"কাঞ্চনা দিদি এ কথার উত্তর দিবেন"। সখি কাঞ্চনা মূলকথা কিছুই জানেন না। প্রিয়াজি তখন বলিলেন—"আজ সখি অমিতা একটী অতি সুন্দর গৌর-কীর্ত্তনের গান গাহিয়াছে,—সে গানটিতে আমার মনের ভাব এবং আমার প্রাণের কথাগুলি বড়ই পরিস্ফুট হইয়াছে—তাই আমি প্রশ্ন করিয়াছি—"**তুমি কি আমি,—না আমিই তুমি**"। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির প্রশ্ন শুনিয়া একটু মৃদু হাসিলেন এবং মৃদুভাবে সখি অমিতাকে কহিলেন—"সখি অমিতে! গানটি আর একবার তুমি গাও দেখি? তবে ত আমি বুঝিব তোমাদের ভিতরকার ব্যাপারটা কি? গানটি একবার না শুনিয়া আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না"। তখন প্রিয়াজির অনুরোধে সখি অমিতা পুনরায় গানটী করিলেন—এবার গৌর-পাগলিনী কাঞ্চনা সখি তাঁহার কলকণ্ঠে দোহার দিলেন—গানটি প্রিয়াজির কর্ণে যেন অবিশ্রান্ত মধু বৃষ্টি করিল।

গানটি শেষ হইলে সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজিকে বলিলেন "প্রিয়সখি! সখি অমিতার ভাগ্যের সীমা নাই—সে তোমার মনোভাব বুঝিয়া তোমার মনের মতন গান গাহিয়াছে। তুমিই তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মুখে তুমিই তোমার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছ। তোমার আবেশে—তোমার আত্ম প্রবেশে—তোমার অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারে,—তোমার তুমিত্ব তুমিই দান কর। ব্রজগোপিনীগণ শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ ছিলেন। তোমার কৃপায় সখি! আমরা তোমার মনের মধ্যেই বাস করি—আমাদের কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই,—সুতরাং তোমার অভিন্ন-কায়া অমিতা-কাঞ্চনা তোমার মধ্যেই আছে,—আর তুমিও তাহাদের হৃদয়ের মধ্যেই আছ,"—

সখি কাঞ্চনার মুখে তাঁহার প্রশ্নোত্তর পাইয়া বিরহিণী প্রিয়াজি কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন—পরে বদন অবনত করিয়া বলিলেন—"সখি কাঞ্চনে! এ সকল কথা আমি কিছু বুঝিলাম না—তোমাদের তত্ত্ব তোমরাই জান,—তোমাদের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমার নাই! আমারই ভ্রমবশতঃ এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, ক্ষমা কর সখি কাঞ্চনে! এখন গৌর কথা কহ—গৌর-নাম-রূপ-গুণ-গানে আমার পিপাসিত কর্ণ শীতল কর। এই কথা বলিতে বলিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার গৌরানুরাগরঞ্জিত কমল নয়নদ্বয় জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল—তিনি অসহনীয় গৌরবিরহ জ্বালায় যেন বিহ্বল ও অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

"—গৌর গরবে হাম, জনম গোঙায়নু,
অব কাহে দিরদয় ভেল।
পরিজন বচনহি, গরলে গরাসল,
গেহ দহন সম ভেল॥
সোঙরিতে সো মুখ, হৃদয় বিদারত,
পাঁজরে বজরক শেল॥
উঠি বসি করি কত, ক্ষিতি মাহা লুঠত,
পবন অনল দহ অঙ্গ।
(সখি!) কি করব কা দেই, সম্বাদ পাঠাওব,
মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ॥"
ব্যথিত বেদনি জন, বোধায়ত অনুখন,
ধৈরজ ধরু হিয়া মাঝ।
নিরবধি সো গুণ, করু অবলম্বন,
মাধব শিরে হানে বাজ॥

পদকল্পতরু।

সখি কাঞ্চনা সঙ্গেসঙ্গেই আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

—"জনমহি গৌরক গরবে গোয়ায়নু,
সো কিয়ে এত দুখ সহই!
উর বিনু সেজ, পরশ নাহি জানত,
সো তনু অব মহী লুঠই॥
বদন-মণ্ডল, চাঁদ ঝলমল,
সো অতি অপরূপ সোহে।
রাহু ভয়ে শশী, ভূমে পড়ল খসি,
ঐছন উপজল মোহে॥
পদ অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতিপর লেখই,
যৈছন বাউরি পারা!
ঘন ঘন নয়নে, নিঝর বারি ঝরু,
যৈছন শাওন-ধারা॥

খেনে মুখ গোই, পানি অবলম্বই,
ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস।
সোই গৌরহরি, **পুনহি মিলায়ব,**
নিয়ড়হি মাধব দাস॥"—
পদকল্পতরু।

বিরহিণী গৌর বল্লভা সখি কাঞ্চনার এই দুটি গান ধীরভাবে শুনিলেন—যতক্ষণ শুনিলেন অঝোর নয়নে ঝুরিলেন—কিছুক্ষণ নীরব রহিয়া সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি করুণ-নয়নে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে প্রেমগদগদ বচনে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! **"পুনহি মিলায়ব"** যাহা হইবার নহে—সে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া মনাগুণে কেন জ্বলিয়া মর সখি! গৌরনাম কর—গৌর-গুণগান কর—গৌর-রূপের অপূর্ব্ব মাধুরীর কথা কহ—আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক"—এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি কাঁদিয়া আকুল হইলেন—তিনি যেন বড়ই অসম্বর হইয়া পড়িলেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কত কি সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন—কত কি উপদেশ দিতে লাগিলেন —কিন্তু কিছুতেই বিরহিণী প্রিয়াজির মন শান্ত হইল না—তিনি বালিকার মত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনাও ধৈর্য্য হারাইলেন—তিনিও কাঁদিয়া আকুল হইলেন—সখি অমিতাও নীরবে বসিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন এবং প্রিয়াজির ভাবগতিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরহিণী গৌর-বল্লভা আত্মসম্বরণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। সখি কাঞ্চনার গলদেশ বাম হস্তে বেষ্টন করিয়া সস্নেহে দক্ষিণ হস্তখানি তিনি সখি অমিতার উরুদেশে স্থাপন করিয়া আকুল প্রাণে করুণ ক্রন্দনের স্বরে কহিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

—"সজনি! আর কি শুনব উপদেশ।
সব উপদেশ-সার, গৌর-কথার হার,
নব নব তাহাতে রচনা কর বেশ॥
কর্ণের ভূষণ কর, গৌর-কথা সুমধুর,
শ্রুতিমূলে কর সখি, (গৌর) নাম উপদেশ।
নয়নে অঞ্জন কর, গোরারূপ—সুধাকর,
গোরা-অনুরাগ-তৈলে—বান্ধি দেহ কেশ॥
লিখ ভালে গোরা-নাম, অলকা তিলকদাম,
নানা রঙ্গে অলঙ্কার—রচহ বিশেষ।
গৌর-চরণ-ধুলি, রাশি রাশি তুলি তুলি,
মাখাইয়ে দাও সখি! (কিছু) রাখি অবশেষ॥
ওগো সখি মাথা খাও, অঞ্চলে বাঁধিয়া দাও,
বুকে ধরি পদ-রজ, (এই) অনুরোধ শেষ।
গৌর-কথা শুনাইয়ে, জুড়াও তাপিত হিয়ে,
না ফিরব ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি—দেশ বিদেশ॥
তুমি বল আমি শুনি, গৌরকথা সুধাবাণী,
না কর সন্দেহ চিতে,—পা'ব হৃদয়েশ।
সখির চরণ ধরি, বিরহে কান্দয়ে হরি,
গৌরকথা গৌর-গাথা—কহ গো বিশেষ॥"—
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটক।

এই কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রাণ যেন তাঁহার প্রাণ-বল্লভের চরণকমলে তন্ময় হইয়া গেল—মন যেন গৌর-বিরহে পরম ব্যাকুলিত হইল—হৃদয় গৌর-প্রেমে বিগলিত হইল—তিনি জগত গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি আর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না—সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে প্রেমাবেগে ঢলিয়া পড়িলেন। প্রিয়াজির বদনমণ্ডল ভজনমন্দিরস্থ তাঁহার স্বহস্ত-অঙ্কিত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের পট-মূর্ত্তির দিকে ঝুঁকিয়া রহিল —নির্নিমেষ নয়নদ্বয় যেন সেই শ্রীমূর্ত্তির চরণে লিপ্ত হইয়া রহিল—নয়নে পলক নাই—নির্নিমেষ নয়নে তিনি তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বধন অভীষ্টদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিতেছেন—তাঁহার কমল নয়নদ্বয় যেন একবার তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীচরণপ্রান্তে, আর একবার যেন তাঁহার শ্রীবদনপ্রান্তে পুষ্প-মধুলোলুপ ভ্রমরের ন্যায় নিরন্তর ঘুরিতেছে এবং গুণগুণ স্বরে কি গান করিতেছে—সে গানের সুর কি মধুর,—সখিদ্বয়ের কর্ণে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মধুর ঝঙ্কার দিতেছে। অতি মৃদু ও অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী-সখীদ্বয়কে উপলক্ষ্য করিয়া করুণ হইতেও করুণ মৃদু মধুর স্বরে বলিতেছেন,—

যথারাগ।

—"সজনি! তোরা শুন্‌বি যদি আয়।
পরাণ বঁধুয়া মোর মুরলী বাজায়॥
হেথা বসে আছি আমি, আচম্বিতে ধ্বনি শুনি,
ভজন-মন্দিরে মোর—কে বাঁশি বাজায়।

হাসি মুখে হেলে বামে, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে সে যে—মুরলী-বাজায় ॥
অলকা তিলকা ভালে, গায় গান মানে তালে,
নূপুর-পরান রাঙ্গা চরণ নাচায়।
শিখি পুচ্ছ শিরে ধরে, মোহন মুরলী করে,
বাঁকা নয়নে চেয়ে—ভুরু নাচায় ॥
পরিধানে পীতাম্বর, গলে শোভে গুঞ্জাহার,
মুনি ঋষি মন হরে—বদন শোভায়।
একি দেখি অপরূপ, শ্যাম-সুন্দর রূপ,
আমার বঁধুতে হেরি—পরাণ জুড়ায় ॥
কি জানি কি হ'ল মোর, একি দেখি স্বপ্ন ঘোর,
প্রাণনাথ দাসী সনে—কি ছলা ছলায়।
দাসী হরিদাসী ভণে, (তুমি) যা ভেবেছ মনে মনে,
সেই রূপে দেখা দিল—প্রারা রসময় ॥"—
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটক।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহের সহিত তাঁহার এই জাগ্রত-স্বপনের সুধামধুর কথাগুলি শুনিতেছেন—বিরহিণী গৌরবল্লভার শ্রীমুখে এই ভাবের কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের পূর্ব্বাভাসের প্রাচীন পদগুলি মনে পড়িল—তাঁহারা ভাবিতেছেন আজ তাঁহাদের বড় সৌভাগ্য যে গৌর-বল্লভার শ্রীমুখে শ্রীশ্রীগৌর কৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্বকথা শ্রবণের শুভসংযোগ সংঘটন হইল। সখিদ্বয়ের মনে আজ বড় আনন্দ। সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণের নিকট মুখ দিয়া অতি মৃদুভাবে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! তুমি এখন একটু সুস্থ হও—পরে এসকল কথার আলোচনা তোমার সহিত আমরা নির্জ্জনে করিব। এই জাগ্রত-স্বপ্নটির নিগূঢ় অর্থ আছে"।

বিরহিণী প্রিয়াজি এখনও সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে শায়িতা—এখনও তিনি নির্ণিমেষ নয়নে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীপট-মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া আছেন—এখনও তাঁহার ভাবাবেশ যায় নাই—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলক-কদম্বে পরিপূরিত—ভজন-মন্দিরটি গৌর-অঙ্গগন্ধে যেন মহ মহ করিতেছে—শচীনন্দন গৌরহরি আজ যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে যে নদীয়ার নির্জ্জন মহাগম্ভীরা-মন্দিরে অলক্ষ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন—একথায় সখিদ্বয়ের অবিশ্বাস নাই—তবে তাঁহারা সম্মুখে থাকিয়াও সে অপরূপ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ মূর্ত্তির দর্শন পাইলেন না—এই তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ এবং আত্যন্তিক আক্ষেপের বিষয়। তাঁহারা উভয়েই মন দুঃখে হায় হায় করিতেছেন —প্রাণের ভিতরের মর্ম্মান্তিক দুঃখে মরমে মরিয়া আছেন —কিন্তু সে কথা বা সে ভাব মুখে কিছুই প্রকাশ নাই। কারণ, এ বড় গুপ্ত রহস্য কথা—প্রিয়াজি ও তাঁহার প্রাণ-বল্লভের হৃদয়ের নিগূঢ় গুপ্তভাবের ইহা একটি বিচিত্র চিত্র,—এই অলৌকিক চিত্রের বৈচিত্রী-ভাব-রস-কদম্বের পরমাদ্ভুত মাধুরী-সম্ভার—চারি বেদ গুপ্তধন—শিব বিরিঞ্চির অগোচর। যথোপযুক্ত সময়ে গৌর-বল্লভার ইচ্ছায় এই নিগূঢ় রহস্যজাল ক্রমশঃ বিস্তারিত হইবে—বহু তথাকথিত একনিষ্ঠ গৌর-ভক্তের বিষম ভ্রমজাল দূরীভূত হইবে। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ অদ্বয়-তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি বিষয়ে গৌর-বল্লভার এই লীলারঙ্গটি গৌরভক্তদিগের প্রাণে নব ভজন-বল সঞ্চার করিবে।

বিরহিণী প্রিয়াজি এতক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া উঠিয়া বসিলেন—ধীরে ধীরে ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া সখিদ্বয় তাঁহাকে আসনে বসাইয়াছেন—তিনি তাঁহার স্বহস্ত-অঙ্কিত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের শ্রীপটমূর্ত্তির শ্রীবদনের প্রতি নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন।

সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির তাৎকালিক মনোভাব বুঝিয়া সময়োচিত ও ভাবোচিত শ্রীরাধিকার উক্তি—একটী প্রাচীন স্বপ্নবিলাস পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"নিধুবনে দুহু জনে, চৌদিকে সখিগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি,
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে ॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গৌর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটি কাম,
রসরাজ রসের সদন ॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি, ভাবভূষা নিরবধি,
নাচে গায় মহামত্ত হৈঞা।

অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি,
মন ধায় তাঁহারে দেখিয়া ॥
নব জলধর রূপ, রসময় রসকূপ,
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে ॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন,
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা জপমালা হস্তে শ্রীচিত্রপটের সম্মুখে বসিয়া সজলনয়নে নিশ্চল ও নিস্পন্দ শরীরে এক মনে নয়ন ভরিয়া তাঁহার প্রাণ বল্লভের শ্রীবদন দর্শন করিতেছেন আর সখি কাঞ্চনার গান শুনিতেছেন—কিন্তু তাঁহার মুখে কোন কথা নাই—সখি অমিতাও শ্রোতা। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা গান শেষ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে প্রিয়াজির তাৎকালিক বদনের ভাব লক্ষ্য করিলেন—বদনের ভাবের সহিত তাঁহার মনের ভাবের ঐক্য দেখিলেন—সময়োচিত এবং ভাবোচিত রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উত্তর তখন আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন। প্রিয়াজির নির্জ্জন ভজনমন্দির পুনরায় তাঁহার কলকণ্ঠস্বরে মুখরিত হইল।

যথারাগ।

—"শুনইতে রাই বচন অধরামৃত,
বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাব প্রকাশিতে,
ধনী অনুমতি ভেল জান ॥
সুন্দরি! যে কহিলে গৌর-স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনা,
মোহে করবি হেন রূপ। ধ্রু ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহিব না পাইয়ে ওর ॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে,
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাবকান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয় ॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা,
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে (১) কয়, প্রভু মোর দয়াময়
না ভজিনু মুক্তি নরাধম ॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছেন,—আর তাঁহার সেবিত শ্রীপটমূর্ত্তি শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দদেবের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন—তাহা মুখে প্রকাশ নাই—তাঁহার অন্তরে কত ভাবের কত তরঙ্গ যে খেলিতেছে—তাহার ইয়ত্তা নাই। সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির বাহ্যিক সর্ব্বাঙ্গের ভাবভূষণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয়সখির অগাধ-অথাই-হৃদি-সমুদ্রোত্থিত ভাব-রত্নগুলিরও অনুসন্ধান লইতেছেন। তিনিও কোন প্রশ্ন করিতেছেন না।

সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে পুনরায় ইহার উত্তরে শ্রীরাধিকার উক্তি ইহার পরবর্ত্তী প্রাচীন একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"বঁধু হে! শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজ জীবন, তুয়া বিনু কৈছন,
ব্রজপুর বাঁধব থেহা ॥
জল বিনু মীন, ফণী মণি বিনু,
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন,
ব্রজপুর-গতি তুহুঁ জান ॥
সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি,
পাওব কোন হি সুখ।

(১) জীবাধম লেখকের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুর প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই রচিত এই পদরত্নটী। পরবর্ত্তী আরও দুটী পদ তাঁহারই রচিত।

কিয়ে আন জন, তুয়া মরমহি জানব,
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিবসয়ি,
তুহুঁ বর নাগর কান।
অহনিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব,
তেজব সবহুঁ পরাণ ॥
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনা-তটে,
সখা সঞে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি,
না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌরবিরহিণী সনাতন-নন্দিনী কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পূর্ব্বাভাস যে তাঁহারই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ এবং তাঁহারই উক্তি যে উক্ত পদ-রত্নটী,—তাহা তিনি জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না—এইরূপ ভাবটি দেখাইতেছেন—কিন্তু মুখে কোন কথা কহিতেছেন না। এ সকল পূর্ব্বচরিতকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে যে আনন্দ হইতেছে না—প্রাণে যে সুখ হইতেছে না—একথা নহে! তবে সে সুখানুভূতির বাহিরে কোন প্রকাশ নাই। সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা সনাতন-নন্দিনী গৌর-বল্লভার "ব্রজপুর চারু-চরিত-কথা" বড়ই প্রিয় বস্তু—এবং নিজ "পুরব-রচিত-গীতি" তদপেক্ষাও অতীব প্রিয়তম বস্তু—তিনি এই সকল প্রাচীন পদাবলী প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিতেছেন—এবং পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুরের পরম পবিত্র বংশের কুলাঙ্গার জীবাধম লেখক-কে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন বা শাসন করিতেছেন, তাহা জানিবার উপায় যে নাই,—একথা বলিতে পারি না।

সখি কাঞ্চনার চতুরতার সীমা নাই—তিনি বিরহিণী প্রিয়াজির মর্ম্মী সখি—তাঁহার অন্তরের কথা সকলি জানেন—এবং তাঁহার মনের মধ্যে এখন যে কি ভাবের উদয় হইতেছে—তাহাও তিনি জানেন। তিনি ছাড়িবেন কেন এ সুযোগ—এ সুবিধা—আর এ সৌভাগ্য। শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি—অর্থাৎ তাঁহার কথার উত্তরে শ্যামসুন্দর যাহা বলিলেন তিনি তাহাই এখন প্রিয়াজিকে শুনাইতেছেন। যথা,—

যথারাগ।

—"শুনহ সুন্দরি! মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর-প্রেম করব পরকাশ ॥
গোপ গোপাল সবজন মেলি।
নদীয়া নগর পরে করবহুঁ কেলি ॥
তনু তনু মেলি হোই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব তব নাম ॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব।
ব্রজবিনু প্রেম না হোয়ব লাভ ॥
ব্রজপুর ভাবে পুরাব মন-কাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম ॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার নিজ-চরিত-কথা এই মহাজনী পদগুলি শুনিয়াই যাইতেছেন—অতি ধীর গম্ভীর ভাব তাঁহার এখন—জপের মালা তাঁহার হাতেই আছে—বাহ্যে তাঁহার দুরধিগম্য অন্তরের অন্তস্তলের ভাব-তরঙ্গের কোন চিহ্নই প্রকাশ নাই—গৌর-বিরহিণী তাঁহার স্বতন্ত্রা প্রকৃতিগত ভাব-গম্ভীর-স্বভাবের এখন পূর্ণ পরিচয় দিতেছেন। সখি কাঞ্চনার চতুরতা তিনি বুঝিয়াই এরূপ অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিতেছেন।

অতঃপর সর্ব্বশেষে সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির নিকট অতি সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে গৌর-তত্ত্বটি প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন। যথা—

যথারাগ।

—"এত শুনি বিধুমুখী, মনে হয়ে অতি সুখী,
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য,
সেইরূপ দেখিব হে আমি ॥
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে,
অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়া ধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথায় লুকাইবে,
কাল গৌর হইবে কেমনে ॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তভের প্রতিবিম্বে,
দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা,
ভাবপ্রেমময় সব অঙ্গ ॥

নিধুবনে এই ক'য়ে, দুহুঁ তনু এক হয়ে,
নদীয়াতে হৈল উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে,
প্রেম-বন্যায় জগত ভাসায়॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রসাস্বাদন,
ব্রজবাসী সখা সখি সঙ্গে।
বৈষ্ণব-দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ,
না ভাসিলাম সে সুখ-তরঙ্গে॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই পদটী শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি আন্‌মনা হইয়া যেন কি ভাবিতে লাগিলেন—তিনি যেন কোন এক নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত পদটিতে শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রাণবল্লভকে কহিতেছেন—

—"আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে,
অসম্ভব হইবে কেমনে?"—

এইরূপ মনের ভাবটি শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভার অত্যন্ত স্বাভাবিক সরল ও সহজ ভাব। তাঁহার মনের ভাবটি সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়, কেন তিনি স্বীয় ভাবে ও স্ব-স্বরূপে শরীরধারী হইয়া তাঁহার গৌরবর্ণ প্রাণবল্লভের সহিত সর্ব্বোত্তম নরলীলারঙ্গ তাঁহার নববৃন্দাবনধাম নবদ্বীপে পুনঃ প্রকটিত করিবেন না? ব্রজের পরকীয়া ভাবের লীলারঙ্গে যে অপূর্ব্ব রসোল্লাস তাহার পরাকাষ্ঠা তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে এই নববৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সহিত নবভাবে স্বকীয়া লীলারঙ্গ প্রকট করিতে শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভার মনে একটী বাঞ্ছার উদয় হইয়াছে। এইজন্য অতিশয় চতুরতার সহিত বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকা এই প্রশ্নটি তাঁহার প্রাণ-বল্লভের নিকট উত্থাপন করিলেন—"দুই দেহ এক হবে, অসম্ভব হইবে কেমনে?" "অসম্ভব" শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা তিনি তাঁহার মনোভাবের সুদৃঢ়তা সূচিত করিলেন।

এইরূপ একটী ভাবতরঙ্গ বিরহিণী প্রিয়াজির মানস-সরোবরে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ করিতেছে—গানটী শুনিয়া পর্য্যন্ত তিনি গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা তাঁহার কায়ব্যূহ সখিদ্বয়ের অবিদিত নাই—তবে সকল কথা প্রিয়াজিও প্রকাশ করিয়া বলিতেন না—মর্ম্মী সখিদ্বয়ও অনেক সময় মনের কথা মনেই রাখিতেন—কারণ প্রচ্ছন্ন অবতার-নারীর প্রচ্ছন্নলীলারঙ্গের মাধুর্য্য অপ্রকাশেই সমধিক উজ্জ্বল এবং মর্ম্মী সখিদিগের সঙ্গেও এই লুকোচুরি খেলা প্রচ্ছন্নলীলাময়ী গৌর-বল্লভার স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক।

ব্রজে পরকীয়াভাবে যে অপূর্ব্ব রসোল্লাস—তাহার পরাকাষ্ঠা গৌরবল্লভা কৃষ্ণবল্লভারূপে ব্রজলীলায় প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন তাঁহার মনোবাঞ্ছা নদীয়ায় স্বকীয়-ভাবে শ্বশুরগৃহে নিজজনসঙ্গে প্রকাশ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলার একটী অপূর্ব্ব অভিনয় দেখাইবেন—যাহার চমৎকারিতায় এবং ভাব-মাধুর্য্যে প্রেমভক্তির নবভাবে স্ফূর্ত্তি হইবে। এই জন্য উক্ত পদটিতে তিনি অতিশয় চতুরতার সহিত "দুই দেহ এক হবে" কেমন করিয়া এই কথার উত্তরে নিজেই বলিয়াছেন,—ইহা অসম্ভব। গৌরভক্ত নিত্যপার্ষদ পদকর্ত্তা-গণ সর্ব্বজ্ঞ—প্রচ্ছন্ন অবতারনারীর হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন ভাবটীর অঙ্কুর এই একটী কথায় উট্টঙ্কিত করিলেন—তাঁহার মনোভাবের নিশ্চয়তা সূচিত করিলেন। নিত্যসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণ তাঁহাদের প্রাণকোটিসর্ব্বস্বধন অভীষ্ট দেবের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সর্ব্বভাবে সমর্থ এবং উপযুক্ত পাত্র।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপসুধাকরের আদিলীলালেখক শ্রীল মুরারি গুপ্ত মহাশয় তাঁহার করচায় নদীয়ার এই স্বকীয় লীলারঙ্গটি যে একটী অপূর্ব্ব রসভাণ্ডার এবং শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল শ্রীমূর্ত্তি যে সর্ব্বরসসার "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" তাহা গ্রন্থে অতি মধুর সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া কলিহতজীবের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-যুগল-ভজন-পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই সুমধুর শ্লোকটি এই,—

—"সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমৈঃ
ররাজরাজদ্বর হেম গৌরঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-লালিত-পাদপঙ্কজো
রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্র মৌলিঃ।"—
মুরারী গুপ্তের করচা ১ম প্রঃ ১৫ সর্গ ৪র্থ শ্লোক।

পদকর্ত্তার এই নিগূঢ় ভাব-রসাস্বাদন করিয়া কোন আধুনিক ভক্তকবি লিখিয়াছেন—

—"রাধিকার মনোবাঞ্ছা আছিল মনেতে।
স্বকীয় ভাবেতে হৈব উদয় নদেতে॥

কানু সনে গুপ্তপ্রেমে বিঘ্ন নিরন্তর।
জটিলা কুটিলা নাহি রবে অতঃপর॥
রাত্রিকালে কুঞ্জেবাস গোপনেতে স্থিতি।
এ সকলে হইবেক এই বার ইতি॥
সর্ব্ব লোকে জানিবেক প্রাণকান্ত মোর।
রসরাজ নটবর শচীনন্দন গোর॥
শ্বশুর শাশুড়ী আর আত্মীয় স্বজন।
সকলে জানিবে গোরা মোর প্রাণধন॥
(এই) স্বকীয় লীলার স্পর্শে পরকীয়া রস।
নদীয়াতে সর্ব্বভাবে হইবে সরস॥"—

মহাভাবময়ী গৌরবল্লভা এখন পর্য্যন্ত মহাভাবে বিভোর আছেন। সখিদ্বয় তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় আছেন—নির্জ্জন-ভজন-মন্দিরে গভীর নিশীথে এই অন্তঃসলিলা ভাব-তরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ গৌরবল্লভার হৃদয়ে খেলিতেছে—তাহার ঘাত প্রতিঘাত মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হৃদয়ে লাগিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৌরবল্লভা আপনাআপনই ভাব সম্বরণ করিলেন। তিনি তাঁহার মর্ম্মীসখি কাঞ্চনার প্রতি সস্নেহ-ভাব দেখাইয়া পরম প্রেমভরে সরলা শিশু-বালিকার ন্যায় সরলান্তঃকরণে মৃদুমধুর হাসিয়া কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমি এতক্ষণ ধরিয়া কি যে বলিতেছিলে তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝিতে পারি নাই—ও সকল তোমাদের কথা তোমরাই জান—আমি আদার ব্যাপারী—জাহাজের দর জানিবার আমার প্রয়োজন কি? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ আমার প্রাণ-সর্ব্বস্বধন এবং তোমাদের শচীনন্দন গৌরহরি আমার প্রাণ-বল্লভ—এইমাত্র আমি জানি—ইহার অধিক আর কিছু আমি জানি না—জানিতেও চাহি না। আমার প্রাণবল্লভ আমাকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—আমি কৃষ্ণ-লীলাগুণগান শুনিয়া বড় আনন্দ পাই—তাই পরমাদরে শ্রবণ করি তোমাদের মুখে—এজন্য তোমাদের নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ।"—

সখি কাঞ্চনা এই সুযোগে একটী কথা না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় চতুরতার সহিত মৃদুমধুর বচনে কহিলেন—"প্রাণসখি! তুমি বলিলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তোমার প্রাণসর্ব্বস্বধন—আর শচীনন্দন গৌরহরি তোমার প্রাণ-বল্লভ। এই দুইটি কথার অর্থের তারতম্য কি বল দেখি সখি?

গৌর-বল্লভা পুনরায় গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন—পূর্ব্বের ন্যায় সরলভাব আর তাঁহার নাই—তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না—সুতরাং কাঞ্চনা সখির মনোরথ সিদ্ধ হইল না।

সনাতন-নন্দিনী গৌরবল্লভার প্রকৃতি একেবারে ঐশ্বর্য্য-গন্ধশূন্য, বড়ই মধুর। তাঁহার প্রাণ-বল্লভ কলির ছন্ন-অবতার হইয়াও কখন কখন ভক্তভাবের মধ্যেও কিছু কিছু ঐশ্বর্য্যভাব দেখাইয়া তাঁহার স্ব-স্বরূপের কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখের "মুক্তি সেই মুক্তি সেই" বাণী গুলিই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবোধক। কিন্তু গৌর-বল্লভা কখন কোন কার্য্যে তাঁহার স্ব-স্বরূপের কোনরূপ পরিচয় দেন নাই। তাঁহার কোন কথায় এমন কি তাঁহার মর্ম্মীসখিগণ পর্য্যন্ত কোন দিন তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাবের কোনরূপ গন্ধ পান নাই। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীকৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকার বিশিষ্ট আবির্ভাবের ইহাই বৈশিষ্ট্য—সনাতন-নন্দিনী শ্রীগৌরবল্লভার সর্ব্বোত্তম নরলীলার ইহাই বৈশিষ্ট্য। তাঁহার এই যে লীলা-বৈচিত্রী—ইহাতেই তাঁহার স্ব স্বরূপের পরম মাধুর্য্যময়ী মহামহিমাকে অত্যধিক সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

সখি কাঞ্চনা আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। গৌর-বল্লভা চতুরার চূড়ামণি—সখি কাঞ্চনা তাহা জানেন—তবুও মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রিয়সখির কিছু ঐশ্বর্য্য দেখিতে বা দেখাইতে তাঁহার বাসনা হয়—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সর্ব্বজ্ঞা প্রিয়াজি তাহা না বুঝেন এমন নহে—বুঝিয়াই মর্ম্মীসখি গণের ভাবে বিশেষ কোন আঘাত দেন না।

এক্ষণে প্রিয়াজি তাঁহার সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি চাহিয়া বুঝিলেন তাঁহাদের মনের ভাব যেন কিছু সঙ্কুচিত ও সশঙ্কিত। সখিদ্বয়ের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁহার সংখ্যানাম জপের মালা গাছটি শিরে স্পর্শ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া স্থির হইয়া আসনে বসিলেন। সনাতননন্দিনী গৌরবল্লভা পরম পণ্ডিতা—বিশেষতঃ তিনি ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞা—তিনি যে মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবী। মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবী আজ সখি-সঙ্গে স্বয়ং ভক্তিশাস্ত্রালোচনা করিতে বাসনা করিলেন। তিনি নিজ আসনে বসিয়া পরম গম্ভীরভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—যথা,—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরণ যদমুষ্যরূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভি নবং দুরাপ-
মেকান্তধামযশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥"—

অর্থ,—মথুরাবাসিনী রমণীগণ বলিতেছেন—অহো! আমাদের কি কষ্ট! আমরা অতি অল্পপুণ্য। ব্রজগোপিনীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন যে তাঁহারা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণভগবানের অপরূপ এই মদনমোহন রূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণভগবান সর্ব্বলাবণ্যসার। ইঁহার তুল্য লাবণ্যশীল—অথবা ইঁহার অপেক্ষা অধিক লাবণ্যমান আর দ্বিতীয় কেহ নাই—এই পরম পুরুষটির লাবণ্য শ্রীঅঙ্গশোভা জনিত নহে—এ লাবণ্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ।

গৌর বিরহিণী প্রিয়াজি শ্রীরাধাবল্লভের রূপলাবণ্যের কথা কহিতে কহিতে কৃষ্ণপ্রেমভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। সখি কাঞ্চনা বুঝিলেন এই যে তাঁহার প্রিয়সখির কৃষ্ণভাবাবেশ—ইহাই তাঁহার পূর্ব্বলীলার ঐশ্বর্য্য ভাবাভাস। ইহাই তাঁহার প্রাণবল্লভের "মুঞি সেই—মুঞি সেই" ভাবের প্রচ্ছন্ন স্ফূর্ত্তি। তখন সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির তাৎকালিক ভাবোচিত শ্রীরাধিকার উক্তি বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত একটী প্রাচীন পদ তাঁহাকে শুনাইলেন। বৃষভানুনন্দিনী তাঁহার প্রিয়সখি ললিতাকে বলিতেছেন,—

—"এ সখি! কি পেখলু এক অপরূপ।
শুনইতে মানবি, স্বপন-স্বরূপ॥
কমল যুগলপর চান্দকি মাল।
তা পর উপজল তরুণ তমাল॥
তা পর বেড়ল বিজুরীক লতা।
কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখা শিখর সুধাকর পাঁতি।
তাহে নবপল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তা পর কীর, থির করু বাস॥
তা পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তা পর সাপিনী বেড়ল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিনী কহত নিদান।
পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রসভাণ।
সুপুরুষ-মরম তুহুঁ ভাল জান॥"*

পদকল্পতরু।

সখি কাঞ্চনা এই পদটী গাহিতে গাহিতে, কৃষ্ণ-রূপ-মাধুর্য্য-সাগরে যেন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছেন—তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িয়াছেন—শ্রোতাদ্বয় স্বয়ং গৌরবল্লভা ও সখি অমিতা—তাঁহারাও তদবস্থাপন্না—কে কাহারে দেখে?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে কহিয়াছেন—

---

* শ্রীমতী রাধিকা ললিতা সখির নিকটে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনচ্ছলে আপন হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। সখি! আজ স্বপনের মত কি এক অপরূপ রূপ দর্শন করিলাম তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। সেই নবীন নাগরের উভয় রাতুল চরণ যেন কমলযুগল-লাবণ্যপ্রভাময়, তাঁহার পদনখ সমূহ যেন চাঁদের মালা; সেই নবীন নাগরের নধর দেহখানি যেন তরুণ তমালকে বিদ্যুত লতা সদৃশ পীত বসন বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ তিনি পীতাম্বর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ধীরে ধীরে কালিন্দীর তীরে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার শ্রীহস্তের সমুজ্জ্বল নখাবলী শ্যাম তমালের শাখাগ্রে যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন বৃক্ষ শাখাগ্রে চাঁদের কিরণ ফুটিয়াছে। শ্যাম তমাল বৃক্ষে বিম্ব ফলের লতা পাতা উঠিয়াছে, তাহাতে দুইটী বিমল বিম্বফল সদৃশ সেই নবীন নাগরের ওষ্ঠাধর শোভা পাইতেছে। তাহার উপর শুক-চঞ্চু নাসিকা স্থির ভাবে আছে। শুকের আশা বিম্বফল ভক্ষণ করে। কিন্তু সে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। আশা মাত্রই সার। তাহার উপর এক জোড়া চঞ্চল খঞ্জন পক্ষী রূপ চপল নেত্রদ্বয় শোভা পাইতেছে। তাহার উপর বেণীর উপরিস্থিত ময়ূর পুচ্ছের চূড়া সর্পের উপর ময়ূরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এ বর্ণনায় সকলি আশ্চর্য্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য এই যে, নবীন তমাল তরুটী স্থাবর নহে, গতিশীল।

"কালিন্দী তীর চলু যাতা।"

শ্রীমতী রাধিকা সখীকে কহিতেছেন—সখি! কি যে দেখিলাম, কিছুত বুঝিতে পারিলাম না, কারণ ভাল করিয়া আবার যখন দেখিতে যাইলাম আমার সংজ্ঞা লোপ হইল। তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, তুমি পরম রঙ্গিনী সখি। বল দেখি আজ একি দেখিলাম!

পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি সখিভাবে উত্তর দিতেছেন—"বলিহারি সখি! তুমি এত রসও জান। বেশ বুঝা গেল, তুমি এখন সুপুরুষের মর্ম্মজ্ঞানে সুপণ্ডিতা হইয়াছ।" শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ বর্ণনে অতিশয়োক্তি ও বিরোধাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হইবে। কিন্তু শ্রীমতী রাধিকার অনুরাগ কল্পনায় পদকর্ত্তা সাধকশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ঠাকুর কবিত্বের যে উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, তাহা রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

"সনাতন! শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন,—

—"না দিলেক লক্ষকোটি, সবে দিলেক দু'টি আঁখি,
তাতে দিলে নিমেষ আচ্ছাদন।
বিধি বড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন,
বিধির ইচ্ছা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

মহাভাবময়ী গৌর-বল্লভা কিছুক্ষণ পরে নিজ ভাব সম্বরণ করিয়া পরম প্রেমভরে সখি কাঞ্চনার হস্ত দু'খানি নিজ হস্তে ধারণ করিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"সখি! প্রিয় সখি! কৃষ্ণরূপ বড়ই অপরূপ—কৃষ্ণকথা বড়ই মধুর—মধু হইতেও ইহা মধুর। সখি! তোমার মুখে গৌররূপের অপূর্ব্ব বর্ণনা শুনিয়া—অপূর্ব্ব গৌরকথা শুনিয়া আমার গৌর-বিরহ-তাপিত-হৃদয় সুশীতল হইয়াছে—কিন্তু তোমার মুখে আমার প্রাণবল্লভের অতিশয় প্রিয় মধু হইতেও মধু কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলা-কথা অধিক শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। সখি কাঞ্চনে! আজ তুমি কিছু কৃষ্ণকথা কহিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর—আমার প্রাণবল্লভ,—তোমাদের নদীয়ার নাগর গৌরসুন্দর কৃষ্ণকথা বড় ভাল বাসিতেন এবং কৃষ্ণনাম করিতে সকলকে উপদেশ দিতেন।"—

গৌর-বল্লভা আজ স্বয়ং কৃষ্ণ-কথা তুলিয়াছেন,—তিনি জানেন তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার একটী নাম "কৃষ্ণ-পাগলিনী"—এই নামটী তাঁহার প্রাণবল্লভই তাঁহার প্রিয় সখিকে দিয়াছিলেন। প্রিয়াজি কৃষ্ণকথার অবতারণা করিবামাত্র কৃষ্ণ-পাগলিনীর হৃদয়ে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়াছে—প্রিয়াজির মত সুচতুরা সর্ব্বজ্ঞার তাহা বুঝিতে আর কতক্ষণ লাগে। তিনি আর যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-কথা-রসাস্বাদন করিলেই কৃষ্ণ-পাগলিনী সখি কাঞ্চনার হৃদিস্থিত কৃষ্ণ-কথার অফুরন্ত উৎস ফুটিয়া উঠিবে—এই ভাবিয়া গৌর-বল্লভা আর একটী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—যথা—

"কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥"

এই শ্লোকটী ব্রজগোপিনীর উক্তি—রাসলীলার শ্লোক। ইহার অর্থ—মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ-মাধুরী যে লাবণ্য-সার—সেই কথা তুলিয়াই ব্রজগোপিনী কৃষ্ণাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"হে অঙ্গ! তোমার যে অপরূপ রূপ দেখিয়া এবং মধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া গো পক্ষী বৃক্ষ মৃগ পর্য্যন্ত পুলক ধারণ করে, ত্রিলোকে এমন স্ত্রী কে আছে যে তোমার সেই কলপদায়ত বেণুগীতে সম্মোহিতা হইয়া, এবং তোমার সেই ত্রৈলোক্যসৌভগ অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়?

শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্যামসুন্দরের বাঁশীর কথা শুনিতেই কৃষ্ণপাগলিনী সখি কাঞ্চনার কর্ণে যেন কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি ধ্বনিত হইল—তিনি তখন কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পরম প্রেমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের বেণু-মাধুর্য্যের মহিমাব্যঞ্জক একটী বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—যথা—ব্রজগোপিনীর উক্তি,—

যথারাগ।

—"কি কহব রে সখি! ইহ দুঃখ ওর।
বংশী-নিশ্বাস পরশে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনুমন লাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥
গুরুজন সমুখই ভাব-তরঙ্গ।
যতনে হি বসনে ঝাঁপিত সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণে চলিল গৃহ মাঝ।
দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনুমন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহ ধন্দ॥"—

পদকল্পতরু।

আজ সখি কাঞ্চনার যেন স্ব-স্বরূপের পরিপূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে—তিনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার সখি ললিতার বিশিষ্ট আবির্ভাব। স্ব-স্বরূপে তিনি আজ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের বেণু-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন,—তিনি আজ তাঁহার "কৃষ্ণপাগলিনী" নাম সার্থক করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিই তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-রস-সীমা। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্য-সার দিয়াই যেন বংশীর এই কলধ্বনি সৃষ্টি হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের বংশী কলধ্বনি কামবীজের প্রস্ফোরক—সুতরাং এই বংশীধ্বনিই ব্রজগোপিনী-গণের কৃষ্ণপ্রেমের মূলমন্ত্র।

এই বেণুমাহাত্ম্যগান শ্রবণ করিয়া প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন ভক্তকবিগণ পরমানন্দ পাইয়াছেন—যথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—

—"শুনিলে বেণুর রব, বন মাঝে ধেনু সব,
মাথা তুলি ব্যাকুল নয়নে।
ইতি উতি ফিরে চায়, তৃণ পত্র নাহি খায়,
ছুটে যায় শ্যাম দরশনে॥
যমুনা উজানে বয়, ধ্যানে চিত নাহি রয়,
যোগী ঋষি মুনি ছাড়ে ধ্যান।
শাখী-শাখে বসি পাখী, মুদিয়া থাকয়ে আঁখি,
নিচল নীরব আগেয়ান।
সতী ছাড়ে নিজ পতি লজ্জা ত্যজে কুলবতী,
খুলে যায় নীবির বন্ধন।
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভালমন্দ কর্ম্মাকর্ম্ম,
ক্ষুণ্ণ হয় সকল নিয়ম॥
মৃত দেহ পায় প্রাণ, মুক করে বেদগান,
শুষ্ক তরু শোভে কিশলয়ে।
সুগন্ধি মঞ্জরী ফোটে, গুঞ্জরি ভ্রমরা যোটে,
মাতে তারা মকরন্দ পিয়ে॥
ঘন ঘোর বরষায়, বসন্ত বহিয়ে যায়,
পিক-বধূ গায় কলতানে।
জরাজীর্ণ দেহ মাঝে, নবরসে প্রাণ রাজে,
শ্যামের বাঁশরী-সুধা-গানে।"—

এমন যে অপূর্ব্ব বস্তু বংশী—সেই বংশীধারী বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ-লাবণ্যের কথা কহিতে কহিতে ললিতার বিশিষ্ট আবির্ভাব সখি কাঞ্চনা আজ পূর্ব্বলীলারসে আত্মহারা হইয়া প্রেমাবেগে কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা সমুদ্রে একেবারে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। গৌরবল্লভাও স্ব-স্বরূপে এবং স্বীয় পূর্ব্বভাবে শ্রীকৃষ্ণ-রূপরসমাধুর্য্য-রস পান করিতেছেন এবং তাঁহার বংশীধ্বনির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে প্রেমাশ্রুপাত করিতেছেন। প্রিয়াজি মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ-রূপ-লাবণ্যসার মধুর বংশীধ্বনির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে টুঙ্কার মাত্র দিতেছেন,—তাঁহার সেই টুঙ্কারের ফলে সখি কাঞ্চনার হৃদিস্থিত পূর্ব্বলীলার কৃষ্ণ-প্রেমরসোৎসের মুখ খুলিয়া যাইতেছে—সেই যে অফুরন্ত উৎস—তাহার প্রেমোচ্ছ্বাস ও প্রেমোদ্গীরণ-ভঙ্গী দেখিয়া প্রিয়াজির এবং সখি অমিতার হৃদয় প্রেমানন্দে পরিপূরিত হইয়াছে। গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদি-সমুদ্রে আজ কৃষ্ণপ্রেমরস-তরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে—তাহাতে তাঁহার মনপ্রাণ উদ্বেলিত করিতেছে—তিনি তখন শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ রচিত বিদগ্ধমাধব নাটকের বংশী-মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একটী উত্তম শ্লোক আবৃত্তি করিলেন,—যথা,—

—"রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতি পরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দন-মুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসঃ।
উৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘুর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥"—

অর্থাৎ এই যে শ্যামের বাঁশী, ইহা গগনচারী মেঘ সমূহের গতিরোধ করিতে পারে—তুম্বুরু বাদ্যের চমৎকারিতা সম্পাদন করিতে পারে—সনক সনন্দাদির সমাধিভঙ্গ করিতে পারে—বিশ্ববিধাতার বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারে—ঔৎসুক্য উৎপাদনে বলিরাজের মনে ব্যাকুলতা জন্মাইতে পারে—নাগরাজ অনন্তদেবের মস্তক বিঘূর্ণন করিতে পারে এবং ইহা ব্রহ্মাণ্ড কটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণশীল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির এইরূপ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য।

এই শ্লোক শ্রবণমাত্র কৃষ্ণপাগলিনী সখি কাঞ্চনার কর্ণে যেন অকস্মাৎ শ্যামের সেই অপূর্ব্ব সর্ব্বচিত্তাকর্ষক এবং প্রেমানন্দবর্দ্ধক বংশীধ্বনি প্রবেশ করিল—তিনি যেন স্বচক্ষে দেখিতেছেন ভজন-মন্দির মধ্যে ঐ যে গৌর-বল্লভাসেবিত বংশীধারী শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দজিউর পটমূর্ত্তির শ্রীহস্তের বংশী—তাহাই যেন সেই অপূর্ব্বভাবে ধ্বনিত

হইল—তখন সখি কাঞ্চনার হঠাৎ মনে পড়িল গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির পূর্ব্বকথিত সেই মধুর গানটি—

—"সজনি তোরা শুন্‌বি যদি আয়।
পরাণ বঁধুয়া মোর মুরলী বাজায়॥
হেথা শুয়ে ছিনু আমি, আচম্বিতে ধ্বনি শুনি,
ভজন-মন্দিরে মোর কে বাঁশী বাজায়।"—

সখি কাঞ্চনা দেখিতেছেন ঐ যে শ্রীপটমূর্ত্তির হস্তে বংশী উহারই রন্ধ্রে শ্রীবদন দিয়া গৌরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই মধুরস্বরে বংশী বাদন করিতেছেন। তখন তাঁহার সেই প্রাচীন পদটি স্মরণ হইল—জগাই বলিতেছেন মাধাইকে—

—"মাধা! দেখরে এত শুধু গৌর নয়।
গোরারূপের মাঝে মাঝে কালবরণ ঝলক দেয়"।—

তখনি আবার সখি কাঞ্চনার মানস সরোবরে অন্য একটী ভাবতরঙ্গ উত্থিত হইল—তিনি মনে মনে গানের ধুয়া ধরিলেন—

—"সখি! দেখ দেখ, এত শুধু কাল নয়।
কাল-রূপের মাঝে মাঝে গৌর-বরণ ঝলক দেয়॥"—

সখি কাঞ্চনা নিজ মনের ভাব মনেই রাখিলেন—তাহা আর প্রকাশের প্রয়োজন মনে করিলেন না। তিনি শ্যামসুন্দরের বাঁশির মধুর ধ্বনিও শুনিয়াছেন—এবং গৌরসুন্দরের খোল করতালের মধুর ধ্বনিও শুনিয়াছেন—এই দুই ধ্বনিও এক বস্তু অদ্বয় তত্ত্ব। শ্যামসুন্দরের বংশীনিনাদে ব্রজবালাবৃন্দ আকুল-প্রাণে সঙ্কেত-স্থান নিভৃত কুঞ্জে গমন করিতেন—আর গৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত খোল-করতাল-ধ্বনিতে নদীয়া-নাগরীবৃন্দ তাঁহাদের সঙ্কেত-স্থান সঙ্কীর্ত্তন মহারাসস্থলীতে গমন করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনের রাসস্থলী এবং নদীয়ার সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী এক বস্তু, এক তত্ত্ব। এই বংশীধ্বনি আর খোল-করতাল ধ্বনিই শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজজন আকর্ষণের মহামন্ত্র।

সখি কাঞ্চনা এই সর্ব্বচিত্তহারক বংশীধ্বনি এবং খোল-করতাল-ধ্বনি দ্বয়ের তত্ত্ব বুঝিয়াই প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়াছেন। তখন ভাবাবেশে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীচিত্রপটের প্রতি চাহিয়া তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস ঠাকুরের রচিত আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"হেদে হে মুরলীধর! না বাস আপন পর,
হাসিয়া কহ না এক বোল।
যে ছিল মনের সিদ্ধি, তাহা পুরাইল বিধি,
মিটে গেল মনের সে গোল॥
মধুর মধুর ধ্বনি, গাও নিজে গুণমণি,
নিজ মুখে শুনিতে মধুর।
কি জানি কি গাও গুণে, বিষভরি মুখ খানে,
শুনিলে দংশয়ে হিয়া মোর॥
যেমন ভুজঙ্গগণ, করিলেই দংশন,
চেতন গেয়ান নাহি থাকে।
তেমতি তোমার বাঁশী, কুল নাশে হাসি হাসি,
দংশন করয়ে আসি বুকে॥
কভু বাঁশী প্রেম-ধারা, কভু বা ভুজঙ্গ পারা,
গরল সমান হয় কাণে।
কেন বা এমন হয়, অবলা প্রাণে কি সয়,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভাবি ভণে॥"—

পদকল্পতরু।

সখি কাঞ্চনার মুখে শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন বেণু-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া গৌরবল্লভার মনে পূর্ব্ব-চরিত-কথা এবং পূর্ব্ব-লীলা-স্মৃতি সকল উদয় হইতেছে। তিনি পরম প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া সখি কাঞ্চনার গলদেশে নিজ বাহুদ্বয় বেষ্টন করিয়া প্রেমাবেশে কানে কানে কহিলেন—"প্রাণসখি কাঞ্চনে! বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার বংশী-শিক্ষা-লীলাটি সমগ্র গান কর"—সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! একথাটি এত গোপনে বলিবার প্রয়োজন কি? এখানে আর ত কেহ নাই—তুমি, আমি ও অমিতা,—আমাদের সঙ্গে এত লুকাচুরি-ভাব কেন সখি!" স্বভাব-গম্ভীরা এবং স্ব-স্বরূপ-ছন্নপ্রিয়া গৌর-বল্লভা কিয়ৎক্ষণ আনমনা রহিলেন,—পরক্ষণেই তিনি নিজ ভাব সম্বরণ করিয়া সখি কাঞ্চনাকে পুনরায় কানে কানে কি কহিলেন, সখি কাঞ্চনার বদনে তখন হাসির রেখা দেখা দিল—তিনি পরম প্রেমানন্দে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনীর ভাবে স্ব-স্বরূপে শ্রীরাধার বংশীশিক্ষা লীলাগানের পালাটি সমগ্র গাহিলেন। নীলাচলের গম্ভীরা-লীলায় স্বরূপ দামোদর ললিতা সখির ভাবে বিভাবিত হইয়া এই অপূর্ব্ব লীলাকথাগুলি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন। এখানে সেই ললিতা সখির বিশিষ্ট আবির্ভাব সখি কাঞ্চনা স্ব-স্বরূপে সেই

গানই গাহিতেছেন—ইহার শ্রোতা স্বয়ংভগবতী মহাভাব স্বরূপিণী বৃষভানু-নন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রোতা ছিলেন স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিশিষ্ট আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু। উভয় ক্ষেত্রেই অদ্বয়-জ্ঞানলক্ষণ মূর্ত্তিমান শক্তিমৎ পরতত্ত্ব এবং তাঁহার মূর্ত্তিমতী পরাশক্তি তাঁহাদের পূর্ব্ব-লীলা-রসাস্বাদন করিতেছেন।

সখি কাঞ্চনা তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের অদ্ভুত বংশী-শিক্ষা-লীলারঙ্গের পালাটির অভিনয় আরম্ভ করিলেন। এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি পূজ্যপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুর ব্রজরসরসিক ভক্তদিগের আস্বাদনের জন্য পদ লিখিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন। এই কৃতীত্বের নাম বিদ্বৎ অনুভব *। শ্রীভগবানের লীলাসকল ভক্তের অনুভব-বেদ্য—সিদ্ধ রসিক ভক্তকবি চণ্ডীদাস ঠাকুরের ধ্যানপ্রসূত এই অদ্ভুত বংশীশিক্ষালীলারঙ্গটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া রসিক কৃষ্ণভক্ত এই সিদ্ধকবি মহাজনটিকে অমর করিয়া গিয়াছেন—আজ গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার প্রাণবল্লভের আস্বাদিত সেই অপূর্ব্ব লীলারসাস্বাদন করিতেছেন।

সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে এই অপূর্ব্ব লীলাগানের ধুয়া ধরিলেন প্রথমেই—

যথারাগ।

—"রাই বাম করে, নাগর শেখরে,
ধরিয়া লইল কুঞ্জে।
বসো ধনি রাধে, মুরলী শিখাব,
এই যে কুটীর কুঞ্জে॥
হরষবদনী, ও মৃগনয়নি,
কহেন হাসিয়া রসে।
দেহ করে বাঁশি, ধনী কহে হাসি,
বৈঠহ আমার পাশে॥
যেমতি বাজাও, মধুর মুরলী,
তেমতি শিখাও মোরে।
শিখালে মুরলী, যা' চাহ তা' দিব,
অধীন হইব তোরে॥
ছাড়ি খল-পনা, খলের স্বভাব,
শিখাও মুরলী গুণে।
হাসি রস-পানে, শিখাব যতনে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥"—

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি কৃষ্ণলীলাকথা শুনিতেছেন তাঁহার মর্ম্মীসখি কাঞ্চনার মুখে—তাঁহার প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণলীলারসে মগ্ন রহিতেন—কৃষ্ণলীলাকথা তাঁহার প্রাণ ছিল। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার এই জন্য কৃষ্ণকথা বড় ভাল লাগিতেছে—তিনি রাস-রসিকা-শ্রেষ্ঠা—মধুর রসাস্বাদনে তাঁহার পরমা রতি। তিনি সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"সখি! তার পর রসিকেন্দ্র চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র কি বলিলেন।" সখি কাঞ্চনা অমনি পরবর্ত্তী একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—রসিক নাগর বলে "শুন বিনোদিনী।
তোমারে শিখাব বংশী—আমি ভাল জানি॥"—

---

* ভক্তের ভগবানকে জানিবার যত কিছু উপায় সাক্ষাতে থাকিলেও ভক্তগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন না, কিন্তু ভগবান্ নিজেও যখন আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন। তাঁহার ভক্তগণের নিকট ভগবান কোন মতেই আত্মগোপন করিতে সমর্থ হন না। ভক্তিদেবীর কৃপায় ভক্তের এমনই প্রভাব। এই ভক্তি দেবী শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি এবং তিনি—সাধ্যবস্তু।

এইরূপ যে অনন্যশরণ ভক্তের অনুভব তাহার নাম—"বিদ্বৎ-অনুভব"। ভগবত্তত্ত্ব ও ভগবল্লীলানুভবের একমাত্র হেতুই ভক্তি। ভক্তিদেবী শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি—সেই ভক্তিদেবীর কৃপা ভিন্ন ভগবদনুভব কিম্বা ভগবল্লীলানুভব একেবারেই অসম্ভব। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহ মেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্"। ভক্তি দেবীর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছেন বলিয়াই ভক্তের ভগবান লুকাইয়া থাকিলেও ভক্ত তাঁহাকে জানিতে পারেন—তাঁহার গুপ্ত অপ্রাকৃত অদ্ভুত-পূর্ব্ব লীলারঙ্গ সমূহও ভক্তের অবিদিত থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিপিত শ্লোকে এইরূপ অনন্যভক্তের কথা লিখিত আছে যথা,—

—"উল্লঙ্ঘিত ত্রিবিধ-সীম-সমাতিশায়ী
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম স্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি-নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং-ত্বদনন্যভাবাঃ॥"—

অর্থ। হে ভগবন? যাহা দেশ কাল ও পরিমাণ—এই ত্রিবিধ সীমার অতীত—যাঁহার সমানও কেহ নাই—যাঁহাপেক্ষা অধিকও কেহ নাই—এবং স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে যাঁহাকে তুমি সর্ব্বদা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ—তোমার সেই প্রভুত্বের স্বরূপকে তোমার কোন কোন অনন্যভক্ত সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন।

সেই অনন্য ভক্তজন যে শ্রীভগবানের নিগূঢ় লীলারঙ্গ দর্শন করিবেন—ইহাতে বিচিত্র কি? বিদ্বৎ-অনুভব তাঁহাদেরই অনুভব,—ইহা যে সে লোকের অনুভব নহে। গ্রন্থকার।

তখন—রাধা কহেন "কুটিল ছাড়িতে যদি পার।
তবে গুণ শিখাইবে কিছু, বংশীধর॥"—
তারপর—কানু বলে "কুটিল যে জানিলে কেমনে।
ধর বাঁশী কহে হাসি শিখাই যতনে॥"—
তখন—রাই কহে "বিনোদ নাগর রসময়।
ভালমতে শিখাইবে আমার মনে হয়॥"—
তখন কৃষ্ণচন্দ্র—
করেতে মুরলী দিল হাসিয়া হাসিয়া।
মনের হরিষে বাঁশী শিখায় বসিয়া॥
তারপর—কানু কহে "শুন ধনী আমার বচন।
ত্রিভঙ্গ ভাবেতে কর চরণ স্থাপন॥
চরণে চরণ বেড়ি দাঁড়াও ভঙ্গিমে।
অঙ্গুলি ঘুরাও রাধা বলে ঘনশ্যামে॥
কহে চণ্ডীদাস বড় অপরূপ বাণী।
চূড়া বান্ধি মুরলী শিখিবে বিনোদিনী॥"—

কৃষ্ণ-বল্লভার প্রেমরস সম্ভোগের এই আসন্ন বিপদ বুঝিয়া গৌর-বল্লভা মনে মনে বড়ই হাসিলেন—বৃষভানু-নন্দিনীকে পুরুষের মত হইয়া—শুধু পুরুষ নহে—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মত হইয়া সেই ভাবে সেই ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ভাবে দাঁড়াইয়া চরণে চরণ দিয়া বাঁশী বাজাইতে হইবে—এ যে মহা বিপদ! স্ত্রীলোকে কি তা পারে? প্রিয়াজির মনে মনে তখন এই ভাব-তরঙ্গটি উঠিল।

সখি কাঞ্চনা গৌর-বল্লভার মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন—"সখি! প্রিয় সখি! রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরালির সীমা নাই—তিনি আরও কি বলিলেন তাহাও শ্রবণ কর।" এই বলিয়া আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"নাগর চতুরমণি, কহেন একটি বাণী,
শুন শুন সুকুমারী রাধে।
দাণ্ডাইতে শিখ আগে, তবে সে ভালই লাগে,
তবে বাঁশী শিখাইব সাধে॥
ধরহ আমার বেশ, আরোহ চরণ শেষ,
পদের উপরে দেহ পদ।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রও, বাঁশী সনে কথা কও,
বাঁশী গাও হইয়া আমোদ॥
শুনিয়া আনন্দ বড়ি, সে নবকিশোরী গৌরী,
ত্রিভঙ্গিম ভঙ্গিম সুঠাম।
ধরিয়া রাধার করে, নাগর রসিকবরে,
অঙ্গুলি ঘুরাইতে শিখান॥
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে অঙ্গুলি, শিখাইছে বনমালী,
দেহ ফুকু সুকুমারী রাধা।
বাজাহ মধুর তান, মন্দ মন্দ কর গান,
তিলেকেও নাহি কর বাধা॥
হাসি কহে সুবদনী, এবে কি শিখিব আমি,
অলপে অলপে যদি পারি।
কহেন রসিকরাজ, তুমি বুঝি পাবে লাজ,
চণ্ডীদাস যায় বলিহারী॥"—

গৌর-বল্লভার অন্তর আজ ব্রজভাবে গর গর—নীলাচলে বসিয়া ব্রজরস-মাধুরী আস্বাদন করিতেছেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ দুইটী মর্ম্মী ভক্ত সঙ্গে,—আর শ্রীনবদ্বীপে বসিয়া সেই ব্রজ-রস-মাধুরীই আস্বাদন করিতেছেন গৌর-বল্লভা দুইটী মর্ম্মী অন্তরঙ্গা সখি সঙ্গে। ব্রজ-রস-মাধুরী আর নবদ্বীপ-রস-মাধুরী এক বস্তু—একতত্ত্ব,—মাত্র আস্বাদনের বিশেষত্ব। আস্বাদক দুই জনে অদ্বয়তত্ত্ব—কিন্তু আস্বাদনের বিশেষত্বেই তাঁহাদের বিশিষ্ট আবির্ভাবের পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

গৌর-বল্লভা ব্রজরসমাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে আজ যেন একেবারে ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাই হইয়াছেন—তাঁহার ব্রজরসে তন্ময়ত্বভাব দেখিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় আজ তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই দেখিতেছেন। আবার নীলাচলেও ঠিক সেই ভাবেই রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভুকে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদ্বয় ঠিক শ্রীরাধাই দেখিতেছেন। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে দুইস্থানে দুইটী রাধা স্বরূপের ব্রজরসমাধুরী আস্বাদন কি করিয়া সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে শ্রীরাধিকার স্বরূপ একই—কিন্তু তাঁহার ভাব লীলাভেদে স্বতন্ত্র—নীলাচলে ভাবাঢ্য গৌরাঙ্গ রাধাভাবে ব্রজরস আস্বাদন করিতেছেন—আর শ্রীনবদ্বীপে স্বয়ং বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার বিশিষ্ট আবির্ভাবরূপে সেই ব্রজরসই আস্বাদন করিতেছেন। এখানে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের স্বরূপশক্তি স্ব-স্বরূপেই অবস্থিত এবং স্বীয় কুঞ্জেই অধিষ্ঠিত আছেন—আর নীলাচলে ভাব-

রূপিণী তিনিই মহাভাবস্বরূপা হইয়া শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে তাঁহাকে শ্রীরাধিকা স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

যাহা হউক তাত্বিকগণ তত্বের মীমাংসা করুন—আমরা লীলা-রসাস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হই।

সখি কাঞ্চনা তখন বংশী-শিক্ষা-লীলার পরবর্ত্তী পদ-রত্নটির ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই মুরলী মধুর পুর,
শুনি যেন শ্রবণ পূরিয়া।
দেহ ফুঁক ধীরে ধীরে, অঙ্গুলি নাড়হ রাধে,
তাহা শ্যাম দিছে দেখাইয়া॥
রাই! হের দেখ চাহি মোর পানে,—
রন্ধ্রে রন্ধ্রে "ও"রা ধ্বনি, করের অঙ্গুলি ঢাকা,
প্রথম রন্ধ্রেতে কর গানে॥
এ বোল শুনিয়া রাই, শ্যাম মুখপানে চাই,
ফুঁক দিল সব রস গান।
না উঠে কোনও গান, ফুঁক ফুঁক পড়ে যেন,
হাসি কানু না করে ধরণ॥
পুন কহে সুনাগর, শুনহে নাগরী গৌরী,
নহিল নহিল এনা গান।
পুন দেহ দৃঢ় ফুঁক, বাড়ুক অনেক সুখ,
পুনঃ ধনি পূরহ সন্ধান॥
কানুর বচন শুনি, বৃষভানুনন্দিনী,
কহে রাই বিনয় বচনে।
প্রথম মুরলী-শিক্ষা, কেবল হয়েছে দীক্ষা,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে॥"—

সখি কাঞ্চনা গৌর-বল্লভার বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আপন মনে ব্রজরসে তন্ময় হইয়া গান করিতেছেন—তিনি সুস্পষ্ট দেখিতেছেন আজ যেন পূর্ব্বলীলার অপূর্ব্ব লীলাময়ী বৃষভানুনন্দিনী বংশী-শিক্ষা-লীলা-ভাবময়ী সেই অপরূপ কৃষ্ণমনমোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে সেই অপূর্ব্ব বংশীশিক্ষা-লীলাই প্রকট করিতেছেন। তিনি তন্ময় হইয়া পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"পুনরপি রাই, মুরলী বাজাই,
উঠিল একটী ধ্বনি।
প্রথম সন্ধান, উঠিল যখন,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ উঠে বাণী॥
কহে শ্যাম পর, বাজে অপস্বর
না উঠল রাধা নাম।
আগে কহ ধ্বনি রাধা নাম শুনি,
তবে সুধা অনুপাম।
তবে হাসি ধনি, রাজার নন্দিনী,
কহিছে কানুর কাছে।
মুরলী শিখিতে, বড় সাধ আছে,
শিখাও আর যে আছে॥
তুমি গুণমণি, গুণের সাগর,
আমি যে অবলা জনে।
মুরলী শিখালে, যাহা চাহ দিব,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥"—

তখন কি হইল, কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সখি কাঞ্চনার মুখে তাহা শ্রবণ করুন। সখি কাঞ্চনা তন্ময় হইয়া গান গাহিতেছেন—আর যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন—

যথারাগ।

—"দুহুঁ বাহে মধুর মুরলী।
অপরূপ দুহুঁ রস-কেলি॥
এক রন্ধ্রে দুজনে বাজায়।
রাধা-কৃষ্ণ নাম উঠে তায়॥
রাই কহে শুন নাগর কান।
পুরল মনের অভিমান॥
সাধ ছিল শিখিতে মুরলী।
তাহাও শিখালে বনমালী॥"—

বংশী-শিক্ষা-লীলায় শ্রীরাধিকার উক্তি ইহার পরের পদটী এই লীলাবর্ণনের প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হইয়াছে—যথা—

—"হেদে হে মুরলি ধর, না বাস আপন পর
হাসিয়া কহ না এক বোল।
যে ছিল মনের সিদ্ধি, তাহা পুরাইল বিধি,
মিটে গেল মনের সে গোল॥ ইত্যাদি

কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ সেই পদটি এখানে

আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হউন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভা এই পদটিতে তাঁহার প্রাণবল্লভকে বলিতেছেন—হে নাগরবর! তোমার বাঁশীর কি গুণ জানি না—কখন ইহা মুখে বিষ উদ্গীরণ করে—কখন সেই মুখেই প্রেমধারা বর্ষণ করে—এমন কেন হয় বল দেখি প্রাণবঁধু!" ইহার উত্তরে মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন তাহাও শুনুন—

—"হাসিয়া নাগর, চতুর শেখর,
রাধারে তখন বলে।
কহিল সকল, তোমার গোচর,
বাঁশীর বচন ছলে॥
কখন কখন, বাজয়ে কেমন,
কখন মধুর সম।
কখন কখন, গরল সমান,
গাইতে ঘটে গো ভ্রম।
কোন অভিলাষে, বাজয়ে কেমন,
না বুঝি ইহার রীত।
মধুর মধুর, বাজয়ে সুস্বর,
কত না আনন্দের গীত॥
বাঁশী পরবশ, নহে নিজ বশ,
কখনো সে নহে ভাল।
বাঁশীর চরিত, বুঝিতে না পারি,
তুমি বা কি আর বল॥"—

সখি কাঞ্চনার বংশী-শিক্ষা-পালা-গান শেষ হইল—রাত্রিও তৃতীয় প্রহর অতীত হইল,—এতক্ষণ সময় যে কোথা দিয়া গেল তিন জনে কেহ কিছুই জানিতে পারিলেন না। সখি অমিতা ও প্রিয়াজি শ্রোতা—আর সখি কাঞ্চনা গায়িকা—শ্রোতাদ্বয় যতক্ষণ গান শুনিলেন, ততক্ষণ একটি কথাও কহিলেন না। গান শেষ হইলে—অর্থাৎ শ্রীরাধিকার বংশীশিক্ষা-লীলারঙ্গ শেষ হইলে গৌর-বল্লভা সখি অমিতার প্রতি ব্রজরস-বিভোর করুণ কমল নয়নে চাহিয়া রাই কানুর ইহার পরবর্ত্তী লীলারঙ্গ গান করিতে যেন ইঙ্গিৎ করিলেন। সখি অমিতা সরমে যেন মরমে মরিয়া গেলেন এবং মস্তক নাড়িয়া করযোড়ে ইহাতে যেন তাঁহার অসম্মতির ভান করিলেন। কিন্তু ব্রজরস-বিহ্বলা প্রিয়াজি যখন তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন, তখন তিনি কি করেন—অগত্যা ধীর ললিত মধুর সুরে সময়োচিত গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

"রাইক বেশ বনাওত কান।
কাজরে উজোর করল নয়ান॥
চিবুকহি দেয়ল মৃগ-মদ-রেখ।
চরণ-যুগলে করু যাবক-লেখ॥
উর পর করল—সুকুঙ্কুম সাজ।
সিন্দুর দেওল—সীঁথক মাঝ॥
তাম্বুল সাজি দেওল ধনি মুখে।
হেরই শ্যামদাস মন সুখে॥"—

পদকল্পতরু।

সখি অমিতা গম্ভীরা প্রকৃতি হইলেও অত্যন্ত সুরসিকা—এবার তিনি বিশিষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন,—এ সুযোগ ও সৌভাগ্য তিনি ছাড়িবার পাত্রী নহেন। ব্রজরসরসিক গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির তাৎকালিক মনোভাব বুঝিয়াই তিনি আপনভাবে ও আপন মনে রাই কানুর সম্ভোগ রসের একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"শ্যামর-চন্দ উতাপিত অঙ্গ।
হেরি বর-নাগরী অতিহুঁ সশঙ্ক॥
কঠিন মানি হিয়ে কাঁচুলী-ডারি।
তাহি নিবারল ভূধর-ধারী॥
সুকঠিন দরপক দুরন্তর কাজ।
মানি সুকামিনী পরিহরু লাজ॥
কর দেই ঠেলহ নয়নক বারি।
অধরে অধর দেই চুম্বই অপারি॥
পাই পরমরস অতিহুঁ উদণ্ড।
শ্যাম শীতকারই পুলকিত গণ্ড॥
দুহুঁ মন মনোভব-তরঙ্গ বিথার।
দুহুঁ জন ভুলন সহজ বিচার॥
কো কি কর ইহ নহত নিতান্ত।
অতুল উলসিত হেরি কৃষ্ণকান্ত॥"—

পদকল্পতরু।

গৌর-বিরহিণী নিজ বসনাঞ্চলে বদন ঝাপিয়া পরম প্রেমানন্দে অঘোর নয়নে ঝুরিতেছেন আর ব্রজরসাস্বাদন করিতেছেন—সখি অমিতার আজ ভাগ্য সুপ্রসন্ন—আজ তাঁহার হৃদিস্থিত পূর্ব্বলীলার ব্রজপ্রেমরস ভাণ্ডারের চাবি

খুলিয়া দিয়াছেন—স্বয়ং ব্রজেশ্বরী রসবতী গৌর-বল্লভা। সখি অমিতার আজ মুখ খুলিয়াছে—ইহাতে সখি কাঞ্চনার পরমানন্দ—তিনিই এই মহাগম্ভীরা-মন্দিরে ব্রজরস-সম্ভারের অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের সৃষ্টিকর্ত্রী,—পূর্ব্বে তিনিই ইহার মূলমন্ত্র গাহিয়াছেন—এখন সখি অমিতা শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ-সম্ভোগ-লীলা-রস-মহাযজ্ঞে প্রেমের পূর্ণাহুতি দিতেছেন। সখি অমিতা পুনরায় একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ—বিহাগড়া।

—"শীতল সমীর, বহত অতি মৃদুতর,
অলিকুল ফুল পরি গেল।
অগুঞ্জ সবহুঁ, কবহুঁ ঘন বোলত,
শচীপতি-দিগ অরুণ রুচি ভেল।
সখি হে দারুণ বিহিক বিধান।
এ হেন লেহ, সিরজি পুন অনুচিত,
রজনী শেষ নিরমাণ॥ ধ্রু॥
দুলহ সমিলন, বিবিধ বিলাসহি,
দুহুঁ তনু দুহু নাহি তেজে।
রসভরে সো পুন, অতি অবশায়িত,
অবহি নিধারল শেজে॥
অলসক আধ, ভোগ নাহি পুরলি
কৈছে জাগাওব তায়।
কহে কৃষ্ণকান্ত, নিতান্ত পুন ঐছন,
দারুণ গুরুজন দায়॥—

পদকল্পতরু।

সখি কাঞ্চনা অমিতার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন—আর সখি অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজির বদনের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব্ব নয়নভঙ্গী-করিয়া গান করিতেছেন—প্রিয়াজির বদন কিন্তু অঞ্চলে ঝাঁপা—তাঁহার নয়নে ঝর ঝর প্রেমাশ্রুধারা—মধ্যে মধ্যে সেই অবগুণ্ঠিত প্রফুল্ল বদনখানি তিনি এক একবার আপন মনে তুলিতেছেন,—আর সখি অমিতার বদনের প্রতি করুণনয়নে চাহিতেছেন—চোখোচোখি হইলেই বিরহিনী-প্রিয়াজি পুনরায় তাঁহার বদনখানি অবনত করিতেছেন। কৃষ্ণপাগলিনী সখি কাঞ্চনা সকলি দেখিতেছেন,—আজ তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা নাই।

বিশাখার বিশিষ্ট-আবির্ভাব সখি অমিতা ব্রজরসগান সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন—তিনি স্ব-স্বভাবে গান গাহিয়া যাইতেছেন—তিনি আর একটী প্রাচীন কুঞ্জভঙ্গ-পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ ললিত।

—"প্রাতহিঁ জাগল, রাধা মাধব
মন্দির গমন বিধানে।
করহ বিদায় অব- শেষ রজনী ভেল
অব পরণাম তুয়া চরণে॥
দুলহ বচন শ্রবণে কানু কাতর
জল পুরল দুহুঁ নয়ানে।
হিয়া দগদগি কছু, কহই না পারই
হেরি রহু রাইক বয়ানে॥
না তেজই কান্থ পাছ অনুসারই
আগোরহি গহি বহু বসনে।
পুন ধরি যতনে, রাই সমুঝায়ই
কুল শীল গেল অভিমানে॥
লাজ ডুবল হঠ, না করহ ঐছন,
যৈছনে লোকে না জানে।
রায় বসন্ত কহ হঠ ছোড়ি গমন কর
না দেখহ ভৈগেল বিহানে॥"—

পদকল্পতরু।

এতক্ষণের পর বিরহিণী প্রিয়াজির মুখে একটী কথা বাহির হইল অতি মৃদু ক্রন্দনের স্বরে—তিনি প্রেম গদগদ বচনে কহিলেন—"সখি তার পর"—অমনি ব্রজ-রস-রসিকা সখি অমিতা প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া পরবর্ত্তী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ বিভাষ।

—"দুহুঁ অতি কাতর, কুঞ্জ সঞে নিকসল
সব সহচরীগণ মেলি।
দুহুঁ-জন-নয়নে প্রেম-জল ঝর ঝর
ঐছনে গৃহে চলি গেলি॥
কিয়ে রাধা-মাধব লীলা।
সোঙরিতে খেদ, ভেদ করব অন্তর
গলি গলি যাওত শিলা॥ ধ্রু॥

মিমনহি নিজ নিজ মন্দিরে দুহুঁ জন,
শুতল পালঙ্ক-শয়ানে।
সখিগণ নিজ নিজ, মন্দিরে ঘুমল,
ঐছন ভেল বিহানে॥
গুরুজন জাগল, সুরয উদয় কৈল,
সবহুঁ ভেল পরকাশ।
শ্রীরূপ-মঞ্জরী, চরণ হৃদয়ে ধরি
কহে পরমানন্দ দাস॥"—পদকল্পতরু।

অমিতার এই ব্রজ-রসোদ্গার-রস-গীতি শ্রবণ করিয়া সখি কাঞ্চনার মনে ঠাকুর লোচনদাস বিরচিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল-বিলাস এবং সম্ভোগলীলারঙ্গের পদটীর কথা উদয় হইল। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ঠাকুর লোচনদাস শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ানাথের এই নিগূঢ় রহোলীলা বর্ণনে যাহা লিখিয়াছেন—এখানেও ঠিক তাই। সেই মধুর পদ-রত্নটীতে পদকর্ত্তা লিখিয়াছেন—

—"তবে সে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি!
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥"—

এখানেও পদকর্ত্তা বলিতেছেন—

"রাইক বেশ বনাওত কান।"

রসিকশেখর গৌরসুন্দর সম্ভোগের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণ-বল্লভাকে কিরূপে মনমতভাবে সাজাইতেন,—তাহা সেই পদরত্নটি পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া মনে মনে ধ্যান করুন,—আর রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্যামসুন্দরই বা তাঁহার প্রাণ-বল্লভাকে কি ভাবে সাজাইতেন,—তাহাও ধ্যান করুন—একসঙ্গে অদ্বয়তত্ব শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-গোবিন্দের অপূর্ব্ব সম্ভোগ-লীলা-রসাস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন। সম্ভোগরস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আর বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর-চন্দ্রের লীলার বৈশিষ্ট থাকিলেও মূলে উভয়েরই রস-রাজত্বে কোন রসেরই অভাব নাই। সম্ভোগরসের পর বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন চিরন্তন প্রথা। এই জন্যই শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের রসিক ভক্তবর ঠাকুর লোচনদাস শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-গৌরাঙ্গের সম্ভোগলীলা বর্ণনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের রসিকভক্ত-সাধকগণের প্রাণে পরমানন্দ দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজনের দুর্গম পথ কিছু সুগম করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত! জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ!! জয় ঠাকুর লোচন দাস!!!

এদিকে নিশি শেষ হইলে নদীয়ার টহলিয়া কীর্ত্তনের দল গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে আসিয়া প্রভাতী গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া-ধরিল,—

রাগ—ভৈরব একতাল।

—"সোঙর নব, গৌর-সুন্দর, নাগর-বনোয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু, করুণা-সিন্ধু, ভকতবৎসলকারী॥ ধ্রু॥
বদন-চন্দ্র অধর-কন্দ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ,
চন্দ্রকোটি-ভানুমুখ, বিছুয়ারী।
কুসুম-শোভিত-চাঁচর-চিকুর, ললাট-তিলক নাসিকা-উপর,
দশন-মোতিম-অমিয়-হাস দামিনী ঘনয়ারী॥
মকর কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণি-কৌস্তুভ-দীপ্ত-কণ্ঠ,
অরুণ-বসন, করুণ-বচন, শোভে অতি ভারি।
মালা-চন্দন-চর্চ্চিত-অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি-অনঙ্গ,
চন্দন-বলয়া-রতন-নূপুর, যজ্ঞসূত্রধারী॥
ধাওত-গায়ত-ভকত-বৃন্দ, কমলা সেবিত পাদ দ্বন্দ,
ঠমকে-চলত মন্দ-মন্দ, যাউ বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ,
পতিত পাবন নিতাইচাঁদ, প্রেমদানকারী॥

গৌরপদ তরঙ্গিণী।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ-দেওঘর,
১লা পৌষ ১৩৩৭সাল
বৃহস্পতিবার, রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(১৬)

—"যা শক্তির্হি যুগে যুগে ভগবতঃ কেলিপ্রদা প্রেমদা।
যা শক্তির্বীজুনক্তি নঃ প্রিয়বরে কুত্রাপি কেনাপি বা॥
সর্ব্বেষাং পর দেবতা পতিরতা গৌরেকনামাশ্রিতা।
সা গৌরাঙ্গময়ী মহীমুপগতা বর্ববর্ত্তি বিষ্ণুপ্রিয়া॥"—

ভগবত-সাধন ও ভগবল্লীলারসাস্বাদন দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু। সাধনের পরিপাকাবস্থায় সাধকের মনে লীলারসাস্বাদন-সুখ-লালসার উদ্রেক হয়। সাধন যখন আস্বাদনে পরিণত হয়—তখনই সাধনের পরিপূর্ণতা উপলব্ধি হয়—লীলারসা-স্বাদনেই সাধকের ভজন-চতুরতা পরিদৃষ্ট হয়। রসিক

ভক্তের রসাস্বাদন-ক্ষমতা ও চাতুরী যতই পরিপক্ক হয়—ততই এই ক্ষমতার উৎকর্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় এবং চাতুরীর পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয়। ভগবল্লীলা-স্মরণ-মনন ও কীর্ত্তন-চাতুর্য্যই লীলাময়ের লীলানুভবের প্রকৃত উপায় ও উৎকৃষ্ট পন্থা।

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে বিরহিণী-গৌর-বল্লভা প্রথমে বিধিনিয়মে কঠোরতম সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার নির্জ্জন ভজন-মন্দিরদ্বার দিবারাত্রি বন্ধ থাকিত—এমন কি তাঁহার অন্তরঙ্গা সখিগণেরও পর্য্যন্ত সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রিয়াজির এই সাধন এক্ষণে আস্বাদনে পরিণত হইয়াছে—মর্ম্মীসখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতাকে তাঁহার নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে প্রবেশাধিকার দান করিয়া তিনি তাঁহাদের মনঃকষ্ট দূর করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের সাধনভজনের রীতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে বিপ্রলম্ভরসের পরিপাকা-বস্থা এবং এই রসাস্বাদনের উৎকর্ষতা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। সুরসিকা ও ভজনবিজ্ঞা সখিদ্বয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে—তাঁহারা এখন মনের সাধে প্রাণ খুলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির সহিত বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন—আর গৌর-বল্লভাও তাঁহার মনের মর্ম্মব্যথা ও হৃদিবেদনা মর্ম্মী সখিগণের নিকট এখন মনপ্রাণ খুলিয়া বলিয়া গৌর-বিরহ-ব্যথার কথঞ্চিৎ উপসম করিতেছেন।

ভগবল্লীলা নিত্য এবং দ্বিবিধা—প্রকট ও অপ্রকট। শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ নিজ পরিকরগণের সহিত প্রপঞ্চের অগোচর অনন্ত প্রকাশে যে যুগপৎ বাল্য-পৌগণ্ড-কিশোর বিলাসময়ী নিত্যলীলারঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহার নাম অপ্রকট-লীলা, —আর সেই লীলা যখন একই প্রকাশে সপরিকর শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রপঞ্চে যথাক্রমে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকট লীলা কহে। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণভগবানের প্রকট-লীলা প্রকাশ হইয়াছিল মথুরামণ্ডলের শ্রীবৃন্দাবনে—আর চারিশত বর্ষ-পূর্ব্বে শ্রীগৌর-ভগবানের প্রকট-লীলা প্রকাশ হইয়াছিল গৌড়মণ্ডলের শ্রীনবদ্বীপে। এখনও কোন ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহাদিগের প্রকট লীলা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন হইতে মথুরায়—মথুরা হইতে দ্বারকা প্রভৃতি ধামেতে গমনাগমন—আর শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ও রামেশ্বরে গমনাগমন প্রভৃতি লীলাসকল প্রকট লীলাতেই প্রকাশ হইয়া থাকে এবং ইহাই প্রকট-লীলার বিশেষত্ব। **অপ্রকট-লীলায় গ্রামান্তরে গমনাগমন নাই।** এই জন্যই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীধামনবদ্বীপে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে পুষ্পোদ্যানে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সমন্বিত ও নদীয়া-নাগরীগণ-বেষ্টিত যে অপূর্ব্ব যুগলবিলাস তাহাই তাঁহার নিত্যলীলা—এই জন্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

—"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—

গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার দৈনন্দিন ভজনান্তে সন্ধ্যাকালে যথারীতি সখিদ্বয় সহ ভজন-মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণ বহিতেছে—সূর্য্যদেব অস্তচূড়াবলম্বী হইয়াছেন—সুরতরঙ্গিণী-সলিলে রক্তিমাভ বর্ণ রঞ্জিত হইয়াছে—পশ্চিম গগন-প্রান্তে যেন সিঁদুরে মেঘ উঠিয়াছে। সখি কাঞ্চনা উপযুক্ত সময় ও সুযোগ বুঝিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের রূপাভিসারের প্রাচীন একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ ধানশী।

—"গৌরাঙ্গ-লাবণ্য-রূপে, কি কহিব এক মুখে,
আর তাহে ফুলের কাচনি।
ও চান্দ মুখের হাসি, জীব না গো হেন বাসি,
আর তাহে পিরীতি-চাহনি।
সইলো! বিহি গঢ়ল কত ছান্দে।
কেমন কেমন করে মন, সব লাগে উচাটন,
পরাণ পুতুলী মোর কাঁন্দে॥ ধ্রু॥
বিধিরে বলিব কি, করিল কুলের ঝি,
আর তাহে নহি স্বতন্তরী।
গেল কুল লাজ ভয়, পরাণ বাহির হয়,
মনের অনলে পুড়ে মরি॥
কহিব কাহার আগে, কহিলে পীরিতি ভাঙ্গে,
চিত মোর ধৈরজ না বান্ধে।

নয়নানন্দের বাণী, শুন শুন
ঠেকিলা গৌরাঙ্গ-প্রেম-ফান্দে ॥”—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার নিয়মিত মালাজপ করিতেছেন আর অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত সখিমুখে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপরূপ রূপের কথা শুনিতেছেন—তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে। সখি অমিতাও শুনিতেছেন। সখি কাঞ্চনার হৃদয় গৌর-প্রেমের অফুরন্ত উৎস। তিনি একটী গান করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহেন। তিনি পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—“নাচত গৌর কান্তি ঝলকত
উজ্জল সো মুখ-চন্দ্রিমা।
সহজে নটবর ভুবনে মনোহর
কিবা মধুর ভঙ্গিমা॥
রসরাজ নব নব ঠমকি নাচত
সহজ গতি অতি স্থিরে।
তাদ্রিমিকী দৃমিকী সুবাদ্য বাজত
মধুর শব্দ সুধীরে॥
ঝঙ্কার ঝুনু ঝুনু ঝুনুর ঝনরব
মধুর রব নব নদীয়াতে।
আহা মরি মরি গৌর মুখ হেরি,
নাগরী-ভাসে রস-দরিয়াতে॥
ঘোমটা খুলি খুলি বদন তুলি তুলি,
সে রূপ-মাধুরী নিরখিয়া।
সুকোমল নব কান্তি সৌরভ,
নদীয়া-নাগরী না ধরে হিয়া॥
গৌর-রাগিণী প্রেম-বিলাসিনী,
নিগূঢ় রসরূপ বাউরী।
প্রেমের বন্ধনে শচীর নন্দনে
বান্ধিল নব নব নাগরী॥
বেদ-বিধিপর গৌর-সুন্দর
উদয় হৃদয় সুমন্দিরে।
কান্ত কহে মরি ধন্য নাগরী
নবদ্বীপে সুরধুনী তীরে॥”— *

পদকল্পতরু।

গৌরসুন্দরের মধুর নৃত্যকলা স্মৃতি-পথে উদিত হইবামাত্র বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর-বিরহাকুল-প্রাণে এক অভিনব ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইল—তাঁহার বদনমণ্ডলের ভাব এবং নয়নভঙ্গী দেখিয়াই সুচতুরা সখি কাঞ্চনা বুঝিলেন—প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অদ্ভুত নৃত্য-বিলাসরঙ্গ আরও শ্রবণ করিতে উৎসুক। প্রাণ-সখির মনোভাব বুঝিয়াই তিনি পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—“নাচত গৌর সুনাগর-মণিয়া
খঞ্জন গঞ্জন, পদযুগ-রঞ্জন,
রণ-রণি-মঞ্জীর-মঞ্জুল-ধ্বনিয়া। ধ্রু॥
সহজই কাঞ্চন, কান্তি কলেবর,
হেরইতে জগজন মন-মোহনিয়া।
তহিঁ কত কোটি, মদন-মন মুরছল,
অরুণ-কিরণ-অম্বর-বনিয়া॥
ডগমগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই,
দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখনিয়া।
প্রেমক সায়রে, ভুবন মজায়ই
লোচন-কোনে করুণ নিরখনিয়া॥
ও রসে ভোর, ওর নাহি পাওই,
পতিত কোরে ধরি ভুবন বেয়াপি।
কহ বলরাম, লম্ফ-ঘন-হুঙ্কৃতি
হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপি॥”—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি যেন তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপূর্ব্ব নৃত্য বিলাসরঙ্গ সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন—তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত—সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী বিমণ্ডিত। আত্মহারা হইয়া গৌর-বল্লভা সুমধুর গৌরনৃত্য-বিলাস-রঙ্গ শ্রবণ

* পদকর্ত্তা কান্ত গৌরাঙ্গ-পার্ষদ সেন শিবানন্দের ভাগিনেয়—যাঁহাকে নীলাচল-লীলায় মহাপ্রভু “পেঠাঙ্গি না উতরিয়া” দণ্ডবৎ করণের সময় বিশিষ্টভাবে কৃপা করিয়াছিলেন। পদকর্ত্তা নদীয়া-নাগরী-ভাবে বিভাবিত হইয়া এই পদটী লিখিয়াছেন।

করিতেছেন—তিনি যেন সমাধিগতা। সখি কাঞ্চনারও প্রাণে আজ গৌরনাগরবরের অপূর্ব্ব নট-নর্ত্তন-লীলা-রসের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে—তিনি সময় বুঝিয়া পুনরায় আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—বঙ্গাল।

—"নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম।
ঝলকত অঙ্গ, কিরণ মনরঞ্জন,
কনক মেরু দূরে দামিনীদাম॥ ধ্রু॥
বন্ধুর বদন, মদন-মদ-মরদন,
মধুরিম হাস যুবতী-ধৃতি-হারী।
শ্রুতি-জিতি তরুণ, অরুণ মণিকুণ্ডল,
টলমল নয়ন-যুগল-ছবি ভারি॥
চাঁচর-চিকণ, কেশ-কুসুমাঞ্চিত,
চপল চারু-উরে মণ্ডিত মাল।
অভিনব বাহু ভঙ্গী, ভর নিরুপম,
ধরত চরণতলে সুললিত তাল॥
পহুঁ চলু পাশ, লসত প্রিয় পরিকর,
গায়ত মধুর রাগ-রস মাতি।
উলসিত সকল ভুবন, ভণ নরহরি,
বায়ত খোল ধমক বহু ভাঁতি॥

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনার গান শেষ হইলে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির এখন একবার সখি অমিতার বদনের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত পড়িল—অশ্রুপূর্ণ পরম করুণ-নয়নের প্রেমপরিপূরিত সেই চাহনির মর্ম্ম বুঝিতে চতুরা সখিদ্বয়ের কিছুই বাকি রহিল না—তাঁহারা উভয়েই বুঝিলেন প্রিয়াজির ইচ্ছা সখি অমিতা একটি গান করেন। সখি অমিতা বড়ই গম্ভীরা-প্রকৃতি—তিনি অতি অল্পভাষিণী—মহা লজ্জিতভাবে মৃদু-মধুরভাবে প্রিয়াজিকে তিনি কহিলেন—"সখি! আমি ত গান জানি না—তবে গ্রাম্যবালিকা ও রমণীদিগের মুখে তোমার প্রাণবল্লভের একটি রূপোল্লাসের গান শুনিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল—সে গানটী আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল—এবং আমি তাহা গলার হার করিয়া রাখিয়াছি—সেই গানটী আমি আপন মনে মধ্যে মধ্যে গান করিয়া মনে বড় সুখ পাই—যদি তোমার অনুমতি হয়—সেই গানটী আমি করিতে পারি।"—

প্রিয়াজি মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"সখি! অনুমতির কথা বলিয়া আমাকে মনঃকষ্ট দিলে কেন? গৌর-কথা গৌর-গান, গৌর-কীর্ত্তন শুনাইতে আমার অনুমতির অপেক্ষা করে না—আন্ কথাকথন অবশ্যই আমার অনু-মতিসাপেক্ষ। সখি অমিতে! তুমি স্বচ্ছন্দে গান কর—তোমার মুখে আমার প্রাণবল্লভের গুণগান ও লীলাকথা আমার বড় মিষ্ট লাগে—তোমাদের গানই—তোমাদের কথাই—এখন আমার জীবন-সম্বল—এই কথা বলিতে বলিতে প্রিয়াজির নয়নদ্বয় হইতে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিলেন। সখি অমিতা তখন তাঁহার সেই পল্লীবাসিনী নদীয়া-বালার উক্তি গ্রাম্য গীতিটির ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"প্রাণ কাঁদে, নদে যেতে, (আমি) প্রেমফাঁদে পড়েছি।
গোরা-রূপ, অপরূপ, লোকমুখে শুনেছি॥
(সখি!) চল সাথে, নদীয়াতে, গোরা-রূপ হেরিব।
লাজ ভয়ে তেয়াগিয়ে, (গোরা) রসময়ে ভজিব॥
(কানে) গৌর নাম, রস ধাম, যদবধি শুনেছি।
কুল মান, মন প্রাণ, পদে তাঁর সঁপেছি॥
নাহি কাজ, লোক লাজ, চল সখি নদীয়া।
দেখি গিয়ে, রসময়ে, মন প্রাণ ভরিয়া॥
দিয়ে ছাই, বাসনায়, চল যাই ত্বরিতে।
শুনি রূপ, অপরূপ, প'ড়েছি গো পিরীতে॥
কুল শীলে, দূরে ফেলে, শচী-বালে ভজিব।
কেশ দিয়ে, মুছাইয়ে, (তাঁর) চরণেতে পড়িব॥
বুকে ধরি, পদতরি, হরি হরি বলিব।
দিয়ে প্রাণ, প্রতিদান, নাথ বলি ডাকিব॥
চল সখি, চোখে দেখি, নদীয়ার নাগরে।
হরি বলে, এস চলে, ল'য়ে যাব নগরে॥
দিব সঁপে, হাতে হাতে, নব বালা তোমারে।
বল দেখি, বিধুমুখি, কিবা দিবে আমারে॥"—

গৌর-গীতিকা।

গৌর-বল্লভার মন এই গানটি শুনিয়া বড়ই প্রফুল্ল হইল—বদনে পরিপূর্ণ প্রসন্নতার ভাব পরিদৃষ্ট হইল—তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ে অবিশ্রান্ত আনন্দাশ্রু ধারা পড়িতেছে। তিনি

সুধা-মধুর বচনে সখিদ্বয়কে কহিলেন—"সখি! এই সরলা গ্রাম্য বালিকাগণের সৌভাগ্য দেখিয়া আমার মনে প্রকৃতই হিংসার উদ্রেক হইতেছে। তাঁহারা আমার প্রাণ-বল্লভকে কখন চক্ষে দেখেন নাই—তাঁহারা বলিতেছেন লোকমুখে অপরূপ গোরারূপ শুনিয়াই তাঁহাদের প্রাণে এরূপ একটী অপূর্ব্ব প্রগাঢ় গৌরানুরাগের উদয় হইয়াছে—যাঁহার জন্য তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া অকপটে অনায়াসে সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছেন,—

—"লাজভয়ে, তেয়াগিয়ে, গোরাচাঁদে ভজিব"—

এ বড় সহজ সাধনার কথা নহে, সখি! তাঁহারা কে? আমি যে তাঁহাদের দাসীর দাসী হইবারও উপযুক্ত নহি সখি!"—এই বলিয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি কান্দিয়া আকুল হইলেন—তাঁহার হৃদি-সমুদ্রে আজ যেন একটী নবভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে—প্রাণের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতির উদয় হইয়াছে—মনের মধ্যে গৌর-বিরহানল যেন ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভাবাবেশে অবশাঙ্গ হইয়া প্রেমাবেগে সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। সখি অমিতা বিষম লজ্জিতা হইলেন—এমন কথা তিনি কি বলিলেন যাহাতে প্রিয়াজির এইরূপ দশা ঘটিল—এই চিন্তায় তাঁহার চিত্ত অস্থির হইল—তিনি ভয়ে ভয়ে প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

কতক্ষণ পরে বিরহিণী গৌর-বল্লভা আত্মসম্বরণ করিলেন—ধীরে ধীরে নিজেই উঠিয়া বসিলেন - আপন নয়ন-সলিল আপনার মলিন বসনাঞ্চলে মুছিয়া সখি অমিতার মুখের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া কাঁন্দিতে কাঁদিতে কহিলেন—"প্রিয় সখি অমিতে! তোমার কথিত এই পল্লীবাসিনী নববালাগণ নিশ্চয়ই তোমার পরিচিতা—তুমি তাঁহাদিগকে আমার নিকটে একবার লইয়া এস—আমি তাঁহাদের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব—তাঁহারাই প্রকৃত গৌর-প্রেমের গুরু। কারণ তাঁহারা বলিতেছেন,—

—"গৌর-নাম, রসধাম, যদবধি শুনেছি।
কুলমান, মনপ্রাণ, পদে তাঁর সঁপেছি॥

পুনরায় বলিতেছেন,—

"দিয়ে ছাই, বাসনায়, চল যাই ত্বরিতে।
শুনি রূপ, অপরূপ, পড়েছি গো পিরীতে॥

কি সুন্দর আত্ম নিবেদন!—কি সুন্দর প্রেম-লালসা!—কি সুন্দর ভাব-কদম্ব! এই সকল গ্রাম্য-বালিকাদিগের গৌর-প্রেম-সম্পত্তি লক্ষপতির ধন-সম্পত্তি হইতে লক্ষগুণ মূল্যবান!

তার পর তাঁহারা বলিতেছেন—

—"কুলশীলে, দূরে ফেলে, শচী-বালে ভজিব।
কেশ দিয়ে মুছাইয়ে, চরণেতে পড়িব॥

এই যে গৌরপ্রেম-লালসাময়ী গৌর-সেবাকাঙ্ক্ষা—এই যে সরল প্রাণের অকপট সরল বাসনা—ইহাই সখি, গৌর-চরণ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়। এই যে গ্রাম্য বালিকাবৃন্দ—এই যে নব-নাগরীবৃন্দ,—ইহারাই প্রকৃত গুরুপদবাচ্য। তাঁহারা অতিশয় কৃপাময়ী—কলিহত জীবগণকে প্রেমভক্তি শিখাইবার জন্যই তাঁহাদের জগতে আবির্ভাব। তাঁহারা এই গ্রাম্য-গীতিচ্ছলে কলিজীবকে গৌর-প্রেম-সেবা শিক্ষা দিতেছেন। সখি অমিতে! তুমি মহা ভাগ্যবতী—তুমি এই সকল প্রেমময়ী রমণীবৃন্দের দর্শনলাভ করিয়াছ—আমার মত হতভাগিনী এ হেন সুখসম্পদে বঞ্চিত। কারণ আমি কুলের কুলবধূ—পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিণীর মত গৃহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ। সখি! প্রিয়সখি! আমার ভাগ্যে কি তাঁহাদের দর্শনলাভ ঘটিবে?"—

এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি পুনরায় বিহ্বল হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলের ভাব পরিবর্ত্তন হইল—মুখে আর কথা বাহির হইল না—তিনি নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—সখি কাঞ্চনা কত না বুঝাইতে লাগিলেন—কিছুতেই তাঁহার মনে আজ স্বস্তি বোধ হইতেছে না।—গৌর-বল্লভা পরমা ধৈর্য্যবতী—তিনি আপনাআপনিই আত্মসম্বরণ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় প্রেম-গদগদ মৃদুমধুর বচনে কহিলেন,—সখি! এই গানটির প্রতি ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে, নিগূঢ়-গৌর-ভজন-রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এই নবনাগরীবৃন্দের ভজন-তত্ত্ব আস্বাদন কর। পল্লিবাসিনী নদীয়া-নাগরী শেষে বলিতেছেন—

—"বুকে ধরি, পদতরি, হরি হরি বলিব।
দিয়ে প্রাণ, প্রতিদান, নাথ বলি ডাকিব॥"—

সখি! কি উচ্চভাবপূর্ণ ভজন-চাতুর্য্যের পরিচয় এই পদ্যাংশে আমরা পাই! কি উচ্চাঙ্গের আত্মনিবেদনের

শব্দবিন্যাস ঘটা! গ্রাম্যবালাগণ বলিতেছেন, এবং আত্ম-নিবেদনচ্ছলে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া হরি হরি বলিব। তাঁহারা ভজন-বিজ্ঞা এবং ভাব-চতুরা। গৌরাঙ্গ-চরণ ধারণ করিয়া গৌরহরি বলিব—বলিলেই ত তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত—কিন্তু তাহা না বলিয়া তাঁহারা বলিতেছেন—গৌর-চরণ শিরে ধারণ করিয়া "হরি হরি" বলিব। তাঁহারা জানেন নদীয়ার চাঁদ গৌরহরি হরিনামে ভোলা—যে কেহ একবার "হরি" বলিলেই তাঁহাকে পরম প্রেমভরে নিজ ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া তিনি তাঁহার রাতুল চরণে স্থান দান করেন। আর এই হরিনামেই তাঁহার আত্যন্তিক প্রীতি। সুতরাং গ্রাম্যরমণীগণ গৌর-ভজন-তত্ত্ব রহস্যবিৎ পরম পণ্ডিতশিরোমণি—তাঁহাদের এই শেষ কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

তার পর পদকর্ত্তার ভনিতাটিও মধুর দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। বড় মধুর ভাব ইহাতে নিহিত আছে। ভণিতার শেষের চরণ তিনটি পুনরায় আমার মুখে শ্রবণ কর। যথা—

—"হরি বলে, এস চলে, ল'য়ে যাব নগরে।
দিব সঁপে, হাতে হাতে, নদবালা তোমারে॥
বল দেখি, বিধুমুখি, কিবা দিবে আমারে॥"—

পদকর্ত্তা বলিতেছেন—"হরি বলে চলে এস"—হরি না বলিলে গৌর মিলে না—হরিনামমন্ত্র গ্রহণ না করিলে গৌরভজনে অধিকার হয় না—এই জন্য বলিতেছেন—হরি বলে তোমরা চলে এস—তোমাদের গৌরধাম নদীয়া নগরে লইয়া যাইব। অর্থাৎ হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া তবে শ্রীনবদ্বীপধামে তোমরা এস। এই গেল একটি অর্থ,—দ্বিতীয়ার্থ—পদকর্ত্তা "হরি" নামক কোন গৌরভক্ত এই কথা বলিয়া গৌরানুরাগিনী গ্রাম্যরমণী বৃন্দকে নদীয়া নগরে লইয়া আসিয়া গৌরচরণে সমর্পণ করিবেন—এই ভাবপ্রকাশক এই পদটির ভণিতা লিখিয়াছেন।"

সখিদ্বয় প্রিয়াজির কথাগুলি শুনিয়া পরমানন্দ পাইলেন—সখি অমিতা লজ্জিতা হইলেন। এতগুলি কথা প্রিয়াজি যে একসঙ্গে গুছাইয়া এই সময়ে বলিবেন—সে আশা সখিদ্বয় করেন নাই—তিনি সখি অমিতার গান শুনিয়া যে পরমানন্দ পাইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদেরও পরমানন্দ। সখি কাঞ্চনা তখন সস্নেহে ও পরমাদরে সখি অমিতার পৃষ্ঠদেশে হস্তস্পর্শ করিয়া কহিলেন—"প্রিয় সখি অমিতে! তুমি আর একটী গান কর—তোমার গানে প্রিয়াজির মনে বড় আনন্দ হয়। সখি অমিতা তাঁহার কাঞ্চনা দিদির মুখে এই কথা শুনিয়া যেন সরমে মরমে মরিয়া গেলেন—অলক্ষিতে প্রিয়াজির বদনের প্রতি একবার করুণ নয়নে চাহিলেন—যেন তাঁহার অনুমতি চাহিতেছেন। প্রিয়াজি পুনরায় গান করিতে তাঁহাকে ইঙ্গিত করিলেন—তখন তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রূপোল্লাসের আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—'সখি! কলয় গৌরসুন্দরম্।
(গৌর) সুন্দর শিরে শোভিছে কেমন
সুন্দর চাঁচর চিকুরম্॥
(সখি) কলয় গৌরসুন্দরম্॥ ধ্রু॥
(কিবা) সুন্দর ভালে সুন্দর চন্দন
(যেন) উদয় পূর্ণ-চন্দ্রম্।
সুন্দর নাসিকা সুন্দর তিলক
সুন্দর গতি-মন্থরম্॥
সুন্দর শ্রবণে সুন্দর কুণ্ডল
দোলন তাহে সুন্দরম্।
সুন্দর বদনে সুন্দর বচন
সুন্দর কর-চালনম্॥
সুন্দর পলক সুন্দর অলক
সুন্দর কপোল-যুগলম্।
সুন্দর গঠন সুন্দর নয়ন
সুন্দর অতি-দর্শনম্॥
সুন্দর গলায় সুন্দর মালিকা
সুন্দর বক্ষ-দোলনম্।
(কোন) সুন্দরীর হাতে সুন্দর গাঁথনি
সুন্দর মালতী-পুষ্পম্॥
সুন্দর বক্ষ সুন্দর বাহু
সুন্দর ভুজ-দোলনম্।
সুন্দর মুরতি সুন্দর অতি
সুন্দর কটি-হেলনম্॥
সুন্দর জঘন সুন্দর গমন
সুন্দর পদ-যুগলম্।

সুন্দর জ্যোতি সুন্দর ভাতি
সুন্দর নখ-দর্পণম্ ॥
সুন্দর অতি সুন্দর মতি
সুন্দর নট-নর্ত্তনম্ ।
সুন্দর ভকতি সুন্দর ভকত
সুন্দর হরি-কীর্ত্তনম্ ॥
সুন্দর গগন সুন্দর পবন
সুন্দর গঙ্গা-তীরম্ ।
সুন্দর তানে সুন্দর পাখী
গাইছে গৌর-গীতম্ ॥
সুন্দর তীরে সুন্দর নীরে
সুন্দরীকুল কলিতম্ ।
সুন্দর বসন্ত সুন্দরী কান্ত
সুন্দর গৌর-সুন্দরম্ ॥
সুন্দর কান্তি সুন্দরী-পতি
সুন্দর গৌর-নাগরম্ ।
সুন্দর নাগর সুন্দরী নাগরী
সুন্দর গৌর-ভজনম্ ॥
সুন্দর গৌর সুন্দরী প্রিয়াজি
সুন্দর নদীয়া-যুগলম্ ।
সুন্দরীর হিয়া সুন্দর নদীয়া
সুন্দর নদীয়া-বাসম্ ॥
সুন্দর অঙ্গন সুন্দরী অঙ্গনা
সুন্দরীমোহন সুন্দরম্ ।
সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী সুন্দর
সুন্দরে-সুন্দর-মিলনম্ ॥
সুন্দর সুন্দর সকলি সুন্দর
সুন্দর নাগরী-বৃন্দম্ ।
সুন্দর মতি সুন্দর রতি
সুন্দর ভাব-মধুরম্ ॥
সুন্দর মৃদঙ্গ সুন্দর বাদ্য
সুন্দর করতালম্ ।
সুন্দর পিরীতি সুন্দর রীতি
সুন্দর ভকত-চরিতম্ ॥
সুন্দর ভাতি সুন্দর নারী
সুন্দর ভাব চাতুরীম্ ।

(এমন) সুন্দর সুন্দরী ভজিল না হরি
অভাগিয়া সে যে অন্ধম্ ॥
(ওগো) সুন্দর সবে সুন্দরী সবে
অ-সুন্দরে কর সুন্দরম্ ।
(গৌর) সুন্দর তবে সুন্দরী চিনিবে
(গোরা) সুন্দরী-প্রাণগৌরম্ ॥
সুন্দর গৌর সুন্দরী চাহে
(ওগো) সুন্দর কর জগতম্ ।
(কর) অন্তর সুন্দর বাহির সুন্দর
সুন্দর কর জীবনম্ ॥
সুন্দরী সবে সুন্দর রবে
কলয় গৌর-গীতম্ ।
সুন্দরী হব সুন্দরে পাব
(গৌর) সুন্দর মম জীবনম্ ॥
সুন্দর মনে সুন্দর প্রাণে
(ভজ) সুন্দর গৌর-নাগরম্ ।
সুন্দরীর ধন সুন্দর ভজন
সুন্দর নদীয়া-যুগলম্ ॥
(সখি) কলয় গৌর সুন্দরম্ ॥
(তোরা সবে মিলে বল)
সুন্দর গৌর-নাগরম্ ।
(বাহু তুলে বল্)
সুন্দর নদীয়া-যুগলম্ ॥
(নেচে নেচে বল্)
সুন্দর গৌর-সুন্দরম্ ।
(নয়ন মিলে দেখ)
(ঐ) সুন্দর নদীয়া-যুগলম্ ॥
সুন্দরী নহে সুন্দরও নহে
অভাগিয়া হরিদাসম্ ।
পাইবে কেমনে সুন্দর সেবা
সুন্দর নদীয়া-যুগলম্ ॥

গৌর-গীতিকা।

সখি অমিতা আজ নদীয়া-যুগল ভাবাবেশে সকলই সুন্দর দেখিতেছেন—তিনি আজ নদীয়া-যুগল ভাবোল্লাসে গৌরপ্রেমোন্মত্তা হইয়া তাঁহার গম্ভীর-প্রকৃতিটি একেবারে হারাইয়াছেন—তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি, হাব ভাব, চাল

চলনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে—তাঁহার আলুথালু কেশদাম বদনোপরি পড়িয়া সুন্দর মুখখানি একেবারে আচ্ছাদন করিয়াছে—তিনি যেন গ্রহগ্রস্থের ন্যায় মস্তক ঢুলাইতেছেন—আর হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন,—

"—সখি ! কলয় গৌর সুন্দরম্ ॥

তাঁহার নয়নদ্বয় গৌরানুরাগরঞ্জিত-রক্তবর্ণ,—বদন-প্রান্তে ফেনোদ্গীর্ণ হইতেছে—তাঁহার অসম্বর পরিধান বসন—সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত—নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া আছেন—নচেৎ ভূমিতলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত। সখি অমিতার সর্ব্বাঙ্গে বিপুল পুলকাবলীর উদ্গম হইয়াছে—সখি কাঞ্চনা তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত আছেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি সখি অমিতার অবস্থা তাঁহার গানের প্রারম্ভ হইতেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। প্রিয় সখির মুখে অপূর্ব্ব ভাবোল্লাসপূর্ণ এই করুণ গৌর-গীতিটি শ্রবণ করিয়া তিনিও ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন—কিন্তু তিনি নিজেই আত্মসম্বরণ করিয়া সখি অমিতার হস্ত ধারণ করিয়া কতবার যে ইঙ্গিতে চিত্ত স্থির করিতে নীরব অনুরোধ করিতেছিলেন—তাহা সখি কাঞ্চনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অমিতার সেই—"সখি কলয় গৌর-সুন্দরম্"—বুলির আর নিবৃত্তি নাই। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সেই "মধুরং মধুরং" পদটীর কথা সখি কাঞ্চনার বারম্বার স্মরণ হইতেছিল। প্রিয়াজিও আত্মহারা হইয়া প্রেমানন্দে নয়নের প্রেমধারায় বক্ষ ভাসাইতেছিলেন। সখি কাঞ্চনার মনে আজ বড় আনন্দ,—তিনি বিরহিণী প্রিয়াজির সখি-প্রীতির গভীরতা দেখিয়া আজ বিস্ময়ে ও প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়াছেন। স্বয়ং আত্মসম্বরণ করিয়া পরমা ধৈর্য্যবতী বিরহিণী গৌরবল্লভা আজ গৌর-পাগলিনী সখি-সেবায় নিযুক্তা। প্রিয়াজিও স্বয়ং সখি অমিতার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত আছেন—সখি কাঞ্চনার সাহায্য করিতেছেন,—তখনও সখি অমিতার বাহ্যজ্ঞান হয় নাই—তখনও তাঁহার মুখে সেই—

—"সখি কলয় গৌর সুন্দরম্"—

শেষে প্রেম-মূর্চ্ছাবস্থাতেও তিনি "কলয়" "কলয়" শব্দ করিতেছেন গোঙাইয়া গোঙাইয়া,—আর মস্তক ঢুলাইতেছেন—তাহার পর সর্ব্ব শরীর যখন তাঁহার অবসন্ন হইয়া পড়িল—তিনি কেবলমাত্র "ক" অক্ষরটী অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিতেছেন,—আর তাঁহার নয়নধারায় ভূমিতল সিক্ত হইতেছে। এই করুণ হইতেও সকরুণ কাষ্ঠ-পাষাণ-দ্রবকারী হৃদিবিদারক দৃশ্যটী গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির চক্ষের উপর সংঘটিত হইল—এবং তিনিই ইহার সৃষ্টিকর্ত্রী—এই ভাবিয়া তিনি আজ সবিশেষ সন্তপ্তা। তিনি কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার প্রিয়সখি অমিতাকে বারম্বার ডাকিতেছেন, আর পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন—সখি! আর কখন তোমাকে আমি গান করিতে বলিব না—প্রিয়সখি! প্রাণের সখি অমিতে! উঠ সখি ! তোমার এই অবস্থা দেখিয়া যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে"—এই বলিয়া প্রিয়াজি সজোরে শিরে করাঘাত করিলেন। সখি কাঞ্চনা তাড়াতাড়ি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া করুণ ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন—"সখি! প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! এখন তুমিই গৌর-নাম করিয়া তোমার প্রাণের সখি অমিতার জীবন রক্ষা কর। এই কথা বলিতে বলিতে সখি কাঞ্চনা কান্দিয়া আকুল হইলেন। পরমা ধৈর্য্যবতী গৌরবল্লভা বড় বিপদেই পড়িলেন—দুই দিকে দুই সখিকে ধরিয়া তিনি স্বয়ং তখন তাঁহার প্রাণবল্লভকে আকুল প্রাণে কাতরকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে !

—"তোমার পিরীতে ক্রন্দনই সার
দরশন অতি দুর্ল্লভ।
কাঁদায়ে পিরীতি এ কেমন রীতি
এ কেমন প্রাণবল্লভ ॥

প্রাণকান্ত হে।

(সুধু) কাঁদাতে শিখালে দরশ না দিলে
পরশ দূরের কথা।
চরণ দাসীর আশা না মিটালে
(তার) বুঝিলে না মনব্যথা ॥
কি আর বলিব আমি হে তোমারে
সকলি ত তুমি জান।
জীবনে কান্দিব মরণে কান্দিব
(আমি) মরিয়া করিব মান ॥

কভু যদি পাই দরশন তব
কোটি জনম পরে।
পদতলে বসি মরমের কথা
(তখন) বলিব গরব ভরে॥
সুখে থাক তুমি ওহে গুণমণি
(যেন) কাঁদি আমি যুগে যুগে।
কাঁদিতে এসেছি কাঁদিয়া যাইব
(মোর) নাহি কাজ সুখভোগে॥
আমি মরে যাই তাতে দুখ নাই
সখিরা মরে যে কেঁদে।
(আমি) সহিতে না পারি নয়নের বারি
(মোর) পরাণ ফাটে যে খেদে॥
(ওহে!) নদীয়ার গোরা, জর্জ্জরিত তারা
তোমার বিরহ-বাণে।
(তুমি) এসে দেখে যাও কাণে শুনে যাও
কি দুখ তাদের প্রাণে॥"
বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ হে!
(তোমার) বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ কাতর
নিবেদন তব পায়।
আঁখি নীরে ভাসি দাসী হরিদাসী
মনের দুখেতে গায়॥
(সে) নদীয়ার রজে এ দেহ মিশাবে
নয়নের নীরে ভাসি।
গৌরাঙ্গ বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে
মরে যেন হরিদাসী॥"—

গৌর-গীতিকা।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণের মর্ম্মন্তুদ এই আত্ম-নিবেদনের ধ্বনি নীলাচলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কর্ণে পৌঁছিল যখন—তখন রাত্রি এক প্রহর, তিনি গম্ভীরা-মন্দিরে অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারসে মগ্ন ছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার শ্রীবদনমণ্ডলের ভাব পরিবর্ত্তন হইল—তিনি অন্যমনস্ক ভাবে কি কথা বলিতে কি কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—উপস্থিত ভক্তগণ বুঝিলেন কৃষ্ণবিরহে তাঁহার মনে ভাবান্তর উপজাত হইয়াছে। এরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার হইত। সেখানে জগদানন্দ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন—তিনি মনে মনে বুঝিলেন—আজ সন্ন্যাসী-ঠাকুরের মনে নদীয়ার কথা উদয় হইয়াছে,—ঘরের কথা মনে পড়িয়াছে—নদীয়ার গৌরশূন্য গৌরগৃহের দুঃখিনী গৃহিণীর কথা মনে প'ড়িয়াছে—তাঁহার অনুরাগের করুণ আকুল আহ্বানগীতির মর্ম্মন্তুদ ধ্বনি নদনদী সমুদ্র পার হইয়া নীলাচলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। পণ্ডিত জগদানন্দ দেখিতেছেন সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ বড়ই আনমনা।

এদিকে নদীয়ার মহাগম্ভীরামন্দির সেই রাত্রিতে অকস্মাৎ কস্তুরী-কুঙ্কুমগন্ধে আমোদিত হইল—মালতী মল্লিকা পুষ্প সুগন্ধে গৌরশূন্য গৌর-শয়ন-মন্দির মুখরিত ও পরিপূরিত হইল—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়ন-মন্দিরের সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কোপরি যেন নবনটবর নদীয়া-নাগরবেশে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছেন—তাঁহার অপরূপ রূপের বর্ণনা ঠাকুর লোচনদাস যাহা করিয়াছেন—যেন ঠিক সেই রূপেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ, তাঁহার শয়ন-মন্দিরে আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই অপরূপ রূপটি কি রূপ তাহা শ্রবণ করুন,—

রাগ—রামকেলি।

—"আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর (কিবা) ধ্রু॥
ধবল পাটের জোড় পরেছে, রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে,
চরণ উপর দুলি যাইছে কোঁচা।
বাঁক-মল সোনার নূপুর, বাজাইছে মধুর মধুর,
রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা॥
দীঘল দীঘল চাঁচর চুল, তায় দিয়েছে চাঁপার ফুল,
কুন্দমালতীর মালা বেড়া ঝুটা।
চন্দন মাখা গোরা গায়, বাহু দোলাঞা চলি যায়,
ললাট উপরে ভুবনমোহন ফোঁটা॥
মধুর মধুর কয় কথা, শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর দোলন দেখি, করবী শুণ্ড কি সে লেখি,
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা॥
এমন কেউ ব্যথিত থাকে, কথার ছলে থানিক রাখে,
নয়ান ভৈরে দেখি রূপখানি।
লোচন দাসে বলে কেনে, নয়ন দিলে উহার পানে,
কুল মজালি আপনা আপনি॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

এই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নদীয়ায় আবির্ভাব—ইহা নূতন কথা নহে—এরূপ আবির্ভাব মধ্যে মধ্যে হইত—স্নেহময়ী শচীমাতার রন্ধনে—প্রেমময় শ্রীনিত্যানন্দের নর্ত্তনে—গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির অনুরাগের আকুল আহ্বানে—সন্ন্যাসীঠাকুর নীলাচলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গলীলা'র ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

—"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"—

এই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব—ইহা ক্ষণিকের জন্য—এরূপ আবির্ভাবে বাক্যালাপ নাই,—হাস্য পরিহাস নাই—অঙ্গসঙ্গ নাই- নায়িকার প্রণয়-পিয়াসা মিটিবার আশা নাই—ইহা স্বপ্ন নহে—স্বপ্নাবেশও নহে—তড়িৎ-ছটার ন্যায় ক্ষণিক সাক্ষাৎ দর্শন। এই দর্শনপ্রভাবে সাধক-দর্শকের সমাধি হয়। অধিকক্ষণ এরূপভাবে ভগবদ্দর্শন-প্রভাব জীবের সহ্য করিবার শক্তি নাই। নর-লীলোচিত কার্য্যকারণের অধীনতা স্বীকার করিয়াই লীলাময়ী স্বয়ং ভগবতী তাঁহার কায়ব্যূহ সখিগণ সহ এই বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদন-লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের এই আবির্ভাবলীলা দর্শনে বিরহিণী গৌর-বল্লভা ও তাঁহার সখিদ্বয়ের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে—তিন জনই যেন সমাধিগ্রস্তা—কে কাহাকে দেখে? এরূপ অবস্থায় যে তাঁহারা কতক্ষণ ছিলেন, তাহা কেহই জানেন না। বহিরাঙ্গনের কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের প্রেম-মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। রাত্রি তখন দেড়প্রহর—বহিরাঙ্গণে দামোদর পণ্ডিত বংশীবদন ঠাকুর এবং ঈশান, সেই গভীর রাত্রিতে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিয়াছেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌর-হরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥"—

বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত মাত্রেই সখি কাঞ্চনা "জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি" বলিয়া প্রথমেই উঠিয়া বসিলেন। তিনিও তাঁহার মধুকণ্ঠে এই কীর্ত্তনেরই ধুয়া ধরিলেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌর হরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"—

সখি অমিতার কর্ণে এই কীর্ত্তনধ্বনি প্রবেশ হইবা মাত্র তাঁহারও বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইল—ধীরে ধীরে তিনিও বসন সম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। প্রিয়াজি এখনও সমাধিগ্রস্তা—তাঁহার শরীর নিস্পন্দ—আঁখিদ্বয় নিমীলিত—বদন পাণ্ডুবর্ণ—বহুক্ষণ পরে পরে ধীরে ধীরে শ্বাস মাত্র পড়িতেছে। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার মুখে কথা নাই—তাঁহারা কীর্ত্তনোন্মত্তা। সখি কাঞ্চনা বিরহিণী গৌর-বল্লভার কর্ণের নিকট মুখ দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—সখি অমিতা দোহার দিতে লাগিলেন,—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ জয় শচীনন্দন।
শচীমায়ের দুলালিয়া, নাগরী-মন-মোহনিয়া,
গদাধরের প্রাণবঁধুয়া, জয় শচীনন্দন।
নরহরির চিত্তগোরা, নদেবাসীর প্রাণ গোরা,
নাগরীর মনচোরা, জয় শচীনন্দন॥"—

পুনরায় কীর্ত্তনের পদ ধরিলেন,—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥"—

এই কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি অঙ্গমোড়া দিয়া পাশ ফিরিলেন—ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পরে চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করিলেন,—তাঁহার নয়নদ্বয়ে অবিশ্রান্ত জলধারা পড়িতেছে—পরিধান বসন সিক্ত হইয়াছে—কথা কহিবার শক্তি নাই—তবুও যেন প্রসন্ন বদন—প্রফুল্ল অন্তকরণ। বদনের ভাব দেখিয়া সুচতুরা সখিদ্বয় বুঝিলেন তাঁহাদের প্রিয়সখির মন আজ প্রেমানন্দাপ্লুত। দুই সখি মিলিয়া তখন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা হইতে উঠাইলেন—ভজনমন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন আত্মসম্বরণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে মৃদুমধুর বচনে প্রেমগদগদ ভাষে হাসিমুখে কহিলেন—

যথারাগ।

সখি!
—"আজু রজনী হাম পোহায়নু
পেখিনু প্রিয়ামুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু
দশ দিক ভেল নিরবন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানিনু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥ বিদ্যাপতি।

এই কথা বলিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভা দুই বাহুদ্বারা পরম প্রেমাবেশে দুই সখির গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া আকুল করুণ প্রেমক্রন্দনের মৃদু রোলে ভজন-মন্দির মুখরিত করিলেন। সখিদ্বয়ের প্রাণে আজ বড় আনন্দ। নটবর নদীয়া-নাগরবেশে গৌর-সুন্দর-দর্শনানন্দে বিভোর হইয়া তাঁহারাও প্রিয়াজির মত প্রেমানন্দসমুদ্র মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন—তদুপরি বিরহিণী প্রিয়াজির প্রফুল্ল বদন এবং হাসিমুখ দর্শনে আজ তাঁহাদের মনে আনন্দের আর সীমা নাই। এরূপ আনন্দের বিশেষ একটি কারণ আছে। প্রিয়াজি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া কহিতেছেন—

"আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল—
টুটল সবহু সন্দেহা"—

এই সন্দেহটি কি তাহার মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। প্রিয়াজির মনের সন্দেহ তাঁহার প্রাণ বল্লভ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন—কখন যে তিনি পুনরায় গৃহে ফিরিবেন—সে আশাও তাঁহার নাই—এই দুঃখেই গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি মর্ম্মাহতা। তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রবাস-বাস-জনিত বিরহ তাঁহার নহে—তাঁহার বিরহ স্বতন্ত্র জাতীয়—এ বিরহের গভীরতা এবং প্রভাব, অন্য জাতীয় বিরহের তুলনায় আসিতে পারে না,—ইহাকে বিরহ সংজ্ঞা না দিয়া 'শোক' সংজ্ঞা দিলেই সমীচীন হয়। যিনি প্রকট লীলায় সন্ন্যাস বেশ ত্যাগ করিয়া কখন পূর্ব্বাশ্রমের বেশ গ্রহণ করিবেন না—তিনি আজ নবনটর নদীয়ানাগর বেশে তাঁহারই শয়ন-মন্দিরে—তাঁহারই ব্যবহৃত উত্তম সুসজ্জিত পালঙ্কে উপবেশন করিয়া তাঁহার প্রিয়তমা প্রাণবল্লভার সম্মুখে আবির্ভাব হইয়া যেরূপ ভাবে অপূর্ব্ব দর্শন দান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিলেন, ইহাতে তাঁহার বক্ষবিলাসিনী বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে তাঁহার প্রাণবল্লভ ইচ্ছা করিলে নদীয়া-নাগরবেশে নদীয়ায় পুনরায় আসিতে পারেন। ইহা যে দুরাশা নহে, এই সন্দেহ-ভঞ্জনরূপ সুখানুভূতিতে অভিভূতা হইয়া বিরহিণী প্রিয়াজির মনে বড় আনন্দ হইয়াছে। তাই তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এরূপ কথা বাহির হইয়াছে।

বিরহিণী প্রিয়াজির মন প্রফুল্ল এবং তাঁহার চন্দ্রবদনে বহুদিনের পর আজ হাসির রেখা দেখিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনের যে আনন্দ, তাহাও প্রিয়াজির আনন্দানুভূতির অনুরূপ। শ্রীভগবল্লীলারহস্যগুলি বড়ই নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ এবং দুর্ব্বোধ্য। নিত্য রাসবিলাসাকাঙ্ক্ষী হইয়া নিত্যধামে মিলন ও সম্ভোগ-লীলা-রসবিগ্রহ রসরাজ স্বয়ংভগবান এবং মহাভাব-স্বরূপিণী রাসরসরসিকাশ্রেষ্ঠা স্বয়ং ভগবতীর এই যে বিরহ-লীলারঙ্গ এবং বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন, ইহাই তাঁহাদের অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় লীলাবৈচিত্রী। অপ্রকটলীলায় গোলোকে তাঁহাদের বিরহ নাই—বিচ্ছেদ নাই—শোকদুঃখ নাই—সেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ—তাঁহারা সেখানে আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ! নরলীলায় শ্রীগৌরভগবান তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহিত ভৌম নবদ্বীপে যে সর্ব্বোত্তম নরলীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহাতেই বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনাদি নরলীলোচিত ভাব-সম্পত্তি সকল পরিদৃষ্ট হয়।

এক্ষণে গৌর-বল্লভা এবং তাঁহার মর্ম্মীসখিদ্বয় প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন—তাঁহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন চতুর-চূড়ামণি সন্ন্যাসী ঠাকুরের চতুরতা—তাঁহার এই যে আবির্ভাব-লীলারঙ্গ—ইহা বিদ্যুৎমালার ন্যায় ক্ষণিকের জন্য—ইহা ভক্তের প্রতি যে তাঁহার অসীম কৃপার নিদর্শন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—তবে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির পক্ষে এরূপ কৃপার নিদর্শন লীলারসপুষ্টির উদ্দেশে চতুর-চূড়ামণির চতুরতা কিম্বা কপট সন্ন্যাসী ঠাকুরের ছলনা মাত্র। তাঁহার দুগ্ধের তৃষ্ণা যে ঘোলে মিটিতে পারে না—তিনি বারম্বার তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়কে সে কথা বলিয়াছেন—এখনও তাই বলিতেছেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের পটমূর্ত্তির সম্মুখে আসনে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে শ্রীমূর্ত্তির বদন-চন্দ্র দর্শন করিতেছেন এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। সখিদ্বয় নিকটে বসিয়া নীরবে আলাপ করিতেছেন—রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। সখিদ্বয় ভাবিতেছেন প্রিয়াজির আজ মন প্রসন্ন আছে,—তাঁহার প্রাণবল্লভের আবির্ভাব-লীলারঙ্গে তাঁহার বিরহ সন্তপ্ত হৃদয়াগুণে কিঞ্চিৎ যেন শান্তিবারি সিঞ্চিত হইয়াছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে—এরূপ ক্ষণিক দর্শনে বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর-বিরহাগুণে যেন ঘৃত পড়িয়াছে—বিরহানল যেন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার হাতের জপমালা হাতেই আছে—সংখ্যানাম জপ

আর করিতে পারিতেছেন না:—তাঁহার নাড়ী মুচড়িয়া মুচড়িয়া যেন ক্রন্দন আসিতেছে—মহা ধৈর্য্যবতী মহা স্থিরা ও গম্ভীরা-প্রকৃতি গৌরবক্ষবিলাসিনী আজ যেন পরম বিরহ-বিহ্বলা—তিনি বালিকার ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন—তাঁহার নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—নয়নদ্বয়ে যেন শ্রাবণের ধারা বহিতেছে। তিনি ঠাকুরমন্দিরে পূজার আসনে আসীনা—সম্মুখে কোশাকুশী, শঙ্খ ঘণ্টাদি পূজার দ্রব্যাদি রহিয়াছে। তাঁহার প্রেমাশ্রুজলে গঙ্গাজলের কোশাখানি পূর্ণ হইয়া গেল—গঙ্গাজলে যেন যমুনার জল মিশ্রিত হইল—এই মহাতীর্থ-জল নীলাচলের সমুদ্রজলে পরিণত হইল—গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির নয়নজলের সহিত লবণাক্ত সমুদ্র-সলিলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইল—অশ্রুজলও লবণাক্ত, সমুদ্র-জলও লবণাক্ত—মহা তপস্বিনী প্রিয়াজি যেন আজ দিব্যাসনে বসিয়া তাঁহার নয়নজলে গৌরবিরহ প্রশমনার্থ তর্পণ করিতেছেন—কৃপানিধি পাঠকপাঠিকাবৃন্দ! এই তর্পণের মহামন্ত্র বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীমুখে আপনারা শ্রবণ করুণ। গৌর-বল্লভা আকুল প্রাণে করুণ হইতেও করুণ ক্রন্দনের সুরে তাঁহার প্রাণবল্লভকে প্রেমগদগদবচনে কহিতেছেন,—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে!

(তুমি) দেখা দিয়ে চলে গেলে কেন বল না।
কেন গেলে কথা কয়ে বলে গেলে না॥ ধ্রু॥
আর কত দিনে, কোথা কোন স্থানে,
দরশন দিবে বল না॥
আর কত কাল, বাঁধি মায়াজাল,
(তুমি) করিবে আমারে ছলনা।
যুগ-যুগান্তরে, পাব কি তোমারে,
দয়া করি মোরে বল না॥
বল বল শুনি, শ্রীমুখের বাণী,
আর কিছু আমি চাহি না।
অসাধন তুমি, অভাগিনী আমি,
ডাকিতে তোমারে জানি না॥
নিজ গুণে এস, কাছে মোর ব'স,
রস-কথা দু'টী কহ না।
নয়নে নয়ন, রাখি অনুখন,
পুরাই মনের বাসনা॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার, জীবনের সার,
(কবে) দরশন দিবে বল না।
ভণে হরিদাসী, আঁখিনীরে ভাসি,
ক'র না হে আর ছলনা॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

বিরহিণী প্রিয়াজির এই অপূর্ব্ব আত্মনিবেদন শ্রবণ করিয়া সখিদ্বয় কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন কতক্ষণে প্রিয়াজির আকুল হৃদি-সমুদ্রের বিরহোচ্ছাসপূর্ণ এই ভাবতরঙ্গাবলী প্রশান্ত আকার ধারণ করিবে,—কতক্ষণে তাঁহার মনপ্রাণ সুস্থির হইবে,—কতক্ষণে পুনরায় তিনি নিয়মিত সংখ্যানাম-ভজনে রত হইবেন! গৌরকথার আলোচনায় তাঁহার গৌর-বিরহজ্বালা ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিয়াছে—এখন আর ইষ্টগোষ্ঠীর প্রয়োজন নাই,—এখন নির্জ্জন ও নীরব ভজনের প্রয়োজন! এই ভাবিয়া সখিদ্বয় আর কোন কথা কহিলেন না। বিরহিণী প্রিয়াজি সখিদ্বয়ের মনোভাব বুঝিয়াই সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। ভজন-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিন জনেই জপমগ্না—তিন জনের আসন তিন দিকে—প্রিয়াজির আসন শ্রীপটমূর্ত্তির সম্মুখে—সখি কাঞ্চনার আসন তাঁহার দক্ষিণ ভাগে কিছু দূরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের পর্য্যঙ্কের নিকট—সখি অমিতার আসন প্রিয়াজির বাম ভাগে ঠাকুরের শয়ন-খট্টাঙ্কের নিকট। তিন জনেই আপন আপন আসনে বসিয়া স্ব স্ব ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। নদীয়ার গম্ভীরা-মন্দিরে নির্জ্জনে রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তিন মূর্ত্তি গৌর-বিরহিণীর একান্ত নীরব গৌরভজনের প্রভাব বৈষ্ণবজগতে বিস্তারিত হইয়া নির্জ্জনভজনের পথ প্রসারিত করিবে। নীরব রোদনের সহিত নির্জ্জনে আত্ম-নিবেদন, এই শরণাগতিই বৈষ্ণবীয় প্রকৃষ্ট ভজন পন্থা,—আর এই ভজন-পন্থাই গৌর-কৃষ্ণ-চরণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। নির্জ্জন ভজনাধিকার সাধকের সাধনলব্ধ ধন—সাধু-গুরু-কৃপা ব্যতীত এ অধিকার লাভ সুদুর্ঘট। মহৎ সঙ্গ ও মহৎ কৃপাই নির্জ্জন ভজনসাধন বিষয়ে সাধকের একমাত্র সম্বল।

তিনটি বিপ্রলম্ভরসের মূর্ত্ত বিগ্রহ নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তরে নির্জ্জনে বসিয়া নিশীথে গৌরভজন করিতেছেন সংখ্যা-নাম-জপ সিদ্ধি-ফলাকাঙ্ক্ষায়—অর্থাৎ নাম ও নামীর একত্ববোধক যে ধ্যান ও জপ তাহার ফল ভগবদ্দর্শন লাভ। ভগবদ্দর্শন লাভ হইলেই আর তখন নামের সংখ্যা থাকে না—তখন সাধক সমাধিগত হন—প্রেম-মূর্চ্ছনা—বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—দেহানুসন্ধানরাহিত্য এরূপ নাম জপের বিশিষ্ট ফল। এখানে হইয়াছেও তাই—প্রিয়াজির হস্ত হইতে তাঁহার জপমালা শ্রীপটমূর্ত্তির সম্মুখে পড়িয়া গিয়াছে—তিনি প্রেমাবেশে ও প্রেমানন্দে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীপাদুকাদ্বয়ের উপর মস্তক রাখিয়া ভূমিতে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতারও তদবস্থা—কে কখন কি ভাবে সমাধিগতা—কেহ তাহা জানেন না। ভজনমন্দিরে ঘৃতদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে—তিন মূর্ত্তি গৌর-বিরহিণী সেই নির্জ্জন নিশীথে ভজন-মন্দিরের তিন দিকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। তিন জনেই মূর্চ্ছিতা—কে কাহাকে দেখে—কে কার শুশ্রূষা করে? গৌরাঙ্গৈক-জীবনা গৌর-বিরহিণী-ত্রয় ভাবাবেশে প্রেমানন্দে গৌর-দর্শন করিতেছেন—তাঁহারা যদিও মূর্চ্ছিতা ও বাহ্যজ্ঞানরহিতা—কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে,—সেই অন্তর্দৃষ্টি-দ্বারা তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্বধন নদীয়া-নাগর শচীনন্দনকে দর্শন করিতেছেন—মধু হইতেও মধু শিঞ্জিনিবাঞ্ছিত নবদ্বীপ-লীলারস আস্বাদন করিতেছেন—তাঁহাদের গৌর-ভাবনাময়ী-তনু জড়বৎ বোধ হইলেও তাহাতে গৌর-অঙ্গ-স্পর্শানুভূতি-রূপ গৌরসেবানুরক্তির সকল ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটি গীতে দেখিতে পাই—বিরহিণী শ্রীরাধিকার উক্তি—

"যখন বিরলে বসিয়া নয়ন মুদে দেখি,
তখন যেন প্রাণসই গো।
ও সে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি,
দিয়ে গলে পীতাম্বর বলে পীতাম্বর
"রাধে বিধুমুখি!
একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি।"
অমনি দেখি বলে যদি আঁখি মিলে দেখি,
দেখি দেখি করি পুন নাহি দেখি,
এ কি দেখি,—বল দেখি সখি॥"
৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

এই যে "বিরলে বসিয়া নয়ন মুদে দেখি" ভাবটি বড়ই মধুর—নাম ও নামী এক করিয়া নামজপকালীন এই ভাবটী নির্জ্জন ভজনের ফল—আর এইরূপ নির্জ্জন ভজনের ফলেই ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরে গৌরবিরহিণীত্রয়ের এখনকার এইরূপই ভাব—আর এই ভাবেই বিভাবিত হইয়া তাঁহারা পরমানন্দেই আছেন।

ঠিক এই সময়ে সখি চন্দ্রকলা নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের বারান্দার একটী নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া নির্জ্জন ভজনে রত আছেন। তিনিও সঙ্গীত বিশারদা—গভীর নিশীথে নির্জ্জনে বসিয়া তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কলকণ্ঠে তাঁহার আত্মনিবেদনের পদ গাহিতেছেন। নদীয়ার নীরব নিশীথগগণ ভেদ করিয়া সে মধুর গীতিধ্বনি যেন সমগ্র গৌড়মণ্ডল মুখরিত করিতেছে—নদীয়াবাসী নিদ্রিত নর-নারীবৃন্দের কর্ণে যেন সে মধুরধ্বনি প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ গভীর নিশীথে তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছে। গ্রহগ্রস্তের ন্যায় তাহারা সুপ্তোত্থিত ভাবে বাহিরে আসিয়া প্রেমাবেশে উৎকর্ণ হইয়া সেই মধুর গীতিধ্বনি শুনিতেছে—সকলেরই অনুমান হইতেছে এই ধ্বনি যেন নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইতেছে—সেই গৌরশূন্য গৌরগৃহের প্রতি তাহাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে।

সখি চন্দ্রকলা গাহিতেছেন—

যথারাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ হে!
(দুটি) পরাণের কথা, বলিব তোমায়,
তাই আসিয়াছি বিজনে।
কেউ নাই হেথা, চলে এস নাথ,
তিলেকের তরে এখানে॥
নিশীথ নীরব, সুরধুনী-নীর,
বহিছে মধুর স্বননে।
কুল কুল রবে, সমীরণ ধীরে
করে নিবেদন চরণে॥
গাহে সমীরণ, বিরহের গান,
ধরিয়াছে তান তটিনী।

করিতে তোমায়, পিরীতি আরতি,
মল্লিকা-মালতী-নলিনী ॥
চাঁদের কিরণে, বিজলি ছুটিছে,
উজল করিয়া ধরণী।
এস এস নাথ, এ মধু সময়ে,
শুনিতে পিরীতি-কাহিনী ॥
কুঞ্জে এসেছি, অভিসার করি,
বড় আশা লয়ে পরাণে।
নিজনে তোমায়, পাবার আশায়,
আসিয়াছি আমি গোপনে ॥
গুপুত পিরীতি, ভালবাস তুমি,
বলিয়াছ মোরে স্বপনে।
কুলবালা আমি, কুলশীল ছাড়ি,
তাই আসিয়াছি বিজনে ॥
চরণেতে ধরি, ওহে গৌরহরি,
আসি দেখা দাও ঝটিতি।
নিশি পোহাইলে, যেতে হবে চলে,
একি হে তোমার পিরীতি ॥
সারা নিশি জাগি, বসে আছি আমি,
তোমা তরে বনে বসতি।
অবলা রমণী কি বুঝি কি জানি,
পিরীতের তব কি রীতি ॥

তখন——
নিশি ভোর ভোর, গৌর কিশোর,
চুপি চুপি ধীরে আসিয়া।
ধীরে উঁকি মারে, কুঞ্জের দুয়ারে,
মধুর মধুর হাসিয়া ॥
রসিক শেখর, নব নটবর
মধু ভাষে বলে আমারে।
"আসিয়াছি আমি, শুন ওগো ধনি,
ভুলি নাই আমি তোমারে ॥

তখন—
দিশেহারা হ'য়ে, প্রাণের হরিবে,
যাইনু ধরিতে বঁধুয়া।
নিদ্ টুটি গেলা, বঁধু পলাইলা,
(দুখে) কেঁদে মরে হরিদাসিয়া ॥

গৌর-গীতিকা

যেন জাগ্রত স্বপনে এইভাবে নদীয়ানাগর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সহিত সখি চন্দ্রকলার এইরূপ প্রেমালাপ হইতেছে। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া গান করিতেছিলেন—হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—যেন কাহাকেও তিনি তাঁহার সম্মুখে দেখিলেন। আর কাহাকে দেখিবেন? মনপ্রাণ যাঁহার চরণে সঁপিয়াছেন—কুল শীল মানে যাঁহার জন্ম তিলাঞ্জলি দিয়াছেন—তাঁহারই সেই নদীয়ানাগর নবনটবরের প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তিখানি সম্মুখে দেখিতে পাইয়া প্রেমাবেগে কহিতেছেন—

যথারাগ।

প্রাণগৌরাঙ্গ হে!
(তুমি) কেন কর অভিমান?
চেয়ে মুখ পানে, চলে গেলে কেনে,
কেন বা রোষের ভাণ?
কি দোষ দেখিলে, চরণ না ধুলে,
ধুলা পায় চলে গেলে।
যতন করিয়া, কত কি রাধিনু,
কিছু নাহি তুমি খেলে ॥
জাগি সারা নিশি, রহিলাম বসি,
আশাপথ তব চেয়ে।
দেখা মাত্র দিয়ে, চলে গেলে কেনে,
কেন বা আসিলে ধেয়ে?
চোরের মতন, চুপে আগমন,
বুকেতে মারিতে ছুরি।
চকিতে চাহিয়ে, রূপ দেখাইয়ে,
করিলে পরাণ চুরি ॥
ভেবেছিনু মনে, ধরিব গোপনে,
ধরা তুমি নাহি দিলে।
চুপে বুকে বসি, নিজ কাজ সাধি
চুপি চুপি পলাইলে ॥
চোরের চাতুরী, বুঝিবে কি নারী,
রহিনু দুয়ার খুলি।
অলখিতে আসি, বুকে মোর বসি,
(প্রাণ) চুরি করি গেলে চলি ॥
হে চতুর চোর, কিছু নাহি নিলে,
বহুমূল্য গৃহধন।

কি ভাবিয়া নিলে, দুনিয়ার ছার,
দুখী অবলার মন ॥
মন যদি নিলে, রহিলে না কেনে,
গৃহে মোর এক তিল।
গেল যে চলিয়া, বুঝিলে না তুমি,
রমণীর কুল শীল ॥
আবার এখন পুন অভিমান,
এ কি এ চোরের রীতি।
এ কেমন চোর, রসিক শেখর,
কে শিখালে এই নীতি ॥
চোরের আবার, অভিমান কেন,
(তোমার) কোথা গেল লাজ ভয়।
(তুমি) **নিলাজ নিমাই,** মরমের কথা,
দীনা হরিদাসী কয় ॥"

গৌর-গীতিকা।

সখি চন্দ্রকলার গানের সুমধুর ধ্বনি সর্ব্ব নদীয়ার লোকে সেই গভীর নিশীথে শুনিতে পাইল—উৎকর্ণ হইয়া সর্ব্বলোকে শুনিয়া প্রেমাকুলচিত্তে গৌরনাম করিতে লাগিল। কিন্তু ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরবিরহিণীত্রয়ের কর্ণে এ ধ্বনি প্রবেশ করিল না। সখি কাঞ্চনা ও সখি চন্দ্রকলার এক আত্মা—দেহ মাত্র ভিন্ন। বিরহিণী প্রিয়াজির আদেশে সখি চন্দ্রকলা নির্জ্জনে গৌরভজন করেন। অন্তঃপুরে তাঁহার সঙ্গে প্রিয়াজির দেখা সাক্ষাৎ হয়—মনে মনে কথা বার্ত্তা হয়—নয়নে নয়নে ভাবে ইষ্টগোষ্ঠি হয়—নয়নের জলে নয়নের জল মিশাইয়া সখি চন্দ্রকলা প্রিয়াজির প্রেমপূজায় অর্ঘ্য সমর্পণ করেন। সখি কাঞ্চনার সঙ্গেও তাঁহার এইরূপ ভাবের বিনিময় হয়। সখি চন্দ্রকলার ভজনবৃত্তান্ত কেহ জানিতে পারে না—কোথায় তাঁহার ভজনকুটীর কেহ তাহা জানে না। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ভজনস্থান নাই।

এক্ষণে প্রিয় পাঠকপাঠিকাবৃন্দ! গৌরবিরহিণীত্রয়ের কি অবস্থা তাহাই স্মরণ করুন,—নদীয়ার গম্ভীরামন্দিরে তাঁহারা মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূমিশয্যায় শায়িতা আছেন। তাঁহাদের এখন অন্তর-বাহ্য দশা।

পূর্ব্বে গৌর-বিরহিণীর যে ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে—অর্থাৎ তিনি শতমুখে গৌর-বিরহ-কথা বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতেছেন—কিন্তু কহিতে কহিতে একবারে নীরব হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণলীলায় এইরূপ ভাব-বিপর্য্যয়ের একটী পদ আছে—যথা,—ললিতা বলিতেছেন সখি বিশাখাকে—

—"দেখ না বিশাখে! রাইয়ের কি ভাব হইল।
কি ভেবে শ্যামভাবিনী নীরব রহিল ॥
শতমুখে কইতেছিল পূর্ব্ব-সুখ-কথা।
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যথা ॥"—

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

এখানে বিরহিণীর পূর্ব্ব সুখ-কথা নহে—তিনি তাঁহার গৌর-বিরহ-দুঃখ-কথাই বলিতে বলিতে নীরব হইয়াছেন। এই যে নীরবতা—ইহাও একটী ভাব—ইহার নাম স্তম্ভভাব। তবে সংখ্যানাম জপের সঙ্গে এইরূপ স্তম্ভ-ভাবের সম্বন্ধ হয় কেবল ভগবদ্দর্শন লাভের সময়।

বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে আজ মূর্চ্ছিতা গৌর-বিরহিণীত্রয় ভিন্ন চতুর্থ প্রাণী আর কেহ নাই যে তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সেবা করিবে।

এই ভাবে রাত্রি শেষ হইলে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও গৌর-বিরহিণীত্রয় তদবস্থাতেই আছেন। প্রভাতী কীর্ত্তনের দল গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল,—তখন—

—"বায়স কোকিল কুল ঘুঘু দহিয়াল-রব।
তা সহ মিলিয়া ডাকে পরিকর সবে ॥"—

বাসু ঘোষ।

এই যে গৌরাঙ্গ-পরিকরগণ তাঁহারা কি বলিতেছেন বা কাহাকে ডাকিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুণ,—

—"উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল ॥"—

গৌর-বল্লভার এমনি গৌরপ্রেমের গভীরতা যে কোন পশুপক্ষীর রব শুনিলেই তাঁহার মনে খোলকরতালের ধ্বনির উদ্দীপনা হইত। পূর্ব্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণবল্লভার—

"সারস পক্ষীর ধ্বনি করয়ে শ্রবণ।
মুরলীর ধ্বনি তাঁর হইত উদ্দীপন ॥"—

বৃষভানু-নন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাবের মনে আজ সেই পূর্ব্বভাব স্ফুর্ত্তি হইল। গৌর-প্রেমাবেশে তিনি মূর্চ্ছিতা ছিলেন—প্রভাত হইয়াছে—বায়স, কোকিল, ঘুঘু, দহিয়াল প্রভৃতি পক্ষীগণের রব তাঁহার

কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার মনে খোল-করতাল-ধ্বনির উদ্দীপনা হইল—সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী কীর্ত্তনে খোল-করতাল-ধ্বনিও ধ্বনিত হইল—যেমন উদ্দীপনা—তেমনি স্বরূপ শ্রবণ—তার পর প্রভাতী কীর্ত্তনে "গোরাচাঁদ" নাম শ্রবণেই বিরহিণী প্রিয়াজির প্রেম মূর্চ্ছা সর্ব্বাগ্রে ভঙ্গ হইল—তিনি বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন—ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া বসিলেন—প্রভাতী কীর্ত্তন চলিতেছে—

—"কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি।
কত নিদ্রা যাও ওহে গোরা-গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
শশধর তেজল কুমুদিনী-বাস॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের অলসে॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

প্রিয়াজি তখন দেখিতেছেন তাঁহার মর্ম্মীসখিদ্বয়ও মূর্চ্ছিতাবস্থায় দুই দিকে পড়িয়া আছেন,—তখন তিনি বুঝিলেন—তাঁহার কায়ব্যূহ সখিদ্বয়ও তাঁহারই মত সমদশাগ্রস্থা। গৌরবল্লভা তখন স্বয়ং সখিদ্বয়ের অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন। স্বয়ং গৌরনাম কীর্ত্তন করিয়া তিনি তাঁহাদিগের বাহ্যজ্ঞান করাইলেন—সখিদ্বয় একই সঙ্গে

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি"

বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং প্রিয়াজির মলিন বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সখি কাঞ্চনা মৃদু মধুর প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

যথারাগ।

—"নিশান্তে নিদ্রিতা, সনাতন-সুতা,
গোরা-গুণমণি কোলে।
বহু সুখে প্রিয়া, নাগরের বাহু,
রাখিয়া মস্তক তলে।
পরিহিত অম্বর, হ'য়ে অসম্বর,
লাজ গিয়াছে চলে॥"—

সখি-মুখে এই গানটি শুনিতে শুনিতে বিরহিণী গৌরবল্লভা মহা লজ্জিত ভাবে নিজ হস্তে সখি কাঞ্চনার বদন চাপিয়া ধরিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন চুপ করিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির তাঁহার পূর্ব্ব সুখ-সম্ভোগ-লীলাকথা-শ্রবণ তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণের মত অন্তরে সুখ বাহিরে দুঃখ প্রকাশ মাত্র। এই সকল পূর্ব্বস্মৃতি-কথায় বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর-বিরহ-জ্বালা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়।

মর্ম্মীসখিদিগের দুইটী অন্তরঙ্গ সেবা—একটী বিরহ প্রসমনের চেষ্টা—আর একটী বিপ্রলম্ভরস পুষ্টির জন্য নব নব ভাবের বিরহ-রস-কলার সৃজন। এই দুইটি সেবা সখিদিগের মুখ্য সেবা। বিপ্রলম্ভরসপুষ্টির জন্য নানা ভাবে নানাবিধ পূর্ব্বস্মৃতিমূলক রস-কেলি বা রস-কলার সৃষ্টি প্রয়োজন। এই জন্যই বিপ্রলম্ভরস-ব্যঞ্জক নানা ভাবের পদ রচনার সৃষ্টি—এই জন্যই বিরহের দশ দশার সৃষ্টি—এই জন্য ভাব, মহাভাব, অধিরূঢ় মহাভাবের সৃষ্টি—এই জন্যই ভাবী, ভবন্, ও ভূত বিরহের কল্পনা। বিরহই বৈষ্ণবসাহিত্যের মহাকাব্যের প্রধান উপকরণ। বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদন-লালসায় গোলোক হইতে রসিকশেখর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নন্দনন্দনরূপে এই জন্যই ভৌমবৃন্দাবনে আবির্ভাব বা অবতরণ। শ্রীবৃন্দাবনে এই রসের পুষ্টি করণাভিলাষে তাঁহার দ্বারকা ও মাথুর-লীলারঙ্গ—দ্বাপরের লীলায় এই বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন পরিপূর্ণভাবে হয় নাই বলিয়া পুনরায় নদীয়ায় তাঁহার শ্রীগৌর-গোবিন্দরূপে বিশিষ্ট আবির্ভাব—এখানে তিনি স্বয়ং নীলাচলে বসিয়া নির্জ্জনে রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া এই বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন করিতেছেন অশেষ বিশেষে—আবার তাঁহার স্বরূপশক্তি সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে নির্জ্জনে বসিয়া সেই গৌর-বিরহ-রসই আস্বাদন করিতেছেন নানা ভাবে এবং তাঁহার মর্ম্মীসখিগণ নব নব ভাবে এই রসপুষ্টির জন্য নিত্য নূতন রস-মাধুরীর উপকরণ সৃষ্টি করিতেছেন—অপূর্ব্ব ভাব-চাতুরীর সহিত এই যে সখি কাঞ্চনার প্রভাতী কীর্ত্তনটি—ইহার সৃষ্টি হইয়াছে এই বিপ্রলম্ভ-রসপুষ্টির জন্য—ইহার রচয়িতা—ঢাকা নরসিংহদি নিবাসী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গৈক-জীবন রসিক ভক্ত পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত কবিগুণাকর শ্রীহরিচরণ আচার্য্য-মহাশয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

—"যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥"—

এস্থলে প্রভাত সময়ে নিদ্রাভঙ্গকালে বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণে তাঁহার প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রির

সম্ভোগ-রস-বিলাসের স্মৃতি উদিত হইয়াছে। সেই এক দিন—আর এই একদিন—এরূপ একটী অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রাণে খেলিতেছে। সখি কাঞ্চনা কে? প্রিয়াজিরই কায়ব্যূহ—পূর্ব্বলীলার সখি ললিতার তিনি বিশিষ্ট আবির্ভাব—তিনি তাঁহার প্রিয়সখির অন্তরে বাস করেন—সখির অন্তরের ভাব-কদম্ব-কোরকের সদা অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকেন—তাঁহার নিকট প্রিয়াজির মনোভাব লুকাইবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু তাঁহাদের বাহ্য ব্যবহার বিভিন্ন ভাবোদ্যোতক- "বাহ্যে রোষ—অন্তরে সন্তোষ" এই ভাবব্যঞ্জক ব্যবহার সখিদিগের সহিত বিরহিণী প্রিয়াজির—এ বড় মধুর ভাব—এ বড় মধুর লীলাভঙ্গী—এই অপূর্ব্ব লীলারসাস্বাদন-সুখদাত্রীগণের চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম।

প্রিয়াজি যখন তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছেন—সখি অমিতা তখন সময় ও সুযোগ পাইয়া আর একটী প্রভাতী কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

অলস অঙ্গে প্রিয়াজি সঙ্গে
শুতি আছে গৌরহরি।
রজনী জাগিয়া মন-মোহনিয়া
বহু রতিরণ করি॥
মন নাহি চায় উঠাইতে তাঁয়
অপরূপ দরশন।
ভুজে ভুজ দিয়ে অঙ্গ এলাইয়ে
শুতি আছে দুহুঁ জন॥
হিয়াপর হিয়া অমিয় মথিয়া
বদনে বদন শোভে।
চরণে চরণ চারু সুশোভন
মদন মরয়ে লোভে॥
হইয়ে একাঙ্গ প্রিয়াজি সঙ্গ
শুতি আছে শচীসুত।
(হেরি) যুগল বিলাস উপজিল হাস
কি আনন্দ অদ্ভুত॥
নদীয়ানন্দ গৌরচন্দ্র
প্রেমেতে আত্ম-হারা।
নদীয়ার রাই বিষ্ণুপ্রিয়া
ব্রজের কানাই গোরা॥
উঠ উঠ ধনি গৌর-সোহাগিনী
উঠ উঠ গোরা রায়।
সোনার বরণ প্রভাত অরুণ
ঐ দেখ দেখা যায়॥
নদীয়া যুগলে হেরি কুতুহলে
হাসিব পরাণ ভরি।
হরিদাসিয়ার এই সাধে বাধা
দিওনাক গৌরহরি॥"—

অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-মনন-পদ্ধতি।

বিরহিণী প্রিয়াজি তখন সখি কাঞ্চনাকে ছাড়িয়া সখি অমিতার মুখ বন্ধ করিতে গেলেন—অমিতা কিছু দূরে বসিয়া ছিলেন—প্রিয়াজিকে আসন ত্যাগ করিতে হইল। সম্মুখস্থ শ্রীগৌরগোবিন্দদেবের শ্রীপটমূর্ত্তির প্রাতঃকালীয় জাগরণাদি সেবার কার্য্য ছাড়িয়া তিনি কি করিয়া যাইবেন—এই ভাবিতেছেন—ইতিমধ্যে সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির হস্তবন্ধন মুক্ত করিয়া আর একটী প্রভাতী কীর্ত্তন-পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

"নিশি হ'ল ভোর উঠিল গৌর
কুসুম-শয়ন ছাড়ি।
বিষ্ণুপ্রিয়ারে জাগাইল ধীরে
অঙ্গ পরশ করি॥
সকলে তখন প্রিয় সখি যত
মিলিল আঙ্গিনা মাঝে।
নদীয়া-যুগলে মঙ্গল আরতি
করিতে সকলে সাজে॥
আইলা মালিনী সীতা ঠাকুরাণী
সর্ব্বজয়াকে ল'য়ে।
শচীমাতা আসি সম্ভাষিলা সবে
মধুভাষে কথা ক'য়ে॥
শুভ শঙ্খ বাজে হুলু হুলু ধ্বনি
ঘৃত মধু ধূপ দীপে।
নদীয়া-নাগরী করিলা আরতি
যুগলে নদীয়া-ভূপে॥

অগুরু চন্দনে ভূষিলা শ্রীঅঙ্গে
বরষি কুসুমরাশি।
নিরখি নয়নে যুগল-মাধুরী
সবে বলে হাসি হাসি॥
(ওহে!) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ
উঠ উঠ বেলা হ'ল।
নদীয়ার লোক জাগিয়া উঠিল
চারিদিকে কোলাহল॥
কত সখি কত বলিতে লাগিল
উপজিল কত হাসি।
দূরে থেকে দেখে যুগল আরতি
অভাগিয়া হরিদাসী॥"

বিরহিণী প্রিয়াজি শ্রীপটমূর্ত্তির জাগরণাদি নিত্য প্রাত-কৃত্যসেবায় নিযুক্ত আছেন,—সখি কাঞ্চনাও তাঁহার নিত্য প্রেমসেবা—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গযুগলের প্রাতঃকৃত্য-সেবায় রত আছেন—গৌরবল্লভা তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-সেবা কার্য্য ছাড়িয়া উঠিয়া সখি কাঞ্চনার মুখ বন্ধ করিতে পারিতেছেন না—এই তাঁহার দুঃখ,—তিনি মধ্যে মধ্যে সকরুণ সজল নয়নে কাতরভাবে তাঁহাকে করযোড়ে মিনতি করিতেছেন, ইঙ্গিৎ করিতেছেন,—মুখ বন্ধ কর—কিন্তু সখি কাঞ্চনা তাঁহার নিত্য ভজন ছাড়িবার পাত্রী নহেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল—তখন প্রিয়াজির ভজন শেষ হইলে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে ভজন-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অন্দর মহলে ধীরে ধীরে গমন করিলেন। সখিদ্বয় তখন কিছু দূর সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দাসীদিগের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া পুনরায় আসিয়া ভজন-মন্দিরের একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া তাঁহাদের প্রিয় সখি সম্বন্ধে দু'একটী প্রাণের কথা কহিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা সজল নয়নে প্রেম-গদগদবচনে অমিতাকে কহিতেছেন—"প্রিয় সখি অমিতে! হায়! সে কাল আর এ কাল,—সে দিন আর এ'দিন! আমাদের এই প্রাণের সখি বিষ্ণুপ্রিয়া নদীয়া লীলায় প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তখন কি করিতেন মনে আছে কি? সখি তোমার যদি মনে না থাকে আমি মনে করিয়া দেই—

যথারাগ।

"প্রিয়াজি আগেতে উঠিয়া প্রভাতে
বাহিরিলা মধু-সাজে।
রুণু ঝুণু ঝুনি অলঙ্কার-ধ্বনি
কানেতে মধুর বাজে॥
নদীয়া-নাগর করিয়া আদর
কহিলেন রস-কথা।
হাসিয়া প্রিয়াজি বসন সম্বরি
চলিলা শচীমা যথা॥
অলস অঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে
শচীমার ঘরে চলে।
শয্যাতে বসি শচীমাতা হাসি
"এস মা এস মা" বলে॥
আসিল কাঞ্চনা অমিতাদি সখি
প্রিয় সখি দেখিবারে।
মুখ চেয়ে হাসে সুখ-নীরে ভাসে
নিশি-লীলা মনে ক'রে॥
(তখন) শচীমার সনে গঙ্গা সিনানে
চলে সুখে প্রিয়াজি।
সখি সঙ্গে গেল প্রভাত সময়ে
আর কত জনা ঝি॥
(যেন) রাজার ঝিয়ারি অবতার-নারী
পথে চলে নদীয়ার।
রূপের ছটায় দামিনী চমকে
দশ দিশি উজিয়ার॥
যে দেখে সে রূপ জ্যোতি অপরূপ
প্রণমি তাঁহার পায়।
স্মরণ মনন প্রভাতী কীর্ত্তন
দাসী হরিদাসী গায়॥"

অষ্টকালীয় স্মরণ-মনন-পদ্ধতি।

গান করিতে করিতে সখি কাঞ্চনার নয়নসলিলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল—সখি অমিতাও অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—কিয়ৎকাল এই ভাবেই গেল—নীরব রোদনেই মনের দুঃখ কোনগতিকে তাঁহারা নিবারণ করিলেন। সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে আপন নয়নদ্বয় মুছিলেন এবং পরম প্রেম-ভরে অমিতার নয়নজল মুছাইয়া দিয়া পুনরায় ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"সখি অমিতে! আমাদের প্রাণের সখি বিষ্ণুপ্রিয়ার তাৎকালিক অপরূপ রূপের কথা মনে পড়ে কি?" অমিতা এই প্রশ্ন শুনিয়াই কাঁদিয়া আকুল হইলেন

—কোন উত্তর দিতে পারিলেন না—পূর্ব্বস্মৃতি সকল তাঁহার মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহাকে আজ পরম বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে—তিনি তাঁহার দক্ষিণ কপোলদেশে বাম হস্ত বিন্যস্ত করিয়া কেবল অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। সখি কাঞ্চনা তখন অতি মৃদু মধুর স্বরে গৌর-বল্লভার তাৎকালিক রূপবর্ণনার প্রাচীন পদটির ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"তবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সখিগণ সঙ্গে।
সুরধুনী সিনানে চলিলা বহু রঙ্গে॥
কনক দামিনী জিনি অঙ্গের বরণ।
কত কোটি চাঁদ শোভা সুচারু বদন॥
বেনী ভুজঙ্গিনী শোভে নিতম্ব উপরে।
গ্রন্থিত কনক ঝাঁপ বকুলের হারে॥
কুটিল কুন্তল যেন ভ্রমরের পাঁতি।
দুইগণ্ডে ঝলমল মুকুরের ভাতি॥
কর্ণে সাজে মণিময় কর্ণিকা ভূষণ।
নিম্নে দোলে ক্ষুদ্র ঝাঁপা মুকুতা খিচন॥
কর্ণভূষা ভার বহে সুবর্ণ শিকলে।
শলাকা সহিতে বদ্ধ করি শ্রুতিমূলে॥
স্বর্ণ সূত্রে সূক্ষ্ম মুক্তা করিয়া রচন।
পদ্মরাগমণি মাঝে সিথার বন্ধন॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু প্রভাত অরুণ।
কস্তুরী-চিত্রিত তার পাশে সুশোভন॥
মৃগমদবিন্দু শোভে চিবুক উপরে।
সুরঙ্গ অধরে মৃদু হাস মনোহরে॥
চকিত চাহনি যেন চঞ্চল খঞ্জন।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখ কাঁপয়ে মদন॥
তিল ফুল জিনি নাসা গজমুক্তা দোলে।
গলে চন্দ্রহার তঁহি মালতির মালে॥
ছোট বড় ক্রম করি সুবর্ণের হারে।
কণ্ঠ দেশে শোভা ধরিয়াছে থরে থরে॥
কুচ যুগ শোভা স্বর্ণকলস জিনিয়া।
কনক চম্পক কলি উপরে বেড়িয়া॥
চন্দনের পত্রাবলী তাহাতে লিখন।
গজমতি হারে মণি চতুষ্কি-শোভন॥
সুবর্ণ মৃণাল ভুজযুগের বলন।
শঙ্খ মণি কঙ্কণাদি তাহে বিভূষণ॥
বাজুবন্ধ বলয় বন্ধন ভুজমূলে।
তহি বদ্ধ পট্ট আদি স্বর্ণঝাঁপা দোলে॥
রাঙ্গা করতলাঙ্গুলি মুদ্রিকামণ্ডিত।
তর্জ্জনীতে শোভে হেম মুকুরে জড়িত॥
পরিধানে শোভে দিব্য পট্ট মেঘাম্বরে।
অঞ্চল নির্ম্মাণ মণি মুকুতা ঝালরে॥
গুরুয়া নিতম্ব আর ক্ষীণ মধ্যদেশে।
কিঙ্কিনী রসনা মণি তাহাতে বিলাসে॥
রাতুল চরণযুগ যাবক-মণ্ডিত।
বঙ্করাজ রতন নূপুর বিভূষিত॥
মধুর গমন গতি হংসরাজ জিনি।
চটক গুঞ্জরে যেন নূপুরের ধ্বনি॥
নবনীত জিনিয়া কোমল তনুখানি।
হাস পরিহাসে স্নান করি সুরধুনী॥
গৃহে আসি বস্ত্র পরিবর্ত্ত যে করিলা।
বিষ্ণুপূজা লাগি সজ্জা করিতে লাগিলা॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃত।

প্রিয়াজির এই অপরূপ রূপরাশি বর্ণনা করিতে করিতে সখি কাঞ্চনা একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন—তিনি যেন সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী পরমা রূপবতী নববালা গৌর-বল্লভার রূপ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন—প্রিয়াজির প্রতি অঙ্গের তাৎকালিক অপরূপ রূপমাধুরী যেন তাঁহার নয়নে এখনও লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে—প্রেমানন্দ-ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া গৌর-বক্ষ-বিলাসিনীর অপরূপ রূপ বর্ণনা করিয়া নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন,—আর ভাবিতেছেন আজ তাঁহার ভজন সার্থক হইল।

সখি অমিতার স্তম্ভভাব—তিনি স্থিরভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে প্রিয়াজির অপরূপ রূপমাধুরীকথা শ্রবণ করিয়া যেন তাহা সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন—তিনি উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণা,—তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণ বিবর্ণ ধারণ করিয়াছে—তাঁহার বর্ণ যেন শ্বেতবর্ণ বোধ হইতেছে—মুখে কোন কথা নাই—নিস্পন্দ শরীর—নয়ন মুদ্রিত—যেন ধ্যানমগ্না।

সখিদ্বয় কেহ কাহারও ভাবানুসন্ধানে ব্যগ্র নহেন—

স্ব স্ব ভাবে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অপরূপ রূপ-সুধা পান করিতেছেন। গানটী শেষ হইলে অনেকক্ষণ পরে সখি কাঞ্চনা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া দেখিলেন সখি অমিতার বাহ্যজ্ঞান নাই—তিনি প্রেমাবেশে ভূমিতলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং অমিতার কর্ণের উপর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যথা—

"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ নাগরীক প্রাণ।
কলিযুগে প্রেম-ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার দান॥"

অমিতা নদীয়া-যুগলের নাম শ্রবণমাত্রেই বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন—তিনি অঙ্গমোড়া দিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার প্রিয়সখিকে পরমপ্রেমভরে নিজ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া তাঁহার চোখে মুখে শীতল জলের ছিটা দিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে বীজন করিতে লাগিলেন,—ক্রমে সখি অমিতাও কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন দুই জনে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন দিবা দুই দণ্ড অতীত হইয়াছে—প্রিয়াজির ভজনমন্দিরে পুনঃপ্রবেশের সময় হইয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অন্তঃপুর হইতে প্রিয়াজিকে সঙ্গে করিয়া ভজনমন্দিরের দ্বারে আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন—তখন গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে শেষ নগরকীর্ত্তনের একটি দল আসিয়া নিম্নলিখিত প্রাচীন গৌরকীর্ত্তনের পদটীর ধুয়া ধরিয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে গমন করিল।

রাগ তুড়ি।

—"জলকেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদগণ সঙ্গে গোরা জলেতে নামিল।
কার অঙ্গে কেহ জল ফেলিয়া সে মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
হুলাহুলি কোলাকুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহন না যায়।
বাসুদেব ঘোষ তাহে গোরা গুণ গায়॥"

গৌরপদতরঙ্গিনী।

সখিগণসঙ্গে গৌরবল্লভার গঙ্গাস্নানের পর তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ তাঁহার পার্ষদভক্তগণসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। শ্রীনবদ্বীপ-লীলার পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে সখিদ্বয়ের স্মৃতিপথে যতই উদিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা প্রেমাবেশে পরম বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইতে লাগিলেন।

প্রিয়াজি যেন এসকল কিছুই জানেন না—এরূপ একটী ভাব দেখাইয়া পরম গম্ভীরভাবে নিজ ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যেরূপ গম্ভীরভাবে তাঁহার ভজনমন্দির হইতে অদ্য প্রাতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন—ঠিক সেই ভাবেই তিনি পুনঃ প্রবেশ করিলেন—সখিদ্বয় মন্দিরদ্বারে বসিয়া সংখ্যানামজপে মগ্ন হইলেন—প্রিয়াজি মন্দিরাভ্যন্তরে নিজ আসনে বসিয়া তাঁহার দৈনন্দিন ভজনসাধনে রত হইলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ দেওঘর।
১৫ই পৌষ ১৩৩৭
শ্রীএকাদশী, রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(১৭)

—"যা শক্তিঃ শ্রুতিভিঃ পরেতি কথিতা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে।
শ্রীরাধেতি সুবিশ্রুতা ব্রজবিধোরারাধনাদ্ গোকুলে॥
শ্রীগৌরে প্রকটং গতে নবযুতে দ্বীপে শচীকেতনে।
সা লেভে প্রিয়কারিণী ভগবতঃ সংজ্ঞাং চ বিষ্ণুপ্রিয়া॥"

ঠাকুর বংশীবদন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বড় প্রিয়ভক্ত ছিলেন—শচীমাতাকে তিনি মাতৃসম্বোধন করিতেন—তিনিও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পর দুখিনী শ্রীশচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িয়াছিল ঠাকুর বংশীবদনের উপর—এই গুরু ভার তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন আত্যন্তিক গৌর-প্রেম-নিষ্ঠার সহিত সানন্দে বহন করিয়াছিলেন। শচীমাতার অপ্রকটে এই গুরুভার তাঁহার পক্ষে গুরুতর হইতে গুরুতম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সর্ব্বভাবে গৌরশূন্য গৌরগৃহের আজীবন তত্ত্বাবধারক ছিলেন।

বহির্বাটীতে তিনি আর প্রভুর পুরাতন ভৃত্য ঈশান থাকিতেন—দামোদরপণ্ডিত কিছুদিন পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কৃপাদেশে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া ঈশানের সহিত একত্রেই গৌরশূন্য গৌরগৃহের বহির্বাটীতে উভয়ে বাস করিতেন। এই তিনজন পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সেখানে থাকিবার অধিকার ছিল না।

এই বংশীবদন ঠাকুর গৌর-বিরহ-তাপ-দগ্ধা "শাশুড়ী-বধূর" প্রাণপণে সেবা করিতেন—কায়মনোবাক্যে গৌর-জননী ও গৌর-ঘরণীর সেবা-ফলে তাঁহার প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদেশ হয় শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে—একই সময়ে এরূপ স্বপ্নাদেশ তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকেও দেন। সে সকল লীলাকথা পরে মধ্যখণ্ডে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই বংশীবদন ঠাকুর গৌরশূন্য গৌরগৃহে বাসকালীন পুত্রশোকাতুরা শচীমাতা ও বিরহিণী প্রিয়াজির শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতেন—আর নির্জ্জনে বসিয়া কখন কখন উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বহির্বাটীর এক প্রান্তে নির্জ্জনে বসিয়া তিনি নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া করুণ ক্রন্দনের সুরে তাঁহার স্বরচিত একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ গান্ধার।

"আর না হেরিব, প্রসর কপালে,
অলকা-তিলকা কাচ!
আর না হেরিব, সোনার কমলে,
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না হেরিব, শ্রীবাস-মন্দিরে,
সকল ভকত লৈয়া।
আর না নাচিবে, আপনার ঘরে,
আর না দেখিব চাঞা॥
আর কি দু'ভাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবেন এক ঠাঁই।
নিমাই বলিয়া, ফুকার সদাই,
নিমাই কোথাও নাই।
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া,
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর, না হেরি কেমনে,
রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী-বধূর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায়॥"

গৌরপদতরঙ্গিণী।

গান শুনিয়া বৃদ্ধ দামোদরপণ্ডিত ও ঈশান তথায় উপস্থিত হইলেন—তাঁহারাও কাঁদিয়া কাঁদিয়া পদকর্ত্তার সহিত এই কীর্ত্তনগানের দোহার দিতেছেন। গৌরশূন্য গৌরগৃহের বহির্বাটীতে করুণ প্রেমক্রন্দনের ধ্বনি উঠিল।

সন্ধ্যাকাল—মাঘ মাস—পূর্ণিমা তিথি—গঙ্গাতীরে নদীয়ার বহু নরনারী একত্রিত হইয়াছেন—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গঙ্গাসৈকতে বসিয়া সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছেন—নদীয়াবাসিনী কুলনারীবৃন্দ কলসকক্ষে জল আনিতে গঙ্গাতীরে আসিয়াছেন—গৌরশূন্য গৌর-গৃহ-দ্বার দিয়া তাঁহাদের গঙ্গাঘাটের যাতায়াতের পথ। সেই পথ দিয়া সকলেই যাতায়াত করিতেছেন—বহির্বাটীরও দ্বার অর্গল-বদ্ধ—এই রুদ্ধদ্বার বহির্বাটীর বিস্তৃত প্রাঙ্গনের এক প্রান্তে বসিয়া তিন জনে প্রাণঘাতী করুণস্বরে গৌর-বিরহের ঝঙ্কার উঠাইয়াছেন—তাহার করুণধ্বনি বাহিরের লোকে শ্রবণ করিয়া পরম ব্যাকুলিত চিত্তে প্রাচীরের ভিতের নিকট এবং গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া পরমপ্রেমভরে শ্রবণ করিতেছে এবং কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। এই পদটির প্রত্যেক শব্দটী তাঁহারা প্রত্যেকেই সুস্পষ্ট স্বকর্ণে শুনিতে পাইতেছে, আর গায়ক এবং দোহারদ্বয়ের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনিও তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত অস্থির করিয়া তুলিতেছে। গৌরশূন্য গৌরগৃহের বহির্দ্বারে এই ভাবে বহুলোকের সংঘট্ট হইয়াছে এবং তাহাদের সমবেদনাসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস ও হাহাকার-ধ্বনিতে গঙ্গাতীরচারী নরনারী-মাত্রেরই হৃদয়ে গৌরবিরহানল উদ্দীপ্ত করিতেছে।

বিরহিণী প্রিয়াজি যথারীতি তাঁহার দৈনন্দিন ভজনকৃত্য সমাধান করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার ভজন-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া বসিয়াছেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার সঙ্গেই আছেন। বহির্বাটীর করুণ ক্রন্দনের রোল অন্তঃপুরে বেশ শুনা যাইতেছে—গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজিও উৎকর্ণ হইয়া বংশীবদন ঠাকুরের কীর্ত্তন শুনিতেছেন।

"আর না হেরিব, প্রসর কপালে
অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব, সোনার কমলে,
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥"

শুনিবামাত্র বিরহিণী প্রিয়াজি পরম বিহ্বল ও বিকল চিত্ত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে—বদনচন্দ্র বিনত করিয়া প্রিয়াজি অশ্রুজলে ভূমিতল সিক্ত করিতেছেন—ক্রমে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ প্রেমাবেশে শিথিল হইয়া আসিল—তবুও ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন—শ্রীহস্তে তাঁহার হরিনামের মালা—গাত্রে একখানি জীর্ণ নামাবলী স্কন্ধ-কণ্ঠদেশে তুলসীর মালা—নাসিকামূলে গোপীচন্দনের তিলক—নয়নের জলে বক্ষ ভাসাইয়া গৌর-বিরহিণী আজ গৌরকীর্ত্তন শুনিতেছেন।

পদকর্ত্তা স্বয়ং গান গাইতেছেন—তিনি যখন পদের মধ্যম কলিটীর ধুয়া ধরিলেন—

—"নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ॥"—

তখন আর বিরহিণী প্রিয়াজি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি "হা প্রাণবল্লভ! হা নবদ্বীপচন্দ্র"! বলিয়া শিরে বিষম করাঘাত করিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সখিদ্বয় তখন তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্তা হইলেন।

কোন বিশেষ কাজে বহিরাঙ্গনের দ্বার খুলিবামাত্র নদীয়াবাসী বহু নরনারী গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বহিরাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর বংশীবদন ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু তাঁহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্যই নাই—তাঁহারা স্ব-ভাবে যেন সেই নির্জ্জনেই ভজন করিতেছেন—তাঁহারা তাঁহাদের সেই করুণ-ক্রন্দনের স্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—পদকর্ত্তা বংশীবদন ঠাকুর শেষ চরণ গাহিতে গাহিতে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া সেই বিস্তৃত বহিরাঙ্গনে ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কেবল সেই একই কথা—

—"কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।"—

অতিবৃদ্ধ ঈশান এবং পণ্ডিত দামোদরও ঠাকুর বংশীবদনের সঙ্গে গৌরশূন্য গৌর-গৃহের প্রাঙ্গনের ধূলায় পড়িয়া প্রেমাবেগে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন—উপস্থিত দর্শকবৃন্দ একে একে শচী-আঙ্গিনায় দীঘল হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন—তাঁহাদের মুখে মাত্র পদের শেষ কথাটি—

—"বংশী গড়াগড়ি যায়।
এস হে গৌরাঙ্গ রায়॥"

গৌরশূন্য গৌর-গৃহের বহিরাঙ্গনে ভীষণ আর্ত্তনাদের ধ্বনি উঠিল—কীর্ত্তন বন্ধ হইয়াছে—এখন কেবল আর্ত্তনাদ ও হাহাকারের ধ্বনি। এই দর্শকবৃন্দের মধ্যে নদীয়া-রমণীগণও আছেন—তাঁহারাও কেহ কেহ ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন—কেহ বা প্রাচীরের গায়ে অঙ্গ হেলাইয়া স্তম্ভভাবে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন—বর্ষীয়সী রমণীগণ অঙ্গনে বসিয়া পড়িয়া বক্ষ চাপড়িয়া ভীষণ আর্ত্তনাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটী গৌরবিরহিণী গৌর-বল্লভার বাল্য সখি ছিলেন—তিনি এখন যুবতী—তিনি এই কাষ্ঠপাষাণভেদী করুণ দৃশ্য চক্ষে আর যেন দেখিতে পারিলেন না—তিনি গৌরবিরহে প্রেমোন্মাদিনীভাবে আলুথালু বেশে ধৈর্য্যহারা হইয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিলেন—গঙ্গাতটে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ বয়স্যগণ সঙ্গে যেখানে উপবেশন করিতেন—সেই স্থানে গিয়া পাগলিনীর মত বক্ষে করাঘাত করিয়া কত কি যেন প্রলাপবাক্য বলিতে লাগিলেন—প্রিয়াজির পরম ভক্ত এবং চিহ্নিত দাস পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের একটী প্রাচীন পদে গৌরপাগলিনী এই নদীয়ানাগরীটির তাৎকালিক অবস্থা ও মনের ভাব অতি সুন্দর প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই পদরত্নটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

রাগ ধানশী।

"তছু দুখে দুখী, এক প্রিয়সখি,
গৌর-বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া, চলিল ধাইয়া,
যেমতি বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে, সুরধুনী তীরে,
যেখানে বসিতা পহুঁ।
তথায় যাইয়া, গদগদ হৈয়া,
কি কহয়ে লহু লহু॥

সে সব প্রলাপ, বচন শুনিতে,
পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল পুরে, যৈছন গৌড়ে,
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর, হিয়া গর গর,
কহয়ে কাঁদিয়া কথা।
মাধব ঘোষের, হিয়া বিয়াকুল,
শুনিতে মরম ব্যথা॥”

গৌরপদতরঙ্গিণী।

কৃপানিধি পাঠকপাঠিকাবৃন্দ! বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার ভজন-মন্দির-দ্বারে সখি-ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন—কৃপা করিয়া একবার সেখানে চলুন—গিয়া দেখুন গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার কিরূপ অবস্থা!

সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে এক জন দাসী বহিরাঙ্গণে গিয়া গৌরবিরহদগ্ধ সমবেত নরনারীবৃন্দকে কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিনয়নম্র-বচনে করযোড়ে কহিলেন—“প্রিয়াজির অবস্থা বড় শোচনীয়—তিনি এখনও মূর্চ্ছিতা—আপনারা কৃপা করিয়া রোদন সম্বরণ করুন।” ঈশানের নিকটে গিয়া তাঁহারও কাণে কাণে এই দাসীটি কি বলিলেন—তাঁহার ফলে ঈশান ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে আঙ্গিনা হইতে উঠিয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত নরনারীবৃন্দের প্রত্যেকের চরণে ধরিয়া কাতরনিবেদন করিলেন—“কৃপানিধি নদীয়াবাসী গৌরভক্তগণ! আপনারা কৃপা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করুন এবং স্ব স্ব গৃহে গমন করুন—এখানে অধিক গোলোযোগ হইলে আমার ঠাকুরাণীকে রক্ষা করা দায় হইবে”—এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ঈশানের যেন হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল—কারণ গৌরগৃহ হইতে গৌরভক্তগণকে এরূপভাবে বিদায় দিবার অধিকার তাঁহার কখনই ছিল না—এখন কৃপাময়ী গৌর-বল্লভা তাঁহাকে সেই অধিকার দিয়া কৃতার্থ করিলেন কি অধঃপাতিত করিলেন, সরল স্বভাব নিরক্ষর বৃদ্ধ ঈশান তাহা বুঝিতে পারিল না।

ঈশানের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে লোকসংঘট্ট কমিয়া গেল—বহির্দ্বার পুনরায় বন্ধ হইল। বিরহিণী প্রিয়াজির অবস্থা জানিবার জন্য অনেকেই পরমোৎকণ্ঠিতভাবে গঙ্গা-তীরে বসিয়া রহিলেন। নিতান্ত নিজজন কয়েকজন বহিরাঙ্গনের মধ্যেই রহিলেন।

ঠাকুর বংশীবদন, এবং দামোদর পণ্ডিত এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন—তাঁহারা প্রিয়াজির অবস্থা শ্রবণ করিয়া এখন আত্মগ্লানির বিষম অনুতাপে অনুতপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন কি সর্ব্বনাশ করিলাম! কেন আমাদের আজ এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল? ঠাকুর বংশীবদনের অনুতাপের আর সীমা নাই—কারণ তিনিই আজ প্রিয়াজির এই দুঃখের মূল কারণ। তিনি আকুল-প্রাণে দুই বাহু দ্বারা বৃদ্ধ ঈশানের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বালকের মত কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মুখে কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না—চক্ষের চাহনিতে ও বদনমণ্ডলের ভাবে সুস্পষ্ট তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাবটী বেশ পরিস্ফুট হইতেছে! সে ভাবটী এই—“ঈশান দাদা! আমি কি করিতে কি করিলাম?” ঈশান তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কত কি সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন—কিন্তু সে সকল কথা ঠাকুর বংশীবদনের কানেও গেল না—সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসমান শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া কোথায় যে চলিয়া গেল, তাহার ঠিকানা নাই।

এদিকে সখি কাঞ্চনা ও অমিতা গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন। অন্যান্য সখিগণ ও দাসীগণ সকলেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—তাঁহারাও অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারিণী। সকলেই কান্দিয়া আকুল।

—“চৌদিকে সখিগণ, ঘিরি করে রোদন,
তুলা ধরি নাসার উপরে।”—

এইরূপে চারি দণ্ড রাত্রি পর্য্যন্ত গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি গৌরবিরহ-বাণে বিদ্ধ হইয়া সখিক্রোড়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া জড়বৎ পড়িয়া আছেন। মন্দ মন্দ গৌরনাম কীর্ত্তন সর্ব্বক্ষণ চলিতেছে, কিন্তু আজ আর কিছুতেই প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইতেছে না। সখিগণ সকলেই মহা ভীতা হইয়াছেন। বহিরাঙ্গনে যাঁহারা আছেন—তাঁহারা ঈশানকে দিয়া মুহুর্মুহু প্রিয়াজির সমাচার লইতেছেন—সকলেই ম্রিয়মান,—যেন প্রতিমুহূর্ত্তে সমূহ বিপদ গণিতেছেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সখি কাঞ্চনা তাঁহার মূর্চ্ছিতা প্রিয়সখির কানের নিকট মুখ দিয়া যেন কি মন্ত্রপাঠ করিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

রাগ কেদার।

“গৌরাঙ্গচাঁদ! হের নয়নের কোনে।
শরণ লইনু তোমার শীতল চরণে॥

দিয়েছি তোমারে দায় আমার কেহ নাই।
তুমি দয়া না করিলে যাব কার ঠাই॥"—
ঠাকুর নরহরি।

এই প্রার্থনাগীতির মধুর ধ্বনি বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণে প্রবেশ করিল—তিনি একবার অঙ্গমোড়া দিলেন—অমনি সঙ্গে সঙ্গে সখি অমিতা আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

শ্রীরাগ।

"—আরে মোর গৌরাঙ্গ সোনা।
পাইয়াছি তোমারে কত করিয়া কামনা॥
আপন বলিয়া মোর নাহি কোন জনা।
রাখহ চরণতলে করিয়া আপনা॥
তোমার বদনে কিবা চাঁদের তুলনা।
দেহ প্রেম-সুধারস রহুক ঘোষণা॥
কমল জিনিয়া তোমার শীতল চরণ।
বাসু ঘোষে দেহ ছায়া তাপিত এজন॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এবার বিরহিণী গৌর-বল্লভা অকস্মাৎ একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া গায়িকার মুখের প্রতি চাহিয়াই পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তখন সখি কাঞ্চনা পুনরায় তাঁহার কলকণ্ঠে আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

শ্রীরাগ।

—"গৌরাঙ্গ! তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু॥
এ কুলে ও কুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষে কহে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদ ছায়া দিয়া॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌরবিরহিণী গৌর-বল্লভা এবার দুই চক্ষু উন্মীলন করিয়া সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি করুণ নয়নে একবার শুভদৃষ্টিপাত করিলেন—যেন কিছু বলিবার বাসনা—চক্ষের চাহনিতে এরূপ ভাবই প্রকাশ পাইতেছে—কিন্তু তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক—কথা কহিবার শক্তি নাই। সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে অমিতা তখন একটু চরণামৃত আনিয়া প্রিয়াজির মুখে দিলেন—এবং চক্ষে ও বদনমণ্ডলে জলের ছিটা দিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির বদনমণ্ডল তখন প্রশান্তভাব ধারণ করিল—তিনি যেন কিছু সুস্থ বোধ করিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন আর একটী গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"উঠ সখি! গোরাচাঁদ দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
"বিষ্ণুপ্রিয়া" নাম ধরি ডাকে ধীরে ধীরে॥
আঁখি তার ছল ছল, দু'নয়নে ঝরে জল,
কি যেন কি কথা তোমা চাহে বলিবারে।
শত অপরাধী যেন, মনে মনে ভাবে হেন,
সাহস না করে সখি! আসিতে ঘরে।
অভিমান দূরে রাখি আন গিয়ে তুমি ডাকি,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে গোরা ডাকে কাতরে॥
হরিদাসী দূরে থাকি দেখে নাগরে॥"—
গৌর-গীতিকা।

এই গানটী শুনিয়া গৌর-বল্লভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—সখি কাঞ্চনার প্রতি করুণ নয়নে চাহিলেন—সে চাহনীর মর্ম্ম "সখি প্রাণবল্লভকে আদর করিয়া গৃহে ডাকিয়া আন,"—তখন সখি কাঞ্চনা কি বলিয়া গৌরাবাহন করিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন,—

যথারাগ।

—"এস এস এস ওহে নদীয়া-নাগর।
নদীয়া-নাগরী জানে তোমার আদর॥
এস বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ, মিলাইব প্রিয়া সাথ,
ছাড় যদি যতি-বেশ ওহে নটবর।
নদীয়া-নাটুয়া-বেশে, কথা কহ হেসে হেসে,
নদীয়া-নাগর তুমি শচীর কোঙর॥
কহ দু'টি রস-কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
পদে ধরি হরিদাসী লয়ে যাবে ঘর।
বসাবে প্রিয়ার বামে, নদীয়া-যুগল-ঠামে
হেরিবে যুগলরূপ অতি মনোহর॥—
গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজির তখন বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে—তিনি

সখিক্রোড়ে তখনও শায়িতা আছেন—উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু কাঞ্চনার মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভের শুভাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি অকস্মাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় অসম্বর বেশে উঠিয়া বসিলেন,—সখিদ্বয় তাঁহারই মলিন বসনাঞ্চলে তাঁহার অঙ্গ আবরণ করিয়া দিলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভা আলুথালু বেশে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন—সখিদ্বয় ধরিয়া রাখিয়াছেন—উঠিতে দিতেছেন না—পাছে পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া যান। প্রিয়াজির দৃষ্টি—অন্তঃপুরের দ্বারের দিকে—তিনি দেখিতেছেন দ্বার রুদ্ধ—কেহই সেখানে নাই। সখি কাঞ্চনার পূর্ব্ব গানে আছে—

—"উঠ সখি! গৌরাচাঁদ দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
"বিষ্ণুপ্রিয়া" নাম ধরি ডাকে ধীরে ধীরে॥"—

এই কথাগুলিই যেন বিরহিণী গৌর-বল্লভার এখন কর্ণে বাজিতেছে—তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে কথাগুলি প্রবেশ করিয়াছে—কর্ণের মধ্যে যেন বাসা করিয়াছে। গৌর-বিরহিণীর কর্ণে আর কোন কথাই যাইতেছে না—কেবল ঐ কথা "দুয়ারে দাঁড়ায়ে" আর "বিষ্ণুপ্রিয়া নাম ধরি ডাকে ধীরে ধীরে"। তিনি তাঁহার "দুয়ারে" কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না—কাহারও নাম ধরিয়া ডাকাও শুনিতে পাইতেছেন না। কেবলমাত্র সখি কাঞ্চনার গানের সুরটী তাঁহার কানের মধ্যে বড়ই মধুর বাজিতেছে মাত্র।

এক্ষণে তিনি পাগলিনার মত উদাসনয়নে কেবলমাত্র চাহিতেছেন—কখনও বামে,—কখনও দক্ষিণে,—কখনও উর্দ্ধে—তাঁহার উদাস নয়নদ্বয়ের উদাস দৃষ্টি—তাঁহার কেশ-দাম আলুথালু—তিনি কখনও প্রেমাবেশে মস্তক দুলাইতেছেন—কখনও বা অট্টহাসি,—কখন বা চীৎকার করিয়া বিকট হাসির লহরী তুলিতেছেন—যেন একেবারে উন্মাদগ্রস্তা। বিরহিণী প্রিয়াজির মনে এক্ষণে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। তাঁহার প্রাণবল্লভ সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে একবার যতি-বেশে তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবা ও জন্মভূমি দর্শন করিতে নবদ্বীপে শুভাগমন করিয়াছিলেন—তাঁহার জন্ম-ভিটার দুয়ারে তিনি একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন—সেই পূর্ব্বস্মৃতিকথা বিরহিণী প্রিয়াজির মনে আজ উদয় হইয়াছে। তখন শচীমাতা প্রকট ছিলেন—সেই হৃদিবিদারক পূর্ব্বস্মৃতির প্রাণঘাতী ঘটনাবলীর এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত" ও "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে" তাহা কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ বিস্তারিত পাঠ করিবেন।

বিরহিণী গৌরবল্লভা মনে মনে ভাবিতেছেন বোধ হয় সেই সন্ন্যাসবেশেই তাঁহার প্রাণ-বল্লভ বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহাকে এবার কৃপা করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। এই ভাব-তরঙ্গটি যখন তাঁহার মানস-সরোবরে খেলিতেছে—তখন তিনি প্রবল বল সঞ্চয় করিতেছেন—সখিদ্বয়ের হাত ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন—মুখে কিন্তু কোন কথা নাই—এ সকলই তাঁহার অন্তরের ভাব-রাজ্যের ভাব-সমুদ্রের অপূর্ব্ব-তরঙ্গ-ভঙ্গী। অন্তরঙ্গা সখিগণ ও দাসীগণ সকলেই সেখানে উপস্থিত—সকলেই আজ প্রিয়াজিকে লইয়া মহা বিপদে পড়িয়াছেন—বিশেষ করিয়া সখি কাঞ্চনার আজ আর অনুতাপের পরিসীমা নাই। বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদয়ে তিনিই সেই প্রাণঘাতী পূর্ব্ব-স্মৃতির উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছেন। নীরব মর্ম্মবেদনায় সখি কাঞ্চনার প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে—তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। এখন কি করিলে গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার এই আগন্তুক উৎকট গৌর-বিরহ-জ্বালার উপসম হয়—তাঁহার হৃদয় হইতে এই আগন্তুক ভাবতরঙ্গাঘাতের সূচীভেদ্য বেদনা দূরীভূত হয়—এই চিন্তায় অধীর হইয়া সখি অমিতার কানে কানে গোপনে তিনি কি বলাবলি করিলেন। সখি অমিতা তখন সেই পদপরিচয়িত্রী দাসীটিকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন—সখি কাঞ্চনা তখন তাহারও কানে কানে কি বলিলেন—কেহ তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু দীনা দাসীটির দুর্ব্বল হৃদয় ভয়ে দুরু দুরু করিতে লাগিল—তিনি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছেন—যাহাতে গৌর-বল্লভার এই দশা হইয়াছে—তিনি ভয়ে ও ক্ষোভে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার অপরাধ কি তাহা তিনি বুঝিয়াছেন—তিনি যে বুদ্ধিহীনার মত কাজ করিয়াছেন তাহা তাঁহার রচিত গানটীতেই প্রকাশ হইয়াছে।

"ছাড় যদি যতি বেশ ওহে নটবর!"

তবে তোমাকে তোমার প্রাণ-বল্লভার সহিত মিলন করাইয়া দিব। বিরহিণী প্রিয়াজির এখনকার মনের ভাব স্বতন্ত্র—তিনি এখন একটিবার মাত্র তাঁহার প্রাণবল্লভের

দর্শন ভিখারিণী—সে যে বেশেই হউক—তাঁহার মনের ভাব তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহার যতিধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন—তিনি সন্ন্যাসী—তাঁহার জগতগুরু সন্ন্যাসবেশ অত্যন্ত স্বাভাবিক—তিনি জগতগুরুরূপে এই সন্ন্যাস-বেশে কলিহত জীবকে উদ্ধার করিতেছেন—তাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন—আমি কেন তাঁহার যতি-ধর্ম্মের বা যতি-বেশের বিরোধী হইব?—আমার একমাত্র বাসনা—তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন—যে সুখে আমি চিরদিন বঞ্চিত—এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না,—শান্তিপুরে আসিয়া আমার প্রাণবল্লভ নদীয়াবাসী সর্ব্বলোককে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে দিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া দর্শন দান দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন—কেবল একজন ছাড়া—সেই অভাগিনী জনম-দুখিনী বিষ্ণুপ্রিয়া আমি। আমি তখন মনের দুঃখে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়াছিলাম,—

"—এ দুঃখ জীবনে মোর কভু যাবে না।
(তুমি) দেশে এসে এ দাসীরে দেখা দিলে না॥
না হ'তাম যদি আমি, তোমার রমণী-মণি,
দরশন দিতে তুমি—একি ছলনা।
এ দুঃখ জীবনে মোর কভু যাবে না।"

গৌর-গীতিকা।

প্রিয়াজির মনের ভাবটি এখন এইরূপ—কিন্তু অবোধিনী দীনা দাসীটি তাঁহার গুরুরূপা সখির আন্তরিক মনের ভাব না বুঝিয়া তাঁহার বিনা অনুমতিতে একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে—যাহাতে এতখানি কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। দীনহীনা অরসজ্ঞা দাসিটি তাহার গুরুরূপা সখির আদেশে এখন তাঁহার অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্য করিতেছে কি বলিয়া কৃপানিধি পাঠকপাঠিকাবৃন্দ তাহাও শ্রবণ করুন, আর তাহার মস্তকে চরণাঘাত করিয়া তাহাকে আপনারাও শাসন করুন।

যথারাগ।

(আমি) "কি বলিতে, কি যে বলি, কিছু বুঝি না।
কি করিতে, কি যে করি, তাও ত জানি না॥
(আমার) প্রিয়াজির দুঃখ-কথা, গাইতে বাসনা।
কেঁদে মরি, কইতে নারি, মন যে বুঝে না॥
পরমাদ করে আমি, পাই যে যাতনা।
কত লোকে, করে মোর, নিন্দা রটনা॥
গুরু মোরে শাসাইবে, এইত বাসনা।
হরিদাসী জানে না যে শাস্ত্র-শাসনা॥"—

গৌর-গীতিকা।

—"অধিকারী নহি আমি করি পরমাদ।
প্রিয়া-গুণ গাইবারে মনে বড় সাধ॥
কেশে ধরি শিখাইলা গুরু মহারাজ।
না করিবে পুনরায় আর হেন কাজ॥
সখিরূপা গুরু মোর করিয়ে বিচার।
করিবেন দুঃখ দূর—গৌরাঙ্গ-প্রিয়ার॥
দাসীর কর্ত্তব্য সেবা—বিনা বাক্যব্যয়ে।
কেশে ধরি শিখাইলা গুরু মহাশয়ে।
দাসী হরিদাসী আজ নাকে খত্ দিলা।
আর না বলিবে কিছু (শুধু) দেখিবেক লীলা॥
গুরুমুখে শুনিবেক লীলারস-গান।
কোন কথা কহিবে না যোড়া দিলা কান॥"—

এক্ষণে সখি কাঞ্চনা তাঁহার বিরহিণী প্রিয়সখির প্রাণের এই ভাব-তরঙ্গাবলী অন্য দিকে প্রধাবিত করাইবার চেষ্টায় আছেন। ভাবনিধি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহাভাবময়ী প্রাণবল্লভার ভাব-চতুরা সখিদ্বয় এক্ষণে আর একটী ভাবকদম্ব পুষ্প আনিয়া গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির সম্মুখে ধরিলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ ধানশী।

—"আওত গৌর, পুনহি নদীয়াপুর,
হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ- কন্দ কিয়ে হেরব
করবহি কীর্ত্তন-বিলাস॥
হরি হরি! কব হাম হেরব সো মুখ-চাঁদ।
বিরহ-পয়োধি, কবহু দিন পঙরব,
টুটব হৃদয়ক বাঁধ॥ ধ্রু॥
কুন্দ-কনক-কাঁতি, কব হাম হেরব,
যজ্ঞকি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি, হরি হরি বোলব,
নটন-ভকতগণ মাঝ॥
এত কহি নয়ন, মুদি রহ সবজন,
গৌর-প্রেমে ভেল ভোর।

নরহরি দাস, আশা কব পূরব,
হেরব গৌর-কিশোর ॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার এই পদটি শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রেমোন্মাদ-ভাবটি তখন সম্বরণ করিলেন—এক্ষণে তাঁহার স্তম্ভভাব,—তিনি নীরব ও নিস্তব্ধভাবে যেন জড়বৎ বসিয়া আছেন—চক্ষুদ্বয় নিমীলিত—যেন ধ্যানমগ্না। সখিমুখে তিনি শুনিয়াছেন—

—"কুন্দ-কনক কাঁতি কব হাম হেরব
যজ্ঞকি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি, হরি হরি বোলব—
নটনি ভকতগণ মাঝ॥"—

এক্ষণে বিরহিণীর মনে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের এই রূপটির মধুর স্মৃতি উদয় হইয়াছে—এই রূপ-ধ্যানে তিনি এখন নিমগ্না। তাঁহার এই ভাবান্তরে পূর্ব্বভাবের পরিহার হইয়াছে—মনে কথঞ্চিৎ শান্তি আসিয়াছে—তবে ইহাও একটী ভাব—এ ভাবটিও পরিবর্ত্তনশীল। প্রিয়াজির এখন সমাধি অবস্থা—আর এইরূপ সমাধির মূলে প্রেমানন্দানুভূতি বিদ্যমান থাকায় বিরহিণী প্রিয়াজি যে প্রেমানন্দে মগ্ন আছেন, তাহা তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় অবগত আছেন। সখি কাঞ্চনা ঘন ঘন প্রিয়াজির বদনের প্রতি চাহিতেছেন—তাঁহার বদনচন্দ্রের ভাব এক্ষণে প্রসন্ন—মুখে নীরব মৃদু হাসির রেখা—তিনি যেন স্বচ্ছন্দে ও পরমানন্দে তাঁহার প্রাণবল্লভের নটবর নদীয়ানাগররূপ সন্দর্শন করিতেছেন। সখি কাঞ্চনা বিরহিণী গৌরবল্লভার তাৎকালিক ভাবোচিত আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ কামোদ।

—"সখি হে! ঐ দেখ গোরা কলেবরে।
কত চাঁদ জিনি মুখ সুন্দর অধরে॥
করিবর-কর জিনি বাহু সুবলনী।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ন চাহনি॥
চন্দন তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত বাহু নব নব মালে॥
কম্বুকণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্নহার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ চরণ।
নখমণি জিনি ইন্দু পূর্ণ দরপন॥
বাসু ঘোষ বলে গোরা কোথা বা আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥"—
গৌরপদতরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজির বিরহ-বিদগ্ধ হৃদয়-দর্পণে নবনটবর গৌরাঙ্গনাগর-রূপচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে—তিনি তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রাণ-গৌরাঙ্গকে দর্শন করিতেছেন—তাঁহার হৃদি-নদীয়ায় আজ নব নটেন্দ্র নাগরেন্দ্র গৌরসুন্দর মধুর নৃত্য করিতেছেন—তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর আছেন—কোন কথা বলিবার তাঁহার আর সামর্থ নাই। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রাণবল্লভের যে অপরূপ রূপটি এখন বর্ণনা করিলেন—সেই নাগরী-মন-মোহনিয়া অপূর্ব্ব রূপ-মাধুরী গৌর-বিরহিণী এখন প্রাণ ভরিয়া কলসে কলসে পান করিতেছেন—আর মনে মনে ভাবিতেছেন—আমার প্রাণবল্লভের যতিবেশ তাঁহার কপট-বেশ—আমার সম্মুখে তিনি সন্ন্যাসী বেশে আসিবেন কেন? তিনি যে আমার নদীয়া-নাগর—তিনি যে নদীয়ানাগরীর প্রাণ-গৌরাঙ্গ। গৌররূপমুগ্ধা প্রিয়াজি এইরূপ ভাবিতেছেন আর উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতেছেন। সখি কাঞ্চনা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় আর একটি পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"আর যে লাগে না ভাল কিছু নয়নে।
গোরা-রূপ হেরি সদা শয়নে স্বপনে॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, গোরারূপ সব দেখি,
গৌরময় জগৎ হেরি—হাসি মনে মনে।
মন-প্রাণ-চিত-চোরা, নদীয়া-নাটুয়া-গোরা,
মোরা সবে অনুক্ষণ—হেরি নয়নে।
অনুরাগে ডাকলে তারে, দেখা দেয় সে যারে তারে,
ভুলিনা গৌরাঙ্গ যেন—জীবনে মরণে॥
দাসী হরিদাসী ভণে, গৌরাঙ্গের রূপ বিনে,
লাগে না লাগে না ভাল—কিছু নয়নে॥"
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

গৌর-রূপ-মুগ্ধা সখি কাঞ্চনার হৃদাকাশে এখন অপরূপ

গৌর-রূপ-ছটার অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ হইয়াছে—তাঁহার প্রিয়সখি গৌরবল্লভার মনোভাবের সহিত তাঁহার মনোভাব মিশাইয়া তৎকালোচিত গৌররূপোল্লাসের পদ গাহিতে লাগিলেন—

যথারাগ।

—"রূপ দেখবি যদি আয়।
রূপের সাগর বহে শচী-আঙ্গিনায়॥
হাসি মুখে হেলে বামে, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে,
(শচী) অঙ্গনে দাঁড়ায়ে গোরা মুরলী বাজায়।
অলকা তিলকা ভালে, নাচে গায় মানে তালে,
নূপুর-পরান রাঙ্গা চরণ নাচায়॥
শিখিপুচ্ছ শিরে ধরে, মোহন মুরলী করে,
বঙ্কিম নয়নে চেয়ে ভুরু নাচায়।
পরিধানে পীতাম্বর, শোভে গলে গুঞ্জা হার,
মুনি ঋষি মন হরে বদন শোভায়॥
একি দেখি অপরূপ, শ্যাম সুন্দর রূপ,
গৌরাঙ্গ-নাগরে হেরি, পরাণ জুড়ায়।
নন্দ-নন্দন হরি, করে বুঝি বর্ণ চুরি,
উদিত হলেন আসি পুন নদীয়ায়॥
দাসী হরিদাসী ভণে, (তুমি) যা' ভেবেছ মনে মনে,
ঠিক তাই নদের নিমাই—কে তারে লুকায়।
নদীয়ার চাঁদ গোরা ব্রজের কানাই॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাটক।

বিরহিণী প্রিয়াজি এইবার ধীরে ধীরে দু'টী কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন—এখনও তিনি সখিক্রোড়ে শায়িতা—চক্ষুদ্বয়ে দরদরিত প্রেমধারা,—অঙ্গে যেন বল নাই—উঠিবার শক্তি নাই! তিনি অতি মৃদু ও ক্ষীণকণ্ঠে সখি কাঞ্চনার প্রতি করুণ-নয়নে চাহিয়া করুণ-স্বরে কহিলেন —"সখি কাঞ্চনে! তুমি কি বলিলে বুঝিলাম না—বর্ণ চুরি কে করিলেন কার? আমার প্রাণবল্লভ ত গৌরবর্ণ হরি। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কার বর্ণ চুরি করিলেন?" সখি কাঞ্চনা ভজনবিজ্ঞা ও সুচতুরা—তিনি প্রিয়াজির প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিয়াই উত্তর করিলেন—"সখি! প্রাণসখি! তোমার প্রাণবল্লভ গৌরবর্ণ হরি—কৃষ্ণবর্ণ হরিই তাঁহার প্রাণবল্লভা বৃষভানু-নন্দিনীর বর্ণ চুরি করিয়া গৌরবর্ণ হরি হইয়াছেন—কৃষ্ণ-গোবিন্দ আর গৌর-গোবিন্দ এই উভয় স্বরূপের স্বরূপশক্তির বর্ণ গৌরবর্ণ—গৌর-গোবিন্দের এবার বর্ণ চুরী করিয়া লুকোচুরি খেলিবার প্রয়োজন হয় নাই—তিনি নাগরীগণের মনচোরা—এবার মন চুরিই তাঁহার কাজ। বর্ণ-চোরের অপেক্ষা মন-চোরের বাহাদুরী বেশী।"

গৌর-বল্লভা স্থিরভাবে কথাগুলি শুনিলেন,—কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। তিনি মাত্র একটী কথা বলিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমার কথার মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—আমার শরীর বড় দুর্ব্বল—পিপাসা পাইয়াছে —একটু চরণামৃত চাও।" সখি অমিতা চরণামৃত আনিয়া দিলেন—বিরহিণী প্রিয়াজি তাহা পান করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এতক্ষণ পরে প্রিয়াজির জপমালার উদ্দেশ হইল—তিনি এতক্ষণ কোন প্রেমরাজ্যে যে বাস করিতেছিলেন, তাহা তাঁহারই স্মরণ নাই। এক্ষণে সংখ্যানাম জপের জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। সখি অমিতা প্রিয়াজির হস্তে তাঁহার জপের মালা দিলেন। তিনি অতি ধীরে ধীরে ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিজ আসনে উপবেশন করিয়া সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন। সখিদ্বয়ও নিজ নিজ সংখ্যানাম জপ করিতে লাগিলেন।

রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে—তখন বিরহিণী প্রিয়াজির একটু তন্দ্রা মাত্র আসিয়াছে—তিনি নিজ আসনেই শয়ন করিয়াছেন—তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন কে যেন গান গাহিতেছে।

তাল বিভাস দশকুশি।

"অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
বদন সরসী-রুহ, মলিন যে হইয়াছে,
সারা নিশি করি জাগরণ।
তুয়া সনে কিসের পিরীতি?
এমন সোনার দেহ, পরশ করিল কেহ,
না জানি সে কেমন রসবতী॥ ধ্রু॥
নদীয়া-নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ ওহে,
অবহি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জ্জন করহ হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে।

গৌরাঙ্গ করুণ-ভাষী, কহে মৃদু মৃদু হাসি,
কাহে প্রিয়ে কহ কটু ভাষ॥
হরিনামে জাগি-নিশি, অমিয়া সাগরে ভাস,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী

এই অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রিয়াজি উঠিয়া বসিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা সেখানেই ছিলেন—তাঁহারা সজাগ ছিলেন। সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির নিকটে গিয়া মৃদু বচনে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! তুমি এত কাঁদিতেছ কেন? তোমার মনকথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল সখি! তোমার এরূপ আকুল নীরব ক্রন্দনে যে আমাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।"—

ক্ষীণ ঘৃত-দীপের ক্ষীণালোকে সখি কাঞ্চনা দেখিতেছেন তাঁহার প্রিয়াজির বদনের ভাব বিশিষ্ট হতাশ-ব্যঞ্জক—যেন কোন বিশিষ্ট মর্ম্মবেদনায় তিনি এক্ষণে অতিশয় কাতরা। তখন দুই সখিতে মিলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া কত না সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুতেই আজ তাঁহার মন শান্ত হইতেছে না—তিনি বালিকার ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কেবলই কাঁদিতেছেন—আর নিজ মর্ম্মবেদনায় দাবদগ্ধা হরিণীর ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। সখিদ্বয় বড়ই বিপদে পড়িয়া "হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ! হা নবদ্বীপচন্দ্র!" বলিয়া তাঁহারাও কাঁদিতে লাগিলেন। সেই রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় নদীয়ার নির্জ্জন মহাগম্ভীরা-মন্দিরে যে করুণ হইতেও মহা করুণ রসের একটি বিষাদ চিত্রের দৃশ্য অভিনীত হইল—তাঁহার বর্ণনা করিবার ভাষা সৃষ্টি হয় নাই—তাহা মাত্র অনুভবী সুধী রসিক গৌরভক্তবৃন্দের অনুভবের বস্তু—ধ্যানের বিষয়।

পরমা ধৈর্য্যবতী গৌর-বল্লভা স্বয়ং যে অসহ্য গৌর-বিরহ-জ্বালায় জ্বলিতেছেন, তাহা তিনি নীরবে সহিতে-ছিলেন—তাঁহার জন্য তাঁহার মর্ম্মীসখিদ্বয় এইরূপ মর্ম্ম-বেদনা পাইতেছেন—এরূপ মনঃকষ্ট পাইতেছেন—সেই দুঃখই এখন গৌরবক্ষবিলাসিনীর হৃদয়ে প্রবল হইল—গৌর-বিরহ-জ্বালা অপেক্ষাও যেন এই জ্বালা তাঁহার হৃদয়ে বলবান হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সখিদ্বয়ের গলদেশ তাঁহার দুই ক্ষীণ বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অতিশয় সকরুণ মৃদুবচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! কি আর বলিব? সে কথা যে বলিবার নহে—বহুদিনের গুপ্ত কথা—কেন আবার আমার এ পাপ স্মৃতিপথে উদিত হয়? কে আমাকে সে সকল কথা এখন স্মরণ করাইয়া দেয়? তোমরা আমার পরম শুভা-কাঙ্ক্ষিণী—তোমরা ত এমন কাজ কখন কর না। স্বপ্নে কে যেন আসিয়া আমার মনে পূর্ব্বস্মৃতি-কথা জাগাইয়া দিয়া আজ আমাকে বড়ই অস্থির করিয়াছে।"

এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না—নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ নীরব ক্রন্দনে মনদুঃখ নিবৃত্তি করিয়া পুনরায় অতি মৃদু-ক্ষীণকণ্ঠে গোপনে প্রিয়সখির কানে কানে বলিলেন—"প্রাণসখি! বালিকা বয়সে কোন দিন প্রাণবল্লভকে অভিমানভরে কি বলিয়াছিলাম—সেই কথাটি স্বপ্নে আমাকে কে মনে করাইয়া দিল? আমি ত সখি কখন কাহারও মনোবেদনা দিই নাই—এমন শত্রু আমার কে আছে—যে আমার এই দুর্দ্দিনে আমার এই নিদারুণ দুঃসময়ে আমার মত মন্দভাগিনীর সঙ্গে এমনভাবে নিষ্ঠুর শত্রুতা করে?" সখি কাঞ্চনা তখন চতুরতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি! প্রিয় সখি! কথাটা কি?—স্বপ্নটা কি?—একবার খুলিয়া বল শুন,—তবেত ইহার সদুত্তর দিব।" বিরহিণী গৌরবল্লভা পুনরায় নীরব হইলেন—নয়ন-ধারায় তাঁহার ও তাঁহার সখিদ্বয়ের বসনাঞ্চল সিক্ত হইতেছে—মধ্যে মধ্যে উষ্ণ অশ্রুজল দু'এক ফোটা সখিদ্বয়ের অঙ্গেও পতিত হইতেছে—তাঁহারা দুঃখে ও ক্ষোভে যেন শিহরিয়া উঠিতেছেন। সখিদ্বয়ের বিশেষ অনুরোধে তখন অতি কষ্টে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার স্বপ্নকথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে বদন অবনত করিয়া পুনরায় অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

সখি কাঞ্চনা সুচতুরা এবং ব্রজরসজ্ঞা। তিনি বলিলেন সখি! ইহার জন্য এত দুঃখ কেন? গৌরভজনবিজ্ঞ কবি মহাজনগণ ব্রজভাবোচিত মধুরভাবে গৌরভজন করেন—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—প্রাচীন মহাজনকবি চণ্ডীদাস,

বিদ্যাপতি ঠাকুর প্রভৃতি কত ভাবে শ্রীরাধিকার মানভঞ্জনের কত শত পদ রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গৌরভক্ত মহাজনকবি শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তোমার প্রাণবল্লভের বিশিষ্ট কৃপাপাত্রী নারায়ণীদেবীর উপযুক্ত পুত্র—একনিষ্ঠ নিতাই গৌরভক্ত—তিনি যুগলে গৌর-উপাসনার উপদেশ পাইয়াছিলেন তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবীর নিকট—তাই ব্রজের ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি এই মধুর পদরত্নটি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবী যে তোমার প্রাণবল্লভের জননীরও বিশিষ্ট কৃপাপাত্রী ছিলেন (১) তাহা তুমি ত জান; তিনিই তোমাকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়া নদীয়ানাগর শ্রীগৌরসুন্দরের মনস্তুষ্টি করিতেন।"

বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার কথাগুলি অতিশয় মনোযোগের সহিত শুনিলেন। অনেকক্ষণ নীরবে কি যেন চিন্তা করিলেন। শেষে গম্ভীরভাবে কহিলেন—"সখি! এখন আর সে সব কথার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বস্মৃতিকথা আলোচনা করিয়া আমার লাভ কি? এসকল কথা এখন শুনিলে আমার লজ্জা বোধ হয়—মনে কষ্টও পাই। আমার মত মন্দভাগিনীর পক্ষে কোনরূপ মানাভিমানের আভাসও এখন আর শোভা পায় না।"

সখি কাঞ্চনা এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! এই ভাবের আর একটী প্রাচীন পদ আছে। সেটী তোমার প্রাণবল্লভের একান্ত অনুরক্ত রসিক ভক্তশ্রেষ্ঠ ঠাকুর নরহরি সরকার রচিত। তুমি শুনিতে চাও না—আমি তাহা তোমাকে শুনাইতেও ইচ্ছা করি না। তবে তুমি জান এ সকল তোমাদের রসলীলাকথা তোমার প্রাণবল্লভের প্রিয়তম রসিক ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ।"

"প্রাণবল্লভের প্রিয়তম রসিক ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ" এই কয়টী কথা পতিপ্রাণা প্রিয়াজির কর্ণে যাইবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল—তিনি কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক মনোভাবের মর্ম্ম এইরূপ—যাহা তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রিয়তম রসিক ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ,—যাহা তাঁহার প্রাণবল্লভের রসিক ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাজনগণের রচিত গৌরাঙ্গ-ভজনগান—তাহা যদি তাঁহার অপ্রিয় বোধ হয়—সে ত বিষম অপরাধের কথা। এই চিন্তায় অধীর হইয়া গৌরবল্লভা কিছুক্ষণের জন্ম মৌনী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি স্বপ্নে এই ভাবের একটী পদ শুনিয়া অজানিত গায়ককে পরম শত্রুজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়াছেন—সেই অনুতাপে এখন ভক্তিমতী সতিসাধ্বী গৌরবল্লভা সনাতন-নন্দিনীর কোমলহৃদয় ব্যথিত হইতেছে—তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন।

সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞা এবং গৌরবল্লভার কায়ব্যূহ। তিনি পুনরায় বিরহিণী প্রিয়াজিকে লজ্জিতভাবে মৃদুমধুর-বচনে কহিলেন—"সখি! যাহাতে তুমি মনে কষ্ট পাও এমন কাজ আমরা কেন করিব? তবে স্বপ্নে তোমাকে কে যে এই ভাবের পদ শুনাইয়াছে,—তাহাত আমরা জানি না"।

বিরহিণী প্রিয়াজি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না—তিনি সখি কাঞ্চনার দুটী হস্ত পরম প্রেমভরে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে অতি মৃদুবচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! ঠাকুর নরহরির গানটি আমাকে একবার শুনাও—তাহা শুনিলে আমার অপরাধ ভঞ্জন হইবে। তিনি আমার প্রাণবল্লভের রসিক ভক্তশিরোমণি—তাঁহার ভাব-ভক্তির সম্বন্ধে কোন কথা আমার বলিবার অধিকার নাই। সখি! বল বল সেই গানটি আমি পরম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করিব!"

সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার কলকণ্ঠে গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"শুন শুন নিশির স্বপন সই।
লাজ তেয়াগিয়ে তোমারে কই॥
প্রভাত সময়ে সুচারু বেশে।
আইলেন গৌর আমার পাশে॥
সে চন্দ্রবদন পানেতে চাঞা।
বলিনু কি কাজে আইলে ধাঞা॥
সুখে গোঙাইলে রজনী যথা।
তুরিত যাইয়া মিলহ তথা॥
শুপত না রহে বেকত রীতি।
তা সহ জাগিয়া পোহালে রাতি॥

---

(১) অত্যাপিও বৈষ্ণব-মণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শুনি কত শত শপথ করে।
পরশের আশে সাধয়ে মোরে ॥
হেন কালে নিঁদ ভাঙ্গিয়া গেল।
নরহরি জানে কি দশা হৈল ॥" গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌরবল্লভা অতিশয় মনোযোগের সহিত এই গানটী শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণান্তে পদকর্ত্তা ঠাকুর নরহরির উদ্দেশে একটী প্রণাম করিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন সময় বুঝিয়া প্রিয়াজিকে কহিলেন "ঠাকুর নরহরির রচিত তোমার প্রাণবল্লভের রসলীলা সম্বন্ধে আর একটী বড় মধুর পদরত্ন আছে—সখি! যদি তোমার অনুমতি হয় আমি গাইতে পারি।" প্রিয়াজি ধীরে ধীরে মৃদুবচনে কহিলেন —"সখি কাঞ্চনে! ওকি কথা বল তুমি? আমার অনুমতি কেন চাও সখি! তোমার গোরপ্রেমগীতি আমার জীবন-সম্বল—তুমি কৃপা করিয়া গৌরকথা ও গৌরগীত শুনাইয়া আমার এই দুর্ব্বহ জীবনভার নানাভাবে লাঘব করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেছ। সখি বল বল, গৌরকথা বল—গৌর-গান কর"—

সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার মধুর কণ্ঠে আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"শুন শুন ওগো সজনি স্বপন কহিয়ে আছিয়ে মনে।
জগতের লোক পাগল হইল গৌরাঙ্গচাঁদের গুণে ॥
কুমতি কুটিল কপটী নন্দুক আদি যত ছিল।
ছাড় বিপরীত স্বভাব সকলে গৌর অনুগত হৈল ॥
এই রূপ কত দেখিতে দেখিতে বারেক জাগিনু সই।
পুনঃ ঘুমাইতে আর অপরূপ দেখিনু সে সব কই ॥
যমুনা পুলিনে রাসবিলাসাদি যেরূপ করিল শ্যাম।
সেই রূপ গোরা সুরধুনী তীরে রচিল রসের ধাম ॥
লাজ কুল ভয় সব তেয়াগিয়া নদীয়া-নাগরী যত।
মনোরথে চড়ি চলে যুথে যুথে এড়াইয়া কণ্টক শত ॥
গৃহ কাজ ত্যজি মু বড় চঞ্চল তথা যাইবার তরে।
আচম্বিতে পতি আসিয়া তুরিতে কপাট দিলেক ঘরে ॥
পড়িনু সঙ্কটে কারে কি কহিব অধিক বিকল হৈনু।
মনে হৈল প্রাণ না রবে পিয়ারে পুনহুঁ দেখিতে পাইনু ॥
সে সময়ে ছলে কপাট খুলিল চতুর আমার জা।
ধরমে ধরমে ধীরে ধীরে গৃহ-বাহিরে বাড়ানু পা ॥
প্রফুল্লিতা হৈয়া ধাইনু কাহারো পানে না পালটি আঁখি।
লোহার পিঞ্জর হইতে যেমন পলায় নবীন পাখী ॥
যাইয়া তুরিতে নয়ান ভরিয়া দেখিল গৌর রায়।
যুবতীমণ্ডলী মাঝে সাজে ভাল কি দিব উপমা তায় ॥
নানা জাতি যন্ত্র বাজে চারিদিকে সুখের নাহিক পার।
গাওয়ে মধুর সুরনারীগণ বরিষে অমিয় ধার ॥
ও মুখ-কমল মধুপানে মাতি মো পুন নাচিনু সুখে।
নরহরিনাথ তা দেখি হাসিয়া আমারে করিল বুকে ॥"
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

অতিশয় স্থিরভাবে মনঃসংযোগের সহিত গৌরবল্লভা সমগ্র গানটী শুনিলেন—তিনি গান শুনিতেছেন—আর যেন কি ভাবিতেছেন। তাঁহার বদনচন্দ্র প্রসন্ন—প্রাণে প্রেমানন্দধারা যেন সিঞ্চিত করিতেছে। তাঁহার প্রাণবল্লভের নদীয়ার অপূর্ব্ব রাস-লীলারঙ্গ শ্রবণ করিয়া মনে পরমানন্দ পাইতেছেন—মুখে কিন্তু কথায় সে আনন্দের প্রকাশ নাই —গম্ভীরাপ্রকৃতি পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজির চরিত্র বড়ই গুরুগম্ভীর। গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির পূর্ব্বভাব এখন নাই—তিনি স্বপ্নে তাঁহার মানের পদটী শ্রবণ করিয়া যেরূপ বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন—এখন তাঁহার আর সে ভাব নাই। মর্ম্মী সখিদ্বয়ের অন্তরঙ্গসেবায় এবং চটুল ভাবচাতুর্য্যে প্রিয়াজির এই অপূর্ব্ব ভাবান্তর-লীলারঙ্গ এখন প্রকট হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার নিজজনকে অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ দান করিতেছে। পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

—"সবে এক সখিগণের ইহা অধিকার।
সখি হইতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥
সখি বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখি লীলা বিস্তারিয়া সখি আস্বাদয়।
সখি বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখিভাবে যেই তারে করে অনুগতি ॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

গুরুরূপা সখির কৃপা ভিন্ন এই রস-লীলারঙ্গ-মঞ্চে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই—এই রসলীলারঙ্গ কাহারও শুনিবারও অধিকার নাই। সখিগণের দ্বারাই এই লীলা-রস পুষ্টি হয়—আর তাঁহারাই এই অপূর্ব্ব লীলারস-মাধুর্য্য

বিস্তার করিয়া নিজেরা আস্বাদন করেন এবং অন্তরঙ্গ নিজ-জনকে আস্বাদন করান। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ ও গৌরগোবিন্দ অদ্বয়তত্ত্ব—তাঁহাদের কুঞ্জসেবাই জীবের পরম এবং চরম সাধ্য বস্তু—এই সখিরূপা গুরুর আনুগত্য ভিন্ন এই সাধ্য-বস্তু প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই—নাই—নাই!

বিরহিণী প্রিয়াজি এখন পর্য্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিতেছেন—সখিদ্বয় নিকটে বসিয়া তাঁহার চন্দ্রবদনের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন—প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রতি-অঙ্গের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে—কখন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত—কখন চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ—কখন বদনে গম্ভীর ভাব—আবার কখন প্রশান্তবদনে মৃদু-মধুর হাসির রেখা—কখন চক্ষুদ্বয় গৌর-প্রেমানুরাগে অপূর্ব্ব রঞ্জিত—কখন করুণ নয়নের চাহনিতে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। মহাভাবময়ী প্রিয়াজির অন্তরে যখন যে ভাবে ভাব-তরঙ্গাবলী খেলা করিতেছে, ঠিক সেই ভাবের নিদর্শন সকল বদনমণ্ডলে অবিকল প্রকাশ পাইতেছে। অন্তরঙ্গা সখিদ্বয়ই বুঝিতেছেন তাঁহাদের প্রিয়সখির মানস-সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গী কিরূপ অপূর্ব্ব—কি ভাবে তিনি বিভাবিত হইয়া এই অপূর্ব্ব নীরব লীলারঙ্গ বিস্তার করিতেছেন।

এই ভাবে অনেকক্ষণ গেল—বিরহিণী-প্রিয়াজি আপনা আপনিই তখন ভাব সম্বরণ করিলেন—সখি কাঞ্চনার গলদেশ পরম প্রেমাবেগে ক্ষীণ দুটি হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া মৃদু-মধুর বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমাদের নদীয়া-নাগর নবদ্বীপচন্দ্রের এ সকল লীলারঙ্গের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি আমার নাই—তোমরা নদীয়া-নাগরীগণ এই অপূর্ব্ব রাস-লীলা-রহস্যবিৎ পরম পণ্ডিত। তোমাদেরই কৃপাকটাক্ষপাতে রসিক ভক্তগণ এই নিগূঢ় নিকুঞ্জ-লীলা-কুঞ্জে প্রবেশাধিকার পান। ঠাকুর নরহরি ভক্তরূপে ও সখিভাবে ব্রজের মধুমতী—তাঁহার মনোভাব বুঝিবার শক্তি তাঁহারই অনুগতা সঙ্গিনী নদীয়া-নাগরীবৃন্দ ভিন্ন অন্যের নাই—তিনি বলিলেন—

—"মনোরথে চড়ি চলে যূথে যূথে এড়াইয়ে কণ্ঠক শত শত"—এসব মহা ভাবের কথা—ভাবগ্রাহী নদীয়া-নাগর নবদ্বীপচন্দ্র তোমাদের ভাবনিধি—ভাবগ্রাহী নাগরেন্দ্র তিনি—তিনিই এই ভাবসম্পদের স্রষ্টা, দাতা এবং গৃহীতা। এই যে রাসলীলা-রসরঙ্গকথা ঠাকুর নরহরি বর্ণনা করিলেন—ইহা নিগূঢ় ভাব-সম্পদে পরিপূর্ণ—অত্যাশ্চর্য্য ভাব-মাধুর্য্য-মণ্ডিত—ব্রজ-গোপিনীগণের যমুনাপুলিনে রাস-লীলারঙ্গ—আর নদীয়া-নাগরীগণের সুরধুনীতীরে এই অপূর্ব্ব রাসলীলারঙ্গ একই বস্তু—একই তত্ত্ব। পদকর্ত্তা সখি মধুমতী স্বয়ংই ত বলিয়া দিলেন—

—"যমুনা পুলিনে, রাস বিলাসাদি,
যেরূপ করিল শ্যাম।
সেই রূপ গোরা, সুরধুনী তীরে,
রচিল রসের ধাম॥"—

গৌর-বল্লভার শ্রীমুখে নদীয়ার মহা রাসলীলাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের আজ আর আনন্দের সীমা নাই—তাঁহাদের মনপ্রাণ যেন প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে—সখি কাঞ্চনা ও অমিতার হৃদয় আজ অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দে ডগমগ—দুই জনে গলাজড়াজড়ি করিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ—তাঁহাদের নয়নে প্রেমনদী বহিতেছে—কিন্তু মুখে কোন কথা নাই। নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর এইরূপ অপূর্ব্ব একটী নীরব প্রেমানন্দের প্রবল তুফান বহিতেছে।

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌরলীলা-গীতি-সমুদ্রের অফুরন্ত উৎস। তিনি আজ প্রেমানন্দে শ্রীগৌর-নাগর-বরের নদীয়ার মহারাস-লীলারঙ্গের প্রাচীন পদাবলীর ধুয়া ধরিলেন—সখি অমিতা প্রেমানন্দে দোহার দিতে লাগিলেন—

রাগ কেদার।

—"মণ্ডলী রচিয়া সহচরে।
(নাচে) তার মাঝে গোরানটবরে॥ধ্রু॥
নাচে বিশ্বম্ভর, সঙ্গে গদাধর,
নাচে নিত্যানন্দ রায়।
পুরুষ কৌতুক, ভুঞ্জে প্রেমসুখ,
সব সহচর লঞা॥ (১)
ঘরে ঘরে শ্যাম, সুন্দর মূরতি,
পিরীতি ভকতি দিয়া।
করে সঙ্কীর্ত্তন, যাচে প্রেমধন,
সভারে সদয় হৈয়া॥
পুরুষ নাচে, প্রকৃতি-ভাবে,
পুরুষভাবে যুবতী।

---

(১) পাঠান্তর—"স্বভাবে বুঝিয়া পায়।

যার যেই ভাব, পাইয়া স্বভাব,
নাচে কত শত জাতি॥
কহে নয়নানন্দ, "নদীয়া-আনন্দ"
আনন্দে ভুবন ভোরা।
দুঃখিত জীবন, মাধব নন্দন,
চরণে শরণ মোরা॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পুনরায় সখি কাঞ্চনা আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন। প্রিয়াজি ধীরভাবে মনোযোগের সহিত তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তন-রাস-লীলারঙ্গ-কথা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে জপমালা—বাম হস্ত বাম কপোলে বিন্যস্ত—বদন বিনত—নয়নে প্রেমধারা।

সখি কাঞ্চনা গাহিলেন—

রাগ মল্লার।

—"নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা, ঘন ঘন বোলে হরি।
খেনে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, খেনে খেনে প্রাণেশ্বরী॥ধ্রু॥
যাবক বরণ, কটির বসন, শোভা করে গোরা গায়।
যখন তখন, যমুনা বলিয়া, সুরধুনীতীরে ধায়॥
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী, গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দ কন্দ, গৌরচন্দ্র, অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দ দাস, করত আশ, ওপদ-পঙ্কজ-ছায়া॥" —ঐ

সখি কাঞ্চনা আজ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নদীয়ার সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসলীলা-রঙ্গ বর্ণনা করিতে করিতে উন্মাদিনী প্রায় হইয়াছেন। তিনি এযাবৎকাল বসিয়া গান করিতে-ছিলেন—হঠাৎ আজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সখি অমিতাকেও হাত ধরিয়া উঠাইলেন—দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া কত রঙ্গভঙ্গে প্রেমাবেশে প্রিয়াজির সম্মুখে নিশীথে সেই নির্জ্জন ভজনমন্দিরে অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে করিতে পুনরায় একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ ধানশী।

—"সজনি অপরূপ দেখসিয়া।
নাচয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিবোল বলিয়া॥
সুগন্ধ চন্দন-সার, করবীর মাল,
গোরা-অঙ্গে দোলে হিলোলিয়া।
পুরুব পরোক্ষ ভাব, পরতেখ দেখ লাভ,
সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে, মধুর মুরলী চাহে,
বাঁধে চূড়া চাচর চিকুরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে, মালসাট মারে বুকে,
ক্ষণে বোলে মুঞি সেই ঠাকুরে॥
জাহ্নবী যমুনা ভ্রম, তীরে তরু বৃন্দাবন,
নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ, সেই সখা সখিবৃন্দ,
কালা তনু এবে হৈল গোরা॥"—গৌঃ পঃ তঃ।

বিরহিণী প্রিয়াজি যে ভাবে বসিয়া গান শুনিতেছিলেন—ঠিক সেই ভাবেই আছেন—কেবল মাত্র বিনত বদনখানি উঠাইয়া মধ্যে মধ্যে সখিদ্বয়ের অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দর্শন করিতে-ছেন, আর প্রেমানন্দে তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ে অবিশ্রান্ত প্রেমধারা পড়িতেছে। মর্ম্মী সখিদ্বয়ের অপূর্ব্ব নৃত্যগীতাদি সহ নদীয়ার মহাসংকীর্ত্তন-রস-লীলারঙ্গ তিনি যেন সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। আজ গৌর-বল্লভার প্রাণে অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে—তিনি আজ জাগ্রতাবস্থায় যেন একটী অপূর্ব্ব সুখের স্বপ্ন দেখিতেছেন। অপর সখিগণ এবং দাসীগণ অন্তঃপুরের কক্ষ হইতে সখিদ্বয়ের সমবেত কণ্ঠে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভজন-মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া পরমানন্দে গান শুনিতেছেন—দ্বার উন্মুক্ত ছিল। গৌর-বল্লভার শুভদৃষ্টি তাঁহাদের উপর পতিত হইবামাত্র তাঁহারই ইঙ্গিতে আরও কয়েকজন সখি ভজন-মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থান পাইলেন।

প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের পরম প্রিয় বস্তু শ্রীখোল-করতাল নিত্য পূজিত হইতেন। প্রিয়াজির ইঙ্গিতে আজ সখিগণ সেই খোল করতাল লইয়া সখি কাঞ্চনার কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। প্রিয়াজির ভাবভঙ্গী দেখিয়া সখি কাঞ্চনার উৎসাহ দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত হইল—তিনি তাঁহার উচ্চ কলকণ্ঠে পুনরায় গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—সখিগণ সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন—প্রিয়াজি সম্মুখে বসিয়া আছেন। মধুর মৃদঙ্গ করতাল-রবে ভজন-মন্দির মুখরিত হইল। অন্যান্য সখিগণ নিজ নিজ বাদ্য যন্ত্রাদি সহ কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সখি কাঞ্চনা ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ কেদার।

—তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই,
ঝনর ঝনর করতাল।

তন তন তম্বুর, বীণা সুমধুর,
বাজত যন্ত্র রসাল॥
ডমক থমক কত, রবাব বাজত,
পদতল তাল সুমেলি।
নাচত গৌর, সঙ্গে প্রিয় গদাধর,
সোঙরিয়া পুরবক কেলি।
তীরে তীরে ফুলবন, যেন বৃন্দাবন,
জাহ্নবী যমুনা ভাণে।
কীর্ত্তন মণ্ডলে, শোভা অতি ভেল,
চৌদিকে ভকত করু গানে।
পূরবক লালস, বিলাস রাসরস,
সোই সখিগণ সঙ্গ।
এ কবিশেখর, হোয়ল ফাঁফর,
না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ।" গৌঃ পঃ তঃ।

মধুর মধুর বাদ্যধ্বনি মৃদঙ্গ করতাল-ধ্বনি সহ অপূর্ব্ব সঙ্গতের সৃষ্টি হইল। এই অপূর্ব্ব নৃত্যকীর্ত্তন-বিলাসরঙ্গ দর্শন করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি আজ প্রেমানন্দে ভাসিতেছেন—তিনি যেন সাক্ষাৎ তাঁহার প্রাণবল্লভের নদীয়ার মহা-সঙ্কীর্ত্তন রাসলীলারঙ্গ দর্শন করিতেছেন—কীর্ত্তনলম্পট তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সেই অপূর্ব্ব নবনটবর নদীয়ানাগরবেশে অদ্ভুত নৃত্যভঙ্গী দর্শন করিতেছেন—সখিগণও সকলেই সেই কীর্ত্তন-লম্পট গোরাচাঁদের নারী-মনমোহন নৃত্যভঙ্গী দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বাহু তুলিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিতেছেন। নদীয়ার নির্জ্জন মহাগম্ভীরা-মন্দিরে তৃতীয় প্রহর নিশীথে এই মহাসঙ্কীর্ত্তনের উচ্চ প্রেম-কোলাহলধ্বনি সমগ্র নদীয়া নগরে ব্যাপ্ত হইল—নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীবর্গের অনেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল—দূরবর্ত্তী নদীয়া-বাসিনী নিদ্রিতা নাগরী-বৃন্দের কর্ণেও এই অপূর্ব্ব নিশীথ-কীর্ত্তন ধ্বনি প্রবেশ করিল! নিদ্রাভঙ্গে সকলেই চমৎকৃত হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া গ্রহগ্রস্থার ন্যায় বাহিরে আসিয়া এই মধুর কীর্ত্তনধ্বনি কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন—সর্ব্ব-নদীয়ায় যেন একটা প্রেমানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। এই স্রোতে অনেক তরুণীর কুল-তরণী ভাসিয়া গেল। প্রেমতরঙ্গিণীর স্রোতের তরঙ্গাঘাতপ্রতিঘাতে সর্ব্ব নদীয়াবাসীর গৃহে গৃহে যেন প্রেমের উৎস ছুটিল।

সখি কাঞ্চনা এই সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসের প্রধানা কীর্ত্তনীয়া। তিনি স্বয়ং অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী করিয়া তাঁহার কলকণ্ঠে আজ সঙ্গীত ও নৃত্যকলার পরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন—তিনি পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ মঙ্গলগুর্জ্জরী ধরা একতাল।

—"বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচী-নন্দনে,
চৌদিকে রূপ পরকাশ।
বামে রহু পণ্ডিত, প্রিয় গদাধর,
দক্ষিণে নরহরি দাস॥
গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে, কনয়া কদম্ব জনু,
ঐছন পুলকের আভা।
আনন্দে বিভোর, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা॥
যাহার অনুভব, সেই সে সমুঝই,
কহিলে না যায় পরকাশ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গান বৃন্দাবন দাস॥" গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সহিত মধুর মধুর কীর্ত্তন চলিতেছে—আর সখিগণ তালে তালে সুমধুর নৃত্য করিতেছেন—মধুর মৃদঙ্গ ও মৃদু করতালের সুমিলিত তালে নৃত্যভঙ্গীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরাশি নবনবায়মান বোধ হইতেছে—বিরহিণী গৌর-বল্লভা আজ প্রেমানন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন—কিন্তু তিনি স্থির ভাবে একাসনে পূর্ব্বভাবেই বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—অপূর্ব্ব নৃত্যকীর্ত্তন চলিতেছে। সখি কাঞ্চনা মহাসঙ্কীর্ত্তন-রাসের পদের পর পদের ধুয়া ধরিতেছেন—আর সখিগণ তাল মান সুরের সঙ্গে দোহার দিতেছেন। তিনি এখন আর একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ কানাড়া।

—"নাচত নগরে নাগর-গৌর, হেরি মুরতি মদন ভোর,
ঐছন তড়িত রুচির অঙ্গ, ভঙ্গী নটবর-শোভিনী।
কাম-কামান ভুরুক জোর, করতহি কেলি শ্রবণ ওর,
গীম শোহত রতন পদক, জগজন-মনোমোহিনী॥
কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা-ভ্রমরী গুঞ্জ,
পিঠে দোলয়ে লোটন তার, শ্রবণে কুণ্ডল-দোলনী।
মাহিষ দধি রুচির বাস, হৃদয়ে জাগত রাসবিলাস,
জিতল পুলক কদম্বকোরক অনুখন মন-ভোলনী।

গজমতি জিনি গমন ভাঁতি, প্রেমে বিবশ দিবস রাতি,
হেরি গদাধর রোয়ত হসত, গদগদ-আধ-বোলনি॥
অরুণ নয়ান চরণ কঞ্জ, তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ,
নটনে বাজন ঝনর ঝনন, শুনি মুনিমন-লোলনি।
বদন চৌদিকে শোহত ঘাম, কনক কমলে মুকুতাদাম,
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন, কত রস-পরকাশনি।
মহাভাব রূপ রসিকরাজ, শোহত সকল ভকত মাঝ,
পিরীতি মূরতি ঐছন চরিত, রায় শেখর ভাষণি॥"—
গৌরপদ তরঙ্গিণী।

নদীয়ার গম্ভীরা মন্দিরে অবিশ্রান্ত নৃত্যকীর্ত্তন চলিতেছে—রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল - তবুও নৃত্যকীর্ত্তনের বিরাম নাই—সকলেই প্রেমে ডগমগ—সকলেই প্রেমানন্দে আত্মহারা,—প্রিয়াজির এখন স্তম্ভভাব—তাঁহার হস্ত হইতে জপের মালা পড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু অটলভাবে তিনি আসনে বসিয়া আছেন—তাঁহার কমল নয়নদ্বয় মুদ্রিত—পরিধান বসন অসম্বর—বর্ণ বৈবর্ণ—তিনি নিষ্পন্দভাবে আসনে সমাসীনা—যেন মহা তপস্বিনীর ন্যায় কোন বিশিষ্ট তপস্যারতা—মহা যোগেশ্বরীর মত যেন কোন বিশিষ্ট যোগসাধনতৎপরা।

সখি কাঞ্চনার মনের বাসনা তাঁহার প্রিয়সখি গৌরবল্লভা একটী বার মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া দু'টী কথা বলেন—একটীবার মাত্র গৌরবল্লভাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহারা প্রেমানন্দে নৃত্য করেন। বিরহিণী প্রিয়াজির মুখে তাঁহারা হাসি দেখেন নাই সেই দিন হইতে—যে দিন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—রসিকতা ও আনন্দোৎসবে তিনি এযাবৎ কখন যোগদান করেন নাই—এত বড় তাঁহার প্রাণবল্লভের জন্মোৎসব মহাসমারোহে নদীয়াবাসী ভক্তগণ তাঁহারই প্রাণকান্তের বহিরাঙ্গনে অনুষ্ঠান করিলেন—এত বড় সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের উদ্বোধন ও অনুষ্ঠান নদীয়ায় ইতিপূর্ব্বে কখন হয় নাই—এমত অনুরাগময় অপূর্ব্ব গৌরকীর্ত্তনগান পূর্ব্বে কেহ কখন শ্রবণ করে নাই—সে দিনও গৌরবিরহিণী গৌর-বল্লভা সমস্ত দিবারাত্রি নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জন ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন—অন্তরঙ্গা সখিগণ পর্য্যন্ত সেদিন কেহ একবার তাঁহার দর্শন লাভেরও সৌভাগ্য পান নাই।

সখি কাঞ্চনার এ বাসনা দুর্ব্বাসনা বলিতে হইবে—তবুও তিনি নিরাশ হন নাই। তিনি এক্ষণে স্তম্ভভাবাপন্না সিদ্ধাসনে উপবিষ্টা গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে মধ্যে রাখিয়া তাঁহাকে সখিগণ-পরিবেষ্টিত করিয়া মধুর নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

রাগ ধানশী।

—"কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগি অঙ্গ।
কত সুরধুনী বহে নয়ন-তরঙ্গ॥
গোরা নাচত পরম আনন্দে।
চৌদিকে বেড়িয়া গাওয়ে নিজবৃন্দে॥
করে করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ।
হেরত সুরধুনী উথলি তরঙ্গ॥
ভাবে অবশ তনু গদগদ ভাষ।
বাসু কহে সুমধুর ও মুখহাস॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই মধুর পদরত্নটী যখন সুরতাল-লয়যোগে সখিবৃন্দ সহ সখি কাঞ্চনা অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী করিয়া গাহিতেছিলেন এবং বিরহিণী গৌরবল্লভার মূর্ত্ত বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহটিকে পরম প্রেমভরে সকলে মিলিয়া পরিক্রমা করিতেছিলেন—তখন গৌর-বল্লভা মধ্যে মধ্যে প্রেমানন্দে মস্তক ঢুলাইতেছিলেন—ভাবে বোধ হইতেছিল তিনিও যেন মনে মনে নাচিতেছেন। একটা গানে আছে—

—"মন নাচে, প্রাণ নাচে, নাচে না দেহ।
মনের মরম ব্যথা, বুঝে না কেহ॥"—

তাই হইয়াছে আজ বিরহিণী প্রিয়াজির। সখি কাঞ্চনা শেষে প্রিয়াজির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, পদকর্ত্তার ভণিতাটি তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মধুর অঙ্গভঙ্গী করিয়া গান করিলেন—

—"ভাবে অবশ তনু গদগদ ভাষ।
বাসু কহে সুমধুর ও মুখ হাস॥"

তখন গৌর-বল্লভার মুখে যেন ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল - বৈদ্যরাজ সখি কাঞ্চনা বুঝিলেন তাঁহার ঔষধের ফল ধরিয়াছে—তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ সুহিনী।

—"কি না সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥
নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে।
প্রেমভরে পদ ধরে, ধরণী না ধরে॥

বয়ান কনয়া চাঁদ ছাঁদে।
কত সুধা বরিষয়ে থির নাহি বাঁধে ॥
রাজহংস প্রিয় সহচরে।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে ॥
নব নব নটনী লহরী।
প্রেম লচ্ছিমী নাচে নদীয়া-নাগরী ॥
নব নব ভকতি-রতনে। (১)
অযতনে পাইল সব দীনহীন জনে ॥
নয়নানন্দ কহে এ সুখ-সায়রে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া-নগরে ॥—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই পদটী শেষ হইতে না হইতে বিরহিণী গৌরবল্লভা অকস্মাৎ চক্ষুরুন্মিলন করিলেন এবং সকরুণ প্রেমদৃষ্টিতে সকল সখিগণের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিলেন—তখন তিনি অত্যন্ত প্রেম-বিহ্বলা—তাঁহার আলুথালু বেশ—গাত্রবসন অসম্বর—তিনি যেন নিদ্রোত্থিতার ন্যায় ইতি উতি চাহিতেছেন—লজ্জার লেশাভাসও নাই। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—প্রভাতের পূর্ব্বক্ষণ। সখি কাঞ্চনা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া আরও একটী নিত্য যুগল-লীলার প্রাচীনপদ গাইলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা স্থিরভাবে শুনিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর কত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে কত সুখ ভেল।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওড়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরীয়ার না ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥"— পদকল্পতরু।

এইবার প্রিয়াজির শুষ্কবদনে সুস্পষ্ট হাসির রেখা দেখা দিল—তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সখি কাঞ্চনার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—প্রিয় সখি! বল বল—

"চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর"—

এই কয়টী কথা বলিয়াই বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাবেশে সখিক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার প্রিয় সখিকে ক্রোড়ে করিয়া পরম প্রেমানন্দে বিভোরভাবে পুনরায় গান ধরিলেন—

যথারাগ।

—"নিশান্তে নিদ্রিতা, সনাতন-সুতা,
গোরা-গুণমণি কোলে। (২)
পরিহিত অম্বর, কেশ অসম্বর,
লাজ গিয়াছে চলে ॥
আলুথালু বেশ, নাসায় বেসর,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে দোলে।
ধীরে ধীরে উঠি, বাহু বন্ধন ছুটি,
নাগর করিয়া কোলে ॥
অধর চুম্বন, দেই ঘন ঘন,
দুঁহু জন আঁখি মেলে।"
কবি গুণাকর হরিচরণ আচার্য্য।

পদটী শেষ হইতে না হইতেই সখিক্রোড়ে শায়িতা বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাবেগে দুই হস্তে সখি কাঞ্চনার মুখ চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তখন প্রভাত হইয়াছে। কাক কোকিল ঘুঘু দহিয়াল প্রভৃতি কলরব করিতেছে—টহলিয়া নগর-কীর্ত্তনের দল গৌরশূন্য-গৌর-গৃহদ্বারে আসিয়া প্রভাতী কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিল—

যথারাগ।

—"তেজহ শয়ন গৌর গুণধাম।
চাঁদ মলিন গত যামিনী যাম ॥
পুরুষ দিশা সখি সব ভুলি গেলা।
অনুরাগহি রক্তাম্বরি ভেল।
মুদিত কুমুদ তহি মধুপ নিবাস।
বিকশিত কমল চলত তছু পাশ ॥
চক্রবাকী উলসিত পতি সঙ্গ।
নরহরি হেরি হসত বহু রঙ্গ ॥"—গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

কোথা দিয়া যে এত বড় রাত্রিটা কাটিয়া গেল কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না—সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে তখন

(১) —"পুংস্কোকিল-স্বর-মনোহর-কণ্ঠনাদাঃ
সম্মঞ্জিরাযুগ-বিভূষিত-পাণিপদ্মাঃ।
উচ্চৈর্জগু সপাদ নৃত্যমবেক্ষ্য তস্য
হৃষ্টাপ্রমোদ মধুরং পুলকা কুলাঙ্গাঃ ॥ চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

(২) ভাব—"যেই গোপী সেই কৃষ্ণ পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চৈতন্য-লীলা পরম দুর্ব্বোধ ॥" চৈতন্য চরিতামৃত

কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল। সখিগণ জয়গান করিতে করিতে প্রেমানন্দে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন।

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারি॥"—
—"জয় নন্দনন্দন জয় বংশীধারী।
জয় রাধাবল্লভ নিকুঞ্জবিহারী॥"—

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

বৈদ্যনাথ দেওঘর।
৩রা মাঘ, ১৩৩৭।
শনিবার, রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(১৮)

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥
বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র।

"অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা॥" (১)

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে সুদীর্ঘ পৌষ মাসের চাঁদিনী নিশীথে মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ বিরহিণী গৌর-বল্লভা গৌরকথা-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উঠাইয়াছেন। সখি কাঞ্চনার উচ্চ কলকণ্ঠের সুমধুর ধ্বনি প্রিয়াজির ভজন-মন্দির মুখরিত করিয়াছে—মাত্র তিনটি গৌর-বিরহিণী সেই নির্জ্জন নিশীথে গৌরশূন্য-গৌরগৃহে বসিয়া গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনে উন্মত্তা আছেন—বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রিয় সখি কাঞ্চনার প্রেমালিঙ্গনবদ্ধা—সখি অমিতা তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবারতা—এত দুঃখের মধ্যেও বিরহিণী প্রিয়াজির মনে আজ বড় আনন্দ উল্লাস—তাঁহার বদন অভাবনীয় ভাবে সুপ্রসন্ন—যেন জাগ্রতে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ বিদেশ হইতে গৃহে আসিতেছেন। সখি কাঞ্চনা বিরহিণী গৌরবল্লভার তাৎকালিক ভাবোচিত তাঁহারই উক্তি একটী মহাজনীপদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

(১)

"আলিরি!
হোত মনহুঁ হুলাস সুলছণ,
বাম নিজ ভুজ উরোজ ঘন ঘন,
ফুরই দূর সঞে, প্রাণ পিউ কিএ,
অদুর আওব রে।
যবহুঁ পহুঁ পরদেশ তেজব,
আগেনি লেখন-সন্দেশ ভেজব,
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূষণ,
সবহুঁ ভাওব রে॥

অর্থ।—হে সখি! আজ আমার মনে বড় উল্লাস হইতেছে—আমি চারিদিকে নানাবিধ সুলক্ষণ সকল দেখিতেছি—আমার বামাঙ্গ ঘনঘন নৃত্য করিতেছে—প্রবাস হইতে আমার প্রাণবল্লভ বুঝি আজ গৃহে আসিবেন। সখি! প্রবাস হইতে ফিরিবার সময় তাঁহার ত আমাকে সংবাদ পাঠাইবার কথা ছিল। সখি! সে সম্বাদটি পাইলে বড়ই ভাল হইত।

(২)

—"আলিরি।
ত্রিপথ-গামিনী-তীর পিউ যব,
অচিরে আওব শুনত পাওব,
অলস ত্যজি কুচ-কলস-জোর,
অগোরি সাজব রে।
তবহিঁ হিয়মাহ হার পহিরব,
বেণী ফণি মণিমালে বিরচব,
চলব জলছলে কলস লেই,
সব কলেশ ভাজব রে॥

(১) শ্রীরাধিকাকে "জগৎপ্রসূ" অর্থাৎ জগতের মাতা আখ্যা দিয়াছেন বৈষ্ণবশাস্ত্র। গৌরবক্ষবিলাসিনীকে স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর "বৈষ্ণব-জননী" আখ্যা দিয়াছেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ সর্ব্বজগতের পালনকর্ত্তা বলিয়া তাহা হইতে অভিন্না গৌরময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও জগতের পালন-কর্ত্রী, এজন্য তিনি মাতৃবৎ সর্ব্বপূজ্যা। ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলগ্রন্থে গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজিকে মাতৃসম্বোধন করিয়া বন্দনা করিয়াছেন যথা—

"নবদ্বীপময়ী বন্দো বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাঁর অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা॥"—

তিনি পুনরায় তাঁহারই শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে প্রভুপ্রিয়াজির অপূর্ব্ব যুগল-বিলাস-রহো-লীলারঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসবকর্ত্রী মাতা নহেন—জগতপালনকর্ত্রী জগন্মাতা—তাঁহারা জগজ্জননী। তাঁহারা সর্ব্বভাবে সকলের পূজনীয়া বলিয়া পরদেবতা।

-সখি! গঙ্গাতীরে প্রথম যখন আমার প্রাণবল্লভ প্রবাস হইতে ফিরিবেন, আর এই সংবাদ যখন আমি কাণে শুনিব—তখন আমি আলস্য ত্যাগ করিয়া যুবতীজনোচিত বেশভূষা করিব—স্বর্ণহার গলে পরিব—মণি-রত্নে নানাছন্দে বেণী বন্ধন করিব—জল আনিবার ছল করিয়া প্রাণকান্তের দর্শনাশায় জলের কলস কাঁকে করিয়া গঙ্গাতীরে যাইব,—তখন আমার ক্লেশ দূর হইবে।

(৩)

"আলিরি।

নদীয়াপুরে জয়তুর রাওব,
হৃদয়-তিমির সুদূর যাওব,
ভকত নখতর মাঝ যব দ্বিজরাজ,
রাজব রে।
গৌর-আগ যব আপন আওব,
ঘুঁঘুট দেই তব নিকট যাওব,
দিঠি জলছলে কলধৌত পগ
করি ধৌত মাজব রে॥

অর্থ—সখি! আমার প্রাণবল্লভের শুভাগমন উপলক্ষে নদীয়াবাসীগণ প্রেমানন্দে তুরি ভেরী বাজাইবে—তাহাতে সকলের মনের দুঃখ দূর হইবে। আমার প্রাণবল্লভ যখন নবদ্বীপচন্দ্ররূপে ভক্ত-নক্ষত্র মাঝে বিরাজ করিবেন—তখন আমার মনে যে কত আনন্দ হইবে, তাহা আর কি বলিব? আবার যখন সখি! আমার প্রাণকান্ত আমার আঙ্গিনায় আসিবেন—তখন আমি ঘোমটা দিয়া লজ্জাবনত মুখে তাঁহার নিকট যাইব—আর আমার নয়নজলে তাঁহার সোনার রাঙ্গাচরণ-কমল দু'খানি ধৌত করিয়া নিজ হস্তে মার্জ্জনা করিয়া ধন্য হইব।

(৪)

—"আলিরি!

রঙ্গন শয়নক ভঙন পৈঠব,
পীঠ দেই হসি পালটি বৈঠব,
কছু বিরস ভৈ কছু সরস দৈ
দশ দোখে দোখব রে।
পীন কুচ করকমলে পরশব,
ক্ষীণ তনু মঝু পুলকে পূরব,
ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি,
রস রাখি রোখব রে॥

অর্থ—সখি! আমার প্রাণসর্ব্বস্বধন যখন শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিবেন—আমি একটীবার মৃদু হাসিয়া তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া বসিব। আমি কখন বিরস ভাবে—কখন সরস-ভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নানা দোষ দেখাইয়া তখন দু'কথা শুনাইয়া দিব। আবার যখন তিনি আমার বক্ষে হাত দিয়া প্রেমালিঙ্গন দান করিতে অগ্রসর হইবেন, যদিও আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইবে—তবুও মুখে—"আমাকে স্পর্শ করিও না" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিব—কারণ তাঁহার বদনচন্দ্রের প্রতি চা'হলে আমার চক্ষুলজ্জা আসিবে—রসপুষ্টির জন্য এরূপ অভিমানযুক্ত ক্রোধের ভান করিব।

(৫)

—"আলিরি!

বাহু গহি তব নাহ সাধব,
সময় বুঝি হাম সব সমাধব,
সুধুই সুধাময় অধর পিধি পিয়া,
পুন পিয়াব রে।
মীনকেতন-সমরে চেতন,
হীন হোয়ব নিশি নিকেতন,
অবিরোধ বিনু অনুরোধ পিউ,
পরবোধ পাওব রে॥"

অর্থ—সখি! আবার যখন আমার প্রাণবল্লভ আমার হাত ধরিয়া সাধাসাধি করিবেন—সময় বুঝিয়া আমি সকলই সমাধান করিব—তাঁহার অধরামৃত পান করিব—আর আমার অধরামৃত পান করাইয়া তাঁহাকে প্রেমোন্মত্ত করিব। আর যখন তিনি কামযুদ্ধে কন্দর্পবাণে জর্জ্জরিত হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড বিবর্জ্জিত হইবেন তখন বিনা বিরোধে এবং অনুরোধে আমার প্রাণবল্লভ তাঁহার প্রাপ্য সকলই পাইবেন।

(৬)

—"আলিরি!

মিটব কি হিয়া-বিষাদ ছল ছল,
নয়নে পহু যব তবহি কল কল,
মাদ সুখদ সমবাদ এক ধনি,
ধাই লাওল রে।

নাথ আওল এত নি ভাখণ,
মৃত সঞ্জীবন শ্রবণে পিবি পুন,
জগত ভণ জনু, জীবন মৃততনু,
জীবন পাওল রে॥

অর্থ—সখিরে! আমার এই সাধ কি বিধাতা মিটাইবেন? আমার হৃদয়ের দুঃখ কি দূর হইবে? আমার এই নয়নের জল কি শুষ্ক হইবে? আমার জীবন সর্ব্বস্বধন প্রাণবল্লভের নদীয়ায় শুভাগমন সংবাদ তোমরা কি আমাকে আনিয়া দিবে? এমন সময়ে কোন একটী সখি দৌড়াইয়া আসিয়া এই সুসম্বাদটি দিলেন—শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নদীয়ায় আসিয়াছেন,—এই কথা শ্রবণমাত্র বিরহিণী গৌরপ্রিয়া মৃত দেহে যেন জীবন পাইলেন। পদকর্ত্তা জগদানন্দ * বলিতেছেন এই শুভসম্বাদে প্রিয়াজির গৌরবিরহে মৃতপ্রায় তনু পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইল।

সখি কাঞ্চনা তন্ময় হইয়া এই গানটী গাইলেন—বিরহিণী গৌরবল্লভাও তন্ময় হইয়া গানটী শুনিলেন—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আছে, কিন্তু তিনি প্রেমাবেশে অতিশয় বিহ্বল এবং অবশাঙ্গ। তাঁহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে গুপ্তভাবে তাঁহার প্রেমচেষ্টার ক্রিয়া হইতেছে—বাহিরে কিছু প্রকাশ নাই—তবে সখি কাঞ্চনা বুঝিতেছেন ও দেখিতেছেন যেন প্রিয়াজি মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিয়া ক্ষীণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিতেছেন। সখি অমিতা কাঞ্চনাদিদির মুখের প্রতি চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। বিরহিণী প্রিয়াজির তখনও সুপ্রসন্ন বদনে প্রশান্ত ভাব—কিন্তু তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ের অবিশ্রান্ত প্রেমানন্দধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি সকরুণ নয়নে এক একবার সখি অমিতার প্রতি চাহিতেছেন এবং প্রেমাবেশে সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াও সখি অমিতার হাতখানি পরম স্নেহভরে নিজের বক্ষে ধারণ করিয়াছেন—কি যেন বলিবেন এরূপ ভাব দেখাইতেছেন। সখি অমিতা ধীরে ধীরে বিরহিণী প্রিয়াজির অঙ্গে হাত বুলাইতেছেন এবং নিজ কর্ণ তাঁহার শ্রীবদনের নিকট লইয়া গিয়া পরমাদরে প্রেমভরে মৃদুমধুরভাষে প্রেমক্রন্দনের স্বরে কহিলেন—"সখি! প্রিয় সখি! তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর বল।" বিরহিণী প্রিয়াজি অতিশয় ক্ষীণস্বরে কহিলেন—ঠাকুর লোচন দাসের সেই গানটী তুমি কর"—এই বলিয়াই তিনি সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে বদন লুকাইলেন। সখি কাঞ্চনা সকলি শুনিলেন ও বুঝিলেন তিনিও সখি অমিতাকে বলিলেন "সখি অমিতে! বিরহিণী গৌরবল্লভার তোমার প্রতি বড় বিশেষ কৃপা—তুমি তাঁহার ফরমাইজি গানটি করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি কর—ইহাই এখন প্রিয়াজির পরম ও চরম সেবা জানিও"—

সখি অমিতা তখন প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়া গান ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"শুনি এক ধনি, চমকি উঠিয়া,
ধরিল সে সখি করে।
নিদারুণ হ'য়ে, ভুজলতা দিয়ে,
কেমনে বান্ধিবি তারে॥
ভুজলতা পাশে, কঠিন সে ফাঁসে,
বন্ধন হইবে যবে।
অঙ্গেতে আছয়ে, নানা আভরণ,
সে অঙ্গে কেমনে সবে॥
কুচ গিরি উচ্চ, বড়ই কঠিন,
যুবতী হৃদয়ে আছে।
জিনিয়া নবনী, গোরা তনুখানি,
বেদনা লাগয়ে পাছে।
হৃদি-কারাগারে, তাহারে রাখিবি
মোর মনে লাগে ভয়।
অন্তরে আছয়ে, বিরহ অনল,
সে অঙ্গে কেমনে সয়॥
মোর মনে হয়, শুন লো সুন্দরি,
বিরলে উহারে রাখি।
একমন হ'য়ে, রহি আগুলিয়ে,
অনিমিষ হ'য়ে আঁখি॥
লোচনদাসে বলে, ধিক্ জাতি কুলে,
কিবা যশ অপযশ।

* পণ্ডিত জগদানন্দ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের পরম রসিক পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। তিনি সত্যভামার অবতার বলিয়া গোস্বামীশাস্ত্রে খ্যাত। তিনিই বিরহিণী গৌর-বল্লভার সংবাদ লইয়া নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে গোপনে দিতেন এবং প্রভুপ্রেরিত প্রসাদী বহুমূল্য শাড়ী প্রভৃতি লইয়া আসিয়া শচীমাতাকে দিতেন। প্রিয়াজিরও তিনি কৃপাপাত্র ছিলেন।

পিরীতি বন্ধনে, রাখহ যতনে,
আপনি হইবে বশ ॥"—
পদকল্পতরু।

এই অপূর্ব্ব মধুরভাব-সম্পদশ্রেষ্ঠত্বসূচক গানটি শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির কায়-মন-প্রাণ যেন প্রেমানন্দ-রসে গলিয়া গেল—তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের গলদেশ দুই বাহুযুগলে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদের যুগল বক্ষে বদন লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বালিকার মত কাঁদিতে লাগিলেন—সে ক্রন্দনের ধ্বনি নাই—সে ক্রন্দনের প্রভাবে বাক্‌শক্তি পরাভূতা,—সে ক্রন্দনের নীরবতায় অমিয় ক্ষরিত হয়—সে ক্রন্দনের অস্ফুট নীরব ভাষা এক মাত্র বিরহিণীর প্রেমাস্পদের বেদ্য—সে নীরব প্রেমময় ভাষার অন্য শ্রোতা নাই। সখি কাঞ্চনা ও অমিতারও দশা তাঁহাদের প্রিয়সখি গৌরবল্লভার দশার অনুরূপ—কারণ তাঁহারা প্রিয়াজির কায়ব্যূহ—তাঁহারা তিন জনেই যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্বধন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ তাঁহার শয়নগৃহে নবনটবর নাগর বেশে উদয় হইয়াছেন—তাঁহারা দেখিতেছেন—নদীয়ার পথে স্বজনসঙ্গে তিনি অপরূপ নদীয়া-নাটুয়াবেশে নৃত্য করিতে করিতে প্রেমানন্দে নদীয়ার রাজপথ দিয়া নিজ গৃহে চলিয়াছেন—একটী নদীয়া-নাগরী-পদ যথা,—

যথারাগ।

——"নদীয়া বিহারী গৌরাঙ্গনাগর,
নারী-মন-চোরা রসিকশেখর,
শচীর দুলাল বিষ্ণুপ্রিয়া-বর,
(ঐ) নাচিয়া আসিছে দেখ গো।
নটবর বেশ চাঁচর চিকুর,
ক্ষীণ কটিদেশ বক্ষ প্রসর,
সুবলিত দেহ নারী মনোহর,
স্বজনসঙ্গে চলিছে গো ॥
আজানুলম্বিত বাহু যুগল,
প্রেমময় অঙ্গ স্বভাব চপল,
কাঁচা সোণা রঙং বরণ উজ্বল,
(তাঁর) আঁখির চাহনি কিবা গো।
রমণীমোহন রূপ ধরিয়া,
নদীয়ার পথে চলেছে নাচিয়া,
হরিনামামৃত দিতেছে যাচিয়া,
কিবা মধুময় বুলি গো ॥
তুলিয়া দু'বাহু বিচিত্র শোভন,
প্রেমাবেশে পথে নাচে ঘনে ঘন,
কুলকামিনীর প্রাণ-রমণ,
(সে যে) পরাণ কাড়িয়া লয় গো।
চারু মনোহর দীঘল আকৃতি,
নারী মন-চোরা সুন্দর মূরতি,
সুন্দর গঠন মধুর প্রকৃতি,
(ঐ) নেচে নেচে পথে চলে গো ॥
ভণে হরিদাসী হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
লাজ মান ত্যজি হৃদি প্রাণ খুলি,
সবে সমক্ষে প্রাণনাথ বলি,
(সবে) চরণ ধরিয়া কাঁদ গো ॥"—
গৌরগীতিকা।

সর্ব্বনদীয়ায় যেন একটা প্রবল প্রেমানন্দের মহানদী প্রবাহিত হইয়াছে—বাল-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী প্রেমানন্দ-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছে।

এদিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়ন-মন্দিরেও প্রেমানন্দের তুফান উঠিয়াছে—সেখানে নদীয়া-পুরন্দর নটবরনাগর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হইয়াছে—গৌর-অঙ্গ-গন্ধে শয়নমন্দির মহমহ করিতেছে—গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জাগ্রতে স্বপন দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহার শয়ন-গৃহে আসিয়া বিচিত্র পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছেন এবং তিনিও তাঁহার শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছেন। এই সময়ে বিরহিণী প্রিয়াজির মনে আর একটী অপূর্ব্ব ভাবোদ্গম হইল—তাঁহার এই ভাবটির নাম প্রেমবৈচিত্ত্যভাব। বিরহিণী গৌরবল্লভার তৎকালোচিত ভাবটি একটি আধুনিক ভক্তিমতী স্ত্রীকবি নিম্নলিখিত পদে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

যথারাগ।

—"নদীয়া বিহারি হরি, প্রিয়াজিরে কোলে করি,
মুখ'পরি মুখ রাখি করেন চুম্বন।
অনিমিখে বিষ্ণুপ্রিয়া, পতি-মুখ নিরখিয়া,
জাগ্রতে বিবশ প্রায়,—যেন অচেতন ॥
ব্যাকুল সজল নেত্রে, মৃদুল কম্পিত গাত্রে,
বলে দেবী—"কোথা মম প্রিয় প্রাণধন"।

একাকিনী হেথা ফেলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে,
ভাঙ্গি গেলে অভাগীর সুখের স্বপন" ॥
প্রেমের বৈচিত্ত্য দেখি, প্রভুর সজল আঁখি,
বলিলেন গোরাচাঁদ—"একি গো স্বপন।
এই তুমি কোলে মোর, কি ভাবে হয়েছ ভোর,
জাগ জাগ প্রিয়তমে আজি শুভক্ষণ ॥
তোমারে পাইয়া কোলে, উল্লাসে গিয়েছি গলে,
একি তব মোহময় বিরহ বেদন ॥"
ভাঙ্গিল ভাবের ঘোর, আনন্দের নাহি ওর,
লজ্জায় ঢাকিল মুখ প্রিয়াজি তখন।
প্রভাদেবী অন্তরালে, মুচকি হাসিয়া বলে,
(প্রিয়াজি) এই ভাবে সেবিতেন প্রভুর চরণ ॥"—

অতঃপর বিরহিণী গৌর-বল্লভার জাগ্রত স্বপ্ন অকস্মাৎ ভঙ্গ হইল—তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রেমালিঙ্গন মুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতাও যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছেন—

যথারাগ।

"বসিলেন গৌরচন্দ্র রত্নসিংহাসনে।
গরব করি বিষ্ণুপ্রিয়া বসিলেন বামে।
সলাজ নয়না ধনি মৃদুমন্দ হাসি।
ঢল ঢল মুখ খান পূর্ণিমার শশী ॥
আড় নয়নে বঁধু পানে চকিত চাহনি ॥
কষিত কাঞ্চন সম চম্পক বরণী ॥
সোহাগে ঢলিয়া পড়ে গৌরাঙ্গের গায়।
মালতীর মালা দোলে দুঁহার গলায় ॥
কোন সখি রত্নছত্র ধরিল মাথায়।
দুই সখি দুই দিকে চামর ঢুলায় ॥
প্রধানা কাঞ্চনা দেয় চন্দন শ্রীঅঙ্গে।
আনন্দে মাতিল সবে প্রেমের তরঙ্গে ॥
একেত গৌরাঙ্গচন্দ্র জগত মোহন।
তাহাতে গৌরাঙ্গী মিশি হরিলা পরাণ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের যুগল মিলন।
মৃণালের ভাগ্যে কবে হবে দরশন ॥"—

এতক্ষণ সকলেই যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—এক্ষণে সকলেই কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন—সকলেই স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিয়াছেন—রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর—ভজন-মন্দিরের ঘৃতদীপটী মিটিমিটি জ্বলিতেছে—গৌর-অঙ্গগন্ধে তখন পর্য্যন্ত ভজন-মন্দির মহমহ করিতেছে—তখনও সখিদ্বয়-সহ প্রিয়াজির জাগ্রত-স্বপ্নের আবেশ আছে—প্রেমাবেশে গৌর-বিরহিণীত্রয়ের অঙ্গ গৌরপ্রেমরসে টলমল করিতেছে। সখি কাঞ্চনা নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটি প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—সুহই।

—"লোচনে ঝর ঝর আনন্দ লোর।
স্বপনহি পেখলু গৌর-কিশোর ॥
চিরদিনে আওল নবদ্বীপ মাঝ।
বিহরয়ে আনন্দে ভকত সমাজ ॥
কি কহব রে সখি রজনীক সুখ।
চিরদিনে হেরলু গোরাচাঁদের মুখ ॥
বিরহে আকুল যত নদীয়ার লোক।
গোরামুখ হেরি দূরে গেল সব শোক ॥
পুন না হেরিয়া হিয়া বিদরিয়া যায়।
নরহরি দাস কাঁদি ধুলায় লোটায় ॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

এই গানটি শুনিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে মৃদুমধুর প্রেমক্রন্দনের মর্ম্মভেদী করুণস্বরে তিনি তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার দুটি হস্ত পরম প্রেমভরে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! যাহা হইবার নহে—যাহা এ জীবনে একেবারেই অসম্ভব—যে আশা এখন দুরাশা মাত্র—এমন কথার আলোচনার আর প্রয়োজন কি? এখন গৌর-বিরহ-গানই আমার জীবনসম্বল—আমি বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন করিয়া অপূর্ব্ব সুখানুভব করি—আমার প্রাণবল্লভ বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ—সম্ভোগরসাস্বাদন বহু পূর্ব্বে যাহা তিনি আমাকে কৃপা করিয়া করাইয়াছেন, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট,—এখন তোমরা সকলে মিলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার প্রাণবল্লভের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহারই বিরহ-রসাস্বাদন করিয়া—

"হা নাথ! রমণশ্রেষ্ঠ! কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়াঃ মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥"

এই দাস্য ও সখ্যভাবমিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময় একটী অপূর্ব্ব নবভাবে যেন আমি আমার প্রাণবল্লভের

বিরহ-রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই, এই আশীর্ব্বাদ এখন তোমরা আমাকে কর।"

এই বলিয়া প্রিয়াজি বদন অবনত করিয়া পুনরায় অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তখন নিজ ভাব সম্বরণ করিয়া তাঁহার প্রিয় সখির ভাবোচিত গৌর-বিরহ-রসাত্মক আর একটী পদের ধূয়া ধরিলেন,—

রাগ—পাহিড়া।

"কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে, লিখত মহীমণ্ডল,
নয়নে গলয়ে ঘন লোর। ধ্রু॥
কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু,
জাগ রে নিঁদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাক বদন ঘন,
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন, পাণিতলে ধারই,
ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নর নারী,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই প্রাচীন পদোক্ত বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গের ভাবকদম্বগুলি সখি কাঞ্চনা সকলি তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার শ্রীঅঙ্গে দেখিতেছেন,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ এক্ষণে নীলাচলে রাধাভাবাঢ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু—কিন্তু পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস তাঁহাকে "গৌরকিশোর" বলিয়াই সম্বোধন করিতেছেন। নদীয়ার নবনটেন্দ্র নাগরেন্দ্র গৌরচন্দ্র এক্ষণে রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন—তিনি নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে একেবারে রাধাই হইয়াছেন। এদিকে নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার বক্ষবিলাসিনী বৃষভানুনন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনে তাঁহার প্রাণবল্লভেরই ভজন-পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু যে রাধার ভাব ও কান্তি চুরী করিয়া যে অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করিতেছেন, সেই রাধাই নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরে স্বয়ংরূপে এবং স্ব-স্বভাবে সেই রসই আস্বাদন করিতেছেন। তবে রসাস্বাদনের পারিপাট্য উভয় স্বরূপের কিরূপ তাহা জানিবার বা বুঝিবার শক্তি জীবের পক্ষে অসম্ভব। বিরহিণী প্রিয়াজির চরিত্র বড়ই গম্ভীর—তাঁহার বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনের পরিপাট্যও অতিশয় চমৎকার এবং দুর্ব্বোধ্য।

সখি কাঞ্চনা দেখিতেছেন বিরহিণী প্রিয়াজি গান শুনিয়া বড়ই অস্থির হইয়াছেন—মধ্যে মধ্যে তিনি অতি ধীরে ধীরে বদন উঠাইয়া সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি এক একবার করুণ-নয়নে চাহিতেছেন—আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন—নয়নের দরদরিত ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—এই প্রাণঘাতী দৃশ্য দর্শন করিয়া সখিদ্বয়ের হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। সখি কাঞ্চনা বিরহিণী গৌরবল্লভার সম্মুখে বসিয়া গান করিতেছিলেন—এক্ষণে তিনি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া বসিলেন—সখি অমিতা গিয়া তাঁহার বামপার্শ্বে বসিলেন,—সখিদ্বয় দুইদিক হইতে তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া পুনরায় অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—বিরহিণী গৌরবল্লভা প্রেমাবেশে সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন—তিন জনেই নির্ব্বাক—নিস্তব্ধ।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। তখন বিরহিণী প্রিয়াজি কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া সখি কাঞ্চনাকে অতিশয় কাতরভাবে ক্ষীণকণ্ঠে মৃদুমধুর বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমি ইতিপূর্ব্বে যে পদটি গান করিলে তাহাতে আমার প্রাণবল্লভের কৃষ্ণবিরহভাবোৎকণ্ঠার আতিশয্যেরই লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়—কিন্তু সখি! আমার হৃদয়ে ত গৌরবিরহোৎকণ্ঠার লেশাভাসও নাই—আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যই তুমি আমার প্রাণবল্লভের কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠার পদাবলী গান করিয়া আমার পরমোপকার সাধন করিতেছ—সখি! তুমিই আমার গৌরপ্রেমের গুরু। প্রাণসখি! এই ভাবের পদাবলী আরও আমাকে শুনাইয়া কৃতকৃতার্থ কর।"

সখি কাঞ্চনা লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন—তিনি কি বলিবেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না,—তাঁহার প্রাণসখির নিকট যাহা কিছু বলিবেন, তাহাতেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হইবেন,—এই বহুদর্শিতা তিনি অনেক দিন লাভ করিয়াছেন। বৈষ্ণবীয় দীনতায়,—কথার চতুরতায়—ভাবচাতুরীর পারিপাট্যে প্রিয়াজির নিকট তাঁহারা যে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত—তাহা তাঁহারা বিশেষ ভাবে জানেন। তথাপিও সখি কাঞ্চনা—কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি করযোড়ে অতিশয় দীনতার সহিত

নিবেদন করিলেন—"প্রাণ সখি! তোমার সহিত কথায় আমরা পারিব না—তুমিই তোমার প্রাণ-বল্লভের প্রেমের গুরু—তোমারই ভাব লইয়া তিনি নীলাচলে যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছেন—তাহার তুলনা একমাত্র তুমিই। তুমি আমাদের যে এত সম্মান দাও—সে তোমার নিজ গুণের পরিচায়ক—ইহাতে আমাদের কৃতীত্ব কিছুই নাই সখি! তুমি গান করিতে আদেশ করিয়াছ—আমি তাহা প্রতিপালন করিতেছি—কিন্তু তুমি দুঃখ পাইবে—সে দুঃখ তোমার তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ।"

এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজিকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই তৎক্ষণাৎ আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়।
জাগিয়া রজনী পোহায়॥
খেনে খেনে করয়ে বিলাপ।
খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ॥
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে।
কোন নাই রহু পঁহু পাশে।
ঘন কাঁদে তুলি দুই হাত।
কোথার আমার প্রাণনাথ॥
নরহরি কহে মোর গোরা।
রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই গানটি শ্রবণ করিয়া বিরহিণী গৌর বল্লভা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না—তিনি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া অঙ্গ আছড়াইয়া ভূমিতলে পড়িলেন এবং আলুথালু বেশে অসম্বর হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার দিগবিদিগ্ জ্ঞান নাই—কোথায় তাঁহার আসন—কোথায় তাঁহার বসন—কোথায় তাঁহার পূজার উপকরণ—কোথায় তাঁহার মালা ঝোলা,—উন্মাদিনীর ন্যায় বিরহিণী গৌর-বল্লভা ভজনমন্দিরের ভিতরেই—তাঁহার অভীষ্টদেবের সম্মুখেই সজোরে বক্ষে করাঘাত করিতেছেন—দুই হস্তে নিজ কেশদাম ছিঁড়িতেছেন—আর চীৎকার করিয়া করুণ ক্রন্দনের বিষম রোল উঠাইয়াছেন। সখিদ্বয় বিষম বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিরহিণী প্রিয়াজিকে সর্ব্বভাবে সামলাইতেছেন, আর সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বান্তঃকরণে গৌরাঙ্গ-চরণ স্মরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মনস্তাপের সীমা নাই—প্রিয়াজির এই আগন্তুক বিষম উদ্বেগের মূল কারণ—এই পদটীর ভাবে ও ভাষায় নিহিত আছে—সেই পদটী গান করিয়াছেন সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির প্রেরণায়। সখি কাঞ্চনা এক্ষণে মনোদুঃখে, মনস্তাপে ও ক্ষোভে অত্যন্ত অনুতপ্ত—সখি অমিতারও দুঃখের সীমা নাই—সখি কাঞ্চনার দুঃখেই তাঁহার দুঃখ—দুই জনে দুই জনের বদনের প্রতি চাহিতে পারিতেছেন না—কেবল অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। পরমা ধৈর্য্যবতী বিরহিণী গৌর-বল্লভা আজ পরম অধৈর্য্য হইয়াছেন—তাঁহার মনে অত্যান্তিক দুঃখ তাঁহার প্রাণবল্লভ যে ভাবে কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন—তিনি সে ভাবে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিতে পারিতেছেন না—ইহাই তাঁহার পরম দুঃখ—চরম মনস্তাপ। পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি তখন আপনাআপনিই আত্মসম্বরণ করিয়া স্থির হইলেন—তিনি তখন অবশাঙ্গ হইয়া জড়বৎ ভূমিতলে পড়িয়া রহিলেন—সখিদ্বয় তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্তা আছেন—দাসীগণও আসিয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্তা আছেন—কিন্তু কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

গৌর-বল্লভার বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে—তিনি পরম বুদ্ধিমতী এবং স্নেহবতী। সখি ও দাসীগণের দুঃখে তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইয়াছে,—তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন—সখিদ্বয় ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা অতিকষ্টে দুই হস্তে সখিদ্বয়ের গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাদের ক্রোড়ে তাঁহার শুষ্ক ও মলিন বদন খানি লুকাইলেন—তাঁহার তাৎকালিক মনোভাব,—এ মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। সর্ব্বজ্ঞা সখিদ্বয় প্রিয়াজির মনোভাব সকলই বুঝিতেছেন, কিন্তু কি করিবেন? এখন কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না।

গৌরবিরহিণী গৌরবল্লভা প্রথমেই ক্ষীণকণ্ঠে অতিশয় কাতর করুণস্বরে সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি চাহিয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে কহিলেন—সখি কাঞ্চনে। আমার জীবনে ধিক্! আমার প্রাণবল্লভ নীলাচলে বসিয়া কৃষ্ণবিরহরসাস্বাদন করিয়া জগজ্জীবকে কৃষ্ণভক্তি-রসে নিমগ্ন করিতেছেন—যেরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবশিক্ষাচ্ছলে তিনি আমাকেই শিক্ষা দিতেছেন,

আমি অভাগিনী তাঁহার সহস্রাংশের একাংশও আচরণ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেছি না। সখি! প্রিয় সখি! আমার অপরাধের সীমা নাই—আমার মত হতভাগিনী ত্রিজগতে দ্বিতীয়া নাই,—আমি সর্ব্বভাবে গৌরপ্রেমে বঞ্চিত,—এখন উপায় কি? সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! তোমারা দুইজনেই আমার পরম হিতৈষিণী—তোমরাই আমার গৌর-প্রেমের গুরু এখন—

যথারাগ।

—"গুরু হ'য়ে তার সখি! এ বিষ্ণুপ্রিয়ায়।
বল বল প্রিয় সখি! কি করি উপায়॥
কি করিলে কোথা গেলে, মিলে গোরা রায়॥ ধ্রু।
গৌর প্রেমের গুরু তুমি, দুখিনী পাপিনী আমি,
কি ভাবে ভজন করি শিখাও আমায়।
দয়া কর নিজগুণে এ বিষ্ণুপ্রিয়ার॥
দাসী হরিদাসী কয়, গুরু হ'য়ে শিষ্য হয়,
এ বড় নিগূঢ় তত্ত্ব, বুঝন না যায়॥"

সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার উত্তপ্ত নয়নজলে প্রিয়াজির বক্ষ ভাসাইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত দুই হস্তে তাঁহার দুখানি করকমল নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া বিনীতভাবে পরম করুণস্বরে নিবেদন করিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার এইরূপ দৈন্যকথায় আমাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হয়—তুমি কি তাহা বুঝিতে পার না সখি? তোমার ভাবের তোমাতেই অবধি—তোমাতেই তাহার সমাধি—অন্যে তোমার ভাবের মর্ম্ম বুঝিবে না—কিন্তু আমরা তোমার অন্তঃরঙ্গা সখি, আমরা সকলই বুঝিতে পারি—আমাদের সঙ্গে তুমি এমন কর কেন সখি! তোমার দুঃখে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়—তোমার মুখে এত দুঃখের মধ্যেও একটী ভাল কথা শুনিলেই—তোমার ম্লান বদনে একটু হাসির লেশাভাস মাত্র দেখিলেই আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাই। সখি! প্রিয়সখি! প্রাণসখি! আর এরূপ কথা আমাদিগকে যেন শুনিতে না হয়—আমাদিগের এই প্রার্থনাটি তোমায় শুনিতে হইবে—এই ভিক্ষাটী তোমার দিতেই হইবে—নচেৎ আমাদিগের প্রাণ রক্ষা দায় হইবে—তুমি স্ত্রী-বধের দায়ী হইবে।"—

বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার কথাগুলি বিমত-বদনে সকলি শুনিলেন—শুনিয়া স্তম্ভভাব ধারণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বাক্ রহিলেন—কোন উত্তরই দিলেন না। তিন জনেই সেই গভীর নিশীথে—ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

পরিশেষে পরম স্নেহময়ী গৌর-বল্লভা গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পরম করুণ স্বরে কহিলেন,—"সখি কাঞ্চনে! কি আর বলিতে আমি জানি,—আমার বলিবার ত আর কিছু নাই—তুমি ও অমিতা আমার মনের কথা—প্রাণের ব্যথা সকলই জান,—মনে মনে বিচার করিয়া দেখ দেখি সখি! আমার প্রাণ-বল্লভ জগজ্জীবের হিতাকাঙ্ক্ষায় কিরূপ কঠোরতা করিতেছেন,—কত না কষ্ট সহ্য করিতেছেন,—আর আমি সখি! পরমসুখে তাঁহার গৃহে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি—বর্ষাতপে—আমার কোন কষ্ট নাই—তোমরা আমার সুখের জন্য সর্ব্বভাবে সকলই সমাধান করিতেছ? একথা চিন্তা করিলে—বিচার বিশ্লেষণ করিলে সখি! আমাতে আর আমি থাকি না,—কি বলিতে কি বলি—কি করিতে কি যে করি—কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমাদের আমি যে কি বলিয়াছি আমার ত কিছুই মনে নাই। যদি কিছু দুঃখ-দায়ক কথা বলিয়া থাকি, যাহাতে তোমরা মনে এত মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছ,—তাহার জন্য আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবে—আমি উন্মাদিনী,—হিতাহিত জ্ঞান রহিতা,—আমার প্রলাপবাক্যে কি এত দুঃখ করিতে আছে? ছি সখি! তুমি বুদ্ধিমতী—আমার বর্ত্তমান শোচনীয় মানসিক-অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবে। এখন আমার প্রাণবল্লভের সেই অত্যদ্ভুত কৃষ্ণবিরহাকুল প্রেম-চেষ্টার কথাই পুনরায় বল, আমি শুনিয়াই কৃতার্থ হই—আমার শিক্ষা হউক।"

সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মহা চিন্তান্বিতা হইলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহরসাস্বাদনের পরম নিগূঢ় পদাবলী শুনাইয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে উন্মাদিনী করিয়াছিলেন—যে জন্য তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়াছেন—এক্ষণে পুনরায় প্রিয়াজি সেই রূপ লীলাগানই শুনিতে চাহিতেছেন। সখি কাঞ্চনা বিশেষরূপে জানেন, গৌরবল্লভা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা—তিনি যাহা বলিবেন তাহাই করিবেন—তিনি ইচ্ছাময়ী। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহার প্রাণবল্লভের বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ শ্রীমূর্ত্তিটিকে—যাহা তিনি এক্ষণে নীলাচলে

প্রকট করিয়াছেন—তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তমহাজন-গণের রচিত পদাবলী দ্বারে আস্বাদন করিবেন। রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর নীলাচলের গম্ভীরালীলার অত্যদ্ভুত প্রেম-চেষ্টা-কথা-শ্রবণ-লালসা তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার মনে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। ভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি এখন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে—তিনি যে একেবারে শ্রীরাধা হইয়াছেন—আর তাঁহার অদ্ভুত প্রেমচেষ্টা যে তাঁহার পূর্ব্বলীলার প্রাণবল্লভার ভাবের পরাকাষ্ঠা—বিরহিণী প্রিয়াজি তাহাই উপলব্ধি করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। বিরহিণী গৌরভববল্লভা স্বয়ং যে ভাবে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন—সেই ভাবটী পরিবর্দ্ধিত, পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিবার জন্য গৌরবল্লভার এই বাসনা—এই প্রচেষ্টা। সখি কাঞ্চনা সর্ব্বজ্ঞা এবং প্রিয়াজির মনোভাব সকলই তিনি জানেন। তিনি আর কোন কথা কহিতে সাহস করিতেছেন না—অথচ তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটী বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে—কি জানি আবার বা কি হয়?

অন্তর্য্যামিনী প্রিয়াজিও সকলই বুঝিতেছেন—প্রিয় সখি কাঞ্চনার হৃদয়ের ভাবটী তিনি বুঝিতে পারিয়া অতিশয় কুণ্ঠিতভাবে সদৈন্যবচনে তাঁহাকে দুটী কথা বলিলেন। সখি কাঞ্চনার দুটী হস্ত নিজ বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুমধুর অস্ফুট প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"প্রিয় সখি কাঞ্চনে! ভয় নাই—আমি আত্মসংযমের চেষ্টার ক্রুটি করিব না।"

সখি কাঞ্চনা তখন সাহসে ভর করিয়া তাঁহার কলকণ্ঠে আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—সুহই।

—"রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণনাম-মধু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন বিমল বিধু॥
শিব বিহি নাহি পায় যার পদে ভক্তি।
তরুতলে বৈঠল সব সঙ্গ তেজি॥
ছাড়িয়া সকল সুখ ভেল অশকতি।
সাত কুম্ভ কলেবর ভাব বিভূতি॥
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কাঁদে।
বাসুঘোষ হিয়া থির নাহি বান্ধে।"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি মালাহস্তে সংখ্যানাম জপ করিতেছেন—আর গান শুনিতেছেন—তাঁহার দু'নয়নে অবিরল ধারা পড়িতেছে—তিনি ভজন-মন্দিরের নিভৃত এক প্রান্তে বসিয়া একাকিনী গান শুনিতেছেন—তাঁহার অন্তরে অন্তরে অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-বিকার-লক্ষণ সকল পরিপুষ্ট হইতেছে—শ্রীমুখের ভাবে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সখিদ্বয় তাহা দেখিতেছেন। কিন্তু বাহ্যে সে সকল ভাবকদম্বের বিকাশ নাই।

সখি কাঞ্চনা অনিমেষ নয়নে বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন—গৌর-বল্লভার গৌরানুরাগরঞ্জিত চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত,—গানটি শেষ হইবার কিছুক্ষণ পরে তিনি একবার চক্ষু উন্মিলিত করিয়া সখি কাঞ্চনার প্রতি সজলনয়নে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন—তাহার মর্ম্ম "সখি! তুমি আরও গান কর"। সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির ইঙ্গিত বুঝিয়া সাহসে ভর করিয়া পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—পাহিড়া।

"হরি হরি কি কহব গৌর-চরিত।
অকুর অকুর বলি, পুন পুন ধাবই,
ভাবহি পুরব পীরিত। ধ্রু।
কাহা মঝু প্রাণনাথ, লেই যাওই,
ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন, বোলে নাহি ঐছন,
সব জন রহল নিচুপে॥
রোই কত খণে, বোলই পুনঃ পুনঃ
তুহুঁ সব না কহসি ভাব।
ঐছন হেরি, ভকতগণ রোয়ত,
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই গানটী শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির মনে তাঁহার প্রাণবল্লভের সন্ন্যাস-লীলার পূর্ব্ব স্মৃতি সকল উদয় হইল। কেশবভারতীর কথা মনে স্মরণ হইল—তিনি যেন শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার শ্রীমুখে অস্ফুটস্বরে কেশবভারতীর নামটী যেন শ্রুত হইল—অতি কষ্টে তিনি তাঁহার ভাব সম্বরণ করিয়া নিস্তব্ধভাবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা সময়োচিত ও ভাবোচিত আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—পাহিড়া।

"হরি হরি গৌরাঙ্গ কেন এমন হৈলা।
সবারে সদয় হৈয়া, মুঞি নারীরে বঞ্চিয়া,
এ শোক-সাগরে ভাসাইলা॥ ধ্রু॥
এ নব যৌবন কালে, মুড়াইলা চাঁচর চুলে,
কি জানি সাধিলা কোন সিদ্ধি।
কি জানি পরাণ যে, পশুবৎ পতিত সে,
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসে দিলা বিধি॥
অক্রূর আছিল ভাল, রাঙ্গা বোলে লইয়া গেল,
থুইল লৈয়া মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়,
ভারতী করিলা দেশান্তরী॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, মরমে বেদনা পাঞা,
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
বাসুদেবানন্দে কয়, মো সম পামর নাই,
তবু হিয়া না বিদরে আমার॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি গানটী শুনিয়া গেলেন মাত্র, তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তনের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্ট হইল না। এখন তাঁহার স্তম্ভভাব—তিনি ভজন-মন্দিরে এক নিভৃত কোনে বসিয়া দেওয়ালের ভিতে ঠেস দিয়া গান শুনিতেছেন—তাঁহার শরীরের বর্ণ বৈবর্ণ—নয়নদ্বয় নিমীলিত—যেন গভীর ধ্যানমগ্না। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা সকলই দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন। সখি অমিতা তখন কাঞ্চনার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গান বন্ধ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এই ভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল—রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—সখিদ্বয় মালা হস্তে করিয়া জপে বসিলেন—প্রিয়াজির হস্তে মালা নাই—তিনি সমাধিস্থা। এই ভাবেও কিছুক্ষণ গেল—তথাপিও প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইল না দেখিয়া সখিদ্বয় মহা চিন্তান্বিতা হইলেন এবং জপমালা রাখিয়া প্রিয়াজির নিকটে বসিয়া গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

—"গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাং॥
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাং।
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর ত্রাহি মাং॥"—

এই নাম সর্ব্বক্ষণ চলিতে লাগিল—কিছুক্ষণ পরে প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি তখন উদাস প্রাণে সখিদ্বয়ের প্রতি করুণ নয়নে একবার চাহিলেন—পুনরায় বদন অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—তাঁহার শ্রীবদনে অস্ফুটস্বরে গৌরনাম শ্রুত হইতে লাগিল—শ্রীহস্তে জপমালা অলক্ষ্যে আপনিই তুলিয়া লইয়াছেন—বারম্বার ভূমিতলে মস্তক লোটাইয় প্রণাম করিতেছেন। বিরহিণী প্রিয়াজির তাৎকালিক অবস্থা নিম্নলিখিত পদটিতে পরিস্ফুট হইয়াছে।

যথারাগ।

—"বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া, হাতে লঞা জপমালা,
রুই রুই জপে গৌর নাম।
নবীনা যোগিনী ধনি, বিরহিণী কাঙ্গালিনী,
প্রণময়ে নীলাচল ধাম॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধুলা মাখা, লম্বাকেশ এলো চুলা,
সোনার অঙ্গ অতি দুরবল।
বলরাম দাস কয়, শুন প্রভু দয়াময়,
মুছায়ে দাও দেবী-আঁখি জল॥"—

এই ভাবে গৌর-বল্লভা নিজ সংখ্যানাম শেষ করিয়া পুনরায় সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া ইঙ্গিত করিলেন আরও গান কর। সুচতুরা কাঞ্চনাসখি প্রিয়াজির মনোভাব বুঝিয়াই পূর্ব্বভাবের গানের পুনরায় ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—সুহই।

—"সিংহদ্বারে ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সভারে সুধায়॥
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়।
মাঝে কনয়া-গিরি ধুলায় লোটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মূরছায়॥
উত্তাল নয়ন মুখে ফেন বহি যায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়ে যায়॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই গানটী শুনিবামাত্র বিরহিণী গৌর-বল্লভা পূর্ব্ববৎ অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতলে নিপতিত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। সখিদ্বয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত

হইলেন। এই যে প্রিয়াজির প্রেম-মূর্চ্ছনা, ইহা তাঁহার প্রাণবল্লভের উপরি উক্ত পদেরই ভাব—

—"আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মুরছায়॥"—

সখিদ্বয় দেখিতেছেন বিরহিণী প্রিয়াজির,—

উত্তাল নয়ন, মুখে ফেন পড়ি যায়।"

তখন যেমন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের,—

"চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়"

বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে সখি ও দাসীগণে বেষ্টন করিয়া তেমনি ভাবেই গৌর-গুণ-গান করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা মূল গায়িকা—আর সকলে দোহার দিতে লাগিলেন,—গৌর-গীতির ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—কেদার।

—"অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম বিনোদ, নব নাগর,
বিহরই নবদ্বীপ-মাঝ॥ ধ্রু॥
কুটিল কুন্তল, গন্ধ পরিমল,
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির—
দুয়ারে দেওল কপাট॥
অধর বান্ধুলী বন্ধু বন্ধুর,
মধুর বচন রসাল।
কুন্দ-হাস, প্রকাশ সুন্দর,
ইন্দুমুখ উজিয়ার।
করিকর জিনি বাহুর সুবলনি,
দোসারি গজমতি হার।
সুমেরু শেখর উপরে যৈছন,
বহুই সুরধুনী ধার॥
রাতুল চরণ, যুগল পেখলু,
নখর বিধু মণি জোর।
সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল,
গোবিন্দদাস মন ভোর।"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি এতক্ষণে অঙ্গমোড়া দিয়া একবার পাশ ফিরিলেন—তাঁহার মলিন বদনচন্দ্রখানি সখিদ্বয়ের সম্মুখে পড়িল। সখি কাঞ্চনা দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সমস্ত ভাবকদম্বগুলি প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গে বর্ত্তমান—মধ্যে মধ্যে তাঁহার শ্রীমুখে "গৌর" নাম অস্ফুটস্বরে শ্রুত হইতেছে—তিনি যেন আকুলপ্রাণে গৌরান্বেষণে ব্যস্ত। কোথায় আমার প্রাণকান্ত গৌরসুন্দর—কোথায় আমার প্রাণবল্লভ গোরারায়,—কোথায় আমার নাগরেন্দ্র শিরোমণি নদীয়ার চাঁদ—এই ভাবের বিলাপোক্তির ভাব গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির বদনচন্দ্রে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। সখি কাঞ্চনা তৎকালোচিত এবং ভাবোচিত আর একটী গৌর-গুণ-গানের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—বরাড়ী।

—"ও না কে বল গো সজনি!
কত চাঁদ জিনি সুন্দর মুখানি
বরণ কাঞ্চন মণি॥ ধ্রু।
করিবর কর জিনি, বাহুর সুবলনী,
আজানুলম্বিত সাজে।
নখ-কর-পদ, বিধু কোকনদ,
হেরি লুকাইল লাজে॥
ভাঙ যুগবর দেখিতে সুন্দর,
মদন তেজয়ে ধনু।
তেরছ চাহিয়া, হাসি মিশাইয়া
হানয়ে সভার তনু॥
কটিতে বসন, অরুণ বরণ,
গলে দোলে বনমালা।
বাসু ঘোষ ভণে হও সাবধানে,
জগত করেছে আলা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই গানটি শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির প্রেমমূর্চ্ছা কথঞ্চিৎ ভঙ্গ হইল—তিনি ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলন করিয়া সখি কাঞ্চনার প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিলেন—কি বলিতে গেলেন—বলিতে পারিলেন না—তাঁহার দু'নয়নে অবিশ্রান্ত প্রেম-ধারা বহিতেছে। কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে মৃদুমধুর বচনে সখি কাঞ্চনার অঙ্গে হস্তস্পর্শ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার গৌর কোথায়? আমার প্রাণবল্লভ এমন কেন হইলেন?" এই বলিয়া বালিকার মত প্রিয়াজি ফুঁপিয়া ফুপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—আর কোন কথা

বলিতে পারিলেন না। সখিগণ চৌদিকে বেড়িয়া গৌরনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন—কাঞ্চনার ইঙ্গিতে তাঁহারা ভজন-মন্দিরের বাহিরে গেলেন—কেবলমাত্র সখি অমিতা রহিলেন।

মর্ম্মী সখিদ্বয় বিরহিণী গৌরবল্লভার শ্রীবদনের উপর মুখ দিয়া বসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেছেন—আর তাঁহার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। প্রিয়াজি বড় দুর্ব্বল উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—কিন্তু উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহার শ্রীবদন হইতে অনবরত গৌরনাম-মধু ক্ষরিত হইতেছে—সখিদ্বয় আর গৌরবল্লভার শ্রীবদনের গৌর-নাম মধু-পানে প্রমত্তা হইয়াছেন—গৌরবক্ষ-বিলাসিনীর প্রেমমূর্চ্ছাবস্থায় তাঁহার শ্রীবদনচন্দ্র হইতে যে ফেন নির্গত হইয়াছিল, তাহা পান করিয়া অন্তরঙ্গা সখি ও দাসীবৃন্দ প্রেমোন্মাদিনী হইয়া গৌর-গুণগানে প্রমত্ত হইয়াছিলেন—প্রেমোন্মাদ-দশাগ্রস্ত শ্রীপ্রভুর শ্রীবদনের ফেনপুঞ্জ ভক্তগণ পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হইতেন। এই ফেনপুঞ্জের নাম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত দিয়াছেন "লব"—গৌরবক্ষবিলাসিনীর শ্রীবদননিঃসৃত "লব" গৌরভক্ত-গণের দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু নদীয়ানাগরীবৃন্দ তাহা পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। নদীয়ানাগরীবৃন্দের ইহা একচেটিয়া সম্পত্তি,—তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই- ইঁহারা ব্রজগোপিকা-দিগের মত জগৎপূজ্যা—ইঁহাদিগের পদরেণু প্রাপ্তির আশায় উদ্ধবাদি কৃষ্ণভক্তশিরোমণিগণ নদীয়ায় তৃণ-গুল্ম-জন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন। নদীয়া নাগরীগণ প্রিয়াজির কায়ব্যূহ—তাঁহাদের আনুগত্যে রসরাজ গৌরাঙ্গভজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম সাধন—ইঁহাদিগের রাগাত্মিকা ভক্তিপথ—একমাত্র ব্রজগোপিকাবৃন্দ এবং নদীয়ানাগরীবৃন্দ এই রাগাত্মিকা ভক্তিমার্গের অধি-কারিণী—আর যত বড় গৌরভক্তচূড়ামণিই হউক না কেন তাঁহাদের পক্ষে রাগানুগা ভক্তিপথ।

বিরহিণী প্রিয়াজি এক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছেন—তিনি সখিদ্বয়ের অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া পরম প্রেমাবেগে ইতি উতি চাহিতেছেন। সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি প্রিয়াজির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ইহার মর্ম্ম কৃতজ্ঞতার নিদর্শন—সখি কাঞ্চনার গানে আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের মূর্ত্ত বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ দর্শন হইয়াছে। কৃষ্ণবিরহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীঅঙ্গে কিরূপ ভাবে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বিকারের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইত—যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার পার্ষদভক্ত-গণ স্বরচিত পদে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—আজ সখি কাঞ্চনার কলকণ্ঠে সেই সকল পদরত্নের আস্বাদন করিয়া প্রিয়াজির তত্তদ্ভাবোচিত ভজন শিক্ষা হইল—এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি বারম্বার সখি কাঞ্চনার প্রতি সকরুণ শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই সকল পদাবলী শ্রবণ-মধুলোলুপ এই শুভদৃষ্টির মর্ম্ম "আরও গাও"। একমাত্র সর্ব্বজ্ঞা কাঞ্চনাই প্রিয়াজির মনোভাব বুঝিতেছেন—তাঁহার মর্ম্মব্যথার মর্ম্মানুভব করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভয় দূর হইতেছে না—প্রিয়াজির শ্রীমুখের আশ্বাস বাক্য পাইয়াও তিনি দেখিতেছেন গৌর-বল্লভা স্ববশে নহেন—তিনি পরম স্বতন্ত্রা হইয়াও যেন পরতন্ত্রা হইয়াছেন—বহু চেষ্টাতেও তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি-বাক্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না—ইহাতে তাঁহার কোন দোষই নাই—সুচতুরা ও ভজনবিজ্ঞা সখি কাঞ্চনা তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন। তবুও আর একবার করযোড়ে প্রিয়াজির চরণে ভয়ে ভয়ে একটী কথা নিবেদন করিলেন। তিনি অতি মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক—রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল—অবসর মত কল্য আবার তোমাকে এই গানই শুনাইব।"

বিরহিণী গৌরবল্লভার বদনমণ্ডল যেন গম্ভীরভাব ধারণ করিল—তিনি যেন মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—মুখে কোন কথাই বলিলেন না—কিন্তু সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি ঘন ঘন সকরুণ নয়নে চাহিতে লাগিলেন এবং কান্দিয়া আকুল হইলেন। তিনি তখন যেন নিরুত্তর হইয়া অস্ফুটস্বরে করযোড় করিয়া স্থিরভাবে জড়বৎ আকাট হইয়া বসিয়া রহিলেন। সখি কাঞ্চনা আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না—তিনি তাঁহার কলকণ্ঠে পূর্ব্ববৎ প্রাচীন পদাবলীর ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ পাহিড়া।

—"আরে আমার গৌরকিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহনে হাসি,
মনের ভরমে পহু ভোর॥ ধ্রু॥
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায়, কারে পঁহু কি সুধায়,
কোথায় আমার প্রাণনাথ।

ক্ষণে শীতে অঙ্গ কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেই লম্ফ,
কাঁহা পাও যাও কার সাথ॥
ক্ষণে ঊর্দ্ধ বাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখিযুগ মুন্দে, হা নাথ বলিয়া কান্দে,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ॥
কহে দাস নরহরি, আরে মোর গৌরহরি,
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে, কলিযুগ উদ্ধারিতে,
বঞ্চিত হইনু মুক্তি কেন॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এবার গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি এই গানটী শুনিয়া সখি সঙ্গে দু'একটী মনের মর্ম্মকথা কহিতে বাসনা করিলেন। তাঁহারা ইঙ্গিতে বুঝিলেন ইচ্ছাময়ীর কিছু বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে—সখিদ্বয় প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়া নিকটে গিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলেন। গৌরবল্লভা স্বল্পভাষিণী, দুই একটী মর্ম্মকথা অতি গোপনে মর্ম্মীসখিদ্বয়কে বলিবেন—এরূপ বাসনা করিয়াছেন। তিনি অতি মৃদুমধুর বচনে কহিলেন —"সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! তোমরা আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বল দেখি, আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য যে ভাবে নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন, তাহার সহস্রাংশের একাংশও কি আমার দ্বারা সম্ভব? আমি যে সর্ব্বভাবে তাঁহার অযোগ্যা দাসীর দাসী—তাহা ত তিনি জানেন তিনি কি তাঁহার দাসীর ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন না সখি?" এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি দুই বাহু দ্বারা সখিদ্বয়ের কণ্ঠদেশ পরম প্রেমাবেশে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার মনপ্রাণ নীলাচলের গম্ভীরামন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে পড়িয়া রহিয়াছে—তাঁহার শরীরটা মাত্র নদীয়ায় রহিয়াছে। তিনি যেন সুস্পষ্ট দেখিতেছেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ-দশায় মূর্চ্ছিত—স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ নিকটে বসিয়া আছেন—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃষ্ণনাম শ্রবণে হঠাৎ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল—তখন তিনি কি করিলেন, পদ-কর্ত্তা বাসু ঘোষ তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

রাগ—শ্রীরাগ।

—"চেতনা পাইয়া গোরা রায়।
ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥
সম্মুখে স্বরূপ রাম রায়।
দেখি পহুঁ করে হায় হায়॥
কাঁহা মোর মুরলি-বদন।
এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ।
কৃপা করি দেহ দরশন॥
এত বিলাপয়ে গোরাচাঁদে।
দেখিয়া ভকতগণ কাঁদে॥
বাসু ঘোষ কহে মোর গোরা।
কৃষ্ণপ্রেমে হইল বিভোরা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনা অতঃপর এই গানটি গাহিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাবেশে পরম বিহ্বলভাবে গানটী শুনিলেন। তিনি যেন নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে রাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিরহাকুল বিলাপধ্বনি নদীয়ায় বসিয়া শ্রবণ করিতেছেন—

"ওহে নাথ পরম করুণ! কৃপা করি দেহ দরশন॥"

এই বিলাপধ্বনির প্রতিধ্বনি যেন গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণে বাজিতে লাগিল—কর্ণের ভিতরে গিয়া বাসা করিল।

"কাঁহা মোর মুরলি-বদন! এখনি পাইনু দরশন"

তাঁহার প্রাণবল্লভের এই আত্মনিবেদনের করুণ স্বর—এই প্রাণের ব্যাকুলতাময়ী আত্মবিলাপ-কাহিনী—গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির মনে পাষাণের রেখার ন্যায় দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গেল।

এই পদরত্নটীর মধ্যে গৌরবল্লভা তাঁহার সন্ন্যাসী প্রাণ-বল্লভের মূর্ত্ত "রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপং" অপরূপ রূপের অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন। তিনি স্বাভাবিক স্বকীয় ভাবে যেরূপ গৌরবিরহ রসাস্বাদন করিতেছেন —তাঁহার প্রাণবল্লভের এই ভাবটি তদ্রূপই—কিন্তু গৌরবক্ষ-বিলাসিনী প্রচ্ছন্ন অবতার নারী—তিনি বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী—সে ভাব তাঁহাতে যাহা প্রকাশ নাই—অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রিয়াজির হৃদয়ের অন্তঃস্তলে মহাভাবময়ীর সেই ভাব

কদম্ব গুলি অন্তর্নিহিত অবস্থায় বিদ্যমান। মর্ম্মী সখিগণ তাহা জানেন—গৌরবল্লভাও তাহা জানেন। অপূর্ব্ব লীলারঙ্গের উদ্দেশে সে সকল গুপ্তভাবগুলিকে অন্তরে অন্তরে সঙ্গোপনে রাখা হইয়াছে।

বিরহিণী গৌরবল্লভা প্রেমাবেশে ইতি উতি চাহিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে মহা সকরুণ ক্রন্দনের সুরে বলিতেছেন —

যথারাগ।

—"কাঁহা মোর গোরা রায়'
শিরে কর হানি করে হায় হায়॥
দরশন দাও কৃপা করি।
নদীয়াবিহারী ওহে গৌরহরি॥
দরশন বিনে পরাণ যে যায়।
রাত্রি দিনে নিঁদ নাহি আয়॥
এত বলি বিলাপয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া।
সখিগণ সবে বিষাদিত হিয়া॥
সবে মিলে বল জয় বিষ্ণুপ্রিয়া।
ভণয়ে হরিদাসী কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥

গৌর-গীতিকা।

এই ভাবে ভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গের কৃষ্ণবিরহরস এবং তাঁহার স্বরূপশক্তির স্ব-স্বরূপের স্বাভাবিক গৌর-বিরহরস-সার সংমিশ্রণে নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তরে গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রাণে একটী অপূর্ব্ব অননুভূত ও অনির্ব্বচনীয় বিপ্রলম্ভ-রস-সারের একটী উৎস সৃষ্টি করিয়াছে —যাহার অমৃত রসাস্বাদনে সখিদ্বয় সহ গৌর-বল্লভা তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণবৎ পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। লোকচক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে বিরহদুঃখানুভূতিসূচক আক্ষেপোক্তি মাত্র বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইহার নাম "আনন্দামৃতম্"।

বিরহিণী প্রিয়াজি কতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া সখি কাঞ্চনার প্রতি পুনরায় সকরুণ নয়নে চাহিলেন। এই চাহনির মর্ম্ম "গান চলুক পূর্ব্ববৎ"। তিনি পুনরায় জপমালা হস্তে করিয়া বসিলেন।

সখি কাঞ্চনার আর কোন কথা বলিবার সাহস নাই— স্বতন্ত্রা পরাশক্তির স্বতন্ত্রতার প্রভাব গুরুতর, তাহার উপর কোন কথা বলিবার শক্তি তাঁহার কায়ব্যূহ সখিদেরও নাই —প্রেমতত্ত্বে পরতত্ত্ব ও গৌরকৃষ্ণতত্ত্বে পরাশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বয়ং ভগবান "দেহি পদ পল্লব মুদারং" বলিয়া বিনত মস্তকে তাঁহার পরাশক্তির স্বতন্ত্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। সখি কাঞ্চনার ইচ্ছা ছিল না নীলাচলের ব্রজমাধুরীর পদাবলী আজ আর গান করেন,— এ কথা বিরহিণী প্রিয়াজিকে তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন —তাহার উত্তরও তিনি পাইয়াছেন। দ্বিতীয় কথাটি বলিতে তিনি আর সাহস করিলেন না। তিনি তখন প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কলকণ্ঠে আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ ধানশী।

—"যামিনী জাগি জাগি জগজীবন
জপতহি যদুপতি নাম।
যাম যাম যুগ, যৈছন জানত,
জর জর জীবন মান॥
ঝুবত্ত-গৌর কিশোর।
ঝাকত ঝিকয়ে, ঝর ঝর লোচনে,
বুঝি পূরব রসে ভোর। ধ্রু॥
চম্পক গৌর, চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে, চলই না পারই,
চকিতহি চেতন চোরাহ॥
ছল ছল নয়ন, ছাপি করযুগল.
ছোড়ল রজনীক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি, কবহু জগজীবন,
ছদ না কহতহি দাস গোবিন্দ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখিদ্বয় স্পষ্ট দেখিতেছেন গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গে এই পদবর্ণিত সমুদয় ভাবকদম্বগুলিই সুন্দর ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে—কেবল মাত্র—

"চলইতে চরণে, চলই না পারই"

ভাবটি বিরহিণী প্রিয়াজির মানসিক ভজন-রহস্য- ব্যাপার। তিনি বসিয়া আছেন—কিন্তু মনে করিতেছেন— তিনি গৌরান্বেষণে চলিয়াছেন। পূর্ণিমার চাঁদিনী নিশি— রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—পূর্ণ শশধর ম্লান মুখে নদীয়ার মহাগম্ভীরামন্দিরের গবাক্ষদ্বার দিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির এই কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান লীলারঙ্গ দর্শনলোলুপ হইয়া যেন অতি গোপনে এক একবার উঁকি ঝুঁকি মারিতেছেন

—বিরহিণী প্রিয়াজির নয়নপথে পতিত হইবামাত্র তিনি যেন এক একবার চমকিয়া উঠিতেছেন,—আর সুচতুরা সখিদ্বয় তাহা দর্শন করিয়া পদরত্নটীর বর্ণিত ভাব-লহরীর সহিত প্রিয়াজির এই ভাব-কদম্বটি মিলাইতেছেন—সেই পদাংশটি এই—

—"চম্পক গৌর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ ॥"—

এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতার সহিত বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনের পারিপাট্য দর্শনে মর্ম্মী সখিদ্বয় প্রেমানন্দসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভার বাহ্যজ্ঞান নাই—তিনি যেন একটী মূর্ত্তিমতী বিপ্রলম্ভ রস-বিগ্রহ। নিস্পন্দ—নির্ব্বাক—নীরব—নিশ্চল—একটী অপূর্ব্ব মহাভাবময়ী শ্রীমূর্ত্তি নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরে যেন অধিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্ত্তিমতী বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহটির শ্রীচরণ দর্শন-সৌভাগ্য যাঁহারা পাইয়াছেন—তাঁহাদের মত সৌভাগ্যবতী ত্রিজগতে কেহ নাই—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যরস-রসিক ও রসিকা ভক্তগণের নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই। মাতৃস্থানীয়া পরম স্নেহময়ী ও প্রেমবতী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-গৃহিণী সীতাদেবী, শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন-পত্নী সর্ব্বজয়া দেবী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জননী মহামায়াদেবী—তাঁহার প্রাণবল্লভের ধাত্রীমাতা নারায়ণী দেবী প্রভৃতি বর্ষীয়সী গৌরগতপ্রাণা নদীয়ারমণীগণের পর্য্যন্ত নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের অভ্যন্তরে আসিবার অধিকার নাই—অন্তপুরদ্বার রুদ্ধ—স্বতন্ত্রা গৌর-বল্লভার বিনা অনুমতিতে কাহার সাধ্য গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে? এরূপ ভীষণ কঠোরতার সহিত বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের নিভৃত শয়নকক্ষে বসিয়া গৌর-বিরহ রসাস্বাদন করিতেছেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার এক্ষণে বাহ্য জ্ঞান হইয়াছে—তাঁহার মুখে সেই একই কথা—"গান চলুক"—তাঁহার উদাস নয়ন,—শুষ্ক বদন,—অসম্বর বসন,—অবিশ্রান্ত নয়নধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি মধ্যে মধ্যে এক একবার সকরুণ নয়নে চাহিতেছেন—চাহনির মর্ম্ম তাঁহাদের কৃপা ভিক্ষা। তাঁহার হৃদয়ে প্রাণবল্লভের কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদনভাবব্যঞ্জক মধুর পদাবলী শ্রবণ-লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে—তিনি শ্রোতা—সখিকাঞ্চনা বক্তা—বক্তার কৃপা ভিক্ষা ভিন্ন নবাঙ্গ ভক্তির প্রথমাঙ্গ "শ্রবণ"-লালসা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না—তাই বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রধানা সখি কাঞ্চনার কৃপা-ভিখারিণী হইয়া প্রেমাশ্রু-সিক্ত নয়নে বারম্বার তিনি তাঁহার বদনের প্রতি করুণ নয়নে চাহিতেছেন। সখি কাঞ্চনা সকলই বুঝিতেছেন—গৌর-বল্লভার মনস্তুষ্টিই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন সাধন। তিনি গৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী—তাঁহার হৃদয়খানি গৌর-প্রেমের অফুরন্ত উৎস। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মধুকণ্ঠে পুনরায় আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—সুহই।

—"নবদ্বীপ-চাঁদ চাঁদ জিনি সুন্দর,
নাগরী বিদগধ-রাজ।
আনন্দ রূপ অনুপম গুণগণ
আনন্দ বিতরণ কাজ ॥
হরি হরি! হামারি মরণ এবে ভাল।
সো যদি সুখময়, কেলি উপেখিয়া,
বিরহ ভাবে খেপু কাল ॥ ধ্রু ॥
কত অনুতপি, প্রলাপহুঁ কতবিধ,
অপরূপ কত উনমাদ ॥
কত বেরি মোহ, হোয়ত পুন ঘন ঘন,
দশমী দশা পরমাদ ॥
আগে ভকতগণ, উঠ হরি বোলত,
তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন, অনুবাদ ঐছন,
যাতে করু ইহ রস-গান ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সুচতুরা সখি কাঞ্চনা এইবার তাঁহার প্রাণের কথাটি গৌরভক্ত মহাজনমুখে প্রকাশ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির ভাব সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতেছেন গৌর-বল্লভার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল,—এই গানটী শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রাণে যেন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের অপূর্ব্ব তরঙ্গ উঠিয়াছে—তিনি ভাবিতেছেন—মিলন সুখাপেক্ষা বিরহবেদনা শ্রেষ্ঠ—সম্ভোগ-রস-লীলাপেক্ষা বিপ্রলম্ভ-রস-লীলারঙ্গ শ্রেষ্ঠ—একথা রসশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—ভাগবতশাস্ত্রেও ভগবত্ত-বিরহ সম্বন্ধে

এই কথাই লিখিত আছে। তবে কেন মহাজন কবি বলিতেছেন—

"মরু রাধা মোহন, অনুবাদ ঐছন,
যাতে করু ইহ রস-গান ॥

ইহার বিচারের স্থান এখানে নহে।

প্রাণবল্লভের কৃষ্ণ-বিরহ-রস-গান শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি এতক্ষণ তাঁহার প্রাণের মধ্যে আনন্দই পাইতেছিলেন—বাহ্যদেহে প্রেমাশ্রুবর্ষণ এবং সাত্বিক ভাবকদম্ব প্রকাশ তপ্তইক্ষুচর্ব্বণবৎ তাঁহার পক্ষে সুখ-দায়ক।

গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মর্ম্মী সখিসঙ্গে গৌরবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন—তাঁহার এত দুঃখের মধ্যেও পারমার্থিক পরম সুখের একটা বিশিষ্ট অনুভূতি প্রাণের মধ্যে রহিয়াছে। এই যে গৌর-বিরহ-দুঃখ, ইহাই তাঁহার গৌর-দর্শনপ্রাপ্তির মূলীভূত কারণ। এই সকল ভাব-তরঙ্গ-স্রোতে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদি-সমুদ্র উদ্বেলিত হইতেছিল—তাই তাঁহার বদন প্রফুল্ল—মন প্রসন্ন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয় সখির এই অপূর্ব্ব ভাব-সম্পত্তি দেখিয়া পরমানন্দ পাইতেছেন—সখি অমিতার সহিত কানে কানে তিনি কি কথা বলিলেন। প্রিয়াজির তাৎকালিক ভাবানুযায়ী সখি কাঞ্চনা পুনরায় আর একটী গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ-গান্ধার।

—"যো শচীনন্দন, ভুবন-আনন্দন,
করু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি, কলারসে নিগমন,
সতত রহত মুখে হাস ॥
সজনি। ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে, বেয়াকুল অন্তর,
করতহি কতএ প্রলাপ ॥ধ্রু।
গদ গদ কহত, কাঁহা মঝু প্রাণনাথ,
ব্রজ-জন-নয়ন-আনন্দ।
কাঁহা মঝু জীবন, ধায়ল মহৌষধি,
কাঁহা মঝু সুধারস-কন্দ ॥
পুন পুন ঐছন, পুছত নিজজন,
রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখী, ভকত বচন দেখি,
কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পদকর্ত্তার ভাবের সহিত বিরহিণী প্রিয়াজির ভাবের মধ্যে মধ্যে মিলন এবং সংঘর্ষ উভয়ই চলিতেছে, কিন্তু সকলই মনে মনে—বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রসন্ন বদনমণ্ডলের ভাবে অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় তাঁহার মনের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারিতেছেন। সখি কাঞ্চনা বুঝিতেছেন এই সকল পদাবলী শ্রবণ করিয়া প্রিয়াজি মনে মনে সবিশেষ আনন্দই পাইতেছেন। গৌর-বল্লভার প্রাণে আনন্দ দান করাই তাঁহার ভজন—প্রিয়াজির মনোমত কাজ করাই তাঁহার সাধন। এই ভাবিয়া সখি কাঞ্চনা পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন।

রাগ—ধানসী।

—"সো শচীনন্দন, চাঁদ জিনি উজোর,
সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ।
কাম কোটি কোটি, জিনি তনু লাবণি,
মত্ত গজ জিনি গতি ভঙ্গ ॥
সজনি! কো ইহ দুখ সহ পায়।
সো সব অসিত, চাঁদ সম ক্ষীয়ত,
লোচন ঝর অনিবার। ধ্রু ॥
মথুরা মথুরা বলি, পুন পুন কাঁদই,
অতিশয় দূরবল ভেল।
হাস কলারস, দূরহি সব গেও,
না রহ ভকতহি মেল ॥
ইহ বড় শেল, রহল মঝু অন্তর,
কহ কহ কি করি উপায়।
রাধা মোহন, প্রাণ কঠিন জনু,
যতনে নাহি বাহিরায় ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌরবল্লভার গৌর-বিরহের লক্ষণগুলি তাঁহার প্রাণবল্লভের কৃষ্ণবিরহ-লক্ষণ গুলির সহিত সকলই মিলিতেছে—সখিদ্বয় তাহা সকলই বুঝিতেছেন। তাঁহাদের ভাবও পদকর্ত্তৃগণের ভাবের সহিত সম্পূর্ণ মিলিতেছে। বিরহিণী প্রিয় সখির সম্মুখে এই সকল পদাবলী গান করিয়া সখি কাঞ্চনা মহাজনগণেরই মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন মাত্র।

সুচতুরা গৌর-বল্লভা কি তাহা বুঝিতেছেন না? তিনি অন্তর্য্যামিনী—তাঁহারই কায়ব্যূহ সখিদিগের মনে যখন যে ভাবটী উদয় হইতেছে,—তিনিই তাহার প্রেরণাকর্ত্রী—তিনিই তাহার আস্বাদনকর্ত্রী। কাজেই সখি কাঞ্চনার ভয় বা সঙ্কোচ অমূলক। লীলাপুষ্টির জন্য তিনি বাহ্যিক ভয় বা সঙ্কোচের ভাণ দেখাইতেছেন মাত্র।

সখি কাঞ্চনার মন প্রাণ এখন নিজ ভাবে গর গর—তিনি এতক্ষণ বসিয়া ছিলেন—এক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আপন ভাবে বহুবিধ রঙ্গেভঙ্গে অঙ্গসঞ্চালন করিয়া প্রিয়াজির সম্মুখে পরম প্রেমাবেশে পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ নাটিকা।

সজনি! না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিহার।
কত কত অনুভব, প্রকট হোয়ত,
কত কত বিবিধ বিকার॥ ধ্রু॥
বিরস বদন ভেল, শচীনন্দন হেরি
মোহে লাগয়ে ধন্দ।
বিরহ ভাবে জনু, গোপীগণ বোলত,
তৈছন বচনক বন্ধ॥
নয়নক নিদ গেও মঝু বৈরিণী,
জনমহি যো নাহি ছোড়।
স্বপনহি সো মুখ, দরশন দুলহ,
অতএ নহত কভু মোর॥
এত কহি হরি হরি, বলি পুন কাঁদই,
ভাবে স্থকিত ভেল অঙ্গ।
কহ রাধা-মোহন, হাম নাহি বুঝিয়ে
সো বর প্রেম-তরঙ্গ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনার প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনদ্বয় বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীবদনে যেন লিপ্ত হইয়াই আছে—আর গৌর-বল্লভার গৌর-প্রেমানুরাগরঞ্জিত অশ্রুসিক্ত কমল নয়নদ্বয়ের প্রেমরস-লোলুপ দৃষ্টি তাঁহার প্রিয়সখির প্রতিঅঙ্গের উপর সঞ্চরণ করিতেছে—গায়িকা ও শ্রোতার ভাব একইরূপে সমভাবে উভয়ের প্রাণে অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দান করিতেছে। সখি অমিতা অত্যুত্তম শ্রোতা এবং রসজ্ঞা। তিনি কেবলমাত্র গানগুলি শুনিয়াই যাইতেছেন—তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীবদনের প্রতি সুদৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট রহিয়াছে—আর কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই।

সখি কাঞ্চনাকে এখন আর কিছুই বলিতে হইতেছে না—বিরহিণী গৌর-বল্লভার অবিচিন্ত্য শক্তিসঞ্চারে তিনি স্বীয়ভাবে ও স্ব-স্বভাবে আপন মনে ভুরিভুরি গৌর-বিরহগীতি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাণ ভরিয়া গৌর-বক্ষবিলাসিনীর শ্রীচরণকমলে সমর্পন করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। তিনি পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ - নাটিকা।

"সজনি! অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।
যো শচীনন্দন, পূরবহি গোকুলে,
আনন্দ সকল নিদান। ধ্রু॥
সোই নিরন্তর, কাতর অন্তর,
বিবরণ বিরহক-ধূমে।
ঘামহি ঝর ঝর, সকল কলেবর
অহর্নিশি শুতি রহুঁ ভূমে॥
নিরবধি বিকল, জ্বলত মঝু মানস,
করইহি কৈছন রীত।
কৈছে জুড়ায়ত, সোই যুকতি কহ,
তিলে এক হোত সম্বিত॥
এত কহি গৌর, ফুকরি পুন রোয়ত,
ডুবত বিরহ-তরঙ্গে।
রাধামোহন কছু নাহি বুঝত,
নিমগন যো রস-রঙ্গে॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার গান শুনিতে শুনিতে প্রেমাবেশে ভূমিতলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—সখি অমিতা গিয়া তাঁহাকে পরম প্রেমভরে ক্রোড়ে উঠাইয়া বসাইয়াছেন। পৌষ মাসের দারুণ শীতে বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গে গলদ্‌ঘর্ম্ম—সর্ব্বাঙ্গ বিকল,—কমল নয়নদ্বয় দিয়া যেন শ্রাবণের ধারা বহিতেছে—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আছে—সখি-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তিনি পরমপ্রীতিভরে অস্তঃরঙ্গসেবা গ্রহণ করিতেছেন—আর উৎকর্ণ হইয়া সখি কাঞ্চনার গান শুনিতেছেন—

রাগ—ধানশী।

—"কেলি কলানিধি, সব মনোরথ সিধি,
বিহরই নবদ্বীপ-ধাম।
বিদগধ শেখর, সব গুণে আগর
মথুরায় সতত বিরাম॥
হরি হরি! হৃদি মাঝে বড় শেল মোর।
যো শচী-নন্দন, হৃদয়-আনন্দন,
মাথুর বিচ্ছেদে ভোর॥ ধ্রু॥
গুরুতর গ..., গরিমান সূচক,
নিগমন সোই তরঙ্গে।
চিন্তা-সন্ততি, সবহুঁ দূরে গেও,
আর উনমাদ বর ভঙ্গে॥
নয়নক নীর, অধিক থাকিত ভেল
হোয়ত সো বর মোহ।
রাধামোহন ভণ, যো লাগি বিহরণ,
মূরতিমন্ত ভেল সোহ॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পদকর্ত্তার ভণিতাটি গান করিবার সময় গৌর-প্রেমোন্মত্তা সখি কাঞ্চনার ঘনঘন সপ্রেমদৃষ্টি বিরহিণী গৌরবল্লভার প্রতি অঙ্গের প্রতি পতিত হইল। তিনি যেন অতিশয় পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গের সর্ব্ব ভাব-কদম্বাবলীর পরীক্ষা করিতেছেন—আর মনে মনে বিচার করিতেছেন কৃষ্ণবিরহিণী বৃষভানুনন্দিনী মূর্ত্তিমতী হইয়া নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরে যেন সাক্ষাৎ বিরাজমান রহিয়াছেন—তিনি পদকর্ত্তার ভাবের সহিত নিজভাব মিলাইয়া বারম্বার বলিতেছেন—

—"মূর্ত্তিমন্ত ভেল সোহ"—

সখি অমিতা সকলি বুঝিতেছেন—তিনি বিরহিণী প্রিয়াজির অরন্তঙ্গ সেবায় নিযুক্ত আছেন—তিনিও দেখিতেছেন—

—"মূর্ত্তিমন্ত ভেল সোহ"—

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে মাত্র তিনটি মূর্ত্তি গৌর-বিরহিণী এইরূপ অনির্ব্বচনীয়, অননুভবনীয় এবং অশ্রুতপূর্ব্ব প্রেমানন্দ রসাস্বাদন করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতীত হইল।

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খান গৌরপ্রেমের অফুরন্ত উৎস—তিনি আজ গৌর-বিরহ-প্রেমোল্লাসে শতমুখী হইয়া গৌর-বিরহগীতির অপূর্ব্ব ঝঙ্কার দিতেছেন—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের গৌর-বিরহ-গীতির ঝঙ্কার সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ ভেদ করিয়া ভূলোকে ও গোলোক ধামে পৌছিতেছে—ত্রিভুবনের সর্ব্বজীবের প্রাণে এই মধুরোজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ও সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক গৌরবিরহ-ঝঙ্কার-ধ্বনির ঘাত প্রতিঘাতে যে প্রেমানন্দলহরীর সৃষ্টি হইতেছে, তাহার এক বিন্দুতে ত্রিভুবন ভাসিয়া যায়—তাহার কণামাত্র পাইবার আশায় শিববিরিঞ্চি এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ লালায়িত। সাধ করিয়া কি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী-কুল-মুকুট-মণি ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামি-পাদ লিখিয়াছেন—

"ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমামণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈবধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন কাপি কৃপাময়েন চ নিজেঽপ্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বল ভক্তিবর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ॥ *

এখানে "গৌরপ্রিয়া" শব্দের সুস্পষ্ট মর্ম্মার্থ গৌর-নাগরীবৃন্দ। সাধারণ শব্দার্থেই এরূপ প্রতীয়মান হয়। একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ, আর জীববৃন্দ সকলেই প্রকৃতি। এজন্য গৌরভক্তগণ গৌরপ্রিয়া নামে খ্যাত। কারণ গৌরভক্তবৃন্দ মাত্রেরই গোপীভাব—সুতরাং তাঁহারা গৌর-নাগরী। গৌর নাগরীদিগের নামান্তর 'নদীয়া-নাগরী"।

সখি কাঞ্চনার গান এখনও চলিতেছে। তিনি পদের উপর গৌরবিরহব্যঞ্জক পদাবলীর ধুয়া ধরিতেছেন যথা—

রাগ—ধানশী।

—"ভ্রমই গৌরাঙ্গপ্রভু বিরহে বেয়াকুল।
প্রেম-উনমাদে ভেল যৈছন বাউল॥
হেরই সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা গেও সো সব আনন্দ-কেল॥ ধ্রু॥

* অর্থ—যে পরমশ্রেষ্ঠ মধুরোজ্জ্বল প্রেমভক্তিপথে শ্রীব্যাসাদি মুনীন্দ্র-গণও ভ্রান্ত হইয়াছেন—যে পথের অনুসন্ধান পূর্ব্বে এই পৃথিবী মধ্যে কোন সাধু মহাজনেরই বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই—যাহা পরম ভাগবতাগ্রগণ্য শ্রীশুকদেব গোস্বামীও অবগত ছিলেন না—যাহা [illegible] শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রও নিজ ভক্তগণের প্রতি প্রকাশ করেন নাই—একণে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের পরম কৃপায় পরম সৌভাগ্যবান্ তাঁহার কৃপাভাজন শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ সেই মধুরোজ্জ্বল পরমশ্রেষ্ঠ রাগানুগা ভক্তিপথে পরম সুখে ক্রীড়া করিতেছেন।

স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই।
বরজ সুধাকর কাঁহা তাহে পুছই॥
ক্ষণে গড়াগড়ি কান্দে ক্ষণে উঠি ধায়।
রাধামোহন কাহে মরিয়া না যায়॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনা সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন—তাহাতে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির আদেশ—"ধুনার গন্ধে মনসা নাচে" একটা ব্যবহারিক কথা আছে—এস্থলে সখি কাঞ্চনার পক্ষে তাহাই হইয়াছে—তিনি স্বয়ং গৌর-পাগলিনী এবং গৌর-গান-পাগলিনী। নদীয়াবাসিনী রমণীবৃন্দ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন—"গান-পাগ্‌লা মেয়ে"—ইহা তাঁহার পরম গৌরবের নাম।

রাত্রি প্রভাত হইবার উপক্রম হইয়াছে—কাক কোকিল কুক্কুটাদি পক্ষীগণ কলরব করিতেছে—তথাপি সখি কাঞ্চনার ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি তাঁহার কলকণ্ঠে এইবার শেষ গানটি গাহিলেন—

রাগ তুড়ী।

"কিবা কহ নবদ্বীপ চাঁদ।
শুনইতে সব মন বান্ধ॥
আনহ নীল নিচোল।
সব অঙ্গ ঝাপই মোর॥
চিরদিনে মিলব তায়।
এত কহি কোন দিশ চায়॥
সেই ভাবে অবতার।
রাধামোহন পঁহু সার॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

রাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণবিরহবাণে জর্জ্জরিত হইয়া কহিতেছেন,—নীল সাড়ী দিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ আবরণ কর। এই নীল সাড়ী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার প্রিয় শ্রীঅঙ্গবস্ত্র ছিল—শুধু রাধাভাব ও কান্তি চুরী করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মনসাধ পূর্ণ হয় নাই—তাঁহার নীলবসন খানি পর্য্যন্ত চুরি করিবার মনে সাধ হইয়াছে এখন। চৌরাগ্রগণ্য পুরুষের চুরীর বাহাদুরী আছে বটে।

"ব্রজাঙ্গনানাং দুকূল চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি।"

বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে শেষের গানগুলি সকলি অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত শ্রবণ করিলেন। পদকর্ত্তা রাধামোহনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবার জন্য তাঁহার মন ব্যস্ত হইয়াছে,—সখি কাঞ্চনাকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিলেন এবং তাঁহার কাণে কাণে অস্ফুটস্বরে এই কথাটির কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন। সখি কাঞ্চনা পরিচয় দিলেন—পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর তাঁহারই বিশিষ্ট কৃপাপাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর বংশধর। পরিচয় শুনিয়া বিরহিণী-প্রিয়াজির বদনমণ্ডল প্রসন্ন বোধ হইল—এত বিরহদুঃখের মধ্যেও তাঁহার মনে যেন কিঞ্চিৎ সুখানুভূতির উদয় হইল (১)। পদকর্ত্তা এই সকল পদাবলী গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির দাসী ভাবেই বিভাবিত হইয়া নদীয়া নাগরীভাবে কোন সখিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা এই সকল পদ সখিমুখে আস্বাদন করিয়া পরমানন্দ পাইলেন—এজন্য কৃপাময়ী বৈষ্ণব-জননী তাঁহার বিশিষ্ট কৃপাপাত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধরকে স্মরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের ভজন সাধন সার্থক হইল—তাঁহার রচিত পদাবলীর সার্থকতা সম্পাদন হইল।

এখনও অরুণোদয় হয় নাই—এত বড় সুদীর্ঘ পৌষের রাত্রিটা যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল—কেহ বুঝিতেই পারিলেন না। গৌরশূন্য গৌর-গৃহে নিত্য গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-লীলারঙ্গ এইভাবে চলিতেছে। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে পুষ্পোদ্যানে নিত্য রাসলীলারঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এই

(১) রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর পৌত্র কিম্বা প্রপৌত্র, এবিষয়ে মতভেদ আছে। পৈতৃক বাসস্থান শ্রীপাট চাকন্দীগ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ভক্তিরত্নাকর শ্রীগ্রন্থে ইহাঁকে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর "দ্বিতীয় প্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি একজন সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ এবং উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। "পদামৃত" সমুদ্র শ্রীগ্রন্থখানি ইনিই সম্পাদন করেন, এবং ইহার একটী সংস্কৃত টীকা করেন—তাহার নাম "মহাভাবানুসারিণী"। বৈষ্ণব মহারাজ নন্দকুমার এবং পুটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। গৌড়-মণ্ডলে "স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ" সম্বন্ধে যখন ঘোরতর বিবাদ হয়, জয়পুর রাজদরবারে গিয়া এই পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর বিচারে পরকীয়াবাদ স্থাপন করিয়া জয়পত্র প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল ত্রিশ বৎসর মাত্র।

শ্রীনিবাসআচার্য্যপ্রভু গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বিশিষ্ট কৃপাপাত্র ছিলেন—সে কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার উপযুক্ত বংশধর গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির ভাবে বিভাবিত হইয়া এই সকল সুন্দর পদাবলী রচনা করিয়া তাঁহার বংশের গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

অভূতপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভরস-লীলারঙ্গও অনাদি অনন্তকাল হইতে চলিতেছে এবং চিরকাল চলিবে। ইহার আদি নাই—অন্তও নাই। সুতরাং এই "গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" শ্রীগ্রন্থের আদি মধ্য ও অন্ত খণ্ড নাম মাত্র। নিত্য লীলার নিরবচ্ছিন্ন নিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলে মাত্র একটী ক্ষণের একটী লীলারসাস্বাদন-সুখেই সাধকের চিরজীবন কাটিয়া যায়,—দ্বিতীয় লীলারসাস্বাদনের অবসর হয় না।

টহলিয়া কীর্ত্তনের দল আসিয়া গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে প্রভাতী-গৌরকীর্ত্তনের ধুয়া ধরিল,—

রাগ-ধানশী।

—"উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল॥
কোকিলার কুহুরব সুললিত ধ্বনি।
কত নিদ্রা যাও ওহে গোরাগুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
শশধর তেজল কুমুদিনী বাস॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
কত নিদ্রা যাও গোরা প্রেমের আলসে॥"—

দ্বিতীয় কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে লাগিল—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারি॥"—

তৃতীয় দল গাহিতে গাহিতে লাগিল—

"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"—

প্রভাতী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া যথারীতি গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সখিদ্বয়সহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ।
মাঘী সংক্রান্তি ১৩৩৭ সাল
বৃহস্পতিবার, রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(১৯)

মায়াবাদ-কুতর্কপুঞ্জতিমিরান্ স্বজ্যোৎস্নয়া হন্তয়ন্।
ভক্তিং ভাগবতীং প্রপন্ন হৃদয়ে কারুণ্যয়া ভাসয়ন্॥
বিশ্রব্ধং মাধুর্য্যং প্রতি পদ নবং স্বান্তরঙ্গে প্রযচ্ছন্।
নটস্তং গৌরাঙ্গং স্মরতু মে মনঃ শ্রীলক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়েশং॥

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

মাঘ মাসের আজ প্রথম দিন—গতকল্য মকর সংক্রান্তির শেষ রাত্রিতে নদীয়াপুরন্দর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ গৃহত্যাগ করিয়া নদীয়া আঁধার করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে কাটোয়া যাত্রা করিয়াছিলেন—প্রতি বর্ষে বর্ষে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির মনে সেই কাল মাঘ মাসের প্রথম দুর্দ্দিনের স্মৃতিকথা সকল উদয় হয়। বৈষ্ণব মহাজনকবি মাঘ মাসের বিশেষণ দিয়াছেন "পাপী"—মাঘ মাসকে শাস্ত্রে পুণ্যমাস বলে—কিন্তু গৌরভক্তগণ এই পুণ্য মাসকেও "পাপী"বিশেষণে বিভূষিত করিয়া তাঁহাদের গৌর-বিরহের জ্বালা মিটাইয়াছেন। এই মহাজনকবির নাম বসু রামানন্দ। প্রিয়াজির প্রেরণায় সেই পদটী সখি কাঞ্চনা আজ সন্ধ্যার পর প্রথমেই গাহিতে ইচ্ছা করিলেন। সমগ্র দিবাভাগ আজ গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার ভজন-মন্দিরে নির্জ্জনভজনে রত ছিলেন—সখিদ্বয় তাঁহার নিকটে থাকিবারও অনুমতি পান নাই—ভজন-মন্দির-দ্বার রুদ্ধ ছিল,—দিবাভাগে বিরহিণী প্রিয়াজি যে কি করিতেছিলেন—তাহা কেহ জানেন না, জানিবার উপায়ও ছিল না।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা সন্ধ্যার পর গৌর-বল্লভার আদেশে ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির উক্তি পূর্ব্বোক্ত পদটীর ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ সুহই।

—"পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস।
তবহি গেও মঝু জীবন আশ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে নয়ন।
গোরা বিনু কত দিন ধরিব জীবন॥
অবহুঁ বসন্ত বসহু সুখময়।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয়॥
যত যত পিরীতি করল পঁহু মোর।
সোঙরিতে জীউ এবে কাউকি ভোর॥

কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অবনত বদনে জপমালা হস্তে গান শুনিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে তাঁহার মনে উদয় হইতেছে,—আর তাঁহার যেন নাড়ি মুচড়িয়া ক্রন্দন আসিতেছে। সমস্ত দিবস তিনি নির্জ্জনভজনে ছিলেন—কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার কমল নয়ন দুইটীগৌরপ্রেমানুরাগে রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে—নয়নধারায় তাঁহার পরিধান-বসন সিক্ত—ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত। মর্ম্মী-সখিদ্বয় বিরহিণী গৌর-বল্লভার শ্রীবদনের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না। মাঘের দারুণ শীতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে—তিনি যেন স্ববীরার ন্যায় জড়বৎ বসিয়া আছেন।

সখিদ্বয় আসিয়া একে একে তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিলেন—তাঁহার ঘর্ম্মসিক্ত মলিন অঙ্গবস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন,—কিছুতেই পারিলেন না। তাঁহাকে উঠাইবার শক্তি কাহারও নাই—কখন তাঁহার শরীর তুলার বস্তার ন্যায় লঘু—কখন বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় গুরুভারযুক্ত,—এখন তাঁহার দ্বিতীয়া-বস্থা। মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বিশিষ্ট কাতর রোদনে পরম স্নেহ-বতী প্রিয়াজি ধীরে ধীরে বদন তুলিয়া তাঁহাদের প্রতি একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন—তাঁহার নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উৰ্দ্ধনয়নে করযোড়ে তাঁহার প্রাণবল্লভের চরণে কিরূপ আত্মনিবেদন করিতেছেন ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে!

"মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! মোহে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস॥—

বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণের মর্ম্মস্থল হইতে এই সকল মর্ম্মান্তিক কথাগুলি বাহির হইতেছে—ইহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইতেছে। এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাবেগে হঠাৎ সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

বিরহিণী গৌরবল্লভার এই কথাগুলি যে তাঁহার মর্ম্মান্তিক হৃদি-বেদনার কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—"পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি"—

একথা বড় দুঃখেই বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে—সাধ্বীসতী স্ত্রীলোক স্বামীহারা হইলে তাঁহার সন্তানসন্ততি থাকিলে তাহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া স্বামীর শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিতে সক্ষম হয়েন। গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এ দুঃখ-তাঁহার জীবন মরণের সাথী—তিনি আজ বড় দুঃখেই মর্ম্মীসখিদ্বয়ের নিকট অতি গোপনে নিজ মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

সখিদ্বয় প্রিয়াজির শ্রীমুখে তাঁহার এই মর্ম্মভেদী দুঃখ কথা শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন—মনের দুঃখে ও হৃদয়ের মর্ম্ম-বেদনায় তাঁহাদের প্রাণ যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া গেল,—হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইল। আজ বিরহিণী প্রিয়াজির মনে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সন্ন্যাস-লীলারঙ্গের পূর্ব্ব-স্মৃতি সকল একে একে জাগরিত হইতেছে—আজ রাত্রিতে যে তিনি কি ভীষণ কাণ্ড করিবেন, তাহার চিন্তা করিতেও সখিদ্বয়ের মস্তকে যেন বজ্রপাতের আশঙ্কা বোধ হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই—তিনি স্বতন্ত্রা ও স্বেচ্ছাময়ী—তাঁহার মনে আজ কি যে আছে তাহা তিনিই জানেন।

সখিদ্বয় এইরূপ ভাবিতেছেন এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতে-ছেন। এমন সময়ে বিরহিণী গৌর-বল্লভা আত্মসম্বরণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিজেই উঠিয়া বসিলেন। সখি কাঞ্চনার কণ্ঠদেশে পরম প্রেমাবেগে নিজ ক্ষীণ বাহুদ্বয় বেষ্টন করিয়া এবং তাঁহার বক্ষদেশে মলিন বদনখানি লুকাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি অতি ধীরে ধীরে করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিতে লাগিলেন—

রাগ ধানশী।

—"পহিলহি মাঘ, গৌরবর নাগর,
দুখ-সাগরে মুঝে ডারি।

রজনীক শেষ, শেজ সঞে ধায়ল,
নদীয়া করিয়া আঁধিয়ারি ॥
সজনি! কিয়ে ভেল নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে, ছিল যত সুখ,
এবে ভেল দুখ পরচুর ॥
নিজ সহচরীগণ, রোয়ত অনুখন,
জননী রোয়ত মহী রোই।
আহা মরি মরি করি, ফুকরই বেরি বেরি,
অন্তর গর গর হোই ॥
সো নাগরবর, রসময় সাগর,
যদি মোহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জিউ, ধরব হাম সুন্দরি,
জনম গোঙায়ব রোই ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির কণ্ঠরোধ হইল,—পুনরায় সখি-ক্রোড়ে প্রেমাবেগে ঢলিয়া পড়িলেন। তিনি এবার বাহ্যজ্ঞানশূন্যা—নিস্পন্দ—যেন প্রাণহীনা। মর্ম্মী সখিদ্বয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়সখির বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন—তাঁহাদের নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। বিরহিণী গৌর-বল্লভা আজ স্বয়ং তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতির মর্ম্মান্তিক দুঃখকথার—তাঁহার প্রাণ-বল্লভের গৃহত্যাগের পর দিনের প্রাণঘাতী-হৃদিবেদনার মর্ম্মন্তুদ বিরহ-কথার বক্তা, আর তাঁহার সখিদ্বয় শ্রোতা। সুতরাং সখিদ্বয়েরই বিপদ অধিক,—বক্তা অপেক্ষা শ্রোতৃবর্গেরই প্রাণে বক্তার হৃদয়ের ভাব-তরঙ্গিণী অপূর্ব্ব লীলা-তরঙ্গ সকল সমধিক ক্রিয়াশালী—সমধিক সুখ-দুঃখদায়ক এবং সমধিক আশা ও নৈরাশ্য-প্রদায়ক বলিয়া বোধ হয়। এক্ষেত্রেও সখিদ্বয়ের মনোমধ্যে সেই ভাবগুলি ক্রমশঃ সমুদিত হইল। তাঁহারা বক্তা অপেক্ষাও অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন—কিন্তু তাঁহাদের কোন কথা কহিবার শক্তিও নাই—সাহসও নাই। বিরহিণী গৌরবল্লভা কিছুক্ষণ আপন মনে প্রাণ ভরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। গ্রন্থে দেখিতে পাই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কমল নয়নদ্বয় দিয়া পিচকারীর ন্যায় প্রেমাশ্রুধারা নির্গত হইত—তাঁহার প্রাণবল্লভার কমল নয়নে সদাসর্ব্বদা অশ্রুনদী প্রবাহিত হইতেছে—নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে চির-বর্ষা বিরাজমান।

গৌরবল্লভা আজ গৌরবিরহানলে বিষম দহ্যমানা,—তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন—পুনরায় অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে করুণ ক্রন্দনের সুরে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—

রাগ—সুহই।
—"ইহ পহিল মাঘ কি মাহ।
সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ ॥
জিনি কনক-কেশর-দাম।
পহুঁ গৌরসুন্দর নাম।
কেশ চামর মোহই।
কুসুম-শর বর, জিনিয়া সুন্দর,
কতিহুঁ ভাবিনী মোহই ॥ ধ্রু ॥
না হেরিয়া সো মুখ, ফাটি যায়ত বুক,
প্রাণ ফাঁফর হোয়রি।
কেশব ভারতী, মন্দ মতি অতি,
কয়ল প্রিয় যতি সোঁয়রি ॥

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই ভাবে কাতর বিলাপধ্বনি করিতে করিতে গৌর-বল্লভার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হইয়া গেল—তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজ নয়ন-সলিল-সম্পাতে তাঁহাদের বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন—রোরুদ্যমানা সখিদ্বয়ের উষ্ণ অশ্রুজল বিরহিণী প্রিয়াজির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিল—তিন মূর্ত্তি গৌরবিরহিণীর নয়নবারি সম্পাতে নদীয়ার গম্ভীরামন্দিরে অশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত হইল—প্রিয়াজির ভজন-মন্দির ত্রিবেণী-সঙ্গমে পরিণত হইল।

এইভাবে যে কতক্ষণ অতিবাহিত হইল, তাহা বলা যায় না। প্রিয়াজির মর্ম্মান্তিক কথাগুলি সখিদ্বয়ের হৃদয়ে শেল বৎ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—

—"না হেরিয়া সো মুখ, ফাটি যাওত বুক,
প্রাণ ফাঁফর হোয়রি"—

এই মর্ম্মভেদী কথাগুলি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া মর্ম্মী সখি-দ্বয়ের চক্ষের উপরে দেখা দিতেছে,—তাঁহারা দেখিতেছেন প্রকৃতই প্রিয়াজির বুক ফাটিয়া যাইতেছে—প্রাণ ফাঁফর

বোধ হইতেছে। মূর্ত্ত বিপ্রলম্ভ রসের অবতার-নারী গৌর-বল্লভাকে দর্শন করিয়া সখিদ্বয়ের হৃদয়ে ও মনে আজ নানা ভাবের ভাবতরঙ্গাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে তপ্তইক্ষুচর্ব্বণবৎ মর্ম্মান্তিক হৃদি-বেদনার মর্ম্ম ভেদ করিয়া কোন অভাবনীয় অভিনব ভাব-তরঙ্গের কি এক অপূর্ব্ব সুখময় স্মৃতি সৃষ্টি করিয়াছে—প্রাণে কি এক নবভাবের বৈরাগ্য-বৈভবের উদয় হইয়াছে—তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা সৃষ্টি হয় নাই।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি আত্মসম্বরণ করিয়া পরম প্রেমাবেশে সখি কাঞ্চনার দুটি হস্ত নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর কণ্ঠে কহিতেছেন—

রাগ—সুহই।

—"কহ সখি! কি করি উপায়।
ছাড়ি গেল গোরা নটরায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ।
বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গ-বদন।
কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে।
চিরি দেখি কি আছে কপালে॥
হিয়া জর জর অনুরাগে।
এ দুখ কহিব কার আগে॥
কহে বাসুঘোষ নিদান।
গোরা বিনু না রহে পরাণ॥

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

"চিরে দেখি কি আছে কপালে" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে গৌরবিরহোন্মাদিনী প্রিয়াজি নিমেষের মধ্যে তাঁহার সম্মুখস্থ গঙ্গাজলের কোষাখানি ক্ষীণহস্তে তুলিয়া নিজ কপালে সজোরে বিষম আঘাত করিলেন—সখিদ্বয়ের সম্মুখেই নিমেষমধ্যে এই ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল—মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রিয়াজি তাঁহাদের চক্ষে ধুলা দিয়া এত বড় কাণ্ড করিয়া ফেলিলেন—ইহা দেখিয়া সখিদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া তাহাদের প্রিয়সখির দুটী হস্ত জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহাদেরও অবস্থা শোচনীয়—তাঁহারাও প্রিয়াজির সম্মুখে ভূমিতলে মাথা কুটিতে আরম্ভ করিলেন। জীর্ণ দেহ তিন জনেরই—গৌরবিরহানলে তিন জনেই জর্জ্জরিতা—কে কাহারে দেখেন? বিরহিণী প্রিয়াজির শরীরে হঠাৎ তখন যেন বিষম বল-সঞ্চার হইল—তিনি সখিদ্বয়কে সামলাইয়া দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বসিলেন—তিনি নিজ দুঃখ-যন্ত্রণার কথা তখন একেবারে ভুলিয়া গেলেন—সখিদ্বয়ের সেবাশুশ্রূষা নিজ হস্তে করিতে লাগিলেন। প্রিয়াজি দেখিতেছেন সখিদ্বয়ের কপাল বিষম ফুলিয়াছে—সখিদ্বয় দেখিতেছেন প্রিয়াজির কপালে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে—কিঞ্চিৎ রক্তপাতও হইয়াছে। ইহা দেখিয়া মনোদুঃখে ক্ষোভে ও অনুতাপে তাঁহারা হায় হায় করিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই উচ্চ ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে অন্যান্য সখিগণ এবং দাসীগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রিয়াজির কপালের আঘাত গুরুতরই বোধ হইল—সখিদ্বয়ের কপালের আঘাতও তদ্রূপই—শীতল জলে ধৌত বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া তিন জনেরই কপালে অন্যান্য সখিগণ বস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন। ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। প্রিয়াজি পরমা ধৈর্য্যবতী—তিনি এই অবস্থায় স্থিরভাবে বসিয়া নিজ হস্তে সখিদ্বয়ের সেবা করিতেছেন। বিরহিণীত্রয়ের শিরোদেশে বস্ত্র বাঁধা। নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে যেন ডাকাতি হইয়াছে। সকলেরই বিষণ্ণ বদন—নয়নে বারিধারা—একটি বিষম বিষাদের চিহ্ন যেন সকলেরই বদনে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

গৌর-বল্লভার ইঙ্গিতে অন্যান্য সখিগণ ও দাসীগণ ভজন-মন্দিরাভ্যন্তর হইতে চলিয়া গেলেন। তখন গৌরবিরহিণী-ত্রয় মুখোমুখী করিয়া একত্রে বসিয়া নির্জ্জনে গৌর-বিরহ-কাহিনী পুনরায় গাইতে আরম্ভ করিলেন। তিন জনেরই মস্তকে বস্ত্র বাঁধা—তিন জনেই মহা ক্লিষ্টা ও ব্যথিতা—কিন্তু তাই বলিয়া গৌর-কথার বিরাম নাই।

বিরহিণী গৌর-বল্লভাই প্রথমে গৌর-বিরহ-কথা পুনরায় তুলিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হস্ত-ধারণ করিয়া মৃদু ক্ষীণস্বরে কহিলেন—

রাগ-ভূপালী।

—"হেদেরে পরাণ নিলজিয়া।
এখনও না গেলি তনু তেজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর।
আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে।
মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে॥

সন্ন্যাসী হইয়া পহুঁ গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কাঁদি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী।
বাসু কহে না রহে পরাণি॥"—গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌরবিরহিণীর এই প্রাণঘাতী মর্ম্মকথাগুলির প্রতি অক্ষরে অক্ষরে গৌর-বিরহ-জ্বালার মর্ম্মান্তিক ব্যথা বিজড়িত রহিয়াছে—এই কথাগুলি প্রিয়াজির যেন নাড়ি মুচড়িয়া প্রাণের অন্তস্তল হইতে বাহির হইয়াছে। সখিদ্বয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে শুনিলেন—ইহা তাঁহাদের শুনিবার কথা নহে—বিরহিণী প্রিয়াজির মনের ভাব তাঁহার কথাতেই প্রকাশ হইয়াছে—"এখনও না গেলি তনু তেজিয়া" এই কথাকয়টি সখিদ্বয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে—ইহাতে তাঁহাদের সরল প্রাণের মর্ম্মস্থলে বাণবিদ্ধ করিয়াছে—তাঁহাদের মনে বিষম আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে! কিন্তু মুখে কিছু বলিবার শক্তি নাই।

বিরহিণী প্রিয়াজির আর দু'টী কথাতেও সখিদ্বয়ের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে—

—"আর কি গৌরাঙ্গ চাঁদে পাবে।
মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে॥"—

তাঁহাদিগের মুখের ভাবে বোধ হইতেছে—তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়াছেন—প্রিয়াজির হতাশ্বাসের করুণ বিলাপের সহিত মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হতাশ্বাস বিজড়িত হইয়া সেই গভীর নিশীথে ভজন-মন্দির শোকোচ্ছাসে পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন—তিনি যে আর গৃহে ফিরিবেন না—এ দুঃখ তাঁহাদের জীবনে যাইবে না—গৌরবক্ষবিলাসিনীর গৌর-সম্ভোগ-সুখ-বাসনা জনমের মত ফুরাইয়াছে,—একথা তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য।

—"সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল।
এ জনমের সুখ ফুরাইল॥"—

ইহা প্রিয়াজিরই শ্রীমুখের কথা—তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রাণ-প্রিয়তম পার্ষদভক্ত বাসুদেব ঘোষের ভাষায় লিখিত মাত্র।

যাহা হউক এক্ষণে গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজি পুনরায় তাঁহার সেই "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনের দুঃখকথা তুলিয়া করুণ ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন—

রাগ-সুহই।

—"হরি হরি! গোরা কোথা গেল।
কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল॥ধ্রু॥
হিয়া মোর জর জর পাঁজর ধসে।
পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে॥
ফুকরি কাঁদিতে নারে চোরের রমণী।
অনুখণ পড়ে মনে গোরা-মুখ খানি॥
ঘরের বাহির নহি—কুলের ঝি।
স্বপনে না হয় দেখা করিব কি?
রূপ-মাধুরী-লীলা কাহারে কহিব।
গোরা পহুঁ বিনে মুক্রি অনলে পশিব॥
গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেন মুণ্ডে না পড়য়ে বাজ॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা শ্রোতা আর গৌরবক্ষবিলাসিনী বক্তা,—এই যে গৌর-বিরহিণী গৌরবল্লভার মুখে গৌর-বিরহ-কথা—ইহা বড়ই মর্ম্মান্তিক—বড়ই মর্ম্মন্তুদ—বড়ই প্রাণঘাতী কথা। মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনোদুঃখের সীমা নাই—মনঃকষ্টের অবধি নাই—কোথায় তাঁহারা বিরহিণী প্রিয়াজিকে সান্ত্বনা করিবেন—তাঁহার প্রাণে শান্তি দান করিবেন—না আজ তাঁহারই শ্রীমুখে তাঁহারই প্রাণবল্লভের মর্ম্মন্তুদ বিরহ-কথা শুনিতে হইতেছে—অথচ কোনরূপ সান্ত্বনাবাক্য বলিবার তাঁহাদের অবসর নাই—প্রিয়াজির বিনা অনুমতিতে বিনা ইঙ্গিতে সখিদ্বয় কোন কার্য্য করিতে পারেন না—মহাভাবময়ী গৌরবল্লভার স্বতন্ত্রতার বিশেষত্বই অদ্যকার এই অপূর্ব্ব নবভাব—এই অভূতপূর্ব্ব স্বেচ্ছাচারিতা। শ্রীভগবানের একটী গুণ আছে—যাহার নাম দিয়াছেন রসশাস্ত্রকারগণ "স্বৈরচারিতা"। শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি-তেও এই গুণটী যে না থাকিবে এরূপ কথা নহে। স্বয়ং ভগবান ও স্বয়ংভগবতীর স্বতন্ত্রতার কথাই স্বতন্ত্র—এবং তাঁহাদের স্বতন্ত্রতার ফল সাধারণের বিচারসাপেক্ষ নহে।

উপরি উক্ত পদটীতেও কয়েকটী বিষম কথা আছে, যাহাতে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনে পূর্ব্বাশঙ্কা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। গৌরবিরহিণী গৌরবিরহে অধীরা হইয়া শোকাবেগে কহিতেছেন—

"গোরা পহুঁ বিনে মুক্রি অনলে পশিব"

পরবর্ত্তী পয়ার-শ্লোকে তিনিই গৌরবিরহকাতর পদ-কর্ত্তার মুখে পুনরায় বলিতেছেন—

—"গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ॥"

ইহাও সখিদ্বয়ের পক্ষে পরম বিপজ্জনক এবং আশঙ্কাজনক।

আর একটী বড় সুন্দর কথা প্রিয়াজি বলিয়াছেন—

—"ফুকারি কাঁদিতে নারে চোরের রমণী"—

গৌর-বল্লভা তাঁহার প্রাণবল্লভকে "চোর" বলিলেন—একথার নিগূঢ় রহস্য আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ লুকাইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন—কত লোকে এজন্য প্রিয়াজিকে কত কুকথা বলিয়াছে—তিনি যে একটু প্রাণভরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের অদর্শনজনিত দুঃখভার উপসম করিবেন—তাঁহারও উপায় নাই। তাঁহার প্রাণবল্লভ যে চৌরাগ্রগণ্য মহাপুরুষ—তাহা তিনি যে না জানেন—এমন কথা নহে—আর তিনি তাঁহারই ভাব ও কান্তি চোর—তাহাও তাঁহার অবিদিত নাই। সুতরাং তিনি যে "চোরের রমণী" এসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই নাই। পূর্ব্বলীলাতেও তিনি "চোরের রমণী" ছিলেন—এবার নবদ্বীপ-লীলাতেও তিনি যে তাই—তাহারই তিনি ইঙ্গিত দিলেন। "চোরের রমণী" কি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে? এই জন্যই তাঁহার এই গম্ভীরা-লীলারঙ্গ—এই কারণেই তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের গৃহ-কারাগারে দ্বাররুদ্ধা বন্দিনীর মত রহিয়াছেন—আর নির্জ্জনে গোপনে বসিয়া গভীর নিশীথে তাঁহারই বিরহানল-দগ্ধ-হৃদয়ে নীরবে কাঁদিতেছেন। তিনি যে "কুলের ঝি"—তাঁহার প্রাণবল্লভের গৃহের বাহির হইবার তাঁহার সাহস নাই—ক্ষমতাও নাই—তাহা তিনি জানেন। কুলের ঝি কুলশীলের ভয় রাখে।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রাণে পূর্ব্বস্মৃতি সকল আজ প্রবলভাবে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে—তিনি একে একে সকল কথাই স্মরণ করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের নিকট অপকটে মনের ব্যথা জানাইতেছেন। তাঁহার প্রাণবল্লভের গৃহত্যাগের পরদিনের স্মৃতিবোধক প্রাচীন পদাবলী ভাগ্যবান গৌরাঙ্গ-পার্ষদভক্তগণ লিপিবদ্ধ করিয়া জীবজগতের পরম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ঠাকুর লোচনদাস মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রিয়াজির সহিত অপূর্ব্ব সম্ভোগ-বিলাস-লীলারঙ্গ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি তাঁহার বিরহলীলারঙ্গও অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত পদরত্নটীকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

রাগ—সিন্ধুড়া।

—"হেথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
শিরে করে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর, সোনার নূপুর,
গলার সোনার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া,
জীতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিনু প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া॥
কাঞ্চন নগর, গেলা বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগদগ মন,
শচী না পাইলা দেখিবারে॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই প্রাচীন পদরত্নটীর ভাব-সম্পত্তি নদীয়ার মহাগম্ভীরামন্দিরে অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শয়নকক্ষই নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দির। গৌরবল্লভা তাঁহার প্রাণবল্লভের সেই শয়নকক্ষে বসিয়া গৌরভজন করেন আর তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যসম্ভারের নিত্য সংস্কার করেন। সেই রত্নখচিত শয়ন-পর্য্যঙ্ক—সেই উত্তম রেশমী কাপড়ের ঝালট দেওয়া বালিশ—সেই দুগ্ধফেননিভ উত্তম শয্যা—সেই সুগন্ধি চন্দনের স্বর্ণ কটোরা—সেই সূক্ষ্ম কৃষ্ণকেলি ধুতি—প্রভুর সেই রাঙ্গা চরণের সোনার নূপুর—প্রিয়াজির প্রাণবল্লভের কম্বুকণ্ঠের সেই স্বর্ণহার—সেই সুবর্ণ ঝারি—সেই রৌপ্যনির্ম্মিত খড়ম,—সকলি এখনও বিরহিণী প্রিয়াজির ভজনমন্দিরে বিদ্যমান। এই সকলই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের প্রাণবল্লভার অতিশয় প্রিয়বস্তু ছিল—বিরহিণী প্রিয়াজির পক্ষে এ সকল মহামূল্যবান বস্তু সকল তাঁহার প্রাণবল্লভের বিরহোদ্দীপক। আজ স্বয়ং তিনি বিশেষভাবে এই সকল প্রিয়বস্তুর সংস্কার করিতেছেন—আর নয়নজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন—প্রত্যেক বস্তুটী একএকবার মস্তকে ধারণ করিতেছেন—কোন কোনটিকে পরম প্রেমভরে চুম্বন করিতেছেন—কোনটিকে

বক্ষে ধারণ করিয়া ডুকারিয়া ডুকারিয়া কাঁদিতেছেন। সখিদ্বয় নিকটে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছেন—গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার অপূর্ব্ব গৌর-প্রেমের এই অনির্ব্বচনীয় ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতেছেন। কখন কখন প্রিয়াজি মনোদুঃখে শিরে করাঘাত করিয়া এই সকল বস্তু মর্ম্মী সখিদ্বয়কে দেখাইয়া বলিতেছেন—সখি! প্রিয় সখি! এই আমার প্রাণবল্লভের রাঙ্গাচরণের সোনার নুপুর,—এই তোমাদের নদীয়া-নাগর নবদ্বীপচন্দ্রের গলার স্বর্ণহার—এই তাঁহার পরিধান বস্ত্র কৃষ্ণকেলি ধুতি—এই তাঁহার ব্যবহৃত চন্দনের স্বর্ণকটোরা—আমার প্রাণবল্লভের এই সকল বিলাসের অপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভার সকলই বিদ্যমান। প্রাণসখি! কোথায় আমার প্রাণবল্লভ! কোথায় আমার প্রাণেশ্বর!" গৃহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রির বিলাস-পারিপাট্যের কথা তুলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি নয়নের জলে বক্ষ ভাসাইয়া কহিলেন—

—"মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া॥"

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, আর কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিয়া বিলাপ করিতেছেন তাহাও মহাজনী পদে বর্ণিত আছে। যথা—

রাগ—পাহিড়া।

—"কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া,
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতিতলে।
ওহে নাথ! কি করিলে, পাথারে ভাসাঞা গেলে,
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে॥
এ ঘর জননী ছাড়ি, মোরে অনাথিনী করি,
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ, লইয়া জানকী সাথ,
তবে সে করিলা বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা,
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদমুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব,
না করিব সে সুখ বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাহি আশ॥

গৌর পদ-তরঙ্গিণী।

সখিদ্বয় গৌরবিরহদগ্ধা প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্তা আছেন—তাঁহার বিলাপধ্বনির প্রতি শব্দটি সখিদ্বয়ের বক্ষে যেন শেল সম বাজিতেছে—বিরহিণী প্রিয়াজি গৌর-বিরহজ্বালায় ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতেছেন—আর প্রাণঘাতী বিলাপধ্বনি উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—

—"ওহে নাথ! কি করিলে, পাথারে ভাসায়ে গেলে
অভাগিনী এ বিষ্ণুপ্রিয়ায়।"

বিরহিণী গৌর-বল্লভার শেষ বিলাপ-ধ্বনিটী বড়ই মর্ম্মান্তিক হৃদিবেদনাকর—তিনি কাষ্ঠপাষাণভেদী সকরুণ ক্রন্দনের স্বরে কহিতেছেন—

—"চাঁদমুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখ বিলাস॥"

প্রিয়াজির ভাবে বিভাবিত হইয়া পদকর্ত্তা প্রেমাবেগে কহিতেছেন,—

—"এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব,
বাসুর জীবনে নাহি আশ।"—

গৌর-বিরহিণী গৌরবল্লভার শ্রীমুখে গৌরবিরহকথা শ্রবণ করিয়া যদি গৌরাঙ্গচরণে রতি মতি না হইল—গৌরাঙ্গচরণাশ্রয় করিতে বাঞ্ছাই যদি না হইল—তবে হইল কি? পদকর্ত্তা বাসু ঘোষ বড় দুঃখেই প্রিয়াজির রাঙ্গাচরণে শরণ লইয়াছেন—তবেই ত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এত গুণগান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

বিরহিণী প্রিয়াজির এই করুণ বিলাপধ্বনির এমনি প্রবল প্রভাব যে বিশ্ববাসী নরনারীকে এই প্রভাবে আকর্ষিত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনসাধন শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার শ্রীমুখে এইরূপ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল। এই প্রাণঘাতী আর্ত্তনাদের ফলে যদি জগজ্জীব শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আশ্রয় গ্রহণ না করে, তবে তাহাদের ঘৃণিত জীবনে শত ধিক্—তাহারা "জন্মিয়া না মৈল কেন?"

কতক্ষণ পরে বিরহিণী গৌরবল্লভা নিজেই আত্মসম্বরণ করিলেন—তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের গলদেশ ক্ষীণ বাহুদ্বয়ে বেষ্টন করিয়া করুণ নয়নে তাঁহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া ক্রন্দনের সুরে পুনরায় কহিলেন—

রাগ—করুণ।

সখি!

"গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকুলে ভাসাইয়া॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥
হায় রে নিদারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার॥
বাসু ঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনা এক্ষণে কথা না বলিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—এবার তিনি সাহসে ভর করিয়া পরম প্রেম-ভরে তাঁহার প্রিয়সখির হাত দুখানি ধরিয়া ছলছল নয়নে সকরুণ বচনে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! আর কেন? তোমার মুখে তোমার প্রাণবল্লভের বিরহ-কথা শুনিয়া আমাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে—তোমার এইরূপ দশা দেখিয়া আমাদের প্রাণে বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর—আমরা তোমার প্রাণ-বল্লভের গুণগান করি—তুমি শ্রবণ কর।"

কথাগুলি বিরহিণী প্রিয়াজির কাণে গেল বটে, কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তিনি একথার উত্তর না দিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন—

রাগ—বিভাস।

—"ধিক্ যাউ এ ছার জীবনে।
পরাণের পরাণ গোরা গেল কোন খানে॥
গোরা বিনু প্রাণ মোর আকুল বিকল।
নিরবধি আঁখির জল করে ছল ছল॥
না হেরিব চাঁদমুখ না শুনিব বাণী।
হেন মনে করি আমি পশিব ধরণী॥
গেল সুখ সম্পদ যত পহুঁ কৈল।
শেল সমান মোর হৃদয়ে রহি গেল॥
গোরা বিনু নিশি দিশি আর নাহি মনে।
নিরবধি চিন্তি মুক্তি নিধনিয়ার ধনে॥
রাতুল চরণতল অতিশয় শোভা।
যাহা লাগি মন মোর অতিশয় লোভা॥
ডাহিনে আছিল বিধি এবে ভেল বাম।
কহে বাসুদেব ঘোষ না রহে পরাণ॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভা যেন আত্মহারা ও ক্লান্ত হইয়া ভূমিতলে ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন—তিনি তখন মন্দমন্দ ক্ষীণস্বরে গৌরনাম করিতে লাগিলেন। গৌরানুরাগে তাঁহার কমল নয়ন দু'টি সর্ব্বদাই রঞ্জিত রহিয়াছে—শয়নাবস্থায় পদাঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা ভূমিতল যেন কর্ষণ করিতেছেন—কখন বদনে গোঁ গোঁ শব্দ শ্রুত হইতেছে—তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। এখন তাঁহার গৌরবিরহের আতিশয্যে প্রেমোন্মাদাবস্থা। সখি কাঞ্চনা সময় বুঝিয়া প্রিয়াজির বিনা অনুমতিতেই একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—ধানশী।

—"জনমহি গৌর গৌরে গোঙায়লু,
সো কিয়ে এ দুখ সহায়।
উর বিনু শেজ, পরশ নাহি জানত,
সো তনু অব মহী লোটায়॥
বদন মণ্ডল, চাঁদ ঝলমল,
সো অতি অপরূপ শোহে।
রাহু ভয়ে শশী, ভূমে পড়ল খসি,
ঐছন উপজল মোহে॥
পদ অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতি পর লেখই
যৈছন বাউরি পারা।
ঘন ঘন নয়নে, নিঝর বারি ঝরু,
যৈছন শাওন-ধারা॥
ক্ষণে মুখ গোই, পানি অবলম্বই,
ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস।
সোই গৌর-হরি, পুনহি মিলায়ব,
নিয়ড় হি মাধব দাস॥"*—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

* পদকর্ত্তা মাধবদাস বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা—তিনি প্রিয়াজির বিরহ সম্বন্ধে কয়েকটী অতি সুন্দর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা স্থিরভাবে গানটী আগাগোড়া অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মুখে কোন কথা নাই—কেবলমাত্র উদাস নয়নে সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি এক একবার চাহিতেছেন—আর ঝরঝর নয়নে অবিরত ঝুরিতেছেন—তাঁহার কমলনয়ন দু'টী যেন গৌর-প্রেম-নির্ঝরিণী—শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারার ন্যায় তাঁহার নয়ন-বারি নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের ভূমিতল সিক্ত করিতেছে। অনেকক্ষণ পরে তিনি আপনিই আত্ম-সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। সর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় ছিলেন—তাঁহারা এক্ষণে প্রিয় সখির সম্মুখে আসিয়া বসিলেন—গৌরবিরহিণীত্রয় মুখোমুখী হইয়া বসিলেন—কিন্তু কেহ কাহারও মুখের প্রতি বদন তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না—তিন জনেরই ভাব একরূপ—তিন জনেই উৎকট গৌর-বিরহানলে মর্ম্মে মর্ম্মে দহ্যমানা, তিন জনেরই নয়নে অবিরল বারিধারা বহিতেছে—প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে গৌরপ্রেমের নদী-নালা প্রবাহিত হইতেছে—যাহার বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিলে ত্রিতাপের জ্বালা চিরতরে প্রশমিত হয়—সংসার-দাবানল একেবারে নির্ব্বাপিত হয়।

বিরহিণী প্রিয়াজি স্বয়ং অগ্রে বদন তুলিয়া সখিদ্বয়ের প্রতি প্রেমবিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন—তিনিই অগ্রে সখিদ্বয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের গৌর-বিরহ-জ্বালাময় হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিলেন। তাহার পর তিনিই স্বয়ং নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মৃদু করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন,—'সখি কাঞ্চনে! আমার প্রাণ-বল্লভ যে দিন গৃহত্যাগ করেন—সে দিন আমার পক্ষে বড় দুর্দ্দিন—সে দুর্দ্দিনের পূর্ব্ব স্মৃতি সকল মনে করিলে এখনও আমি সুখ পাই—সে সুখে তোমরা সখি! এই মন্দভাগিনীকে বঞ্চিত করিও না। সে দিন আমি যে কি করিয়াছিলাম—সকল কথা আমার মনে নাই—গৌরাঙ্গপার্ষদ ভক্তরাজ বাসুদেব ঘোষ একটী পদে সে সকল কথা অতি সুন্দররূপে বিনাইয়া বিনাইয়া লিখিয়াছেন—সেই পদটী আমি তোমার মুখে আজ শুনিতে চাই,—সখি! কৃপা করিয়া আজ আমার সেই দুর্দ্দিনের স্মৃতি রক্ষা কর—দুঃখের স্মৃতি বড় মধুময়—সুখের স্মৃতি এখন কষ্টদায়ক।" এই কথা বলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা অতি কাতরভাবে সখি কাঞ্চনার দু'টি হস্ত ধারণ করিলেন। তখন সখি কাঞ্চনা প্রেমাশ্রুনয়নে কহিলেন—"প্রিয়সখি! তোমার যাহাতে সুখ হয় তাহাই আমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমি সেই পদটি গাহিতেছি তুমি শ্রবণ কর।" এই বলিয়া তাঁহার কলকণ্ঠে সেই প্রাচীন পদটীর ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ বিভাস বা করুণ।

—"সুধু খাটে দিল হাত, বজ্র পড়িল মাথাত,
বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
শচীর মন্দির কাছে গেল॥
শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের কাছে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিল, নিশা-অন্তে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বরজ পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয় মনে, নিদ্রা নাহি দু'নয়নে,
শুনিয়া উঠিলা শচীমাতা।
আলু থালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়,
শুনিয়া বধুর মুখে কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি,
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু সাথে, কান্দিয়া কান্দিয়া পথে,
ডাকে শচী "নিমাই" বলিয়া॥
তা শুনি নদীয়ার লোকে, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জন পথে ধায়, দশ জন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখেছ যেতে কোথা॥
সে বলে দেখেছি যেতে, আর কেহ নাহি সাথে,
কাঞ্চন নগরের পথে ধায়।
বাসু কহে আহা মরি! আমার শ্রীগৌরাঙ্গ হরি,
পাছে নাকি মস্তক মুড়ায়॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা পরমোৎকণ্ঠার সহিত গানটী আদ্যোপান্ত শুনিলেন—কোনরূপ ভাব-বিকার-লক্ষণ কিছুই কেহ দেখিলেন না তাঁহার শ্রীঅঙ্গে,—তাঁহার বদন মলিন—নয়নদ্বয়ে উদাস ভাব—সেরূপ প্রেমাশ্রুধারা এখন আর নাই। অতি মৃদুস্বরে ক্ষীণকণ্ঠে—গৌর-বিরহিণী গৌর-

বল্লভা সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি চাহিয়া দুটি কথা মাত্র কহিলেন—"তার পর"।

সখি কাঞ্চনা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—করুণ।

—"পড়িয়া ধরণী তলে, শোকে শচী কাঁদি বলে,
লাগিল দারুণ বিধি বাদে।
অমূল্য রতন ছিল, কোন বিধি হরে নিল,
পরাণ পুত্তলী গোরা-চাঁদে॥
অঙ্গের অঙ্গদ বালা, গোরাচাঁদের কণ্ঠ-মালা,
খাট পাট সোনার ঢুলিচা।
সে সব রহিল পড়ি, গৌর মোরে গেল ছাড়ি,
আমি প্রাণ ধরি আছি মিছা।
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেল, নদীয়া আঁধার ভেল,
ছটফটি করে মোর হিয়া।
যোগিনী হইয়া যাব, গৌরাঙ্গ যথায় পাব,
কাঁদিব তার গলায় ধরিয়া॥
যে মোরে গৌরাঙ্গ দিব, বিনা মূলে বিকাইব,
হৈব তার দাসের অনুদাসী।
বাসুদেব ঘোষে ভণে, কাঁদ শচী কি কারণে,
জীব লাগি নিমাই সন্ন্যাসী॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পূর্ব্ববৎ এবারও বিরহিণী প্রিয়াজি অতিশয় মনোযোগের সহিত সমগ্র পদটি মহোৎকণ্ঠার সহিত আস্বাদন করিলেন—তিনি যেন নির্ব্বিকার—নিস্পন্দ—কোন কথা মুখে নাই—অঙ্গে কোন রূপ ভাববিকার বৈলক্ষণ্য নাই—করুণ-নয়নে চাহিয়া মুখে সেই একই কথা—"তার পর"—

সখিদ্বয় সকলই দেখিতেছেন—দুই জনে অতি সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে গাত্রস্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত ইসারায় কি বলাবলি করিলেন। সখি অমিতা মস্তক নাড়িয়া যেন অসম্মতির ভাব দেখাইলেন—তখন সখি কাঞ্চনা আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—পাহিড়া।

—"সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে॥
শচী কহে শুন মোর নিমাই গুণমণি।
কেবা আসি দিল মন্ত্র, কে শিখাইল কোন তন্ত্র,
কি হইল কিছুই না জানি। ধ্রু॥
গৃহ মাঝে গিয়াছিনু, ভাল মন্দ না জানিনু,
কি বা করি গেলে রে ছাড়িয়া।
কিবা নিঠুরাই কেল, পাথারে ভাসাঞা গেল,
রহিব কাহার মুখ চাহিয়া॥
বাসুদেব ঘোষের ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি, ঈশানে দেখায় ঠারি,
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি এক ভাবে আসনে বসিয়া গানগুলি সকলই উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন—তাঁহার মনের ভাব—"আরও বল"। সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি তিনি সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া আছেন—সে চাহনির ভাব—"কৃপা করিয়া বল সখি! আমার দুর্দ্দিনের স্মৃতিকথা গুলি বল—আমি শুনি"—সখি কাঞ্চনা গৌর বল্লভার মন বুঝিয়া পুনরায় পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ ভাটিয়ারি।

—"কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সভাকারে॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবে না বলিলা,
কাঁদে ভক্ত ধুলায় ধুসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারি,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাঁদে অবিরত,
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দন-রব, নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক
কাঁদে সব মাথে হাত দিয়া॥

নাগরিয়া ভক্ত যত, সব শোকে বিগলিত,
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কান্দে সব স্ত্রী পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
(দাস) বৃন্দাবন করে হাহাকার॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এবার বিরহিণী গৌর-বল্লভা প্রসন্নবদনে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের সহিত প্রাণ খুলিয়া দু'টী কথা কহিলেন। তিনি স্বতন্ত্রা—নির্ব্বিকারচিত্তে এসকল প্রাণঘাতী গৌর-বিরহ-গাথা শুনিতেছেন—মহাভাবময়ী গৌরবক্ষবিলাসিনী নিজ ভাব নিজেই স্তম্ভন করিতেছেন—সখিদ্বয় প্রিয়াজির এইরূপ ভাব দেখিয়া আজ বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন—এরূপ ভাব-স্তম্ভন বিরহিণী গৌর-বল্লভার স্বীয়প্রকৃতি-সিদ্ধ স্ব-ভাব নহে—ইহা একটী অপূর্ব্ব আগন্তুক ভাব—যাহার নাম পর্য্যন্ত রসশাস্ত্রে লিখিত হয় নাই—ভাবনিধি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুও এই অপূর্ব্ব ভাবসম্পত্তিটি জীবজগতে প্রকট করেন নাই—তিনি যাহা না করিয়াছেন—তাঁহার স্বরূপশক্তি তাহা করিলেন।

গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখি কাঞ্চনার দু'টী হস্ত পরম প্রেমভরে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া অতিশয় করুণ কাতর বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আজ আমি বড়ই দুঃসাহসে বুক বাঁধিয়াছিলাম। আর আমি কাঁদিব না—আর আমি চক্ষের জল ফেলিয়া আমার প্রাণবল্লভের মনে কষ্ট দিব না। আজ আমি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছি—গুণনিধি আমার প্রাণবল্লভ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার চক্ষে জল দেখিয়া আমার দুঃখে কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন—তাঁহার বদনচন্দ্রের কাতরভাব দেখিয়া আমার মনে বড় দুঃখ হইল—আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া নিবেদন করিলাম—আমার জন্ম তুমি কাঁদিও না—আর আমি কাঁদিব না। কিন্তু তিনি বলিলেন—'কলির ভজনই রোদন—তুমি কাঁদিতে শিখিয়াছ বলিয়াই ত্রিতাপদগ্ধ জগজ্জীব তোমার জন্ম কান্দিতে শিখিয়াছে—আমি কাঁদিতেছি বলিয়াই তুমি আমার জন্ম কান্দিতেছ। এই যে কৃষ্ণনামে জীবের করুণ ক্রন্দনধ্বনি—কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণভক্তের ক্রন্দনের রোল—ইহাই কৃষ্ণের প্রকৃত বংশীধ্বনি—ইহার শ্রবণে জগজ্জীবের হৃদয় কৃষ্ণরসে বিগলিত হইবে—জীবজগত মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণানুগত্য স্বীকার করিবে। অতএব তুমি কৃষ্ণের জন্ম কাঁদিও—কৃষ্ণভক্তের জন্ম কাঁদিও—আমার জন্ম বৃথা শোক করিও না।"—

এই বলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা নীরব হইলেন। সখিদ্বয় কত না সান্ত্বনা-বাক্য বলিলেন—কত না অনুনয় বিনয় বচনে প্রিয়াজিকে বুঝাইলেন—কিন্তু কিছুতেই তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। তখন বিপদে পড়িয়া সখিদ্বয় গৌর-চরণ স্মরণ করিয়া গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

রাগ-কেদার।

—"গোপীগণ কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত,
অরুণ-বসন শোভে অঙ্গে।
কাঞ্চন-কান্তি-বিনিন্দিত কলেবর,
রাই-পরশ-রস রঙ্গে॥
দেখ সখি, অপরূপ গৌর-বিলাস।
লাখ যুবতী রতি যো গুরু-লম্পট,
সো অব করল সন্ন্যাস॥ধ্রু॥
যো ব্রজবধূগণ, দৃঢ়-ভুজ-বন্ধন,
অবিরত রহত আগোর।
সো তনু পুলকে পূরিত অব চর চর,
নয়ানে গলয়ে প্রেম-লোর।
যো নব নটবর ঘনশ্যাম কলেবর,
বৃন্দাবিপিন-বিহারী।
কহয়ে বলরাম নটবর সো অব,
অকিঞ্চন ঘরে ঘরে প্রেমভিখারী॥"—*
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা এই পদ-রত্নটী শ্রবণ করিয়া প্রাণে আনন্দ পাইলেন—তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে পরম গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিলেন। পরে ধীরে ধীরে সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! আর আমি এই ভীষণ গৌর-বিরহ-পর্ব্বত বুকে বাঁধিয়া জীবন্মৃতের মত পড়িয়া থাকিতে পারিব না—আর আমি এরূপভাবে বৃথা কালক্ষেপ করিব না। এখন আমি দিবারাত্রি স্বয়ং গৌর-বিরহ-গীতি বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিয়া তোমাদিগকে শুনাইয়া গৌর-বিরহ-তাপ-দগ্ধ এই শরীরটাকে

* এই পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর,—জীবাধম লেখক যাঁহার বংশের কুলাঙ্গার।

চূর্ণবিচূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব—গৌর-কথা, গৌরগুণগানই আমার জীবনের ব্রত হইবে। গম্ভীরা-মন্দিরে আমি আর গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিব না—এখন এই আমার সংকল্প—ইহাই আমার প্রাণবল্লভের ইচ্ছা।"—

এই কথা কয়টী বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির যেন বুক ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি স্বয়ং তাঁহার প্রাণবল্লভের দুখিনী জননী শচীমাতার সেই দুর্দ্দিনের স্মৃতি-কথা প্রকাশ করিতেছেন—

রাগ কল্যাণী।

—"বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়,
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাতিয়া শুইয়া ভূমে॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি রাত্রি দিনে,
মালিনী বাহির হইয়া ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পৈড়া আছে,
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে॥
উথলিল হিয়ার দুখ, মালিনীর ফাটে বুক,
ফুকরি কান্দয়ে উভরায়।
দুহুঁ দোহা ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী-তলে,
তখনি শুনিয়া সবে ধায়॥
দেখিয়া দোঁহার দুখ, সবার বিদরে বুক,
কতমত প্রবোধ করিয়া।
স্থির করি বসাইলে, ভাসে নয়নের জলে,
প্রেমদাস যাউক মরিয়া।"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পুত্রশোকাতুরা গৌরাঙ্গ-জননীর কথা বলিতে বলিতে গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার কমল নয়নদ্বয় দিয়া ঝরঝর বারিধারা পড়িতেছে—তিনি আপন দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন—শাশুড়ীর দুঃখে তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে—তাঁহার কোমল হৃদয়খানি শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। তিনি বড় দুঃখেই তাঁহার প্রাণবল্লভকে সম্বোধন করিয়া এক দিন একটী বিলাপধ্বনি উঠাইয়াছিলেন,—যাহার শ্রবণে বহু কাষ্ঠপাষাণবৎ কঠিনহৃদয় নরনারীর প্রাণ বিগলিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং তাহাদের মন গৌরভজনে সংযত হইয়াছে। সেই বিলাপ-গীতিটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যথারাগ।

—"তুমি যদি আমি হও বুঝিবে তবে।
আমার দুখের কথা শুনিবে যবে॥
দিয়ে গেছ সেবা ভার, দুখিনী এ বুড়া মার,
কি সেবা করিলে তাঁর এ দুখ যাবে।
তুমি তা বিচার করে, দেখা দিয়া বল মোরে,
তাই করি কাটাইব জীবন ভবে।
তোমার মায়ের সেবা, এ ভাগ্য বা পায় কেবা,
অভাগিনী বলি বুঝি দিয়েছ ভেবে।
তুমি যদি আমি হও বুঝিবে তবে।"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা একদৃষ্টে অনিমেষ নয়নে বিরহিণী প্রিয়াজির বদনের প্রতি চাহিয়া তাঁহার ভাব-বিপর্য্যয়ের লক্ষণ সকল অলক্ষে লক্ষ্য করিতেছেন। সখি অমিতা তাঁহার কাঞ্চনা দিদির অঙ্গস্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে প্রিয়াজির তাৎকালিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার একটী ফরমাজি গান গাইতে অনুরোধ করিলেন। সখি কাঞ্চনা আর কোন কথা না বলিয়া গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ-ধানশী।

"—যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥
দিবানিশি পিয়ে গোরা-নাম সুধাখনি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ-বিরহে কাঁদে দিবস রজনী॥
সঙ্গিনী প্রবোধ করে কহি কত কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি গান শুনিয়া নীরবে দরদরিত অশ্রু-বারি বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার "দুই এক সহচরী"—এই সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা—তখনও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন—এখনও আছেন—তাঁহারা প্রিয়াজির নিত্য-সঙ্গিনী—সুখদুঃখের সমভাগিনী—তাঁহাদেরও সেই দুর্দ্দিনে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল—প্রত্যক্ষদর্শী মহাজনকবি তাহাও

বর্ণনা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির উক্তি পদগুলিতে তাঁহার সখিবৃন্দের গৌর-বিরহ-দশা বর্ণিত আছে। একটী পদে আছে—

"নিজ সহচরীগণ, রোয়ত অনুখন
জননী রোয়ত মহী রোই।
আহা মরি মরি করি, ফুকরই বেরি বেরি,
অন্তর গর গর হোই॥"

অপর একটী পদে—

"নিজ সহচরীগণ, আওত নাহি পুন,
কার মুখে না শুনিয়ে বাত।"

প্রিয়াজির কোন কোন সঙ্গিনী নদীয়া-নাগর গৌর-সুন্দরের গৃহত্যাগ-সংবাদ শ্রবণমাত্রেই নিজ গৃহে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন—আর তাঁহারা উঠেন নাই। তাঁহাদেরই কথা প্রিয়াজি কহিতেছেন।

বিরহিণী প্রিয়াজির কোন কোন সঙ্গিনী একেবারে উন্মাদিনী হইয়া কুলের বাহির হইয়াছিলেন—তাহার মধ্যে এক জন গৌর-পাগলিনীর কথা গৌরাঙ্গপার্ষদ মাধব ঘোষের পদে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। পদটী পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে,—এস্থলেও পুনরুক্ত হইল—এরূপ পুনরুক্তি অনেক স্থলেই হইয়াছে। কৃপানিধি পাঠকপাঠিকাবৃন্দ কৃপা করিয়া এ সম্বন্ধে পুনরুক্তি-দোষ গ্রহণ করিবেন না—

রাগ-ধানশী।

—"তছু দুখে দুখী, এক প্রিয়সখি,
গৌর-বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া, চলিল ধাইয়া,
যেমনি বাউরি পারা॥
নদীয়া নগরে, সুরধুনী তীরে,
যেখানে বসিতা পঁহু।
তথায় যাইয়া, গদগদ হৈয়া,
কি কহয়ে লহু লহু॥
সে সব প্রলাপ, বচন শুনিতে,
পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল পুরে, ঐছন গৌড়ে,
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর, হিয়া গর গর,
কহয়ে কাঁদিয়া কথা।
মাধব ঘোষের, হিয়া বিয়াকুল,
শুনিতে মরমে ব্যথা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পদকর্ত্তা গৌরাঙ্গপার্ষদ মাধব ঘোষ তাঁহার তিনটি পদে বিরহিণী গৌরবল্লভার বিরহোন্মাদদশা অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহিণী বৃষভানুনন্দিনী যখন দশম-দশায় উপনীতা, তখন যেমন বৃন্দা দূতী মধুপুরে গিয়া শ্রীরাধিকার চরমদশা এবং ব্রজবাসীগণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপভাবে বিভাবিত হইয়া পদকর্ত্তা মাধবঘোষ গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির ও নবদ্বীপবাসীগণের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরি লিখিত পদোক্ত এই সখিটি একেবারে উন্মাদিনী হইয়াছেন এবং সেই ভাবে প্রলাপ করিতেছেন। গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নাম গুণ ও লীলা শ্রবণ বহু ভাগ্যের কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ ভক্তিভাব পোষণ করিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহাদের বিরচিত পদাবলীতেই পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার পর হইতেই "পহিলহি মাঘের" এবং "পাপী মাঘ" মাসের প্রথম দুর্দ্দিনের কথা কীর্ত্তন করিতে বিরহিণী প্রিয়াজি স্বয়ং আরম্ভ করিয়াছেন—তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতির এই সকল মর্ম্মান্তিক কথা আজ তিনি সখিসঙ্গে বিশেষ ভাবে বর্ণনও আস্বাদন করিতেছেন, কারণ আজ সেই স্মরণীয় দুর্দ্দিনের স্মরণোৎসব নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একে একে সকল কথাই বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীমুখে ও তাঁহার মর্ম্মী সখিমুখে শ্রবণ করিয়া কৃপানিধি পাঠকপাঠিকাবৃন্দ আত্মশোধন করুন—আর গৌরভজনে চিত্ত সুদৃঢ়ভাবে সংযত করুন—ইহাই তাঁহাদের চরণে জীবাধম লেখকের কাতর প্রার্থনা!

এক্ষণে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে—কোথা দিয়া কি ভাবে যে এত রাত্রি অতিবাহিত হইল তাহা গৌর-বিরহিণীত্রয়ের জ্ঞান নাই—তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানরহিতা—তাঁহাদের কোনরূপ দেহানুসন্ধানই নাই—সমস্ত দিবারাত্রি তাঁহারা তিন জনেই উপবাসী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের গৃহত্যাগের প্রথম দুর্দ্দিনের স্মৃতিকথা আলোচিত হইতেছে—সেই এক দিনের স্মৃতিকথাই অনাদি অনন্ত কালের জন্য নানা ভাবে ও নানা ভাষায় অনুদিত ও অলঙ্কৃত হইয়া ত্রিভুবনব্যাপী গৌর-বিরহের ঝঙ্কার উঠাইতেছে—যাহার প্রভাবে জগজ্জীব-হৃদয়ে চিরদিনের

গৌর-প্রেম-রস-ভাণ্ডারের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিবে এবং যাহার উপর শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজন-সৌকর্য্যার্থে আকাশভেদী রত্নসৌধকিরিটিনী সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। সেই ঝঙ্কারের প্রবল প্রভাবে কলিহত জীবের কাষ্ঠপাষাণ-হৃদয় দ্রবকারী গৌর-প্রেম-তরঙ্গিণীর প্রবল তরঙ্গাবলীর নিরন্তর ঘাতপ্রতিঘাতে জগজ্জীবের মনপ্রাণ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল ভজনে সংযত করিতেছে।

এই মাঘ মাসের নিদারুণ শীতে গৌর-বিরহিণীত্রয় নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে গৌরপ্রেম-সমুদ্রে ভাসিতেছেন —হাবুডুবু খাইতেছেন—তাঁহাদিগের পরিধান বসন নয়ন-সলিল-সিক্ত,—তাঁহাদের ভূম্যাসন কর্দ্দমাক্ত। মহাজনকবি গাহিয়াছেন—সখির প্রতি প্রিয়াজির উক্তি—

রাগ—ধানশী।

—"আওল পৌষ, মাহ অতি দারুণ,
তাহে ঘন শিশির নিপাত।
থরহরি কম্পি, কলেবর পুনঃ পুনঃ,
বিরহিণী পর উৎপাত॥
সজনি! অবহি হেরব গোরামুখ।
গণি গণি মাহ, বরষ অব পূরল,
ইথে পুন বিদরয়ে বুক॥ ধ্রু॥
তোমারে কহিয়ে পুন, মরমক বেদন,
চিত মাহা কর বিশওয়াস।
গৌর-বিরহ-জ্বরে, ত্রিদোষ হইয়া জারে,
তাহে কি ঔষধ অবকাশ।
এত শুনি কাহিনী, নিজ সব সঙ্গিনী,
রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবন ভণে, ধৈরজ করহ মনে,
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বারমাস্যা।

মাঘের এই দারুণ শীতে প্রিয়াজির শ্রীমুখের বাণী—

"থরহরি কম্প, কলেবর পুনঃপুনঃ,
বিরহিণী পর উৎপাত।"

কিন্তু এদিকে তাঁহাদের কোন লক্ষ্যই নাই—তাঁহারা দুঃখ-রস আস্বাদন করিতেছেন। গৌর-বিরহ-জাত দুঃখ-রস অপ্রাকৃত বস্তু। ইহা প্রাপঞ্চিক বস্তু নহে।

সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি চাহিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা সেই দুর্দ্দিনের—সেই "পহিলহি মাঘের" নিদারুণ দুর্দ্দিনের কথাই আজিকার তাঁহার যে বিশিষ্ট ভজন এই কথাই বলিলেন। প্রিয় সখির তাৎকালিক ভাবোচিত গান করিতে হইবে—নিজের ইচ্ছাতে কোন কাজই হইবে না,—ইহা সখি কাঞ্চনা বিলক্ষণ জানেন। অতএব তাঁহার নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সকল গৌরবিরহব্যঞ্জক প্রাণঘাতী গান গাহিতে হইতেছে। সখিদিগের যে স্ব-সুখ-তাৎপর্য্য নাই—সখি কাঞ্চনার এই কার্য্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি গানের ধুয়া ধরিলেন—শচীমাতার উক্তি,—

রাগ—পাহিড়া।

—"স্বপনে গিয়াছিনু, ক্ষীরোদ সাগরে,
তথা না পাইনু গুণনিধি।
পাতিয়া হাট খানি, বসাইতে না দিলি,
বিবাদে লাগিল বিধি॥
কোথা হৈতে আইল কেশব ভারতী,
ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ।
পড়াইয়া শুনাইয়া পণ্ডিত করিনু,
কেবা লৈয়া গেল দূর দেশ॥
শচীমায়ে ডাকে নিমাই আয়রে,
শূন্য ঘরে যাদুধন।
বাসু ঘোষ কহে ঐ গোরাচাঁদ,
মায়ের জীবন॥"

গৌর পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরভাবে সখি-মুখে শাশুড়ীর দুঃখকথা শুনিতেছেন—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে জাগিয়া উঠিয়াছে—নিত্যধাম-গতা স্নেহময়ী অতি বৃদ্ধা শাশুড়ীর দুঃখকথা শ্রবণ করিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সখি কাঞ্চনাকে সেই দুর্দ্দিনে নদীয়ার ভক্তগণের অবস্থার কথা কিছু বলিতে ইঙ্গিত করিলেন—সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে প্রিয়াজির ভাবোচিত গানের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—সুহই, সোমতাল।

—"নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ডুবল ভকত সব শোকের সাগরে॥

কাঁদিছে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীবাস গদাধর।
বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর॥
বাসুদেব নরহরি কাঁদে উভরায়।
শ্রীরঘুনন্দন কাঁদি ধুলায় লোটায়॥
কাঁদিছেন হরিদাস দু-আঁখি মুদিয়া।
কাঁদে নিত্যানন্দ শচী-মুখ নিরখিয়া॥
সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়।
সোঙরি সে সব বাসুর হিয়া ফাটি যায়॥”

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির বদনের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন তিনি আরও গান শুনিতে চান। পুনরায় সখি কাঞ্চনা ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ ভাটিয়ারি।

—“কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে,
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ চাঁদে, রাধা রাধা বলি ডাকে,
কি লাগি ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চ রায়, পাষাণ মিলাঞা যায়,
গদাধর না জীবে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা,
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মোহান্ত ঘরে, বিধাতা বুঝায়ে ফিরে,
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন,
কি লাগি ত্যজিল তার লেহ॥
কি কব দুখের কথা, কহিতে মরমে ব্যথা,
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি, বিরহ আকুল প্রাণী
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥”—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রাণবল্লভের একান্ত নিজ-জনের মর্ম্মান্তিক দুঃখকথা শুনিতে শুনিতে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়নের ধারায় বক্ষ প্লাবিত হইল—সখি অমিতা গিয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বসিলেন। সখি অমিতার মুখে আজ একটী কথাও নাই—তিনি আজ যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন—কোন কথা কহিবেন না—তাঁহার নীরব ক্রন্দন-সাধনা অপূর্ব্ব ভজন-পন্থা—তাঁহার মৌনব্রতই তাঁহার অপূর্ব্ব-ভজনবিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সখি কাঞ্চনা গান ছাড়িয়া তখন গৌরবল্লভার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি এখনও সখি অমিতার ক্রোড়ে বদন লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল—তথাপিও গৌর-বিরহিণী-ত্রয়ের “পহিলহি মাঘের” গৌর-কথার শেষ নাই—বিশ্রামের ধার তাঁহারা ধারেন না—আহার নিদ্রার অপেক্ষাও রাখেন না।

“পহিলহি মাঘের” দুর্দ্দিন জীবজগতের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন—সেই দুর্দ্দিনের কথা আজ গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি নিজ শ্রীমুখে কহিতেছেন—আর অন্তরঙ্গা মর্ম্মী সখি-মুখে শুনিতেছেন। দুর্দ্দিনের স্মৃতি কিরূপে রক্ষা করিতে হয়—দুর্দ্দিনের স্মৃতিকথা কি ভাবে ভজনের সহায় হয়—এই শিক্ষা দিবার জন্যই লীলাময়ী গৌর-বল্লভার এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ।

কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল—পরম ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি ভাব সম্বরণ করিয়া পুনরায় উঠিয়া বসিলেন। সখি কাঞ্চনার মুখের প্রতি চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ ক্রন্দনের মর্ম্ম—“সখি! আরও কিছু বল”। সেই দুর্দ্দিনের দুঃখ-কথার স্মৃতি-পূজার দিনটীতে পরিপূর্ণভাবে গৌরবিরহ রসাস্বাদন করিবেন—ইহাই বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণের বাসনা। সেই বাসনা পূর্ণ করিতেছেন তাঁহার প্রিয় সখি কাঞ্চনা। প্রিয়াজির মন বুঝিয়াই তিনি পুনরায় গান ধরিলেন—

শ্রীরাগ।

—“শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অঙ্কুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলসে কলসে সেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে ভরি গেল যত জীব ছিল।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥
শাস্ত্রমদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল।
অবতার-সার তারা স্বীকার না কৈল॥
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন।
তাদেরে তরাইতে তাঁর হইল মনন॥

সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস।
মরমে মরিয়া রোয় বৃন্দাবন দাস॥

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পুনরায় আর একটী এই ভাবের গানের ধুয়া ধরিলেন—

শ্রীরাগ।

—"নিন্দুক পাষণ্ডীগণ প্রেমে না মজিল।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল॥
না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে॥
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িলা যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস॥
বৃদ্ধা জননীর বুকে শোক শেল দিয়া।
পরিলা কৌপীন ডোর শিখা মুড়াইয়া॥
সর্ব্বজীবে সম দয়া দয়ার ঠাকুর।
বঞ্চিত এ বৃন্দাবন বৈষ্ণবের কুকুর॥—"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরভাবে বসিয়া নীরবে গান শুনিতেছেন—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি তিনি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তিনি পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন—

শ্রীরাগ।

—"কান্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়।
একবার নৈন্থা এলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমাগুণ কহিয়াছি কত।
এইবার নাগাইল পাইলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এবার পাইলে তারে লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পরিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিত পাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ড যত পাইল প্রকাশ।
কাঁদিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবনদাস॥—"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি অফুরন্ত গৌর-প্রেমের উৎস। তাঁহার অক্ষয় গৌর-গীতি-ভাণ্ডারটি একটি অপূর্ব্ব বস্তু। গৌর-পদ-সমুদ্রে তিনি সদা সর্ব্বদা ভাসমান রহিয়াছেন। তিনি যে গৌর-পাগলিনী—"গৌর-গান-পাগ্‌লা মেয়ে" তাঁহার যে বড় আদরের নাম—নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দের দত্ত তাঁহার এই মধুর নামটি। তিনি পুনরায় আর একটি গানের ধুয়া ধরিলেন—

শ্রীরাগ।

—"নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক দুর্জ্জন।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ার গণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কাঁদিয়া বিকলে।
হায় হায় কি করিনু আমরা সকলে॥
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত॥
যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হৈল মো সবার।
পতিত পাবনে কেন কৈনু অস্বীকার॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে।
চরণ ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে॥—" (১)

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই গানগুলি শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির হৃদি-সমুদ্রে নানাবিধ ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইল। তাঁহার শ্রীবদন গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। এই সকল নিন্দুক পাষণ্ডী পড়ুয়াদিগের উদ্ধারকল্পে গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী যেন দৃঢ় সংকল্প হইলেন—তাঁহার প্রাণবল্লভের অতিশয় প্রিয় জীবোদ্ধারকার্য্য—তাহা এখন তাঁহারই কার্য্য—এরূপ মনোভাব লইয়া তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার দুটি হস্ত নিজ কম্পিত ক্ষীণ করে ধারণ করিয়া সকরুণবচনে কহিলেন— "প্রাণসখি! এই সকল নিন্দুক পড়ুয়া পাষণ্ডীগণের দুঃখের কথা শুনিয়া আমার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে।—সখি কাঞ্চনে! ইহাদের উপায় কি হবে? আমার প্রাণবল্লভ অদোষদরশী—তিনি ত ইহাদের কোন দোষই গ্রহণ করিবেন না। আমি ইহাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার চরণকমলে কায়-মনোবাক্যে নিয়ত প্রার্থনা করিব"—এই বলিয়া স্নেহময়ী বৈষ্ণবজননী প্রিয়াজি এই পাষণ্ডী দুর্ম্মতিদিগের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সখি কাঞ্চনা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া

(১) এই পদরত্নগুলি গৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত।

উত্তর করিলেন—সখি! প্রিয়সখি! তুমি যখন ইহাদের উদ্ধার-কামনা করিয়া তোমার প্রাণবল্লভের চরণে প্রার্থনা করিতেছ—তখন ইহাদের উদ্ধার ত হইয়াই গিয়াছে—সখি! তুমিও ত পতিতোদ্ধারিণী বৈষ্ণবজননী—কলিহত অধম সন্তানদিগের প্রতি তোমারও ত অপার করুণা।"

গৌরবল্লভার মনে সখির শেষ কথাটি ভাল বোধ হইল না—তাঁহাকে "পতিতোদ্ধারিণী" বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে—এইটি ঐশ্বর্য্যবোধক স্তুতি বাক্য। তিনি ঐশ্বর্য্যের লেশাভাসেরও ধার ধারেন না—তিনি বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী। সখি কাঞ্চনা তাহা যে না জানেন এমন কথা নহে,—তবে তিনি মধ্যে মধ্যে এখন কথা বলেন কেন—এ প্রশ্নের উত্তর তিনি ভিন্ন আর কেহ দিতে সমর্থ নহেন।

সখি কাঞ্চনার গান শেষ হইল আর রাত্রি প্রভাত হইল। কাক, কোকিল, ঘুঘু, দহিয়াল প্রভৃতি পক্ষীগণের কলরবে নদীয়ার ঘাট-বাট মুখরিত হইল—প্রভাত-গগনে রক্তিমাভা প্রতিভাত হইল।

প্রভাতী কীর্ত্তনের দল আসিয়া গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিল।

যথারাগ।

—"ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, কহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
লহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম রে।
যে জন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজে,
সেই হয় আমার প্রাণ রে॥"

আর একদল কীর্ত্তনের দল আসিয়া গাইল—

"উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া উঠিল॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ! উঠ উঠ উঠ হে!
গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া,—জাগ জাগ জাগ গো॥

সখিদ্বয়সহ বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ভজনমন্দিরের বাহিরে আসিয়া কীর্ত্তনে নিজনাম-গাথা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া বিষম লজ্জিতভাবে সুরতরঙ্গিনীর উদ্দেশে গলবস্ত্রে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সখিদ্বয়সহ ঝটিতি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ।
৪ঠা ফাল্গুন, ৩৭, সোমবার শিবরাত্রি।

(২০)

"কোঽয়ং পট্টধটীবিরাজিত কটিদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্ব্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
ঊর্দ্ধীকৃত্য-নিবদ্ধ-কুন্তল-ভর প্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা-
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈর্নামভিঃ॥"
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

"পহিলাহি মাঘের" বিষম দুর্দ্দিনের প্রাণঘাতী স্মৃতিকথা এখনও শেষ হয় নাই। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রিয়াজি ভজন-মন্দিরে আসিয়াই তাঁহার নিত্য সঙ্গিনী প্রিয় সখিদ্বয়কে ভিতরে আহ্বান করিলেন। ভজন-মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৌর-বিরহিণীত্রয় পূর্ব্বরাত্রির ভাবে বিভাবিত হইয়া পুনরায় মণ্ডলী করিয়া বসিয়া গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি এখনও বাকি আছে। গতকল্য এই মহা-যজ্ঞের অষ্টপ্রহর গিয়াছে—অদ্য তাহার দধিমঙ্গল। বিরহিণী প্রিয়াজির কমলনয়নযুগল গৌরানুরাগে সুরঞ্জিত—সখি-দ্বয়ের অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নচতুষ্টয় প্রিয়াজির বদনমণ্ডলে যেন লিপ্ত হইয়াই রহিয়াছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। গৌর-বিরহিণীত্রয় নীরবে বসিয়া যেন কোন গভীর সাধনায় নিমগ্না।

কিছুক্ষণ পরে বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সজলনয়নে সখি অমিতার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—"সখি অমিতে! গত রাত্রির গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের শ্রোতা ছিলে তুমি—হোতা ছিল সখি কাঞ্চনা,—অদ্য তুমিই এই যজ্ঞের হোতা হইয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া দধিমঙ্গল সম্পন্ন কর। আমার সেই বিষম দুর্দ্দিনের দুঃখকথা গৌরভক্ত মহাজনগণ যে ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন সখি কাঞ্চনা আমাকে তাহা শুনাইয়া বিনিমূলে কিনিয়া লইয়াছে। এখন অবশিষ্ট যাহা কিছু বাকি আছে—তুমি সখি! বল,—আমি শুনিয়া কৃত-কৃতার্থ হই"।

সখি অমিতা স্বল্পভাষিণী এবং গম্ভীর-স্বভাবা। তিনি বড়ই বিপদে পড়িলেন—তিনি প্রিয়াজির এই আদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা তখন পুনরায়

সকরুণ কাতর ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন,—"সখি অমিতে! আমার দুঃখকথার অন্ত নাই—আমার দুঃখেরও অন্ত নাই—আর আমার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখকথাসম্বন্ধে মহাজন পদাবলীরও অন্ত নাই—অনন্ত কালের জন্য এই মন্দভাগিনীর অনন্ত দুঃখকথা কলিহত জীবজগতের প্রাণে গৌর-বিরহ-দুঃখেরই সৃষ্টি ও পুষ্টি করিবে—তাহাতে তাহাদের পরম মঙ্গলই হইবে। এই যে দুঃখ ও দুঃখকথা—ইহার মূলে গৌর-বিরহ-রস-ভাণ্ডারের অফুরন্ত উৎস আছে—সেই উৎসের পরম পবিত্র নির্ম্মল স্বচ্ছসলিলই আমার একমাত্র জীবনসম্বল। গৌরবিরহ-দুঃখকথা-রহস্যবিৎ পণ্ডিত ভক্তমহাজনগণই আমার পরম মঙ্গলকারী হিতৈষী বান্ধব। এই সকল মহাজনের রচিত পদাবলীতে তাঁহাদের গৌর-ভজন-বিজ্ঞতা পরিপূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি হয়। সেই পদাবলী-সমুদ্র সাধুগুরু বৈষ্ণবমুখে শ্রোতব্য—সখি অমিতে! আমার মত মন্দভাগিনীর পক্ষে সাধুগুরু বৈষ্ণব সকলি তোমরা। তোমাদের কৃপাপাত্রী এই হতভাগিনীর প্রতি কৃপা করিয়া "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনের গৌর-বিরহ-কথা-যজ্ঞ এক্ষণে তুমি সমাপন কর—যজ্ঞফল তোমাদের নদীয়া-নাগর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের চরণে সমর্পণ করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর।"

বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীমুখে এতগুলি অতি মূল্যবান ভজন-সার-কথা শ্রবণ করিয়া সখিদ্বয় অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—বিরহিণী প্রিয়াজিও নয়ন-সলিলে নিজ বক্ষ ভাসাইলেন। সখি অমিতা আর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ-সুহই।

—"সকল ভক্তগণ শচীমাকে দেখি।
সকরুণ হৈয়া কয় ছল ছল আঁখি॥"
থির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে।
নিত্যানন্দে পাঠাইল তোমা দেখিবারে॥
আমরা যাইব সব নীলাচল পুরী।
গঙ্গাস্নান বলিয়া আনিব সঙ্গে করি॥
ঐছন বচন কহি প্রবোধ করিলা।
সবে মিলি থির করি ঘরে বসাইলা॥
প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি।
কি করি ছাড়িলা গৌর না বুঝিনু রীতি॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি ও সখি কাঞ্চনা শ্রোতা আর সখি অমিতা আজ বক্তা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ কণ্টক নগরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া কি ভাবে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার আভাস মাত্র নিম্নলিখিত পদটিতে পাওয়া যায়। সখি অমিতা সেই প্রাচীন পদটির ধুয়া ধরিলেন।

রাগ কানাড়া।

—"নবীন সন্ন্যাসী বেশে, বিশ্বম্ভর ঊর্দ্ধশ্বাসে,
বৃন্দাবন পানেতে ছুটিল।
কটিতে করঙ্গ বাঁধা, মুখে রব রাধা রাধা,
উধাও হইয়া পহুঁ ধাইল॥
দু'নয়নে প্রেমধারা বহে।
বলে কাঁহা মঝু রাই, কাঁহা যশোমতি মাই,
ললিতা বিশাখা মঝু কাহে॥ধ্রুঁ॥
কাঁহা গিরি গোবর্দ্ধন, কাঁহা সে দ্বাদশ বন,
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কই?
ছিদাম সুবল সখা, কাঁহা মুঝে দাও দেখা,
কহ মোর নীপতরু কই?
কাঁহা নব লক্ষ ধেনু, কাঁহা মেরি শিক্ষা বেণু,
কাঁহা মোর যমুনা-পুলিন?
বৃন্দাবন কাঁদি কয়, আমার গৌরাঙ্গ রায়,
কেন হেন হইল মলিন?"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই পদরত্নটিতে রাধাভাবাঢ্য গৌরঙ্গের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না—তিনি স্বরূপের পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়া কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া এই সকল পূর্ব্বলীলার কথাগুলি সুস্পষ্ট বলিলেন। সখি কাঞ্চনা গৌর-তত্ত্ববিৎ পরম পণ্ডিত—তিনি সখি অমিতার মুখে যখন শুনিলেন—কপট সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিতেছেন—

—"কাঁহা মঝু রাই, কাঁহা যশোমতি মাই,
ললিতা বিশাখা মঝু কাহে।"—

তখনই তিনি বুঝিলেন—এই সকল পূর্ব্বলীলার স্মৃতির সঙ্গে প্রকটলীলার স্মৃতি সকল ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে—সেই ব্রজের রাইই—নদীয়ার রাই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—সেই যশোমতি মাইই—নদীয়ার মাই,—সেই ললিতা বিশাখাই—কাঞ্চনা অমিতা। কপট সন্ন্যাসীঠাকুর আপনার

পূর্ব্বাশ্রমের নিজজনের নাম করিতে পারিতেছেন না—তাঁহার ভাবভঙ্গীতে তাঁহার নিত্যপার্ষদ ভক্তগণ সকলি বুঝিতেছেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি জপমালা হস্তে ধীরভাবে শ্রবণ করিতেছেন—তাঁহার শ্রীমুখে কোন কথা নাই,—তবে তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের কৃষ্ণাবেশ পূর্ব্বেও দেখিয়াছেন—এখনও শুনিতেছেন। তাহার বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

সখি অমিতা আপনভাবে গান গাহিলেন—তাঁহার মুদ্রিত নয়নে অবিরল প্রেমধারা পড়িতেছে—তিনি যেন কপট সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। তাঁহার সেই—

—"কটিতে করঙ্গ বাঁধা,
মুখে রব রাধা রাধা,
উধাও হইয়া পহুঁ ধাইল"—

ভাবটী যেন মূর্ত্তিমন্ত হইয়া নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরে বিরাজমান বোধ হইতেছে এবং তাঁহার শ্রীমুখের "রাধা রাধা" শব্দ যেন সখিদ্বয়ের কর্ণে "বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া" বলিয়া ধ্বনিত হইতেছে। বিরহিণী প্রিয়াজির মনেও তাঁহার প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইতেছে—তিনি যেন সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিতেছেন—তাঁহার প্রাণবল্লভ "নবীন সন্ন্যাসীবেশে, বিশ্বম্ভর উর্দ্ধশ্বাসে, বৃন্দাবন পানেতে ছুটিল।" এই ভাবে গৌর-বিরহিণীত্রয় গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন প্রাতঃকালে রুদ্ধদ্বার নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তরে বসিয়া—সেখানে চতুর্থ ব্যক্তির যাইবার অধিকার নাই।

সখি অমিতার কণ্ঠস্বর মৃদুমধুর—তিনি তাঁহার স্বাভাবিক সহজ সকরুণ সুরে আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ সুহই।

—"করি বৃন্দাবন ভাণ নিত্যানন্দ রায়।
পহুঁকে লইয়া আচার্য্যের গৃহে যায়॥
অদ্বৈত অচৈতন্য ছিল প্রভুর বিরহে।
চাঁদমুখ হেরি প্রাণ পাইল মৃতদেহে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পহুঁ কহে সীতাপতি।
কি জানি নিদয় হৈলা মো সবার প্রতি॥
কহ প্রভু কি দোষে ছাড়িয়া সবে গেলে।
তোমার সুখের হাট কেন বা ভাঙ্গিলে॥
প্রভু কহে মোরে নাড়া অনুযোগ দেহ।
তুমি ত নাটের গুরু নহে আর কেহ॥
হাতে তুড়ি দিয়া যেন পায়রা নাচায়।
তুই কি না সেইরূপ নাচাস্ আমায়॥
সুখেতে গোলোকে ছিনু তুইত আনিলি
সব ছাড়াইয়া মোরে কাঙ্গাল করিলি॥
বৃন্দাবন দাস কহে কি দোষ নাড়ার।
নতু কৈছে হবে সব জীবের উদ্ধার॥"—

গৌর পদ-তরঙ্গিণী।

সঙ্গে সঙ্গে সখি অমিতা ইহার পরবর্ত্তী পদটিও গাহিলেন—

রাগ—ধানশী।

—"প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া-নগরে॥
ভাবিয়া বাটীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কান্দি বলে কোথা আছে আমার নিমাই॥
না কান্দিও শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু মোর গুণমণি॥
সন্ন্যাস করিয়া পহুঁ আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাঞা দিলা তোমা লইবারে॥
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচীমাতা॥
উঠাইল নিত্যানন্দ চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে—অদ্বৈতের ঘরে॥
শচী কাঁদে নিতাই কাঁদে নদীয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদে না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি নিজ দুঃখ সকলই ভুলিয়া গিয়া দুখিনী পুত্রশোকাতুরা শাশুড়ীর দুঃখকথা শ্রবণে আকুল ক্রন্দনের রোল উঠাইলেন—তাহা শুনিয়া সখিদ্বয়ের হৃৎপিণ্ড

যেন ছিন্ন হইয়া গেল—তাঁহারাও প্রিয়াজির ক্রন্দনের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দির মধ্যে করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি উঠাইলেন। তখন প্রাতঃকাল—এই অসময়ে এরূপ প্রাণঘাতী বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্যান্য সখিগণ ও দাসীগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—কিন্তু দ্বার রুদ্ধ। গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহারা দেখিলেন মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরবিরহিণীত্রয় ভূমিতলে ধূল্যবলুণ্ঠিতদেহে গড়াগড়ি দিতেছেন—"পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনে—গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের দধি-হরিদ্রা উৎসব হইতেছে—ঠাকুরঘরের গঙ্গাজলের পাত্র গৌর-প্রেমোন্মাদিনী প্রিয়াজির ধূল্যবলুণ্ঠিত অঙ্গ-সঞ্চালনে ভূমিতলে পতিত হইয়া ভজনস্থলী কর্দ্দমাক্ত করিয়াছে—সেই কর্দ্দমের সহিত গৌর-বিরহিণীত্রয়ের দরদরিত নয়ন-সলিলসম্পাতে তাঁহাদের পরিধান-বস্ত্রও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। এই ভাবে এই অপূর্ব্ব প্রেমযজ্ঞের অপূর্ব্ব দধিমঙ্গলোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছে।

ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরের এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া সমাগত সখি ও দাসীগণ বাহিরে দাড়াইয়া করুণ ক্রন্দনের উচ্চ রোল উঠাইলেন। বহির্ব্বাটির লোকজন ছুটিয়া আসিলেন,—অন্তঃপুরের দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া তাঁহারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে আসিলেন। তাহার মধ্যে পুরাতন ভৃত্য অতিবৃদ্ধ ঈশান আছেন—দামোদর পণ্ডিত আছেন—বংশীবদন ঠাকুর আছেন। তাঁহারা দূর হইতে সংবাদ লইতেছেন—একজন দাসী গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহা-দিগকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে পরামর্শ দিলেন—"দিদি গো! তোমরা সকলে মিলিয়া গৌর-কীর্ত্তন কর—আমরাও করি—তাহাতেই এখন কার্য্যসিদ্ধি হইবে—আর কিছুতেই হইবে না"—

সখি ও দাসীগণ ভজন-মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া উচ্চ সংকীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"—

অন্তঃপুরপ্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ঈশান, পণ্ডিত দামোদর এবং ঠাকুর বংশীবদন প্রভৃতি কয়েকজন নিতান্ত অন্তরঙ্গ নিজজন গৌরকীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"—

কতক্ষণ এই কীর্ত্তন চলিল—অকস্মাৎ মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া সখি কাঞ্চনা বাহিরে আসিলেন এবং সকলকে নির্ভয় দিলেন—"কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই—প্রিয়াজি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন—এখন সকলে নিজ নিজ ভজন-কার্য্যে যাইতে পারেন"—

এই সংবাদে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন—পুনরায় সখি কাঞ্চনা ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির নিকটে বসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। পুনরায় দ্বার রুদ্ধ হইল। এক্ষণে বেলা একপ্রহর অতীত হইয়াছে।

কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া গৌর-বিরহিণীত্রয় পুনরায় ভজন-মন্দিরে মণ্ডলী করিয়া বসিলেন :—এক্ষণে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের শেষাঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইল। বিরহিণী প্রিয়াজি সখি অমিতার মুখের প্রতি করুণ-নয়নে চাহিয়া কাতর স্বরে কহিলেন,—"সখি অমিতে! তার পর"।

সখি অমিতা—পুত্রশোকাতুরা শচীমাতার কথাই কহিতেছেন—তিনি তাঁহারই উক্তি আর একটী প্রাচীন পদ গাহিতে লাগিলেন—

রাগ-সুহই।

—"হাদে গো মালিনী সই, চল দেখি যাই।
নিমাই অদ্বৈতের ঘরে কহিল নিতাই॥
সে চাঁচর কেশহীন কেমনে দেখিব।
না যাব অদ্বৈতের ঘরে গঙ্গায় পশিব॥
এত বলি শচীমাতা কাতর হইয়া।
শান্তিপুর মুখ ধায় নিমাই বলিয়া॥
ধাইল সকল লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
বাসুদেব সঙ্গে যায় কান্দিতে কান্দিতে॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

দুখিনী শচীমাতার সঙ্গে নদীয়ার সর্ব্বলোক গৌরাঙ্গ দর্শনে শান্তিপুরে যাইতেছেন—কি ভাবে তাহা শ্রীল মুরারি গুপ্ত অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

রাগ—ধানশী।

—"চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে॥

হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ! সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
হেরিতে গৌরাঙ্গ-মুখ, মনে অভিলাষ।
শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষশূন্য নদীয়া-নগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

শান্তিপুরে গিয়া শচীমাতা—কি দেখিলেন ও কি কহিলেন—তাহা ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া দু'ফোটা নয়ন-জল বিসর্জ্জন করিয়া আত্মশোধন করুন।—সখি অমিতা গাহিতে লাগিলেন—

রাগ—পাহিড়া।

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে,
আইল সবাই শান্তিপুরে।
মুড়ায়ে মাথার কেশ, ধৈরাছে সন্ন্যাসী বেশ,
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে॥
এমত হৈল কেনে, শিরে কেশ দেখি হীনে,
পরিয়াছে কৌপীন যে বাস।
নদীয়ার ভোগ ছাড়ি, মায়েরে অনাথ করি,
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস॥
কর জোড়ি অনুরাগে, দাঁড়াল মায়ের আগে,
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাতে তুলি বুকে, চুম্ব দিলা চাঁদ মুখে,
কাঁদে শচী গলাটি ধরিয়া॥
"ইহার লাগিয়া যত, পড়ালাম ভাগবত,
এ দুঃখ কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ডধারী,
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায়, ইহা নাকি সহা যায়,
কার বোলে হৈলা বৈরাগী॥"
গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
আর তাহে শচীর করুণা।
কহে বাসুদেব ঘোষে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে,
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননীর সকল কথা গুলিই মস্তক অবনত করিয়া ধীর ভাবে শ্রবণ করিলেন—কিছুক্ষণ পরে তিনি উত্তর করিলেন।

রাগ—পাহিড়া।

—"শুনিয়া মায়ের বাণী, কহে প্রভু গুণমণি,
"শুন মাতা আমার বচন।
জন্মে জন্মে মাতা তুমি, তোমার বালক আমি,
এই সব বিধির লিখন॥
ধ্রুবের জননী ছিল, পুত্রকে বৈরাগ্য দিল,
ভজে তেঁই দেব চক্রপানি।
রঘুনাথ ছাড়ি ভোগে, বনে বনে ফিরে লোকে,
ঝুরে সদা কৌশল্যা জননী॥
তার শেষে দ্বাপরে, কৃষ্ণ গেলা মধুপুরে,
ঘরে নন্দরাণী নন্দ-পিতা।
সর্ব্ব পরে এই হয়ে, একথা অন্যথা নহে,
মিথ্যা শোক কর শচীমাতা॥
বিধাতা নিবন্ধ যাহা, কেবা খণ্ডাইবে তাহা,
এত জানি স্থির কর মন।
ভজ কৃষ্ণ কর সার, আর নাহি সংসার,
পাইয়া পরম পদধন॥
রোদন করিলে তুমি, ডাকিলে আসিব আমি
এই দেহ তোমার পালিত।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যাই নীলাচল পুরে,
তুমি চিত্তে কর সন্নিহিত॥"
প্রভু স্তুতিবাণী কহে, শচী নির্ব্বচনে রহে,
পড়ে জল নয়ন বহিয়া।
বাসু কহে গৌরহরি, এই নিবেদন করি,
পুনরপি চলহ নদীয়া॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভের এই সকল লীলাকথা শুনিতেছেন—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতে-ছেন—তাঁহার মনে যেন একটী নবভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে—দুঃখিনী শচীমাতার দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি

আপন দুঃখ ভুলিয়াছেন—তাঁহার মনে হইতেছে—তাঁহার প্রাণবল্লভের এই যে অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-লীলা-রঙ্গ—ইহা জগজ্জীবের হিতার্থেই জগতে প্রকট হইয়াছে—তাঁহার প্রাণবল্লভ যে বহুবল্লভ,—তাহা তিনি এখন উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন। পরম বুদ্ধিমতী গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজি বৃদ্ধা শাশুড়ীর অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও দুর্জ্জয় পুত্র-বিরহ-শোক-সহন-ক্ষমতা দেখিয়া নিজ মনকে প্রবোধ দিতেছেন। সখি কাঞ্চনা এক্ষণে নীরব শ্রোতা—তিনি বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনোভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সখি অমিতাকে ইঙ্গিতে তাঁহার ভাবানুযায়ী গান করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন।

এক্ষণে সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ নীলাচল-যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে তাঁহার দুখিনী জননীকে প্রবোধ দিয়াছেন—এক্ষণে নদীয়ার ভক্তগণকে কি বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন,—তাহা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া আত্মশোধন করুন।

সখি অমিতা পুনরায় গান ধরিলেন—

রাগ—শ্রীগান্ধার

—"শ্রীপ্রভু করুণস্বরে, ভকত প্রবোধ করে
কহে কথা কান্দিতে কান্দিতে।
দু'টি হাত যোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি,
সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে॥
ছাড়ি নবদ্বীপ বাস, পরিনু অরুণ বাস,
শচী বিষ্ণুপ্রিয়ারে ছাড়িয়া।
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচলে বাস,
তোমা সবার অনুমতি লৈয়া॥
নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে,
তাহাতে পাইবা তত্ত্ব মোর।
এত বলি গৌরহরি, নমো নারায়ণ স্মরি,
অদ্বৈতে ধরিয়া দিল কোর॥
শচীরে প্রবোধ দিয়া, তাঁর পদধুলি লৈয়া,
নিরপেক্ষ যাত্রা প্রভু কৈল।
বাসুদেব ঘোষ বলে, গোরা যায় নীলাচলে,
শান্তিপুর ক্রন্দনে ভরিল॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

*এই পদটী শ্রবণ করিয়া গৌরবক্ষ-বিলাসিনী সখি কাঞ্চনার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া যেন কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন—তাঁহার নয়নের বারিধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে প্রিয়সখির চক্ষু-দ্বয় মুছাইয়া দিয়া পরম প্রেমভরে কহিলেন—"প্রিয়সখি! কি বলিতেছিলে বল,—মনের ভাব মনে চাপিয়া রাখিও না,—তাহাতে উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হয়।" তখন বিরহিণী প্রিয়াজি পরম লজ্জিতভাবে অধোবদনে নিজ হস্তাঙ্গুলির নখাগ্রভাগ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন—"প্রিয়সখি! লোক-মুখে শুনিয়াছি সন্ন্যাসী হইলে স্ত্রীর নাম করিতে নাই,—কিন্তু তোমাদের নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর সর্ব্বসমক্ষে আমার নাম করিলন কি করিয়া? বাসুদেব ঘোষ তোমাদের নবদ্বীপচন্দ্রের পার্ষদ ভক্ত—তাঁহার রচিত উক্ত পদটিতে আমার সন্ন্যাসী-প্রাণবল্লভের মুখে তাঁহার অভাগিনী স্ত্রীর নামটি শুনিতে পাইয়া আমি পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি।"

সখি কাঞ্চনা উত্তর করিলেন—"প্রিয় সখি! তোমার প্রাণবল্লভ কপট-সন্ন্যাসী—জীবোদ্ধারকল্পে তিনি সন্ন্যাস-বেশ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র—তাহাও তাঁহার ঘরণীর অনুমতি লইয়া। এক্ষেত্রে তাঁহার ঘরণীর নাম করা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ নহে। পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর তোমার দুঃখে বড়ই কাঁদিয়াছেন—তিনি তোমার সন্ন্যাসী-প্রাণ-বল্লভের মুখে তোমার নামটি শুনিয়া বড়ই আনন্দ পান, এই জন্যই তিনি তাঁহার এই পদটীতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের মুখ দিয়া তোমার নামটি বাহির করিয়া প্রকৃতই তাঁহার যে কপট-সন্ন্যাসী-ভাব, তাহা জগতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।"

বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে ধীর ভাবে কথাগুলি শুনিলেন—আর কোন উত্তর করিলেন না।

সখি অমিতাও এই কথাগুলি শুনিলেন—ইহাতে তাঁহারও মনে বড় আনন্দ হইল।

কিছুক্ষণ পরে প্রিয়াজি সখি অমিতার প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। এই চাহনির মর্ম্ম "তার পর"।

সখি অমিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শান্তিপুর হইতে নীলাচল-যাত্রার পদটীর ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—পাহিড়া।

—"পহুঁ মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়া দু'টি হাত, কাঁদে শান্তিপুর-নাথ,
কিবা ছিল কিবা হৈল বলে॥ধ্রু॥

কৃপা করি মোর ঘরে, অবধূত-বিশ্বম্ভরে,
কতরূপ করিলা বিহার।
এবে সেই দুই ভাই, কি দোষে ছাড়িয়া যাই,
শান্তিপুর করিয়া আঁধার॥
অদ্বৈত-ঘরণী কাঁদে, কেশপাশ নাহি বান্ধে,
প্রভু বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, প্রেম-কীর্ত্তন রঙ্গে,
কে আর নাচিবে মোর ঘরে॥
শান্তিপুরবাসী যত, তারা কাঁদে অবিরত,
লোটায়ে লোটায়ে ভূমিতলে।
এ শচীনন্দন ভণ, শান্তিপুর হৈল যেন,
পূর্ব্বে যে শুনিল গোকুলে॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গান শুনিয়া গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কান্দিয়া আরও আকুল হইলেন—সখি কাঞ্চনার নয়নের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—গায়িকা সখি অমিতার ত কথাই নাই। নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে যেন প্রেম-নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

গৌরবল্লভার গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনের প্রবল লালসার এখনও তৃপ্তি হয় নাই—তিনি ছলছল নয়নে গৌর-বিরহানুরাগে সখি অমিতার প্রতি ঘনঘন চাহিতেছেন—এই চাহনির মর্ম্ম—"সখি! আরও বল"—সখি অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজির কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি সেন শিবানন্দ রচিত একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন।

রাগ—মঙ্গল।

—"দয়াময় গৌরহরি, নৈশ্যলীলা সাঙ্গ করি,
হায় হায় কি কপাল মন্দ।
গেলা নাথ! নীলাচলে, এদাসেরে একা ফেলে,
না ঘুচিল মোর ভববন্ধ॥
আদেশ করিলা যাহা, নিশ্চয় পালিব তাহা,
কিন্তু একা কিরূপে রহিব।
পুত্র পরিবার যত, লাগিবে বিষের মত,
তোমা বিনা কি মতে গোঙাব॥
গৌড়ীয় যাত্রিক সনে, বৎসরান্তে দরশনে,
কহিলা যাইতে নীলাচলে।
কিরূপে সহিয়া রব, সম্বৎসর কাটাইব,
যুগ শত জ্ঞান করি তিলে॥
হও প্রভু কৃপাবান্, কর অনুমতি দান,
নিতি নিতি হেরি পদ-দ্বন্দ্ব।
যদি না আদেশ কর, ওহে প্রভু বিশ্বম্ভর,
আত্মঘাতী হবে শিবানন্দ॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার পরমান্তরঙ্গ পার্ষদভক্ত সেন শিবানন্দকে যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির মনে আনন্দ হইল। নদীয়ার ভক্তগণ প্রতি বৎসর নীলাচলে গৌর-দর্শনে যাইবেন—তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের সংবাদ তাঁহাকে দিবেন—এই আশাতেই প্রিয়াজির মনে এত দুঃখের মধ্যেও আনন্দ হইল।

শান্তিপুরনাথ গৌর আনা গোসাঁঞি প্রভুবিরহে বড়ই কাতর হইলেন—তাঁহার মত প্রাচীন প্রাজ্ঞ এবং সর্ব্বজন-পূজিত আচার্য্যের বিলাপে, সন্ন্যাসীঠাকুরের হৃদয় বিকল হইল। মহাপ্রভুর উক্তি একটি পদে পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ সন্ন্যাসীঠাকুরের তাৎকালিক মনোভাব অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই পদরত্নটি গান করিয়া সখি অমিতা গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনের পূর্ব্ব-স্মৃতি মহোৎসবের অষ্টপ্রহর যজ্ঞ সমাপন করিলেন।

রাগ—ধানশী।

—"অদ্বৈত-বিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন অদ্বৈতাচার্য্য "এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলা-ক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কি রূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় শোক কেন কর।
তব সঙ্গে সদা আমি এ বিশ্বাস কর॥
প্রভু-বাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ।
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসু ঘোষ॥
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে গৌর-বিরহিণীত্রয় একত্রে মিলিয়া যে গৌর-বল্লভার "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনের পূর্ব্বস্মৃতির অষ্টপ্রহর গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের উদ্বোধন করিয়াছেন,—তাহার উদ্‌যাপন ও পূর্ণাহুতি হইল পরদিন দ্বিপ্রহরে। এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ প্রহর কাল গৌর-বিরহিণী-ত্রয়ের এবং গৌরশূন্য-গৌরগৃহের অন্যান্য সখিগণ ও দাসদাসীগণের আহার নিদ্রা নাই,—বিরহিণী প্রিয়াজি প্রতি বৎসর এই দিনে এইরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—বিরহিণী গৌরবল্লভার দৈনন্দিন নিয়মিত ভজনারম্ভ হইল এখন। তিনি মর্ম্মী সখিদ্বয়কে সস্নেহে হাতে ধরিয়া ভজন-মন্দির হইতে বিদায় দিলেন এবং মালাহস্তে সংখ্যানাম জপে মগ্না হইলেন। সখিদ্বয়ও ভজন-মন্দিরের বারান্দার এক পার্শ্বে বসিয়া স্ব স্ব ভজনানন্দে মগ্না হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন প্রিয়াজি গতকল্য উপবাসী ছিলেন—অদ্যও তাঁহার ভাগ্যে তাঁহার প্রাণবল্লভ প্রসাদ লিখেন নাই—কারণ তাঁহার সংখ্যানাম জপ শেষ না হইলে তিনি ভজনমন্দির হইতে বাহির হইবেন না।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ গতকল্য প্রিয়াজির প্রসাদ পান নাই—আজি যে কখন পাইবেন—তাহারও কোন ঠিকানা নাই। তাঁহারাও উপবাসী আছেন—অন্যান্য সখি ও দাস-দাসীগণের ত কথাই নাই—তাঁহারাও উপবাসী আছেন। গৌরশূন্য গৌরগৃহের আত্মগোষ্টির এরূপ উপবাসের পালা মাসের মধ্যে পাঁচ সাত দিন লাগিয়াই থাকিত। গৌর-পরিবারের নিত্য দাসদাসীগণ গৌরবিরহিণী গৌর-বল্লভার আনুগত্যে গৌরভজন করিতেন—সুতরাং প্রিয়াজির কঠোর ভজনাদর্শই তাঁহারা গ্রহণ করিয়া কোনরূপে দেহ ধারণ করিয়া আছেন।

এদিকে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল,—গৌরশূন্য গৌরগৃহের বহির্বাটীর দ্বারে নদীয়াবাসী একান্ত গৌরভক্ত-গণ প্রিয়াজির প্রসাদের জন্য দুই দিন হইতে জীবন্মৃতবৎ মালাহস্তে নদীয়ার রজে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের বদনে কেবলমাত্র "হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ! হা গৌরাঙ্গ গুণনিধি! হা গৌর-সুন্দর!" এইরূপ সকরুণ আর্ত্তনাদের ধ্বনি। ইহাঁদের মধ্যে পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষও আছেন। তিনি কি বলিয়া কাঁদিতেছেন শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

রাগ—সুহই।

—"গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া॥
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ একান্ত গৌরভক্তগণ তখন গৌর-শূন্য গৌরগৃহদ্বারে বসিয়া সকলে মিলিয়া উচ্চ গৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—কোথা হইতে কয়েকটী গৌরভক্ত খোলকরতাল লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে সেখানে উচ্চ কীর্ত্তনের রোল উঠিল।

রাগ—শ্রীরাগ।

—"গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িবে।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিবে॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু॥
একুলে ওকুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি॥
বাসুদেব ঘোষ কহে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া।"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌর-শূন্য গৌর-গৃহদ্বারে কীর্ত্তনের মহা ধূম উঠিল। সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে ঈশান গিয়া বহির্দ্বার খুলিয়া দিলেন—গৌরভক্তগণ বহিরাঙ্গণে উচ্চকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—এই কীর্ত্তনে পণ্ডিত দামোদর, ঠাকুর বংশীবদন এবং অতি বৃদ্ধ ঈশানও যোগ দিলেন। তাঁহারাও উপবাসী আছেন।

এবার পদকর্ত্তা বল্লভ দাস তাঁহার স্বরচিত পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—সুহই।

—"আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
দীনে দয়া তোমা বিনা করে হেন নাই॥

এই ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত রেণু প্রায়।
কে গণিবে পাপ মোর গণন না যায়॥
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর।
তোমা না ভজিয়া কৈনু ভাঁড়ের আচার॥
হেন প্রভু না ভজিনু কি গতি আমার।
আপনার মুখে দিলাম জলন্ত অঙ্গার॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বল্লভ দাসিয়া কেন না গেল মরিয়া॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই উচ্চ গৌর-কীর্ত্তনের ধ্বনি অন্তঃপুরে প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে পৌঁছিল—সখিদ্বয় বাহির বারান্দায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন—তাঁহারা মালাহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি ভজন মন্দিরে বসিয়া সংখ্যানাম জপ করিতেছিলেন—তিনিও দ্বার খুলিয়া বাহির বারান্দায় আসিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভার হস্তে জপমালা—শুষ্ক বদন—সর্ব্ব অঙ্গ যেন গৌর-প্রেমভরে টলমল করিতেছে। মর্ম্মী সখিদ্বয় সঙ্গে তিনি গৌরকীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন। দিবা অবসান প্রায়। সখি কাঞ্চনা তখন প্রিয়াজির নিকটে গিয়া অতি মৃদুস্বরে কহিলেন—প্রিয় সখি! তোমার প্রাণবল্লভের এই সকল অন্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদ ভক্তবৃন্দ তোমারই মত গতকল্য হইতে উপবাসী আছেন—কারণ প্রভুর প্রসাদ তাঁহারা কালও পান নাই—আজও দিবা অবসানপ্রায়—এখন অন্তঃপুরে চল—তোমার প্রাণবল্লভের ভোগ লাগাইয়া শীঘ্র ইহাঁদিগকে যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ দান করিয়া ইহাঁদের প্রাণ রক্ষা কর"—

সখির কথা শুনিয়া গৌর-বল্লভার তখন চৈতন্য হইল। তিনি অত্যন্ত পরিতাপের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার মত মহা অপরাধিনী অধমা মন্দভাগিনী ত্রিজগতে আর কেহ নাই—আমার জন্য এই সকল প্রাচীন বৈষ্ণববৃন্দ এত কষ্ট পাইতেছেন—আমার প্রাণবল্লভের ইহাঁরা একান্ত নিজজন—ইহাঁদের চরণে আমি ত বিশেষ অপরাধিনী হইয়াছি। এখন উপায় কি বল সখি! আমার ত সংখ্যানাম জপ এখনও শেষ হয় নাই।" এই বলিয়া মনদুঃখে মহা তপস্বিনী প্রিয়াজি নিজ কপালে করাঘাত করিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িলেন এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই জনে তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রিয়াজি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সখি কাঞ্চনা কহিলেন—"প্রিয় সখি! তোমাকে আমি আর কি উপদেশ দিব? তোমার কঠোর ভজনরীতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোন কাজ করিতে বলা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র—তুমিই স্বয়ং বিচার করিয়া এখন কাজ কর। এই আমাদের কাতর অনুরোধ।" বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন—কোন উত্তর না দিয়া জপমালা যথাস্থানে রাখিয়া গৌরাঙ্গৈকপ্রাণ নদীয়াবাসী বৈষ্ণবগণের উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন—তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন—সখিদ্বয় [illegible] তাঁকে দুই দিক হইতে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে

সংখ্যা জপের তণ্ডুল আজ অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে—একটী দাসী আসিয়া তাহা অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন—অর্দ্ধেকমুষ্টি এই তণ্ডুলগুলি দেখিয়া অন্তঃপুরের সখি ও দাসীবৃন্দ নীরবে চক্ষের জল ফেলিলেন—কাঞ্চনা ও অমিতার মনঃদুঃখের আর সীমা নাই। পরমা ধৈর্য্যবতী ও স্নেহময়ী প্রিয়াজি সখিবৃন্দের মনোভাব বুঝিয়া পরম প্রেম-ভরে সখি কাঞ্চনাকে নিকটে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিলেন। সখি কাঞ্চনা স্বয়ং পাকগৃহে গিয়া তৎক্ষণাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি নানাবিধ উপকরণ দিয়া প্রভুর ভোগ লাগাইলেন। প্রিয়াজি তাঁহার জপসিদ্ধ সেই অর্দ্ধেক তণ্ডুলমুষ্টি লইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ং পাক করিয়া তাঁহার নিয়ম পালন করিলেন। এদিকে সখি কাঞ্চনার পাকশালায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হইল—তিনি নানাবিধ উপকরণের সহিত ভোগ প্রস্তুত করিয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ভোগ লাগাইলেন। যথাসময়ে অপরাহ্নে প্রিয়াজির অনুমতিক্রমে অন্তঃপুরের আঙ্গিনায় উপস্থিত বৈষ্ণবগণের পঙ্গত বসিল। অন্য দিন মাত্র কণিকা প্রসাদ বিতরিত হইত,—আজ নানাবিধ উৎকৃষ্ট উপকরণ সহ তাঁহারা প্রসাদ পাইলেন। সকলেই মহা বিস্মিত হইলেন—আজ অসম্ভব সম্ভব হইল। এই পঙ্গতে বসিয়াছেন শিবানন্দ সেন প্রমুখ নদীয়াবাসী একান্ত

গৌরভক্ত মহাজনগণ—আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধ ঈশান, দামোদর পণ্ডিত আর ঠাকুর বংশীবদনও প্রিয়াজির আদেশে আসিয়া পঙ্গতে বসিয়াছেন। সকলেরই নয়নে প্রেমধারা—বদনে প্রেমধ্বনি—

"—জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥"—

বিরহিণী প্রিয়াজি অন্তঃপুরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বৈষ্ণবভোজন দর্শন করিতেছেন—তাঁহার নয়নধারায় বক্ষ ভাসিয়া ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিতেছে। সখি ও দাসীবৃন্দ নীরবে দাঁড়াইয়া প্রিয়াজির "পহিলহি মাঘের" ছুর্দ্দিনের স্মৃতি মহোৎসবের বৈষ্ণব-ভোজন দর্শন করিতেছেন—আজ আর কাহারও কোন নিয়ম নিষ্ঠা নাই—এই সকল গৌরাঙ্গ-পার্ষদ মহাজন বৈষ্ণববৃন্দও বিষম কঠোরতার সহিত প্রাণ-ধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গ-ভজন করিতেন। আজ তাঁহারা চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় উত্তম প্রসাদ ভোজন করিতেছেন—কাহারও মুখে সে আলোচনা নাই· কোন কথা নাই,—মনের সাধে প্রেমানন্দে আজ তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া প্রেমধ্বনি দিতেছেন—

"জয় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ"

বৈষ্ণবভোজন শেষ হইলে বিরহিণী প্রিয়াজির ইঙ্গিতে উদাসীন বৈষ্ণববৃন্দকে নূতন বহির্ব্বাস—এবং গৃহী বৈষ্ণব-গণকে নববস্ত্র বিতরিত হইল। দূর হইতে অলক্ষ্যে গৌর-বল্লভা গলবস্ত্রে বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিলেন—

—"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥"

অতঃপর বৈষ্ণব-জননী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অন্তঃপুর প্রাঙ্গনের পিঁড়াতে গিয়া দাঁড়াইলেন—যথা,—

"পিঁড়াতে কাঁড়ার টানা বস্ত্রের আছয়ে।
তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হ'য়ে॥
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে।
দাসী যাই কাঁড়ার রঞ্চেক ধরি তোলে।
চরণ কমল মাত্র দর্শন পাইতে।
কেহ কেহ ঢলিয়া পড়য়ে কোন ভিতে।"— অঃ চঃ।

এইরূপে বৈষ্ণব-জননী কৃপাময়ী প্রিয়াজি বৈষ্ণববৃন্দকে দর্শন দান করিয়া বিদায় করিলেন। ইহা তাঁহার দৈনন্দিন নিত্যকৃত্য। অগ্ন বৈষ্ণব ভোজনব্যাপারের বিশেষত্ব আছে। তাঁহার "পহিলহি মাঘের" ছুর্দ্দিনের স্মৃতি-মহোৎসবের বৈষ্ণব-ভোজন ব্যাপারটি অপূর্ব্ব দৃশ্য। শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল ভজনের ফলে নদীয়াবাসী একান্ত অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবগণের ভববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত এতাদৃশ সুকৃতি লাভ হইয়াছে। এত দুঃখের মধ্যেও এই "অনর্পিত চরী" টুকু না পাইলে তাঁহারা যে প্রাণে মরিয়া যাইতেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। নদীয়াবাসী এই সকল বৈষ্ণববৃন্দ কে? শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের চিহ্নিত নিত্যদাসগণ। তাঁহারা নদীয়া ছাড়া হন নাই। গৌরবল্লভার আনুগত্যে নদীয়া-যুগল ভজন করিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ এই সুখটুকু তাঁহাদিগকে না দিলে তাঁহার বিরহ-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া ইহাঁরা কোন কালে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিতেন। তাঁহারা নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবীর কৃপাকটাক্ষে যুগবৈরাগ্যবান হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের যুগল-ভজন করিতেছেন।

এই সকল গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ একান্ত নিজজন বৈষ্ণবগণ সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ট হইয়া গৌর-বল্লভার চরণে এই বলিয়া নিত্য প্রণাম বন্দনা ও প্রার্থনা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন।

—"চৈতন্যবল্লভা তুমি জগত ঈশ্বরী।
তোমার দাসের দাস হৈতে বাঞ্ছা করি।
তোমার দাসের দাস হৈতে মুক্তি চাই।
সেই সে আমার ওগো জানিহ বড়াই॥ বংশীশিক্ষা।

এখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল—বৈষ্ণববৃন্দ বিদায় হইলে পুনরায় অন্তঃপুর-দ্বার রুদ্ধ হইল। সখিগণ ও দাসীগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভা জপ-মালা হস্তে ভজন-মন্দিরের দ্বারে আসিয়া বসিলেন। সখি-কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার সঙ্গেই আছেন। তিন জনেরই হস্তে জপমালা—নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া স্ব স্ব সংখ্যানাম জপে মগ্না তিন জনেই।

গৌরবল্লভা প্রিয়াজি তাঁহার সংখ্যানাম জপ শেষ করিয়া তবে দেহধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার জপসিদ্ধ অর্দ্ধেক মুষ্টি তণ্ডুলের প্রসাদ পাইবেন—আজ দুই দিন তিনি উপবাসী,—তাহাতে তাঁহার ভ্রুক্ষেপও নাই। মর্ম্মী সখিদ্বয়ও এখন পর্য্যন্ত উপবাসী—কেহ কাহারও বদন পানে চাহিতে পারিতেছেন না—অবনত বদনে বসিয়া একাগ্রভাবে সকলেই সংখ্যানাম জপে মগ্না। রাত্রি প্রহরেক

হইল—তখন তাঁহাদের সংখ্যানাম জপ পূর্ণ হইল—তখন তাঁহারা অন্তঃপুরে গিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইলেন। অন্যান্য সখিগণ ও দাসীবৃন্দও তখন পর্য্যন্ত উপবাসী ছিলেন। বহির্বাটীর বৈষ্ণবত্রয়—বৃদ্ধ ঈশান, পণ্ডিত দামোদর ও ঠাকুর বংশীবদন, প্রিয়াজি যে প্রসাদ পান নাই—ইহা তাঁহারা কেহই জানিতেন না—জানিলে পঙ্গতে বৈষ্ণবগণের সহিত তাঁহারা প্রসাদ পাইতে বসিতেন না। পঙ্গতের বৈষ্ণববৃন্দও এ সংবাদ জানেন না। জানিলে তাঁহারা প্রিয়াজির অগ্রে কখন প্রসাদ পাইতেন না। তবে কৃপাময়ী গৌর-বল্লভা তাঁহার অনুগত নিজজনকে তাঁহার প্রসাদে সে দিন বঞ্চিত করেন নাই। গৌর-বিরহিণী গৌর-বল্লভা প্রসাদ পাইয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় সহ ভজন-মন্দিরে পুনরায় প্রবেশ করিলেন—তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। অতঃপর অন্তঃপুরের অন্যান্য সখিগণ ও দাসীগণ প্রসাদ পাইলেন।

গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর "পহিলহি-মাঘের" দুর্দ্দিনের স্মৃতি-মহোৎসবের পূর্ণকুম্ভ এবং ভোজ্য এখনও বাকি আছে। প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন। যেন কিছু বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। সর্ব্বজ্ঞা সখি কাঞ্চনা সকলি জানেন ও বুঝেন—তিনিও কোন কথা কহিতেছেন না—তিনি লীলাময়ীর লীলারঙ্গ লক্ষ্য করিতেছেন। কিছু ক্ষণের পর বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মনের কথাটী আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি সখি কাঞ্চনার প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনের একটী কথা আমাকে সখি অমিতা শুনায় নাই—সেই জন্য আমার সেই দুর্দ্দিনের স্মৃতি-মহোৎসব-যজ্ঞ অপূর্ণ রহিয়াছে। সেইটিই এই যজ্ঞ সমাপনের পূর্ণ-কুম্ভ—তুমি সখি আজ এখন সেই দুর্দ্দিনের গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের পূর্ণ-কুম্ভ ও ভোজ্য দানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমার বার্ষিকী ব্রত সাঙ্গ কর।"

এই বলিয়া গৌর-বল্লভা তাঁহার মলিন বদনখানি অবনত করিয়া ঝরঝর নয়নে অবিরত ঝুরিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বুঝিয়াছেন—সে কথাটি কি, আর অমিতা কেন যে সেই বিষম কথাটি পূর্ব্বে চাপিয়া গিয়াছেন,—তাহা ত প্রিয়াজি জানেন। এখন সখি কাঞ্চনা মহা বিপদে পড়িলেন। কিন্তু তিনি জানেন প্রিয়াজি ছাড়িবার পাত্রী নহেন—স্বতন্ত্রা ও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সখি কাঞ্চনা অবনত বদনে তাঁহার বাম হস্তের নখ দক্ষিণ হস্তের নখ দ্বারা খুঁটিতে খুঁটিতে সকরুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"প্রিয় সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! সে কথায় এখন আর কাজ কি? সখি অমিতা সে মর্ম্মান্তিক কথাটি তোমাকে বলিতে পারে নাই—আমার প্রতি তোমার এ কি বিষম করুণা যে, আমার পোড়া মুখ দিয়া তুমি সেই প্রাণঘাতী বিষম কথাটীর রসাস্বাদন করিবে? সে যে বড় ভীষণ কথা—মহাজনগণ অতিশয় সাবধানতার সহিত তোমার সেই দুর্দ্দিনের কথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কবিকর্ণপুর গোস্বামী সেই প্রাণঘাতী কথাটির তোমারই শ্রীমুখে একটু টুঙ্কার দিয়াছেন,—সেই পদটী তুমি শুনিতে চাও ত বলি—কিন্তু দেখ সখি! তোমাকে লইয়া যেন আবার আমরা কোন নূতন বিপদে না পড়ি! আমাদের পক্ষে তোমার আদেশই বলবান"। এই বলিয়া সাহসে ভর করিয়া সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজীর উক্তি সেই মহাজনী পদটীর ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"আমা লাগি প্রভু মোর করিল সন্ন্যাস।
ফিরিয়া যদ্যপি আইলা অদ্বৈতের বাস॥
স্ত্রীপুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবতী যুবক।
দেখিতে আনন্দে ধাঞা চলে সব লোক॥
কোন অপরাধ কৈনু মুঞি অভাগিনী।
দেখিতেও অধিকার না ধরে পাপিনী॥
প্রভুর রমণী যদি না করিত বিধি।
তথাপি পাইতু দেখা প্রভু গুণনিধি॥"

চৈঃ চঃ নাটক।

বিরহিণী প্রিয়াজি অত্যন্ত ধীরভাবে স্থিরচিত্তে গানটি শুনিলেন—সখি অমিতা অধোবদনে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া আছেন—তাঁহার নয়নের দরদরিত বারিধারায় ভূমিতল সিক্ত করিতেছে—গৌর-বল্লভার নয়নে জলবিন্দু নাই—তাঁহার এখন স্তম্ভভাব—পলকবিহীন উদাস নয়নে সখি কাঞ্চনার প্রতি তিনি চাহিয়া আছেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির এরূপ স্তম্ভভাব দেখিয়া আজ বড়ই

ভূত হইয়াছেন। গানটী শেষ হওয়ার পর দুই দণ্ড কাল আর কোন কথা নাই। গৌর বিরহিণীত্রয় নীরবে নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে নিশীথে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া গৌরবিরহসাগরে মগ্ন আছেন। এই ভাবে যে কতক্ষণ গেল তাহার ঠিকানা নাই।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন শ্রীনিতাই-চাঁদকে শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে তাঁহার বৃদ্ধা জননী ও নদীয়ার ভক্তগণকে শান্তিপুরে আনিতে প্রেরণ করেন, তখন নবীন সন্ন্যাসীঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কানে কানে একটী গুপ্ত কথা বলিয়া দিয়াছিলেন—সেই কথাটি এই—"সকলকে আনিবে—একজন ছাড়া—তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া"—এই আদেশ পালন করিতে অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহার প্রাণান্ত হইয়াছিল। সেই কথাটী অমিতা চাপিয়া গিয়াছিলেন—এখন প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার মুখ দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইলেন। সন্ন্যাসীপ্রাণবল্লভের এই কঠিন আদেশ শ্রবণে নবীনা প্রিয়াজির তৎকালে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ঠাকুর লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন—যথা,—

"বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশুপক্ষী তরুলতা এ পাষাণ ঝুরে॥"

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

এই প্রাণঘাতী দৃশ্য দেখিয়া—

শচী দেবী সম্মুখে দাঁড়াতে নারে থিয়া।
দাঁড়াইলা দু'জনার দু'বাহু ধরিয়া॥ চৈঃ মঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

—"শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম-বন্ধ যায় নাশ॥—"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

পুনশ্চ লিখিয়াছেন—

—"মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন॥" ঐ

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি এখন পর্য্যন্ত সেই একই অবস্থায় আছেন—তাঁহার সেই অপূর্ব্ব স্তম্ভ ভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই। সখিদ্বয় বিষম বিপদে পড়িয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াবল্লভের শ্রীচরণকমল স্মরণ করিলেন। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

যথারাগ।

"এস বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ হে।
এস অদ্বৈতের আনা-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে॥
এস নিত্যানন্দের সর্ব্বস্বধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে।
এস গদাধরের প্রাণবঁধুয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হে॥
এস নরহরির-চিত্ত-চোরা শ্রীগৌরাঙ্গ হে।
এস শচীমার দুলালিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হে॥
এস নাগরী-মন-মোহনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হে।
এস নদেবাসীর প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে॥"—

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে গভীর নিশীথে যখন এই গৌরাবাহনের সকরুণ প্রেমাকুল কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিল—নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর তখন আসন টলিল। তিনিও সেখানে রাধাভাবে কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিতেছিলেন—তিনিও সেই নীলাচলের নির্জ্জন গম্ভীরা-মন্দিরে গভীর নিশীথে একাকী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে গুণ গুণ করুণ ক্রন্দনের সুরে গাহিতেছেন—

যথারাগে।

—"জনম গোঙানু দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশা পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কুলে দিনু তিলাঞ্জলি, গুরু দিঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভালমন্দ নাহি জানে, পরমুখে যেবা শুনে,
সেইত অনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয়, প্রেম কি অনল হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥"

পদ-সমুদ্র।

এই ভাবে তিনি একাকী নির্জ্জনে কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন—এমন সময়ে তাঁহার কর্ণে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা মন্দিরের আকুল প্রেমাহ্বান-গীত-ধ্বনি প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভাবের বিপর্য্যয় সংঘটন করিল। তিনি ছিলেন রাধা-ভাবে বিভাবিত—এক্ষণে তাঁহার মনে অকস্মাৎ স্ব-স্বরূপের ভাবোদ্দীপনা হইল—তিনি ছিলেন রাধাভাবাঢ্য গৌরাঙ্গ,—এখন হইলেন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ নাগর গৌরাঙ্গ। তাঁহার স্বরূপশক্তি বৃষভানুনন্দিনীর বিশিষ্টাবির্ভাব সনাতননন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা তখন তাঁহার অকস্মাৎ মনে পড়িল,—সেই "পহিলহি মাঘের" দারুণ দুর্দ্দিনের কথা মনে পড়িল,—সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর নদীয়া-নাগর গৌরসুন্দরের স্বরূপশক্তির গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির ফলে ন্যাসীচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর এই ভাববিপর্য্যয় সংঘটিত হইল—স্বরূপশক্তির বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ের প্রবল প্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয়—অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান হয়—অশাস্ত্র শাস্ত্র হয়—অবিধি বিধিরূপে বলবান হয়। নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দির ছাড়িয়া তাঁহার ভাব ও বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্ব-স্বরূপে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নদীয়ার গম্ভীরা-মন্দিরে আসিতে হইল। এমনি স্বরূপশক্তির প্রবল আকর্ষণ—এমনিই তাঁহার প্রেমের প্রবল প্রভাব।

সেই গভীর নিশাথে নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে নদীয়া নাগরবেশে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব হইল—তাঁহার সেই সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কের উপরে স্বর্ণ নূপুরপরা ভববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-লালিত-পাদপঙ্কজ"দ্বয় ঝুলাইয়া মৃদু মধুর হাস্যবদনে তিনি যেন আসিয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। কস্তুরী কুঙ্কুমগন্ধে ভজন-মন্দির আমোদিত হইল। তাঁহার গলায় মালতী ফুলের মালা,—চরণে সোনার নূপুর,—পরিধানে কৃষ্ণকেলি সূক্ষ্ম পট্টধুতি—বক্ষে স্বর্ণহার—হস্তে অঙ্গদ বলয়—মস্তকে উর্দ্ধীকৃত কুন্তলবদ্ধ মনোহর মল্লিকার মালাবেষ্টিত,—তাঁহার যেন অপূর্ব্ব নটবর-নাগর-নৃত্যাবেশ।

শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদশ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতগ্রন্থে এই অপরূপ রূপটি ধ্যাননেত্রে দর্শন করিয়া অতি উত্তমরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সেই উত্তম শ্লোকটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

—"কোঽয়ং পট্ট-ধটী-বিরাজিত কটিদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়োর্বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
উর্দ্ধীকৃত্য নিবদ্ধ কুন্তল ভর প্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা-
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌর-নাগরবরো নৃত্যতিরিজৈর্নামভিঃ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার আদি করচালেখক শ্রীপাদ মুরারি গুপ্ত ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার সুপ্রাচীন করচায় লিখিয়াছেন—

—"সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমৈ-
ররাজ রাজদ্বর হেম গৌরঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-লালিত-পাদ-পঙ্কজো
রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্র মৌলি॥"—

মুরারি গুপ্তের করচা।

ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর স্ব-স্বরূপ—আর এই স্ব-স্বরূপেই তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর ভজন-মন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। তিনি এই রসরাজ গৌর-গোবিন্দস্বরূপেই তাঁহার স্বরূপ-শক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নদীয়ার নিত্য লীলা-রঙ্গ করেন।

এই যে শ্রীভগবত-আবির্ভাব ইহা ক্ষণিকের জন্য—মেঘ-মালার মধ্যে বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় এই শ্রীভগবত-আবির্ভাব সাধকের দিব্য চক্ষে প্রতিভাত হইয়া তাঁহার সাধনার ফল দান করেন। সাধনরাজ্যে মন্ত্রশক্তি বলবতী করিয়া প্রিয়তমের প্রীতি বর্দ্ধন পূর্ব্বক তিনি অদৃশ্য হন।

গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এযাবৎকাল স্তব্ধভাবেই আসনে উপবিষ্ট ছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভ তাঁহারই শয়ন-মন্দিরের পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট—তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবামাত্র আর তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইলেন না। তিনি হতাশ নয়নে শয়নকক্ষের ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন,—আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পর্য্যঙ্কের উপরি হাত বুলাইতে লাগিলেন—এই সময়ে ঠাকুর মন্দিরের ঘৃতের দীপটি হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইল। সখি কাঞ্চনার মনে বিরহিণী গৌর-বল্লভার "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনের পূর্ব্ব-স্মৃতি কথাগুলি উদ্দীপনা হইল—তিনি প্রিয়াজির একান্ত অন্তরঙ্গা সখি—তাঁহার মনে যে ভাবটী উঠিয়াছে—বিরহিণী প্রিয়াজির মনেও সেই ভাবটি উত্থিত হইয়াছে। সখি কাঞ্চনা সেই অন্ধকারেই ঠাকুর লোচন দাসের একটী পদের ধুয়া ধরিলেন।

রাগ—সিন্ধুড়া।

"এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া, পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শিরে করে করাঘাত ॥
এ মোর প্রভুর, সোনার নূপুর, গলায় মোহন হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া, জীতে না পারিব আর ॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী, জাগিব প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া, প্রভু গেল পলাইয়া ॥"

এদিকে সখি অমিতা,—

"তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতিউতি,
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাঞা"—

বিরহিণী প্রিয়াজি যেন সেই "পহিলহি মাঘে"র দুর্দ্দিনের ঘটনাগুলি দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন—আর শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতেছেন। সেই প্রাণঘাতী করুণ-দৃশ্য—

——"বিষ্ণুপ্রিয়া বধুসনে, পড়িয়া বহিরাঙ্গনে,
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া"——

সেই শাশুড়ী-বধুর সকরুণ রোদন-ধ্বনি এবং প্রতিবেশী-গণের মহোদ্বেগে দৌড়াদৌড়ি—

"দুহের রোদন-ধ্বনি শুনিয়া সকলে।
ব্যস্ত হয়ে শচীগৃহে দৌড়াদৌড়ি চলে ॥
শচীগৃহে যাঞা সবে করেন শ্রবণ।
অলক্ষিতে পলায়েছে শচীর নন্দন ॥"

বংশী-শিক্ষা।

এই হৃদিবিদারক দৃশ্য সকল যেন গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। তিনি তখন অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন—

"পরিজন পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥"

তখনকার শাশুড়ী-বধুর অবস্থাটি একবার মনে মনে ধ্যান করুন, আর প্রাণ ভরিয়া কাঁদুন,—

—"অবয়ব আছে প্রাণ গেলত ছাড়িয়া।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভূমিতে লোঠাঞা ॥
শচীদেবী কান্দে ডাকে নিমাই বলিয়া।
আগুনে পুড়িল যেন ধক্ ধক্ হিয়া ॥"

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল।

—"শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া"।

এদিকে—

"বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উনমত চিত ॥
বসন সম্বরে নাহি, না বান্ধয়ে চুলি।
হা কান্দ কান্দনা কান্দে উন্মতি পাগলী" ॥

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

বিরহিণী প্রিয়াজি অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতলে পড়িয়া প্রাণঘাতী আর্ত্তনাদ করিতেছেন কি বলিয়া তাহাও ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার শ্রীগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—

—"প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া।
জ্বালহ আগুনি আমি মরিব পুড়িয়া ॥
গুণ বিনাইতে নারে মরয়ে সরমে।
সবে এক বোলে দেবী এই ছিল করমে ॥
অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুণ।
এখনে সকল সেই ভৈগেল আগুন ॥
রহস্য-বিনোদ-কথা কহিবারে নারে।
হিয়ার পোড়নি পোড়ে অতি আর্ত্তস্বরে ॥"

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

পুত্রশোকাতুরা দুখিনী বৃদ্ধা শচীমাতা কি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন—তাহাও শ্রবণ করুন,—যথা—

—"শূন্য হৈল দশ দিগ্ অন্ধকারময়।
কেমনে বঞ্চিব মুঞি ঘর ঘোরময় ॥
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘর করণ।
বিষ যেন লাগে ইষ্ট কুটুম্ব বচন ॥
মা বলিয়া আর মোরে না ডাকিবে কেহো।
আমাকে নাহিক যম পাসরিল সেহো ॥
কিবা দুখ পাই পুত্র ছাড়িলা আমারে।
হাপুতি করিয়া পুত্র গেলা কোথাকারে ॥
হায়! হায়! নিদারুণ নিমাই হইয়া।
কোন্ দেশে গেলা পুত্র কে দিবে আনিয়া ॥
বুক ফাটে তোমার বাপ্ সোঙরি মাধুরী।
মা বলিয়া আর না ডাকিব গৌরহরি ॥
অনাথিনী করিয়া কোথায় গেলে বাপ্।
মনে ছিল জননীরে দিব আমি তাপ ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র ইহাই শিখিলা।
অনাথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা ॥

কোথা বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি পলাইয়া গেলা।
ভকত জনার প্রেম কিছু না গণিলা॥
শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের নিত্য পার্ষদগণ তাঁহার সন্ন্যাস-লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পদাবলী রচনা করিয়া গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গপার্ষদ ভক্ত বাসুদেব ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষ প্রিয়াজির সখির উক্তি একটী পদে কি বলিতেছেন তাহাও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—

রাগ—পাহিড়া।

—"অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়া গুণ সোঙরিয়া,
মুরছি পড়ল ক্ষিতি তলে।
চৌদিকে সখিগণ, ঘিরি করে রোদন,
তুলা ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে, অন্তর জর জর,
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়া নিবাসী যত, তারা ভেল মুরছিত,
না দেখিয়া তুয়া মুখ খানি॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণ ছাড়া,
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গী গণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ,
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া॥
যত সহচর তোর, সবাই বিরহে ভোর,
শ্বাস বহে দরশন আশে।
ফেদে হে রসিকবর, চলহ নদীয়াপুর,
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥"
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

নদীয়ায় মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে নির্জ্জনে নিশীথে গৌর-বিরহিণীত্রয় এই ভাবে "পহিলহি মাঘের" দুর্দ্দিনের গৌর-বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসবের শেষাঙ্ক অভিনয় শেষ করিলেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার ভজন-মন্দিরের ভূমিতলে পড়িয়া এমনও আর্ত্তনাদ করিতেছেন,—সখিদ্বয় তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন। গৌর-বিরহিণীত্রয়ের নয়নজলে সেখানে প্রেমনদী বহিতেছে। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে—এখনও গৌর-বিরহ-রসার্ণবের উচ্ছসিত প্রেমতরঙ্গাবলীর উদ্দাম নৃত্যের অবসান নাই,—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী ও তাঁহার সখিগণের পক্ষে "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"—তাঁহারা দেহানুসন্ধানশূন্যা মহাতপস্বিনী এবং মহাসংযমী—তাঁহাদের পক্ষে রাত্রিকালও জাগরণের সময়। তপস্বিনী ও সংযমী তপস্যা ও সংযমাগ্নির তাপে চির জাগ্রত। তাঁহাদিগের প্রাণে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন-রূপ মহান্ তপস্যার হোমানল সর্ব্বক্ষণ প্রজ্জ্বলিত—এই হোমানলই গৌর-বিরহানল। অবসাদ ও জড়তা—এই বিরহানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার সখিদ্বয় গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনরূপ কঠোর তপস্যাবলে চির-জাগ্রত ও চিরপ্রবুদ্ধ—তাঁহাদের দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইলেও তাঁহাদের ভিতরে প্রজ্ঞার বিদ্যুৎ চমকায়—অন্তরে নিত্যবুদ্ধ ও শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ হয়। নিদ্রা জীবের স্বাভাবিক নিত্যক্রিয়া—কিন্তু গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার সখিগণ কঠোর তপস্যার দ্বারা নিদ্রা-হারবিজয়ী হইয়াছেন। সাধন-জগতে যিনি যত বড় হইয়াছেন তাঁহার অন্তরে তত অধিক ভগবত বিরহতাপ সঞ্চিত আছে—এই তাপাধিক্যের জন্যই তিনি চির জাগ্রত, চির প্রবুদ্ধ। বিরহিণী গৌর-বল্লভার হৃদয়ে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তাপরাশি পুঞ্জীকৃত করিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভ সেই তাপাগ্নির স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর আলোকে তাঁহার সহিত অপূর্ব্ব লুকোচুরী লীলারঙ্গ করিতেছেন। এই যে লীলারঙ্গ—এই যে অপূর্ব্ব লুকোচুরী খেলা—ইহার মর্ম্ম তপস্বী ও তপস্বিনীগণই জানেন—আর জানেন সেই লীলা-পুরুষোত্তম—যাঁহার অনির্ব্বচনীয় এবং পরমাশ্চর্য্য অশ্রুতপূর্ব্ব বিরহলীলারঙ্গ-কাহিনী তপ্তইক্ষুচর্ব্বনবৎ পরমাস্বাদ্য বোধে তাঁহার একনিষ্ঠ পার্ষদ দাসদাসী ও ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করেন।

গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এক্ষণে আপনা আপনিই আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন—মর্ম্মী সখিদ্বয় নিকটেই বসিয়া আছেন—দুই দিন দুই রাত্রিকাল সমভাবে গৌর-বল্লভার সেই "পহিলহি মাঘের" স্মৃতি-মহোৎসব যেরূপ কঠোরতার সহিত সুসম্পন্ন হইল, তাহা গৌরশূন্য গৌরগৃহের দাসদাসীগণ এবং বাহিরবাটীস্থ তিন মূর্ত্তি বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারিলেন না—গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ নদীয়াবাসী কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত—যাঁহারা নিত্য গৌর-শূন্য গৌর

গৃহের বহির্দ্বারে প্রভুপ্রিয়াজির কণিকা প্রসাদের আশায়-ধন্না দিয়া বসিয়া থাকেন—তাঁহারাও এই মহামহোৎসবের ব্যাপারটি কিছু কিছু জানিতে পারিলেন।

বিরহিণী প্রিয়াজির ভাব এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তাঁহার বদন প্রসন্ন—নয়নদ্বয় প্রশান্ত—এখন আর বদনে হা হুতাশ নাই। তিনি এক্ষণে মর্ম্মী সখীদ্বয়ের সহিত দু'টি প্রাণের কথা প্রাণ খুলিয়া কহিতেছেন। সখিদ্বয়ের মনে ইহাতেই পরম আনন্দ। গৌর-বল্লভা আজ অতি প্রসন্নমনে কহিলেন—

যথারাগ।

"আজু রজনী হাম, ভাগ্যে পোহাইনু,
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানিনু,
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানিনু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল কুল, অবলাস ভাকই,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব, লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব সো না যবহুঁ, মোহে পরি হোয়ত,
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপভাগি নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।"— পদকল্পতরু।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর এরূপ আবির্ভাব নদীয়ার মহা-গম্ভীরা মন্দিরে পূর্ব্বে অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু তখন বিরহিণী প্রিয়াজির ভাব ছিল স্বতন্ত্র। মর্ম্মী সখিদ্বয় প্রিয়াজির অন্তরের এই অপূর্ব্ব ভাববিপর্য্যয় দেখিয়া প্রেমা-নন্দে আত্মহারা হইয়াছেন। সখি কাঞ্চনার মনে আর একটী বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদের ভাব উদয় হইল—তিনি তাঁহার কলকণ্ঠে সেই অপূর্ব্ব যুগলামলনের গানটী গাহিলেন—

যথারাগ।

—"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহা নিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥
শীতের উড়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরীয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি।"—পদকল্পতরু।

বিরহিণী প্রিয়াজির আজ অপূর্ব্ব ভাব—ক্ষণমাত্র প্রাণ-বল্লভের দর্শন লাভেই আজ যেন তাঁহার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ হইয়াছে—যেন তাঁহার চিরজীবনে পুঞ্জীকৃত সমস্ত দুঃখরাশি ক্ষণমাত্র কে আসিয়া চিরদিনের জন্য হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে—আজ যেন তাঁহার আর গৌর-বিরহ-তাপের লেষাভাস মাত্রও নাই। এত বড় অত্যদ্ভুত কাণ্ড কিরূপে ক্ষণমাত্রে সংঘটিত হইল—মর্ম্মী সখিদ্বয় ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীবদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় সখির বদনচন্দ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে—তাঁহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিয়াছে—গৌরবল্লভার অন্তর বাহিরে যেন একটা প্রবল প্রেমানন্দের স্রোত প্রকাশিত হইতেছে।

রাত্রি শেষ হইয়াছে—মাঘের দারুণ শীতে পশুপক্ষীকুল পর্য্যন্ত যেন নিতান্ত কাতর—তাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠরব মাত্র শ্রুত হইতেছে—প্রভাতী কীর্ত্তনের দল তখন গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। সখি কাঞ্চনা সাহসে ভর করিয়া প্রিয়াজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয়-সখি! আজ তোমাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণে আনন্দের তুফান উঠিয়াছে—একটী গান করি শ্রবণ কর।" গৌর-বল্লভা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "সখি কাঞ্চনে! আমার প্রাণবল্লভের নদীয়া-বিহারের গান কর।" তখন সখি কাঞ্চনা কলকণ্ঠে প্রভাতী কীর্ত্তনের সুরে গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"নিশি হ'ল ভোর, উঠিল গৌর,
কুসুম-শয়ন ছাড়ি।

বিষ্ণুপ্রিয়ারে, জাগাইল,
অঙ্গ পরশ করি ॥
কাঞ্চনা অমিতা, প্রিয় সখি যত,
মিলিল আঙ্গিনা মাঝে।
নদীয়া-যুগলে, মঙ্গল আরতি,
করিতে সকলে সাজে ॥
আইলা মালিনী, সীতা ঠাকুরাণী,
সর্ব্বজয়াকে ল'য়ে।
শচীমাতা আসি, সম্ভাষিলা সবে,
মধুভাষে কথা ক'য়ে ॥
শুভ শঙ্খ বাজে, হুলু হুলু ধ্বনি,
ঘৃত মধু ধূপ দীপে।
নদীয়া-নাগরী, করিলা আরতি,
যুগলে নদীয়া-ভূপে ॥
অগুরু চন্দনে, ভূষিলা শ্রীঅঙ্গে,
বরষি কুসুম রাশি।
নিরখি নয়নে, যুগল মাধুরী,
সবে বলে হাসি হাসি।
(ওহে) বিষ্ণুপ্রিয়ার, প্রাণ বল্লভ,
উঠ উঠ বেলা হ'ল।
নদীয়ার লোক, জাগিয়া উঠিল,
চারিদিকে কোলাহল।
কত সখি কত, বলিতে লাগিল,
উপজিল কত হাসি।
দূরে থেকে দেখে, যুগল আরতি,
অভাগিয়া হরিদাসী ॥"—
অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-মনন-পদ্ধতি।

—গান শুনিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা আজ বহুদিন পরে অকপটে মৃদুমন্দ হাসিলেন—সে হাসির ভাব বড়ই মধুর—সখিগণের বড়ই চিত্তাকর্ষক। কোন ভাগ্যবতী দাসী আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রিয়াজির এই অপূর্ব্ব ভাবসম্পত্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রেমানন্দে গাইতে লাগিলেন—

"—জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি ॥"—
বিষ্ণুপ্রিয়ার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ।
১২ই ফাল্গুন ৩৭।
মঙ্গলবার শেষরাত্রি।

(২১)

—"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং **স্বভক্তিশ্রিয়ম্**।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥
বিদগ্ধমাধব নাটক।

পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামীপাদের বিরচিত উক্ত পুণ্য-শ্লোকে যে "স্বভক্তিশ্রিয়ম্" সর্ব্বতত্ত্বসার নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ গোস্বামীমত প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যাখ্যা নানা মুনি নানাবিধ করেন। নানা মুনির নানা মত জানিবার গৌরভক্তের কোন প্রয়োজন নাই,—সাধক গৌরভক্তের ভজনবিদ্যা গুরুমুখী—সেই বিদ্যাই তাঁহার পরা বিদ্যা—শ্রীগুর্ব্বানুগত্যে ভক্তিলাভই পরম সম্পদ—আর এই ভক্তি-সম্পত্তিই গৌরকৃষ্ণ প্রাপ্তির পরমোপায়।

এই যে "স্বভক্তিশ্রিয়ম্" বাক্যদ্বয় উক্ত পুণ্য শ্লোকটিতে সুনিপুণতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন—ইনি কে? ইনি শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র নিজ পার্ষদ,—শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরিপূর্ণ কৃপাশক্তি এই পরম পূজ্যপাদ মহাপুরুষের ভিতর সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় মত প্রচার করিয়াছেন। অতএব গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীরূপানুগত্যেই ভজন সাধন করেন। উপরি উক্ত শ্লোকটীর রচয়িতা পূজ্যপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ।

এই "স্বভক্তিশ্রিয়ং" বাক্যদ্বয়ে পূজ্যপাদ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ গৌরসুন্দরের **নিজবিষয়ক** ভক্তিসম্পত্তির কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ এইটি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের স্ব-স্বরূপের বন্দন-শ্লোক। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই পুণ্যশ্লোকে তাঁহার আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। "**শচীনন্দন গৌরহরি**" কৃপাপূর্ব্বক সকল জীবের হৃদয়-কন্দরে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন—ইহাই জীব জগতের প্রতি পরমপূজ্যপাদ গ্রন্থকারের পরম কল্যাণময়ী

আশীর্ব্বাদ বাণী। ইহাতে শচীনন্দন গৌরহরির নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের কোন কথাই নাই। কারণ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে তিনি জীবকে যাহা দেন নাই—এমন একটী "অনর্পিতচরী" পরম দুর্লভ বস্তু অবিচারে জগজ্জীবকে দিবার নিমিত্তই তিনি শ্রীগৌরস্বরূপে পরম কৃপা পরবশ হইয়া কলিযুগে ভক্তি-ব্রজ শ্রীধামনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। উন্নতোজ্জল রসমাধুর্য্যমিশ্রিত মূর্ত্ত স্বীয় ভক্তিসম্পত্তিই প্রেমভক্তিস্বরূপিণী তাঁহার স্বরূপশক্তি সনাতননন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া। এই "স্বভক্তিশ্রিয়ং" পরম দুর্লভ বস্তু—পরম নিগূঢ়-তত্ত্ব—পরমোপাস্য ও পরম সাধ্য বস্তু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব তিনযুগে ভক্তি "সাধন" ছিলেন—এই 'প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার' পুণ্য কলিযুগে "স্বভক্তিশ্রিয়ং" সাধ্যবস্তুরূপে নির্ণীত হইয়াছেন।—এই সিদ্ধান্ত স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের নিজ-শক্তিসম্পন্ন তাঁহার পরম কৃপাসিদ্ধ পার্ষদ মহাজন শ্রীগোস্বামিপাদগণের লিখিত প্রত্যেক ভক্তিগ্রন্থাবলীতে উট্টঙ্কিত রহিয়াছে। যাঁহার শাস্ত্রদৃষ্টি অতি উদার এবং সূক্ষ্ম—বিশুদ্ধ ভগবতভাবে যিনি চক্ষুষ্মান—যাঁহার প্রাণ একান্ত গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ এবং যিনি মূর্ত্ত প্রেমভক্তিস্বরূপিণী সনাতননন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আনুগত্যস্বীকারপ্রার্থী—তিনিই এই সকল প্রচ্ছন্ন ও নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তসকল এবং কলির প্রচ্ছন্ন অবতারীর প্রচ্ছন্ন লীলারহস্য সকল অনুভব করিতে সমর্থ—এবং তাঁহারই অনুভব "বিদ্বদনুভব" পদবাচ্য।

এই যে "স্বভক্তিশ্রিয়ং" ইহা স্বয়ংভগবান শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিজবিষয়ক ভক্তি,—স্ব-সম্বন্ধীয় প্রেমভক্তি। পূর্ব্ব যুগে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে—বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের "স্বভক্তিশ্রিয়ং" ছিলেন, তদ্রূপ এই কলিযুগে সনাতন-নন্দিনী-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের "স্বভক্তিশ্রিয়ং" উভয়েই সর্ব্বাবতারী স্বয়ংভগবানের স্বরূপশক্তি—উভয়েই পরম সাধ্য বস্তু। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ শ্রীরাধাদাস্য ব্যতিত অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই—একথা তিনি তাঁহার স্বরচিত শ্লোকে স্বমুখেই প্রকাশ করিয়া জগজ্জীবকে পরম ও চরম তত্ত্ব শ্রীরাধাদাস্যে নিয়োজিত করিবার জন্য স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সেই পুণ্য শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

—"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিনাপি"—

অর্থ—হে বরুরু রাধে। অমৃত সমুদ্রময় আশা প্রাচুর্য্যে আমি অতি কষ্টে কালাতিপাত করিয়াছি। এখন যদি তুমি আমার প্রতি কৃপা বিধান না কর, তাহা হইলে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমন কি কৃষ্ণে কি প্রয়োজন?

এরূপ পরম পরতত্ত্ব এবং পরাশক্তি শ্রীরাধানিষ্ঠা এবং রাধা-দাস্য-প্রিয়তার কথা একমাত্র পূজ্যপাদ দাসগোস্বামীর শ্রীমুখেই শোভা পায়। রাধাদাস্যকেই তিনি পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন। (১) সুতরাং এই কলিযুগে গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শক্তি-শক্তিমত্তত্ত্বের অভেদাত্মক পরতত্ত্ব এবং তদ্ভাবে কলিজীবের পরমোপাস্য ও পরম সাধ্য বস্তু।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় এসম্বন্ধে কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন,—

—"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ যার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি ভেদাভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

ভগবৎ সন্দর্ভে (১১৮) লিখিত আছে ভগবচ্ছক্তি দুই রূপে অবস্থিত—কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত আর শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রাধা হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ—পূর্ণতমা হ্লাদিনী (অমূর্ত্তা) শক্তির পূর্ণতমা অধিষ্ঠাত্রী। তিনি যে কেবল হ্লাদিনী শক্তির অধিষ্ঠাত্রী, একথা বলিলে তাঁহার পরিপূর্ণমহিমা প্রকাশ

(১) আর একটী অনুরূপ শ্লোক শ্রীপাট শ্রীখণ্ডনিবাসী ঠাকুর নরহরি সরকারপরিবার সিদ্ধ মহাত্মা পরম গৌরভক্তচূড়ামণি শ্রীল সর্ব্বানন্দ ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-অষ্টকের প্রথমেই লিখিয়াছেন—যথা—

—"যা শক্তির্হি যুগে যুগে ভগবতঃ কেলিপ্রদা প্রেমদা
সা শক্তির্বিজুনক্তি ন প্রিয়বরে কুত্রাপি কেনাপি বা।
সর্ব্বেষাং পরদেবা গৌরৈকনামাশ্রিতা
সা গৌরাঙ্গময়ী মহীমুপগতা বর্ব্বর্ত্তি বিষ্ণুপ্রিয়া।"—

পায় না—সন্ধিনী এবং সম্বিৎশক্তিও তাঁহারই অপেক্ষা রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ হইলেও তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি সমুৎসুক। হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ ত্রিবিধ চিচ্ছক্তিই তাঁহার আনন্দ আস্বাদনের মুখ্য হেতু। সন্ধিনী সম্বিৎ তাহার আনুকুল্য করে। সন্ধিনী ও সম্বিৎ শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ-আস্বাদন করাইবার জন্য চেষ্টিত—কিন্তু হ্লাদিনীর আনুকুল্য ব্যতিত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করিতে পারে না—তাঁহারা হ্লাদিনীর অপেক্ষা রাখেন। সুতরাং ত্রিবিধা চিচ্ছক্তির মধ্যে হ্লাদিনীকেই সর্ব্বশক্তিগরীয়সী বলা যায়—আবার সেই কারণেই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীরাধাকেও সর্ব্ববিধ শক্তির প্রধানতমা অধিষ্ঠাত্রী বলা যায় এবং এই জন্যই তিনি পরিপূর্ণ শক্তি।

সর্ব্ববিধ শক্তির পূর্ণতম অধিকারী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পূর্ণ শক্তিমান। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববিধা শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনি পূর্ণ শক্তিমান। সর্ব্ব শক্তিগরীয়সী শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।

শক্তির প্রভাবেই স্বরূপের অভিব্যক্তি।

একই কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় থাকেন, তখন তিনি পূর্ণতর, আর যখন ব্রজে থাকেন, তখন তিনি পূর্ণতম। ইহার কারণ এই যে দ্বারকায় মহিষীবৃন্দ পূর্ণতরা শক্তি, আর ব্রজে শ্রীরাধা পূর্ণতমা শক্তি। শ্রীরাধার প্রভাবেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের পূর্ণতম বিকাশ—এইজন্য শ্রীরাধার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শক্তিশক্তি মত্তত্ব সম্বন্ধে এই সকল তত্ত্বকথাগুলি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে সম্যক প্রযুজ্য। কারণ যেমন শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব, তদ্রূপ তাঁহাদিগের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়াও অদ্বয়তত্ত্ব (১)। শক্তির প্রভাবেই স্বরূপের অভিব্যক্তি, অতএব শক্তির প্রাধান্য শাস্ত্রযুক্তিসম্মত। সর্ব্বশক্তি-গরীয়সী সনাতননন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রাণবল্লভ বলিয়াই শচীনন্দন গৌরহরি পূর্ণশক্তিমান। অতএব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদাস্য সর্ব্বতোভাবে কলিহত জীবের প্রার্থনীয় এবং তাঁহার আনুগত্যে শ্রীগৌর-গোবিন্দ-ভজন অবশ্য কর্ত্তব্য। অকরণে প্রত্যবায় আছে।

শক্তির প্রাধান্য শক্তিমানই স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দের স্বরূপশক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার মহিমা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—আদিলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে—

—"কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান।
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম, গুরু—আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ (১)
নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়॥
রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥
যাহা বই গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিৎ।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত॥
যাহা হৈতে সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্রব্যবহার॥ (২)

(১) কেহ কেহ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করেন, আবার কেহ অভেদ স্বীকার করেন। তত্ত্বচিন্তক যোগীদিগের সিদ্ধান্তে শক্তি-শক্তিমানের ভেদবুদ্ধি আছে। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করিয়া এক অপূর্ব্ব রসময় সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের নাম অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ, বস্তুগত অভেদ নহে, অবস্থাগত অভেদ মাত্র। পুষ্করিণীর জলে ও ঘটীর জলে বস্তুগত কোন ভেদ নাই—কিন্তু অবস্থাগত ভেদ আছে। তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদতত্ত্বও বস্তুগত।

(১) কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয় সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্য শিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুতলং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥
গোবিন্দলীলামৃত।

(২) বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ।
দানকেলি কৌমুদী।

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল "বিষয়"।
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥"

এইরূপ চিন্তা করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র পুনরায় স্বমাধুর্য্য দেখিয়া বিচার করিতেছেন,—

—"অদ্ভুত অনন্তপূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে।
মন্মাধুর্য্য রাধা-প্রেম,—দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোহে কেহো নাহি হারি।
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥"(১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আরও একটি বিচার স্বয়ংভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনে মনে এই সময়ে উদয় হইয়াছে—যথা,—

—"কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণ-রস-রূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন জন॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর বংশী-গীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর-রস আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥
এই মত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি—সব বিপরীত॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
"কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু—জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয়ে অন্ধ॥
তাম্বুল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গ-মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥

(১) অপরি কলিত পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারী।
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্য-পূরঃ॥
অয়মহমপি হন্তপ্রেক্ষ্য যংলুব্ধচেতাঃ।
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

ললিতমাধব।

দোঁহার যে সম রস—ভরত মুনি (১) মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥
অন্যান্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হইতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥ (১)
তাতে জানি মোতে আছে কোন্ এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য-প্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেম রস আস্বাদন বিবিধ প্রকার॥
রাগ মার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল নানা আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা (১) মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকার—ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥
ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা কথন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(১) রসশাস্ত্রকার ভরতমুনি প্রাকৃত নায়ক নায়িকা সম্বন্ধে লৌকিক-সম্ভোগ রসের-কথাই লিখিয়াছেন। ব্রজসুন্দরীগণের সম্ভোগ-রস লৌকিক নহে—অপ্রাকৃত।

(২) প্রথম—শ্রীরাধিকার প্রণয় মহিমা কিরূপ,—দ্বিতীয়—শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্য কিরূপ; এবং তৃতীয়—মাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীরাধা যে আনন্দ পান তাহাই বা কিরূপ। এই তিনটী বিষয় জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বাসনাই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য। এস্থলে বৃষভানুনন্দিনী কৃষ্ণবল্লভা শ্রীরাধিকার মহিমা বর্ণনের উদ্দেশ্য,—সনাতন-নন্দিনী গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত—কারণ শ্রীশ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব অদ্বয় ও অভেদ তত্ত্ব। সুতরাং শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীমুখের সকল উক্তিগুলিই গৌরবল্লভা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পক্ষে সর্ব্বভাবে এবং সম্যকরূপে প্রযুজ্য। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-অদ্বয়-তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন,—গৌরভক্তবৃন্দকে এসকল কথা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই—তবে যে বলিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী সে কারণটি বিশেষভাবে তাঁহার শ্রীগ্রন্থে স্বয়ংই লিখিয়া গিয়াছেন। যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে,—

—"এসব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥
এসব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হিক প্রবেশ।
তার চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের যুগলভজনতত্ত্ব এবং অষ্ট-কালীয় লীলাস্মরণ-মনন-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রধানা অষ্ট সখি আছেন আর এই অষ্ট প্রধানা সখির প্রত্যেকের অষ্ট মঞ্জরী আছেন—এই সখিগণ ও মঞ্জরীগণ মহাজনীপদে ও গোস্বামীশাস্ত্রে নদীয়া-নাগরী নামে প্রখ্যাত। শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুর যোগপীঠে নিত্য রাসলীলাস্থলী শচীঅঙ্গিনায় পুষ্পোদ্যানে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দরূপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়াসমন্বিত এবং নদীয়ানাগরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নিত্য রাসলীলারঙ্গ করিতেছেন। নদীয়া-নাগরীগণের যুথ বর্ণনে অষ্টসখি ও তাঁহাদের যুথের মঞ্জরীগণের নামও লিখিত

আছে। শ্রীধাম নবদ্বীপের নদীয়া-নাগরীভাবসিদ্ধ, সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের গুটিকার মধ্যে এই কারিকা পাওয়া গিয়াছে।

(১) কাঞ্চনা—ইন্দিরা শ্রীকুরাঙ্গাক্ষী দেবী হেমলতা।
বিদ্যুল্লতা কাত্যায়ণী আর কৃষ্ণমাতা॥
কৃষ্ণকান্তা শৈলবালা কাঞ্চনা সমাজে।
এই অষ্টসখি খ্যাতি রহে জগমাঝে॥

(২) অমিতা—শ্রীমাধবী প্রিয়ম্বদা আর সুচরিতা।
শ্রীরূপমঞ্জরী সরস্বতী বেদমাতা॥
সত্যভামা শ্রীরুক্মিণী অমিতার সখি।
গৌরাঙ্গ সেবয়ে সদা সখি মন রাখি॥

(৩) মনোহরা—কোমলাঙ্গী চারুবালা শ্রীমঞ্জুভাষিণী।
দীর্ঘকেশী বিশালাক্ষী শ্রীমনমোহিনী॥
তিলোত্তমা সুরবালা এই অষ্টজনা।
মনোহরা সখি সবে না জানে আপনা॥

(৪) সুকেশী—সুরবালা সুকুমারী গোলোকবাসিনী।
ললিতা লবঙ্গলতা সুচারু হাসিনী॥
সুরধুনী জগন্মাতা সুকেশী যূথেতে।
হয় এই অষ্ট সখি সখি-মননেতে॥

(৫) চন্দ্রকলা—হৈমবতী হেমকান্তি আর সুশোভনা।
চন্দ্রমুখী চন্দ্রভাগা শ্রীচন্দ্রবদনা॥
কলকণ্ঠী সুভাননা চন্দ্রকলা সখি।
সখি অনুকুল সদা সখিগণ লখি॥

(৬) সুরসুন্দরী—সুলোচনা ব্রজবালা উর্ম্মিলা মেনকা।
প্রতিভা গায়ত্রী শ্যামা সখি সুগন্ধিকা॥
এ সভার যূথেশ্বরী শ্রীসুরসুন্দরী।
গৌরাঙ্গ সেবনে যাঁর অনুরাগ ভূরি॥

(৭) প্রেমলতিকা—চপলা শ্রীসুধামুখী রাধা রাসেশ্বরী।
শান্তি ক্ষেমঙ্করী কৃষ্ণা দেবী মহেশ্বরী॥
শ্রীপ্রেমলতিকা সখি এই অষ্ট জনে।
সর্ব্বদা সখির কার্য্য করে প্রাণপণে॥

(৮) সখি বিষ্ণুপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রিয়াদেবী শ্যামা রমা চন্দ্রমুখী।
সুলক্ষণা সুমধ্যা, ভদ্রা আর প্রিয়মুখী॥
সখি বিষ্ণুপ্রিয়া * সখি একয় যুবতী।
সখি অনুকূলে সবেই প্রেমের মুরতি॥

শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের স্বহস্তলিখিত ভজন-গুটিকা হইতে এই সখি-নামা-ভজন-পদ্ধতি উদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজবধূবর্গের যাহা কল্পিত শ্রীনবদ্বীপে নদীয়া-বধূ অর্থাৎ নদীয়া নাগরীবর্গের দ্বারা তাহাই কল্পিত হইয়াছে—ব্রজবধূবর্গ এবং নদীয়া-নাগরীবর্গ এক বস্তু,—এক তত্ত্ব। তাঁহাদিগের মধুর উন্নতোজ্জ্বল-ভজন-রহস্যও সম্পূর্ণ ব্রজগোপীভাবব্যঞ্জক। ইঁহাদিগের তত্ত্ব ও ভজন-রহস্যে কোন প্রকার ভিন্নভাব নাই। সখি ও মঞ্জরীবৃন্দের বয়ঃক্রম বর্ণ, পরিধান বস্ত্রালঙ্কারাদির বিশিষ্ট বিবরণ এবং প্রত্যেকের সেবাকার্য্য সদ্‌গুরুর চরণান্তিকে শিক্ষণীয়। "গৌর-সাগর" গ্রন্থে অষ্ট সখির স্তোত্র ও ধ্যানাদি লিখিত হইয়াছে যথা,—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অষ্ট সখির স্তোত্র।

অথ শ্রীকাঞ্চনা স্তোত্রং—১

১। ব্রহ্মকন্যাং মহামায়াং ব্রহ্মাদি দেব বন্দিতাং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥
স্বর্ণ-বিদ্যুৎবিজিতাঙ্গীং পীতাম্বর বিধারিণীং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥

২। গৌর-প্রেমময়ীং রামাং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥
প্রসন্নবদনাং লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়ৈক জীবনাং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥

৩। সঙ্গীত-কুশলাং রামাং মৃদঙ্গ-যন্ত্র ধারিণীং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥
স্নেহময়ীং সদারাধ্যাং গৌরপ্রেম প্রদায়িনীং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥

---

* সখি বিষ্ণুপ্রিয়া গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর একজন অন্তরঙ্গা সখি। গৌরাঙ্গ-প্রেয়সী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী হইতে ইহার প্রভেদকল্পে নদীয়া-নাগরী-সমাজ হইতে ইনি সখি-বিষ্ণুপ্রিয়া নাম পাইয়াছিলেন।

৪। শান্তিময়ীং শান্তিদাত্রীং শোকদুঃখ-বিনাশিনীং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥
সন্তাপনাশিনীং বালাং সর্ব্বদা নবযৌবনাং।
বন্দে শ্রীকাঞ্চনাং দেবীং গৌরদাসীং মনোহরাং॥

অথ শ্রীঅমিতা স্তোত্রং—২

১। অমিতাং সুন্দরীং রামাং পুষ্পারণ্যবিহারিণীং।
গৌরস্য বল্লভাং বন্দে লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
তপ্ত হাটক গৌরাঙ্গীং শ্যাম-বস্ত্র বিধারিণীং।
বন্দে শ্রীঅমিতাং দেবীং লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥

২। পূর্ণেন্দুবদনাং চারুহাসিনীং প্রেম-রূপিণীং
বন্দে তামমিতাং দেবীং লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
রত্নালঙ্কার ভূষাঙ্গীং তাল-বাদ্য-বিনোদিনীং।
বন্দে তামমিতাং দেবীং লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥

৩। প্রিয়য়োঃ স্নেহপাত্রীং যা দাসীভাব-প্রদায়িনীং।
বন্দে তামমিতাংদেবীং লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
নবযৌবনসম্পন্নাং ললিতাং নম্রভাষিণীং।
বন্দে তামমিতাংদেবীং লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥

৪। বিম্বাধরীং দীর্ঘকেশীং ভয়লজ্জা-নিবারিণীং।
বন্দে তামমিতাংদেবীং লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
গৌরস্নেহময়ীং দেবীং প্রপন্নার্ত্তি-বিনাশিনীং।
বন্দে তামমিতাং দেবীং লক্ষ্মীপ্রিয়ৈকজীবনাং॥

অথ শ্রীচন্দ্রকলা স্তোত্রং—৩

১। রক্তাম্বরাং হেমগৌরীং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
বন্দে চন্দ্রকলাং দেবীং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
নবীন বয়সীং বালাং নীতিশাস্ত্র বিশারদাং।
বন্দে চন্দ্রকলাং দেবীং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং॥

২। চতুরীং চারুহাসিক সারঙ্গীবাদ্য-ধারিণীং।
বন্দে চন্দ্রকলাং দেবীং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
পদ্মনেত্রীং ক্ষীণ কটিং হরেগৌরেতি বাদিনীং।
বন্দে চন্দ্রকলাং দেবীং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং॥

৩। পূর্ণেন্দুবদনাং রামাং রাসনৃত্য-বিনোদিনীং
বন্দে চন্দ্রকলাং দেবীং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
মস্তকে শোভতে যস্যা ইন্দ্রনীলমণিঃ সদা।
বন্দে চন্দ্রকলাং তাংহি বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং॥

৪। পিকস্বনীং প্রেমদাত্রীং পাপতাপ-বিনাশিনীং।
বন্দে চন্দ্রকলাং দেবীং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং॥
মরাল-গমনাং ভালে কস্তুরী-বিন্দু শোভিতাং।
বন্দে চন্দ্রকলাং দেবীং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং।

অথ শ্রীপ্রেমলতা স্তোত্রং—৪

১। প্রসন্নবদনাং রামাং কিশোরীং মন্দহাসিনীং।
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্রদায়িনীং॥
নীল পট্টাম্বরাং ভেরীবাদ্যযন্ত্র-বিধারিণীং।
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্র[illegible]ং॥

২। প্রিয়য়োঃ স্নেহপাত্রীঞ্চ শশাঙ্কবদনাং শুভাং।
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্রদায়িনীং॥
পুষ্পোদ্যানপ্রিয়াং গৌরমোহিনীং চারুভাষিণীং।
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্রদায়িনীং॥

৩। প্রতপ্ত হেমগৌরাঙ্গীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং।
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্রদায়িনীং॥
নৃত্যগানরসে মত্তান্ নানাভাব-প্রকাশিনীং।
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্রদায়িনীং॥

৪। বিনা গৌরকিশোরেণ তুচ্ছবৎ সর্ব্বত্যাগিনীং
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্রদায়িনীং।
হা হা গৌর কিশোরেতি হৃয়নচ্ছিন্নবাদিনীং॥
বন্দে প্রেমলতাং দেবীং পরাভক্তি-প্রদায়িনীং॥

অথ শ্রীমনোহরা স্তোত্রং—৫

১। শুক্লাম্বরাং চম্পকাভাং শিঙ্গাবাদ্যবিধারিণীং।
মনোহরাং মহাদেবীং বন্দে গৌর-বিনোদিনীং।
সরলাং সরসিজাক্ষীং করুণাসাগরীং সমাং।
মনোহরা মহাদেবীং বন্দে গৌর-বিনোদিনীং॥

২। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং বামাং রাসনর্ত্তনকারিণীং।
মনোহরাং মহাদেবীং বন্দে গৌরবিনোদিনীং॥
বিদ্যুত্তুল্য মহা রত্নালঙ্কারধারিণীং শুভাং।
মনোহরাং মহাদেবীং বন্দে গৌর-বিনোদিনীং॥

৩। প্রিয়য়োঃ পাদপদ্মে চ রত্ননূপুর দায়িনীং।
মনোহরাং মহাদেবীং বন্দে গৌর-বিনোদিনীং॥
গজেন্দ্রগমনাং শশ্বৎ সুহাস্যবদনাং সতীং।
মনোহরাং মহাদেবীং বন্দে গৌর-বিনোদিনীং॥

৪। ধীরাধিরূঢ় ভাবাঢ্যাং পীনস্তনীং মনোরমাং।
মনোহরাং মহাদেবীং বন্দে গৌর-বিনোদিনীং॥
রসজ্ঞাং রসিকাশ্রেষ্ঠাং রঙ্গিনীং রাসপণ্ডিতাং।
মনোহরা মহাদেবীং বন্দে গৌর-বিনোদিনীং॥

অথ শ্রীসুকেশী স্তোত্রং—৬

১। সুচিত্রবসনাং রামাং কটিবাস-বিনোদিনীং।
বন্দে গৌরপ্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥
প্রিয়য়োঃ সঙ্গিনী রামাং পবিত্রাং পদ্মলোচনাং॥
বন্দে গৌর প্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥

২। চারুকুঞ্চিত কেশাঢ্যাং বেণীযুক্তাং মনোরমাং।
বন্দে গৌরপ্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥
নানালঙ্কার ভূষিতাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
বন্দে গৌরপ্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥

৩। কটি-কিঙ্কিনী সংযুক্তাং কোমলাঙ্গীং কৃপাময়ীং।
বন্দে গৌরপ্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥
কল্যাণরূপিণীং শান্তাং গৌরানন্দ-প্রদায়িনীং।
বন্দে গৌরপ্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥

৪। লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-দাসীং ব্রহ্মাদি দেববন্দিতাং।
বন্দে গৌরপ্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥
পুষ্পোদ্যান-রসোন্মত্তাং পাপকল্মষনাশিনীং।
বন্দে গৌরপ্রিয়াং দেবীং সুকেশীং চারুহাসিনীং॥

অথ শ্রীসুরসুন্দরী স্তোত্রং—৭

১। পদ্মবর্ণাম্বরাং দেবীং ডমরু-বাদিনীং শুভাং।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নমামি সুরসুন্দরীং॥
স্বর্ণবিদ্যুদ্দ্যুতিং গৌরীং নানালঙ্কার-ধারিণীং।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নমামি সুর-সুন্দরীং॥

২। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা বিজেত্রীং স্বরূপেন চ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নানালঙ্কার ধারিণীং॥
লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী বিজেত্রীং গুণশালিনীং।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নানালঙ্কার-ধারিণীং॥

৩। স্বর্ণাগরীগণারাধ্যাং স্বর্ণদীতটবাসিনীং।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নমামি সুরসুন্দরীং॥
স্বর্জ্জনাং স্বরূপাশক্ত্যা গৌরপ্রেম-প্রদায়িনীং।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নমামি সুরসুন্দরীং॥

৪। সহস্রাক্ষ-বিধি-সেব্যাং সংকল্পপূর্ণ কারিণীং।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নমামি সুরসুন্দরীং॥
সত্যবতীং প্রেমদাত্রীং সুন্দরীণাং শিরোমণিং।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং রামাং নমামি সুরসুন্দরীং॥

অথ সখি বিষ্ণুপ্রিয়া স্তোত্রং—৮

১। বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রিয়াং দেবীং খঞ্জনীবাদ্যধারিণীং।
সখি বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥
স্বর্ণবিদ্যুৎবিজিতাঙ্গীং বালার্কাম্বরধারিণীং।
সখি বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥

২। কিশোরীং কেলিরূপাঞ্চ রাসলক্ষ্মীং কৃপাময়ীং।
সখি-বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥
রত্নমাণিক্যভূষাঢ্যাং নাগরীনাং প্রিয়াং শুভাং।
সখি বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥

৩। নবীনবয়সীং বালাং বিষ্ণুপ্রিয়ৈকজীবনাং।
সখি-বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥
সঙ্গীত কুশলাং শশ্বৎ রাসনৃত্যবিহারিণীং।
সখি-বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥

৪। কুহুকণ্ঠ-স্বনীং মন্দহাসিনীং চারুভাষিণীং।
সখি-বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥
লাবণ্যরূপিণীং হাস্যনৃত্যাভিনয়কারিণীং।
সখি বিষ্ণুপ্রিয়াং বন্দে গৌরপ্রেমবিনোদিনীং॥
ইতি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়াঃ অষ্ট সখিস্তোত্র সমাপ্তঃ।

এতক্ষণ তত্ত্বকথালোচনায় গেল। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

—"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"—চৈঃ চঃ।

কৃপানিধি গৌরভক্ত পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মহামূর্খ সর্ব্বভাবে অযোগ্য লেখককে কেশে ধরিয়া শাসন করিবেন। অনধিকার চর্চ্চার লালসা তাহার দুর্দ্দমনীয়—লীলাকথাপ্রসঙ্গে দুরূহ তত্ত্বালোচনা যে লীলারসভঙ্গের অবশ্যম্ভাবী কারণ, মূর্খ লেখকের সে জ্ঞান যে নাই, তাহা নহে। এ সকল যে তাহার জ্ঞানকৃত পাপ, তাহা যে সে জানে না—সে কথাও নহে। জানিয়া শুনিয়াও তাহার এই দুর্দ্দমনীয় লালসা যায় না—এই জন্য শাসনের প্রয়োজন। আপনারা গৌরভক্ত—জীবাধম লেখকের মাথার মণি—অনুগ্রহ নিগ্রহে আপনারা সর্ব্বদা সমর্থ। সর্ব্বভাবে অপরাধী জীবাধম লেখককে আপনারা নিজগুণে যথেষ্ট নিগ্রহ করুন—অকাতরে দণ্ডপ্রসাদ দান করুন। ইহাই তাহার প্রাণের প্রার্থনা।

—"আত্ম শোধিবার তরে দুঃসাহস কৈনু।
লীলাসিন্ধুর একবিন্দু স্পর্শিতে নারিনু॥"—

পুনরায় এতক্ষণ ভণিতা করিলাম—পুনরায় আপনাদিগের চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিলাম—দণ্ডপ্রসাদের জন্য জীবাধম গ্রন্থকার পুনরায় গৌরভক্ত পাঠকপাঠিকাবৃন্দের চরণে প্রার্থনা করিতেছে। কৃপাপূর্ব্বক কেশে ধরিয়া তাহাকে সংশোধন এবং শাসন করুন!

বিরহিণী গৌর-বল্লভার পূর্ব্ব-রাত্রির ভাবমাধুর্য্য-বিগলিত নয়নকমলের আনন্দধারা,—তাঁহার গৌরবিরহতাপদগ্ধ প্রাণমনের শান্তি ও তৃপ্তিব্যঞ্জক বদনমণ্ডলের অপূর্ব্ব প্রসন্নতাভাব, পরদিন প্রাতেও সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার প্রাণে ইহা দেখিয়া আনন্দের আর সীমা নাই বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীমুখের মৃদু হাসির বিদ্যুত-রেখাগুলি পর্য্যন্ত এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে—তিনি প্রসন্নমনে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীতুলসীকে পরিক্রমা ও প্রণাম পূর্ব্বক ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার সঙ্গেই আছেন।

মনের সাধে আজ প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচিত্র-পটসেবা করিতেছেন—শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তির শিরোপরি সুগন্ধি মালতীর মালা বিজড়িত—শ্রীচরণকমলযুগল পদ্মপুষ্পাঞ্জলিতে সুশোভিত, অগুরুচন্দন ও ধূপধুনার গন্ধে ভজনমন্দির আমোদিত। বিরহিণী গৌরবক্ষবিলাসিনী আজ তাঁহার প্রাণের দেবতাকে প্রাণভরিয়া পরম প্রেমভরে প্রেমপূজা করিতেছেন—সখিগণ নানাবিধ উপকরণপূর্ণ নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছেন—শয্যা, পাদুকা, আসন প্রভৃতি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীগুলি সুসংস্কৃত এবং সুসজ্জিত করা হইয়াছে—অন্যান্য সখিগণ ও দাসীগণ আজ সকলেই বিরহিণী গৌরবল্লভার গৌরপূজা দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন—আজ আর ভজন-মন্দিরের দ্বার বন্ধ নাই।

দৈনন্দিন আহ্নিক পূজা শেষ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজী তাঁহার মর্ম্মী-সখি কাঞ্চনাকে পরম প্রেমভরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! বহুদিন পরে আজ আমার প্রাণে যেন কে একটা অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দের উৎস ফুটাইয়া দিয়াছে—আমার মানস-সরোবরে যেন পদ্মপুষ্পরাজি ফুটাইয়া দিয়াছে—আমার হৃদয়কন্দর যেন অপূর্ব্ব দিব্যালোকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। সখি! গত রাত্রিতে একটীবার মাত্র দর্শন দিয়াই আমার প্রাণবল্লভ অদর্শন হইয়াছেন—কিন্তু আমার চক্ষের উপরে যেন তোমাদের সেই নদীয়া-নাগর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের অপূর্ব্ব নৃত্যবিলাস-ভঙ্গীপূর্ণ অপরূপ রূপ-রাশি এখন পর্য্যন্ত ভাসিতেছে। প্রাণসখি! সে রূপ বর্ণনা করিবার আমার সাধ্য নাই। তুমি সে বিষয়ে সবিশেষ দক্ষ, তুমি তোমাদের নদীয়া-নাগর গৌরসুন্দরের সেই অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্যরাশি পুনরায় বর্ণনা করিয়া আমার চিরপিপাসিত কর্ণ শীতল কর"—এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার হাত দুখানি পরম প্রেমভরে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া কত না আর্ত্তি, কাকুতি ও মিনতি করিতে লাগিলেন।

সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার কলকণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রূপাভিসারের পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—রামকেলি

"আমার গৌরাঙ্গ-সুন্দর ! (কিবা) । ধ্রু ॥

ধবল পাটের জোড় পরেছে,
রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়েছে,
চরণ উপরি দুলি যাইছে কোঁচা ।
বাঁক-মল সোনার নূপুর,
বাজাইছে মধুর মধুর,
রূপ দেখিতে ভুবন মুরছা ॥
দীঘল দীঘল চাচর চুল,
তায় দিয়েছে চাঁপা ফুল,
কুন্দ মালতির মালা বেড়া ঝুটা ।
চন্দন মাখা গোরা গায়,
বাহু দোলাঞা চলি যায়,
ললাট উপরি ভুবন-মোহন ফোটা ॥
মধুর মধুর কয় কথা,
শ্রবণ-মনের ঘুচায় ব্যথা,
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা ।
বাহুর হেলন দোলন দেখি,
করীর শুণ্ড কিসে লেখি,
নয়ান বয়ান যেন কুঁদে কোঁদা ॥
এমন কেউ ব্যথিত থাকে,
কথার ছলে খানিক রাখে,
নয়ান ভৈরে দেখি রূপ-খানি ।
লোচনদাসে বলে কেনে,
নয়ান দিলি উহার পানে,
কুল মজালি আপনা আপনি ॥"

গৌর-পদ তরঙ্গিণী ।

গৌরবল্লভা এই গানটী শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন—তিনি তাঁহার কমল নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া গানটী শুনিতেছিলেন এবং মনশ্চক্ষে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপরূপ রূপ-রাশি দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার বদনের ভাব অতি প্রসন্ন—কিন্তু মুখে কোন কথা নাই। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রাণ-সখির মনের ভাব বুঝিয়া সখি অমিতার প্রতি চাহিয়া আর একটী গানের ধুরা ধরিলেন।

যথারাগ ।

—"সই গো ! গোরারূপ অমৃত-পাথার ।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥
সখিরে ! কিবা ব্রত কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া ।
অগাধ-অথল তার হিয়া ॥
সেই রূপ হেরি হেরি কাঁদে ।
কোন বিধি গড়ল গো—হেন গোরাচাঁদে ॥
গোরারূপ পাসরা না যায় ।
গোরা বিনু আন নাহি ভায় ॥
দিবানিশি আন নাহি স্ফুরে ।
লোচনদাসের মন দিবানিশি ঝুরে ॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী ।

বিরহিণী প্রিয়াজির অশ্রুপূর্ণ লোচনদ্বয় এখনও নিমিলিত—তিনি নীরবে নিশ্চিত মনে পরম প্রেমানন্দে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপরূপ রূপ-সুধা পান করিতেছেন। গৌররূপ-মুগ্ধা সখি কাঞ্চনার প্রাণখানি গৌর-রূপ-সুধার অনন্ত উৎস—তাঁহার হৃদয়খানি অফুরন্ত গৌর-প্রেমের অনন্ত ভাণ্ডার। তিনি তাঁহার প্রিয়সখি গৌর-বল্লভার বদনের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, তিনি গৌর-রূপ-ধ্যানমগ্না—গৌর-রূপ-সাগরে তিনি যেন ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। সখি কাঞ্চনা পুনরায় গান ধরিলেন—

যথারাগ ।

—"এ হেন সুন্দর গোরা, কোথা বা আছিল গো,
কে আনিল নদীয়া নগরে ।
নিরখিতে গোরারূপ, হৃদয়ে পশিল গো,
তনু কাঁপে পুলকের ভরে ॥
ভাবের আবেশে ওলা, এলায়ে পড়েছে গো,
প্রেমে ছল ছল দুটি আঁখি ।
দেখিতে দেখিতে আমার, হেন মনে হয় গো,
পরাণ-পুতলি করি রাখি ॥
বিধি কি আনন্দ-নিধি, মথি নিরমিল গো,
কিবা সে গড়িল কারিগরে ।
পীরিতি-কুঁদের কুঁদে, উহারে কুঁদিল গো,
(উহার) নয়ান কুঁদিল কাম শরে ।
গোকুল-নেটোর কাণ, বঙ্কিম আছিল গো,
কালিয়ে কুটিল তার হিয়া ।
রাধার পীরিতি উহার, সমান করেছে গো,
সেই এই বিহরে নদীয়া ॥

মনের মরম কথা কাহারে কহিব গো,
চিত যেন চুরি কৈল চোরে।
লোচন পিয়াসে মরে, ওরূপ হেরিয়া গো,
বিধাতা বঞ্চিত ভেল মোরে ॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনা দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণ-সখি গৌর-বল্লভার বদনে মৃদুমধুর হাসির রেখা—কিন্তু চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত। তাঁহার মুদ্রিত নয়নকোন দিয়া যেন প্রেমাশ্রুধারার পিচ্কারী ছুটিতেছে—এই পিচ্কারীর জলে সখি কাঞ্চনা ও অমিতার গাত্রবসন সিক্ত হইতেছে। বিরহিণী গৌর-বল্লভার চক্ষুরুন্মীলন করিবার শক্তি নাই—তিনি তাঁহার মর্ম্মী-সখির মুখে তাঁহার প্রাণ-বল্লভার অপরূপ রূপরাশির অপূর্ব্ব বর্ণনা শুনিয়া অন্তশ্চক্ষে গৌরাঙ্গ-নাগররূপ দর্শন করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন এই অপরূপ রূপ-লাবণ্যসার একটী শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপধামে পূজিত ও সেবিত হইলে বড় সুখের হয়। ইহাই গৌর-বল্লভার তাৎকালিক মনোভাব।

সখি কাঞ্চনার প্রাণে আজ গৌর-রূপ-সাগরের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছে। তিনি পুনরায় গান ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"শচীর গোরা, কামের কোঁড়া,
দেখ্লাম ঘাটের কুলে।
চাঁচর চুলে, বেড়িয়া ভালে,
নব-মালতীর মালে ॥
কাঁচা সোনা, লাগে ঘৃণা,
রূপের তুলনা দিতে।
(এমন) চিত-চোরা, মনোহরা,
নাইক অবনীতে ॥
কি আর বলিছ ওলো সই
(তোমায়) বুঝাব কি।
স্নানে যেতে সখির সাথে
(আমি) গৌর দেখিছি ॥
(সে) রূপ দেখি, দু'টি-আঁখি,
ফিরাইতে নারি।
পুনঃ তারে, দেখ্বার তরে,
কত সাধ করি ॥
কি আর বলিছ ওগো সই,
তুমিত আছ ভাল।
আমার মরমের কথা সই
মরমেই রহিল ॥
(আমার) জাগিতে ঘুমাইতে সদাই
গৌর জাগে মনে।
লোচন বলে, যে দেখেছে
সেই সে উহা জানে ॥"
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিশুদ্ধ গোপীভাবাত্মক গৌর-নাগরীভাবের অফুরন্ত উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে আজ নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তরে—গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি আজ সেই উৎসের পরম পবিত্র প্রেমজলে প্রাণ ভরিয়া স্নান করিতেছেন—এমন গা ঢালিয়া স্নান তিনি বহুদিন করেন নাই—মর্ম্মী দরদিয়া সখিদ্বয়সহ সেই গৌর-রূপোল্লাস-প্রেমোৎসবের স্বচ্ছ সলিলে আজ গৌর-বল্লভা নির্ভয়ে পরম স্বচ্ছন্দতার সহিত জল কেলি-লীলারঙ্গ করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় লীলারঙ্গ চলিতেছে আজ দিবাভাগে প্রাতে চারি দণ্ড বেলার সময় বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া,—এই অপূর্ব্ব গৌর-প্রেমরসপূর্ণ সঙ্গীত সুধা-পানে গৌর-বিরহিণীত্রয় আজ আত্মহারা হইয়াছেন। সখি কাঞ্চনা আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় গান ধরিলেন—

যথারাগ—

—"গৌর রতন ক'রে যতন
রাখ্বো হিয়ার মাঝে।
গৌর বরণ, ভূষণ পর্‌বো,
যেখানে যেমন সাজে ॥
গৌর বরণ ফুলের ঝাঁপায়
লোটন বাঁধ্বো চুলে।
গৌর ব'লে গৌরব ক'রে,
পথে যাব চলে ॥
গৌর বরণ গোরোচনায়
গৌর লিখ্বো গায়।
গৌর ব'লে রূপ যৌবন
সমর্পিব পায় ॥
কুলের মূল উপাড়িয়ে
ভাসাব গঙ্গার জলে।

লাজের মুখে আগুন দিয়ে
বেড়াব গৌর বলে॥
গৌর চাঁদ রসের ফাঁদ
পেতেছে ঘরে ঘরে।
সতী, পতি ছাড়ি, দেহ
দিতে সাধ করে॥
(তোমরা) কিছুই বলো, রূপ-সাগরে
সকলি গেল ভেসে।
লোচন বলে কুতূহলে,
দেখ্‌বে বৈসে বৈসে॥"—
গৌরপদতরঙ্গিণী।

এবার বহুক্ষণের পর অকস্মাৎ গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার গৌরপ্রেমানুরাগ-রঞ্জিত কমল নয়নদ্বয় উন্মিলিত করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি সকরুণ একটী শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। এতক্ষণ ধরিয়া গৌর প্রেমতরঙ্গিণীর স্বচ্ছ সলিলে গৌর বিরহিণীত্রয় প্রাণ ভরিয়া জলকেলিরঙ্গ করিতেছিলেন—এখন যেন পরম পরিতৃপ্ত হইয়া গৌরপ্রেমসলিলে স্নানক্রিয়াদি সমাপন করিয়া তাঁহারা তীরে উঠিলেন এবং আদ্রবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিব্য শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিলেন। নব নব গৌরবর্ণ বস্ত্র ভূষণে বিভূষিত হইয়া গৌরবর্ণ ফুলের ঝাঁপায় কবরীতে তাঁহারা লোটন বাঁধিলেন। গৌরবর্ণ গোরোচনায় সর্ব্বাঙ্গে গৌর-নামের দিব্য ছাপ্ মারিলেন—তারপর তিন জনে মিলিয়া এবার একত্রে গানের ধুয়া ধরিলেন—নদীয়া-গম্ভীরা-মন্দিরে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম হইল।

রাগ পহিড়া।

"গৌরাঙ্গ-তরঙ্গে, নয়ন মজিল,
কিবা সে করিব সার।
কলঙ্কের ডালি মাথায় ধরিয়া,
ঘরে না রহিব আর॥
সই, এবে সে করিব কি?
গৌরাঙ্গ চাঁদের নিছনি লইয়া
গৃহে সমাধান দি।
গৃহধর্ম্ম যত হইল বেকত,
গোরা বিনা নাহি জানি।
আনেরে দেখিয়া ভরমে ভুলিয়া
গৌরাঙ্গ বলি যে আমি॥

পতির সহিতে শুতিয়া থাকিতে
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে।
আসি ত্বরা করি প্রাণ গৌরহরি,
পতিরে ফেলাঞা ভূমে॥
আমারে লইয়া করে উরপরে
বদনে বদন দিয়া।
আবেশে গৌরাঙ্গ সুধা উগারয়ে
প্রতি অঙ্গে পড়ে বহিয়া।
গৌরাঙ্গ-রতন করিয়ে যতন,
মোড়াঞে লইব কোলে।
তিলাঞ্জলি দিয়া সকলি ভাসামু
এ দাস লোচন বলে॥"—
গৌর-পদ তরঙ্গিণী।

পরমা ধৈর্য্যবতী প্রিয়াজি আজ একেবারে ধৈর্য্যহারা হইয়াছেন—মর্ম্মী সখীদ্বয়ের সহিত মর্ম্ম উঘাড়িয়া মরমের মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতেছেন এবং প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদের সহিত পরম গুহ্য গৌরপ্রেম-রস-কথা কহিতেছেন। সখিদ্বয়ের আর আনন্দের সীমা নাই—তাঁহারা আজ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন। এমন পরম সৌভাগ্য তাঁহাদের বহুদিন হয় নাই—আজ তাঁহাদের প্রাণ-সখি প্রাণ খুলিয়া প্রাণের অন্তস্তলের মর্ম্মকথাগুলি বলিতেছেন—প্রকৃত প্রাণ-সখির কার্য্য তিনি আজ করিতেছেন। নদীয়ার গম্ভীরা-মন্দিরে নির্জ্জনে পরম গম্ভীরা প্রকৃতি পরম স্বতন্ত্রা গৌর-বিরহিণী গৌরবল্লভাকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা বিষম বিপদেই পড়িয়াছিলেন। পরম প্রেমময় ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু করুণাসাগর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের পরম কৃপাবলে আজ তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা প্রাণসখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এইরূপ অপূর্ব্ব ভাববিপর্য্যয়াবেশ দেখিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া গৌর-রূপ-গুণ-গানে প্রমত্ত হইয়াছেন। সখি অমিতা কদাচিৎ গান করেন—বড় গম্ভীরা প্রকৃতি—তাঁহার অন্তরে অন্তরে আজ গৌরপ্রেমের উৎস ছুটিতেছে—কিন্তু মুখ ফুটিতেছে না। অন্তর্য্যামিনী গৌর-বল্লভা সকলই বুঝিতেছেন—তিনি একবার তাঁহার প্রিয়সখি অমিতার প্রতি মৃদুমধুর হাস্য-বদনে চাহিয়া তাঁহার হাতখানি নিজ হাতে ধরিয়া কি কহিলেন,—সখি কাঞ্চনা তাহা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু পরক্ষণেই সখি অমিতা আপন মনে প্রেমানন্দে একটি গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

"(গৌরের) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি
হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ-পুতলী মোর
হিয়া নাহি বাঁধে॥
আমি কেন সুরধুনী গেলাম,
(গেলাম! গেলাম!)
কেন গোরা-রূপে নয়ন দিলাম॥
আমি কেনই চাহিলাম গৌরপানে।
(গৌর) আমায় হান্‌লে দু'টি নয়ন-বাণে॥
আমার নয়ন কোণে ওরূপ দেখে আসি।
আমার মন বলে তার হৈগে দাসী॥
(গোরা) করে নয়নপথে আনা-গোনা।
আমার পাঁজর কেটে কর্‌লো থানা॥
গৌর-রূপ-সাগরের পিছল ঘাটে।
আমার মন গিয়ে ভয়ে প'ড়্‌লো ছুটে॥
একে গৌর-রূপ তায় পীরিতি-মাখা।
(তাতে আবার) ঈষৎ হাসি নয়ন বাঁকা॥
(গৌরের) যত রূপ তত বেশ।
ও! সে! ভাঙ্গিতে পাঁজর শেষ॥
(গৌরের) রূপ লাগি-আঁখি ঝুরে।
গুণে মন ভোর করে॥
(গৌর-রূপ) তিল আধ পাসরিতে নারি।
কি ক্ষণে (গৌরাঙ্গ রূপ) হিয়ার মাঝে ধরি।
এ বুক চিরিয়া রাখি, পরাণেরই সঙ্গ।
মনে হলে, বাহির করে, দেখি মুখচন্দ॥
গৌর-রূপ হেরি সবার অন্তর উল্লাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিনী।

সখি কাঞ্চনা অমিতার গাত্র স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে আরও এই ভাবের গান করিতে উৎসাহিত করিলেন—বিরহিণী গৌরবল্লভা পরম প্রেমাবেশে পরমানন্দে গৌর-রূপ-সুধা পান করিতেছেন—তাঁহার হাস্য বদন—কিন্তু নয়নদ্বয় মুদ্রিত—তিনি যেন ভাবাবেশে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের "নয়ন-পথে আনা-গোনা" করিতেছেন—তিনি তাঁহার ভজন-মন্দিরে বদ্ধ থাকিয়াও তাঁহার প্রাণবল্লভের নটবর নদীয়া-নাগর মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। "গৌর-রূপ-সাগরের পিছল ঘাটে" বিরহিণী প্রিয়াজির মন যেন পা পিছলিয়া একেবারে সটান পড়িয়া গেল—তিনি যেন আর উঠিতে পারিতেছেন না—তাঁহার অবস্থা এখন—

—"রূপ-লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর"—

মুদ্রিত কমল নয়নদ্বয়ে তাঁহার অবিরল প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে—তাঁহার মন গৌর-গুণ গান শ্রবণে বিভোর হইয়াছে—তিনি যেন মূর্ত্ত প্রেমভক্তি স্বরূপিণী হইয়াছেন।

সখি অমিতা পুনরায় গান ধরিলেন—

যথারাগ।

—"শারদ চন্দ্রিকা স্বর্ণ, ধিক্ চম্পকের বর্ণ,
শোণ-কুসুম গোরোচনা।
হরিতাল সে কোন ছার, বিকার সে মৃত্তিকার,
সে কি গোরা-রূপের তুলনা॥
ধিক্ চন্দ্রকান্ত মণি, তার বর্ণ কি সে গণি,
ফণি মণি সৌদামিনী আর।
ও সব প্রপঞ্চ রূপ, অপ্রপঞ্চ রসভূপ,
তুলনা কি দিব আমি তার॥
যত দেখ বর্ণন, অনুসারে উদ্দীপন
গৌররূপ বর্ণন কে করে।
জান না যে সেই গোরা, ধরা রূপে অঙ্গ ধরা,
দরশে ধৈরজ দূর করে॥
শুন ওগো প্রাণ সই, জগতে তুলনা কই
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই, যাঁর তুলনা তাঁর ঠাঁই
অমিয়া মিশাব কেন বিষে॥
কেবা তার গুণ গায়, গুণের কে ওর পায়,
কেবা করে রূপ নিরূপণ।
রূপ নিরূপিতে নারে, গুণ কে কহিতে পারে,
ভাবিয়া বাউল হৈল মন॥

পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই না পায় টের
যত দূর শক্তি উড়ি যায়।
সেইরূপ গৌরাঙ্গের, রূপের না পায় টের
অনুসারে এ লোচন গায়॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

আজ সখি অমিতার আর সে গম্ভীর ভাব নাই—নদীয়া-নাগরী ভাবটি যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আজ অমিতার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—তাঁহার নয়নে, বদনে, চাহনিতে ও প্রতিঅঙ্গভঙ্গিমাতে নাগরীভাবটি যেন পরিপূর্ণ পরিস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি আর একবার গৌরবল্লভার বদনমণ্ডলের প্রতি প্রেমবিস্ফারিত-লোচনে চাহিতেছেন—আরবার সখি কাঞ্চনার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া যেন পরম প্রেমভরে ঢলিয়া পড়িতেছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব গুপ্ত ভাব-সম্পত্তি দর্শনে সখিকাঞ্চনার মনে যেন হিংসার উদ্রেক হইতেছে। তিনি আর নীরব শ্রোতা থাকিতে পারিলেন না—তিনি সখি অমিতাকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারই ভাবের অনুকূল আর একটি গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"নবদ্বীপ নাগরী আগরি গোরা-রসে।
কহিতে গৌরাঙ্গ-কথা প্রেম-জলে ভাসে॥
ভাবভরে ভাবিনী পুলক ভরে ভোরা।
শ্রবণে নয়নে মনে গোরা গোরা গোরা॥
গোরা-রূপ-গুণ-অবতংস পরে কাণে।
দিবানিশি গোরা বিনা আন্ নাহি জানে॥
গোরোচনা নিবিড় করিয়া মাথে গায়।
যতন করিয়া গোরা নাম লেখে তায়॥
গোরোচনা হরিদ্রার পুতলী করিয়া।
পূজয়ে চক্ষের জলে প্রাণ ফুল দিয়া॥
প্রেমনেত্রে প্রেমজল ঝরে দু'নয়নে।
তায় অভিসিঞ্চে গোরার রাঙ্গা দু'চরণে॥
পিরীতি-নৈবেদ্য তাহে বচন তাম্বুল।
পরিচর্য্যা করে ভাব সময় অনুকূল॥
অঙ্গ কান্তি-প্রদীপে করয়ে আরত্রিকে।
কঙ্কণ শবদে ঘণ্টা আনন্দ অধিকে॥
অঙ্গ গন্ধ ধূপ ধুনা বহে অনুরাগে।
পূজা করি দরশ-পরশ-রস মাগে॥
দিনে দিনে অনুরাগ বাড়িতে লাগিল।
লোচন বলে এত দিনে জ্ঞান-শেল গেল॥"
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনার এই গানটী নদীয়া-নাগরীর অপূর্ব্ব ভাবসম্পত্তিমণ্ডিত—সখি অমিতার প্রতি অঙ্গে এই সকল ভাব-ভূষণ লক্ষিত হইতেছে—এই সমুদয় ভাব-মাধুর্য্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অনুভূত হইতেছে। সখি কাঞ্চনার লক্ষ্যস্থলই প্রিয় সখি অমিতার এই অপূর্ব্ব ভাব-সম্পত্তির পরমোজ্জ্বল মাধুর্য্য মণ্ডিত দেহখানি।

গৌরবিরহিণী গৌর-বল্লভা এতক্ষণে চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন,—গোরারূপ-সাগরে তিনি ঝম্প প্রদান করিয়া নদীয়া-নাগরী-ভাব-রত্নরাজি আহরণ করিয়া পরমানন্দে মৃদুমধুর হাস্ত করিতেছেন। সখিদ্বয় উভয়েই তাহা মনে মনে বুঝিতেছেন এবং স্বচক্ষে দেখিতেছেন। তাঁহাদের প্রাণে আজ অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দের তরঙ্গ ছুটিয়াছে—তাঁহাদের মনে আজ নদীয়া-নাগরী-ভাবের অফুরন্ত উৎস ফুটিয়াছে।

সখি কাঞ্চনার গানটী শেষ হইলেই বিরহিণী গৌরবল্লভা সখি অমিতার বদনের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিলেন —সে চাহিনির মর্ম্ম—"সখি! আর একটী গান তুমি গাও"।

সখি অমিতা পুনরায় প্রেমাবেশে পূর্ব্ববৎ গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"আমার গৌরাঙ্গ নাচে হেম কিরণিয়া।
হেমের গাছে, প্রেমের রস, পড়্ছে চৌয়াইয়া॥
ঠার ঠমকা, কাঁকাল বাঁকা, মধুর মাখা হাসি।
রূপ দেখিতে, জাতি কুল, হারাই হারাই বাসি॥
অদ্‌ভূত, নাটের ঠাম, গোরা অঙ্গের ছটা।
রূপ দেখিতে হুড় পড়েছে, নব যুবতীর ঘটা॥
মন মজিল, কুল ডুবিল, বৈছে প্রেমের বান্।
লোচন বলে, মদন ভোলে, আর কি আছে আন্"॥
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌর-বল্লভা গভীর অভিনিবেশের সহিত তাঁহার প্রাণবল্লভের অপরূপ রূপাভিসারের গানগুলি শুনিতেছেন—আর প্রেমানন্দে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহার প্রসন্ন বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে—তাঁহার প্রফুল্লবদনে

মৃদুমধুর হাসির রেখা দেখা দিতেছে—তাঁহার চক্ষের উপর যেন তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপূর্ব্ব নদীয়াবিলাস-লীলারঙ্গ উদ্ভাসিত হইতেছে। তিনি প্রেমানন্দ-সাগরে মগ্ন আছেন। সখি অমিতার প্রাণে আজ যেন নদীয়া-নাগরীভাবের অফুরন্ত উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি পুনরায় গান ধরিলেন—

রাগ—কল্যাণী।

—"অরুণ কমল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখা,
ডুবু ডুবু করুণা-মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমা চাঁদে, ছটায় পরাণ কাঁদে,
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে।
আনন্দ নদীয়াপুরে, টল মল প্রেমার ভরে,
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে,
মদন মোহন নটরাজে॥
পুলক পূরল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়,
রোমচক্রে সোণার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
আধ বাণী কহে কম্বুকণ্ঠ॥
শ্রীপাদ-পদ্ম-গন্ধে, বেড়ি দশ নখ চাঁদে,
উপরে কনক বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, রাঁ ঝলমল করে,
চমকয়ে অমর সমাজ॥
সপ্ত দ্বীপ মহী মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি, গুণ সঙ্কীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন হেন,
হুঙ্কার-হিল্লোল প্রেম-সিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে, জগত পড়িল ভোলে,
দুকুল খাইল কুলবধূ॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলা বিনোদ বিলাস।
কোটি কোটি কুসুমধনু, জিনিয়া বিনোদ তনু,
তাহে করে প্রেমার প্রকাশ॥
লাখ্ লাখ্ পূর্ণিমা চাঁদে, জিনিয়া বদন ছাঁদে,
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ান অঞ্চল ছলে, ঝর ঝর অমিয়া ঝরে,
জনম মুগধ পাইল প্রেমা॥
কি কব উপমা সার, করুণা বিগ্রহসার,
হেন রূপ মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে,
আনন্দে লোচন দাস গায়॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

যথারাগ।

—"অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে পড়িল গোরা দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধুই সুনেহ॥
অনুরাগের দর্পিখানি, প্রেমার সাঁচনা দিয়া,
কেবা গড়িল আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মধু, লহু লহু কথা খানি,
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি॥
অখণ্ড পীযূষ ধারা, কে বা আউটিল গো,
সোনার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেনি তুলাইল গো,
হেন বাসি গোরা অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাঁটিয়া কেবা, গা খানি মাজিল গো,
চান্দে মাজিল মুখ খানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমার চান্দে, বিকল হৈয়ে কান্দে
কর পদ-পদুমের গন্ধে।
কুড়িটি নখের ছটায়, জগৎ করেছে আলো,
আঁখি পাইল জনমের আন্ধে॥
এমন বিনোদ রায়, কোথাও দেখিয়ে নাই,
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া বিকল গো,
নারী বা কেমনে প্রেম বান্ধে॥
সকল রসের রাশি, বিলাস হৃদয় খানি,
কে না গড়িল রঙ্গ দিয়া।

রদন বাটিয়া কেবা, বদন গড়িল গো,
বিনি ভাবে মো মন্থ কান্দিয়া ॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা ॥
ও রূপ স্বরূপা যত, কুলের কামিনী গো,
দুই হাতে করিতে চাহে পাখা ॥
রঙ্গের মন্দির খানি, নানা রত্ন দিয়া গো,
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা, ভাবের বিলাস গো,
মদন বেদনা ভাবি কান্দে ॥
না চাহে আঁখির কোনে, সদাই সভার মনে,
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি, সুখের পিয়াস গো,
আলসল জর জর গায় ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভরড়ে,
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ভূমিতে লোটাঞা কান্দে, কেহ স্থির নাহি বান্ধে,
গোরা গুণ অমিয়া অখণ্ড ॥
ধাওরে ধাওরে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহ নাচে কেহ অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বধু সে বলে সকল যাউ
গোরা-গুণ রূপের বাতাসে।
নদীয়া-নগর-বধু, হেরি গোরা-মুখ-বিধু,
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে,
মন মাঝে সদাই ধেয়ায় ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে গণে রাত্রি দিবা,
গোরা গুণে লাগি গেল ধান্দা ॥
অখিল ভুবনপতি, ভূমিতে লুঠাঞা কান্দে
সদাই সোঙরে রাধা রাধা ॥
লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেম অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে তনু, বাহির না হয় গো,
এই গোরা-তনু তার সাখী ॥
দেখরে দেখরে লোক, গোরা অতি অপরূপ,
ত্রিজগত-নাথ নাথ হঞা।
অকিঞ্চনের সঙ্গে, কি জানি কি ধন মাগে
কিবা সুখে বুলয়ে নাচিয়া ॥
জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেম-রসালয়,
ভাঙ্গি বিলাইল গোরা রায়।
নির্জীব জীবন পাইল, পঙ্গুগিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচন গুণ গায় ॥"

সখি অমিতার হৃদয়খানি নদীয়া নাগরী-ভাবের ফল্গুনদী। ঠাকুর লোচনদাসের নদীয়া নাগরী-ভাবের পদাবলী অপেক্ষাও নরহরি সরকার ঠাকুরের নদীয়ানাগরী-ভাবের পদাবলী সখি অমিতার বড় প্রিয়—কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে এ সকল পদ কখনও গান করেন নাই—এই তাঁহার প্রথম লোকসমক্ষে অন্তরের গুপ্তভাব স্ফুরণ—আর এই লোক সকল কে? তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম মর্ম্মী সখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও কাঞ্চনা। ইতিপূর্ব্বে এ সকল মধুর রসের পদাবলী ইহাঁদিগের সম্মুখেও কখন তিনি গান করেন নাই। নিজেনিজেই নির্জ্জনে বসিয়া একাকিনী এই সকল মধুর রসের পদাবলী তিনি আস্বাদন করিতেন—ইহাই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু আজ সখি অমিতার এই স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিয়া সখি কাঞ্চনা ও বিরহিণী প্রিয়াজি উভয়েই স্তম্ভিত হইয়াছেন। মহা গম্ভীরাপ্রকৃতি সখি অমিতার এইরূপ প্রগল্‌ভতাতে তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আজ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি বহুবিধ রস-ভাব-কলা প্রদর্শন করিয়া এবং নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া প্রাণ খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছেন—তাঁহার প্রাণের গুপ্তভাব-সম্পত্তি, মনের আজন্মপোষিত গুপ্তরস-ভাণ্ডার- হৃদয়ের বহু দিনের গচ্ছিত ধন—আজ তিনি প্রাণ ভরিয়া মনের সাধে হৃদয়-কপাট উন্মোচন করিয়া প্রাণের মর্ম্মী সখিদ্বয়কে অকাতরে দান করিতেছেন—তাঁহার নিজের মনেও আনন্দের সীমা নাই-- শ্রোতা সখি-দ্বয়েরও প্রাণেও ভরপুর আনন্দ! নদীয়ায় মহাগম্ভীরা-মন্দিরে আজ প্রেমানন্দের তুফান উঠিয়াছে।

বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণে আজ নদীয়া-বিলাসের পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি সকল একে একে জাগিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার হৃদি-সমুদ্রে প্রেমতরঙ্গের অপূর্ব্ব হিল্লোল উঠিয়াছে। সখি অমিতা তাহা বুঝিতে পারিয়াই পুনরায় গান ধরিলেন।

—"দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, গোরাচাঁদ না হেরিলে,
মরমে মরিয়া যেন থাকি।
সাধ হয় নিরন্তর, হেম কান্তি কলেবর,
হিয়ার মাঝারে সদা রাখি॥
তিলেক না দেখি তায়, পাঁজর খসিয়া যায়,
ধৈরয ধরিতে নাহি পারি।
অনুরাগের ডোরি দিয়া, অন্তর বাহির হিয়া,
না জানি তার কত ধার ধারি॥
সুরধুনি তীরে যাঞা, কুল দিব ভাসাইয়া,
অনল জ্বালিয়া দিব লাজে।
গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি, দেখিব নয়ন ভরি,
দিন গেল মিছামিছি কাজে॥
হাম নারী-কুলবালা, গৌরাঙ্গ-কলঙ্ক-মালা,
গলায় পরিতে সাধ লাগে।
মুরারি গুপুতে বলে, ভাল মোরে দাগা দিলে,
গোপত গৌরাঙ্গ অনুরাগে"—

গানটী শেষ করিয়া গৌরপ্রেমোন্মত্তা সখি অমিতা কিছুক্ষণ নীরবে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির বদনমণ্ডলের ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতেছেন গৌরবল্লভার বদনমণ্ডল গৌরানুরাগরঞ্জিত,—তাঁহার কমল নয়নদ্বয় গোরাপ্রেমে আরক্তিম,—তাঁহার বদন-প্রান্তে গৌর-প্রেমানুরাগরঞ্জিত মৃদুমধুর হাসির রেখা,—এক কথায় তাঁহার প্রতি অঙ্গ যেন গৌর-প্রেম-রস-সিঞ্চিত এবং হৃদয়খানি যেন গৌর-প্রেম-রসভাবিত। সখি কাঞ্চনাও তদ্রূপ ভাবে ভাবিত হইয়াছেন,—অধিকন্তু সখি অমিতার গানে আজ যে গৌরপ্রেম-বিস্ফুরিত অপূর্ব্ব সুধা রাশির উদ্গম হইয়াছে,—তাহারও সম্যক আস্বাদন করিতেছেন। এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে প্রিয়াজি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সখি কাঞ্চনার প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন "সখি কাঞ্চনে! অমিতার আজ বড় পরিশ্রম হইয়াছে—তাঁহার কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি ঠাকুর নরহরির রচিত গৌর-প্রেমের পদাবলী-সমুদ্র হইতে দুএকটী রত্ন উদ্ধার করিয়া আমাকে শুনাইয়া কৃতকৃতার্থ কর। তোমাদের মুখে গৌর-গুণগান শ্রবণই আমার এখন জীবন-সম্বল। তোমরা না থাকিলে আমার অদৃষ্ট যে কি হইত, তাহা বলিতে পারি না। সখি! প্রাণের সখি! গৌর-রূপ-গুণ-গান করিয়া এ তাপিত প্রাণ শীতল কর।"

সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"প্রিয় সখি! মুরারি গুপ্তঠাকুরের আর একটী পদ গাহিয়া তবে ঠাকুর নরহরির পদাবলী কীর্ত্তন করিব"। এই বলিয়া তিনি তাঁহার কলকণ্ঠের মধুর স্বরে গানের ধুয়া ধরিলেন।

রাগ—সুহই।

"সখি হে! ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ ধ্রু॥
নয়ান পুতলী করি, লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুণ জ্বালি, সকলি পুড়াইয়াছি,
জাতি-কুল-শীল-অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে, এ তনুটি ভাসায়েছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে,
গৌর বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপুতে কহে, পিরীতি এমতি হয়,
তার গুণ তিন লোকে গায়॥"—

বিরহিণী গৌরবল্লভা নীরবে বসিয়া গান শুনিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতেছেন মুরারি গুপ্তের মত বিজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিতলোকে বলিতেছেন—গৌর-প্রেম-সমুদ্র-জলে—

"এ তনুটি ভাসায়েছি, কি করিবে কুলের কুকুরে,"
পুনরায় তিনি বলিতেছেন—
—"খাইতে শুইতে রইতে, আন্ নাহি লয় চিতে
গৌর বিনা আন নাহি ভায়"—

আর লোকে আমাকে "গৌর-বল্লভা,—গৌর-কান্তা,—গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী" বলিয়া সম্বোধন করে,—আমি লজ্জায় প্রাণে মরিয়া যাই—আমি আমার প্রাণবল্লভের জন্য কি করিতেছি—এখনও কুলের কুলবধূ আমি,—কুলের বাহির হইতে আমি পারি নাই—আমি খাইতে শুইতে সর্ব্বক্ষণ

গৌর-নাম লইতে পারি না,—আমার জীবনে শত ধিক !" গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজি মনে মনে এইরূপ আত্মবিলাপ করিতেছেন,—আর অনুতাপানলে তিনি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন—কিন্তু তাঁহার মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ নাই।

সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয় সখির মনোভাব বুঝিয়াই পুনরায় মুরারি গুপ্তঠাকুর রচিত আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—সুহই।

—"সখি হে ! কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া, দিয়া সেই পদ ছায়া
বঞ্চল এ অভাগিরে কাহে ॥ ধ্রু ॥
গৌর-প্রেমে সঁপি প্রাণ, জিউ করে আন চান্
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম, পিরীতি না করিতাম,
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে ॥
আমি ঝুরি তার তরে, সে যদি না চায় ফিরে,
এমন পিরীতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে, বজর কেপিলে তাহে,
যায় ফাটি যায় কিনা বুক ॥
মুরারি গুপুতে কয়, পিরীতি সহজ নয়,
বিশেষে প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর,
তবে সে পাইবা শচী-বালা"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই পদ-রত্নটী পদকর্ত্তা মুরারি গুপ্তঠাকুর বিরহিণী প্রিয়াজির ভাবে বিভাবিত হইয়াই লিখিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিত্যপার্ষদ এবং আদিলীলা-লেখক। তিনিও গৌর-নাগরীভাবের সাধক ছিলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভার দুঃখে তিনি মরমে মরিয়া আছেন এবং তাঁহারই ভাবে বিভাবিত হইয়া পদকর্ত্তার হৃদয়ে এই পদরত্নটীর ভাবাঙ্কুর স্ফুরিত হইয়াছে। গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজির মনে কিন্তু এই গানটী শুনিয়া ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণা—তিনি বুঝিয়াছেন যে মুরারি গুপ্তঠাকুর তাঁহারই ভাবে বিভাবিত হইয়া এই পদটী রচনা করিয়াছেন এবং পদের ভণিতায় তাঁহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি উপদেশ দিতেছেন—

—"কুল মান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচী-বালা।"—

প্রিয়াজির এইরূপ ভাবিবার অবশ্য কারণ আছে। তিনি যে কুলের কুলবধূর ন্যায় গৌরশূন্য গৌরগৃহে আবদ্ধ আছেন। কিন্তু ইহা যে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের আদেশ,—এবং তাঁহার আদেশই যে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। একথা তিনি বুঝেন না এমন নহে। তবে বুঝিয়াও তাঁহার মন বুঝে না—ইহাই লীলাময়ী গৌরবল্লভার অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ। এই লীলারস-মাধুর্য্য পুষ্টির জন্যই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের এরূপ পদ-রচনা-কৌশল-জাল বিস্তার।

সখি কাঞ্চনা বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনোভাব বুঝিয়াই তাঁহার গৌর-বিরহ-রস-পুষ্টিকল্পে আরও দু'একটী প্রাচীন নদীয়া-নাগরীভাবের পদ গাহিবার সংকল্প করিলেন। প্রিয়াজির আদেশ ছিল ঠাকুর নরহরির পদ শুনাইতে, কিন্তু সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির অনুমতি লইয়াই তাঁহার নরহরি ঠাকুরের মধুর পদাবলী গানের গৌরচন্দ্রিকারূপে এই সকল প্রাচীন পদরত্ন কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি তাঁহার মধু হইতেও মধুকণ্ঠে ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—কামোদ।

—"কি ক্ষণে দেখিনু গোরা, নবীন কামের কোঁড়া,
সেই হইতে রইতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল, কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী তীরে ॥
বিধি, তো বিনু বুঝিতে কেহ নাই।
যত গুরু-গরবিত, গঞ্জন বচন কত
ফুকরি কাঁদিতে নাই ঠাঁই ॥ ধ্রু ॥
অরুণ নয়নের কোনে, চাঞাছিল আমা পানে,
পরাণে বড়শী দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর, ছারখারে যাউক গো
না জানি কি হবে পরিণামে ॥
আপনা আপনি খাইনু, ঘরের বাহির হইনু,
শুনি খোল-করতাল নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাসে কয়, মরমে যার লাগয়,
কি করিবে কুল পরিবাদ ॥"
গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

পদকর্ত্তা প্রায় সকল মহাজনগণই নাগরীভাবে বিভাবিত হইয়া পদ লিখিয়া নদীয়ানাগরী ভাব পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন—

আর কুলশীল মানের কথা তুলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। উক্ত পদটিতে নদীয়ানাগরীভাবাপন্ন পদকর্ত্তা বলিতেছেন—

—"কুলের ধরম মোর ছারখারে যাউক গো"—

গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী মনে মনে ভাবিতেছেন তাঁহার প্রাণ-বল্লভ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন,—"তুমি আমার গৃহে বসিয়া ভজন কর,—ঘরের বাহির হইও না"—মহাজন-বাক্যে আর তাঁহার বাক্যে ঐক্য নাই কেন? আমার মত অভাগিনীর পক্ষে কি কিছু বিশেষ নিয়ম আছে? এইরূপ প্রশ্ন প্রিয়াজির মনে উঠিতেছে। ইহার সমাধান কে করিবে? গৌর-বল্লভা বড় গম্ভীর প্রকৃতি—অনেক কথাই মনে মনে গোপনে রাখেন—তিনি নিজেই মনে মনে তাহার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু আজ তিনি এই প্রশ্নটি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার দ্বারা সমাধান করিতে বাসনা করিয়া গানটি শেষ হইলেই প্রাণের কথাটী তাঁহাকে কহিলেন। উত্তরে সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া কহিলেন "প্রিয় সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার প্রাণবল্লভ চতুরচূড়ামণি—তোমার সঙ্গেও তিনি ছলচাতুরী অনেক স্থলেই করিয়াছেন,—এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁহার সে চতুরতার পরিচয় দেন নাই। সখি তোমার প্রাণ-বল্লভ তোমাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়া স্বয়ং ঘরের বাহির হইয়াছেন—তোমার কুল-শীল-মান বজায় রাখিয়া নিজের কুল শীল-মান হারাইয়া তাঁহার প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধানে ভিখারীর বেশে দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়া পরিশেষে নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে নির্জ্জনে বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন—আর কৃষ্ণবিরহ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন! প্রাণ সখি! কৃষ্ণ-ধন বাহিরের বস্তু নহে—অন্তরের ধন পরম রতন—তাঁহাকে অন্তরেই রাখিতে হয় অতি সঙ্গোপনে। সখি! গৃহে বসিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যায়—মনের মধ্যে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁহার স্থান—বাহিরে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া কোন বিশেষ ফল নাই। তোমার প্রাণ-বল্লভ সমগ্র ভারতবর্ষের তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে আসিয়া নির্জ্জনে বসিয়াছেন। প্রিয় সখি! তুমি তাঁহার প্রাণ-প্রিয়তমা প্রাণাধিকা প্রাণ-বল্লভা,—তোমাকে তিনি প্রকৃত ভজন-পথই দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। তিনি চতুরচূড়ামণি হইয়াও নিজেই ঠকিয়াছেন; কিন্তু তোমাকে ঠকাইতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই, কিম্বা সাহস হয় নাই। মহাজনের ভজন-পথ স্বতন্ত্র—আর তোমার ভজন-পন্থা স্বতন্ত্র। প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার মত স্বতন্ত্রার কুল-শীল-মানের ভয় থাকিতেই পারে না। তুমি গৃহে বসিয়াই যে সে সমস্ত ত্যাগ করিয়াছ। সখি তোমার প্রাণের কথাটি আমাকে খুলিয়া বল দেখি তোমার প্রাণ-বল্লভ নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া এখন যাহা করিতেছেন—তুমি তাঁহার গৃহে বসিয়া ঠিক তাই করিতেছ কিনা?"

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখির কথাগুলি সকলি ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন—কিন্তু আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি সে কথা আর না তুলিয়া সখি কাঞ্চনাকে ঠাকুর নরহরি সরকারের পদাবলী কিছু গান করিতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সহিত কহিলেন—প্রাণ-সখি! ঠাকুর নরহরির গান পরে গাহিতেছি—এখন আগে একটী তোমার প্রাণ-বল্লভের অপূর্ব্ব রূপাভিসারের প্রাচীন পদ গাহিয়া তোমাকে শুনাইয়া ধন্য হই'—এই বলিয়া তাঁহার কলকণ্ঠে গানের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—গৌরী।

—"মরি না লো নদীয়ার মাঝারে ওনা রূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা শোভে মুখের পরিপাটি।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দু'টি॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি পরাণ কোথা রয়॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গন ফুলের মালা।
কত রস-লীলা জানে কত রস-কলা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥
দেবকীনন্দন বলে শুনলো আজুলী।
তুমি কি জান না গোরা নাগর বনমালী॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই গানটি শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। পরে সখি কাঞ্চনার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার প্রাণ-বল্লভকে সকল মহাজনগণই নাগরেন্দ্র বলিয়া

স্বীকার করিয়াছেন— পুরুষ যোষিৎ সকলেই তাঁহার অপরূপ রূপাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন—তিনি যে বহুবল্লভ,—ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। নদীয়ানাগরীবৃন্দ আমার প্রাণবল্লভের রূপমুগ্ধা— তাঁহাদের ভাবটী অতি বিশুদ্ধ—আমার ইহা বড়ই ভাল লাগে। সখি! এই ভাবের পদ আরও গান কর—আমি শুনিয়া কৃতার্থ হই"।

সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির ইঙ্গিৎ পাইয়া প্রেমানন্দে গান ধরিলেন।

রাগ—বসন্ত।

"নীলাচলে কণকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥
দেবকুমারী নারীগণ-সঙ্গ।
পুলকে কদম্ব কয়ম্বিত অঙ্গ॥
ফাগু খেলত গৌরতনু।
প্রেম-সুধাসিন্ধু মুরতি যনু॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
বঙ্ক নয়নে ঝরে অরণহি নীর॥
কণ্ঠে হি লোহিত অরুণিম মাল।
অরুণ ভকতগণ গায় রসাল॥
কত কত ভাব বিথারল অঙ্গ।
নয়ন ঢুলায়ত প্রেম-তরঙ্গ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দ দাস॥"

পদামৃত সমুদ্র।

গৌর-বল্লভা অতিশয় মনোযোগের সহিত এই পদরত্নটী শ্রবণ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন গৌরাঙ্গপার্ষদ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস একি বলিতেছেন? তিনি বলিতেছেন নীলাচলে আমার প্রাণবল্লভ হোলি উৎসবে প্রেমরঙ্গে "দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে" ফাগু খেলিতেছেন। পণ্ডিত গদাধর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া লহু লহু হাসিতেছেন। আমার সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভের সঙ্গে এ সকল দেবকুমারীগণ প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া ফাগু খেলিতেছেন। ইহারা কে? গৌরবল্লভা এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছেন। সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির মনোভাব বুঝিয়াছেন—তিনি তাঁহারই কায়ব্যূহ—তিনি গৌর-বল্লভার নাড়ি নক্ষত্র সকলই জানেন—তাঁহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিতে পারেন। সখিকাঞ্চনা মৃদু মধুর হাসিয়া কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি যাহা ভাবিতেছ,—আমি তাহার উত্তর দিতেছি। তুমি ভাবিতেছ নীলাচলে তোমার সন্ন্যাসী-প্রাণবল্লভের সঙ্গে দেবকুমারীগণ কেন? ইহারা কে? ইহার উত্তর আমি দিতেছি—এই দেবকুমারীবৃন্দই নদীয়া-নাগরীবৃন্দ—ইহাদিগের মধ্যে তুমি আমি সকলেই আছি। তোমার প্রাণবল্লভ তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত এবং এই স্বরূপশক্তির সখিবৃন্দের সহিত স্ব-স্বরূপেই অর্থাৎ নদীয়ানাগর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভরূপেই তিনি নীলাচলে বসিয়া এই অপূর্ব্ব প্রেমলীলারঙ্গ করিতেছেন। ইহাতেই তোমার মনে খট্‌কা লাগিয়াছে। কিন্তু অবিচিন্ত্য মহাশক্তিসমন্বিত তোমার প্রাণবল্লভের এইরূপ লীলারঙ্গ শাস্ত্রদৃষ্টিতে কোনরূপ দোষাবহ নহে"—

গৌরবল্লভা নীরবে সকল কথাই শুনিয়া গেলেন—বহুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। পরে সখি কাঞ্চনার প্রতি চাহিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"তোমাদের নদীয়া নাগর শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের মর্ম্ম তোমরাই ভাল জান—আমি কিছুই জানিনা—আমি এইমাত্র জানি তিনি আমার প্রাণবল্লভ, আর আমি তাঁহার শ্রীচরণের দাসী"। ঐশ্বর্য্যভাবের কথা উঠিলেই গৌরবল্লভা এই ভাবেই উত্তর দেন—ইহাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাব—তিনি বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী এবং তাঁহার এই অপূর্ব্বভাবে তাঁহার ও তাঁহার প্রাণবল্লভের ঐশ্বর্য্যের লেশাভাসও নাই।

সখিকাঞ্চনা তখন পুনরায় আর একটী গানের ধুয়া ধরিলেন। এই প্রাচীন পদটি জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত

রাগ—শ্রীরাগ

"নিন্দই ইন্দু বদন-রুচি সুন্দর, বদনহি নিন্দই কুন্দ।
বদন ছদন রুচি নিন্দই সিন্দুর
ভুরু যুগ ভুজগ-গতি নিন্দ।
আজু কহবি গৌর যুবরায়।
যুবতী-মতি হর, তোহারি কলেবর,
কুলবতী কি করু উপায়॥ ধ্রু॥

সুরধুনী তট গত, হরিণ-নয়নী যত,
গুরুজন কয়ইতে আঁধে।
কত কত গোপত, বরত করি অবিরত,
পড়ি তছু লোচন ফাঁদে॥
তুয়া মুখ সদৃশ, সুধাকর নিরজনে,
নিরখিতে যব কহ মন্দ।
কঙ্কণ ঘাত মাথে, দেই কাঁদই,
কি করব জগত আনন্দ॥"

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

প্রিয়াজি যে ঠাকুর নরহরির পদ শুনিতে চাহিয়াছিলেন গৌরপ্রেমানন্দে সখিকাঞ্চনা সে কথাটি ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়খানি এখন পণ্ডিত জগদানন্দের গৌরপ্রেমানুভবরাগে রঞ্জিত—তিনি এখন সেই গৌরপ্রিয়তম গৌরাঙ্গ-পার্ষদবরের ভাবেই বিভাবিত হইয়া পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—শ্রীরাগ।

—"দুরহি নব নব, সুরতরঙ্গিনী সব,
যৈখনে পেখনু তোয়।
রূপক কূপে মগন, ভেল তৈখন,
লখই না পারই কোই॥
শুনহ গৌর দ্বিজরাজ।
তুয়া পরসঙ্গ হোত, নিতি ইত উত,
অভিনব যুবতী সমাজ। ধ্রু।
কোই কহ কণক- মুকুর, কোই কহ,
নহ কনক-কমল কিবা হোই॥
কোই কহ নহ, নহ, শরদ সুধাকর,
কোই কহ নহ মুখ সোই॥
গুরুজন নয়ন—প্রহরিগণ চৌদিকে
নিশি দিশি রহত আগোরি।
কি করব অবিরত, আবেকত রোয়ত,
জগদানন্দ কহ তোরি॥"

বিরহিণী প্রিয়াজি বিনা বাক্য ব্যয়ে নীরবে গান শুনিয়া যাইতেছেন—এ সকল পদরত্নাবলী তিনি পরম প্রেমানন্দে সখিমুখে আস্বাদন করিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন—"গুরুজন-নয়ন-প্রহরীগণের কড়া পাহারার মধ্যে থাকিয়াও রূপমুগ্ধা নদীয়ার কুলবধূগণ গৌর-রূপ-সুধা পান করিতেন এবং গৌরভক্ত মহাজনগণ এই সকল গৌররূপ-মুগ্ধা গৌরানুরাগিণী নদীয়া-নাগরীগণের ভাবে বিভাবিত হইয়া এই সমুদয় মধুর পদাবলী রচনা করিয়া জীবজগতে মধুর রসের অফুরন্ত উৎস খুলিয়া দিয়াছেন। এই মধু হইতেও মধু পদাবলীসমুদ্রে একবার যাঁহার চিত্ত ডুবিয়াছে,—তিনি আর উঠিতে চাহেন না—তিনি নিয়ত এই সুধা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন—কিন্তু তীরে উঠিবার শক্তি নাই।

সখিকাঞ্চনার হৃদয়খানি আজ গৌর-পদ-সমুদ্রের উচ্ছলিত তরঙ্গে উদ্বেলিত। তিনি পদের উপর পদ গাহিতেছেন—শ্রোতা মাত্র দুইটি—সখি অমিতা ও প্রিয়াজি। এখনও ভজনমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ—বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন যে দিবাভাগ—গৌর-বিরহিণী-ত্রয়ের তাহা জ্ঞান নাই—গৌরপ্রেমানন্দে তাঁহাদের দিবা-রাত্রি জ্ঞান নাই—দেহানুসন্ধান নাই—আহার নিদ্রার প্রয়োজন হয় না। সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে পুনরায় গান ধরিলেন।

রাগ—শ্রীরাগ।

নদীয়াপুরে নিজ নয়নে নিরখনু নবীন দ্বিজ যুবরাজ।
যতনে কত শত যুবতী রূপ সেবই
তেজি কুল মান লাজ।
অব তোহে কি কহব আন।
মাহরি তছু বদন সঙরিতে কি জানি
কি করু পরাণ॥ধ্রু।
ক্ষীণ কটিতটে চিন ভব পট
নীল নীরদ কাঁতি।
তিথরি হেম জঞ্জির তছুপর
যৈছে দামিনী পাঁতি॥
চলত মদ মাতয়াল
তরুণ গতি অতি মন্দ।
সতত মানস- সরসী বিলসই
কি করু জগত আনন্দ॥"—

সখি কাঞ্চনা আজ গৌরপ্রেমোন্মাদিনী ভাবে পরমানন্দে তাঁহার সঙ্গীতবিদ্যার পূর্ণ পরিচয় দিতেছেন—তিনি সঙ্গীত-বিদ্যাসিদ্ধা—তাঁহার পরিপূর্ণ শক্তি সমুদয় তিনি আজ সঙ্গীত-কলা পরিচর্য্যাতে নিয়োজিত করিয়াছেন। গানের আর

বিরাম নাই, তিনি তাঁহার কলকণ্ঠে পুনরায় গান ধরিলেন—

রাগ—শ্রীরাগ।

"—মুখ কিয়ে কমল, কমল নহ কিয়ে মুখ,
মুখ নহ কমল বা হোয়।
মনমাহা পরম, ভরম উপজায়ত,
বুঝইতে সংশয় মোয়॥
মাইরি! সুরধুনী তীরে নেহারি।
বারত অলখিত, করত গতাগতি,
লোচন মধু পি গোঙারি॥ধ্রু॥
সু মরণে যাক, শিথিল নীবিবন্ধন
হোয়ত গুরুজন মাঝ।
দরশনে তকি থিরজ ধরু কো ধনী,
পড়ু কুলবতীকুলে লাজ॥
হৃদয়-রতন-পরিযঙ্ক উপরে চড়ি
বৈঠি সতত করু কেলি।
জগদানন্দ ভণ, এত দিনে দারুণ,
দ্বিজকুল-গৌরব গেলি।" —

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রাণবল্লভ নদীয়া-নাগর নটবর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের নদীয়া-বিহার লীলা-রসাস্বাদন করিতেছেন,—আর মনে মনে ভাবিতেছেন পূর্ব্বরাত্রিতে পর্য্যঙ্কোপরি যেভাবে ও যে বেশে বসিয়া আমার প্রাণবল্লভ আমাকে ক্ষণিকের জন্য দর্শন দান করিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন—সেই রসিকশেখর রসরাজ গৌরসুন্দর সতত আমার হৃদয়-পর্য্যঙ্কে বসিয়া সেইরূপ রসরঙ্গ করুন। পদকর্ত্তা জগদানন্দ পণ্ডিতও এই কথা বলিতেছেন।

—"হৃদয়-রতন-পর্য্যঙ্ক উপরে চড়ি বৈঠি সতত
কুরু কেলি"—

অতএব তিনি আমার প্রাণের কথাটি বলিয়াছেন। এই ভাবিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।

সখি কাঞ্চনার এখন মনে পড়িল প্রিয়াজি ঠাকুর নরহরির পদাবলী শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি সেই সকল পদাবলীর গানের পালা গাইবেন, এরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সখি অমিতা প্রিয়াজির বদনের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া সকাতরে নিবেদন করিলেন—

"প্রিয়সখি! এখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—তোমার নিয়মিত দৈনন্দিন ভজন-ক্রিয়া শেষ করিলেই ভাল হয়। রাত্রিতে ঠাকুর নরহরির পদাবলী কীর্ত্তন শুনিও।"—এই কথা শুনিয়া দেহানুসন্ধানরহিতা গৌর-বল্লভার যেন চমক ভাঙ্গিল। দিবা দ্বিপ্রহরে যে, এই সকল নিগূঢ় রসগান হইতেছিল—তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই—তিনি ভাবিতেছিলেন এখন রাত্রিকাল। কারণ রাত্রি-কালেই নির্জ্জনে এ সকল মধুর রসাস্বাদনের প্রকৃত সময়। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু মধুর হাসিয়া মধুভাষে কহিলেন "প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার প্রাণবল্লভের কথা শুনিতে পাইলে তোমার রাত্রি-দিন জ্ঞান থাকে না। গৌর-কথা-রসে মগ্ন হইলে তোমার দেহানুসন্ধান থাকে না—তোমাকে লইয়া আমরা বড় বিপদেই পড়িয়াছি।" বিরহিণী প্রিয়াজি, এই কথা শুনিয়া কিছু লজ্জিত হইলেন। আত্মপ্রশংসা শুনিয়া তাঁহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন "সখি! প্রাণসখি কাঞ্চনে! তোমরা সেই বল আমি আমাকে বিশেষ ভাবে জানি—আমার এতদিনেও গৌরনামে রুচি হইল না—দুর্দ্দৈবের কথা আর কি বলিব?" এই কথা বলিয়া পরম-প্রেমাবেশে তিনি প্রিয় সখির হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রেমগদ-গদ ভাষে কহিলেন—

—"সখি!

আমার নামে রুচি হবে কবে?
(গৌর) নাম করিতে, নয়ন ঝরিবে
শরীরে পুলক হবে।
দুখে গলে মন, ঝরে দু'নয়ন,
শরীরের ক্লেশ হ'লে।
(পদে) কাঁটাটি ফুটিলে, করি হায় হায়
ভাসি নয়নের জলে॥
গৌরাঙ্গ নামেতে, গলে না হৃদয়,
আসে না নয়নে জল।
(গৌর) নাম গানেতে মজিল না মন
(আমি) কেবলই করিয়ে ছল॥
চোখে জল আসে, নানা যাতনায়,
ভাবি আমি প্রেম হ'ল।

গৌরাঙ্গ নামেতে রুচি হ'ল বলে,
আঁখি করে ছল ছল॥
তখনি আবার যেমন তেমনি
শুষ্ক হৃদয় প্রাণ।
লোক মুখে শুনি, আত্ম-গরিমা
হৃদে ভরা অভিমান॥
কপট রোদন দেখায়ে সবারে
প্রেমিকা সাজিয়া আছি।
(আমার) কপা'লে আগুণ জীবনেতে ধিক
শত ধিক প্রাণে ছি ছি!

এই কথা বলিতে বলিতে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি কাঁদিয়া আকুল হইলেন—নিজ চক্ষুজল নিজ মলিন বসনাঞ্চলে নিজেই মুছিয়া পুনরায় ক্রন্দনের স্বরে কহিতে লাগিলেন—

সখি!
(আমার) নামে রুচি কবে হবে?
(গৌর) নাম স্মরণে, বহিবে নয়নে
শত ধারা নিশি দিবে॥
(প্রেম) গদ গদ ভাষে ডাকিব গৌরাঙ্গে
অমিয়া মধুর হবে।
হেন দিন কবে আসিবে আমার
(মোর) কপট ছলনা যাবে।
অধমা দুখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার
নামে রুচি নাকি হবে?
গৌর-গীতিকা।

এই বলিয়া গৌর-বল্লভা প্রেমবিহ্বলভাবে সখিদ্বয়ের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন,—আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। মর্ম্মী সখিদ্বয়ও বিমনা হইলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল—পরে সখীদ্বয় ভজনগৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। গৌর-বল্লভা তখন তাঁহার দৈনন্দিন ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অদ্য দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার নিয়মিত ভজন আরম্ভ হইল।

সখি অমিতার কথাই রহিল—রাত্রিতে ঠাকুর নরহরির মধুর ভাবের পদাবলীর রসাস্বাদন করিবেন গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি—গায়িকা কে হইবেন এখন স্থির নাই। সখি অমিতা ঠাকুর লোচনদাসের পদাবলী যেভাবে গান করিয়া প্রিয়াজিকে পরমানন্দ দান করিয়াছেন, তাহা কৃপাময় পাঠকপাঠিকাবৃন্দের অবশ্যই স্মরণ আছে। জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ!

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ,
৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৭
ত্রয়োদশী বুধবার,—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(২২)

—"তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভং শুভ্রোপবীত ধারিণং।
ধ্যায়েদ্বিশ্বম্ভরং বিষ্ণুপ্রিয়ালিঙ্গিত বিগ্রহং॥"—
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সহস্র-নাম-স্তোত্র।

অদ্য পূর্ণিমা তিথি—রাত্রি চারিদণ্ড হইয়াছে—পূর্ণিমার চন্দ্রদেব যেন প্রেমানন্দের হাসিরাশির উচ্চ লহরী তুলিয়াছেন—তারকারাজিও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত কুসুমের হাসির মত মধুর হাসিরাশির তরঙ্গ ছুটাইতেছে। নিম্নে সুরতরঙ্গিণী মৃদুল তরঙ্গভঙ্গী সহকারে পূর্ণিমার চাঁদের এবং তারকাগণের হাসিরাশি লুকিয়া লুকিয়া নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে কত না অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গী করিয়া প্রেমানন্দে মধুর নৃত্যবিলাস করিতেছেন। পূর্ণিমার শুভ্র চন্দ্রকিরণ গঙ্গাসলিলোচ্ছাসের শুভ্র ফেনপুঞ্জোপরি হিরকখণ্ডের মালার মত গঙ্গাবক্ষে হেলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। দূর হইতে বোধ হইতেছে সুরতরঙ্গিণীর উচ্ছসিত তরঙ্গরাজির শুভ্র ফেনপুঞ্জোপরি যেন অনবরত তুবড়ীর ফুল ফুটিতেছে।

বৈশাখী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের ফুল-দোলোৎসবে নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছে। গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য সুসজ্জিত এবং সুন্দরভাবে আলোকিত নবনবাকারের তরণীবৃন্দ অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। তদুপরি পত্রপুষ্পে সুশোভিত চন্দ্রাতপ তলে দিব্য চতুর্দ্দোল সুসজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া ভক্তবৃন্দ মধুর কীর্ত্তনবাদ্যে গঙ্গাতট মুখরিত করিতেছেন। সন্ধ্যাকালে নদীয়ার সুরধুনি-তটে বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছে,—সকলের মুখেই হরিধ্বনি।

এই আনন্দোৎসবের আর একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে—

সে উদ্দেশ্য নদীয়াবাসী গৌরভক্ত নরনারীবৃন্দের প্রাণের প্রবল গৌরানুরাগের মধুর স্মৃতির সহিত বিজড়িত। বৈশাখী-পূর্ণিমাতিথি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের শুভ পরিণয়ের স্মরণীয় সর্ব্বমঙ্গলা তিথি। নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ সেই ভুবনমঙ্গল শুভ দিনের পুণ্যস্মৃতি রক্ষাকল্পে প্রতি বৎসর নদীয়ায় একটী মহোৎসবের আয়োজন করেন। নদীয়ার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ ধনী জমিদার বুদ্ধিমন্ত খান প্রমুখ গৌরভক্তগণ এই মহোৎসবের ব্যয়ভার প্রতি বৎসর বহন করিয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের এই ভুবন-মঙ্গল যুগল-লীলা-রঙ্গ শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহার সন্ন্যাসলীলার পর হইতে প্রতি বৎসর অভিনীত হয়। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি গঠন করিয়া সুসজ্জিত বহুমূল্য রত্নসিংহাসনে স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে বাদ্যভাণ্ড, আলোকমালা, নৃত্যকীর্ত্তনগীতাদি নানাবিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও আনন্দপ্রদ দ্রব্য সম্ভারের সহিত নদীয়ার প্রশস্ত রাজপথে বহু লোক সমভিব্যাহারে এক প্রকাণ্ড মিছিল বাহির হয়। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার লিখিয়াছেন।

—"যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপযুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ ভবনে॥"—

এই যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের বার্ষিক শুভবিবাহ-লীলা স্মৃতি-উৎসব—ইহা কলিহত জীবের পক্ষে পারমার্থিক মঙ্গলপ্রদ এবং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির উপায়। শ্রীধাম নবদ্বীপে বর্ত্তমানে অনেক বৈষ্ণবীয় এবং অন্যান্য পর্ব্ব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে—তাহাতে প্রতি বৎসর বহু লোকের সমাগম হয়, বহু অর্থ ব্যয় হয়,—কিন্তু পরম দুঃখের বিষয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের শুভপরিণয়-স্মৃতি-মহোৎসবটির অনুষ্ঠান নাই—ইহা পরম পরিতাপের বিষয়। ১৮।২০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা জিলা নরসিংহদিগ্রামে কবিগুণাকর হরিচরণ আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরাঙ্গ আশ্রমে মহাসমারোহের সহিত স্বনামধন্য শ্রীল বসন্তসাধুপ্রমুখ পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজন-নিষ্ঠ ভক্তগণ কর্ত্তৃক বৈশাখী-পূর্ণিমা-তিথিতে এই উৎসবটি একবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বহু ভাগ্যবান্ ধনী গৌর-ভক্ত এই মহামহোৎসবে যোগদান করিয়া মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত পারমার্থিক ফল লাভ করিয়াছিলেন। বহুব্যয়ে এই পরম-মঙ্গলকর উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আজ বিরহিণী গৌর-বল্লভার দৈনন্দিন ভজনকৃত্যাদি সমাপন করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রসাদ পাইতেও রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইল। তৎপরে সমস্ত দিন উপবাসী সমাগত গৌর-ভক্তগণকে কণিকা প্রসাদ বিতরিত হইল। অদ্য রাত্রিতে তাঁহারা গৌর-বল্লভার শ্রীচরণ দর্শন পান নাই,—এই শুভ দিনে তাঁহাদিগের এই দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন। গৌর-শূন্য গৌর-গৃহে এরূপ কাণ্ড মাসের মধ্যে দশ দিন হয়। বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখি-মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভের নদীয়া-বিলাস-লীলা-রঙ্গ আস্বাদন করিতেছেন,—সুতরাং তাঁহার বিধি-নিয়মের দৈনন্দিন ভজন শেষ হইতে কখন কখন অধিক রাত্রি হইয়া যায়। তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপূর্ব্ব হৃৎকর্ণরসায়ন মধুর লীলারসে নিমগ্না হইয়া বিধিনিয়ম তিনি আর রক্ষা করিতে পারিতেছেন না—সে জন্য তিনি যেন লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন।

রাত্রি এক প্রহরের পর বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ ভজন-মন্দিরের উন্মুক্ত বারান্দায় বসিয়া সুস্নিগ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীতে সুরতরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতেছেন,—তাঁহাদের তিন জনেরই হস্তে হরিনামের জপমালা। যে স্থানটীতে তাঁহারা বসিয়াছেন—সেটি অতিশয় নির্জ্জন স্থান—কিন্তু সেখান হইতে গঙ্গার শোভা অতি সুন্দর দেখা যায়। তাঁহারা দূর হইতে দেখিতেছেন গঙ্গাগর্ভে দিব্য আলোক ও পুষ্পমালায় সুসজ্জিত একখানি নবনির্ম্মিত তরণীর উপরে অতি সুন্দর মহাঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-মূর্ত্তি শোভা পাইতেছেন,—আরও অনেকগুলি সুসজ্জিত নৌকার উপর বহু লোকে নানাবিধ বাদ্য-ভাণ্ডসহ নৃত্য-কীর্ত্তন-গীতাদি মহোৎসবে উন্মত্ত রহিয়াছে,—গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ লোকে লোকারণ্য—লোক-সংঘট্ট এত অধিক হইয়াছে যে গঙ্গাগর্ভে যাইবার পথ রুদ্ধ। চতুর্দ্দিকে **"জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ"** জয়ধ্বনি ঘন ঘন শ্রুত হইতেছে—গঙ্গাগর্ভে মধুর কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিয়াছে—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"

বহুদিন পরে আজ বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রসন্ন বদনে যেন মৃদুমধুর হাসির রেখা দেখা দিয়াছে—ইহা দেখিয়া সখী ও দাসীগণের আনন্দের আর সীমা নাই। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন।

বহুদিনের পর বিরহিণী প্রিয়াজির দুর্জ্জয় গৌর-বিরহ-জ্বালা যেন কথঞ্চিৎ প্রশমিত বোধ হইতেছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মধুময় অপূর্ব্ব নদীয়া-বিলাস-কাহিনীসকল সখিমুখে তিনি শ্রবণ করিতেছেন এবং সেই হৃৎকর্ণরসায়ন লীলা-রসাস্বাদনে প্রমত্ত হইয়া তাঁহার বিধিনিয়ম কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে। গৌর-বল্লভার সেরূপ প্রেমোন্মাদদশা এখন আর নাই—তিনি এখন অতিশয় ধীর ও প্রশান্তচিত্তে স্বীয় ভজনানন্দে কালাতিপাত করিতেছেন—ইহাতে তাঁহার মর্ম্মী সখিদিগের মনে বড় আনন্দ—তাঁহাদের হৃদয়ও পূর্ব্ব-স্মৃতি-জাগরণ-জনিত প্রেমোন্মাদমুভূতিতে পরিপূর্ণ।

গৌর-বল্লভা সকলই জানেন,—তথাপিও তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনমালাকে পরম প্রেমাবেশে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"সখি কাঞ্চনে! আজ গৌর-শূন্য নদীয়ার এ কিসের উৎসব? গৌরশূন্য নদীয়ায় গোরাচাঁদ নাই—এত আলোক-মালা কোথা হইতে আসিল? নবদ্বীপচন্দ্রের অভাবে নদীয়া-অন্ধকার ছিল,—অকস্মাৎ আজ একি দেখি?"

সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"প্রাণ সখি! তুমি কি জান না নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ তোমার প্রাণ-বল্লভকে ও তোমাকে কতখানি ভালবাসে। আজ বৈশাখীপূর্ণিমাতিথিতে তোমাদের শুভপরিণয়ের শুভ দিন। শচীনন্দনের সহিত তোমার শুভমিলন পুণ্য তিথিটি নদীয়াবাসীর পক্ষে স্মরণীয় ও আরাধনীয়। তাই আজ নদীয়াবাসী সর্ব্বসাধারণ লোকে তোমাদের সেই শুভ-বিবাহোৎসবের অভিনয় করিয়া পরম প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। ঐ দেখ সখি! তোমাদের যুগল শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা মহাসমারোহে অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছে। গঙ্গাগর্ভে নব-নির্ম্মিত তরণীর উপর দিব্য-আলোকে ও পুষ্পমালায় তোমাদিগের শ্রীযুগল-মূর্ত্তিকে বিভূষিত করিয়া পরমানন্দে এই পুণ্যতিথির পূজা ও আরাধনা করিতেছে। আজ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল—তজ্জনিত ও গঙ্গাতটে অন্যান্য বহু শ্রীবিগ্রহ আসিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে তোমাদের যুগল শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নদীয়াবাসী আজ প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের বাক্য সফল করিতেছে—

"যাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপযুক্ত যায় বৈকুণ্ঠ ভবনে॥"—

প্রিয় সখি ঐ শুন—"জয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের জয়" নাদে নদীয়া-গগন, পবন, গঙ্গাতট সর্ব্বত্র আজ মুখরিত হইয়াছে। আজ এই শুভদিনে আমি তোমাদের প্রথম শুভমিলন বাসরঘরের মধুময় লীলাসূচক দুই এক খানি প্রাচীন মহাজনী পদ গান করিব, তোমারই ইচ্ছামত ঠাকুর নরহরিরচিত পদাবলী গান করিব। এক্ষণে তোমার অনুমতি চাহিতেছি।"

বিরহিণী গৌর-বল্লভা নীরবে প্রসন্ন মনে সখি কাঞ্চনার সকল কথাগুলিই শুনিলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রীমুখের ভাব কিছু গম্ভীর বোধ হইল। ইহার কারণ সখি কাঞ্চনার কথায় প্রিয়াজির ঐশ্বর্য্যভাবের কথা কিছু আছে। গৌর-বল্লভা বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী—তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিলেও তিনি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেন। যাহা হউক প্রিয়াজি তাঁহার মনের ভাব আর মুখে প্রকাশ করিলেন না। সখি কাঞ্চনাকে ইঙ্গিতে গান করিতে অনুমতি দিলেন।

সখি কাঞ্চনা বৈশাখীপূর্ণিমানিশীথে ভজন-মন্দিরের বারান্দার একটী নিভৃত স্থানে বসিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কলকণ্ঠে গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

নদীয়া-বিনোদ গোরা।
প্রবেশে বাসর ঘরে নব নব তরুণীগণের পরাণ চোরা॥(ধ্রু)॥

কুলবধুগণ মনের উল্লাসে
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ায় লৈয়া।
সুমধুর ছাঁদে, বসায় বাসরে
অনিমিষ আঁখে ওমুখ চাঞা॥
কেহ পরশের সাধে হাসি হাসি
সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে।
কেহ সাজাইয়া তাম্বুল-বাটিকা
সম্পুট সম্মুখে রাখয়ে রঙ্গে॥
কেহ করে কত, কৌতুক ছলেতে,
ঢলি পড়ি গায় পুলক হিয়া।
নরহরি-নাথ, আগে রহে কেহ,
ভঙ্গীতে কুসুম অঞ্জলি দিয়া।"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি স্থিরচিত্তে গানটী শ্রবণ করি-

লেন—তাঁহার বদনমণ্ডল আজ সুপ্রসন্ন—মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গিয়াছে—তাঁহার মনে পূর্ব্বস্মৃতিসকল একে একে জাগরিত হইতেছে। তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার মুখের প্রতি সপ্রেমনয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন —"সখি কাঞ্চনে! বলিতে লজ্জা করে এ সকল কথা আমার আজ বড় ভাল লাগিতেছে কেন? বহুকালের আমার ও আমার পিতৃপুরুষের জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ও সৌভাগ্যের ফলে আমি অভাগিনী তোমাদের নদীয়া-নাগর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের দাসীত্ব-পদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম—এখনও আমি তাঁহারই সেই দাসী—পূর্ব্ব গৌরবে গরবিত আমার মনে প্রাণে ও হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতিগুলি তুমি জাগরিত করিয়া দিয়া আমার গৌর-বিরহ-জ্বালা প্রশমিত করিতেছ—তোমার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ—তুমি আমাকে বিনা মূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিলে। ঠাকুর নরহরি এ সকল নিগূঢ় কথা কিরূপে জানিলেন সখি?"—

সখি কাঞ্চনা মৃদু মধুর হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"প্রিয়সখি! ঠাকুর নরহরি তোমার প্রাণ বল্লভের নিত্য-পার্ষদ,—তিনি ব্রজের মধুমতী। তোমার প্রাণ-বল্লভের সহিত তোমার সকল লীলারঙ্গই তিনি জানেন এবং তাঁহার জানিবার অধিকারও আছে।"

গৌর-বল্লভা সখি কাঞ্চনার কথা শুনিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার বদনের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—পরে গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তুমি একবার বলিলে ঠাকুর নরহরি আমার প্রাণ-বল্লভের নিত্যপার্ষদ,—আবার বলিতেছ তিনি ব্রজের মধুমতী। আমি জানি তিনি আমার প্রাণ-বল্লভের প্রিয়তম বন্ধু,—গদাধর পণ্ডিতের মত। দুই জনেরই বন্ধুত্ব স্বার্থগন্ধহীন এবং প্রগাঢ় বিশুদ্ধ প্রেম-মূলক। আমার বোধ হয় আমার প্রাণ-বল্লভ তাঁহার বাসর-রহস্য কথাগুলি তাঁহার প্রাণ বন্ধুকে বলিয়াছিলেন।"

সুচতুরা কাঞ্চনা বুঝিলেন কোনরূপ ঐশ্বর্য্যকথা বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময়ী গৌর-বল্লভার নিকট বলা উচিত নহে। তিনি তাঁহার কথা উল্টাইয়া মৃদু হাসিয়া পুনরায় কহিলেন "প্রাণসখি! তুমি ঠিক বলিয়াছ তোমার প্রাণ-বল্লভ ঠাকুর নরহরির প্রাণ বঁধুয়াই বটেন—তাহা না হইলে তাঁহার বাসর-গৃহে তাঁহার সঙ্গে প্রবেশাধিকার পাইবেন কেন? ঠাকুর নরহরি এই পদটির ভণিতায় লিখিয়াছেন—"নরহরি-নাথ আগে রহে কেহ ভঙ্গীতে কুসুম অঞ্জলি দিয়া।"

এই যে "কেহ" ইনিই ঠাকুর নরহরি স্বয়ং॥

তোমাদের যুগল মিলন দর্শনানন্দে বিভোর হইয়া তিনি অগ্রসর হইয়া প্রেমাবেশে তোমাদের শ্রীচরণে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন"।

বিরহিণী প্রিয়াজি পরম বুদ্ধিমতী এবং সখি কাঞ্চনা অপেক্ষাও সুচতুরা। তিনি তাঁহার দন্তাগ্রভাগে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া মহা লজ্জিতভাবে কহিলেন—"এ কেমন কথা কহ সখি কাঞ্চনে! ঠাকুর নরহরি আমাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন কেন? তিনি যে আমার প্রাণ বল্লভের প্রিয়তম বন্ধু। তাঁহার ত প্রাণবন্ধুর গলদেশে পুষ্প মালিকা দিবার কথা। তুমি সখি ভুল বলিতেছ—ঠাকুর নরহরির পদের ভণিতায় "চরণ" শব্দ নাই—তুমি এ কথা বলিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছ কেন সখি?"

সখি কাঞ্চনা আর উত্তর করিতে সাহস করিলেন না—তিনি তাঁহার অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন আর কখন ঐশ্বর্য্য-বোধক কোন কথা প্রিয়াজিকে তিনি বলিবেন না।

সখি কাঞ্চনা পুনরায় তখন প্রিয়াজির প্রীত্যর্থে আর একটী ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"বাসর ঘরেতে গোরা রায়।
রূপে কোটী মদন মাতায়॥
কুলবধূগণ মনোসুখে।
সোঁপয়ে নয়ন চাঁদ-মুখে॥
ঘুঙটে ঘুঙট কেহ দিয়া।
কেহ কিবা ঈষৎ হাসিয়া॥
পুলকে ভরল সব গা।
ঝাঁপয়ে বদন দিয়া তা॥
কেউ দাঁড়াইয়া কারু পাশে।
কাঁপে সে না বাসর আবেশে॥
কেহ অতি অথির হিয়ায়।
নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায়॥
বাসর ঘরেতে রঙ্গ যত।
তাহা কেবা কহিবেক কত॥

নরহরি মনে বড় আশ।
দেখিব কি এ সব বিলাস ॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছেন—তাঁহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি সকল জাগরিত হইতেছে,—তাঁহার প্রাণ-বল্লভের নদীয়া-বিলাস রঙ্গ মনে করিয়া এক একবার তাঁহার হাসি পাইতেছে—কিন্তু সে হাসিও মনে মনে—বদনে তাহা প্রকাশ নাই—তবে তাঁহার বদন আজ সুপ্রসন্ন ও প্রশান্ত,—তিনি যেন অভূতপূর্ব্ব প্রেমানন্দ সাগরে ডুবিয়া আছেন। সখি অমিতা পরম প্রেমাবেশে ও রসাবেশে অবশাঙ্গ হইয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অপূর্ব্ব বাসর-লীলারঙ্গ শ্রবণ করিতেছেন। গৌর-প্রেমোন্মাদিনী কাঞ্চনার আজ আর আনন্দের সীমা নাই। তিনি দিক্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্যা হইয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া রসরঙ্গে প্রাণ খুলিয়া উচ্চকণ্ঠে গান করিতেছেন। তাঁহার কলকণ্ঠের গীতধ্বনি নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দির ভেদ করিয়া নদীয়া-গগনে উত্থিত হইয়াছে,—স্বর্গের অপ্সরা কিন্নরীর গানের সহিত সে গানের তুলনা হয় না—দেবদেবীগণ অলক্ষিতে কাঞ্চনার গান শুনিতে বিমানে গগনপথে ভ্রমণ করিতেছেন। পূর্ণিমার চাঁদ তারকাগণসহ প্রেমানন্দে হাসিতে হাসিতে কে কার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়িতেছেন, তাহার ঠিকানা নাই—তাঁহাদের হাসির স্নিগ্ধ কিরণ সম্পাতে জগতে শীতলানন্দ বিস্তার করিতেছে। জগজ্জীব বৃক্ষলতাতৃণ স্থাবরজঙ্গম সকলেই যেন পূর্ণিমার চাঁদের হাসিরাশি লুফিয়া লুফিয়া ধরিয়া পরম প্রেমানন্দে নিজ নিজ অঙ্গে মাখিতেছে।

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর অফুরন্ত মূল উৎস। তিনি বিরহিণী প্রিয়াজির বদনচন্দ্র প্রসন্ন দেখিয়া মহোল্লাসে এবং মহা উৎসাহের সহিত পুনরায় আর একটী বাসরগৃহের নিশির প্রভাতকৃত্যের প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"বাসর ঘরেতে গোরা রায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুখে রজনী গোঙায় ॥
কহিতে কৌতুক নাহি ওর।
গোষ্ঠি সহ সনাতন আনন্দে বিভোর ॥
রজনী প্রভাতে গৌরহরি।
হৈলা হর্ষ কুশণ্ডিকা আদি কর্ম্ম করি ॥
গমন করিব নিজালয়ে।
সনাতন মিশ্র মহাশয়ে নিবেদয়ে ॥
সনাতন জামাতা-রতনে।
কহিতে বিদায় ধৈর্য্য ধরয়ে যতনে ॥
কন্যায় কত না প্রবোধিয়া।
দিল বিশ্বম্ভর কর ধরি সমর্পিয়া ॥
গৌরহরি গমন সময়ে।
মান্য গণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে ॥
করিতে কি সে ভার সাধ।
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া শিরে করে আশীর্ব্বাদ ॥
মিশ্র-প্রিয়া কন্যা-জামাতারে।
বিদায় করিতে ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥
গোরা-গৃহে গমন করিতে।
বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারিভিতে ॥
নারীগণ দেয় জয়কার।
নানা বাদ্য বাজে ভাটে পড়ে রায়বার ॥
নরহরি-নাথে নিরখিয়া।
গমন উচিত সভে করে শুভ ক্রিয়া ॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এই গানটী শুনিতে শুনিতে বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী যেন প্রেমাবেশে আনমনা ও আত্মহারা হইলেন—নিত্যধামগত পূজ্যপাদ পিতামাতার কথা তাঁহার আজ মনে পড়িল—তাঁহার কমল-নয়নদ্বয়ে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল—প্রেমাশ্রুধারায় প্রিয়াজির বক্ষ ভাসিয়া গেল—পরিধান-বস্ত্র সিক্ত হইল,—ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত হইল।

সখি কাঞ্চনা সুচতুরা—তিনি তাঁহার প্রাণ-সখির মনোভাব বুঝিয়া নবদম্পতির পিতৃভবন হইতে শ্বশুরভবন শুভাগমন গীতির ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"বরজভূষণ গৌরবিধুবর, করি বিবাহ বিনোদ গতি পর,
প্রেয়সী সহ চলহ নিজ ঘর, পরম অদ্ভুত শোহয়ে।
চড়ল চৌদোল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয় প্রবাহ উছলত,
বলিত নয়ন শিঙ্গার অনুপম, নিখিল জনমন মোহয়ে ॥

হোত জয় জয় শব্দ অবিরত, নারী পুরুষ অসংখ্য নিরখত,
পরস্পর ভণ লখিমী লখিমীকনাথ দুঁহু বিলসত জনু।
বন্দীগণ মন মোদ অতিশয়, উচরিত নব নব চরিত মধুময়,
ভূরি ভূসুর করত ঘন ঘন, বেদধ্বনি পুলকিত তনু॥
বাদ্য বহুবিধ মুরজ মরদল, ত্রিসরি কুণ্ডলী পটহ পুষ্কল,
কু কু মু মু মু মু মুধা, বিবিধ বায়ত মধুর বাদক ঘটা।
নটত নর্ত্তকী নর্ত্তকাবলী, উঘটি তাধিক ধিকিতা ধিনি,
নিধি ধেন্না ধিকি তক তাল ধরু, পগভঙ্গী চমকত তনুছটা॥
জাতিশ্রুতি স্বরগ্রাম মূরছন, তান নব নব নব আলাপন,
শুনত কানন ত্যজি মৃগ,—গুণীবৃন্দ নিকট হি ধায়এ।
ভবন চহু দিশ বিপুল কল কল, দাস নরহরি হৃদয় উছলল,
সময় গোধুলি ললিত সুরধুনী তীরে বিরমি ঘরে আয়এ॥"
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

গৌর-বল্লভার শ্রীবদনে এবার মধুর হাসির রেখা দেখা দিয়াছে,—তিনি চতুর্দ্দোলে চড়িয়া প্রাণ-বল্লভের সহিত শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন, বহু লোক সঙ্গে চলিয়াছে—নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে—নদীয়ার পথ লোকে লোকারণ্য—ছাদের উপরিভাগে পথের দুই পার্শ্বে নদীয়া-রমণীগণের সংঘট্ট হইয়াছে—নদীয়ায় প্রেমানন্দের স্রোত বহিতেছে। হায়! সে দিন আর এ দিন! বিরহিণী প্রিয়াজি মনে মনে ইহাই ভাবিতেছেন। পূর্ব্বস্মৃতি জাগরণে তিনি আনন্দানুভব করিতেছেন। বরসজ্জায় সজ্জিত তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সেই নাগরী-মোহন অপরূপ রূপরাশি তাঁহার আজ মনে পড়িতেছে—তিনি প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া মধ্যে মধ্যে ধৈর্য্য হারাইতেছেন,—সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি চাহিয়া আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিতেছেন না—নয়ন-ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

সখিদ্বয় প্রিয়াজির মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহার তাৎকালিক ভাবোচিত গান করিয়া রসপুষ্ট করিতেছেন। এখন রাত্র দ্বিতীয় প্রহর।

সখি কাঞ্চনা পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"গোরাচাঁদ বিবাহ করিয়া।
আইলেন ঘরে অতি উল্লসিত হৈয়া॥
অলখিত হৈয়া দেবগণ।
করয়ে সকল পথে পুষ্প বরিষণ॥
সুখের পাথার নদীয়ায়।
বিবাহ প্রসঙ্গ কেউ কহে শচী মায়॥
শুনি মহা বাদ্য কোলাহল।
শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বল॥
বাড়ীর বাহির শচী আই।
নিছিয়া ফেলয়ে যত দ্রব্য লেখা নাই॥
স্নেহে চাঁদ বদন চুম্বিয়া।
প্রবেশে ভবনে পুত্রবধু পুত্রে লৈয়া॥
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিশ্বম্ভর।
বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর।
উলু উলু দেই নারীগণ।
হইল মঙ্গলময় সকল ভবন॥
ভাটগণে পড়ে রায়বার।
বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার॥
নানা বাদ্য বায় সবে সুখে।
নরহরি কত বা কহিব এক মুখে॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজির বদন কিন্তু প্রসন্ন,—মন প্রফুল্ল পূর্ব্বস্মৃতি সকল তাঁহার মনে পড়িতেছে,—প্রাণ-বল্লভের বিরহজ্বালা তাহাতে প্রশমিত হইতেছে,—তবে গৌর-কথার সহিত আত্মকথার সংমিশ্রণে মধ্যে মধ্যে বিষম লজ্জার ভাব আসিতেছে। মর্ম্মী সখিদ্বয়ের সঙ্গে এসকল কথাবার্ত্তায় লজ্জার কোন কারণ নাই—তথাপি কখন কখন ব্রীড়াকুঞ্চিতনয়নে মধ্যে মধ্যে গৌর-বল্লভা মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপ করিয়া অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গী করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার বদনখানি অবনত করিয়া তাঁহার বিবাহ-লীলা-কথা-শ্রবণ করিতেছেন। গৌরসম্বন্ধীয় কথাই গৌরকথা,—তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলারঙ্গই হউক,—আর কৈশোর বা যৌবনোচিত মধুর লীলারঙ্গই হউক—সকল লীলারঙ্গই বিরহিণী প্রিয়াজির পক্ষে পরম হৃৎকর্ণরসায়ন এবং গৌর-প্রেমোদ্দীপক। বিরহের দশটি দশার সাত্ত্বিক বিকার সমূহের লক্ষণগুলি পর্য্যায়ক্রমে বিরহিণী গৌর-বল্লভার শ্রীঅঙ্গে দৃষ্ট হইতেছে—কিন্তু বিরহের ক্রমনির্দ্দেশ করিয়া বিরহিণী নায়িকার অঙ্গে এসকল প্রেমলক্ষণ উদ্ভব হইতে পারে না। বিরহোন্মাদ দশাতেও বিরহিণী নায়িকার উদ্বেগ-দশার লক্ষণ সকল দৃষ্ট

হয়। চিন্তা বিরহের প্রথম দশা—ইহা সকল পূর্ব্বাবস্থাতেই দৃষ্ট হয়। জাগরণ দ্বিতীয় দশা,—ইহাও দশম দশার সকল দশাতেই পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং বিরহের দশটী দশার যে কোন দশা যে কোন সময়ে বিরহিণী নায়িকার দেহে ও মনে উদয় হইতে পারে। এক্ষণে প্রিয়াজির মন প্রাণ চিন্তা-দশাগ্রস্ত। অভীষ্ট প্রাপ্তির উপায় সকলের ধ্যানের নাম চিন্তা (১)। গৌর-বল্লভা তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সহিত মিলনোপায় চিন্তা করিতেছেন—বিবাহ-লীলা-প্রসঙ্গগুলি এইজন্য তাঁহার বড় ভাল লাগিতেছে। সখি কাঞ্চনা এইজন্য বিরহিণী প্রিয়াজির মন বুঝিয়াই মিলনের স্মৃতিমূলক গীত সকল গাইতেছেন। তিনি পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"শচী হরষিত হৈঞা, নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ লৈয়া,
আয়োজন সঙ্গেতে করিয়া।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সব জনে হরি বোলে,
দ্রব্য ফেলে দোঁহারে নিছিয়া॥
সম্মুখে মঙ্গল ঘট, রায়বার পড়ে ভাট্‌,
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুপ্রিয়া কর ধরি, বিশ্বম্ভর শ্রীহরি,
গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণ॥
শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বম্ভর,
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে।
আনন্দে বিহ্বল হিয়া, আয়োগণ মাঝে গিয়া,
বধূ কোলে শচীর নাচনে॥
আপনা না ধরে সুখে, নানা দ্রব্য দেয় লোকে
তুষ্ট হৈয়া যত সব জন।
বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়া, এক মেলি দেখিয়া,
গুণ গায় দাস ত্রিলোচন॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজির মনে আজ বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা উদয় হইল—তাঁহার অপার স্নেহের কথা মনে পড়িল—দুর্জ্জয় পুত্রবিরহশোকে তাঁহার অপ্রকটের কথা প্রিয়াজির স্মৃতিপথে আজ উদয় হইল—তিনি তখন কাঁদিয়া আকুল হইলেন। প্রাণ-বল্লভের বিরহ-জ্বালা তাঁহার পূজনীয়া পরম স্নেহবতী শাশুড়ীর বিরহ-জ্বালার সহিত সংমিশ্রণে অনির্ব্বচনীয় উৎকট একটী নব বিরহ-জ্বালার সৃষ্টি করিল। বিরহিণী প্রিয়াজি আর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না—তিনি থর থর কম্পিত কলেবরে সখি অমিতার ক্রোড়ে পরম প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন—তাঁহার নয়নধারায় বক্ষ ভাসিতেছে—বদনমণ্ডলের আর সে প্রসন্ন ভাব নাই—বদনে সে হাসির রেখা নাই,—তাঁহার এরূপ ভাব বিপর্য্যয়ে সখিদ্বয় উদ্বিগ্ন হইলেন—তিনি কখন কখন মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি উদাস নয়নে চাহিতেছেন—কখন বা চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। সখিদ্বয় তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা—তাঁহার ঘন ঘন কম্প হইতেছে। দুই জন সখি দুই পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে দুই দিক হইতে বীজন করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে বদনে ও শিরোদেশে সুশীতল জলের ছিটা দিতেছেন। তাঁহারা যেন বিষম লজ্জিতা—কি করিতে কি করিলেন, বুঝিতে পারিতেছেন না—গানের ফলে বিরহিণী প্রিয়াজির এই ভাবান্তরের বিশেষ কারণ কি হইল সখিদ্বয় তাহাই ভাবিতেছেন। শুভ বিবাহের কথা—বাসরগৃহের রস-কথা—প্রিয়াজির প্রাণ-বল্লভের সহিত প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন—শচীগৃহে আনন্দের স্রোত বহিতেছে—শচীমাতা নববধূকে পরম স্নেহাবেশে ক্রোড়ে করিয়া আয়ন্ত্রীগণের মধ্যে গিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন। এ সকল আনন্দের কথাই ত গানটীর ভাব। ইহাতে প্রিয়াজির এত দুঃখের কারণ আজ এমন কি হইল,—মর্ম্মী সখিদ্বয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যে বিরহিণী গৌরবল্লভা আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—নিজ মলিন বসনাঞ্চলে নিজেই আপনার অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় মুছিলেন। স্নেহবতী প্রিয়াজির প্রাণে আজ তাঁহার পরম পূজনীয়া পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা মনে পড়িয়াছে। শাশুড়ীর অনির্ব্বচনীয় স্নেহব্যবহার—তাঁহার প্রাণঘাতী দুঃখকথা—তাঁহার মর্ম্মভেদী পুত্র-বিরহ-কথা সকল—একে একে সকলি প্রিয়াজির স্মৃতিপথে উদয় হইয়া তাঁহাকে পরম বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এতক্ষণে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়াছেন। সকাতরে পরম

(১) অভীষ্ট-ব্যাপ্ত্যুপায়ানাং ধ্যানং চিন্তা প্রকীর্ত্তিতা।
উজ্জ্বলনীলমণি।

করুণ-ক্রন্দনের-স্বরে তিনি সখি কাঞ্চনার দু'টী হস্ত প্রেমাবেশে নিজ হস্তে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার পূজনীয়া দুঃখিনী শাশুড়ীর কথা মনে হইলে আমি আমার প্রাণবল্লভের বিরহজ্বালা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া যাই। আহা! তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন—তিনি বাঁচিয়াছেন—আর আমি মন্দভাগিনী কি সুখে যে বাঁচিয়া আছি,—আর কেন যে বাঁচিয়া আছি—তাহা আমার প্রাণবল্লভই জানেন—আমার ভাগ্যবিধাতা ভগবান তিনিই সখি!"

এই কথা বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির নয়নে দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল—তিনি পুনরায় প্রেম-বিহ্বলভাবে সখিক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন—সখি কাঞ্চনা পরম প্রেমভরে প্রিয়াজিকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন—গৌরবল্লভা তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—সখিদ্বয়ও কাঁদিয়া আকুল হইলেন—পুনরায় পূর্ব্ববৎ মধ্যে মধ্যে সেইরূপ প্রেমমূর্চ্ছনার ভাব,—অন্তরঙ্গসেবা চলিতেছে—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। বিরহিণী প্রিয়াজির পরিধান বসন অসম্বর—ঘর্ম্মাক্ত কলেবর—আলুথালু কেশপাশ—গৌর-বিরহিণীত্রয়ের নয়নজলে ধরাতল সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত। সখি অমিতা প্রিয় সখির অঙ্গসেবায় আছেন—প্রিয়াজি এক্ষণে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা।

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর—চতুর্দ্দিক নীরব ও নিস্তব্ধ—প্রিয়াজির দুঃখে পূর্ণিমার চাঁদেরও যেন মলিন বদন—তারকা-গুলি যেন নিষ্প্রভ—নৈশ পবন নিস্তব্ধ—আকাশ নিষ্কম্প। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইল—তথাপিও বিরহিণী প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইল না,—তাঁহার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত—তিনি যেন ধ্যানমগ্না। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রাণসখির মনোভাব সকলি জানেন। তিনি বুঝিয়াছেন গৌর-বল্লভার এখন গৌর-বিরহদশা। তাঁহার শাশুড়ীর কথা বলিতে বলিতে তিনি কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"শাশুড়ীর কথা মনে হইলে প্রাণবল্লভের বিরহ-জ্বালা ভুলিয়া যাই"—এই যে "ভুলিয়া যাওয়া"—ইহার অর্থ অন্যরূপ। মূর্ত্ত গৌর-বিরহই গৌর-বিরহিণী স্বয়ং প্রিয়াজি। গৌর-বিরহ ভুলিলেই গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির অস্তিত্বই লোপ পায়—তাহা অসম্ভব। ইহাই সখি কাঞ্চনার মনের ভাব। তিনি প্রিয়াজির গৌর-বিরহ-ব্যাধির বৈদ্যরাজ—তিনি রোগী ও রোগের অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে সেই নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে গভীর চাঁদিনী নিশীথে একটী গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"কুঞ্জে এস হে, নদীয়া বিহারী,
শচীনন্দন গৌরহরি।
রসিক শেখর, নবীন নাগর,
ভুবন ভুলান রূপ ধরি॥
মোর দরদিয়া, শচীদুলালিয়া,
এস নটবর বেশে হে।
মালতী ফুলের গাঁথিয়াছি মালা,
পরায়ে তোমায় দিব হে॥
(তুমি) ভালবাস যাহা, সকলি রেখেছি,
(তোমার) মনোমত ধন এনেছি।
পট্ট বসনে, কুসুম ভূষণে,
(আমি) ভুলাতে তোমায় সেজেছি॥
(আমি) রচেছি শয়ন, ফুল বিছাইয়া,
(তাতে) বসিবে বলিয়া তুমি হে!
পদ পাখালিয়ে, চরণ মুছাব,
চিকন চিকুর দিয়ে হে!
ক'ব রসকথা, মরমের ব্যথা,
বিরলে বসিয়া দু'জনে।
না শুনিবে, কেহ না দেখিবে,
(আমি) মিশিব মিলিব পরাণে॥
দাসী পদ দিয়ে, কৃতার্থ কর হে,
(আমি) আর কিছু নাথ! চাহি না।
সাজি মনোমত, সেবিব সতত,
সাজাব তোমায় কত না॥"—

গৌরগীতিকা।

প্রাণ বঁধুয়া হে!

(আমি) বেশ না করিলে, কেশ না বাঁধিলে,
কি দিয়ে ভুলাব তোমারে।
আমি না সাজিলে, তুমি না সাজিবে,
বুঝেছি আমি তা অন্তরে॥

মোর গুণমণি, বহু বল্লভ তুমি,
(এমন)- দাসী আছে কত তোমারি।
ছাড়িয়া তাদের, কেন বা আসিবে,
রূপে গুণে তারা সুন্দরী ॥
তাই সাজি আমি, মনোমত সাজে,
ভুলাতে তোমায় বঁধুয়া।
কুঞ্জে এস হে, নদীয়া বিহারি,
কেঁদে ডাকে হরিদাসিয়া।"—

গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজির প্রেম-মূর্চ্ছনা অবস্থাতেই এই গানটীর মাঝে মাঝে তিনি এক একবার চক্ষুদ্বয় উন্মোচন করিতেছিলেন,—আর বদনে অস্ফুটস্বরে "গোরা গোরা" বলিতেছিলেন। তাঁহার অন্তরের তাৎকালিক ভাব গানটির ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল হইয়াছে—বাহ্যে সে গুহ্য ভাবটির কিন্তু কোনরূপ প্রকাশ নাই। বিরহিণী প্রিয়াজির তখন—

—"অন্তর গর গর, হৃদয় জর জর,
গৌর-সুধাকর, প্রেম-আশে।
নয়নে বহে ধারা, বদনে গোরা গোরা
রসেতে মাতোয়ারা আনন্দে ভাসে।"—

গৌর-গীতিকা।

সখি অমিতা পরম প্রেমানন্দে শ্রবণানন্দে বিভোর আছেন—তাঁহার দৃষ্টি প্রিয়াজির প্রতি অঙ্গের প্রতি,—তিনি সখি কাঞ্চনার ভজনচতুরতা এবং প্রিয় সখির মনোভাব-বিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া আজ প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। তিনি পরম প্রেমাবেশে সখি কাঞ্চনার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে ইঙ্গিতে আত্মসম্বরণ করিতে বলিয়া প্রিয়াজির তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে বিরহিণী প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি তাঁহার দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হস্ত দুইখানি প্রসার করিয়া সখিকাঞ্চনার গলদেশ ধারণের প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হইয়া মনঃকষ্টে যেন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন—সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির মনোভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া পরম প্রেম-ভরে বক্ষে উঠাইলেন,—প্রিয়াজির আলুলায়িত কর্দ্দমাক্ত কেশদাম সখি অমিতা তখন সংস্কার করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে প্রিয় সখির গৌর প্রেমানুরাগ-রঞ্জিত প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিলেন এবং তাঁহার মলিন বদনের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া মৃদু মধুর বচনে কহিলেন,—"প্রাণসখি! তুমি কেমন আছ?"

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তখনও গৌর-বিরহ-দশাগ্রস্থা,—বিরহ-জ্বালায় অতিশয় মুহ্যমানা। কিন্তু তিনি আত্ম-সম্বরণ করিয়াছেন। অতিশয় ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে তিনি তাঁহার প্রাণসখি কাঞ্চনার কথার উত্তর দিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মলিন বদনখানি বিনত করিয়াই অতি মৃদুভাবে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমি কেমন আছি। আমার প্রাণবল্লভের বিরহানল তুঁষের আগুনের মত অহরহ আমার হৃদয়ে জ্বলিতেছে—পুড়িয়া পুড়িয়া, হৃদয়, মন ও প্রাণ অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। তবে তোমরা সখি, গৌর-কথা-গানে আমার সেই গৌরবিরহ-তাপ দগ্ধ-হৃদয় প্রাণ-মনে আবার নূতন করিয়া বহ্নিসংযোগে তাহাদিগকে এখন পর্য্যন্ত জ্বলন্ত রাখিয়াছ—এই ভাবের জ্বলন্ত অঙ্গারের অস্তিত্ব আর বেশী দিন থাকিবে না"। এই বলিয়াই গৌর-বল্লভা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুইজন বিরহিণী প্রিয়াজিকে দুই দিক হইতে সপ্রেম বন্ধনে বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বদনখানি উঠাইয়া দেখিলেন, শ্রাবণের ধারার ন্যায় প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহাদের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্বধনের ক্ষীণ বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে—তাঁহার হৃদয়ের গৌরবিরহ-সমুদ্রে প্রবল বান আসিয়াছে। এক্ষণে কোন কথাই আর তাঁহার কর্ণে যাইবে না। সখিদ্বয় উভয়ে গুপ্ত পরামর্শ করিয়া তখন গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—সুহই।

—"সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে ক্ষণে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায়॥
কোথায় পরাণ বলি খেনে কাঁদে।
পুরব বিরহ-জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেন হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥"—

গৌরপদতরঙ্গিণী।

এই গানটি শুনিতে শুনিতে বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাবেশে সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন,—উদাস নয়নে ঘন ঘন তাঁহাদিগের বদনের প্রতি চাহিতে লাগিলেন,—মধ্যে মধ্যে ক্ষীণস্বরে—"হা প্রাণবল্লভ! হা নবদ্বীপচন্দ্র! তুমি কোথায়?" এই বলিয়া মহা খেদে বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয় সখির ক্ষীণ হস্ত দু'খানি সজোরে ধরিয়া কত না সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। গৌর-বিরহ-বিহ্বলা প্রিয়াজি প্রলাপ বকিতেছেন—"আমার প্রাণবল্লভের আবার প্রাণনাথ কে? তিনি একটী বারও বলেন না কোথা তাঁহার প্রাণপ্রিয়া? তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয়াকে প্রাণনাথ বলিতেছেন কেন?"—এইরূপ ভাবে কত কি প্রলাপ-কথা বকিতেছেন। উক্ত পদটিতে রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহজ্বালার কথা বর্ণিত আছে—সেই গানটি শুনিয়াই বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রাণে এইরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া সখি কাঞ্চনা আর একটী তদ্ভাবোচিত প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন।

রাগ—সুহই।

"—সে মোর গৌর কিশোর।
মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর॥
সোনার বরণ তনু হইল মলিন।
দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
বচন না নিকসয়ে সে চাঁদ বদনে।
অবিরত ধারা বহে থির নয়নে॥
কাঁদে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া।
পাষাণ শঙ্করদাস না যায় মরিয়া॥"—

নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে রাধা-ভাবাঢ্য গৌরসুন্দর যে ভাবে কৃষ্ণবিরহরসাস্বাদন করিতেছেন—ঠিক তদনুরূপভাবেই তাঁহার প্রাণবল্লভা সনাতন-নন্দিনী নদীয়ার গম্ভীরা মন্দিরে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন,—উভয়েরই ভজন-পদ্ধতি এক,—বিপ্রলম্ভরস বিগ্রহ উভয়েই—বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু নীলাচলে বসিয়া কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন—এবং সেই বৃষভানুনন্দিনীর বিশিষ্ট আবির্ভাব সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী নদীয়ার গৌরশূন্য গৌর গৃহে বসিয়া গৌর-বিরহ রসাস্বাদন করিতেছেন। শক্তি ও শক্তিমানের সর্ব্বোত্তম নরলীলার ভজনপ্রণালী বিভিন্নমুখী হইলে "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" এই সিদ্ধান্তের বিরোধ ঘটে।

বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর-বিরহব্যঞ্জক মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন এখন পর্য্যন্ত হয় নাই দেখিয়া সুচতুরা কাঞ্চনা সখি পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

শ্রীরাগ।

"আজু বিরহ ভরে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
ভূমে পড়ি কাঁদি বোলে কাঁহা প্রাণেশ্বর॥
পুন মূরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় বড় ত্রাস॥
উচ্চ করি ভকত করল হরিবোল।
শুনিয়া চেতনা পাই আঁখি ঝরু লোর॥
ঐছন হেরইতে কাঁদে নর নারী।
এ রাধামোহন মরু যাই বলিহারি॥

গৌরপদতরঙ্গিণী।

এই পদটী শেষ হইলেই সখি অমিতা গৌরপ্রেমোন্মত্ত ভাবে উচ্চকণ্ঠে গৌরকীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

———— "গৌর হরি হরিবোল।
হরি বোল, হরি বোল, গৌরহরি হরিবোল।
পাগলা নিতাইর বোল গৌরহরি হরিবোল॥"

সখি কাঞ্চনা তখন এই উচ্চ কীর্ত্তনে যোগ দিলেন—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দির ভেদ করিয়া এই গৌরহরি হরিবোলের মধুর ধ্বনি নদীয়ার গগনে উঠিল—ইহা পবনের সহিত মিশিয়া সাগর পার হইয়া নীলাচলের গম্ভীরামন্দিরে প্রবেশ করিল। তখন ন্যাসিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু একাকী গম্ভীরামন্দিরের বাহিরে আসিয়া বৈশাখীপূর্ণিমানিশির প্রফুল্ল তারকারাজিবেষ্টিত পূর্ণ শশধরের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন,—তাঁহার মনের তখনকার কি ভাব তাহা বুঝিবার লোক সেখানে কেহ উপস্থিত নাই। তিনি বহুক্ষণ নীরবে আছেন। তিনি কৃষ্ণবিরহ-সাগরে ডুবিয়া আছেন কি রাধাবিরহভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-লীলা স্মরণমননে আছেন, তাহা বুঝিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য সেদিন তিনি কাহাকেও দেন নাই। অনেকক্ষণ এইভাবে তিনি মুক্ত

পূর্ণিমা-আকাশের প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন। অকস্মাৎ তিনি তাঁহার আজানুলম্বিত দু'টী ভুজ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—"বৃন্দাবনবিলাসিনী দয়াময়ী রাধে! দয়া কর গো।" বৃষভানুনন্দিনীর বিরহকাতর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌর-গোবিন্দ তাঁহার প্রেয়সী মুকুটমণি শ্রীরাধিকার নামকীর্ত্তনে যখন উন্মত্ত- তখন তাঁহার মনে কে যেন শ্রীনবদ্বীপ-লীলার স্মৃতি জাগাইয়া দিল, কে যেন অলক্ষিতে সেই গভীর রাত্রিতে আকাশপথে উদিত হইয়া কলকণ্ঠে গান গাহিতেছে এরূপ বোধ হইল। এ যে রমণীকণ্ঠস্বর! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন—কিন্তু স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া সমগ্র গানটী শুনিলেন—

যথারাগ—

—"নদীয়া-বিহারি গৌরাঙ্গ নাগর,
নারীমনচোরা রসিক শেখর,
শচীর দুলাল বিষ্ণুপ্রিয়া বর,
(ঐ) নাচিয়া চলিছে দেখ গো
নটবর বেশ চাঁচর চিকুর,
ক্ষীণ কটিদেশ বক্ষ প্রসর,
সুবলিত দেহ, নারী-মনোহর,
স্বজন সঙ্গে চলে গো॥
আজানুলম্বিত বাহুযুগল,
প্রেমময় অঙ্গ স্বভাব চঞ্চল,
(তাঁর) আঁখির চাহনি কিবা গো।
রমণীমোহন রূপ ধরিয়া,
নদীয়ার পথে চলেছে নাচিয়া,
হরিনামামৃত দিতেছে যাচিয়া
কিবা সুমধুর বুলি গো॥
তুলিয়া দু'বাহু বিচিত্র শোভন,
হরি ব'লে পথে নাচে ঘন ঘন,
কুল কামিনীর প্রাণরমণ,
(গোরা) পরাণ কাড়িয়া লয় গো।
চারু মনোহর দীঘল আকৃতি,
সুন্দর গঠন মধুর প্রকৃতি,
মুখে মৃদু হাসি প্রেমের মুরতি,
(ঐ) নেচে নেচে পথে চলে গো॥
চরণে ধরিয়া হ'য়ে কৃতাঞ্জলি,
সংসার-বাসনায় দিয়া জলাঞ্জলি,
ত্যজি অভিমান হৃদি প্রাণ খুলি,
(সবে) চরণ ধরিয়া কাঁদ গো।
কাঁদ আর বল—"বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ!
করি পদে তব কোটি প্রণিপাত,
নিজ গুণে মোরে কর আত্মসাৎ,
মোরা যে তোমার দাসী গো॥
যত কিছু আছে ধরম করম,
জীবন যৌবন নারীর ধরম,
সব দিনু পদে প্রাণরমণ,
(ঐ রাঙ্গা) চরণেতে স্থান দাও গো
ঘুচায়ে মনের সকল বিকার,
যুগল-সেবায় দাও অধিকার,
প্রাণরমণ ওহে প্রাণাধার,
(একবার) করুণ নয়নে চাহ গো॥
(ওহে) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-বল্লভ,
সবে বলে তোমা বহু বল্লভ,
দাও মাথে তব ওপদ-পল্লব,
জুড়াক ত্রিতাপ-জ্বালা গো।"
এইরূপে গাও প্রার্থনা-গীতি,
(আর) ভজ বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি,
বহুবল্লভ তিনি অগতির গতি,
হরিদাসিয়ার প্রাণ গো॥
(ঐ দেখ) কীর্ত্তনে নাচিছে কীর্ত্তন লম্পট,
নাগরীর প্রাণ সন্ন্যাসী-কপট,
রাসবিহারি নটবর শঠ,
তাঁহারে কেহ চিনে না গো।
চিনে লহ নিজ ভজনের ধন,
নদীয়ার গোরা নাগরী-মোহন,
বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ (জয়) শচীনন্দন,
সবে মিলে জয় দাও গো॥
নাচ আর বল জয় বিষ্ণুপ্রিয়া,
জয় বিশ্বম্ভর গোরা বিনোদিয়া,
নাগরীর প্রাণ নদীয়া-নাটুয়া,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গো!

নদীয়ার পথে ধুলি মাখা অঙ্গ,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ,
(দেখ) নাচিয়া চলিছে ভকত সঙ্গ,
সবে মিলে চলে আয় গো॥
কুলে দিয়ে কালি আয় গো সজনি,
দান দাও পদে এছার পরাণি,
নারীর ধরমে পড়ুক অশনি,
যৌবন বহিয়া যায় গো॥
হরিদাসিয়ার কাতর মিনতি,
ভজ বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি,
পরিহরি লাজ ছাড়িয়া কুমতি,
(তাঁর) পদে ধর সাধি বল গো।
ভজ আর বল "ভজরে ভজ,
নদীয়া-চাঁদের পাদ-পঙ্কজ,
নবদ্বীপধাম ভকতি-ব্রজ,
(সেথা) চল সবে চল চল গো॥
চল গো চল গো গৌর-ধাম,
কহ গো কহ গো গৌর নাম,
ভজ গো ভজ গো প্রেমধাম,
(হরি) দাসিয়ারে কিনে লহ গো।
প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোর,
চল আর বল গৌর গৌর,
বিষ্ণুপ্রিয়ার পরাণ চোর
(ঐ) নদীয়ার পথে চলে গো॥
কমলাসেবিত ওরাঙ্গা চরণ,
কুসুম কোমল পরম রতন,
নদীয়া-বাসীর বক্ষের ধন,
বক্ষের উপরে ধর গো।
নদীয়ার পথে সারি সারি সারি,
চল সবে চল নদীয়া-নাগরী,
বিছাই এ দেহ নদীয়া-ভরি,
পড় গিয়ে সবে পথে গো।
নাচিবে গৌরাঙ্গ তাহার উপরি,
দুই বাহু তুলি বলি হরি হরি,
(তখন) বুঝিবে মরমে গৌরাঙ্গ-মাধুরী,
জয় বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপেশ্বরী,
(হরি) দাসিয়ারে দয়া কর গো॥"—
গৌর-গীতিকা।

অতিশয় মনোযোগের সহিত স্থিরভাবে নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলে বসিয়া এই গানটী শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার মনে নদীয়া-বিলাসের পূর্ব্বস্মৃতি সকল জাগরিত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি স্ব-স্বরূপে—নব নটবর সুন্দর নদীয়া-নাগরবেশে সেই রাত্রিতেই নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার প্রাণবল্লভা বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন গৌরবিরহদগ্ধা বিরহিণী গৌরবল্লভাকে প্রেমাবেশে ক্রোড়ে ধরিয়া তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় গৌরকীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই যে সুদীর্ঘ গৌর-কীর্ত্তনের পদটি—ইহা সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই জনে মিলিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যা বিরহিণী প্রিয়াজিকে প্রেমালিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া গাইতেছিলেন। গান শুনিয়া গৌর-বল্লভার বাহ্যজ্ঞান হইল। ভজন-মন্দির অকস্মাৎ গৌর-অঙ্গ-গন্ধে যেন মহ মহ করিতে লাগিল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব হইয়াছে ইহাতেই বুঝিলেন মর্ম্মী সখিদ্বয়,—বিরহিণী প্রিয়াজির সাক্ষাৎ দর্শন হইল—তিনি নির্নিমেষনয়নে তাঁহার প্রাণবল্লভের পর্য্যঙ্কোপরি চাহিয়া আছেন,—তখন সখিদ্বয় মনশ্চক্ষে দেখিতেছেন,—

—"রাই অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশ দিশ,
শ্যাম ভেল গৌর আকার।
গৌর ভেল সখিগণ, গৌর-নিকুঞ্জবন,
রাই রূপে চৌদিকে পাথার॥
গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী,
গৌর পাখী ডালে ডালে।
গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন,
গৌর-তরু গৌর-ফল ফুলে॥
গৌর যমুনার জল, গৌর ভেল জলচর,
গৌর সারস চক্রবাক।
গৌর আকাশ দেখি, গৌর চাঁদ তারা সাখী,
গৌর-তারা বেড়ি লাখে লাখে॥
গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল,
রাই রূপে চৌদিক ব্যাপিত।
নরোত্তম দাস কয়, অপরূপ রূপময়,
দুঁহু তনু একই মিলিত॥"
পদ-কল্প-তরু।

গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মহাপ্রভু যে অপরূপ রূপ দেখাইয়া ছিলেন, এখানেও সেই—

"রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ ॥"

দেখাইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভাকে ও তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়কে তাঁহার ও তাঁহার প্রাণবল্লভার প্রকৃত স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইলেন।

এ সকল আবির্ভাব-লীলারঙ্গ বিদ্যুৎ-মালার ন্যায় ক্ষণিক দর্শনীয়। গৌর-বিরহিণীত্রয় এই অপরূপ অভিনব গৌর-দর্শনে প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন,—কতক্ষণ যে এ অবস্থায় তাঁহারা ছিলেন, তাহা কেহই জানেন না। কোথা দিয়া কখন রাত্রি প্রভাত হইল, তাহা, কেহই জানিতে পারিলেন না। প্রভাত কীর্ত্তনের দল যথা রীতি গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে আসিয়া যখন কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥" —

তখন গৌর-বিরহিণীত্রয়ের বাহ্যজ্ঞান হইল,—চমক ভাঙ্গিল। তাঁহারা আত্মসম্বরণ করিয়া ভজন-মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। প্রভাত সমীরণের সুস্নিগ্ধ হিল্লোলে কিছুক্ষণ উন্মুক্ত বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুর-তরঙ্গিণীর শোভা সন্দর্শন করিলেন।

আর একটী গৌরপ্রেমিক কীর্ত্তনীয়া তৎকালে সেখানে আসিয়া গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"স্মরমহি গৌর, গৌর-গুণ শ্রবণহি,
বদনহি গৌর বিলাস।
ভরমহি গৌর-চাঁদ বিনে, লোচন হেরইতে
না দেখিয়ে আন।
সখিরে শুনয়া গৌরব দূরে গেল।
তনু মন লোচন, শ্রবণ রসায়ণ
সকলি গৌরময় ভেল। ধ্রু॥
দুর সঞে যব, গৌর নাম শুনই
চমকই অবিচল চিত।
না জানিয়ে কো ঘটাওল গৌরচান্দে সনে মিত॥
পতিক সোহাগ আগ সম লাগই,
রোই রোই ভেল উদাস।
নিশি দিশি রোই, গেহি কত রাখব,
কহতহি গোবিন্দ দাস।"—

বিরহিণী প্রিয়াজি গলে বস্ত্র দিয়া প্রেমাশ্রুলোচনে আনমনে নির্জ্জন বারান্দায় দাঁড়াইয়া সখিসঙ্গে এই অপূর্ব্ব গৌরকীর্ত্তন শুনিতেছেন এবং গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। নদীয়ার গৌর-ভক্ত-বৃন্দ গৌরশূন্য গৌরগৃহ পরিক্রমা করিতেছেন,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। গৌর-প্রিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছেন —কিন্তু তাঁহাকে কেহ দর্শন করিতে পারিতেছেন না— এমনি নির্জ্জন ও নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। দলে দলে গৌর-ভক্তবৃন্দ গৌর-শূন্য গৌর-গৃহ-দ্বারে আসিয়া "হা বিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভ!" বলিয়া বহির্দ্বারের প্রাচীরে মাথা কুটিতেছেন—ভক্তবৎসলা প্রিয়াজি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সখিদ্বয় তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ কুঞ্জ,
১৭ই জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮
রবিবার, রাত্রি দ্বিপ্রহর।
পূর্ণিমা তিথি।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াগৌরয়োশ্চরণকমলেভ্যো নমঃ

গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

মধ্য খণ্ড

(২৩)

"যদাকৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ তরণিতনয়াতীর বিপিনাৎ
সমাগত্য দ্বীপে প্রকটমগমৎ প্রাঙ্ নবযুতে।
তদা রাধা তস্য মধুর রসমাস্বাদনমনা
প্রিয়াভূত্বাবিষ্ণো রজনি সখিবৃন্দৈঃ সহ মুদা ॥"—

নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরে গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মর্ম্মন্তুদ ও হৃদিবিদারক কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান গৌর-বিরহ-জ্বালার করুণ কাহিনীগুলি একে একে বর্ণিত হইতেছে—যাহার শ্রবণে কাষ্ঠপাষাণ বিগলিত হয়;—কিন্তু কলিহত দুর্ভাগ্য জীবের কাষ্ঠপাষাণ হইতেও শুষ্ক ও কঠিন হৃদয়, তাহাতে দ্রব হইতেছে না—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়—বড়ই সন্তাপের বিষয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মুখ্যাশক্তি নব-বালা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রতি অতিশয় কঠোর ভজনোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন কেন? তাহার নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে—সে সকল কথা নিগূঢ়রহস্যপূর্ণ,—পূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে—সেই কঠোর উপদেশবাণীর সারাংশ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—যথা প্রিয়াজির প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের উক্তি,—

—"তুমিও আমার মত গৃহে রহি মোর
এই নদীয়ায়,
আমার বিরহ-ব্যথা,
দৃঢ় করি হৃদে ধরি সতি,
উঠাও বিরহের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি
ত্রিজগত-ব্যাপী।
সাজি বিরহিণী সাজে,
জ্বালি দাও বিরহের বিষম অনল
প্রতি কলিহত জীব-হৃদে।
বিরহিণী হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাসে,
আলোড়িত হইবেক জীবের হৃদয়।
ব্যথিত হইয়া তারা—
আমা তরে কাঁদিয়া আকুল হইবে তখন।
কাষ্ঠ-পাষাণ-ভেদী
করুণ বিরহ বিলাপ-গীতে তব,
হৃদয়ে তাদের হবে তখন,
মোর তরে প্রেমের সঞ্চার।
তবে তারা শিখিবে—
অনুরাগে ডাকিতে আমাকে,—
তবে তারা মুক্ত হবে মায়া-পাশ হতে।
এই ত ভজন-পথ—
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ইহা—কলিহত জীব তরে।
কলি জীব বড়ই দুর্ব্বল,
নানা ভাবে উপদ্রুত তারা,
কলির ভজন তাই কেবল রোদন,
দুর্ব্বলের ইহা বিনা কি আছে সম্বল।"

এই যে গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কাষ্ঠ-পাষাণ-দ্রবকারী মর্ম্মন্তুদ গৌর-বিরহোচ্ছাস—নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরে বসিয়া নির্জ্জনে মর্ম্মীসখিগণের সহিত প্রিয়াজির এই যে অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন—ইহাই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মহান্ শিক্ষা—ইহাই তাঁহার কলিহত জীবের প্রতি অহৈতুকী অপার করুণার নিদর্শন—ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট দান। তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া নীলাচলের গম্ভীরা মন্দিরে বসিয়া যে মধুর ব্রজলীলা-মাধুর্য্য-রসসার প্রকট করিয়াছিলেন—তাহাই শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাযোগ-পীঠে বসিয়া তাঁহার বক্ষবিলাসিনী তাঁহারই উপদেশে কলিহত জীবের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য জীবজগতে প্রকট করিয়াছেন। ইহারই নাম অখণ্ড নবদ্বীপ-রস-সার,—দুর্ভাগ্য দুর্ব্বল, বুভুক্ষু কলিহত জগজ্জীবের গৃহে গৃহে এই রস-সার অবিচারে কলসে কলসে বিলাইবার জন্য এই বিস্তৃত আয়োজন,—এই প্রবল প্রাণঘাতী প্রচেষ্টা। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছাতেই ইহা প্রকাশ হইতেছে—তিনি ইচ্ছাময় স্বতন্ত্রপুরুষ—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। স্বৈরচারিতা স্বয়ংভগবানের একটী প্রধান গুণ—এই গুণটি তাঁহার অনন্যশরণ ভক্তগণের মধ্যেও তিনিই সঞ্চারিত করেন।

বৈষ্ণব-জগতের সাধনরাজ্যে বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন কি যে একটী অপূর্ব্ব প্রেম-সম্পত্তি,—দুষ্প্রাপ্য অমূল্যধন এবং অতুলনীয় বস্তু—তাহা যিনি একবার ইহা আস্বাদন করিয়াছেন—তিনিই বুঝিয়াছেন। মহাজন কবি লিখিয়াছেন,—

—"গাও রে গৌরবিরহ-গান গাও।
গেয়ে দেখ কেমন জুড়াও।"

এক্ষণে মধ্যে মধ্যে পরম স্বতন্ত্রা স্বয়ংভগবতী গৌর-বল্লভার মনের ভাব-বিপর্য্যয়ের চিহ্ন সকল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পরিদৃষ্ট হইতেছে। কয়েক দিবস হইতে তিনি তাঁহারমর্ম্মী ও দরদিয়া সখিদ্বয়সহ প্রাণ ভরিয়া পরম প্রেমানন্দে তাঁহার প্রাণবল্লভের নবদ্বীপ-লীলা-রসাস্বাদন করিতেছিলেন—তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্তলের মর্ম্মব্যথাগুলি একে একে অকপটে প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়কে বলিতেছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মুখে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপূর্ব্ব রসলীলা-কথা মহাজনী-পদে আস্বাদন করিতেছিলেন। এই ভাবে কয়েকদিন যাবৎ তিনি তাঁহার দুর্জ্জয় ও দুর্ব্বিসহ গৌর-বিরহজ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিতেছিলেন। সে ভাবটি এখন আর তাঁহার নাই—তিনি এখন সর্ব্বক্ষণই পরম গম্ভীর—আত্মকথা মিশ্রিত গৌরকথা শুনিতে বা বলিতে এখন তাঁহার আর সে ইচ্ছা নাই। তিনি এক্ষণে স্তম্ভভাবে বহুক্ষণ সমাধি-অবস্থায় ভাবাবেশে থাকেন—তাঁহার আর পূর্ব্ববৎ সে প্রসন্ন ভাব নাই—তিনি যেন কঠোর হইতে কঠোরতম কোন উৎকট তপস্যামগ্না।

বিরহিণী প্রিয়াজির মনের এই ভাব-বিপর্য্যয় অকস্মাৎ হইয়াছে। মর্ম্মী সখিদ্বয় অমিতা ও কাঞ্চনা প্রিয়াজির এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছেন না—প্রিয় সখিকে কিছু বলিতেও পারেন না—তাঁহারা কি যে করিবেন কিছুই বুঝিতেও পারিতেছেন না। ভজন-মন্দির-দ্বার তাঁহাদের পক্ষে অবরুদ্ধ নহে—দিবা রাত্রি দ্বার উন্মুক্তই থাকে—কিন্তু প্রিয়াজির শ্রীমুখে কোন কথাই নাই—তিনি এখন মৌন-ব্রতাবলম্বিনী। হরিনামের জপমালা কখন তাঁহার হাতে থাকে—কখন হস্তস্খলিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হয়—কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই—কোন বিষয়ে তাঁহার আসক্তি নাই—এক দিনের মধ্যেই বিরহিণী প্রিয়াজি যেন কেমনতর হইয়াছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার মর্ম্ম-বেদনার আর পরিসীমা নাই—অন্তঃপুরের অন্যান্য সখি ও দাসীগণ সন্ত্রস্ত হইয়াছেন—সকলের আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছে। বহির্বাটিতেও এই সংবাদ গিয়াছে—অতিবৃদ্ধ ঈশান ও দামোদর পণ্ডিতও মর্ম্মাহত হইয়া জড়বৎ স্থবীরের ন্যায় বসিয়া আছেন—তাঁহাদিগের নয়নজলে বক্ষ ভাসিতেছে—মধ্যে মধ্যে বদনে "হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ!" এইরূপ করুণ ক্রন্দন-ধ্বনির সকরুণ রোল অন্তঃপুরে পৌঁছিতেছে—তাহাতে অন্তঃপুরবাসিনী সখি ও দাসীগণের অন্তরে যেন শেল বিদ্ধ হইতেছে। ঠাকুর বংশীবদন মনের দুঃখে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার শয্যাতল অশ্রুসিক্ত—মধ্যে মধ্যে "হা গৌরাঙ্গ! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ"-ধ্বনি—আর অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ শ্রুত হইতেছে। ঈশান ও দামোদর পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গিয়া বসিতেছেন, সস্নেহে পরম প্রেমাবেশে তাঁহার গাত্রে হস্ত বুলাইতেছেন—কাহারও মুখে কোন কথা নাই—গৌরশূন্য গৌরগৃহের এই গৌরবিরহ-দগ্ধ

বৈষ্ণব মূর্ত্তিত্রয় যেন কি এক ভীষণ শোকের সাগরে ভাসিতেছেন।

গৌরশূন্য গৌরগৃহে বসিয়া গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী একান্তে নির্জ্জনে নিজ ভাবে গৌরভজন করিতেছেন—নদীয়াবাসী গৌরভক্তবৃন্দ তাহাই জানেন—কিন্তু অকস্মাৎ এই যে প্রিয়াজির মৌনব্রতাবলম্বন এবং কঠোর তপস্যার কথা কিছুই তাঁহারা জানেন না। এক্ষণে একথা আর গুপ্ত রহিল না—ক্রমশঃ এই নিদারুণ সংবাদ সমগ্র নদীয়ায় তড়িৎ বার্ত্তার ন্যায় প্রচারিত হইল। নদীয়াবাসী ভক্তগণের গৃহে গৃহে হাহাকার পড়িয়া গেল—কাহারও উনানে হাঁড়ি চড়িল না। সমগ্র নদীয়াবাসী বিষম বিপদ-সাগরে মগ্ন হইল।

পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বয়ং প্রিয়াজির শ্রীমুখে তাঁহার প্রাণবল্লভের নবদ্বীপ-রস-লীলা-কথা-প্রসঙ্গ সকল শ্রবণ করিয়া সখি অমিতা ও কাঞ্চনার প্রাণে বড় একটা, আশার সঞ্চার হইয়াছিল—তাঁহার প্রাতঃকালীন লীলারঙ্গ দর্শনেও তাঁহাদের প্রাণের সে আশা ভঙ্গ হয় নাই। তবে একটী চিন্তার বেগ তাঁহাদের মন মধ্যে সর্ব্বদাই উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল—তাহা এই। পরম স্বতন্ত্রা মহাতপস্বিনী বিরহিণী গৌরবল্লভাকে লইয়া তাঁহারা যে ভাবে গৌর-বিরহরসাস্বাদন করিতেছেন—যে ভাবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় সখির অন্তরঙ্গ প্রেমসেবা করিতেছেন—সে ভাবটী প্রিয়াজির মনোমত কি না—অর্থাৎ তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাদের প্রিয় সখি এরূপ একটী সাময়িক বাহ্য লীলারঙ্গ প্রকট করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণে শান্তিদান করিতেছেন, এরূপ একটী প্রবল চিন্তার স্রোত মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হৃদি-সমুদ্র আলোড়িত করিতেছিল। ইহার সমাধান কে করিবে? স্বয়ং প্রিয়াজি ভিন্ন অন্যে কেহ ইহার সমাধান করিতে সক্ষম নহেন—কিন্তু এ প্রশ্ন তাঁহাকে এখন কে করিবে?

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা এই ভাবে মনে মনে নানাবিধ জল্পনা ও কল্পনা করিতেছেন এবং ভজন-মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহাদিগের মনবেদনার অন্ত নাই—মর্ম্মবেদনার সীমা নাই। বহির্বাটিতে বৃদ্ধ পণ্ডিত দামোদর, ঠাকুর বংশীবদন ও অতি বৃদ্ধ ঈশানকে দেখিবার আর কেহ নাই—তাঁহাদিগের মানসিক অবস্থা অতীব শোচনীয়—তাঁহারা মনদুঃখে ক্ষণে ক্ষণে মনে করিতেছেন—গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ ক'র—পুনরায় তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আদেশ স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দেরও মর্ম্ম-বেদনার সীমা নাই—তাঁহারা আজ সকলেই উপবাসী। গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে একান্ত গৌরনিষ্ঠ ভক্তগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন,—সকলেরই বিষণ্ণ-বদন—নয়নে নীরধারা। বহির্বাটীর দ্বার মুক্ত—শিবানন্দ সেন, বুদ্ধিমন্ত খান, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, মাধব ঘোষ প্রভৃতি গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ সকলেই বিরস বদনে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন—তাঁহারা বহিরাঙ্গনে প্রবেশ করিতেও ইতস্তত বোধ করিতেছেন।

প্রাতঃকাল—ফাল্গুন মাসের শেষ—দিবা এক প্রহরমাত্র হইয়াছে—এমন সময়ে গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে একখানি পালকী আসিয়া দাঁড়াইল—সঙ্গে কয়েকজন মাত্র দাস দাসী। উপস্থিত গৌরভক্তগণ পালকী দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী শ্রীসীতাঠাকুরাণী আসিয়াছেন—ক্ষণ-কাল মধ্যে পালকীর পর্দ্দা খুলিয়া শ্রীসীতা-ঠাকুরাণী বাহির হইলেন—তাঁহাকে দেখিবাই উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—ভক্তবৃন্দের অশ্রু পূর্ণ শুষ্কবদন দেখিয়াই শ্রীসীতাদেবী বুঝিলেন গৌরশূন্য গৌর-গৃহের অন্তঃপুরে কি একটা বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যে একজন দৌড়িয়া গিয়া অতি বৃদ্ধ ঈশানকে শ্রীসীতাদেবীর শুভাগমন-সংবাদ দিলেন—ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে ধূল্যব-লুণ্ঠিত দেহে ঠাকুর বংশীবদন ও পণ্ডিত দামোদরকে সঙ্গে লইয়া বহির্দ্বারদেশে আসিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন—তাঁহারা সকলেই নয়নের জলে বক্ষ ভাসাইয়া উচ্চ ক্রন্দন-রোলে বিস্তীর্ণ গঙ্গাতট মুখরিত করিয়া শ্রীসীতাদেবীর চরণ-তলে দীঘল হইয়া পড়িয়া গেলেন—কেহই আর উঠিতে চাহেন না। স্নেহময়ী অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবীরও বদন মলিন। নয়নদ্বয়ে দরদরিত বারিধারা—শরীর জীর্ণ শীর্ণ—তিনি সেই স্থানেই সকলের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন—তাঁহার সুকোমল পদ্মহস্ত দুই খানি বৃদ্ধ ঈশান, পণ্ডিত দামোদর এবং এবং ঠাকুর বংশীবদনের পৃষ্ঠদেশ সস্নেহে স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণীকে বহির্দ্বারের মৃত্তিকাসনে মাথায় হাত দিয়া উপবিষ্ট দেখিয়া অতিবৃদ্ধ ঈশানের গৌর-বিরহ-দুঃখ-সমুদ্র একেবারে

উথলিয়া উঠিল—তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কর-যোড়ে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন—"মাগো! দয়াময়ী মাগো! মুঞি জীবাধম ঈশান এখনও জীবিত আছি—গৌরশূন্য গৌর-গৃহের পালিত কুক্কুর মুঞি মহাপাপী—ঠাকুরাণীকে ছাড়িয়া আমার মরণেও স্বস্তি নাই—সম্মুখে পতিতপাবনী গঙ্গা—কতদিন মনে ভাবিয়াছি—গঙ্গায় ঝম্প দিয়া গৌরবিরহতাপদগ্ধ এই দেহটা ত্যাগ করি—কে যেন পশ্চাৎ হইতে নিষেধ করেন, আর বলেন 'তুই তোর ঠাকুরাণীর সেবা কর"—মুঞি জীবাধম ঠাকুরাণীর কি সেবা করিব? মাগো! দয়াময়ী মাগো! তুমিত সকলই জান—ঐ দেখ অন্তঃপুরের দ্বারে তালা বন্ধ—মাগো! এস বহির্বাটীতে আমাদের কাঙ্গালের কুটীরে একটীবার চরণ-ধুলি দাও মাগো! আমি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অন্তঃপুরে গিয়া কাঞ্চনা দিদিকে আপনার শুভাগমন-সংবাদ দিয়া আসি এবং প্রিয়াজির অনুমতি লইয়া তালার চাবি লইয়া আসি।"—

এই বলিয়া অতিবৃদ্ধ ঈশান তাড়াতাড়ি নিজ ভজন কুটীরে সীতাদেবীকে আসন দিয়া বসাইয়া বাঁশের মৈ দিয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অতি কষ্টে অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে প্রাঙ্গনস্থ তুলসীমঞ্চের সম্মুখে গিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দীঘল হইয়া পড়িয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দৈন্ত ও আর্ত্তি সহকারে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ভজন-মন্দির-দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন অন্যমনস্ক ভাবে—তাঁহাদের শুভদৃষ্টি পতিত হইল হঠাৎ ঈশানের প্রতি—তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া অতিবৃদ্ধ ঈশানের নিকট বসিয়া পরম স্নেহভরে প্রশ্ন করিলেন—'ঈশান দাদা! কি হইয়াছে বল—তোমার ক্ষীণকণ্ঠের পাষাণভেদী ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আমাদের বুক ফাটিয়া যাইতেছে—বল বল দাদা! তোমার কি হইয়াছে?"

তখন ঈশান আঙ্গিনার রজে গড়াগড়ি দিয়া ধুল্যবলুণ্ঠিত দেহে উঠিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—"দিদি গো দিদি! কি আর বলিব মুঞি। শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী আসিয়াছেন, আমার ঠাকুরাণীকে দেখিতে। মুঞি নরাধম তাঁহাকে বহির্বাটীতে দাদা দামোদর পণ্ডিত ও বংশী-বদন ঠাকুরের নিকট বসাইয়া তোমাদের সমাচার দিতে আসিয়াছি। এখন দিদি গো দিদি! যাহা করিতে হয় তোমরা কর—মুঞি বলিয়া খালাস। ঘরের খবর ত মুঞি সকলি জানি—তোমাদের মনঃকষ্ট সকলি বুঝি—এখন কি করিলে আমার সীতামার সম্মান রক্ষা হয়, তাহা তোমরা কর দিদি।"—

এই বলিয়া অতিবৃদ্ধ ঈশান দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বড়ই বিপদে পড়িলেন—বহুদিন পরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতাঠাকুরাণীর গৌরশূন্য গৌর-গৃহে শুভাগমন হইয়াছে। শচীমাতার অপ্রকটের পর একটীবার মাত্র তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পরম প্রিয়তম পালিত-পুত্র ঈশান নাগরকে দিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে বিরহিণী গৌরবল্লভার সমাচার গ্রহণ করেন—গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির কঠোর, ভজনবৃত্তান্ত সকলি আচার্য্য-দম্পতি জানেন—দৃঢ়ব্রতা গৌরবক্ষ-বিলাসিনীর সুদৃঢ় সংকল্প—তিনি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে পরম পূজনীয়া মাতৃস্থানীয়া মাননীয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীবর্গের পর্য্যন্ত প্রবেশ নিষেধ করিয়াছেন—এ সকল কথা তাঁহারা জানেন,—তথাপিও সীতাদেবী আজ একাকিনী ভিখারিণীর মত গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে আসিয়া প্রিয়াজির দর্শনাশায় বহির্বাটীতে বসিয়া আছেন। পরমাদ্ভুতচেষ্টিতা পরমা স্বতন্ত্রাপ্রকৃতি গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই পরমাদ্ভুত ও পরম গুহ্য নিগূঢ় লীলারহস্য কে বুঝিবে?

ভজন-মন্দিরে বিরহিণী প্রিয়াজি স্বানুভাবানন্দে প্রেম-সমাধি-মগ্না—নয়নকোণে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে,—দ্বার উন্মুক্ত। সখি কাঞ্চনা মৃদুপদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে ও ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রিয়াজির দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন—গৌর-বল্লভার বাহ্য-জ্ঞান নাই—কি করিলে প্রিয়াজির এই প্রেমসমাধি ভঙ্গ হয়, সখি কাঞ্চনা তাই ভাবিতেছেন—সখি অমিতা দূর হইতে অতি বিচিত্র প্রিয়াজির এই প্রেম-রহস্য-লীলারঙ্গ দর্শন করিতেছেন। সকলেই মহা উদ্বিগ্নচিত্ত।

বেলা এক প্রহর প্রায় অতীত হইতে চলিল—শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী বহির্বাটীতে ঈশানের ভজনকুটীরে বসিয়া আছেন—তিনিও মহা উদ্বিগ্নমনা—তিনিও কত কি ভাবিতেছেন—গৌরশূন্য গৌর-গৃহের অন্তঃপুর নীরব, নিস্তব্ধ—সেখানে পশুপক্ষীর কলরব পর্য্যন্ত নাই—কেবল

মাত্র সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এবং গঙ্গা-সলিল-সঞ্চারী পবনে যেন একটী অতি মৃদু ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে —"হায় হায় হায়" !!

সখি কাঞ্চনা ঠিক এই সময়ে সমাধিমগ্না প্রিয়াজির পার্শ্বে বসিয়া এই "হায় হায় হায়" সুরের সহিত সুর মিলাইয়া একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ—।

—"হায় হায় একি সখি হলো নদীয়ায়।
পবনে সলিলে করে হায় হায় হায়॥
যা ছিল জীবনে সুখ সব গেল হায়।
প্রাণ-সখি মোর সনে কথা নাহি কয়॥
গৌর-কথা সখি-মুখে শুনা নাহি যায়।
কি করে জীবন ধরি যাইব কোথায়॥
বলিবার কথা নহে শুধু হায় হায়।
বলিলেও কেহ তাহা নাহি পাতিয়ায়॥
প্রিয়াজির দরশন আশার আশায়।
বসে আছেন সীতাদেবী বহিঃরাঙ্গিনায়॥
(ওহে) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর এস রসময়।
এ সময়ে রঙ্গ করা ভাল না দেখায়॥
প্রিয়াজির মৌনব্রত ভাঙ্গি অমায়ায়।
সীতাদেবীর মানরক্ষা, কর গোরা রায়॥
কাঞ্চনার দুঃখ দেখি বুক ফেটে যায়।
দূরে থাকি হরিদাসী করে হায় হায়॥"—

গৌর-গীতিকা।

সখি কাঞ্চনার এই গানটী শেষ হইতে না হইতে ভজন-মন্দির মধ্যে সুধামধুর কণ্ঠস্বরে দৈববাণী হইল —"বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রিয়তমে! অদ্বৈতগৃহিণীর যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা কর"—এই দৈববাণীর কণ্ঠস্বর স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের—সমাধিমগ্না প্রিয়াজির পিপাসিত কর্ণে তাঁহার প্রাণবল্লভের সুধামধুর অমিয়সিঞ্চিত কণ্ঠস্বর প্রবেশ মাত্র তাঁহার প্রেম-সমাধি তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হইল। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার কর্ণেও এই দিব্য কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল—তাঁহারা প্রেমপুলকাঞ্চিত দেহে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাবের শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-অঙ্গ-গন্ধে ভজনমন্দির মহ মহ করিতে লাগিল— বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমানন্দে চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র তাঁহার ভজন-মন্দিরের সুসজ্জিত শয়ন-পর্য্যঙ্কে তাঁহার প্রাণবল্লভকে শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন পরম প্রেমাবেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয় সত্বর আসিয়া তাঁহাকে দুইজনে দুইপার্শ্বে ধরাধরি করিয়া পালঙ্কের নিকট লইয়া গেলেন—গৌর বিরহিণীত্রয় তখন পরম প্রেমাবেশে দেখিতেছেন,—

—"হেমময় খট্টা-খুরা প্রবালে নির্ম্মিত।
তুলিযুক্ত শেতবস্ত্র তাহাতে মণ্ডিত॥
সুরঙ্গ পাটের ডোর বদ্ধ চারি কোন।
মণিময় থোপ তাহে অরুণ কিরণ॥
উচ্চ চারি স্বর্ণদণ্ড তাহে সুবলন।
ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপ লগ্ন তাহা সুরচন॥
লম্বিত দোলয়ে সূক্ষ্ম মুকুতার হার।
স্বর্গ হৈতে পড়ে যেন সুরধুনী ধার॥
তল্প যেন কৈলাসের সুরচিত খণ্ড।
শোভয়ে বালিস যেন নবনীত পিণ্ড॥
শুভ্র চীন বস্ত্রের পালঙ্ক আচ্ছাদনী।
তথিমধ্যে শুতি আছে গোরা দ্বিজমণি॥
তপত কাঞ্চন জিনি সুবলন অঙ্গ।
অলসে অবশ সব বিপরীত রঙ্গ॥
চাঁচর চিকুর যাঁর কুটিল কুন্তলে।
শ্লথ মুক্তাদাম তহি মল্লিকার মালে॥
চন্দনের শোভে ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
কুঙ্কুম কস্তুরী ফল্গু বিন্দু মনোহর॥
সুচিকন গণ্ডে সাজে কুণ্ডল রতন।
কাম শরাসন জিনি ভ্রূভঙ্গ পত্তন॥
গৌরাঙ্গ-নয়ন শোভা উপমা করিতে।
ভাবিয়া না হয় কিছু বিধির শিল্পিতে॥
বুঝি কাম গোরাভুরু ভঙ্গিমার ডরে।
অঙ্গহীন হইয়া অনঙ্গ নাম ধরে॥
কি বা সতীগণ-চিত্ত-হরিণী বান্ধিতে।
মদনের জাল কেবা করিল নির্ম্মিতে॥
নিদ্রান্তে মুদ্রিত দুই কমল নয়ন।
নিবিড় সুস্থির পক্ষ্ম অসিত বরণ॥
পক্ক বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর।
ঈষৎ হসিত মুখ জগ মনোহর॥

পীন বক্ষ শোভা করে নানাবিধ হারে।
আজানুলম্বিত ভুজ অতি সুগভীরে॥
ভুজদ্বয়ে নবরত্ন বলয়া মণ্ডিত।
শ্রীঅঙ্গ শোভিত ঘন চন্দনে চর্চ্চিত॥
সূক্ষ্ম শুভ্রবস্ত্র সাজে নিতম্ব উপরে।
উত্তরীয় সুশোভিত বেড়িয়া শরীরে॥
প্রান্তভাগ সুবর্ণের কুসুম অঞ্চল।
ক্ষীণ যজ্ঞসূত্র তহি অতি সুনির্ম্মল॥
কর-পদ-তলারুণ জলজ বিকাশ।
করাঙ্গুলী মুদ্রিকাতে তিমির বিনাশ॥

* * * * *

কীর্ত্তন বিহার শ্রম অলসের ভরে।
শুতি আছে গৌরশশী পালঙ্ক উপরে॥"—

শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত।

নিত্য নবদ্বীপ-ধামের শ্রীমায়াপুর মহাযোগপীঠস্থ মহৈশ্বর্য্য ও পরম মাধুর্য্যময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের এই যে নিশান্ত-কালীয় রসলীলারঙ্গের অপূর্ব্ব বিচিত্র চিত্রে তাঁহার বিশিষ্ট আবির্ভাব—ইহা জাগ্রত স্বপ্নবৎ দর্শন করিলেন বিরহিণী গৌরবল্লভা নিমেষের জন্য মাত্র। ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী চমৎকারিতার অত্যদ্ভুত দিব্য প্রভাবে মাত্র মুহূর্ত্তকাল ব্যবধান নিমিষের মধ্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের এই অনির্ব্বচনীয় অতি বিচিত্র রসলীলারঙ্গটি দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইলেন প্রিয়াজির নিত্যলীলার মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা,—কিন্তু ভিন্ন ভাবে। তাঁহারা দেখিলেন প্রিয়াজির সহিত তাঁহার প্রাণবল্লভ দিব্য মণিময় সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে পরম প্রেমানন্দে যুগলে শয়ন করিয়া অপূর্ব্ব রস-লীলারঙ্গ প্রকট করিতেছেন। সখি কাঞ্চনা তখন গৌর-প্রেমানন্দে বিভোর এবং আত্মহারা হইয়া সখি অমিতার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া নদীয়া-যুগল-গীতির একটী পদের ধুয়া ধরিলেন। অমিতার প্রতি সখি কাঞ্চনার উক্তি—

রাগ—বেহাগ একতালা।

হের বিষ্ণুপ্রিয়া রঙ্গিণী।
রস-গৌর-অঙ্কে, রস-পালঙ্কে,
বিলসে গৌর-কামিনী॥
কাঁপে থর থর আহা কি রঙ্গে,
(প্রাণ) নাথ-অঙ্গে রসপ্রসঙ্গে
যাপিতে মধুর যামিনী॥

মুখ-শোভা জিনি বিমল ইন্দু,
সিঁথিতে সিন্দুর ভালে বিন্দু,
নাশায় বেশর পরি মনোহর,
মোহনে মোহে মোহিনী॥
পিন্ধন শাড়ী অতি বিচিত্র,
রাঙ্গাপাড় তাহে রঙ্গিন চিত্র,
পদে অলক্ত রাগ দীপ্ত,
তপ্ত হেম-বরণী।
অতি অপরূপ রস আবেশ,
নাহি অন্তরে লাজ লেশ,
অম্বরে নাহি আবরে কেশ,
রসভরে উন্মাদিনী॥
উজ্জ্বল চারু গণ্ড উপরে,
কজ্জল ভাসে নয়ন-নীরে,
মজ্জিত যেন রস-সাগরে,
কান্ত-ক্রোড়ে সীমন্তিনী।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিকাশ,
উল্লাসে বহে সঘনে শ্বাস,
গদ গদ আধ মধুর ভাষ,
ভাষে অমিয়-ভাষিণী॥
তাহে আর কত রস-তরঙ্গ,
(সে প্রেম)—পয়োধি-অঙ্গে হয় যে ভঙ্গ,
এ দাস বিশ্বরূপ স্মরি সে রঙ্গ,
করে প্রিয়ার জয়ধ্বনি"॥

শ্রীগৌর-লীলা-গীতিকাব্য।

সখি অমিতার সর্ব্ব অঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইল—তিনি এই অপরূপ যুগল-বিলাস-লীলারঙ্গ দর্শনে যেন আনন্দ স্বরূপ হইয়াছেন—তিনি অতিশয় অল্পভাষিণী—প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সখি অমিতা প্রেমগদগদ ভাবে যুগল-আবাহনের একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"কুঞ্জে এসেছে কুঞ্জ-বিহারী
শচীনন্দন গৌরহরি॥
রসিক শেখর নদীয়া-নাগর
রমণী-মোহন রূপ ধরি॥

শচী-দুলালিয়া গোরা বিনোদিয়া
(নব) নটবর বেশে এসেছে।
মালতী ফুলের গাঁথিয়াছি মালা
(নিজ হাতে) পরায়ে তোমায় দিব হে॥"—
গৌর-গীতিকা।

এই যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ক্ষণিক অতি বিচিত্র পরমগুহ্য রহো-লীলা-রঙ্গ—ইহা নিমেষের মধ্যে প্রকটিত হইল নদীয়ার মহা যোগপীঠে বিরহিণী গৌরবক্ষবিলাসিনীর প্রেম-সমাধি ভঙ্গের জন্য—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের অনুরাগময়ী প্রেম-চেষ্টার আধিক্যে—তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব গৌরানুরাগ-পূর্ণ প্রেমাহ্বানে— গৌর-লীলায় যোগমায়া অদ্বৈতগৃহিণী সীতা দেবীর অপূর্ব্ব প্রেম-জাল-কৌশলে, মুহূর্ত্তমধ্যে নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে এই অতি বিচিত্র প্রেম-বিলাস-চিত্রে শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-লীলারঙ্গ পুনঃ প্রকাশিত হইল। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার এই যে অতি অপূর্ব্ব শুভদর্শন দৃশ্যপট এবং অদ্ভুত প্রেম-চেষ্টার বিচিত্র চিত্র—ইহাও ক্ষণেকের জন্য প্রকটিত হইল শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-মিলন-কারিণী যোগমায়া শ্রীসীতা দেবীর ইচ্ছায় এবং শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের কৃপায়। এই যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ক্ষণিক আবির্ভাব-লীলারঙ্গ—ইহাতেই বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার মর্ম্মী সখিগণের জীবন রক্ষা হইতেছে—ইহাই তাঁহাদিগের প্রাণ রক্ষার একমাত্র উপায়।

যাহা হউক লীলাময় শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের এই সকল অপূর্ব্ব লোকলোচনের অগোচর লীলারঙ্গ ক্ষণেকের মধ্যেই প্রকটিত ও অন্তর্হিত হইল—ইহাতে অধিক সময় গেল না। এক্ষণে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছায় বিরহিণী প্রিয়াজি এবং মর্ম্মী সখিদ্বয় প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন—গৌর-বল্লভার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে—তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রসন্নতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—অধরে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়াছে। ইহা দেখিয়া মর্ম্মী সখীদ্বয়ের মৃতদেহে যেন প্রাণ আসিল। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন তাঁহার প্রাণ-বল্লভার আবির্ভাবজনিত তাৎকালিক মনোভাব গোপন করিয়া দুই হস্তে সখিদ্বয়ের দুইটী হস্ত ধারণ করিয়া প্রেম-গদগদ বচনে সাশ্রুলোচনে করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন,—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে! প্রাণসখি অমিতে! আমার প্রকৃতি বড়ই নিষ্ঠুর—সর্ব্বভাবেই আমি তোমাদের সখির অযোগ্যা—তোমাদের স্নেহের অনধিকারিণী—আমার পুঞ্জীকৃত অপরাধ রাশি তোমরা নিজগুণে ক্ষমা করিবে। দৈববাণী হইয়াছে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী আসিয়াছেন। তিনি কোথায় আছেন? আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব"—এই বলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা অতিকষ্টে উঠিবার চেষ্টা করিলেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহাকে দুই পার্শ্বে ধরিয়া অন্তঃপুরাঙ্গনে আনিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন প্রিয়াজিকে কহিলেন—"সীতা ঠাকুরাণী বহিরাঙ্গনে ঈশান দাদার কুটীরে বসিয়া আছেন—তোমার অনুমতি ব্যতিত অন্তঃপুরের দ্বারের তালা খুলিয়া দেয় এমন লোক ত কেহ নাই—এখন অনুমতি দাও সখি! তালা খুলিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে আনয়ন করি।"—

গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজি কিছুকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—মুখে কোন কথা নাই—ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন—তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে—বক্ষ বহিয়া পরিধান বস্ত্র সিক্ত করিতেছে—চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় তিনি অন্তঃপুরপ্রাঙ্গনের দ্বারদেশে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনিই বহিরাঙ্গনে গিয়া শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণীকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া গৌরশূন্য গৌরগৃহে আনয়ন করেন। তিনি আকারে ইঙ্গিতে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের নিকট নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলেন—অন্তঃপুরদ্বার মুক্ত হইল—অতিবৃদ্ধ ঈশান আসিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন—তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়াজির চরণতলে দীঘল হইয়া পড়িলেন—সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে ঈশান আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বহিরাঙ্গনের লোকসংঘট্ট হটাইয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

এক্ষণে শ্রীসীতা ঠাকুরাণী বহিরাঙ্গন হইতে সকলি দেখিতেছেন এবং বুঝিতেছেন—তিনিই এক্ষণে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরদ্বারাভিমুখে আসিলেন—সঙ্গে অতিবৃদ্ধ ঈশান—তাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি থর থর কাঁপিতেছে—পদে পদে পদস্খলিত হইতেছে—নয়নদ্বয়ে প্রেমনদী বহিতেছে—বদনখানি বিষাদপূর্ণ—সখি কাঞ্চনা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহুবেষ্টনে তাঁহাকে ধরিয়া আনিলেন—শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী প্রেমাবেশে সখি কাঞ্চনার গলদেশে দুই বাহু বেষ্টন করিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—ক্রমশঃ তাঁহারা দুইজনে এইভাবে অন্তঃপুর-

দ্বারদেশে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন একটী হৃদি-বিদারক প্রেম-ক্রন্দনের করুণ ক্ষীণ ধ্বনি উঠিল—সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিল বহিরাঙ্গনে যেখানে এখনও পুনরায় গৌর-ভক্তগণের সংঘট্ট হইয়াছে। গৌরশূন্য গৌরগৃহে বহুদিনের পর আজ করুণ ক্রন্দনের বিষম একটা রোল উঠিল—যাহার প্রভাব সর্ব্বনদীয়ায় পরিব্যাপ্ত হইল—সর্ব্ব নদীয়া-বাসীর গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি ধ্বনিত হইল।

অন্তঃপুর-দ্বারে শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীকে [illegible]-মাত্র বিরহিণী প্রিয়াজি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন—সশব্যস্তে স্নেহময়ী সীতাঠাকুরাণী তখন সেখানে আসিয়া গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরম প্রেমভরে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। তাঁহার ক্রোড়ে প্রিয়াজি নিষ্পন্দভাবে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই—শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণীও গৌরবল্লভার পৃষ্ঠোপরি বদন লুকাইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা উভয়েরই অন্তঃরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত আছেন—অন্যান্য সখি ও দাসীগণ সকলেই সেই সেবাকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন—সকলেরই বিষণ্ণ বদন—নয়নে নীরধারা—গৌরশূন্য গৌরগৃহে আজ খরতরা প্রেম-নদী বহিতেছে—কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে বীজন করিতেছেন—প্রিয়াজির পৃষ্ঠদেশে সীতা দেবী বদন লুকাইয়া কাঁদিতেছিলেন—সখি অমিতা ধীরে ধীরে তাঁহাকে উঠাইয়া ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন—এদিকে সখি কাঞ্চনা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা—কর্দ্দমাক্ত বসনা—বাহ্যজ্ঞানশূন্যা গৌর-বক্ষ-বিলাসিনীকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার সবিশেষ অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী ও প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান নাই—উভয়েরই পরিধান বসন অসম্বর—অতিবৃদ্ধ ঈশান বহিরাঙ্গনে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, আর সর্ব্ব অঙ্গিনার ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন—দামোদর পণ্ডিত এবং ঠাকুর বংশীবদন দুই জনে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ভজন-কুটীরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা ঈশানকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণীর পাল্‌কী বাহক ও দাসদাসীগণের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কৃপাময় গৌরভক্ত পাঠক ও কৃপাময়ী পাঠিকাবৃন্দ! এখন একবার গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্তঃপুরের কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান এই হৃদি-বিদারক প্রাণঘাতী করুণ দৃশ্যপটটি নিজ নিজ মানসচিত্রে অঙ্কিত করুন—ইহা আপনাদের ধ্যানের বস্তু—স্মরণ মননের বিষয়।

শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী ও গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজির বাহ্য-জ্ঞান তখনও হয় নাই। সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে তখন অন্তঃপুরের দ্বারদেশেই উচ্চৈঃস্বরে গৌর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—

"জয় শচীনন্দন [illegible] গৌর হরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বি[illegible]"—

গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্তঃপুর মুখরিত করিয়া এই অপূর্ব্ব উচ্চ কীর্ত্তন-ধ্বনি বহিরাঙ্গনেও পরিব্যাপ্ত হইল—সেখানেও উপস্থিত গৌরভক্তগণ এই উচ্চকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। নদীয়ার আকাশে [illegible] সেই মধুর কীর্ত্তনধ্বনি ধ্বনিত হই[illegible] নদীয়ায় কীর্ত্তনধ্ব[illegible] উঠি—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥"—

কিছুক্ষণ পরে শ্রীসীতাদেবীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি যখন এই অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন; তখন তিনি যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছেন—

—"ঐছে গীত, ঐছে কীর্ত্তন, ঐছে গৌরধ্বনি।
কভু নাহি দেখি আর কভু নাহি শুনি॥"

তিনি দেখিতেছেন তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর নদীয়া-নাটুয়া নিমাইচাঁদ যেন এই বিরাট সঙ্কীর্ত্তনবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া তাঁহার আজানুলম্বিত সুবলিত দুই বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কটি দোলাইয়া পরম প্রেমানন্দে নয়নরঞ্জন মধুর নৃত্য বিলাস করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈত গৃহিণীর এই জাগ্রত স্বপ্নদৃষ্ট কীর্ত্তনলম্পট নদীয়া-নাটুয়া শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের তখন আবির্ভাব হইল শচী-আঙ্গিনায়। গৌর-অঙ্গ গন্ধে আঙ্গিনা মহ মহ করিতেছে—সখি ও দাসীগণ গৌর-প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া পুনরায় সঙ্কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—'জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"

"কাঞ্চনা সখি মূল গায়িকা,—সখি অমিতা কাঁদিতে কাঁদিতে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া আখর দিলেন—

——"ওহে বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ!
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"—

সখি কাঞ্চনার অনুরাগের ডাকে তখন যেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার সন্নিকটে আসিলেন—প্রিয়াজির প্রেমমূর্চ্ছা তখন ভঙ্গ হইল—তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া যাহা দর্শন করিলেন, তাহাতে তাঁহার মন প্রাণ প্রেমানন্দে ভরিয়া গেল—তিনি স্বানুভাবানন্দে যখন উঠিয়া বসিলেন,—তখন শ্রীসীতাদেবীর সঙ্গে চারি চক্ষের মিলন হইল—দরদরিত প্রেমাশ্রুধারায় উভয়েরই বক্ষ প্লাবিত হইল। শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী প্রিয়াজিকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতেই পারিলেন না—বিরহিণী গৌর-বল্লভার দেহযষ্টি-খানি জীর্ণশীর্ণ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছে—বদনচন্দ্র মলিন ও শুষ্ক,—সুতীব্র ও কঠোর বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ গৌর-বক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এরূপ শোচনীয় শারীরিক অবস্থা দেখিয়া স্নেহময়ী সীতাদেবী মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন। প্রিয়াজি দেখিতেছেন শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণীর এখন বৃদ্ধাবস্থা—তাঁহার রুগ্ন শরীর, পক্ক কেশ, কোটরাগত চক্ষু—বদনে কালিমার রেখা পড়িয়াছে—যেন তিনি কত কি মনঃকষ্টে দিনপাত করিতেছেন।

প্রিয়াজি এখন পর্য্যন্ত সীতা ঠাকুরাণীক প্রণাম করেন নাই—ইহা তাঁহার স্মরণই নাই—এক্ষণে হঠাৎ এই বিষম অপরাধের কথাটি তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইতেই তিনি সশব্যস্তে উঠিয়া অদ্বৈতগৃহিণীর চরণের ধূলি গ্রহণ করিয়া নিজ মস্তকে দিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন,—সীতাদেবীও প্রেমাশ্রুপূর্ণ-নয়নে পরম স্নেহভরে প্রিয়াজির ক্ষীণ হস্ত দু'খানি দুই হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিয়া প্রেমগদগদভাবে মৃদু মধুর বচনে কহিলেন—"বউমা! তুমি আমাদের বড় আদরের ধন—বড় স্নেহের বস্তু। আমার প্রিয়সখি শচীদেবী আমারই হস্তে তোমার সকল ভার দিয়া গিয়াছিলেন—তুমি মা! যেরূপ কঠোর ব্রত নিয়মে ভজন সাধন করিতেছ—তাহা শুনিলে আমাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া যায়—তোমার প্রাণবল্লভের মাতৃবর্গের পক্ষেও তোমার ভজনমন্দিরের দ্বার মানা—কি করিব? মনদুঃখে জীবন্মৃতা হইয়া আছি—এ কালামুখ আর তোমাদের দেখাইতে একেবারেই আমার ইচ্ছা ছিল না—গৌরশূন্য গৌরগৃহে পুনরায় আসিবার আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না,—একথা বলিলে আমার অপরাধ হয় তাহা জানি—মাগো! তুমি যতদিন আছ—আমার প্রাণগৌরাঙ্গের শ্রীগৃহ্মন্দির আছে এখানে—আমরা প্রতি বৎসর নীলাচলে গৌর দর্শনে যাই—তোমার জীবনসর্ব্বস্বধন শচীনন্দনকে দেখিয়া মনে মনে ভাবি—তিনি যেন কতই দুঃখী—তোমাদের নিকটে যেন কতই অপরাধী। তোমার নির্জ্জন কঠোর ভজন-কথা তিনি সকলি শুনিয়াছেন—ইহাতে তিনি পরম সুখী—তাঁহার সুখেই তোমার সুখ—আত্মসুখ তাৎপর্য্য তোমার নাই—তাহা আমি জানি—আমি তোমার নির্জ্জন ভজনে বিঘ্ন দিতে আসি নাই। গতকল্য রাত্রিতে একটী স্বপ্ন দেখিয়া আর গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলাম না—তাই ছুটিয়া নবদ্বীপে তোমাকে একবার দেখিতে আসিয়াছি"—

এই বলিয়া শ্রীসীতাঠাকুরাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন;—কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। নীরবে বিরহিণী গৌরবল্লভা একাগ্র মনে সীতাঠাকুরাণীর সকল কথাগুলিই শুনিলেন। তিনি তাঁহার মলিন বদনখানি অবনত করিয়া বামহস্ত খানি কপোলে বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের নখাগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতলে কি যেন লিখিতেছেন—তাঁহার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—ভূমিতল সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত করিতেছে—তিনি যাহা কিছু লিখিতেছেন তাহা অস্ফুট বোধ হইতেছে। ভজনবিজ্ঞা সুচতুরা সখিকাঞ্চনা প্রিয়াজির নিকটে বসিয়া আছেন—তিনি দেখিতেছেন প্রিয়াজি কি লিখিতেছেন; যথা—

—"গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে!
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর হে!
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর পাহি মাং!
গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর রক্ষ মাং!"—

প্রিয়াজির মুখে কোন কথা নাই—তিনি মুখ তুলিয়া সীতা ঠাকুরাণীর মুখের প্রতি চাহিতে পারিতেছেন না—সখিকাঞ্চনা ও অমিতা প্রিয়াজির দুইপার্শ্বে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—অন্যান্য সখি ও দাসীগণ নিকটে দাঁড়াইয়া নীরবে রোদন করিতেছেন—সে ক্রন্দনের ধ্বনি নাই।

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতা ঠাকুরাণী গৌরশূন্য গৌর-গৃহের অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে বসিয়া এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলেন—পরে তাঁহারই ইঙ্গিতে গৌরবক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজিকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া ভজন-মন্দিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইল। অদ্বৈত-গৃহিণী প্রিয়াজির জন্য

নববস্ত্র আনিয়াছিলেন। কাঞ্চনা তাহা পরাইয়া দিলেন—প্রিয়াজি কিছু বলিলেন না। শ্রীসীতাদেবী প্রিয়াজির হাত ধরিয়া তখন একত্রে ধীরে ধীরে ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিলেন—দ্বার রুদ্ধ করিয়া দুইজনে নির্জ্জনে বসিলেন। গৌর-বল্লভা তাঁহার হরিনামের মালা হস্তে করিয়া বসিলেন—সীতা ঠাকুরাণী তাঁহার ইষ্টপূজা ও আহ্নিকাদি অতি সংক্ষেপে সেখানে বসিয়াই সমাপন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আজ গৌর-বিরহ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বধন নিমাইচাঁদের সেই খাট্—সেই বালিশ—সেই শয্যা—সেই কৃষ্ণকেলি ধুতি—সেই নিমাইচাঁদের নিজে মুখে পড়ান শুকসারী এখনও "হরে কৃষ্ণ" নামোচ্চারণ করিতেছে। তাঁহার বড় আদরের নিমাইচাঁদের ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকা দু'খানি অপূর্ব্ব রূপ-সাম্য একখানি চিত্রপটের সম্মুখে বিরাজমান—এই চিত্রপটখানি প্রিয়াজির স্বহস্ত অঙ্কিত—তাহাও তিনি শুনিয়াছেন—এই চিত্রপট খানি তাঁহার আজ প্রথম দর্শন—নির্নিমেষ নয়নে তিনি সেই অপূর্ব্ব রূপ-সাম্য নিমাইচাঁদের চিত্রপটখানি দর্শন করিয়া গৌর-রূপ-সুধারাশি নয়নদ্বারে ঢোকে ঢোকে পান করিতেছেন—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—কত শত সহস্র পূর্ব্বস্মৃতি সকল আজ শ্রীসীতাঠাকুরাণীর মনে উদয় হইতেছে, তাহার সীমা নাই—তাঁহার অসীম ও অনন্ত স্নেহ-তরঙ্গপূর্ণ-হৃদি-সমুদ্র আজ অসংখ্য গৌর-বিরহ-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইতেছে। বিরহিণী গৌর-বল্লভা সকলি লক্ষ্য করিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য হারাইলেন—আহ্নিক পূজা তাঁহার মাথায় উঠিল—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—অকস্মাৎ তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—তাঁহার করুণ কণ্ঠে কাষ্ঠপাষাণ-গলান প্রাণঘাতী গৌরবিরহের বিলাপধ্বনি উঠিল ; যথা—

যথারাগ।

(১)

"—নিমাই ! নিমাই ! বাপ্‌রে আমার,
(তোর) এত যদি ছিল মনেতে।
সংসার-বন্ধনে কেন বদ্ধ হলি,
জগত পাগল করিতে॥
(তোর) বৃদ্ধা জননী গোলোক বাসিনী,
(তোর) সোনার প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়া রাণী,
জনম দুঃখিনী চির অনাথিনী
(একবার) দেখে যা' দেখে যা' নিঠুর হৃদয়,
(তার) কি শেল বিঁধেছে বুকেতে।
(তুই) সংসার-বন্ধনে কেন বদ্ধ হলি
তাহারে পাগল করিতে॥

(২)

নিমাই ! নিমাই ! দেখে যা' দেখে যা'
একবার আসি তাহারে॥
(সে যে) আকুল পরাণে বিনত বদনে
ডাকিছে নীরবে তোমারে॥
আঁখিনীরে তার বুক ভেসে যায়,
সহিছে নীরবে জ্বালা সমুদয়,
রেখেছে পরাণ আশায় আশায়
(তারে) দরশন দিয়ে বাঁচা রে।
কেউ নাই তার চির অভাগিনী,
রাজরাণী আজ দীনা ভিখারিণী,
কাঁদিছে নীরবে দিবস-যামিনী,
(সে যে) ভেসেছে অকুল পাথারে॥
আয় আয় আয় গৌর গোপাল,
(তোর) সীতা মার দেখ ভেঙ্গেছে কপাল,
দেখে যা 'দেখে যা' (বিষ্ণু) প্রিয়ার হাল,
(আহা) কি দুখ সহিছে বাছারে॥"—
গৌর-গীতিকা।

এই বলিয়া প্রেমাবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীসীতা-ঠাকুরাণী স্তম্ভভাবাপন্ন গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজীর প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া বলিলেন—

—"কেঁদনা কেঁদনা বউ মা আমার
নিমাই আসিবে ফিরিয়া।
আবার হেরিব সে চাঁদ বয়ান,
শুনিব বচন অমিয়া॥
সীতা মার কথা হউক সফল
ভণয়ে হরিদাসিয়া॥"—
শচী-বিলাপ-গীতি।

গৌরবক্ষবিলাসিনী বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চিত্ত ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিল—তাঁহার জপমালা হস্তস্খলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল—সীতাদেবী কাঁদিতে কাঁদিতে ভজন-মন্দিরে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই—বিরহিণী প্রিয়াজি আসন ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণীর চরণতলে আসিয়া বসিলেন—তিনি স্বয়ং তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ভজন-গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল—দৈবযোগে অকস্মাৎ উন্মুক্ত হইল—গৌরশূন্য গৌর-শয়নগৃহ গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মহমহ করিতে লাগিল—মল্লিকা-মালতি যাতিযুথি প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ-সৌরভে ভজন-মন্দির আমোদিত হইল—অপূর্ব্ব দিব্যজোতি গৃহে উদ্ভাসিত হইল। মর্ম্মসখি কাঞ্চনা ও অমিতা এমন সময়ে ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—তাঁহারা সীতা-ঠাকুরাণীর আদেশমত দ্বারদেশেই বসিয়া মালা জপ করিতে-ছিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবার ফলে শ্রীসীতাঠাকুরাণীর বাহ্যজ্ঞান হইল। এক্ষণে ভজন-মন্দিরে গৌর-বিরহিণী চতুষ্টয়,—প্রিয়াজি, সীতাঠাকুরাণী,সখিকাঞ্চনা ও অমিতা দেখিতেছেন নদীয়া-নাগর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ নবনটবর বেশে তাঁহার শয়ন-মন্দিরের দিব্য সুসজ্জিত শয়ন-পালঙ্কে বসিয়া মধুর মধুর বংশীবাদন করিতেছেন,আর মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন—কণককেতকী সদৃশ তাঁহার কমল নয়নদ্বয় ঢুলাইতেছেন—আর তাঁহার শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত স্বর্ণনূপুরপরা শ্রীচরণকমল যুগল তালে তালে মৃদুমন্দ নাচাইতেছেন। তড়িতরেখার ন্যায় এই অপরূপ ভাবাবিষ্ট শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপূর্ব্ব আবির্ভাব-লীলারঙ্গ ক্ষণিকের জন্য শ্রীনবদ্বীপের মহাযোগপীঠে প্রকটিত হইল। গৌরবিরহিণী অদ্বৈত-গৃহিণীর অনুরাগের ডাকে,গৌর-বল্লভার আকুল ক্রন্দনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের আবির্ভাব হইল। ভজন-মন্দিরের দ্বার তখন আপনা আপনিই বন্ধ হইল—সকলেই তখন প্রেমমূর্চ্ছিতাবস্থায় এই অপূর্ব্ব আবির্ভাব-লীলারঙ্গ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছায় তখন দৈববাণী হইল—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রিয়তমে!

—"যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা ন যযৌ নন্দনন্দনঃ।
নবদ্বীপং পরিত্যজ্য তথা যাস্যামি ন কচিৎ॥"

চৈতন্য-তত্ত্ব-দীপিকা।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার কর্ণে তাঁহার প্রাণবল্লভের সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিয়া সুধাধারা বর্ষণ করিতে লাগিল—তিনি চমকিয়া উঠিয়া পাগলিনীর মত তাঁহার প্রাণবল্লভকে যেন ধরিতে গেলেন—কিন্তু তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন—তাঁহার পতনের শব্দে শ্রীসীতাঠাকুরাণী এবং সখিদ্বয়ের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তখন তিন জন মিলিয়া গৌরবক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। গৌরপ্রেমোন্মাদিনী মর্ম্মী সখিদ্বয় এবং শ্রীসীতাঠাকুরাণী তিন জনে মিলিয়া গৌরপ্রেমাবেশে শিথিল ও অবশ অঙ্গে গৌরবক্ষবিলাসিনীর অন্তরঙ্গ-সেবা করিতেছেন—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। নদীয়ায় মহাগম্ভীরা-মন্দিরে এরূপ গৌরাবির্ভাব লীলারঙ্গ মধ্যে মধ্যে প্রকটিতই হয়—ইহাতেই গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার মর্ম্মী সখিগণের প্রাণরক্ষা হয়।

কিছুক্ষণ পরে বিরহিণী গৌর-বল্লভার বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া নিজ পরিধান বসন সম্বরণ করিলেন—সসম্ভ্রমে গলবস্ত্রে সীতা-দেবীকে একটী প্রণাম করিলেন। প্রথম দর্শনে প্রণাম করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রিয়াজি বিশেষ সন্তপ্তা ও লজ্জিতা, তাহা তাঁহার মুখের ভাবেই প্রকাশ পাইল। সীতাদেবী তাঁহার বসনাঞ্চলে গৌরবল্লভার মলিন বদনচন্দ্র-খানি মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"বউমা! তুমি ত সকলি জান—সকলি বুঝ—স্বচক্ষে দেখিলে এবং স্বকর্ণে শুনিলে আমার নিমাইচাঁদের এই অপূর্ব্ব আবির্ভাব-লীলারঙ্গ। তোমাদের এই যে অনির্ব্বচনীয় বিপ্রলম্ভ-রস-লীলারঙ্গ—ইহার মর্ম্ম তোমরাই জান—আমাদের বুঝিবার সাধ্যও নাই—অধিকারও নাই"। এই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সস্নেহে গৌর-বল্লভার চিবুক ধরিয়া সাদরে মুখচুম্বন করিয়া প্রেমাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদভাষে পুনরায় কহিলেন—"বৌমা! আমার সঙ্গে দুটী' কথা কহ—বহুদিনের পর তোমাদের গৌরশূন্য-গৃহে আমি আসিয়াছি,—একটি অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া এখানে আসিয়াছি—তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিলেই আমি সেই স্বপ্নবৃত্তান্তটি তোমাকে নির্জ্জনে বলিব।"

এইবার এতক্ষণ পরে গৌরবল্লভার মৌনব্রত ভঙ্গ হইল। তিনি মৌনব্রতী ছিলেন—মর্ম্মী সখিগণের

মনস্তাপের পরিসীমা ছিল না। স্বতন্ত্রা প্রিয়াজির নিষ্ঠা-নিয়ম পাষাণের রেখার মত—কি উদ্দেশ্যে কেন যে তিনি মৌনাব্রতাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানেন না—আর জানিবার উপায়ও নাই। যাহা হউক সীতা-ঠাকুরাণীর অনুরোধ তিনি আর এড়াইতে পারিলেন না—তিনি তাঁহার মাতৃস্থানীয়া—তিনি বহুদিন পরে তাঁহাকে "বৌমা" বলিয়া মধুসম্ভাষণে তুষ্ট করিয়াছেন—এই আদরের মধুর ডাকে তাঁহার শাশুড়ী পরম স্নেহময়ী শচীমাতা তাঁহাকে ডাকিতেন। আজ গৌরবিরহিণী সনাতন-নন্দিনীর মনে পূজনীয়া বৃদ্ধা স্নেহময়ী শাশুড়ীর স্মৃতিকথা উদয় হইল। তিনি পরম প্রেমাবেশে তাঁহার ক্ষীণ বাহুদ্বয় বেষ্টনে অদ্বৈত গৃহিণীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"মাগো! আপনাকে দেখিয়া আজ আমার পরমারাধ্যা পরম স্নেহময়ী শাশুড়ীকে স্মরণ হইল—আমাকে "বৌমা" বলিয়া আপনি যে মধুসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন—ইহাতে বহুদিন পরে আমার প্রাণে আজ পরম শান্তি আসিল—তবে মাগো! আমি আপনাদের অভাগিনী বৌমা! আমার মত মন্দভাগিনী ত্রিজগতে দ্বিতীয় আর কেহ নাই"—এই কথা বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল—সীতাদেবীর ক্রোড়ে বদন লুকাইয়া বালিকার মত তিনি ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী তখন পরম স্নেহভরে কত না সান্ত্বনাবাক্যে প্রিয়াজির মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণ পরে প্রিয়াজি আত্মসম্বরণ করিয়া করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"মাগো! এখন দয়া করিয়া আপনার স্বপ্ন বৃত্তান্তটি বলুন।" তখন সীতা দেবী গোপনে তাঁহাকে কহিলেন—"বউমা! আমি গত রাত্রিতে শান্তিপুরে স্বপ্ন দেখিলাম শ্রীনবদ্বীপে আমার জীবন সর্ব্বস্বধন নিমাই-চাঁদের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তিপূজা হইতেছে—মাগো! তোমার গৌর-বিরহ-জ্বালা প্রসমনের জন্যই আমার নিমাইচাঁদের এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ—তোমার ইচ্ছাতেই শ্রীমূর্ত্তি শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হইবে—তুমিই তাঁহার প্রেমপূজার প্রথম পূজারি নিযুক্ত হইবে—স্বয়ং আচরিয়া কলিহত জগজ্জীবকে তুমিই রাগমার্গে আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গের প্রেমসেবা শিক্ষা দিবে।"

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে পরম গম্ভীরভাবে অদ্বৈতগৃহিণীর কথাগুলি শ্রবণ করিলেন। কথাগুলি তাঁহার বড় ভাল লাগিল না—তাঁহার বদনে যদিচ সে ভাবের কোন চিহ্ন প্রকাশ নাই—তথাপি অন্তর্যামিনী শ্রীঅদ্বৈতগৃহিণী গৌরবল্লভার অন্তরের ভাব বুঝিয়াই পুনরায় কহিলেন—"বৌমা! ঐশ্বর্য্যভাবগন্ধশূন্য তোমার মনে আমার এই স্বপ্ন-কথা ভাল লাগিবে না—তাহা আমি জানি, কিন্তু ইহাই যে আমার নিমাইচাঁদের ইচ্ছা,—তুমি তাহা পরে বুঝিতে পারিবে।"

গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি সীতাঠাকুরাণীর কথাগুলি শুনিয়া গেলেন মাত্র—কোন রূপ উত্তর করিলেন না। সীতাঠাকুরাণী ভজন-মন্দির দ্বার খুলিয়া গৌর-বল্লভার হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন। প্রিয়াজির মৌনব্রত ভঙ্গ হইয়াছে,—কাঞ্চনাদি সখিগণকে সীতাদেবী তাহা কহিলেন—তাঁহারা শুনিয়া পরমানন্দ পাইলেন। ভজন-মন্দির-দ্বারে বসিয়া তখন সকলে মিলিয়া গৌর-কথার ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। সখি কাঞ্চনার উপর গৌর-কীর্ত্তনের ভার পড়িল—অন্তর্যামিনী সীতাদেবী তাঁহাকে গোপনে সাবধান করিয়া দিলেন—নদীয়া-যুগল-বিলাস রস-রঙ্গ-কথাতে প্রিয়াজির এখন তত মন নাই—কারণ তাহাতে তাঁহার আত্মকথা বিজড়িত আছে—নিমাইচাঁদের মধুর বাল্যলীলাকথা মহাজনগণ যাহা পদে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—সেই সকল পদাবলীর কীর্ত্তন হউক। সুচতুরা ভজনবিজ্ঞা সখি কাঞ্চনা বুঝিলেন কথাটী ঠিক—প্রিয়াজি তাঁহার আত্ম-কথাকে অনেকবার "আন্ কথা" আখ্যান দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে নদীয়াযুগল-বিলাস-লীলারঙ্গ কথার বহু আলোচনা হইয়াছে। ইহাতেই বোধ হয় তাঁহার চিত্ত কিছু বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার এই মৌনব্রতালম্বন। সীতাঠাকুরাণীর উপদেশ-কথা সখি কাঞ্চনার মনে লাগিল—তিনি অতঃপর কিছু সাবধান হইলেন। দ্বিতীয় কথা মাতৃস্থানীয়া সীতাদেবীর সম্মুখে যুগলবিলাসকথা প্রিয়াজির পক্ষে লজ্জাকর।

ভজন-মন্দির দ্বারে বসিয়া তখন গৌরকথার ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ হইল। সখি কাঞ্চনা বক্তা—আজ প্রধান শ্রোতা সীতাদেবী। সর্ব্ব প্রথমেই প্রত্যক্ষ লীলাদর্শী শ্রীল মুরারি গুপ্ত রচিত গৌরসুন্দরের বাল্যলীলার একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন সখি কাঞ্চনা—

রাগ-পাহিড়া।

"শচীর আঙ্গিনা মাঝে, ভুবন মোহন সাজে,
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি, ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি,
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে, বুক ভাসি যায় লোলে,
চাঁদ মুখে হাসির বিজুলি।
ধুলা মাখা সর্ব্ব গায়, সহিতে কি পারে মায়,
বুকের উপরে লয় তুলি॥
কাঁদিয়া আকুল তাতে, নামে গোরা কোল হৈতে,
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি॥
হাসিয়া মুরারি বোলে, এ নহে কোলের ছেলে,
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি॥"— পদসমুদ্র।

কাঞ্চনার কলকণ্ঠে বাল গৌরাঙ্গ-লীলা-কথা আজ বড়ই সুমধুর লাগিল বিরহিণী প্রিয়াজির—তাঁহার বদন সুপ্রসন্ন বোধ হইল—নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিল। সখি কাঞ্চনার সহিত প্রিয়াজি তখন কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন "সখি কাঞ্চনে! আজ এখন এই ভাবের পদই গান কর"। তখন কাঞ্চনা মহা উৎসাহের সহিত পরম প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উচ্চকণ্ঠে পুনরায় গান ধরিলেন—

রাগ—কামোদ।

—"শচীর দুলাল মনোরঙ্গে।
খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে॥
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে।
নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে॥
হাতে হাতে করে ধরাধরি।
তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি॥
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি।
ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি॥
গোরা যবে বলে হরি হরি।
শিশুগণ সঙ্গে বলে হরি॥
ঘন ঘন হরিবোল শুনি।
কাঁপে কলি পরমাদ গণি॥
মুরারি আনন্দে ভরপুর।
পাপের রাজত্ব হৈল দূর॥" পদসমুদ্র।

গান শুনিয়া সীতাঠাকুরাণী প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন,—তাঁহার নয়নদ্বয়ে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইল—সখিগণও স্থিরচিত্তে প্রেমাবেশে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের বাল্যলীলা-গান শুনিতেছেন,—মুখে কাহারও আর হা হুতাশ নাই—নীরবে বসিয়া সকলেই বালগৌরের বাল্য-লীলা-মধু আকণ্ঠ পান করিয়া প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণে আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের অপূর্ব্ব বাল্য-লীলারঙ্গ শ্রবণের পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌর-লীলা-গানের অফুরন্ত উৎস—সর্ব্ববিধ ভাবের গৌরাঙ্গলীলা-গানে তিনি সিদ্ধকণ্ঠ। বিরহিণী প্রিয়াজির প্রাণবল্লভের বাল্যলীলা-লোলুপ শুভদৃষ্টি সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি প্রতিনিয়ত পতিত হইতেছে। এই দৃষ্টির মর্ম্ম বাল্য-লীলা-গান এখন চলুক—সখি কাঞ্চনাও গৌরলীলা-গানে উন্মাদিনী হইয়াছেন—তিনি এবার প্রত্যক্ষ লীলাদর্শী পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের প্রাচীন পদাবলী গাহিতে আরম্ভ করিলেন—সীতাঠাকুরাণী নিশ্চল হইয়া বসিয়া শুনিতেছেন—তিনি যেন ধ্যানমগ্না—তিনি মধুর বালমূরতি শিশু নিমাইচাঁদকে যেন সেখানে সাক্ষাৎ স্বচক্ষে দেখিতেছেন—পরম স্নেহভাবাবেশে সুমধুর বাৎসল্যরসে বিগলিত-হৃদয় হইয়া তিনি অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। সখি কাঞ্চনা পুনরায় ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—বেলোয়ার দশকোশী।

—"কিয়ে হাম পেখলু কনক পুতলিয়া।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধুসরিয়া॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া।
তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়া॥
রাতুল কমল পদে ধায় দ্বিজমনিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সুধ্বনিয়া॥
বাসুদেব ঘোষ কহে শিশুরস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া॥

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সুগায়িকা কাঞ্চনা প্রিয়াজির বদনের প্রতি চাহিয়া গান করিতেছেন—প্রিয়াজিরও নয়নদ্বয় যেন কাঞ্চনার বদনমণ্ডলে লিপ্ত হইয়া আছে। সখি কাঞ্চনা পুনরায় আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—বেলোয়ার—দশকোশী।

—"মায়ের অঙ্গুলি ধরি শিশু গৌরহরি।
হাটি হাটি পায় পায় যায় গুড়িগুড়ি॥

টানি লৈঞা যার হাত চলে ক্ষণে কোরে।
পদ আধ যাইতে ঠেকাড় করি পড়ে॥
শচীমাতা কোলে লৈতে যায় ধুলি ঝাড়ি।
আখুটী করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি॥
আহা আহা বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে।
কোলে করি চুম্ব দেয় বদন-কমলে॥
বাসু কহে এ ছাবাল ধুলায় লোটাবা।
স্নেহভরে মাগো তুমি কত ঠেকাইবা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

পদকর্ত্তার ভণিতাটি শ্রবণ করিয়া প্রিয়াজি আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না—তিনি প্রেমাবেশে সীতাদেবীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন—অদ্বৈত-গৃহিণী তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিলেন,—নিজ বসনাঞ্চলে পরম স্নেহভরে তাঁহার নয়নজল মুছাইয়া দিলেন।

সখি কাঞ্চনার গান চলিতে লাগিল।

রাগ—তুড়ি।

—"এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি নানা রঙ্গে যায় শচী-বালা॥
লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুন্দর অধর॥
অঙ্গদ বলয়া শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে।
সোনার সিকলি পীঠে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপনা॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

সীতাদেবী তন্ময় হইয়া তাঁহার নিমাইচাঁদের বাল্য-লীলারঙ্গ শুনিতেছেন—তিনিও এই লীলারঙ্গের প্রত্যক্ষ দর্শিনী সঙ্গিনী—প্রিয়াজি তাঁহার ক্রোড়ে শায়িতা। অদ্বৈত-গৃহিণী পরম প্রীতিভরে সস্নেহে প্রিয়াজির গাত্রে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইতেছেন—তিনিও পরম প্রেমভরে সীতাদেবীকে জড়াইয়া ধরিয়া আছেন—কিন্তু তাঁহার নয়নের সকরুণ দৃষ্টি রহিয়াছে কাঞ্চনার বদনমণ্ডলের প্রতি—মহাভাবময়ী গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মসখির সর্ব্ব-অঙ্গে দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে নবনবায়মান অপরূপ ভাবোদ্গমের চিহ্ন সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন—গৌর-প্রেমোন্মাদিনী সখি কাঞ্চনার গৌরভাব-বিভাবিত হৃদি-সমুদ্রে আজ প্রবল গৌরপ্রেমের তুফান উঠিয়াছে—অমিতাদি সখিগণ আজ কাঞ্চনার একটী অপরূপ নব রূপ দেখিতেছেন—পরম জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী-প্রকৃতি কাঞ্চনা সখি গৌর-প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আজ মনের সাধে প্রাণ খুলিয়া বালগৌরাঙ্গের অপরূপ রূপ-গান করিতেছেন—সঙ্গীতবিদ্যায় বিশারদা অন্যান্য সখিগণ সময় বুঝিয়া সখি অমিতার ইঙ্গিতে আজ খোল করতাল মন্দিরা বীণা তম্বুরা প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সুসঙ্গতে তাল মান লয় যুক্ত রাগরাগিনীকে যেন মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিয়াছেন।

গৌরশূন্য গৌরগৃহে আজ একটী নবভাবের প্রেমানন্দ-ধারা প্রবাহিত হইতেছে—সকলেরই প্রাণ মন আজ বাৎসল্যরস-ভাবিত—শচীমাতার ভাবে বিভাবিত হইয়া আজ তৈলধারাবৎ নিরবিচ্ছিন্ন বাল-গৌরলীলা-সুধারসে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মন প্রাণ পরিসিঞ্চিত করিয়া গৌরপ্রেমোন্মাদিনী সখি কাঞ্চনা পুনরায় আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—বেলোয়ার দশকুশী।

—"শচি অঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বদনে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন-লোভা॥"—

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনার গান যেন আজ আর থামে না—থামাইতেও কেহ চাহে না—বেলা দেড় প্রহর অতীত হইতে চলিল—গান অনবরত চলিতেছে সুসঙ্গতের সহিত তালে মানে রাগ রাগিণীতে—পশু পক্ষী কীটপতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধবৎ আজ সখিমুখে গৌরলীলা-গান শুনিতেছে—সঙ্গীতধ্বনি নদীয়ার আকাশে পবনে সলিলে প্রতি ধুলিকণার সহিত মিশ্রিত হইয়া দিগদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—গৌরশূন্য-গৌরগৃহে যেন আজ বালগৌর-প্রেমের প্রবল তুফান উঠিয়াছে।

সখি কাঞ্চনার দৃষ্টি অনুক্ষণ প্রিয়াজির বদনমণ্ডলের উপর—আর সীতাদেবীর দৃষ্টি একবার গৌর-বল্লভার বদনের প্রতি—আর এক একবার গায়িকার প্রতি অঙ্গের অঙ্গভঙ্গীর

প্রতি যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৌর-প্রেমোন্মত্তা সখি কাঞ্চনার কলকণ্ঠে গান চলিতেছে।

রাগ—ভাটিয়ারী।

—"গোরা নাচে শচীর দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি, দেয় ঘন করতালি,
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥ ধ্রু॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোণার কাঠি।
সাধ করিয়া মায় পরাঞাছে ধড়া গাছটি আটি॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ ভুরু কামধনু॥
রতন কাঞ্চন, নানা আভরণ,
অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উৎপল, চরণ যুগল,
তুলিতে নুপুর বাজে॥
শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষ বলে, ধর ধর ধর কোলে,
গোরা মোর পরাণের পরাণি॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বাদ্যযন্ত্রের তাল ভঙ্গ হইতে না হইতেই পুনরায় সখি কাঞ্চনা গান ধরিলেন—

রাগ—বেলোয়ার দশকোশী।

"পূর্ণিমা রজনী চাঁদ গগনে উদয়।
চাঁদ হেরি গোরাচাঁদের হরিষ হৃদয়॥
চাঁদ দে মা বলি শিশু কান্দে উভরায়।
হাত তুলি শচী ডাকে আয় চাঁদ আয়॥
না আসে নিঠুর চাঁদ নিমাই ব্যাকুল।
কাঁদিয়া ধুলায় পড়ে হাতে ছিঁড়ে চুল॥
রাধাকৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল॥
চিত্র পাঞা গোরাচাঁদে মনে বড় সুখ।
বাসু কহে পটে পঁহু হেরে নিজ মুখ॥"

গৌরপদ তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা আকুল প্রাণে স্থির চিত্তে তাঁহার প্রাণবল্লভের বাল্যলীলা-গান শুনিতেছেন—পদকর্ত্তা বাসু ঘোষের পদগুলি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিতেছে—প্রিয়াজি সম্বন্ধেও বহু পদ তিনি লিখিয়াছেন। বাসু ঘোষের সৌভাগ্যের সীমা নাই! ঠাকুর নরহরিও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বাল্যলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার রচিত পদে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রিয়াজির মনে ঠাকুর নরহরির পদগুলিও বড় মধুর লাগে। তিনি এইবার সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনাকে ইঙ্গিতে কহিলেন ঠাকুর নরহরি রচিত বাল্যলীলার পদ দুই একটী গাহিতে। সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে অমনি তৎক্ষণাৎ ধুয়া ধরিলেন—

রাগ—তুড়ি।

—"জগন্নাথমিশ্র মহাসুখে।
পুত্র কোলে করি চুম্ব দেয় চাঁদমুখে॥
শিরে কেশ ভূষণ সাজায়।
আঙ্গুলি চালিতে স্নেহ উথলে হিয়ায়॥
নিমাই বাপের কোল হইতে।
ভঙ্গী করি নাময়ে অঙ্গণে বেড়াইতে॥
হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গণে।
সোনার নূপুর বাজে সুচারু চরণে॥
চলিতে হেরই উলটিয়া।
চলন-মাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া॥
সম্মুখে আসিয়া কহে মায়।
কোলে চড়সিয়া বাপ্ ধুলি লাগে গায়॥
জননীর হাতে হাত দিয়া।
কোলে উঠে লহু লহু হাসিয়া হাসিয়া॥
দুগ্ধ বিন্দু সম দন্তজ্যোতি।
হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি।
দু'টী আঁখে যার পানে চায়।
তারে নিরন্তর সুখ-সমুদ্রে ভাসায়॥
জননীর কোলে ভাল শোহে।
নরহরি নিছনি ভুবন-মন মোহে।"

গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

গানের পর গান সুন্দর তালমান এবং সঙ্গতের সহিত চলিতেছে—গৌর পাগলিনী কাঞ্চনার আজ আর আনন্দের সীমা নাই—তাঁহার প্রিয় সখি আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের বাল্যলীলা-গান শুনিতেছেন—অদ্বৈত-গৃহিণী বহুকাল পরে আজ তাঁহার মুখে বালগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা-

রঙ্গগুলি নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছেন—গায়িকার মনে গৌর-প্রেমানন্দের তুফান উঠিয়াছে। সঙ্গত রীতিমত চলিতেছে। সখি কাঞ্চনা পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ-তুড়ি।

—"শচী ঠাকুরাণী চারু ছাঁদে।
হাঁটন শিখায় গোরাচাঁদে॥
মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া।
ধর মোর অঙ্গুলি আসিয়া॥
শুনি সুখে নদীয়ার শশী।
মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি।
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
দুই চারি পদ চলি যায়॥
ছাড়িয়া অঙ্গুলি পড়ে ভূমে।
শচী কোলে লঞা মুখ চুমে॥
কোলে চড়ি চরণ দোলায়।
বাজায় নূপুর রাঙ্গা পায়॥
আঙ্গুলে কচালি স্তন পিয়ে।
নাহি যে উপমা তায় দিয়ে॥
চারিদিকে চাহে ভঙ্গী করি।
তাহাতে নিছনি নরহরি॥"—গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

এইবার সখি কাঞ্চনার প্রখর দৃষ্টি পড়িল অদ্বৈত-গৃহিণীর বদনমণ্ডলের প্রতি—তিনি এখন তাঁহার সম্বন্ধে আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"অদ্বৈত-ঘরণী সীতাঠাকুরাণী কেবল রসের রাশি।
অনিমিখ আঁখে, নিরিখে সুন্দর, গৌরমুখের হাসি॥
ও নব চরিত, ভাবিতে ভাবিতে, হইল পুরব পারা।
ধৈরজ ধরিতে নারয়ে, যুগল নয়নে বহয়ে ধারা॥
কত কত কথা উপজয়ে চিতে, স্নেহেতে আতুর মতি।
যতন করিয়া করে উপদেশ সে রূপ শচীর প্রতি।
অশেষ আশীষ দিয়া প্রশংসয়ে সুখের নাহিক পার।
নরহরি কহে এসব চরিত বুঝিতে শকতি কার।"—

সীতাদেবীর মনে তখন পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে জাগরিত হইল—তিনি প্রেমাবেগে কান্দিয়া আকুল হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়েতেই এখনও আবদ্ধ আছেন—অদ্বৈত-গৃহিণী তাঁহাকে পরম স্নেহভরে বক্ষে ধারণ করিয়া বসিয়াছেন—দুই জনেই অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন,—কিন্তু গান সমভাবেই চলিতেছে—সখি কাঞ্চনার গৌর-গীতির অফুরন্ত উৎস আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তিনি কলসে কলসে আজ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বাল্যলীলা-রস-সম্ভার বিলাইতেছেন। তিনি পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ-বিভাস।

—"শ্রীবাস-বনিতা অতি সুচরিতা স্নেহের মূরতি যেন।
সতত লজ্জিতা সতী পতিব্রতা জগতে নাহিক হেন।
প্রফুল্লিত তনু অনুপম আধ বদন ঝাঁপিয়া মুখে।
সীতার সমীপে দাঁড়াইয়া ঘন নিরিখে মনের সুখে॥
আঙ্গিনার মাঝে প্রিয় পরিকর বেষ্টিত করিয়া গোরা।
সুন্দর বদন চাঁদ ঝলকয়ে গাখানি সোনার পারা।
নব নব সব কি কর মালিনী সে সোভা-সায়রে ভাসে।
অপরূপ প্রেম-বালাই লৈয়া মরু নরহরি দাসে॥"—
গৌরপদ তরঙ্গিণী।

গানের আর বিরাম নাই,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বাল্য-লীলারঙ্গ অতি মধুর—মধু হইতেও মধু—প্রত্যক্ষ লীলাদর্শী গৌরাঙ্গ পার্ষদভক্তগণ স্বচক্ষে দেখিয়া এই সকল অপূর্ব্ব বাল্যলীলা-কাহিনার সূত্রগুলি পদরত্নরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অপূর্ব্ব দান দিয়া গিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব দানের তুলনা নাই—ইহার একমাত্র প্রতিদান এই পদরত্ন-গুলি প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন—ইহাতেই গৌরভজনের প্রকৃত পরিপাক। সখি কাঞ্চনা পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"রজনী প্রভাতে, শচীদেবী চিতে,
আনন্দের নাহি ওর।
ও মুখ নিরখি, নারে সম্বরিতে,
নয়ানে বহয়ে লোর॥
সীতার চরণে ধরিয়া যতনে
কহয়ে মধুর বাণী।
কেবল ভরসা তোমাদের ওগো
ভাল মন্দ নাহি জানি॥
আপন জানিয়া নিমাই চাঁদেরে
সতত প্রসন্ন হৈবা।
চির আয়ু হৈঞা সুখে থাকে যেন,
এই সে আশীষ দিবা॥

কেহ নাহি মোর কত নিবেদিব,
এ শিশু আঁখির তারা।
এই কর যেন ঘরে থাকে সদা
ঘুচায়ে চঞ্চল ধারা॥
আর বলি এই বিশ্বরূপ মোর
নিমাই জীবন প্রাণ।
তিল আধ যেন না হয় বিচ্ছেদ
এই বর দিবে দান॥
এইরূপ কত কহিয়া তুরিতে
করায় মঙ্গল নীত।
নরহরি এক মুখে কি কহিবে
অতুল মায়ের প্রীত॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

অবিশ্রান্ত শ্রাবণের ধারার ন্যায় গানের উপর গান চলিতেছে—গায়িকার পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই—তাঁহার নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে—নানাবিধ নয়নরঞ্জন অঙ্গভঙ্গী করিয়া সখি কাঞ্চনা বাল-গৌরাঙ্গ-চরিত-সুধা কলসে কলসে শ্রোতৃবর্গকে পরিবেশন করিতেছেন। তিনি শচীমাতার উক্তি আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—বিভাস দশ কোশি।

—"দেখ দেখ আসি, যত নৈদাবাসী,
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বিছানে উঠিয়া, অঞ্চলে ধরিয়া,
ননী দে বলিয়া কাঁদে॥
নহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী,
একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে,
সেই সে আমার ঘরে॥
একি অদভুত, অতি বিপরীত,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা, ত্রিভঙ্গ হইয়া,
মধুর মুরলী বায়॥
আর এক দিনে, খেলে শিশু সনে,
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর ভবনে,
বাসনা পূরিল মোর॥"—গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

সীতাদেবী এতক্ষণ নিঃশব্দে ও নীরবে গানগুলি শুনিতেছিলেন,—গায়িকাকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিবার উদ্দেশে এক্ষণে দুটী কথা বলিলেন। তিনি কাঞ্চনার প্রতি প্রেমাশ্রু-নয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—কাঞ্চনে! ইহা ত আমার স্বচক্ষে দেখা—আমার নিমাইচাঁদের বাল্য-লীলা-রঙ্গ মহাজন গৌরাঙ্গপার্ষদগণ সূত্ররূপে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে তাহা লইয়া কতশত মহাজন-কবি সহস্র সহস্র পদ রচনা করিবেন, যদ্দ্বারা মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা বিস্তার ও প্রচার হইবে। কাঞ্চনে! তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ—এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।"

সখি কাঞ্চনার পদাশ্রিত একটী অতি দীনহীনা দাসী আসিয়া এই সময়ে করযোড়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন দু'একটী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বাল্যলীলার গান সীতাদেবী ও প্রিয়াজিকে তিনি শুনাইবেন।' কাঞ্চনার অতিরিক্ত পরিশ্রম দেখিয়া প্রিয়াজি এবং অদ্বৈত-গৃহিণী উভয়েই এই দীনা দাসীটির প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন—সখি কাঞ্চনাও ইহাতে অনুমোদন করিলেন। ভয়ে ভয়ে অতিশয় লজ্জিতভাবে সঙ্গীত-রসজ্ঞানশূন্যা দাসিটি তাঁহার স্বরচিত একটী গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথা রাগ।

—"শচীর কোলে, হেলে দুলে, ঐ যে খেলে, নিমাইচাঁদ।
মাথায় ঝুটি, পরিপাটি, নয়ন দু'টি, প্রেমের ফাঁদ॥
সোনার পাটা, কটিতে আঁটা, রূপের ছটা, উছলি পড়ে।
বলয় হাতে, কি শোভা তাতে, জগত মাতে, ওরূপ হেরে॥
কুন্দ দশন, ইন্দু বদন, দু'টি নয়ন, করুণাধার।
ভব-সম্পদ, ও চারু পদ, হরে বিপদ, সকলকার॥
শচীর বালা, নন্দলালা, মালতী-মালা, পরেছ ভাল।
সুন্দর দোলে, শচীর কোলে, অলকা ভালে, বালগোপাল॥
চরণ ছুঁড়, দু'হাত জুড়ি, গৌরহরি, কি চায় বল।
বদন ভরা, সুধার ধারা, নয়ন লোরা, বহে কেবল॥
সর্ব্ব শুচি, ভাবেন শচী, ছেলেটী কচি, কি দুখ এর!
কেন বা কাঁদে, কিসের খেদে, লেগেছে ক্ষিদে, বুঝি বা এর॥
দুগ্ধ আনি, মাখন ছানি, ক্ষীর ননী, দিলেন মুখে।
ননী না খেয়ে, ঠোঁট ফুলায়ে, বাছনি রোয়ে, কিসের দুখে॥
দেখান চাঁদে, নিমাইচাঁদে, বিষম ফাঁদে, পড়িয়া আই।
পরাণ ভরে, আদর করে, বক্ষ'পরে, নিলেন তাই।

চুম্বিয়া ঘন, ইন্দু-বদন, দিয়ে বসন, মুছান আঁখি ।।
না দেখি শান্ত, ছেলে দুরন্ত, ডাকে তুরন্ত, মালিনী সখি ।
আসিয়া সখি, নিমায়ে দেখি, মুছায়ে আঁখি, কোলেতে তুলি ।
বদন ভরি, বলেন হরি, নৃত্য করি, সকলে মিলি ॥
আকুল প্রাণে; নামের গানে, নিমাই সনে, নাচে সবাই ।
নিমাই হাসে, ভুবন ভাসে, সুধার রসে, দেখেন আই ।।
সবাই সুখী,; (হরি) দাসী দুখী, রইল বাকি, দেখা তাহার ।
হ'ল না জন্ম, কুফল কর্ম্ম, গৌর-মর্ম্ম, বুঝান ভার ।।

গৌর-গীতিকা ।

এই গানটী শুনিয়া প্রিয়াজি এবং অদ্বৈত-গৃহিণীর মনে বড় আনন্দ হইল,—দাসীটীকে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনরায় আর একটী গান করিতে আদেশ করিলেন—সখি কাঞ্চনাও গানটি অতিশয় মনোযোগের সহিত শুনিলেন—এবং সস্নেহে দাসীটির অঙ্গস্পর্শ করিয়া আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক পুনরায় গান করিতে উৎসাহ দিলেন। ভয়ে ভয়ে দাসীটী পুনরায় গানের ধুয়া ধরিল।

যথা রাগ।

—"কাঁহা মেরা, মনচোরা, প্রাণগোরা, রসময় ।
কোথা গেলে, তারে মিলে, কেবে বলে, কে আমায় ॥
খুঁজে সারা, দিশে হারা, শত ধারা, আঁখে বয় ।
সারা নিশি, ভাবি বসি, গৌর-শশী, মধুময় ॥
ভাবি সুধু, গৌরবিধু, কত মধু, রাঙ্গা পায় ।
ডেকে তারে, প্রাণ ভরে, দুখ হরে, জ্বালা যায় ॥
গোরা নামে, প্রেম ধামে, নিজ জনে, টেনে লয় ॥
গৌরহরি, রসতরি, হাতে ধরি, প্রেম দেয় ॥
ঘুম ঘোরে, প্রেম ভরে, মন চোরে, ডাক আয় ।
শচী কোলে, কচি ছেলে, দেখি খেলে আঙ্গিনায় ॥
মুখে তার, রসধার, অনিবার, বহে যায় ।
পদতলে, শশী খেলে, দুলে দুলে, আড়ে চায় ॥
সুধা রাশি. মৃদু হাসি, নদেবাসী, দেখে যায় ।
অপরূপ, বালরূপ, কি অনুপ, শোভা তায় ।।
কচি হাতে, মুটি বাঁধে, দু'টি দাঁতে, কি চিবায় ।
রসপুষ্ট, পদাঙ্গুষ্ঠ, হয়ে তুষ্ট, মাকে দেয় ॥
পা দুখানি, মা জননি! লক্ষমণি, সম নয় ।
ভাগ্যবতী, তুমি সতী, যশোমতী, মনে হয় ॥
দয়া করি, ক্ষেমঙ্করি! গৌরহরি, দে আমায় ।
কোলে করি, দাসী হরি; প্রাণ ভরি, চুমো খায় ॥"—

গৌরগীতিকা ।

গায়িকা দাসীটি সুকণ্ঠা নহে—তাল-মান জ্ঞান শূন্যা—তথাপি উপস্থিত সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন—দীনা দাসিটী লজ্জায় অধোবদনে রহিলেন। পুনরায় তাঁহার উপর আর একটী গান করিবার আদেশ হইল,—এ আদেশটী স্বয়ং প্রিয়াজির—প্রেমানন্দে দাসিটি তখন গান ধরিলেন—

—"(তোরা) নয়ন ভরিয়া দেখ রে ।
শচীর দুলাল, বিগ্রহ বাল,
রসময় রসধাম ।
বাল গৌর, পরাণ চোর,
প্রেমময় প্রাণারাম ॥
ঐ—হেলে দুলে নেচে চলেরে । ধ্রু ॥
সুঠাম গঠন, সলাজ নয়ন,
হাসি হাসি মুখখানি ।
অঞ্চল ধরিয়া, চলেছে নাচিয়া,
শচীর নয়ন-মণি ।।
শচী চলে যায়, পাছু পাছু ধায়,
কোলে নে কোলে নে বলি ।
প্রাণ কাড়ি লয়, অতি রসময়,
শুনি সে অমিয়া বুলি ॥
(শচীমার) এক হাতে মালা, অন্য হাতে ডালা,
পুজার নৈবেদ্য তাহে ।
বাল গৌরাঙ্গ, করি নানা রঙ্গ,
নৈবেদ্য খাইতে চাহে ॥
ধরিয়া অঞ্চল, গৌর গোপাল,
মায়েরে ফেলিল ফাঁদে ।
(শচীমাতা) বিপাকে পড়িয়া, মালিনীকে ডাকে,
শুনিয়া নিমাই কাঁদে ॥
টানিছে অঞ্চল, চতুর চপল,
শচীমাতা সশঙ্কিত ।
ষষ্ঠী পূজার, সব উপচার,
ভূতলে হ'ল পতিত ।
হাসে খল খল, গৌর গোপাল,
(মায়ের) অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া ।

ভূমিতে বসিয়া, দু'টি হাত দিয়া,
নৈবেদ্য খায় খুঁটিয়া ॥
ভীত চকিত, হয়ে শশঙ্কিত,
অপরাধ মনে করি।
(শচীমা) হস্ত হ'তে তার, পূজা উপচার,
কাড়ি লন তাড়াতাড়ি ॥
কাঁদিয়া আকুল, শচীর দুলাল,
মুখ পানে চেয়ে মার।
কণক কেতকী, দিয়ে দুটী আঁখি,
বাহিরিলা জলধার ॥
ধরিলা আখুটি ভুঁমিতলে লুটি
কান্দিয়া আকুল গোরা।
এ হেন সময়ে, মালিনী আসিয়ে,
দেখে হন দিশেহারা ।
কোলে তুলি ল'য়ে, বাল গোরা রায়ে,
কত না আদর করে।
কিছু নাহি শুনে, আকুল ক্রন্দনে,
নদীয়া গেল যে ভরে ॥
শচীমাতা ভাবে, পূজার অভাবে,
রোষান্বিতা ষষ্ঠীমাতা।
তাই তে নিমাই, কাঁদিছে এতই,
আমি গিয়ে কুটি মাথা।"
ছুটে চলে আই, ষষ্ঠী তলায়,
আলু-থালু কেশ দাম।
ব্যাকুলিত হিয়া, নিমায়ে রাখিয়া,
জপেন হরির নাম ॥
পাছু পাছু চলে, মালিনীর কোলে,
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড-পতি।
ষষ্ঠী তলাতে, মালিনী শচীতে,
করালেন ধরি নতি ॥
ত্রিলোকের পতি, করিলেন নতি,
সবে বলে হরি হরি।
হরিনাম শুনি, গোরা যাদুমণি,
হাসিল বদন ভরি ॥
প্রচ্ছন্ন প্রভাব, সে হাসির ভাব,
বুঝিল না তাহা কেহ।
মাতার কোলেতে, হাসিতে হাসিতে,
উঠিল বাল-বিগ্রহ।
ভণে হরিদাসী, চরণের দাসী,
হইয়া কৃতাঞ্জলি।
(ওহো!) শচীর দুলাল, ব্রহ্মগোপাল,
(মোর) মাথে দাও পদধুলি ॥"—গৌরগীতিকা।

এই গানটী শুনিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির বদনকমলে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল—সীতাঠাকুরাণী এত দুঃখের মধ্যেও মৃদুমন্দ হাসিলেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তখন দাসীটির পৃষ্ঠদেশে সস্নেহে মৃদু করাঘাত করিয়া আরও গান করিতে উৎসাহিত করিলেন। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর—মধ্যাহ্নকৃত্য বা আহারাদির কাহারও কোনরূপ চিন্তাই নাই এবং দেহানুসন্ধানও কাহারও নাই—গৌর-গুণ-গানে সকলেরই মন প্রমত্ত—সকলেই যেন প্রেমানন্দে আত্মহারা।

দাসীটি পুনরায় গান ধরিলেন—

যথারাগ।

—"কান্দে নিমাই শচীমার কোলে বসিয়া।
চান্দ নিব চান্দ নিব বলে কান্দিয়া ॥
অথির কান্দিয়া পঁহু কছু নাহি মানে।
আশোয়াসে শচীমাতা মধুর বচনে ॥
আনি দিব চান্দ কিন্তু ধরি নিবি তুঞি।
বড়ই চতুর চান্দ ধরই না দেই।
পঁহু কহে আনি দেহ মু ধরিব তাহে!
আধ আধ ভাষে গোরা ইতি উতি চাহে ॥
তুরিতই শচীমাতা পানি লেই থারে।
চান্দ বান্ধিলেন মাই মোর পঁহু তরে ॥
চান্দ পেখি চিতচোর হই আগুয়ান।
কোর হ'তে ঝম্প দেই হ'সত বয়ান ॥
ধরিবারে চান্দ যব জলে হাত দেই।
না ধরিতে পারে তাহে খণ্ড খণ্ড হোই ॥
গর গর রাগে পুন ধরিবারে ধায়।
খল খল হাসি মাই কোরেতে উঠায় ॥
রাগ অভিমানে পঁহু নত করি আঁখি।
উনমত শচী মাই সে রূপ নিরখি।
ধুনতই দু'টি ওঠ আঁখি ছল ছল।
মা হেরিনু মু অধম রূপ ঢল ঢল ॥

ভনয়ে হরিদাসী পাপী নরাধম।
অদৃষ্টের দোষ্ ইহা পূরব করম।”—
গৌর গীতিকা।

দীনা দাসীটি এবার গৌরপ্রেমে উন্মাদিনীর ন্যায় আর কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আর একটী গানের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

নেচে নেচে চলে যায় মধুর হেসে।
হেরি যে মোহন রূপ বালক বেশে॥
মুখ খানি চাঁদের পারা,
বচনে অমিয় ধারা,
আন্‌মনা দিশেহারা চলে আবেশে।
পুলকিত হৃদি হয় দেহ পরশে॥

ধুলিমাখা দেহ তার চলে নাচিয়া
নদেবাসী দেখে তারে আঁখি ভরিয়া॥
সজল নয়ন দু'টি,
করুণা রয়েছে ফুটি,
বেশভূষা পরিপাটী গেছে ভুলিয়া।
হরি ব'লে বাহু তুলে চলে নাচিয়া॥

কে হে তুমি মনচোর! বলনা কেনে।
বালবেশে প্রকাশিলে নদীয়াধামে॥
মনোহর রূপ তব,
নৃত্য গীত অভিনব,
তুমিই কি শ্রীমাধব, এলে ভুবনে?
বিশ্বম্ভর গৌরহরি নিমাই নামে॥

বালক মূরতি তব শ্রেষ্ঠ রচনা।
বাল-হৃদয় তব ভরা করুণা॥
অবতরি বালবেশে,
প্রেম দিলে হেসে হেসে,
(জীবের) হৃদয়ের তম নাশে বড় বাসনা।
শিশুমুখে হরি নাম পূর্ণ-সাধনা॥

এস এস হৃদে বস পাতা আসনে।
দীনা হীনা এ দাসীরে রাখ চরণে॥
আসিয়া নদীয়া ধাম,
লইতে না পারি নাম,
কবে হব পূর্ণ-কাম—তা ত জানিনে।
চিরদাসী হরিদাসী—রেখ চরণে॥”—
গৌর-গীতিকা।

দাসীটি বড় দীনা—কাঞ্চনা সখির বড় প্রিয়—তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাল না হইলেও এবং তাল মান জ্ঞান না থাকিলেও সখি কাঞ্চনা তাঁহার গান শুনিতে বড় ভাল বাসেন—তিনি তাঁহার সখিরূপা গুরুর প্রতি এক বার সপ্রেম ও সলাজ নয়নে চাহিলেন—এ চাহনির মর্ম্ম—“আর একটি গান গাহিব,- সখি কাঞ্চনা ইঙ্গিতে আদেশ করিলেন “একটী মাত্র”—পুনরায় দাসীটি গান ধরিলেন,—

যথা রাগ।

—“গৌর-গোপাল পঁহু শচী-দুলালিয়া।
বাল-গোপাল বেশে এস নাচিয়া॥
ধুলিমাখা রাঙ্গা পায়, কি শোভা হয়েছে হায়,
মাথে দাও পদরজ কৃপা করিয়া।
জীবন সার্থক করি কোলে তুলিয়া॥

মনসাধে মা জননী শ্রীশচীমাতা।
বান্ধিয়া দিয়াছে ঝুটি, কি সুন্দর পরিপাটি,
অলকা তিলক ভালে—সুন্দর শোভা।
কিঙ্কিনী কোমর পাটা কটিতে গাঁথা॥

এস এস শচীবালা হৃদি-সরসে।
হাতে বালা পায়ে মল, পা দু'খানি শতদল,
(মোর) হৃদয় মাঝারে রাখি,—নাচ হরিষে।
মিটাই প্রাণের সাধ পদ-পরশে॥

কটিতটে ধড়া বাঁধা চরণে খাড়ু।
মালতীর মালা গলে, চলে গোরা হেলে দুলে,
বদনেতে সুধা ঝরে হাতেতে লাড়ু।
বাল বেশে নাচিতেছে জগত-গুরু॥

নূপুরের ধ্বনি শুনি বাজে চরণে।
হরি বোলে নাচে যবে, নদেবাসী অনুভবে,
ত্রিলোকের পতি বুঝি এল ভুবনে।
কোলে তুলি লই তারে অতি যতনে॥

সুধামাখা ভাষে গোরা ডাকে সবারে।
স্বরগ অমিয়া রাশি নদীয়াতে পরকাশি,
সুধাধারা ঢালে যেন হৃদিমাঝারে।
নদেবাসী ভাসে সবে সুখ-সাগরে॥

বাল-গোপাল বেশে নাচিছে গোরা।
নরনারী অনিমিখে, বালরূপ ব্রহ্ম দেখে,
উন্মত্ত চিত সবে—প্রেমেতে ভোরা।
প্রেমের মুরতি গোরা পরাণ-চোরা॥

এস এস বালব্রহ্ম শচী-দুলালিয়া।
বুকেতে চরণ রাখি, নয়নে মাধুরী দেখি,
পূর্ণ করি মনসাধ হৃদে ধরিয়া।
কাতরে ডাকিছে তোমা হরিদাসিয়া॥"—
গৌর-গীতিকা।

এই গানটী শেষ হইতে না হইতেই বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী শ্রীসীতাঠাকুরাণীর স্নেহালিঙ্গন মুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন—যেন উঠিবার চেষ্টা। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে—সীতাঠাকুরাণীর স্নানাহ্নিক আহারাদি কিছুই হয় নাই—সে কথা এতক্ষণ কাহারও মনে ছিল না—এমনি তন্ময় ভাবে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বাল্যলীলা গীতসুধা পান করিতেছিলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভার উঠিবার আর একটী নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ কারণ আছে। শেষোক্ত গানটিতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ঐশ্বর্য্যভাবের কথা কিছু আছে। সখি মুখে এরূপ গান শুনিলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিতেন, কিন্তু তাল-মান ও রস-জ্ঞানশূন্যা গ্রাম্যরমণী দাসীটির মুখে এই গানটি শুনিয়া তিনি সেরূপ কিছুই করিলেন না—কিন্তু তাঁহার উঠিবার প্রচেষ্টাতেই তাঁহার মনের ভাব মর্ম্মী সখিগণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা এবং অন্যান্য সখি ও দাসীগণ সীতাঠাকুরাণী ও প্রিয়াজিকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময় পথে সখি কাঞ্চনা, তাঁহার অনুগত দীনা দাসিটিকে তাহার শেষোক্ত গানটির রসাভাসের কথা উল্লেখ করিয়া সস্নেহে গাত্র স্পর্শ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন।

—"বিষ্ণুপ্রিয়া পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥"—
শ্রীধাম নবদ্বীপ,
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গকুঞ্জ,
১লা আষাঢ়, মঙ্গলবার রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(২৪)

—"যা গোকুলশ্রী বৃষভানুপুত্রী
যস্যাস্তু সখ্যৌ ললিতা বিশাখে।
সা গৌরকান্তা স্বয়মাবিরাসীৎ
বিষ্ণুপ্রিয়াসৌ ব্রজভক্তিমূর্ত্তিঃ॥"—

"অমিতার গৌরকথা কাঞ্চনার গান।
গৌর-বিরহে প্রিয়া রাখে নিজ প্রাণ॥"

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী মাত্র একটি দিন গৌরশূন্য গৌরগৃহে ছিলেন—সকলে মিলিয়া অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি গৌরশূন্য গৌরগৃহে রাত্রিবাসে সম্মত হন নাই। বিরহিণী গৌরবল্লভার নির্জ্জন নিশীথ ভজন-কাহিনী সকলি তিনি শুনিয়াছেন—পাছে তাঁহার সাধন ভজনে কোনরূপ বিঘ্ন হয়—এই আশঙ্কায় অদ্বৈত-গৃহিণী যে দিন শ্রীনবদ্বীপে আসিলেন,—সেই দিনই অপরাহ্নে শান্তিপুর রওনা হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির নিকট গোপনে নিজ মনঃকথা ব্যক্ত করিয়া অন্তঃপুরে প্রিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গৌরবল্লভার পাষাণের রেখার মত বিধি-নিয়মাদির কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিল না,—সীতাঠাকুরাণী স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া গেলেন। মহা তপস্বিনী গৌর-বল্লভার তাঁহার সঙ্গে আর কোন বিশেষ কথা হইল না—তিনি অত্যন্ত বাকসংযতা ছিলেন—বিদায় কালীন কেবল মাত্র দরদরিত নয়নধারাপূর্ণ সপ্রেম দৃষ্টি ভিন্ন আর কোন কথাই বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীবদন হইতে বাহির হইল না। সীতাঠাকুরাণীরও তাৎকালিক অবস্থা তদ্রূপই বোধ হইল—তিনিও প্রেমাবেগে পরম বিহ্বলা হইলেন—তাঁহারও বদনে কোন কথা বাহির হইল না—উপস্থিত সখি ও দাসীগণের মুখেও কোন কথা নাই—সকলেরই বদন বিষাদপূর্ণ—নয়ন প্রেমাশ্রুপূর্ণ গৌরানুরাগ-রঞ্জিত। এইরূপ নীরব ক্রন্দনের মর্ম্মন্তুদ করুণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সীতাদেবীর বিদায় গ্রহণের সময় আসিল। বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরম স্নেহভরে এবং প্রেমাবেশে তখন তিনি শেষবার নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন-জলে প্রিয়াজির বক্ষ ভাসাইয়া গৌরশূন্য গৌরগৃহ হইতে ধীরে ধীরে মৃদু কম্পিত পদবিক্ষেপে সেই দিনই বিদায় গ্রহণ করিলেন। বহিঃপ্রাঙ্গণের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গৌরবক্ষ-

বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার সখি ও দাসীবৃন্দ সহ স্বয়ং আসিয়া পরম পূজনীয়া শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া প্রেমাশ্রু-পরিপ্লুত লোচনে বিদায় দিলেন। শ্রীসীতা-ঠাকুরাণী সস্নেহে তাঁহার শিরঃঘ্রাণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালীন এই দৃশ্যটি বড়ই মর্ম্মান্তিক এবং মর্ম্মন্তুদ। কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান এই সকরুণ প্রাণঘাতী দৃশ্য বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—জীবাধম লেখকের সে দৃশ্য বর্ণনা করিবার যোগ্যতাও নাই।

শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পাল্‌কীখানি যতদূর দেখা গেল, বিরহিণী প্রিয়াজি সখি ও দাসীগণ সহ সতৃষ্ণ প্রেমাশ্রু-নয়নে তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—পরম স্নেহময়ী সীতাদেবীও পাল্‌কীর অভ্যন্তর হইতে তাঁহার প্রেমাশ্রুবিগলিত বদনখানি কিঞ্চিৎ বাহির করিয়া নির্ণিমেষ নয়নে গৌরশূন্য গৌরগৃহ-দ্বারের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিলেন—পাল্‌কী খানি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সখি ও দাসীবৃন্দ বিরহিণী প্রিয়াজিকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে আনয়ন করিলেন। মর্ম্মীসখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন—আজ সকলের প্রাণেই গৌরবিরহজ্বালা নবনবায়মান হইয়া দ্বিগুণতর ধূ ধূ জ্বলিতেছে—সকলেরই হৃদয়ের অন্তঃস্তলে নূতন করিয়া আজ যেন গৌর-বিরহানলের সুতীব্র একটী জ্বালা সৃষ্টি হইল—গৌরশূন্য গৌরগৃহে আজ যেন একটা নূতন বিষাদ-ছায়া প্রত্যেকের বদনমণ্ডলে দৃষ্ট হইল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিরহিণী গৌর-বল্লভা নিজ নিত্যকৃত্য সমাধান করিয়া ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ দ্বার রুদ্ধ করিলেন—মর্ম্মীসখিদ্বয় বাহিরেই রহিলেন,—তাঁহারা গৌরবিরহিণী প্রিয়াজিকে আজ আর কোন কথাই বলিতে সাহস করিলেন না—ভজনমন্দিরের গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল—তাঁহারা অতি গোপনে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিরহিণী গৌরবল্লভা নিজ সিদ্ধাসনে বসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের চিত্রপটখানি এবং শ্রীচরণের কাষ্ঠপাদুকা দু'খানি সম্মুখে রাখিয়া কাষ্ঠপাষাণ-গলান করুণ ক্রন্দনের স্বরে আত্মনিবেদন করিতেছেন—

যথা রাগ-

প্রাণবল্লভ হে!

—"আপন দুঃখের আর কব না কথা।
মনেতে তোমার নাথ! লাগিবে ব্যথা॥
মরি যদি ভাল তবু, বলিব না তোমা কভু,
হৃদি বেদনার ভার—কাঁদিয়া বৃথা।
কি হবে আমার সুখ, তব মনে দিয়ে দুখ,
জানি না আমি যে নাথ! কুটিল প্রথা॥
জানি সুধু দাসী আমি, তুমি যে প্রাণের স্বামী,
তোমার পরাণে দিব কেমনে ব্যথা।
আপন দুখের আর ক'ব না কথা॥"—

প্রাণকান্ত হে!

(যেন) জনম জনমান্তরে পাই তোমারে।
এই বর দাও নাথ! তুমি আমারে॥
ইহ জনমের সুখ, তোমার সে হাসি মুখ,
আর না দেখিব কভু পরাণ-ভরে।
এ দুখের নাহি ওর, হৃদয়ে যাতনা ঘোর,
সহিতেছি নিশি দিশি—বসিয়া ঘরে॥
ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়া, তোমার এ বিষ্ণুপ্রিয়া,
জুড়ায় হৃদয়-জ্বালা জনম তরে।
(যেন) জনম জনমান্তরে পাই তোমারে॥"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

বিরহিণী প্রিয়াজি এইরূপ প্রাণঘাতী করুণ-ক্রন্দনের সুরে আত্মবিলাপ করিতেছেন—আর তাঁহার প্রাণবল্লভের কাষ্ঠপাদুকা দু'খানি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন,—মধ্যে মধ্যে অবনত শিরে কাষ্ঠপাদুকা দুই খানির উপর নিজ মস্তক রাখিয়া মাথা কুটিতেছেন,—আর অতি মৃদু করুণ-পাষাণ-গলান ক্রন্দনের সুরে বলিতেছেন—

প্রাণ-সর্ব্বস্বধন হে!

—"করুণার অবতার নাম তোমার।
করুণা করিয়া লহ প্রাণ আমার॥
কি কাজ জীবনে মোর, বল দেখি প্রাণ-গৌর,
কৃপা করি লহ প্রাণ ওহে প্রাণাধার॥
সকলি লয়েছ তুমি, আছে মাত্র প্রাণ খানি,
—তোমারি চরণে আজি দিব উপহার।
করুণা করিয়া লহ প্রাণ আমার॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

বিরহিণী প্রিয়াজির মনপ্রাণ আজ বড়ই ব্যাকুল—হৃদয় বড়ই কাতর—তাঁহার দৈনন্দিন ভজন সাধনে আজ আর মন লাগিতেছে না—জপের মালাগাছটি সম্মুখে পড়িয়া

আছে—তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন সীতাঠাকুরাণী আমার প্রাণবল্লভের তার স্বপ্ন দেখিলেন কেন? প্রকটলীলায় ত শ্রীমূর্ত্তিপূজায় বিধি নাই। অদ্বৈতগৃহিণী এই স্বপ্ন কথাটি আমাকে বলিতে কেন শান্তিপুর হইতে এখানে আসিলেন? এত দিন এক দিনের জন্যও ত তিনি নবদ্বীপে আসেন নাই—এখনই বা কেন আসিলেন? এই সকল চিন্তায় বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রাণে যেন আজ কি একটা বিষম অশান্তির ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। মর্ম্মী সখিদ্বয় গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া সকলি দেখিতেছেন এবং শুনিতেছেন—তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সখির হৃদয় বিদারক মর্ম্মভেদী আত্মনিবেদনের প্রাণঘাতী মর্ম্মন্তুদ কথাগুলি শুনিয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতার হৃৎপিণ্ড যেন মনদুঃখে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। সীতাদেবীর স্বপ্ন-বৃত্তান্তটি তাঁহারাও শুনিয়াছেন—তাঁহাদেরও মনে যেন একটা বিষম খট্‌কা লাগিয়াছে—তাহা কিন্তু প্রকাশযোগ্য নহে।

এখন রাত্রি এক প্রহর—ভজন-মন্দিরের দ্বার এখনও রুদ্ধ—বিরহিণী গৌর-বল্লভা গৌর-পাদ-পদ্ম-ধ্যানমগ্না—মধ্যে মধ্যে অন্তরের অন্তস্তল হইতে এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে—মর্ম্মীসখিদ্বয়ের হৃদয়ে তাহা শেল সম বিদ্ধ হইতেছে—ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে একটী মাত্র ঘৃতদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে—গবাক্ষদ্বার দিয়া প্রিয়াজিকে দেখা যাইতেছে মাত্র—মর্ম্মী সখিদ্বয় নিঃশব্দে গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া মহোৎকণ্ঠার সহিত দেখিতেছেন—তাঁহাদের প্রিয়তমা সখি উন্মাদিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উদাস নয়নে ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন—অকস্মাৎ তিনি আসন পরিত্যাগ করিয়া ভজনমন্দিরাভ্যন্তরে এদিক ওদিক দ্রুত পাদচরণ করিতে লাগিলেন—যেন কাহারও উদ্দেশে পাশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন—মর্ম্মীসখিদ্বয় গবাক্ষদ্বার দিয়া দেখিতেছেন বিরহিণী প্রিয়াজির ক্ষীণ দেহযষ্টিখানি গৌরপ্রেমাবেশে টলমল করিতেছে—তিনি যেন গৌর-প্রেম-রস-মদিরাপানে প্রমত্তা হইয়া মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় মন্দিরাভ্যন্তরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন—তাঁহার চরণস্পর্শে ভজনমন্দিরের দ্রব্যাদি এদিক ওদিক ছিটাইয়া পড়িতেছে—সে দিকে তাঁহার কোন লক্ষ্যই নাই—মন্দিরের প্রাচীরের ভিতে কখন কখন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাতও লাগিতেছে। গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির এখন প্রেমোন্মাদ দশা। ইঁহাকেই রসশাস্ত্রে দিব্যোন্মাদ দশা বলে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলে তিনটি দশায় সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন—সেই তিনটি দশাতেই দিব্যোন্মাদ-দশার অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ প্রকটিত হইত। পূজ্যপাদ কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম।
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচন।
আকাশে কহেন শুনে সব ভক্তগণ॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

তাঁহার সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভের ন্যায় বিরহিণী প্রিয়াজিও এইরূপ তিন দশায় সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন—এক্ষণে তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যদশা—তাঁহার আত্মনিবেদনের পদগুলি তাঁহার বাহ্যদশার ভাবের স্ফূর্ত্তি মাত্র। ইতিপূর্ব্বে মহাভাবময়ী গৌরবল্লভা যাসাবধি মৌনব্রতাবলম্বিনী ছিলেন—অধিকাংশ কাল তিনি অন্তর্দ্দশাতেই থাকিতেন—এই সময়ে বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধই থাকিত না। অন্তর্দ্দশায় সাধকের সাধ্য বস্তুর সহিত অন্তরে অন্তরে যে অপূর্ব্ব মিলন ও সম্ভোগ-রসাস্বাদন তাহা বড়ই মধুময়—সাধনের পরিপাকাবস্থায় মিলন ও সম্ভোগরস বিরহ-রসে পরিণত হয়—তাহাকেই বিপ্রলম্ভ রস বলে,—তাহারই আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া করিতেছেন এবং তাঁহারই আস্বাদন পুনরায় গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি প্রাণ ভরিয়া নদীয়ায় মহাগম্ভীরামন্দিরে বসিয়া করিতেছেন। প্রিয়তমজনের দর্শন জন্য উৎকট বিরহজনিত প্রাণের অনাবিল আকুলিত ও ব্যাকুলিত ভাব-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হৃদিসিংহাসন ব্যতিত অভীষ্টদেবের বসিবার উপযুক্ত স্থান আর কোথাও নাই—এবং এইরূপ ভাব-সম্পত্তির অধিকারী না হইলে ভগবদ্দর্শন লাভ অতিশয় দুর্ঘট। এই জন্যই লীলাময় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু এবং লীলাময়ী স্বয়ং ভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্বয়ং আচরণ করিয়া কলিহত জীবশিক্ষার জন্য এই অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন-লীলারঙ্গ জগতে প্রকট করিয়াছেন।

বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে উন্মাদিনীর ন্যায় যে গৌরপ্রেমের তাণ্ডব লীলারঙ্গ করিতে-ছেন তাঁহা দেখিয়া মর্ম্মীসখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতার প্রাণে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে—গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—রুদ্ধ মন্দিরদ্বারে আসিয়া তখন তাঁহারা দুইজনে সজোরে কবাটে করাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে করুণ ক্রন্দনের স্বরে গৌর-কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ হে!
—"এসে তুমি দেখে যাও, কানে তুমি শুনে যাও,
কি দশা হ'য়েছে তব প্রাণ-প্রিয়ার।
এস এস গৌরহরি, তোমার চরণে ধরি,
এ সময়ে প্রাণগৌর, এস একবার॥"

—"গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ।"—
"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর এস এস হে।"

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরদ্বারে যখন গৌরকীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিল, তখন গৌরপ্রেমোন্মাদিনী গৌরবল্লভা অকস্মাৎ মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া আলুথালুবেশে স্বয়ং সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—গৌরকীর্ত্তন-ধ্বনি বিরহিণী প্রিয়াজির পক্ষে শ্যামের বংশিধ্বনি—তিনি কি আর তখন গৃহাবদ্ধ থাকিতে পারেন? তিনি গৌর-প্রেমাবেশে এবং গৌরানুরাগরঞ্জিত উদাস নয়নে তাঁহার প্রাণবল্লভের দর্শন উদ্দেশে আঙ্গিনার দিকে ছুটিবার চেষ্টা করিলেন—অমনি সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই দিক দিয়া তাঁহাকে প্রেমা-লিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া পরম প্রেমভরে ক্রোড়ে করিয়া ভজন-মন্দিরের বারান্দায় বসাইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির তখন বাহ্যজ্ঞান নাই—উন্মুক্ত রুক্ষ-কেশদামে মলিন বদনচন্দ্র-খানি আবৃত—পরিধান বসনখানি অসম্বর—অশ্রুপূর্ণ কমল নয়নদ্বয় মুদ্রিত—নয়নকোনে প্রেমধারার বিরাম নাই—তিনি যেন প্রাণহীনার মত জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে শায়িত আছেন। গৌরকীর্ত্তন চলিতেছে—কীর্ত্তনধ্বনি শুনিয়া অন্তঃপুর হইতে সখি ও দাসীগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদেরও হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত ছিলেন—তিনি পুনরায় উচ্চ গৌরকীর্ত্তনের ধ্বনি উঠাইলেন,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারি।"—

সকল সখি ও দাসীগণ একত্রে মিলিয়া তখন কীর্ত্তনে যোগ দিলেন—তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর—গৌরশূন্য গৌরগৃহে গভীর নিশীথে উচ্চ গৌর-কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া নদীয়ার গৌরভক্তগণ সেই গভীর রাত্রিতে ঘরে ঘরে উচ্চ গৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥"—

নদীয়ার নিশীথ গগনমণ্ডল গৌর-কীর্ত্তন-গানে মুখরিত হইল—নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ হঠাৎ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইল,—নদীয়ার চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন-ধ্বনি ব্যাপ্ত হইল। সেই গভীর নিশীথে একান্ত গৌরভক্ত একদল কীর্ত্তনীয়া আসিয়া গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"—

গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্তপুর-প্রাঙ্গণে ও বহিরাঙ্গণ-দ্বারে একই সময়ে কীর্ত্তন-ধ্বনির প্রবল ঝঙ্কার উঠিল—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারি॥"—

পণ্ডিত দামোদর, ঠাকুর বংশীবদন এবং অতিবৃদ্ধ ঈশান উঠিয়া বহিরাঙ্গণের দ্বার খুলিয়া দিলেন—তখন দলে দলে নদীয়ার গৌরভক্তগণ সেই গভীর নিশীথে গৌর-শূন্য গৌরগৃহে প্রবেশ করিয়া গৌরকীর্ত্তনের ধুম উঠাইলেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি।"—

এত গভীর রাত্রিতে এই প্রথম নির্জ্জন গৌরশূন্য গৌর-গৃহ উচ্চকীর্ত্তনধ্বনিতে মুখরিত হইল—সকলেই বুঝিলেন গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কোন অপূর্ব্ব লীলা-রঙ্গের সহিত গৌরভক্তগণের এই নিশীথ গৌরকীর্ত্তনের বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। কিন্তু প্রিয়াজির এই বিশিষ্ট লীলারঙ্গে

বিশিষ্ট বিবরণ কেহই অবগত নহেন,—তাহা জানিবার সম্ভাবনাও নাই।

বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে মূর্চ্ছিতাবস্থায় শয়ান আছেন—তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—নিশীথ উচ্চ গৌর-কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি তখন ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন,—সখিগণ সকলেই তখন কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া প্রিয়াজির অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন—বহিরাঙ্গণে তখনও কীর্ত্তন চলিতেছে—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥"—

অন্তঃপুরের এ সকল অপূর্ব্ব দৃশ্য বহির্বাটির লোক-লোচনের বহির্ভূত—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের সখি ও দাসীগণের মধ্যেই বিরহিণী প্রিয়াজির এ সকল নিগূঢ় প্রেম-লীলারঙ্গ-রহস্য সকল সযত্নে সংরক্ষিত এবং তাঁহার মর্ম্মী সখি ও দাসীগণের দ্বারা অনাদিকাল হইতে সংস্মৃত হইয়া আসিতেছে এবং চিরদিন হইবে। ইহা তাঁহাদেরই গুপ্ত প্রেমসম্পত্তি—তাঁহাদেরই আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গভজনে এই সকল গুপ্ত প্রেমসম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার এখন অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা—এখনও তাঁহার কোন কথা বলিবার সামর্থ্য হয় নাই—তাঁহার শরীর অবশ এবং দেহের অস্থিসন্ধি সকল শিথিল—এখনও তাঁহার বৈবর্ণ ভাব সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে—মর্ম্মী সখিদ্বয় প্রাণপণে তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিতেছেন। এক্ষণে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে বিরহিণী প্রিয়াজি যেরূপ অপূর্ব্ব দিব্যোন্মাদ লীলারঙ্গ প্রকট করিতেছেন—নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরেও তাঁহার সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া তদনুরূপ লীলারঙ্গ প্রকট করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ মর্ম্মী ভক্ত নিত্যপার্ষদ স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের অন্তরে যে অপূর্ব্ব ভাব-কদম্ব জাগরুক করিয়াছিলেন, এখানেও ঠিক তদনুরূপ ভাবেই বিরহিণী প্রিয়াজির সখিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে দেখিতেছেন তিনি যেন প্রকৃতই শ্রীরাধা হইয়াছেন—এখানেও সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দেখিতেছেন—তাঁহাদের "নদীয়া-রাই" প্রিয়তমা সখিটিও যেন ঠিক তদ্রূপ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি শ্রীরাধাই হইয়াছেন। ব্রজরসরসিকা এবং সঙ্গীতরসজ্ঞা সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার কলকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণানুরাগিণী বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ দর্শনে ললিতা সখির উক্তি পূজ্যপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের রচিত একটী প্রাচীনপদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথা রাগ।

—"রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥" পদকল্পতরু।

অন্যত্র—

—"বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া,
ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি।
নিজ করোপরে, রাখিয়া কপোল,
মহা যোগিণীর পারা।
ও দু'টি নয়নে, বহিছে সঘনে,
শ্রাবণ-মেঘেরই ধারা॥"—

এক্ষণে বিরহিণী প্রিয়াজি স্বয়ংই আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন—সখি কাঞ্চনার বক্ষে নিজ মলিন বদন-খানি লুকাইয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিতে-ছেন—সখি কাঞ্চনা পরম প্রেমভরে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কত কি বুঝাইতেছেন—কিন্তু প্রিয়াজি কোন কথাই বলিতেছেন না—তিনি এক্ষণে প্রিয় সখির প্রেমা-লিঙ্গন মুক্ত হইয়া অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া অধোবদনে নিজ নখাগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতলে যেন কি লিখিতেছেন—আর তাঁহার নয়ন-সলিল-সম্পাতে সেখানে অশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে। নীলাচলে তাঁহার সন্ন্যাসী প্রাণ-বল্লভেরও তদ্রূপাবস্থা,—যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

—"ভূমির উপরে বসি নখে ভূমে লিখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে॥"—

নীলাচলে বিরহিণী প্রিয়াজির সন্ন্যাসী প্রাণবল্লভের তাৎকালিক অবস্থা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যাহা বর্ণিত আছে,

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন উভয় তুল্যমূল্য—পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

—"কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধবাহ্য স্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্য স্ফূর্ত্তি—তিন রীতে প্রভুর স্থিতি।।"

এক্ষণে নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে বিরহিণী গৌর-বল্লভারও তদ্রূপাবস্থা—ইহাই দিব্যোন্মাদের স্থূলাবস্থা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর গম্ভীরার শেষ লীলায় অধিকাংশ সময়েই এরূপ ভাবই প্রকাশ পাইত—তাঁহার স্বরূপশক্তি বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীরও এখন সেই ভাব। শক্তি শক্তিমান যে অদ্বয়তত্ত্ব তাহার প্রমাণ এই,—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত শ্রীগ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—

—"যাদৃশো ভগবান কৃষ্ণো মহালক্ষ্মীরপীদৃশী"—

এই অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ভাব-সম্পত্তি গুলিই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিশিষ্ট দান। পরম প্রেমানন্দপরিপূরিত প্রেমিক রসিকভক্ত-হৃদয়ের এই ভাব-সম্পত্তি গুলির কিঞ্চিৎ আভাসও যদি স্বাধীনভাবে জীব-হৃদয়ে অঙ্কিত এবং প্রতিফলিত হয়—তাহা হইতেই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমতত্ত্বচিন্তামণির দিব্যালোক উদ্ভূত হইয়া ভক্তহৃদয় আলোকিত করিবে এবং প্রেমাবতার প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তিস্বরূপিণী স্বরূপশক্তি সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দিব্যাসন তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন ভক্তিরস-সার জীবের প্রয়োজন পঞ্চমপুরুষার্থ **প্রেমের** অনুভূতি হইবে।

স্বয়ং আচরণ করিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার স্বরূপশক্তি স্বয়ংভগবতী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী জীব-জগতকে তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব লীলা-বৈচিত্র্যের বিচিত্র চিত্র প্রদর্শন করিবার এবং শিক্ষা দিবার জন্যই নীলাচলধামে এবং শ্রীনবদ্বীপধামে যুগপৎ এই পরমাশ্চর্য্য এবং অনির্ব্বচনীয় পরম গম্ভীর গম্ভীরা-লীলারঙ্গ প্রকট করিয়া কলিহত জীবগণকে ধন্য করিয়াছেন। বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনের এই অপূর্ব্ব অভিনব পন্থার আবিষ্কর্ত্তা ও আবিষ্কর্ত্রীর চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। এই জন্যই পূজ্যপাদ ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন—

—"প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।"—

বিরহিণী প্রিয়াজির স্নানাহারাদি বাহ্য ক্রিয়া সকল এবং বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তি সকল স্বভাববশেই সংসাধিত ও পরিচালিত হইতেছে। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামি তাই লিখিয়াছেন—

—"স্নান দর্শন ভোজন স্বভাবেতে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়।।"—চৈঃ চঃ।

এতক্ষণে বিরহিণী গৌর-বল্লভা আত্মসম্বরণ করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় সঙ্গে কিছু কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন—এখন তাঁহার কথঞ্চিৎ বাহ্যস্ফূর্ত্তি-ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হস্ত দু'খানি নিজ দুই হস্তে পরম প্রেমভরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া প্রেমপরিপ্লুত গৌরানুরাগ-রঞ্জিত সাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদ মধুর বচনে করুণ ক্রন্দনের মৃদুমধুরস্বরে কহিলেন—"প্রাণসখি কাঞ্চনে! প্রিয়সখি অমিতে! অদ্বৈতগৃহিণীর প্রতি আমার প্রাণবল্লভের স্বপ্নাদেশ-কথার প্রকৃত মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—এই কথাটি আমার মনে ভালও লাগিতেছে না। প্রকট কালে মূর্ত্তিপূজার কথাটি রসভঙ্গজনক বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। আমার প্রাণবল্লভ ত এ অভাগিনীর প্রতিই এরূপ স্বপ্নাদেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার এই গুপ্তলীলারঙ্গের মর্ম্ম বুঝা ভার"—এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে প্রেমাবেশে পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন। এতগুলি কথা গুছাইয়া বলিতে তাঁহার যেন হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল। সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে প্রেমভরে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া মধুর সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন—"প্রিয় সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি [illegible] চিন্তায় মনাগুণে দহিতেছ,—তোমার সন্দেহের [illegible] কোন কারণ নাই—তোমার প্রাণবল্লভের শ্রী[illegible] ঢাকাদক্ষিণে তাঁহার পিতৃপুরুষের জন্মস্থানে তাঁহার প্রকটকালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—পণ্ডিত কাশীশ্বর নীলাচল হইতে তাঁহার প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি শ্রীধাম বৃন্দাবনে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—পণ্ডিত গৌরীদাস ও সূর্য্যদাসের আত্যন্তিক প্রীতি সম্বন্ধে শ্রীপাট কালনায় শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীমূর্ত্তি তাঁহাদের প্রকট কালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত ও সেবিত হইতেছেন। প্রিয় সখি! তুমি ত সকলি জান, তবে বৃথা মনাগুণে কেন দগ্ধ হইতেছ? সখি সুস্থির হও,—তোমার আশঙ্কার কোন হেতু নাই।"—এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজিকে অশেষ বিশেষে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ কথা

শুনি বিরহিণী গৌর-বল্লভা ধীরভাবে সকলি শ্রবণ করিলেন—কিন্তু তাঁহার মনের সন্দেহটি যেন দূর হইল না—তবে তাঁহার মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল বটে। তিনি আর কোন বিশেষ কথা বলিলেন না। এইমাত্র বলিলেন—"নবদ্বীপে আমার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার কথা তিনি ত অভাগিনীকে একটীবার জানাইলেন না—এই আমার মনের বড় দুঃখ"। সখি কাঞ্চনা বড় সুচতুরা—তিনিও মাত্র একটী কথা বলিয়া এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবসান করিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার প্রাণবল্লভ তোমার অজ্ঞাতে এ কার্য্য কখন করিবেন না।"—

বিরহিণী প্রিয়াজির মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া দিয়া গিয়াছেন শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবী—গৌরবল্লভার কঠোর তপস্যার ফলেই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল।

গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কিয়ৎকাল চিন্তামগ্ন রহিলেন— তৎপর সখি অমিতার বদনের প্রতি চাহিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"সখি অমিতে! আমার জপের মালা কোথায়?"—রাত্রি এখন আড়াই প্রহর অতীত হইতে চলিল—প্রহরেক কাল বিরহিণী প্রিয়াজি অর্দ্ধবাহ্যদশায় ছিলেন। এখন তাঁহার বাহ্যদশা—তাই তিনি জপমালার অনুসন্ধান করিতেছেন—দৈনন্দিন সংখ্যানাম-জপ তাঁহার তখনও পূর্ণ হয় নাই। সখি অমিতা ভজনমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রিয়াজির জপের মালা আনিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন—তিনি তখন মন্দিরাভ্যন্তরে গিয়া তাঁহার নিয়মিত সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন। মর্ম্মী সখিদ্বয়ও নিজ নিজ সংখ্যানাম জপে রত হইলেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই বিরহিণী প্রিয়াজির হস্ত হইতে জপমালা স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তিনি এখন সমাধিমগ্না—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা সময় বুঝিয়া তাঁহার দুই পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ভজন-মন্দিরে মাত্র একটী ক্ষীণ দীপালোক জ্বলিতেছে। অনেকক্ষণ গেল,—বিরহিণী প্রিয়াজির আর সমাধি ভঙ্গ হয় না—তিনি তাঁহার আসনেই নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছেন—নয়নদ্বয় নিমীলিত—কিন্তু নয়নকোণে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে—যেন একখানি শুষ্ক কাষ্ঠের মত তিনি জড়বৎ বসিয়া আছেন। এই ভাবে প্রহরেক কাল মহাতপস্বিনী গৌর বল্লভার উৎকট তপস্যা চলিল—গৌর-আনা-গোসাঞির শ্রীগৌর আনিবার তপস্যা অপেক্ষাও এ তপস্যা উৎকট—এই তপস্যার ফলে জীবজগতের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে।

অকস্মাৎ বিরহিণী প্রিয়াজির সমাধি ভঙ্গ হইল,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান উদয় হইল একটী দৈববাণী শ্রবণ করিয়া। ভজনমন্দিরাভ্যন্তরেই সেই অপূর্ব্ব দৈববাণীটি শ্রুত হইল—তাহাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি সুস্পষ্ট শ্রুত হইল,—

—"প্রাণপ্রিয়ে! শুন মোর এ সত্য বচন।
তোমা সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥
তোমা সবার প্রেম-রসে, আমারে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সভা ছাড়া হঞা, আমা দূরদেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—উর্দ্ধদৃষ্টিতে এদিক ওদিক উদাসনয়নে চাহিতে লাগিলেন—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা তিন জনেই ভজন-মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বহু অনুসন্ধান করিলেন—কিন্তু কাহারও দর্শন পাইলেন না।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের সুমধুর কণ্ঠস্বর যেন প্রিয়াজির কর্ণে বাসা করিয়াছে—তিনি পাগলিনীর মত উদাসনয়নে ইতি উতি চাহিতেছেন—এমন সময়ে গৌরপাগলিনী সখি কাঞ্চনা আকাশপথে অপূর্ব্ব শ্রীগৌরমূর্ত্তির আবির্ভাব দর্শন করিলেন। তিনি প্রেমানন্দে একটী গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"সজনি! হের আওত গোরা রায়।
আজানুলম্বিত ভুজ কাঞ্চন কায়॥
সুবলিত তনু সুন্দর শচী-বালা।
কম্বুকণ্ঠে শোহে মালতী-মালা॥
হেরত কিবা বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গ।
রূপ হেরি সখি! দহল অনঙ্গ॥
গায়ত নাচত নটবর রঙ্গে।
ধায়ত সুরধুনী নিজগণ সঙ্গে॥

পদনখরে শোহে চান্দকি মালা।
কো বিধি নিরমিল এ শচী-বালা॥
নয়ন ভরি হের রূপ অপরূপ।
নদীয়ার চাঁদ গোরা প্রেমরসকুপ॥
ভণয়ে হরিদাসী রোয়ই রোয়ই।
বিষ্ণুপ্রিয়া পাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধরই॥"—

সখি কাঞ্চনার গানে কাষ্ঠপাষাণ দ্রব হয়। নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিতেছে—সেই উষ্ণ অশ্রুজল-ধারা সমাধি-গ্রস্থা বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গে পড়িতেছে—তথাপিও তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। সখি অমিতা প্রিয়াজির বদনের উপর বদন রাখিয়া অতিসন্তর্পণে মৃদু মন্দ বীজন করিতেছেন এবং সখি কাঞ্চনাও অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত আছেন। সখি কাঞ্চনা পুনরায় একটী আত্মনিবেদনের পদ গাহিলেন,—

যথারাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ হে!
কি আর বলিব আমি।
সকলিত জান, হে প্রাণরমণ,
তুমি হে অন্তরযামি॥
বলিতে যা ছিল, সকলি বলেছি,
(আর কিছু নাহি বলিবার।
পরাণের ব্যথা, বুঝিলেন না তুমি,
(ওহে) করুণার অবতার॥
সুধুই কাঁদিয়া, এ জনম যাবে,
বৃথা দরশন-আশা।
প্রিয়ার তোমার, বুঝিলে না দুখ,
এ কেমন ভালবাসা?
(তার) অসহ যাতনা, বিরহ-বেদনা,
বলিবার কথা নয়।
তোমার প্রিয়ার, তুমি লহ ভার,
(তোমার) নারী বধে নাহি ভয়॥
মনের দুখেতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
(একথা) দাসী হরিদাসী কয়॥ গৌরগীতিকা।"

সখি কাঞ্চনার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার ফলে এবং অনুরাগের ডাকে কপট সন্ন্যাসী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নদীয়ার গম্ভীরা-মন্দিরে আবির্ভাব হইবার লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হইল। সখি কাঞ্চনা মনশ্চক্ষে নবনটবর নদীয়া-নাগর শ্রীগৌরসুন্দরের অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিতেছিলেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণে তৃপ্তিবোধ হয় নাই—তিনি চাহেন তাঁহার আবির্ভাবে সাক্ষাৎ দর্শন—সুধু দর্শন নহে—নদীয়া-যুগল-মিলন-সুখ-সম্ভোগ করিবার তাঁহার তাৎকালিক মনের প্রবল বাসনা। এই বাসনা তাঁহার বহু দিন হইতে অতৃপ্ত রহিয়াছে। তাই এত কথা বলিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের প্রাণবল্লভার প্রীতির উদ্দেশে তাঁহার স্বরূপপ্রকাশের জন্য অনুরাগ বর্দ্ধন করিতেছেন।

গৌর-অঙ্গগন্ধে এক্ষণে ভজন-মন্দির মহমহ করিতেছে—নদীয়ার গম্ভীরা-মন্দির অকস্মাৎ দিব্যালোকে মুখরিত হইল—পরম স্নিগ্ধকর—পরম প্রাণারাম—পরম মনোহর একটা অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতি অকস্মাৎ ভজনমন্দিরস্থিত সুসজ্জিত দিব্য পালঙ্কোপরি প্রকাশ পাইল—তন্মধ্যে নবনটবর নদীয়া-নাগর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ শ্রীমূর্ত্তি আবির্ভাব হইল। তিনি যেন দিব্য মণিরত্নমণ্ডিত সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া মৃদুমধুর হাস্যবদনে পদ্মিনয়নে সখিদ্বয় পরিবেষ্টিতা সমাধিগ্রস্তা তাঁহার প্রাণবল্লভার প্রতি মহা অপরাধীর ন্যায় এক একবার প্রেমবিস্ফারিত সজলনয়নে চাহিতেছেন—এবং কখন কখন প্রিয়-প্রেমানুরাগরঞ্জিত লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেছেন। তাঁহার শ্রীবদনপ্রান্তে মৃদুমধুর হাসির রেখাও যেন পরিলক্ষিত হইতেছে—তাহাতে যেন বিজলি চমকিতেছে—সেই মধুর মৃদু হাসির প্রতিচ্ছবি সমাধিগতা তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার শুষ্কবদনপ্রান্তেও যেন উদ্ভাসিত হইতেছে। মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা দেখিতেছেন তাঁহাদের প্রিয় সখির প্রতি অঙ্গ যেন পরিপূর্ণ প্রেমানন্দে পরিপূরিত—তাঁহার অন্তর বাহ্য যেন পরমানন্দময়—সদানন্দময়ী গৌর-বক্ষবিলাসিনী সনাতন নন্দিনীর মনপ্রাণ ও হৃদয় যেন এখন অপূর্ব্ব প্রেমানন্দে ভরপুর। সমাধি অবস্থায় প্রিয় সখির বদনের এইরূপ আকস্মিক অপূর্ব্ব ভাব-পরিবর্ত্তন দেখিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনপ্রাণ আজ প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে।

অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় মাধুরীমাখা পরম স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুল্লতার কমনীয় জ্যোতির অভ্যন্তরে অপরূপ শ্রীগৌর-নাগররূপের অপূর্ব্ব চমক ক্ষণমাত্রের জন্য দেখাইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ যেন হাসিতে হাসিতে অন্তর্হিত হইলেন। সে হাসির মর্ম্ম—"ভয় কি তোমাদের? আমি শীঘ্রই তোমাদের মনোমত মূর্ত্তিরূপে নদীয়ায় আসিতেছি—অপ্রকটপ্রকাশের কাল সমাগত হইয়াছে—বিষ্ণুপ্রিয়া-

লিপ্সিত আমার বিগ্রহে আমার প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অমূর্ত্তরূপে বিরাজ করিবেন। রসিকভক্তগণের মনস্তুষ্টির জন্ত আমি স্বয়ংরূপে নদীয়ায় শীঘ্রই আবির্ভূত হইব—বিষ্ণুপ্রিয়া-লিপ্সিত বিগ্রহকেই নদীয়া-যুগল-বিগ্রহ জ্ঞানে রসিকভক্ত নিজজনে আমার প্রেমসেবা করিবে।"—

ইতিমধ্যেই বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রেম-সমাধি হঠাৎ ভঙ্গ হইল—তিনি অকস্মাৎ মর্ম্মভেদী করুণস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতার জাগ্রত স্বপ্নও ভঙ্গ হইল—তখন তিন জনে মিলিয়া প্রেমাবেশে গলা জড়াজড়ি করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—সে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনের রোল আর থামে না—গৌর-বিরহিণীত্রয়ের প্রেম-ক্রন্দনধ্বনি রুদ্ধদ্বার নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—গৌরশূন্য গৌর গৃহ-প্রাঙ্গণ সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনিতে মুখরিত হইল—নদীয়ার গৌরভক্তগণের গৃহে গৃহে—পথে ঘাটে—আকাশে, পবনে, সলিলে, বৃক্ষের পত্রপুষ্পে অশ্রুতপূর্ব্ব সেই প্রেমক্রন্দনধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল। গভীর নিশীথে নদীয়াবাসী একান্ত গৌরভক্তজনের অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল—তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাত্যাগ করিয়া গৌরশূন্য গৌরগৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ গেল—সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার প্রিয়সখি বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরম প্রেমভরে বক্ষে ধারণ করিয়া স্নেহভরে প্রশ্ন করিলেন—"প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আজ তুমি কি দেখিলে বল দেখি? আজ তোমার প্রাণবল্লভের বিশিষ্ট আবির্ভাব হইয়াছিল—আমরা যেন জাগ্রতে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলাম"—

পরম ধৈর্য্যবতী বিরহিণী প্রিয়াজি সরমে তাঁহার বদন-খানি অবনত করিয়া তাঁহার প্রাণের কথা ও মর্ম্মের মর্ম্মব্যথা পরম অন্তরঙ্গা প্রিয়সখির নিকট বলি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিতেছেন না—সর্ব্বজ্ঞা মর্ম্মী সখিদ্বয় সকলি বুঝিতেছেন—সকলি জানেন। প্রিয়াজির মর্ম্মকথা ও মনব্যথা তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ জানেন না। তাঁহারা বেদগোপ্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-লীলা-রহস্তের পরম বিশ্বস্ত গুপ্ত ভাণ্ডারী। সখি কাঞ্চনা তখন সাদরে তাঁহার প্রিয়সখির চিবুক স্পর্শ করিয়া মৃদুমধুরভাবে কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার মুখে তোমার প্রাণবল্লভের মধুর লীলারঙ্গ-কথা আমাদের যে কত ভাল লাগে তাহা তুমি কি বুঝিবে? তুমি যদি আমি হও তবে বুঝিবে সে কথা—তবে বুঝিবে সে সুখ—সে অপূর্ব্ব লীলা-রসাস্বাদনে কত আনন্দ!" বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণসখির কথাগুলি শুনিয়া গেলেন—কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া সখি কাঞ্চনা পুনরায় প্রিয়াজিকে কত না সাধ্যসাধনা করিলেন—এবার দুই হস্তে পরম প্রেমভরে প্রিয়সখির দুটি হস্ত ধারণ করিয়া গৌরানুরাগরঞ্জিত প্রেমাকুলনয়নে তাঁহার বদনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! আমার মাথার দিব্য বলনা তুমি আজ কি দেখিলে? কি শুনিলে? কি করিলে? তোমার প্রাণ-বল্লভ ত সকরুণ ও সজল নয়নে মহা অপরাধীর ন্যায় তোমার বদনের প্রতি বারম্বার চাহিতেছিলেন—আমরা তোমার সমাধি অবস্থার মধ্যেও তোমার বদনে অপূর্ব্ব মৃদু হাসির রেখা দেখিলাম—তোমার প্রাণবল্লভের বদনেও মধুর হাসি—কিন্তু ঠারে ঠোরে অন্তরে অন্তরে তোমাদের মধ্যে যে কি প্রেম-কথা হইল, তাহা কিছুই বুঝিলাম না। প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! বল বল, আমাদের নিকট তোমার লজ্জা কি সখি!"

পরম গম্ভীরা-প্রকৃতি গৌর-বল্লভার কুসুম-কোমল হৃদয়-খানি এবার দ্রব হইল—তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না—তাঁহার মনের কথা—প্রাণের ব্যথা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতার গলদেশ দুই হস্তে পরম প্রেমাবেগে জড়াইয়া ধরিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"প্রাণসখি কাঞ্চনে! প্রিয়সখি অমিতে! মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে—প্রাণের ব্যথা প্রাণ খুলিয়া বলিলে লোকে পাগল বলে। মনের মানুষের নিকট মনের কথা—প্রাণের ব্যথা না বলিলেও প্রাণ বাঁচে না—তাই বলি শুন তোমাদের গৌরপ্রেম-পাগলিনী অভাগিনী সখির প্রলাপকাহিনী"—এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি অতি মৃদুস্বরে সরমে বদন অবনত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার বাম হস্তাঙ্গুলির নখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

—"স্বপনে বন্ধুয়া মোর, পালঙ্কে বসিল গো,
বারেক চাহিনু আঁখি কোণে।
পিরীতি-মুরতি গোরা, কত আদরিয়া গো,
আপনা অধীন করি মানে॥

সে চাঁদ বদনে মোরে, বারে বারে কয় গো,
পরাণ অধিক মোর তুমি।
ইহা বলি কোলেতে করিয়া সুখে ভাসে গো,
লাজেতে মরিয়া যাই আমি॥
সাজায়ে তাম্বুল মোর, বদনে সঁপিয়া গো,
হরষে বিভোর হঞা চায়।
সে কর-পল্লবে পুনঃ অধর পরশি গো,
পরাণ নিছিয়া দেয় তায়॥
মধুর মধুর হাসি, অমিয়া বরষে গো,
কিবা বা সে সুরসিকপনা।
নরহরি প্রাণপিয়া, হিয়ার পুতলি গো,
যুবতী মোহিতে একজনা॥"—
গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

গৌররঙ্গবিলাসিনী পরম গম্ভীরা বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মুখে আজ তাঁহার পরম গুহ্য গৌর-পীরিতি-কথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রাণ যেন প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বহু দিন পরে আজ এই প্রথম তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়সখির নিজমুখে তাঁহার প্রাণবল্লভের পরম গুহ্য রহোলীলা-কথা শুনিলেন—গোপনে নদীয়ায় আসিয়া কপট সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই পরমাদ্ভুত প্রেমলীলার পরম গুহ্য পিরীতিকথা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনে আর আজ আনন্দের পরিসীমা নাই। বহুদিনের পর—বহু অনুসন্ধানের পর—কপটসন্ন্যাসী লম্পটগুরু চোরাগ্রগণ্য পরম রসিকশেখর মহাপুরুষ নদীয়া-নাগরীমনচোরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ আজ নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে ধরা পড়িয়াছেন—তাঁহার কপট সন্ন্যাসীর যত কিছু ভারিভুরি আজি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। এতদিন বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার সম্বন্ধীয় মধুররসের গৌরলীলায় প্রাচীন মহাজন-পদাবলীর গান শুনিয়া যাইতেন মাত্র—কিন্তু কখন কোন কথা কহিতেন না। আজি তিনি স্বয়ং নিজমুখে পরম গুহ্যাতিগুহ্য বেদ-গোপ্য আত্মপিরীতি-কাহিনী প্রাণ খুলিয়া কহিতেছেন—এ বড় আনন্দের বিষয়—পরমান্তরঙ্গা সখিগণের পক্ষে এ বড় পরম সৌভাগ্যের কথা! সখি কাঞ্চনা ও অমিতার বহুদিনের প্রাণের দুঃখ আজ দূর হইয়াছে। তাঁহাদের বদনে আজ হাসির রেখা দেখা দিয়াছে।

সখি কাঞ্চনার বক্ষে বদন লুকাইয়া বিরহিণী প্রিয়াজি অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—সরমে আর মাথা তুলিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। মর্ম্মী সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয় সখির মনোভাব বুঝিয়া তখন একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ গান্ধার।

—"সখি দেখ দেখ গোরা নটরায়।
বদন শারদশশী, তাহে মন্দ মন্দ হাসি,
কুলবতী হেরি মুরছায়॥ ধ্রু
চাঁচর চিকুর মাথে, চম্পক কলিকা তাতে,
যুবতীর মন মধুকর।
শ্রুতি পদ্মযুগ মূলে, কণক কুণ্ডল দোলে,
পক্ক বিম্ব জিনিয়া অধর॥
কম্বুকণ্ঠে মৃদুবাণী, সুধার তরঙ্গ খনি,
হরি-রসে জগত ডুবায়।
করিবর-কর জিনি, বাহুযুগ সুবলনী,
অঙ্গদ বলয় শোভে তায়॥
বক্ষ হেম-ধরাধর, নাভিপদ্ম সরোবর,
মধ্য হেরি কেশরী পলায়।
অরুণ বরণ সাজে, চরণে নূপুর বাজে,
বাসুঘোষ গোরাগুণ গায়॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি বিশিষ্ট অভিনিবেশের সহিত সমগ্র গানটি শুনিলেন—প্রিয় সখি কাঞ্চনার বক্ষ হইতে মলিন বদনখানি তুলিয়া গৌরানুরাগ-রঞ্জিত নয়নে প্রিয়সখির প্রতি একবার চাহিলেন মাত্র—কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ গৌর-প্রেমাবেশে কাঁপিতেছে—পুনরায় সখিক্রোড়ে তিনি প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন—ধীরে ধীরে প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ-কামোদ।

"দেখহ নাগর নদীয়ায়।
গজবর গতি জিনি, গমন সুমাধুরী,
অপরূপ গোরা দ্বিজ রায়॥ ধ্রু॥
চরণ-কমল যেন, ভকত ভ্রমর গণ,
পরিমলে চৌদিকে ধায়।

মধু মদে মাতল, সব মহীমণ্ডল,
দিগ্‌বিদিক নাহি পায়॥
রসভরে গর গর, অধর মনোহর,
ঈষৎ হাসিয়া ঘন চায়।
অপাঙ্গ ইঙ্গিৎ বর, নয়ান কোণের শর,
কত কোটি কাম মুরছায়॥
আভরণ বহু মণি, বসন অরুণ জিনি,
বাজন নুপুর রাঙ্গা পায়।
জগত বিজয় ধ্বনি জয় গোরা দ্বিজমণি
বাসুদেব ঘোষ গুণ গায়॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখি-বক্ষে মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া আছেন—কিন্তু গৌরগুণগান শ্রবণে তাঁহার প্রাণমন অত্যন্ত সুস্থির আছে। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—গৌর-বিরহিণীগণ আহারনিদ্রাজয়ী—তাঁহাদের কোনরূপ দেহানুসন্ধান নাই।

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি অফুরন্ত গৌররসের প্রকাণ্ড একটী উৎস—তাঁহাকে গৌরদাসদাসীগণ গান-পাগ্‌লা মেয়ে বলেন—কেহ কেহ গৌর-পাগলিনীও বলেন। তিনি বিরহিণী প্রিয়াজির অন্তরের খবর রাখেন—তাঁহার গৌর-বিরহ-জর্জ্জরিত মনপ্রাণ সুস্থির করেন—এক দণ্ডও তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হন না—প্রিয়াজিও তাঁহার প্রাণসখি কাঞ্চনাকে প্রাণতুল্য দেখেন—যেমন স্বরূপদামোদর নীলাচলের গম্ভীরা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রাণস্বরূপ ছিলেন—তেমনি নদীয়ায় মহাগম্ভীরা-মন্দিরে গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রাণস্বরূপা হইয়াছেন সখি কাঞ্চনা।

সখি কাঞ্চনা প্রেমানন্দে আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ-তুড়ি।

—"কুসুমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপ বৃন্দ॥
ললাট ফলক, পটির তিলক, কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, কুণ্ডলে মণ্ডিত, গণ্ডমণ্ডল রাজে॥
ওরূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম, সরম ভরম মাথাতে পড়িল বাজ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিত, ভাঙর ভঙ্গিত, অনঙ্গ রঙ্গিত সঙ্গ।
মদন কদন, হোয়লু সদন, জগত যুবতী অঙ্গ॥
অধর বন্ধুক, মাধ্বিক অধিক, আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে, কলসে কলসে, বময়ে অমিয়া রাশি॥
কুন্দ দাম, ঠামহি ঠাম, কুসুম সুষম পাঁতি।
ততহি লোলুপ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া পড়য়ে মাতি॥
হিরণ হীর, বিজুরী থির, শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ, হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে॥
কাম চমক, ঠাম ঠমক, কুন্দন কণক গোরা।
মত্ততা সিন্ধুর, গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ চরণ, খঞ্জন গঞ্জন, মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দুনিন্দন, নখর ছন্দন, বলি বলরাম দাস॥"—
গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

এইবার ধীরে ধীরে বিরহিণী প্রিয়াজি আপনা আপনিই উঠিয়া বসিলেন—তিনি উদাস নয়নে ইতি উতি চাহিতেছেন—যেন কাহাকেও খুঁজিতেছেন—সখি কাঞ্চনা সময় বুঝিয়া পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

কামোদ।

—"কাঞ্চন দরপন, বরণ সুগোরা রে,
বরবিধু জিনিয়া বয়ান।
দু'টি আঁখি নিমিখ, মুকথ-বর বিধিরে,
না দিলে অধিক নয়ান॥
হরি হরি! কেনে বা জনম হৈল মোর।
কণক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ সুবলনী,
হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর॥ ধ্রু॥
আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত,
মালতী কুসুম সুরঙ্গ।
হেরি গোরা মুরতি, কত শত কুলবতী,
হানত মদন-তরঙ্গ॥
অনুক্ষণ প্রেম ভরে, সে রাঙ্গা নয়ন ঝরে,
না জানি কি জপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনু সে চরণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
নদীয়া নগরী, সেহ ভেল ব্রজপুরী,
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোরে নাথ অঙ্গী করু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
কহে দীন নরোত্তম দাস॥"—

গৌরবিরহিণী গৌরবল্লভা গৌরানুরাগরঞ্জিত নয়নে প্রিয় সখী কাঞ্চনার বদনের প্রতি একবার চাহিতেছেন—পুনরায় উদাস নয়নে নয়ন ঘুরাইতেছেন কোন পরম প্রিয় বস্তুর অনুসন্ধানে—ভজন-মন্দিরের সর্ব্বস্থান তাঁহার চঞ্চল নয়নের সপ্রেম দৃষ্টিতে মুখরিত হইল। যেখানেই তাঁহার শুভদৃষ্টি পড়িতেছে—সেই খানেই তাঁহার প্রাণ-গৌরাঙ্গের মধুময় স্মৃতিচিহ্ন সকল নয়নপথে পতিত হইতেছে—গৌরময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ত্রিজগত যেন গৌরময় দেখিতেছেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রেমানন্দে টলমল করিতেছে—সঙ্গীত-রসজ্ঞা গৌর-প্রেম-পাগলিনী সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌরপদ-সমুদ্র বিশেষ। তিনি পুনরায় আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ-ধানশী।

—"জাম্বুনদচয়, রুচির গঞ্জন, ঝলমল কলেবর কাঁতি।
চন্দনে চর্চ্চিত, বাহু মণ্ডিত, গজেন্দ্র শুণ্ডক ভাতি॥
পেখনু গৌর কিশোর!
নটনাগর হেরইতে আনন্দ ওর।ধ্রু॥
ভাবে তনু ভোর, অন্তর গরগর, কণ্ঠে গদগদ বোল।
নদীয়াপুর ভরি, অশেষ কৌতুক করি, নাচত রসিক সুজান।
বিদির বৈদগধি, বিনোদ পরিপাটি, দিন রজনী নাহি মান॥
সুরধুনী পুলিনে, তরুণ তরুমূলে, বৈঠে নিজ পরকাশে।
বাসুদেবঘোষ গায়,পাওল প্রেমদানে,সিঞ্চিল সব নিজ দাসে॥
গৌর-পদ তরঙ্গিণী।

পুনরায় সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজিকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন,—নিজ বসনাঞ্চলে পরম প্রেমভরে তাঁহার কমল নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিলেন। ঘন ঘন প্রেমাশ্রুবর্ষণে প্রিয়াজির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইয়াছে—সখি কাঞ্চনা নিজ বসনাঞ্চলে প্রিয় সখির সর্ব্বাঙ্গ মুছাইয়া দিতেছেন—সখি অমিতাও গৌরবল্লভার বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ সেবায় আছেন—তিনি আজ নির্ব্বাক্ দর্শক ও শ্রোতা—তিনি এক একবার বিরহিণী গৌরবল্লভার বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিতেছেন—পুনরায় সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি তাঁহার সকরুণ প্রেমদৃষ্ট পড়িতেছে—প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গ তাঁহার চটুল চঞ্চল নয়নদ্বয়ের লক্ষ্যস্থল। তিনি দেখিতেছেন সখি কাঞ্চনার অঙ্গে একে একে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের অদ্ভুত বিকারাবলী প্রকাশ পাইতেছে—আজ যেন গৌরপাগলিনী কাঞ্চনমালা গৌর-রূপ-গুণ-গানে শতমুখী হইয়াছেন। সখি কাঞ্চনার প্রতিই সখি অমিতার লক্ষ্য অধিকতর—সখি অমিতা ভাবিতেছেন—সখি কাঞ্চনা কে?

পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সেই গোপী সেই কৃষ্ণ পরম বিরোধ"—

সখি অমিতা ভাবিতেছেন—

—"সেই নাগরী, সেই গৌর পরম বিরোধ।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গলীলা পরম দুর্ব্বোধ॥"—

এক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে—গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে তখন ভৈরবী রাগিণীতে অপূর্ব্ব প্রভাতী কীর্ত্তনধ্বনি উঠিল,—কীর্ত্তনীয়ার দল গাহিতেছে,—

যথারাগ।

—"সোঙর নন, গৌর সুন্দর, নাগর বনওয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু, করুণা-সিন্ধু ভকত বৎসলকারী॥ধ্রু॥
বদন চন্দ, অধর রন্দ, নয়নে গলত প্রেমতরঙ্গ,
চন্দ্রকোটি ভানু মুখ শোভা নিছুয়ারী।
কুসুম শোভিত, চাঁচর চিকুর, ললাট তিলক নাসিকা উপর,
দশন মোতিম, অমিয়া হাস—দামিনী ঘনয়ারী॥
মকর কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড, মণি কৌস্তভ দীপ্তকণ্ঠ,
অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভা অতি ভারি।
মালা চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ,
চন্দন বলয়, রতন নূপুর, যজ্ঞসূত্রধারী॥
ধায়ত গায়ত ভকতবৃন্দ, কমলা সেবিত পাদদ্বন্দ্ব,
ঠমকে চলত মন্দ মন্দ—যাউ বলিহারি।
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌরচরণে করত আশ,
পতিতপাবন নিতাইচাঁদ, প্রেমদানকারী॥"—
গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

প্রভাতী কীর্ত্তনের মধুর ধ্বনি শুনিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় সহ বিরহিণী গৌর-বল্লভা ধীরে ধীরে মৃদু পাদবিক্ষেপে ভজন-মন্দির হইতে বাহির বারান্দায় আসিলেন—তখনও প্রভাত হয় নাই—দূর হইতে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে এবং পতিতপাবনী সুরধুনিকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া প্রিয়াজি প্রভাতী কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে দরদরিত প্রেমধারা পড়িতেছে—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অপরূপ রূপ-সাগরে তিনি যেন ঝম্প প্রদান করিয়াছেন—প্রভাতীকীর্ত্তন পদটীর বর্ণিত তাঁহার প্রাণ-

বল্লভের অপরূপ রূপরাশি যেন তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছে—তিনি সেখানে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন।

এই ভাবে অনেকক্ষণ গেল—গঙ্গাতীরে তরুশিরে প্রভাতের বালারুণ-রবিকিরণ পড়িয়া অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা ধারণ করিয়াছে—পূর্ব্বাকাশে অরুণবর্ণ বালসূর্য্য প্রকাশিত হইয়া জগজ্জীবের মন হরণ করিতেছে—সুমধুর বিহগকাকলিতে গঙ্গাতট মুখরিত হইয়াছে—কদাচিত কেহ প্রাতঃস্নানের উদ্দেশে গৌরকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে আসিতেছেন।

বিরহিণী প্রিয়াজির নীরব করুণ ক্রন্দনের মর্ম্মভেদী ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মর্ম্মী সখিদ্বয়ের কর্ণে হঠাৎ গেল—তিনি সেখানে বসিয়াই অস্ফুট করুণ ক্রন্দনের সুরে বিলাপ করিতেছেন,—

যথারাগ।

—"কে মোরে মিলায়ে দিবে গৌর-রতন।
জীবের জীবন গোরা মোর প্রাণধন॥
কে মোরে খুঁজিয়ে দিবে হারান রতন।
গৌর-হারা হয়ে মোর গেল যে জীবন॥"—
—"কোথা গেলে গৌর পাব বোলে দে তোরা।
হৃদয় রতন মোর পরাণ-গোরা।"—গৌর-গীতিকা।

এইরূপ মর্ম্মভেদী ও প্রাণঘাতী হৃদিবিদারক বিলাপ করিতে করিতে বিরহিণী গৌরবল্লভা পরমপ্রেমভরে সখিদ্বয়ের হস্ত দুই খানি নিজ হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া করুণ হইতেও সকরুণস্বরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

—"বল সখি! বল বল কোথা আছে সে।
গৌর-বিরহে মোর প্রাণ যায় যে॥"—
দাসী হরিদাসী কহে চরণে ধরি।
(একবার) দেখা দাও প্রিয়াজীকে হে গৌরহরি॥"—

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজির মুখে এরূপ করুণ হইতেও সকরুণ বিলাপগীতি শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ কপালে নিদারুণ করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল। বিরহিণী গৌরবল্লভা প্রেমাকুল নয়নে তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন—সে চাহনির মর্ম্ম—

—"বল সখি বল বল কোথা আছে সে।
গৌর-বিরহে মোর প্রাণ যায় যে॥"—

সখি কাঞ্চনা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি পরম প্রেমভরে নিজ বসনাঞ্চলে বিরহিণী প্রিয়সখির দরদরিত প্রেমাশ্রুজলসিক্ত কমল নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিয়া বাম হস্তে পরম স্নেহভরে তাঁহার কণ্ঠদেশ নিজ বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া প্রেম গদগদ বচনে কহিলেন,—

যথারাগ।

—"অনুরাগে ডাক্‌লে সখি! গৌর আসিবে।
ডাকার মত তুমিই ডাক আমরা পারিনে॥
(তোমার মত) অনুরাগে প্রেমাবেগে কাঁদ্‌তে পারিনে॥
অকপটে পরাণ খুলে ডাক্‌তে পারিনে॥
গৌর তোমার তুমি গোরার পরাণ রতন।
অন্তরে বাহিরে দেখ প্রাণ-রমণ॥
গৌরময়ী তুমি সখি গোরা-প্রাণধন।
জগতময় গৌর দেখ তুমি সর্ব্বক্ষণ॥
দাসী হরিদাসী শুনে এ সব বচন।
গুরুকৃপা সখি মুখে করিয়ে যতন॥"—গৌর গীতিকা।

সখি কাঞ্চনার কথাগুলি বড়ই মধুময়—বড়ই প্রাণারাম। বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাবেশে সকলি শুনিলেন—কিন্তু আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন—সখিদ্বয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

—'বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখ-রঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥"

অর্থ—যাঁহার কৃপায় আমার ন্যায় জড় অর্থাৎ চলচ্ছক্তি-হীন ব্যক্তিও লেখন রূপ রঙ্গস্থলে অকস্মাৎ বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতেছে—সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামিপাদের পূত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জীবাধম বৃদ্ধ ও মূর্খ লেখক সেই দৈন্যাবতার শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব ও লীলা-লেখকের সুরে সুর মিলাইয়া সেই কথারই পুনরুক্তি করিতেছে। অতএব হে কৃপানিধি গৌরভক্ত পাঠকবৃন্দ! কৃপাময়ী পাঠিকাবৃন্দ! করুণাময় শ্রোতৃবৃন্দ! তাহাকে কৃপা করুন,—

প্রণত হইয়া বন্দি সভার চরণ।
যার শিরে লাথি মোর মুক্তি অভাজন॥
মূকে কবিতা লিখে চরণ স্মরণে।
গিরি লঙ্ঘে পঙ্গু,—অন্ধ দেখে তারাগণে॥
যো হেন মূর্খে লিখে প্রিয়াজি-চরিত্র।
অচিন্ত্য শক্তির বল—এ কোন বিচিত্র॥
পরা শক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া গোরা-প্রাণেশ্বরী।
তাহান্ কৃপায় লিখায় মোরে কেশে ধরি॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

সিলং (আসাম)
২০এ ভাদ্র ১৩৩৯ সাল
সোমবার পঞ্চমীতিথি
রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(২৫)

—"যদংশ মূর্ত্তিঃ পরমোর্দ্ধলোকে
বৈকুণ্ঠ সঙ্গে বিলসদ্ধরিত্রী।
অতশ্চ শাস্ত্রে কথিতা মহদ্ভিঃ
ভূবোংশ রূপাপি যথার্থবিদ্ভিঃ॥"—

—"বিষ্ণুপ্রিয়া-লীলাসিন্ধু অনন্ত অপার।
এক বিন্দু স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার॥"—

নদীয়ার মহাগম্ভীরার নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতার সহিত গভীর নিশীথে গৌরকথা-রসসাগরে নিমগ্ন আছেন—গৌরবিরহ-তরঙ্গায়িত এই রস-সাগর যখন কোন বিশিষ্ট কারণে উদ্বেলিত হইয়া উঠে-তখনই গৌর-বিরহিণীত্রয়ের অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ ভক্ত-লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়। বিরহানুভবরূপ যন্ত্র এবং রাগানুগা-ভজন সাধনের মহামন্ত্রের প্রবল প্রভাবে একান্ত গৌরভক্তজন বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনের অধিকারী হন। বেদাতীত এবং শাস্ত্র-শাসনাতীত এই যে নিগূঢ় ভজনরহস্য, ইহা শিববিরিঞ্চিরও অগোচর। রাগানুগা ভজনপন্থার যাঁহারা পথিক এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গকৃপাবলে যাঁহারা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধনে ধনী,—তাঁহারাই এই নিগূঢ় বিপ্রলম্ভ-রসনায় আস্বাদন করিয়া প্রেমানন্দ সাগরে মগ্ন হইতে পারিবেন। সাধারণ ভক্ত সাধকের জন্য এ সকল অপূর্ব্ব, বেদগোপ্য অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় লীলা-রহস্যপূর্ণ ভক্তিসন্দর্ভ লিখিত হইতেছে না।

মাঘ মাস—শুক্ল পক্ষ—বসন্ত-পঞ্চমীতিথি—নদীয়ার নীরব নিশীথ গগনে চন্দ্রোদয় হইয়াছে—কিন্তু সেদিনকার চন্দ্রালোকে তেমন যেন স্নিগ্ধতা নাই—চন্দ্রের চন্দ্রবদনে যেন একটী বিষাদের ঘন ছায়া পড়িয়াছে—জ্যোৎস্নালোকও ক্ষীণ এবং তারকারাজিও ম্লান বোধ হইতেছে। মাঘ মাসে শীতের প্রকোপ গুরুতর—কথায় বলে "মাঘের শীতে বাঘ কাঁপে"—এখন শীতের প্রতাপ সেই রূপই বটে। সুরধুনী-তীরে জন মানব নাই—তীরবর্ত্তী বৃক্ষলতাবলী শিশিরস্নাত—যেন গৌরবিরহে তাহারাও শোকমগ্নমান—গঙ্গাসলিল নিস্তরঙ্গ—পবনদেবের স্তম্ভভাব—মধ্যে মধ্যে গভীর সলিলে মৎস্যাদি জলজন্তুগণের উত্থান ও সঞ্চরণ জনিত কখন কখন প্রবল তরঙ্গোচ্ছাসের দূরাগত শব্দ শ্রুত হইতেছে—তাহাতেও যেন গৌরবিরহিণীগণের গৌর-বিরহোত্থ দীর্ঘ-শ্বাসের ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছে। নদীয়ার নিশীথ-গগনে, গঙ্গা-সলিলে, অনিলে, বনে ও উপবনে সর্ব্বত্রই যেন একটা গভীর বিষাদের ছায়া দৃষ্ট হইতেছে। গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্তপুর-প্রদেশ জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতেও যেন অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে রাত্রিতে একটী ক্ষীণ ঘৃতদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছিল—তাহাও যেন নির্ব্বানোন্মুখ! গৌরশূন্য নদীয়ার নরনারী, জীবজন্তু ও স্থাবর জঙ্গমাদি কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই যেন আজ বিশিষ্ট অবসাদগ্রস্থ।

আজ গৌর-বক্ষবিলাসিনী সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ জন্মোৎসবের দিন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার স্নেহময়ী জননীর আদেশে স্বয়ং তাহার প্রাণবল্লভার জন্ম-তিথির রীতিমত পূজা ও উৎসব করিতেন—তিনি মাতৃভক্ত-শিরোমণি ছিলেন—মাতৃ আশীর্ব্বাদ ও আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার বয়স্যগণের সহিত পরম কৌতুকে এই উৎসবে যোগ দিতেন। প্রতি বৎসর এই উৎসবটী শচী-আঙ্গিনায় মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইত। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের বয়স্যগণ এবং তাঁহার সম-বয়স্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ এই জন্য তাঁহাকে কত না উপহাস বিদ্রূপ করিতেন। নদীয়া-রমণী-বৃন্দ যূথে যূথে এই আনন্দোৎসবে যোগদান

করিতেন—নদীয়া-নাগরী-বৃন্দ প্রভুপ্রিয়াজিকে লইয়া কত না হাস্যপরিহাসাদি প্রেমলীলারঙ্গ করিতেন। শচী-আঙ্গিনায় এই শুভদিনে অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত। নিমাই পণ্ডিত তখন নামজাদা অধ্যাপক শিরোমণি—তাঁহার উপাধি ছিল শ্রীবিশ্বম্ভর বিদ্যাসাগর—তিনি পরমানন্দে তাঁহার প্রাণবল্লভার জন্মোৎসবে প্রতি বৎসর বহু ব্যয় করিতেন। তাঁহার মাতৃ-সন্তোষই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

আজ সেই শুভদিন—ভুবনমঙ্গলা গৌর-বল্লভা সনাতন-নন্দিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আজ শুভ জন্মতিথিপূজা এবং উৎসবের দিন। শচীমাতার প্রকট কালে তিনি যেমন তাঁহার সন্ন্যাসী-পুত্রের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনায় নীরবে ও অনাড়ম্বরে সর্ব্বমঙ্গলা গৌর-জন্মতিথি গৌরপূর্ণিমার আরাধনা করিতেন—তদ্রূপ গৌর-বিরহিণী তাঁহার পুত্রবধূটীর জন্মতিথি বসন্ত-পঞ্চমী তিথির দিন চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া নিজজন লইয়া তিনি স্বয়ং নীরবে এই পুণ্যতিথিরও যথারীতি আরাধনা করিতেন। এত দুঃখ কষ্ট ও নিরানন্দের মধ্যেও প্রাণপ্রিয়তম ও প্রিয়তমা পুত্র ও পুত্রবধূটীর জন্মতিথির পূজা ও উৎসব দুইটী পুত্রবৎসলা পরম স্নেহময়ী শচীমাতার জীবদ্দশায় কোন বৎসরই বাদ পড়ে নাই। গৌর-বিরহিণী পুত্রবধূর শত বাধা ও নিষেধ সত্ত্বেও পুত্রবিরহ-কাতরা অতি-বৃদ্ধা শচীমাতা বসন্ত পঞ্চমীর উৎসব করিতে বিরত হন নাই। নদীয়াবাসী গৌরভক্তবৃন্দ বিষ্ণুশক্তি সরস্বতীপূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া সনাতন-নন্দিনী গৌর-বল্লভার শুভ জন্মতিথি বসন্ত-পঞ্চমী তিথির আরাধনা প্রতি বর্ষে বর্ষে করিতেন।

আজ সেই সর্ব্বমঙ্গলা বসন্ত পঞ্চমী তিথি—জীব জগতের পক্ষে আজ বড় শুভদিন। নির্জ্জন ভজনানন্দিনী—মহা-তপস্বিনী গৌর-বিরহিণী সনাতন-নন্দিনীর আদেশে এই উৎসবটি শচীমাতার অপ্রকটের পর হইতেই নদীয়ায় বন্ধ হইয়াছে। কঠোর তপস্যাব্রতাবলম্বিনী নির্জ্জন ভজন-কারিণী গৌরবল্লভার এই নির্ম্মম কঠোর আদেশ গৌরভক্তগণ সকলেই পালন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—এত জন্যই আজ গৌরশূন্য নদীয়ার গৌরভক্তগণের গৃহে গৃহে নীরব হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে—গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ একান্ত ভক্তজন নীরবে নয়নজলে এই সর্ব্বমঙ্গলা বসন্ত-পঞ্চমী তিথির আরাধনা করিতেছেন—সকলেই আজ উপবাসী আছেন। এই জন্যই গৌরশূন্য নদীয়ার সর্ব্বত্রই একটা নীরব ও মর্ম্মন্তুদ মর্ম্মবেদনায় অস্ফুট কাতর ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে।

গৌরশূন্য গৌর-গৃহ-দ্বারে শিব-বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত গৌরপদাঙ্কিত-ধূলি-কণা-চুম্বন-লালসোদ্দীপ্ত-ব্যাকুলিত-হৃদয়ে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সুর-তরঙ্গিণী তাঁহার গৌরবিরহব্যঞ্জক নীরব নয়নধারারূপ তরঙ্গোচ্ছ্বাসে গৌরগৃহের বহিরাঙ্গণের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ধৌত বিধৌত করিয়া তাঁহার গৌর-বিরহ-দুঃখ কথঞ্চিৎ দূর করিতেছেন—ভাবুক গৌরভক্তবৃন্দের যেন মনে হইতেছে গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া গৌর-বিরহ-বিধুরা গৌর-প্রেম-পাগলিনীর ন্যায় গৌরশূন্য গৌর-গৃহদ্বারে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া মনদুঃখে নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া নয়ন-সলিলে ভূমিতল সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত করিয়া কাতর ক্রন্দনস্বরে বিলাপ করিতেছেন। সুরতরঙ্গিণীর এই করুণ ক্রন্দনের অস্ফুট 'হা গৌরাঙ্গ" ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিতেছে গৌরবিরহিণী গৌর-বল্লভার নির্জ্জন ভজন-মন্দিরের অভ্যন্তরে। মর্ম্মী সখিদ্বয় সহ বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উৎকর্ণ হইয়া সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে ও উদাস নয়নে ভজন-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া ইতি উতি চাহিতেছেন। মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা সকলি বুঝিতেছেন—কিন্তু কি বলিবেন ও কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় বিরহিণী গৌর-বল্লভা স্বয়ং সেই গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—

—"সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈনু প্রীত, হৈল দুঃখ বিপরীত,
এবে যায়,—না রহে পরাণ।" —চৈঃ চঃ।

নীলাচলের গম্ভীরা-মন্দিরে বসিয়া গভীর নিশীথে রাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহার পরমান্তরঙ্গ দুইটী নিত্যপার্ষদ-ভক্ত স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দের (ললিতা ও বিশাখা) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন। তিনি অতিশয় কাতরভাবে পরম প্রেমভরে স্বরূপদামোদরের হস্ত ধারণ করিয়া ঠিক এই সময়ে এইভাবেই এইরূপ আত্মবিলাপ করিতেছেন। নীলাচলে তাঁহার গভীর গম্ভীরা-লীলা এবং নদীয়ায় তাঁহার বিরহিণী প্রাণ-বল্লভার সুগভীর মহাগম্ভীরা-লীলা একই

বস্তু—শক্তি ও শক্তিমান অদ্বয়তত্বের বিরহ-লীলারঙ্গ একই জাতীয়।

সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার প্রাণসখির বদনের প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া দেখিলেন—তিনি আজ পরম বিরহ-বিহ্বলা—তাঁহার বদন মলিন হইতেও মলিনতর বোধ হইতেছে—সোনার বরণ কালিমাকার ধারণ করিয়াছে—কমল নয়নদ্বয়ে শতধারা বহিতেছে—রুক্ষকেশ জীর্ণশীর্ণ, —দেহযষ্টিভারে তিনি যেন কাতরা। তাঁহার শেষ কথা বড়ই মর্ম্মান্তিক—

—"এবে যায় না যায় পরাণ"—

মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। প্রিয়াজির এই শেষ কথাটিতে—তাঁহাদের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। সখি কাঞ্চনার মত সুচতুরা রমণীও আজ যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া একবার প্রিয়াজির বদনের প্রতি—আর একবার সখি অমিতার বদনের প্রতি কাতর ভাবে চাহিতেছেন—কি বলিয়া প্রাণ সখিকে বুঝাইবেন—কি করিয়া সান্ত্বনা দিবেন, তাই ভাবিয়াই যেন আকুল হইয়াছেন। পরম দয়াময়ী প্রিয়াজি মর্ম্মী সখির অন্তর বুঝিয়াই অন্যকথা বলিবার অবসর না দিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের চরণে করযোড়ে আত্ম নিবেদন করিতেছেন—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে!

প্রাণ যে গেল মোর কি করি আমি।
অন্তরে এস ওহে অন্তরযামি॥
(মুত) দিবস গত হয়, মনেতে বাড়ে ভয়,
বদনে হায় হায় বিষাদ-বাণী॥
হৃদয় মাঝে মোর, ঝটিকা বহে ঘোর,
পাব কি না পাব (ঐ) চরণখানি।
কোথা যে আছ তুমি, জানিনা তাহা আমি,
জানিলে ছুটে গিয়ে ধরিয়া আনি॥
প্রাণ যে গেল মোর কি করি আমি॥"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভার স্বহস্তঅঙ্কিত তাঁহার প্রাণবল্লভের রূপসাম্য চিত্রপটখানি তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে—পাদুকা দু'খানি তন্নিম্নে বিরাজমান—তিনি সেই চিত্রাঙ্কিত প্রাণবল্লভের শ্রীচরণকমলদ্বয় ও শ্রীপাদুকাদ্বয় প্রেমাবেশে কম্পান্বিত ক্ষীণ হস্তদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে বারম্বার কহিতেছেন,—

—"পাব কি না পাব ঐ চরণ খানি"—

দরদরিত প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—নির্নিমেষ নয়নে তিনি তাঁহার প্রাণ-বল্লভের রাতুল পাদপদ্মের প্রতি চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল—অতঃপর তিনি পরম প্রেমাবেশে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের পাদুকা দু'খানি পরমাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রেমাশ্রুনয়নে প্রেমগদগদ বচনে কহিতেছেন—

প্রাণকান্ত হে!

—"কবে যে পাব দেখা কে বলে দিবে।
তোমারি কাছে মোরে কে ল'য়ে যাবে॥
পরাণ যে কাঁদে মোর, হেরিতে মনচোর,
এমন শুভদিন কবে যে হবে।
কহিব মন-কথা, গাহিব গুণ-গাথা,
পড়িয়ে পদতলে বিভোর ভাবে॥
হেরিব মুখ-খানি, কবে তা নাহি জানি,
দিবস নিশি আমি মরি যে ভেবে।
(তোমায়) কবে যে পাব দেখা কে বলে দিবে॥"—

গৌর-গীতিকা।

এইভাবে কিছুক্ষণ আত্মবিলাপ করিতে করিতে বিরহিণী গৌরবল্লভা অকস্মাৎ নীরব হইলেন। তিনি এক্ষণে ধ্যানমগ্না—সমাধিস্থা। মর্ম্মী সখিদ্বয় চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে নিকটে বসিয়া সকলি দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন—কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তাঁহারা আজি বিরহিণী গৌরবল্লভাকে দেখিতেছেন যেন একটী মূর্ত্তিমতী গৌরপ্রেমের প্রতিমা—মূর্ত্ত গৌর-প্রেমময়ীর শ্রীমূর্ত্তিখানি আজ যেন গৌর-বিরহ-রসে টলমল করিতেছে—তাঁহার গৌরানুরাগরঞ্জিত নয়নদ্বয়ে আজ যেন কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন তাঁহাদের প্রাণসখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিপ্রলম্ভরসের যেন একটী মূর্ত্ত বিগ্রহ—ধন্য গৌরপ্রেমের সাধনা। ধন্যাতিধন্য গৌরপ্রেমের এই অপূর্ব্ব সাধিকার অত্যদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় প্রেমচেষ্টা!! ধন্য গৌরবিরহিণী সনাতন-নন্দিনীর গৌর-প্রেমের অভূতপূর্ব্ব মহা মহিমা!!

এইভাবে কিছুক্ষণ গেল—গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি আপনা আপনিই আত্মসম্বরণ করিলেন—তিনি ধীরে ধীরে

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ভজন-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে উদাসনয়নে একবার চাহিলেন,—পুনরায় করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন,—

প্রাণ সর্ব্বস্বধন হে !
চরণে ধরি তব মিনতি করি।
দাসীরে দাও ওহে চরণ-তরি ॥
দিবস গণি গণি, বরষ অনুমানি,
কিসের আশে আমি জীবন ধরি।
দিলে না তুমি দেখা, ও মোর প্রাণ-সখা,
বিরহে তব আমি পরাণে মরি ॥
বাঁচাতে যদি চাও, আসিয়ে দেখা দাও,
পরাণ নাথ ওহে গৌরহরি।
চরণে ধরি তব মিনতি করি ॥"—
গৌর গীতিকা।

পুনরায় বিরহিণী গৌরবল্লভা সমাধিস্থা হইলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্তা হইলেন—তিনি নিজ সিদ্ধাসনে নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন—তাঁহার নয়নে প্রেমনদী বহিতেছে—পরিধান বসন অসম্বর—সখি কাঞ্চনা তখন বসন ঠিক করিয়া দিলেন—নিজ অঞ্চলে প্রিয়সখির অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরেই বিরহিণী প্রিয়াজির প্রেমমূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি তখন পুনরায় প্রেমগদগদভাবে আত্মনিবেদন করিলেন,—

জীবন-ধন হে !
—"পরাণ-ধন মোর কি করি বল।
দয়া করি ওহে নাথ ! ছাড় হে ছল ॥
একটী কথা ব'লে, যাও হে তুমি চলে,
নয়নে রাখ মোর নয়ন-জল।
নির্জ্জনে কাঁদি আমি, আড়ালে দেখ তুমি,
মিলন হ'তে মোর বিরহ-ভাল।
কাঁদিলে দেখা পাই, হাসিলে ভুলে যাই,
নাই যে অভাগীর সাধন-বল।
পরাণ ধন মোর কি করি বল ॥"—
গৌর-গীতিকা।

প্রাণবল্লভের ক্ষণিক আবির্ভাব-দর্শনে বিরহিণী প্রিয়াজির উৎকট গৌর-বিরহ-জ্বালা নির্ব্বাপিত হইতেছে না—প্রাণের আশা মিটিতেছে না—তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—

(এরূপ) "মিলন হ'তে মোর বিরহ ভাল"—

তাঁহার স্বহস্তঅঙ্কিত তাঁহার প্রাণবল্লভের রূপসাম্য চিত্রপটখানিতে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অপরূপ রূপরাশি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণিমেষ নয়নে দর্শন করিতেছেন, আর অতিশয় কাতরকণ্ঠে আত্মনিবেদন করিতেছেন,—

প্রাণ গৌরাঙ্গ হে !
—"নয়ন ভরি আমি ওরূপ দেখি।
যত দেখি তত আমি দেখিতে শিখি ॥
(রূপের) মাধুরী-গুণ-গানে, (গৌর) নামেরই সুধাপানে,
পরাণ ভরে উঠে ঝরে যে আঁখি।
পরাণ প্রিয়তম, জীবনধন মম,
তোমারি কাছে আমি বিরহ শিখি ॥
একবার ভুলে ভুলে, নদীয়ায় এস চলে,
দেখা দিতে এ দাসীরে জনম দুখী।
দাসী হরিদাসী ভণে, নাগরীর কৃপা বিনে,
গৌর-বিরহ-গাথা কেমনে লিখি।
যত ভাবি তত আমি কাঁদিতে শিখি।"—
গৌর-গীতিকা।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল—এত অধিক কথাপূর্ণ আত্মনিবেদন তিনি পূর্ব্বে কখন করেন নাই। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের কাষ্ঠপাদুকা দু'খানি দুই হস্তে পরম প্রেমাবেশে বক্ষে ধারণ করিয়া অঝোর নয়নে অনবরত ঝুরিতে লাগিলেন—সে নীরব প্রেমক্রন্দনের আর বিরাম নাই। গৌরবল্লভার কমল নয়নদ্বয়ে যেন প্রেমনদী বহিতেছে—তাহার খরস্রোতে সুধু "শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে নদে ভেসে যায়" এরূপ নহে—সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে।

আজ যেন বিরহিণী গৌর-বল্লভার হৃদয়ের আত্মবিলাপের করুণ-কাহিনীর অফুরন্ত উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাঁহার গৌর-বিরহ-সমুদ্র আজ যেন উথলিয়া উঠিতেছে—মর্ম্মী সখিদ্বয়কে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তিনি পুনরায় আত্মবিলাপ করিতেছেন—

প্রাণবল্লভ হে!

রহি রহি মোর প্রাণ কাঁদে কেন
(তব) রূপরাশি যবে মনে পড়ে।
রহি রহি আমি চমকিয়া উঠি
(মোরে) ডাকে যেন কেহ প্রেমভরে॥
কে ডাকে আমারে কিসের কারণে
কোথা হ'তে আসে মধু-রব।
কিছুই জানি না কিছুই বুঝি না
মধুময় হেরি শুনিয়া সব॥
কে ডাকে আমারে মধুমাখা ভাষে
থাকিয়ে আড়ালে কহে কথা।
না দেয় দরশ না দেয় পরশ
ইথে মনে লাগে বড় ব্যথা॥
(আর যে) সহিতে পারি না বিরহ-বেদনা
দরশন বিনা প্রাণ যায়।
অবলা বধিয়ে কি কাজ সাধিবে
বল বল ওহে দয়াময়॥
(তোমার) অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক যে হবে
(তুমি) নারী-বধভাগী হবে কেন।
হরিদাসিয়ার মুণ্ডে পড়ু বাজ
আগে তুমি লহ তার প্রাণ॥"—

গৌর-গীতিকা।

এইরূপ প্রাণঘাতী করুণ-ক্রন্দনের স্বরে এরূপ মর্ম্মন্তুদ আত্মনিবেদন একমাত্র গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মুখেই শোভা পায়। বিদ্যাপতি ঠাকুর কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার উক্তি একটী পদে লিখিয়াছেন,—

—"কি করিব কোথা যাব সোয়াথ নাহি হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন্ দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হলে কার মুখ চাব॥"—

গৌরবক্ষবিলাসিনী সনাতন-নন্দিনীর এক্ষণে ঠিক এইরূপ অবস্থা। মহাভাবময়ী গৌর-বল্লভার এই সকল ভাবসম্পদ তাঁহারই নিজস্ব বস্তু এবং তিনি তাঁহার এই ভাব-সম্পদরাশি কলিহত জগজ্জীবকে অকাতরে দান করিতেছেন। তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মর্ম্মী সখিবৃন্দই এই অতুলনীয় ভাব-বৈভবের একমাত্র অধিকারিণী। নদীয়া-নাগরীবৃন্দের আনুগত্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব-সম্পত্তির অধিকার লাভ করিতে হইবে। ইহাতে বিশিষ্ট সাধনার প্রয়োজন।

গৌরবক্ষবিলাসিনী বিরহিণী প্রিয়াজি এক্ষণে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে—তিনি বিশিষ্ট অবসাদ-গ্রস্তা হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাকে অতি সাবধানের সহিত ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবা চলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্দ মন্দ গৌর-কীর্ত্তন চলিতেছে—গভীর নিশীথে নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরে গৌর বিরহিণীত্রয়ের এই যে গৌরানুরাগে গৌর উপাসনার নির্জ্জন ভজনপন্থা—এই যে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনের প্রেমময় প্রকৃষ্ট আদর্শ—এই যে, বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে মধুরভাবে উপাসনার প্রকৃষ্ট উপায়—ইহাই গৌরপ্রাপ্তির মূলমন্ত্র।

মর্ম্মী সখিদ্বয় গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। গৌর-কীর্ত্তনে তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব মৃদুমন্দ প্রেমগদ-গদ স্বর ও সুর হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর কীর্ত্তনের মধুর স্বরে গীত হইতে লাগিল—তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনপদটি তিনটিমাত্র শব্দ-সম্পদযুক্ত,—কিন্তু ইহার প্রভাব ও ঝঙ্কার বিশ্বব্যাপী। কীর্ত্তনটী এইরূপ শব্দিত ও উচ্চৈঃস্বরে সংগীত হইলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের বড়ই প্রীতিদায়ক হয়—বিরহিণী প্রিয়াজির সখিবৃন্দ "স্বপ্রিয় নামকীর্ত্ত্যা" শাস্ত্রবাক্য পালন করিতেন। তাঁহাদের সেই পরম প্রিয় নামটি—"**বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর**"। এই নামের এমনি একটি উন্মাদিনী শক্তি আছে যে বারম্বার এই মধু হইতেও মধুর নামটি উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করিবামাত্র গৌর-প্রেমোদয় হয়—এই নামের এমনি একটা গৌরপ্রেমোদ্দীপক অপূর্ব্ব মহিমা আছে যদ্দারা প্রেমাবতার, প্রেমময় ও প্রেমবশী গৌরভগবান তাঁহার এই নাম গায়কের প্রেমে আকৃষ্ট হন।

সখিদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে এই অপূর্ব্ব নামকীর্ত্তন করিতে-ছিলেন—অতঃপর গৌরানুরাগে এবং গৌরপ্রেমাবেশে নানাবিধ আখর দিয়া সখি কাঞ্চনা কীর্ত্তনের সুর পরিবর্ত্তন করিলেন—

যথারাগ।

—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ
নদেবাসীর প্রাণধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
এস এস হে ধ্রু॥

(ওহে) শচীমা'ার অঞ্চলের ধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
(মিশ্র) পুরন্দরের সর্ব্বস্বধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
(ওহে) বিশ্বরূপের প্রাণের ভাই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, অদ্বৈতের আনা ধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নিত্যানন্দের প্রাণসখা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নরহরির চিতচোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, গদাধরের প্রাণ বঁধুয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, সীতাদেবীর দুলালিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, মালিনীর নয়নমণি বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, মহামায়ার নয়নতারা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, সর্ব্বজয়ার প্রাণধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, ঈশানের বক্ষের ধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, মুরারির মনচোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, বাসুঘোষের গৌরনাগর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, হরিদাসের ভজন-সার বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, মুকুন্দের ভজনধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নদেবাসীর প্রাণ-গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নাগরীর প্রাণ-গোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, কীর্ত্তন-লম্পট গোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, হরিবোলা বালগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নদীয়া-বালক-সঙ্গী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নদীয়া-বালিকা-রঙ্গী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নবীন কিশোর গোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নদীয়া-বধূ প্রাণচোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, গঙ্গাতটচারী গোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নদীয়ার চাঁদ গোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, জগজন মনলোভা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, নাগরী-মন মোহনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, প্রাণগৌর বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, কাঞ্চনার চিতচোরা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
এস এস হে!
,, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
,, হরিদাসীর প্রাণধন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।"—

গৌরগীতিকা।

এই যে গৌরপ্রেমানুরাগের ডাক—এই যে মধুর প্রেমাহ্বানগীতি—এই যে প্রেমের অনুরাগা-ভজন,—ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন-কারণ এই অপূর্ব্ব নদীয়া-যুগল নাম ভজনপ্রভাবে অসাধনচিন্তামণি গৌরভগবানের দর্শন লাভ হয়, এরূপ অনুরাগের ডাকে তাঁহার আবির্ভাব হয়। গোস্বামীশাস্ত্র বলিতেছেন—

—"বৈশ্লেষিক ক্রমোদ্রেক বিবশীকৃত চেতসাং।
প্রেষ্ঠানাং সহসৈবাগ্রে ব্যগ্রঃ প্রাদুর্ভবেদসৌ॥"—

লঘুভাগবতামৃত।

অর্থ—বিচ্ছেদ ও বিরহজনিত ক্লেশাতিশয় বশতঃ অতি ব্যাকুলচিত্ত প্রিয়তম ভক্তজনের নিকট অতিশয় ব্যগ্র হইয়া অন্যের অলক্ষিতে সহসা যে ভগবানের প্রাদুর্ভাব, তাহাকে আবির্ভাব বলে। শ্রীভগবানের এইরূপ আবির্ভাবের ফলেই একান্ত ভক্তগণের ভগবদ্দর্শন লাভ হয়।

কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ। লীলাপ্রসঙ্গক্রমে তত্ত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে—কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

—"তত্ত্ব বলি না কর আলস!
যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে হয় সুদৃঢ় লালস॥"—চৈঃ চঃ।

যাহা হউক এসকল বিচার এখন এই লীলাগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

এক্ষণে কৃপানিধি পাঠক পাঠিকাবৃন্দ নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মধ্যস্থা গৌরানুরাগ-ভজনরতা গৌর-বিরহিণীত্রয়ের ভজন-সার সংগ্রহ করুন।

নীলাচলে সন্ন্যাসী ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ভক্তবশী গৌরভগবানকে তাঁহার অনন্যশরণ প্রেমিক ও রসিক ভক্তজনের অনুরাগের প্রবল ডাকে নীলাচল হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধামে আসিতে হইল—এবং তাঁহাকে তাঁহার কপট-সন্ন্যাস-বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইল। তাঁহার পরম প্রিয়তম ভক্ত নদীয়াবাসী নিজজনের মনোমত বেশ, অর্থাৎ তাঁহাকে নদীয়া-নাগর নবনটবর গৃহস্থবেশ ধারণ করিতে হইল। তিনি একদিন নীলাচলে সমুদ্রতীরে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণের আবেগে একটী আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন,—

—"করঙ্গ কৌপীন ফেলি, নদীয়ায় যাব চলি
দেখ্‌বো গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে আছে কেমনে॥"—

প্রাচীন মহাজনগণ তাঁহাকে "কপট-সন্ন্যাসী" আখ্যা দিয়াছেন। তাহার কারণ কি? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পূজ্য-

পাদ কবিরাজ গোস্বামিপাদ মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীকার উক্তিতে লিখিয়াছেন—

—"তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥

* * * * *

কৃপাদ্র´ তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ পদ॥"—

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব—কাজেই সন্ন্যাসীবেশে শ্রীনবদ্বীপ গমন গৌরভগবানের স্বরূপতত্ত্বের বিরোধী বলিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গৌরসুন্দরকে নদীয়া-নাগর নবনটবর বেশে নদীয়ায় আবির্ভূত হইতে হইল।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! নির্লজ্জ জীবাধম লেখককে ক্ষমা করিবেন। পুনরায় লীলারস ভঙ্গ করিয়া সেই তত্ত্ব-কথার অবতারণা! নির্লজ্জতার সীমা নাই। মূর্খ এবং অরসিকের সকল কার্য্যেই পদে পদে অপরাধ সঞ্চয় করা,—সাধু মহাজনের স্বভাবই তাহার ক্ষমা করা,—এই মাত্র ভরসা। জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ!

অকস্মাৎ বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন মন্দির গৌরঅঙ্গ-গন্ধে মহ মহ করিতে লাগিল—দিব্যালোকে মন্দিরাভ্যন্তরের সকল দ্রব্যই আলোকিত হইল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের সুসজ্জিত শয়ন-পালঙ্কখানির রত্নখচিত ঝালর ও মসারি যেন কিঞ্চিৎ কম্পিত হইতেছে, এরূপ বোধ হইল—তন্মধ্যে স্নিগ্ধ মধুর নয়নমুগ্ধকর অপূর্ব্ব জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে যেন পরম রমণীয় মহা জ্যোতির্ম্ময় শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভজন-মন্দিরটী যেন অপূর্ব্ব একটী কুসুমিত কুঞ্জবনে পরিণত হইল—আকাশে দৈববাণীর মত অপ্সরাকণ্ঠে সুমধুর গীতধ্বনি শ্রুত হইল,—

—"কুঞ্জে এসেছে কুঞ্জবিহারী
শচীনন্দন গৌরহরি।
রসিক শেখর নদীয়া নাগর
ভুবন ভুলান রূপ ধরি॥"—গৌর-গীতিকা।

অপূর্ব্ব নিকুঞ্জবন মধ্যে দিব্য পত্রপুষ্প পরিশোভিত শয়ন-পর্য্যঙ্কের উপরি শ্রীশ্রীনদীয়াযুগলরূপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব মধুর্মিলন হইল—ব্রজে নিকুঞ্জবনে ব্রজযুগল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নির্জ্জন ও গুপ্ত মধুর্মিলনের মত এই যে মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবমূলক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের মধুর্মিলন—ইহাতেই গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার মর্ম্মী সখিগণের এযাবৎ প্রাণরক্ষা হইয়াছে। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়া শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের এই অপূর্ব্ব মধুর্মিলন দর্শন করিতেছেন—তাঁহাদের প্রাণসখিকে আর তাঁহারা মূর্চ্ছাবস্থায় দেখিতে পাইতেছেন না। তাঁহার বেশের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—বিরহিণী প্রিয়াজি একদিন আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভকে বলিয়াছিলেন,—

প্রাণবল্লভ হে!

—"বেশ না করিলে কেশ না বাঁধিলে,
কি দিয়ে ভুলাব তোমারে।
আমি না সাজিলে, তুমি না সাজিবে,
বুঝেছি আমি তা' অন্তরে।"—গৌর-গীতিকা।

তাই আজ বিরহিণী গৌর-বল্লভার এই অপূর্ব্ব গৌরমন-হারিণী বেশ পরিবর্ত্তন। ইহা ভাব-ভূষণের বেশ।

সখি কাঞ্চনা তখন পরম প্রেমাবেশে ও প্রেমানন্দে তাঁহার কলকণ্ঠে একটী পদের ধুয়া ধরিলেন—

রাগ কেদার।

—"বৈঠল গৌরবামে রঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া।
আলো সখি অপরূপ হের দেখসিয়া॥ ধ্রু॥
অতুলন দুহুঁ রূপ কিবা সে তুলনা।
গৌর মোর কাঁচা সোনা প্রিয়া গোরোচনা॥
গগনেতে এক চাঁদ এই লোকে জানে।
(এ যে) চাঁদের কোলে চাঁদের উদয় নদীয়া-গগনে॥
চকোর খায় চাঁদের সুধা ত্রিজগতে গায়।
(এ যে) চাঁদে খায় চাঁদের সুধা দেখবি যদি আয়।
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ জন বাহু ঘেরাঘেরি।
দোঁহে মুখ চাওয়া চাহি আঁখি ফেরাফেরি॥
বিজুরী মথিয়া কিবা জ্বলে রসের দীপিকা।
হেম বৃক্ষে জড়াওল যেন স্বর্ণ লতিকা।
প্রেমনদী বিষ্ণুপ্রিয়া (বহে) প্রেমের জোয়ার।
প্রেমময় গৌর তাতে দিতেছে সাঁতার॥
ভাবময়ী গৌরপ্রিয়া অমিয়ার সিন্ধু।
গৌরদাসী দূরে থাকি মাগে এক বিন্দু॥"—
"শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ" পত্রিকা।

বিদ্যুৎরেখার ন্যায় ক্ষণিক চমৎকারিণী এই যে অত্যাশ্চর্য্য ভগবদাবির্ভাব-লীলারঙ্গ, ইহার স্থায়ীভাবই অপ্রকট-প্রকাশে পরিস্ফুট হইয়া নিত্যপার্ষদ ভক্তজনের এবং নিত্যপরিকরবৃন্দের প্রাণে নিরবছিন্ন মিলন ও সম্ভোগ-প্রেমরসাস্বাদ দান করে। এক্ষণে সেই অপূর্ব্ব আবির্ভাব-লীলারঙ্গ গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও তাঁহার মর্ম্মী নিত্য সখীদ্বয়ের প্রাণ গৌরপ্রেমানন্দে পরিপূরিত করিল এবং তাঁহাদের গৌরবিরহজর্জ্জরিত মৃতদেহে যেন প্রাণ সঞ্চার করিল। এতক্ষণ তাঁহারা যেন জাগ্রতে স্বপ্নবৎ এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দর্শন করিতেছিলেন। প্রেম-সমাধির অন্তর্বাহ্যদশায় এবং অর্দ্ধবাহ্যদশায় এই অত্যাশ্চর্য্য পরমাদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয় ভগবদাবির্ভাব-লীলারঙ্গ দর্শন হয়।

এক্ষণে বিরহিণী প্রিয়াজি ও তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বাহ্যাবস্থা-তাঁহাদের মনের ভাব কেহ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বদনের প্রতি গৌরপ্রেমানুরাগরঞ্জিত প্রেমাশ্রুনয়নে চাহিতেছেন—এমন সময় ঊর্দ্ধে দৈববাণী হইল,—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ে!

আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্বতলায় মাতা দিলা মোরে স্তন॥
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তাতে আনন্দিত হৈয়া॥
সেই দারুমূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবাতে তবে পাইবে পীরিতি॥"—

বংশীশিক্ষা।

ঠিক এই সময়েই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার প্রিয়তম রসিকভক্ত ঠাকুর বংশীবদনকে ঠিক এইরূপ স্বপ্নাদেশ দিলেন—তিনি বহির্বাটিতে নিদ্রিত ছিলেন—এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভাকে কতক্ষণে তিনি এই স্বপ্নাদেশ জ্ঞাপন করিবেন—এই চিন্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ভজনমন্দিরে বিরহিণী প্রিয়াজির একটু প্রেমতন্দ্রা আসিয়াছে—তিনিও দৈববাণীর মর্ম্মকথাগুলি যেন তাঁহার প্রাণবল্লভের নিকট হইতে স্বপ্নাদেশ পাইলেন, —"বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমার বিগ্রহে আমার আবির্ভাব হইবে, আমার বিগ্রহের প্রেমসেবায় প্রেমভক্তি লাভ হইবে—বৃথা শোক করিও না—আমার এই মূর্ত্তি দর্শনের ফলে তোমাদের বিরহ-ক্লেশ দূর হইবে—তুমি মনে শান্তি পাইবে"—

এইরূপ ভাবের স্বপ্নাদেশ পাইয়া বিরহিণী প্রিয়াজির তন্দ্রা ভঙ্গ হইল—তিনি প্রেমাবেগে কাঁদিয়া আকুল হইলেন —মর্ম্মী সখিদ্বয়কে তিনি তাঁহার স্বপ্নাদেশের মর্ম্ম বলিলেন—তাঁহারাও কাঁদিয়া আকুল হইলেন—ভজন-মন্দিরে তখন প্রেমনদী প্রবাহিত হইল।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তখন কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

"প্রাণবল্লভ হে!
—"তুমি দেখা দিয়ে চলে গেলে কেন বল না।
কি বলিলে অভাগীরে বুঝা গেল না॥
(তোমার) মূর্ত্তি পূজা কেন করি বুঝে না যে মন।
(তুমি) সাক্ষাতে বিজয় কর ওহে প্রাণধন॥
কাঁহা মোর প্রাণগোরা শচীর নন্দন।
কাঁহা যাও, কাঁহা পাও তব দরশন॥
কে বুঝিবে অভাগীর হৃদিভরা দুখ।
তোমার বিরহে মোর ফেটে গেল বুক॥
দাসী হরিদাসী ভনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণবল্লভ হে!
লাথি মেরে তুমি তার ফুটাও ছাতিয়া॥
মরি যেন মুখে বলে "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া॥"—

গৌর-গীতিকা।

কাষ্ঠপাষাণভেদী এই মর্ম্মান্তিক দুঃখকথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল—তিনি পুনরায় প্রেমমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সখি কাঞ্চনা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি ভাবিতেছেন, তাঁহার প্রিয় সখির আত্যান্তিক দুগ্ধের তৃষ্ণা কি ঘোলে মিটে? আবির্ভাবের ক্ষণিক দর্শনে আর তাঁর প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে না—এখন তিনি নিরন্তর তাঁহার প্রাণবল্লভের সাক্ষাৎ দর্শন—ভিখারিণী—নিরবছিন্ন মিলন-সুখাভিলাষিণী। সখি কাঞ্চনার প্রাণ কাঁদিতেছে তাঁহার বিরহিণী প্রাণসখির জন্য—তিনিও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছু আত্মনিবেদন করিতেছেন,—

যথারাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার-প্রাণবল্লভ হে।

(একবার) "এসে তুমি দেখে যাও কি দশা প্রিয়ার।
সম্মুখে দাঁড়াও এসে ওহে প্রাণাধার॥
এস হে এস হে ওহে বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
দেখে যাও বিষ্ণুপ্রিয়া করে প্রাণ-পাত॥
অন্তিম সময়ে তাঁকে দেখা দিয়ে যাও।
বিলম্বেতে দরশন পাও কি না পাও॥
(তোমার) প্রাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দরশন চায়।
ভজন-মন্দিরে তুমি হও হে উদয়॥
দাসী হরিদাসীর প্রাণ কাষ্ঠ-পাষাণ।
প্রিয়াজির দুখকথায় না গলে তার প্রাণ॥"—

গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা এখনও মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূমিতলে শায়িতা—মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাকে পরম স্নেহভরে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন—তিনি এক্ষণে গৌর-বিরহ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন—গৌর-প্রেম-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণ। তখনও প্রভাত হইতে চারি দণ্ড বাকি আছে—নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে এখনও গভীর নীরবতা নির্ব্বিবাদে স্বরাজ্য বিস্তার করিতেছে—এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভজন-মন্দিরাভ্যন্তর সুগন্ধি মল্লিকা মালতী পুষ্পসৌরভে অকস্মাৎ আমোদিত হইল—গৌর-অঙ্গ-গন্ধে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়ন-মন্দির যেন মহ মহ করিতে লাগিল—সুসজ্জিত নানা রত্নখচিত সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কোপরি যেন সচল শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের রূপসাম্য শ্রীমূর্ত্তিখানি দিব্যালোকে সমুদ্ভাসিত হইল। সখি কাঞ্চনার গৌর-প্রেমানুরাগের আকুল আহ্বানে নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পুনরায় আবির্ভাব হইল। এক রাত্রির মধ্যে এই যে দুই বার তাঁহার আবির্ভাব-লীলা-রঙ্গ—ইহার বিশেষ রহস্য আছে। রাগানুরাগা ভজনানুরাগী রসিক ভক্তগণের প্রেমানুরাগের আকুল আহ্বানে প্রেমময় শ্রীগৌরভগবান স্থির থাকিতে পারেন না—যখনই তাঁহাদের অনুরাগের ডাক তাঁহার কর্ণে পৌঁছিবে—তৎক্ষণাৎ তিনি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। শত বৎসর ধ্যান ধারণা এবং কঠোর তপস্যা করিয়াও জীবনে একবার যোগী ঋষিগণেরও যে সৌভাগ্যলাভ হয় না,—শ্রীভগবানের একান্ত অনুরাগী ভক্তগণের অনুরাগের ডাকে যখন তখন যেখানে সেখানে—তাঁহাদের সে সৌভাগ্য লাভ হয়। রাগানুগাভজনপন্থা কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ঋষিগণেরও পরম লালসার বস্তু।

বিরহিণী প্রিয়াজির এখনও প্রেম-মূর্চ্ছাবস্থা—মর্ম্মী সখিদ্বয়েরও তন্দ্রাপাবস্থা—তাঁহাদের এখন অন্তর্ব্বাহ্যভাব—এইরূপ ভাবাবস্থাতেই রাগানুগাভক্তসাধকের শ্রীভগবদাবির্ভাব-লীলারঙ্গ দর্শন লাভ হয়।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের এবারকার আবির্ভাব-লীলারঙ্গের কিছু রহস্যজনক বিশেষত্ব আছে। তিনি তাঁহার শয়ন-পর্য্যঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার নিকটে আসিলেন—তাঁহার শ্রীকরকমলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। এক্ষণে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার প্রাণবল্লভ দাঁড়াইয়া আছেন—কিন্তু বিরহিণী প্রিয়াজির মনে বিশ্বাস হইতেছে না যে তিনি আসিয়াছেন—প্রাণবল্লভের সাক্ষাৎ দর্শন লাভেও তাঁহার মনের সন্দেহ যাইতেছে না। এক্ষণে তাঁহার প্রেমবৈচিত্ত্য-ভাবাবস্থা। তিনি প্রেমাবেশে শ্রীগৌরানুরাগরঞ্জিত নয়নে উন্মাদিনীর ন্যায় ইতি উতি চাহিতেছেন এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অতি কাতর ক্রন্দনের সুরে কহিলেন,—"প্রাণসখি! আমার প্রাণবল্লভ কি আমার এই অন্তিম সময়েও একটীবার মাত্র দর্শন দানে আমাকে কৃতার্থ করিবেন না?"—

সখি কাঞ্চনার তখনও সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হয় নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ যে তাঁহার প্রিয়সখির সম্মুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান—তিনি তাহা দেখিতে পাইতেছেন না—তিনি যেন ইহার কিছুমাত্র জানেন না। তিনি দেখিতেছেন—বিরহিণী গৌরবল্লভা বড়ই বিরহ-কাতরা—তাঁহার যেন শেষ দশা উপস্থিত।

এদিকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার পার্শ্বে বসিয়াছেন—তাঁহার শ্রীকরকমলে প্রিয়াজির শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া পরম প্রেমভরে মৃদু মধুর বচনে কহিতেছেন—"বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রিয়তমে! আমি আসিয়াছি—

তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না? আমি প্রথমে দৈববাণী দ্বারা এবং পুনরায় স্বপ্নে নদীয়ায় যে আমার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছি, তাহা সত্য। সেই মূর্ত্তিতে নদীয়ায় আমার নিত্যাবির্ভাব হইবে—এবং এই বিগ্রহ দর্শন মাত্রেই তোমার পতি-বিরহ-শোকদুঃখ সকলি নিবারিত হইবে। আমি ত সর্ব্বক্ষণই তোমার হৃদিমন্দিরে বিরাজ করিতেছি—তুমিও আমার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বক্ষণ আছ। এই বিগ্রহে তুমি ও আমি একাঙ্গীভূত হইয়া যুগলরূপে বিরাজিত থাকিব—নদীয়ায় আমার এই বিগ্রহ "**বিষ্ণুপ্রিয়ালিঙ্গিত নদীয়া-যুগল**"রূপে আমার রসিকভক্তজনের নয়নে প্রতিভাত হইবে এবং আমার ইচ্ছায় এই বিগ্রহের নাম তাহারা রাখিবে "**বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ।**" অন্যান্য স্থানেও 'নদীয়া-যুগল-বিগ্রহ" প্রতিষ্ঠিত হইবে সেখানে এই যুগলমূর্ত্তি একাত্মা না হইয়া দেহভেদ পরিদৃষ্ট হইবে। "**বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ**" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রেমসেবা প্রচারের ভার তোমারই সখিগণের উপর ন্যস্ত থাকিল। তোমারই আনুগত্যে নদীয়া নাগরী ভাবে তোমারই সখি ও দাসীগণের দ্বারা এই নদীয়া-যুগল-প্রেম-সেবা সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার ভক্তিমতী স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রচারিত হইবে—তাঁহারাই এই প্রেম-সেবার প্রথম অধিকারিণী হইবে।"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা জাগ্রতাবস্থাতেই এইরূপ অদ্ভুত-পূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় সুখ-স্বপ্ন দেখিলেন—তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না—তাঁহারা উভয়েই প্রেমমূর্চ্ছাগ্রস্ত এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় নিকটেই ভূমিতলে শায়িতা আছেন। বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নয়নদ্বয় মুদ্রিত ছিল—তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভকে মনশ্চক্ষে দেখিলেন এবং তাঁহার মধুমাখা কণ্ঠস্বর তাঁহার অতি স্থির গম্ভীর ভাবের প্রতি কথায় অনুভব করিলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের হৃৎকর্ণ-রসায়ন মধুর কথাগুলি তাঁহার কর্ণে যেন মধু বর্ষণ করিল—তাঁহার প্রাণবল্লভের এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তাঁহার কর্ণমধ্যে যেন বাসা করিয়া রহিল। তিনি যেন প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া আনন্দ-স্বরূপ হইলেন। তিনি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন—তাঁহার প্রাণ-বল্লভ সেখানে নাই,—কিন্তু তখনও তাঁহার ভজন-মন্দির গৌর-অঙ্গ-গন্ধে মহমহ করিতেছে। সখিদ্বয় মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূমিতলে পড়িয়া আছেন। স্নেহময়ী সনাতন-নন্দিনী তখন স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন—নয়নজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তিনি মন্দ মন্দ গৌর-নাম কীর্ত্তন করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিতেছেন—

—"প্রাণবল্লভ হে!

তুমি দেখা দিয়ে চলে গেলে কেন বল না।
কি বলিলে অভাগীরে বুঝা গেল না॥"

কিছুক্ষণ পরে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রেমমূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান পাইয়া দেখিলেন স্বয়ং প্রিয়াজি তাঁহাদের সেবা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহারা বিষম লজ্জিতভাবে কহিলেন—"প্রাণসখি! তুমি কেন এরূপভাবে আমাদিগকে জ্বালাতন করিতেছে—আমরা ত বেশ ঘুমাইতেছিলাম—আর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—তোমার প্রাণবল্লভ পর্য্যঙ্কোপরি তোমার নিকটে বসিয়া গোপনে কত কি কথা বলিতে-ছিলেন। প্রিয়সখি! বল না এত গোপনে তোমার সহিত তাঁহার কি কথা হইল?"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভার সুখ-স্বপ্ন-কথাগুলি মর্ম্মী সখি-দিগের নিকটেও গোপন করিলেন—তবে কিছু প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না—তিনি মর্ম্মী সখিদ্বয়ের দুই হস্ত প্রেমাবেগে দৃঢ়রূপে নিজ হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া প্রেম-গদগদ বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! তোমাদের মত আমিও স্বপ্নাবস্থায় দেখিতেছিলাম—আমার প্রাণ-বল্লভ আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া আমাকে উদ্দেশ করিয়া কত কি রসকথা বলিতেছিলেন—সকল কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না—তবে এইমাত্র মনে আছে তিনি বলিলেন তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইবে এবং সেই শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে আমাদের গৌর-বিরহ জ্বালা চিরতরে প্রসমিত হইবে"—

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ইহা শুনিয়া প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া কহিলেন—"সখি! তোমার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে এখন তোমার সন্দেহ দূর হইল ত?"—বিরহিণী প্রিয়াজি তখন অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিলেন—একথার আর উত্তর দিলেন না। তিনি মনে মনে তাঁহার প্রাণবল্লভের আদেশ ও উপদেশবাণীগুলি আলোচনা করিতে

লাগিলেন—সখিদ্বয় তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না।

এই সময়ে প্রভাতী কীর্ত্তনের একটী দল আসিয়া গৌরশূন্য গৌর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল,—

রাগ সুহই।

"প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ।
হেরই সকলে আন ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ন রাতা।
অলসে ঈষৎ মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলি মুড়িয়া মোড়য়ে তনু।
যৈছন অতনু কণক-ধনু॥
দেখিতে আওল ভকত গণে।
মিলিল বিহানে হরিষ মনে।
নদীয়া-নগরে হেন বিলাস।
যদুনাথ দেখে সদাই পাশ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

খোল করতালের বাদ্য সহ গৌরকীর্ত্তনধ্বনি বিরহিণী গৌরবল্লভার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সখিদ্বয় সহ ভজন-মন্দির হইতে ধীরে ধীরে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী এবং সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের উদ্দেশে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

এমন সময় আর একদল কীর্ত্তনীয়া আসিয়া প্রভাতী-সুরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

—"ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, কহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
লহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম রে।
যে জন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজে
সে হয় আমার প্রাণ রে।"—

তৃতীয় দল আসিয়া পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিল—

যথারাগ।

—"জয় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেম-ভকতি-দাত্রী।
গৌরপ্রিয়া, জীবাশ্রয়া, পতিত-পাবন-কর্ত্রী॥
ভকত বৎসলা, সর্ব্বমঙ্গলা, প্রেমময়ী জগদ্ধাত্রী।
প্রেমরূপিণী, জগবন্দিনী, দয়াময়ী প্রেম-মূর্ত্তি॥
কল্যাণময়ি, বরদাত্রী অয়ি! জয়শ্রী জয়দাত্রী।
জয় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া, পাপীতাপী সমুদ্ধাত্রী॥
ভকতি-রূপিণী, প্রেমদায়িনী, সখিগণ-সুখদাত্রী।
হরিদাসিয়ার, জীবন-আধার, দেহ দৈন্য দেহ আর্ত্তি॥"—

গৌর-গীতিকা।

আত্মস্তুতি শ্রবণ করিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনে বিষম আত্মগ্লানির উদয় হইল—তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি কাতর করুণ নয়নে একবার চাহিলেন—সে চাহনির মর্ম্ম—"সখি! এ আবার কি? কাটা ঘায়ে আর লবণের ছিটা কেন? আপনার প্রাণের দুর্বিসহ জ্বালায় আমি দিবারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি—এখন আমি ত মৃতপ্রায়—মৃতদেহে আর খাঁড়ার আঘাত কেন?"—এই মর্ম্মান্তিক কথাগুলি বিরহিণী প্রিয়াজির মনে মনেই রহিল—বদনে আর বাহির হইল না। মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাদের প্রিয় সখির মনোভাব সকলি বুঝিলেন—সখি কাঞ্চনা তখন সলজ্জভাবে বদন অবনত করিয়া কয়েকটী কথা বলিলেন—"সখি! প্রাণসখি! নদীয়াবাসী গৌরভক্তগণ তোমার প্রাণবল্লভের একান্ত নিজজন—তাহার মধ্যে তাঁহার রসিক-ভক্তগণের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—তাঁহাদের প্রাণের বাসনা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না—গৌরহারা হইয়া তাঁহারা তোমার পাদপদ্মই জীবনের সার করিয়া-ছেন—তুমিই এখন তাঁহাদের সাধ্যবস্তু হইয়াছ। এই কীর্ত্তনের দলে তোমার প্রাণবল্লভের রসিকভক্ত বাসুদেব ঘোষ আছেন, তাঁহার ভ্রাতা মাধব ঘোষ আছেন—শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের গণ আছেন, আর আমাদের বংশীবদন দাদা ও পণ্ডিত দামোদর দাদাও আছেন। ঐ দেখ সঙ্গে সর্ব্বপশ্চাৎ ঈশান দাদাও আছেন। মূল কীর্ত্তনীয়া স্বয়ং বাসুঘোষ—ইঁহারা সকলেই নদীয়া-যুগল-ভজনানন্দী এবং তোমারই পদাশ্রিত ও কৃপাভিখারী। এই সকল তোমার প্রাণবল্লভের একান্ত নিজজনের প্রতি তুমি একবার শুভদৃষ্টিপাত কর"—

বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রিয়সখির মুখে এই কথাগুলি শুনিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে এবং আত্মগ্লানিতে বদন অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—তাঁহার মর্ম্মবেদনার আর পরিসীমা রহিল না,—মর্ম্মী সখিমুখে এরূপ কথা শুনিবেন—তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি এসকল কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রাণতুল্য এই সকল একান্ত ভক্ত ও নিজজনের

প্রতি একটীবার শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে সেখানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

সুচতুরা সখি কাঞ্চনা বুঝিলেন তাঁহার প্রিয়সখি তাঁহার কথায় মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। ঐশ্বর্য্য ভাবের কথা তুলিলেই তাঁহার এইরূপ ভাব হয়—তাহা তিনি জানেন। এক্ষণে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী গৌরবল্লভার আত্ম-প্রকাশের সময় উপস্থিত—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রসিক ভক্তগণ গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বামে বসাইয়া নদীয়াযুগল-ভজন প্রচারের বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন। এখন আর প্রচ্ছন্ন অবতারের প্রচ্ছন্ন কান্তার প্রচ্ছন্নত্ব রক্ষা করা সম্ভব নহে—এইজন্য শ্রীশ্রীগৌরভগবানের নিত্যপার্ষদভক্ত রসিকসুজন মহাজনগণ গুপ্তমন্ত্রণা করিয়া প্রকাশ্যে শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে সখি কাঞ্চনার দোষ কি? স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের ইচ্ছায় এবং প্রেরণায় তাঁহারই একান্ত নিজ পরিকরগণ—শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজন প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির নিকটে গিয়া পরম প্রেমভরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তখন অতি গোপনে কাণে কাণে বলিলেন—"প্রিয় সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! স্বপ্রকাশ বস্তুর প্রকাশ গুপ্ত থাকিতে পারে না। সূর্য্যদেবকে হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করা কি সম্ভব? তোমার এবং তোমার প্রাণবল্লভের ইচ্ছায় তোমাদের যুগল-তত্ত্ব ও ভজন-রহস্য প্রকাশের উপযুক্ত কাল এখন উপস্থিত হইয়াছে। তোমাকে এখন আর আমরা লুকাইয়া রাখিতে পারি না"—এই কথা শুনিবামাত্র গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বদনমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল—তিনি প্রণয়-রোষকষায়িত নয়নকোণে একবার সখি কাঞ্চনার প্রতি চাহিলেন—সে চাহনির মর্ম্ম—"দেখিবে এ কার্য্যে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে—তোমাদের গৃহ-শত্রু অনেক আছে—তাহারা অনর্থ ঘটাইবে"—সুচতুরা সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির অন্তরের ভাব জানেন—তিনি তাঁহার মনোভাব ও অন্তরের কথা বুঝিয়া তাঁহার প্রিয়সখির বদনের প্রতি চাহিয়া একটী কুটিল কটাক্ষপাত করিলেন,—তাহার মর্ম্ম—"আচ্ছা, তাহা দেখিয়া লইব—তোমার কৃপাকটাক্ষে সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর হইয়া যাইবে।"

বিরহিণী গৌর-বল্লভা এবং তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার এই যে মানসিক নিগূঢ় গুপ্তভাবপূর্ণ ভবিষ্য ঘটনার কথোপকথন, তাহা অন্য কেহই জানিতে পারিলেন না। সখি অমিতা কিন্তু সকলি বুঝিলেন।

এক্ষণে গৌরবল্লভার প্রসন্ন বদন—তিনি মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে গমন করিলেন। সেখানে অন্যান্য সখি ও দাসীগণে গৌর-কীর্ত্তন করিতেছেন।

—"জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।"

সিলং (আসাম)
২৬এ ভাদ্র ১৩৩৯ সাল।
শ্রবণা দ্বাদশী—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

গম্ভীরায়-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

অন্ত্যখণ্ড।

(২৬)

(শ্রীবৃন্দাবনধাম নিকেতন শ্রীরাধারমণ-বরদেবসেবক গোস্বামী শ্রীমধুসূদন সার্ব্বভৌম বিরচিতমেব)

"যা দুর্লভা জগত্যাং রমাদিভিঃ সা কথং লভ্যা।
দেব্যা বিষ্ণুপ্রিয়য়া কৃপাকণশ্চেন্ন নিক্ষিপ্তঃ॥
তস্মান্নিপত্য ভূমৌ কাকুভরৈরর্থয়ে দেবীম্।
বিষ্ণুপ্রিয়াং মদীয়া গণনা দাসীগণে কার্য্যা॥"

"যৎকান্তি কল্পলতিকাচ্ছটয়া বিমুগ্ধঃ
শ্রীগৌরচন্দ্রমধুপো যদনল্পবশ্যঃ।
উদ্ঘূর্ণতে প্রতিদিশং ন পদং লভেত
বিষ্ণুপ্রিয়ে! বিতর মে নিজ পাদ দাস্যং॥"

ইতিপূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিনী সীতাঠাকুরাণী নদীয়ার গৌরশূন্য গৌরগৃহে শুভাগমন করিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন-কথা বলিয়াছিলেন—সেইরূপ স্বপ্নাদেশই গত রাত্রি প্রভাতে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ তাঁহার প্রাণবল্লভাকে বিস্তারিতভাবে উপদেশের সহিত জ্ঞাপন করাইলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনে সেই সময়ে যে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার শত চেষ্টাতেও যায় নাই। এক্ষণে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সাক্ষাৎ স্বপ্নাদেশ পাইয়াও তাঁহার মন পূর্ব্ববৎ সেই সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। ঠাকুর বংশীবদনও পূর্ব্ব রাত্রিতে এইরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে সখিদ্বারা তাহা জানাইয়াছেন। এই স্বপ্নাদেশের কথা গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্তঃপুরে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে নদীয়াবাসী গৌরভক্তগণও ইহা শুনিলেন। পরে সর্ব্ব নদীয়ায় এই সংবাদটি তড়িৎবার্ত্তার ন্যায় প্রচারিত হইল। নদীয়ার নিত্যদাস গৌরপার্ষদ ভক্তগণের মন এ সংবাদে আনন্দিত হইল না—সকলেরই মনে যেন একটা বিষম খট্‌কা লাগিল—অনেকেই সমূহ বিপদ মনে করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের পুরাতন ভৃত্য অতিবৃদ্ধ শ্রীঈশানের মনের মধ্যে বিষম চিত্ত-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহার প্রাণের মধ্যে আত্যন্তিক উদ্বেগের অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। বহির্বাটিতে তিনি তাঁহার নির্জ্জন ভজন কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন, আজ তাঁহার প্রাণে গৌর-বিরহ-জ্বালা দ্বিগুণিত হইয়া ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল। তিনি অঝোরনয়নে অনবরত ঝুরিতেছেন। অতিবৃদ্ধ ঈশানের নয়ন-ধারায় আজ শচী-আঙ্গিনা ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি তাঁহার নির্জ্জনভজন-কুটীরের এক প্রান্তে বসিয়া স্বগতভাবে বিভোর হইয়া আপন মনে কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন,—

——"লোক মুখে শুনিতেছি
নদীয়ায় মূর্ত্তিপূজা হবে
নবদ্বীপচন্দ্রের।

মূর্ত্তি ল'য়ে তাঁর কি করিব আমি ?
গৃহের পালিত কুকুর আমি তাঁর,—
অতি শিশুকাল হ'তে দেখেছি তাঁহারে।
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর লীলা তাঁর,—
ভাসিতেছে নিশিদিন
নয়ন উপরে মোর।
দেখে'ছি তাঁর অন্নাসন, উপনয়ন,
দেখে'ছি শুভ পরিণয় তাঁর
দুইবার এ পোড়া নয়নে।
সেই তাঁর ঢল ঢল চঞ্চল নয়ন
কনক কেতকী সম—
সেই তাঁর ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলরাজি—
পড়িতেছে চিরসুন্দর বদন উপর।
সেই তাঁর আজানুলম্বিত বাহুর দোলনী,—
সেই তাঁর পরিসর পীন বক্ষস্থল—
সেই তাঁর শিব-বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত
রাতুল কমল চরণদ্বয়—
এখনও ভাসিছে মোর
নয়ন উপরে নিরন্তর।
জগজন-মনলোভা সেই সুন্দর মুরতি,
রয়েছে চিরঅঙ্কিত হৃদয়ের স্তরে স্তরে মোর।
ভুলিবার বস্তু নহে তাহা,—
গঠনের বস্তু নহে তাহা,—
ভাস্করের সাধ্য কি সে মূর্ত্তির করিতে গঠন ?
বিধি আছে মূর্ত্তিপূজা অপ্রকট কালে
ত্রিজগত নাথ—সচল জগন্নাথ মোর,
নবদ্বীপচন্দ্র প্রকট এবে নীলাচলে—
তবে কেন তাঁর এই মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা ?
কে দিল এ বিধি কিছু নাহি বুঝি।
শুনিতেছি স্বপ্নাদেশ ইহা—
কিন্তু শঙ্কা হয় মোর মনে—
অমঙ্গল গণি আমি এই কাজে।
কিন্তু বলিতে না পারি কিছু—
ঠাকুরাণীর আদেশ।
বলিতেছে সবে,—প্রভুরও স্বপ্নাদেশ এইরূপ।
এই আঙ্গিনায়—ঐ ঘরে
ঐ গঙ্গাতীরে—শ্রীবাস অঙ্গনে—
এই নিত্যধাম নদীয়ায়
স্বয়ংরূপে প্রকাশ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র।
চক্ষু আছে যার—ভাগ্যবান সেই—
হ'তে অনাদি অনন্ত কাল—
নিত্য লীলা তাঁর প্রকট নদীয়ায়।
আমি অধম কুকুর এবাটির—
অস্পৃশ্য—পামর—মুর্খ—
কে শুনিবে মোর কথা ?
দেখিতেছি দিব্যচক্ষে আমি,
এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার শেষে
দয়াময়ী ঠাকুরাণী মোর হবেন অদর্শন।
ডুবিবে আঁধার নদীয়া
ঘন আঁধারে পুনরায়।
হে গৌরাঙ্গ গুণনিধে!
এই বর দাও তুমি মোরে
তার অগ্রে এ শরীর নাশ যেন হয়।
তোমার দুর্ব্বিসহ বিরহ-দুঃখ—
তোমার বৃদ্ধা জননী
শচীমার মুখ পানে চেয়ে,—
এত দিন অকাতরে সহে ছিনু মুঞি,
পুণ্যবতী শচীমাতা
মনদুঃখে তব অদর্শন শোকে
গেছেন চলিয়া স্বধামে।
এক্ষণে ছলে ও কৌশলে—
টানিতেছ তুমি মোর
দয়াময়ী মাকে নিত্যধামে,
ইহা বুঝিতেছি আমি!
হ'ল তব লীলা সাঙ্গ বুঝি
ওহে লীলাময়!—হে কৌশলি!
তাই বুঝি বিস্তারিছ তুমি
এবে এ কৌশল-জাল!
যাহা কর তুমি,—সব ভাল,—
সর্ব্বোত্তম,—মঙ্গলময় তুমি,
জীববন্ধু সর্ব্বলোকে কয়।
কিন্তু নির্ব্বোধ পামর অভাগা মুঞি,

গৌর-শূন্য গৌর-গৃহের
উচ্ছিষ্টভোজী পালিত কুক্কুর নরাধম।
লীলাময়ী ও লীলাময়ের লীলারঙ্গ
কি বুঝিব আমি ?"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের পুরাতন ভৃত্য নিত্য পার্ষদভক্ত অতিবৃদ্ধ ঈশানের মনোভাব তাঁহার ইষ্টদেবী অন্তর্যামিনী গৌর-বল্লভা সকলি বুঝিলেন—তাঁহারও মনোভাব তদ্রূপ—দুইটি প্রাণে প্রাণে ও মনে মনে প্রাণমনের ভাবের অপূর্ব্ব বিনিময় হইল—কিন্তু কেহ ইহা জানিতে পারিলেন না—আর কাহাকেও জানাইবার প্রয়োজন হইল না। বিরহিণী প্রিয়াজির গুরুগম্ভীর স্বভাব ও মনোভাব ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃসলিলা—তিনি পরমা ধৈর্য্যবতী—তিনি সর্ব্বজ্ঞা—সকলি জানেন—সকলি বুঝেন। ঈশানের মনব্যথার ব্যথী তিনি—কিন্তু মুখে সমবেদনাব্যঞ্জক কোন কথাই নাই। অতিবৃদ্ধ ঈশানের জন্য দয়াময়ী গৌরবল্লভার প্রাণ কাঁদিতেছে—সে নীরব ক্রন্দনের মনোময়ী ভাষা চিরদিন চিরকাল অপ্রকাশিত রহিবে। ইহা প্রেমময়ী গৌরবল্লভার নিজস্ব গুপ্তধন।

বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ঠাকুর বংশীবদনকে ডাকিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের স্বপ্নাদেশ বলিলেন এবং অবিলম্বে ভাস্কর ডাকাইয়া শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। ঠাকুর বংশীবদন প্রিয়াজির আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৌরবল্লভা দৈনন্দিন ভজন-ক্রিয়া সমাধান করিয়া সন্ধ্যার পর তাঁহার নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে বসিয়া তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন,—

প্রাণ সখি!

"মন মোর বড়ই চঞ্চল আজি,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে
জাগ্রতে ও সুষুপ্তিতে হেরিতেছি স্বপ্ন আমি,
গুণমণি মোর—নদীয়া-নাগর বেশে
দাঁড়ায়ে সম্মুখে মোর।
অপরূপ রূপরাশি তাঁর
মুখে মৃদু হাসি,—
মোর করে ধরি প্রাণনাথ—
পরম প্রেমভরে কত
কহিছেন রস-কথা
কাছে বসি মোর।
সখি! কত রসকলা জানেন রসরাজ
গৌরাঙ্গ আমার।
কত ছাঁদে পিরীতের ফাঁদে
ফেলিয়া আমারে,—
কত প্রেম, কত আশা,
কত ভালবাসা-মধু
কলসে কলসে ঢালি যেন
দিতেছেন কর্ণেতে আমার।
আর মুঞি অভাগিনী—
ধরি তাঁর রাতুল চরণ দু'টি
কাঁদিতেছি শুধু অঝোর নয়নে।
বাকশক্তি হরে গেছে মোর—
শরীর নিস্পন্দ।
এলাইয়ে পড়ে গেছে দেহযষ্টি মোর
রাতুল চরণ উপরি তাঁর।
সখি! হেন দিন হবে কি আমার
বড়ই মন্দভাগিনী আমি—
ভালে সিন্দুর-বিন্দু,
হস্তে শঙ্খ-বলয় সহ
এই রূপে রাখি মাথা পতি-পদতলে—
নয়নে হেরিতে হেরিতে
চন্দ্রবদন তাঁহার—
কবে আমি দিব বিসর্জ্জন
এ ছার ঘৃণিত জীবন?
প্রাণ সখি! জনম দুখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার
এ হেন সৌভাগ্য হবে কি কখন?"

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—সখি কাঞ্চনার হৃদয়ে এই মর্ম্মভেদী প্রাণঘাতী কথাগুলি যেন শেল সম বিদ্ধ হইল। তিনি ও সখি অমিতা দুই জনে বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে পরম প্রেমভরে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন—গৌর-

বিরহিণীত্রয়ের নীরব ক্রন্দনে এবং উত্তপ্ত নয়নসলিলে গৌর-শূন্য গৌরগৃহে প্রেমনদী প্রবাহিত হইল।

নদীয়ার নির্জ্জন মহাগম্ভীরা-মন্দিরে গভীর নিশীথে বসিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের সহিত গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী আজ প্রাণ খুলিয়া তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্তলের মর্ম্মব্যাথাগুলি বলিতেছেন' আর সখি কাঞ্চনা ও অমিতার কণ্ঠদেশ ক্ষীণ বাহুদ্বয়ে পরিবেষ্টন করিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য মর্ম্মী সখিদ্বয়ের কোনরূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও আয়োজন হইতেছে,—তাহা তিনি জানেন। এই কার্য্যে প্রিয়াজির মনে এবং গৌরগতপ্রাণ পুরাতন ভৃত্য অতিবৃদ্ধ ঈশানের মনে যে সন্দেহ উপজাত হইয়াছে, তাহাও তিনি জানেন—নদীয়ার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ অনন্যশরণ ভক্তগণের মনের ভাবও তিনি জানেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞা—তাঁহার অবিদিত কিছুই নাই—তাঁহার মন এ সংবাদে সবিশেষ চঞ্চল হইয়াছে,—কিন্তু তিনি সুচতুরা—অসাধারণ ধৈর্য্যশালিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না—তিনি তাঁহার নিজ মনোভাব না চাপিয়া রাখিলে বিরহিণী প্রিয়াজীর অবস্থা কি হইবে, তাহাও তিনি বুঝেন। এই ভাবিয়া তিনি মনপ্রাণ সুদৃঢ় করিয়া পাষাণে বুক বাঁধিয়া নীরবে তাঁহার প্রিয় সখির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন। সখি অমিতা ও কাঞ্চনা দুইটী এক প্রাণ—তিনিও সকলি বুঝিতেছেন—তিনিও বিষণ্নমনা—সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি চাহিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন—এই নীরব রোদনের একটা অস্ফুটধ্বনি আছে—সে ধ্বনি যিনি শুনিবার তিনিই শুনিতেছেন।

গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্যান্য সখি ও দাসীগণের মনের মধ্যেও এই সংবাদে একটা সন্দেহ উপজাত হইয়াছে—তাঁহারাও সকলেই বিষাদিতা—শচী অঙ্গিনায় যেন একটা ভীষণ বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে।

নদীয়াবাসী বহিরঙ্গ লোকদিগের মধ্যে অবশ্যই একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়াছে—তাঁহারা এসংবাদে মনে করিতেছেন নদীয়ায় একটী নব উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে—বহু লোকের সমাগম হইবে—মহামহোৎসবে আনন্দের স্রোত বহিবে—ভোজনের ব্যাপারে "দীয়তাং ভোজ্যতাং" হইবে। কিন্তু নিত্যদাস গৌরভক্তগণের মনে যেন একটা নিরানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ নদীয়া-বাসীর মানসিক অবস্থার মধ্যে উপযুক্ত ভাস্করের দ্বারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি গঠিত হইতেছে।

সেই গভীর নিশীথে নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে একত্রে বসিয়া গৌর-বিরহিণীত্রয় মনে মনে পরম প্রেমানুরাগে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীচরণকমল-চিন্তামগ্না,—এক্ষণে তাঁহারা মানসিক স্মরণ-মনন ভজনরতা।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে শায়িতা এবং প্রেমালিঙ্গনবদ্ধা। তাঁহার এখন অর্দ্ধবাহ্য-দশা। এক একবার নয়ন উন্মীলিত করিতেছেন—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন এবং সেই শ্বাসের সহিত "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা নাথ নাগরেন্দ্র!" এই মর্ম্মঘাতী হৃদিবিদারক অস্ফুট ধ্বনি উঠিতেছে। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি করুণ ক্রন্দনের সুরে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের ক্রোড়ে শয়নাবস্থাতেই তাঁহাদের বদনের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিতেছেন—

যথারাগ।

—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপাল লেখি!
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্রে বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদে সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস গোরার (১) পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥"— পদকল্পতরু।

বিরহিণী প্রিয়াজির এইরূপ করুণ আত্মনিবেদনের প্রতি পদে, প্রতি শব্দে, প্রতি অক্ষরে, গৌর-বিরহ-জ্বালার

(১) "শ্যামের" স্থানে "গোরার" পাঠ পরিবর্ত্তিত হইল।

ধূমায়িত শিখা উঠিতেছে। এক্ষণে তিনি গভীর ধ্যানমগ্না—এখন তাঁহার অন্তর্বাহ্য-দশা—সখি অমিতারও স্তম্ভভাব—তিনি শ্রীগৌরাঙ্গচরণ-মধুপানে বিভোর আছেন—

সখি কাঞ্চনার বাহ্যজ্ঞান আছে—তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইলে বিরহিণী প্রিয়াজিকে কে দেখিবে? তিনি গৌর-বিরহিণী প্রিয় সখিকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ক্রোড়ে ধরিয়া বসিয়া আছেন, আর মন্দমন্দ গৌরনাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল। তখন সখি কাঞ্চনা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের চরণে আত্মনিবেদন করিলেন—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ হে! তোমার স্বপ্নাদেশে তোমার একান্ত নিজজনের মনে বিষম একটা খট্‌কা লাগিয়াছে—তাহা তুমি জান। তোমার প্রাণবল্লভার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—তাঁহাকে লইয়া আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। বিপদভঞ্জন শচীনন্দন হে! এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই। নদীয়াবাসীর প্রাণ-সর্ব্বস্ব-ধন হে! তুমি দয়া করিয়া একবার সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া নিজমুখে বলিয়া যাও, নদীয়ায় তোমার এই শ্রীমূর্ত্তিপূজা-লীলারঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?"—এই কথা বলিতে বলিতে সখি কাঞ্চনার নাসিকা গৌর অঙ্গ-গন্ধে পরিপূর্ণ হইল—এই নাগরী-মন-প্রাণহারী মধুর সুগন্ধ তাঁহার নাসিকার পূর্ব্বপরিচিত—তিনি গৌর-অঙ্গ-গন্ধের ঘ্রাণ পাইবামাত্র প্রেমপুলকাঞ্চিত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া গৌরপ্রেমানন্দে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—সখি অমিতা দোহার দিতে লাগিলেন—

যথারাগ।

"—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌর এস এস হে!
তোমার প্রিয়া তোমায় ডাকে এস এস হে!
আসিতে বিলম্ব হলে তাঁর প্রাণ যাবে হে!
অন্তিম সময়ে আসি (একবার) দেখা দাও হে!
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ প্রাণগৌরাঙ্গ হে!
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌর এস এস হে।"—
গৌর-গীতিকা।

গৌরনাম-কীর্ত্তনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র বিরহিণী গৌর-বল্লভার বাহ্যজ্ঞান হইল, অমনি গৌর-অঙ্গগন্ধ তাঁহার নাসিকায় প্রবেশ করিল—তিনিও গৌরপ্রেমাবেশে তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সখি অমিতারও তদ্রূপাবস্থা হইল। তখন গৌর-বিরহিণীত্রয় একত্রে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

—"প্রাণগৌরাঙ্গ! প্রাণগৌরাঙ্গ! প্রাণগৌরাঙ্গ হে!—"

স্বয়ং গৌরবল্লভা মূল গায়িকা—মর্ম্মী সখিদ্বয় আখর দিতেছেন—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ! বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ হে!"—

বিরহিণী প্রিয়াজি আর নিজের নামটি উচ্চারণ করিতেছেন না। সখি কাঞ্চনা পুনর্ব্বার আখর দিলেন—

"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন! বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন! বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন জয় শ্রীশচীনন্দন হে!"

তখন প্রিয়াজি নিজ নামের পরিবর্ত্তে "নদেবাসীর প্রাণধন শ্রীগৌরাঙ্গ হে!" বলিতে লাগিলেন। কখন কখন 'নাগরী-মন-মোহনিয়া নদেবাসীর প্রাণধন"—কখন বা "জয় শচীনন্দন নদেবাসীর প্রাণধন"—এরূপ আখর দিতে লাগিলেন। এইরূপ কীর্ত্তনানন্দের শেষ ফল দশা। প্রেমোন্মাদ-দশাগ্রস্ত হইবার পূর্ব্বক্ষণেই পুনর্ব্বার গৌর-অঙ্গগন্ধে ভজন-মন্দির মহ মহ করিতে লাগিল এবং ইহাতে গৌর-বিরহিণীত্রয়ের মনপ্রাণ প্রেমানন্দে ভরিয়া গেল।

ব্রজগোপিনীগণের যেমন কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধের মত মনপ্রাণ মুগ্ধকর এবং হৃদয়োন্মাদকর সুগন্ধি বস্তু ত্রিজগতে আর কিছুই নাই—নদীয়ানাগরীগণের পক্ষে তদ্রূপ গৌর-অঙ্গ-গন্ধের মত চিত্তোন্মাদকারী এবং মনপ্রাণহারী পরম প্রাণারাম বস্তু ত্রিজগতে আর কিছুই নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমুখ দিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় চমৎকারিতাপূর্ণ কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গৌরকৃষ্ণের রসিকভক্তমণ্ডলীর মনপ্রাণ গৌরকৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ-লোলুপ করাইয়াছেন—ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে ব্রজের বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রাসলীলাস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গগন্ধ বহুদূর হইতে তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। কৃপাময় ও কৃপাময়ী পাঠকপাঠিকা-বৃন্দ এক্ষণে পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় এই অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় গৌর-কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধের অপরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করুন,—

—"কস্তুরী লিপ্ত নীলোৎপল, তার সেই পরিমল,
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।
ব্যপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের করে আঁখি-অন্ধ॥
সখি হে! কৃষ্ণ-গন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে,
কৃষ্ণপাশে ধরি লঞা যায়॥
নেত্র নাভি বদন, কর যুগ চরণ,
এই আট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্ট পদ্ম সঙ্গে॥
হেম কীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ গন্ধে,
মিলি তাকে যেন কৈল চুরি॥
হরে নারীর তনু মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশ বন্ধ।
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত নারী,
হেন ডাকাইত কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ॥
সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙ পিঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥
মদন মোহন নাট, পসারি চাঁদের হাট
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনে মূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়ে করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥
এই মত গৌর হরি, গন্ধে কৈল মনচুরি,
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতা পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মাত্র পায়॥"—
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর উক্তি এই পদ-ছটি বিরহিণী প্রিয়াজিকে সখি কাঞ্চনা গাহিয়া শুনাইলেন—তাঁহাদের সকলেরই এখন বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে—গৌর-অঙ্গ-গন্ধে তখনও ভজনমন্দির মহমহ করিতেছে—প্রাণবল্লভের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে মুগ্ধ হইয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা উন্মাদিনীর ন্যায় গৌরানুরাগরঞ্জিত উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে ভজন-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে মহা উৎকণ্ঠার সহিত ইতিউতি চাহিতেছেন—যেন তাঁহার চিত্ত-চকোর প্রাণবল্লভের অধর-সুধা অনুসন্ধান করিতেছেন। সখি কাঞ্চনার সহিত নয়নে নয়নে মিলিত হইবামাত্র তাঁহার বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল—তিনি পরম প্রেমাবেশে সখি কাঞ্চনাকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া প্রেমাশ্রুনয়নে মর্ম্মভেদী করুণক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে! কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধে প্রমত্ত হইয়া আমার প্রাণ-বল্লভ তাঁহার ভজন-মন্দিরের বাহিরে আসিয়া তাঁহার প্রাণবঁধুয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন—কিন্তু গৌর-অঙ্গ-গন্ধ পাইয়া আমি ত সেরূপ কিছুই করিতে পারিতেছি না—আমার প্রাণবল্লভ নদীয়ায় আসিয়াছেন—তাঁহার অঙ্গ-গন্ধে সর্ব্ব নদীয়া ভরপুর হইয়াছে—সমগ্র নদীয়ার পথে ঘাটে তিনি কীর্ত্তনানন্দে ভ্রমণ করিতেছেন—আমি যে কুলের কুলবধূ—আমি আমার আঙ্গিনার বাহির হইতে পারিতেছি না—আমি লোকাপেক্ষা করি—তাঁহার অনুসন্ধানে নদীয়ার পথে বাহির হইতে পারিতেছি না—একি আমার সামান্য দুঃখ—এখনও আমার কুলের অভিমান গেল না। তবে কি আমি আমার প্রাণবল্লভের দর্শন পাইব না সখি! তিনি যদি আমার মন্দিরে নাই আসেন—আমার কি কর্ত্তব্য নয় তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া গৌর-বিরহ-তাপিত এ প্রাণ শীতল করা এবং তাঁহার চরণে পড়িয়া আমার শত সহস্র পর্ব্বতপ্রমাণ অপরাধরাশি ভঞ্জন করিয়া তাঁহার ক্ষমা-প্রার্থিনী হওয়া? সখি কাঞ্চনে! আমার মত মন্দভাগিনী ও পাপিনী ত্রিজগতে আর একটী তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। আমার নিজের দোষে আমার ইহকাল পরকাল দুইই নষ্ট হইল।"—

এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। মর্ম্মী সখিদ্বয়, তাঁহার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন—এই করুণ ক্রন্দনের মর্ম্মঘাতী রোলে নীলাচলে গম্ভীরামন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভুর আসন টলিল—তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর—তিনিও তখন কৃষ্ণবিরহে দাবদগ্ধ হরিণীবৎ গম্ভীরা-মন্দিরে ছটফট্ করিতেছেন। অকস্মাৎ নবনটবর নদীয়া-নাগরবেশে

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে তাঁহার আবির্ভাব হইল—তাঁহার অঙ্গ-গন্ধে তখন পর্য্যন্ত ভজন-মন্দির মহমহ করিতেছিল—এক্ষণে সেই অপূর্ব্ব অঙ্গগন্ধ যেন গাঢ়তর হইয়া গৌর-বিরহিণী-ত্রয়ের প্রাণমন আকুলিত করিল। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাবের পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখিদ্বয়সহ প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন—তখন দৈববাণী হইল—"প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি আমার স্বপ্নাদেশ পালন কর—মনের সন্দেহ দূর কর,—আমার মূর্ত্তিপূজায় জগজ্জীবের পরম মঙ্গল হইবে—জীবহিতার্থে আমার এই আদেশ পালন করিবে। অপ্রকট-প্রকাশে তোমাদের সঙ্গে এই নদীয়ায় আমার নিত্য মিলন হইবে—তখন নিরবচ্ছিন্ন মিলন ও সম্ভোগানন্দরসে তোমাদের সঙ্গে আমি এইখানেই নিত্যলীলায় অবস্থান করিব—তখন 'নবদ্বীপং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি",—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা এবং তাঁহার মর্ম্মীসখীদ্বয় সকলেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মধুময় কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন—তাঁহারা চমকিত হইয়া প্রেমাবেশে ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন—কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন প্রেমোন্মত্তভাবে গৌরবিরহিণীত্রয় মন্দিরের বাহিরে আসিলেন--চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়াও কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখনও গৌর-অঙ্গ-গন্ধে শচী-আঙ্গিনার সর্ব্বত্র মুখরিত—কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে সেদিন আর গৌর-দর্শন লাভ হইল না। প্রাণবল্লভের দর্শন না পাইয়া তাঁহার অঙ্গ-গন্ধ-মাত্র সম্বল করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্থ হইয়া ভজনমন্দিরের নির্জ্জন বারান্দায় আসিয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের দৈববাণীর কথা ভাবিতেছেন—আর ভাবিতেছেন এবার তাঁহার আবির্ভাবে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হইল না কেন? সখি কাঞ্চনা উঠিয়া বসিলেন—মর্ম্মী সখীদ্বয়ের মধ্যে তখন হৃদিবেদনার মর্ম্মকথার আলোচনা হইল। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয় সখিকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন- "সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার প্রাণবল্লভের দৈববাণীর মর্ম্ম—এখন তাঁহার আবির্ভাব তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিতেই হইবে,—শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে—শীঘ্রই তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে—তখন আমাদের গৌরবিরহ-দুঃখ দূর হইবে—সখি! তোমার প্রাণবল্লভের আদেশ তুমি পালন কর"—

বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে সকল কথাই শুনিলেন—তাঁহার মনের মর্ম্মান্তিক দুঃখ,—হৃদয়ের নিদারুণ ব্যথা,—নয়নের দরদরিত ধারার বিরাম নাই—কিছুতেই তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না - তাঁহার ভজনের কঠোরতা শিথিল হইয়াছে—এক্ষণে তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের স্বপ্নাদেশের বিচার বিশ্লেষণ-ভাব-মগ্ন'—ইহাই তাঁহার বর্ত্তমান ভজন। তিনি তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার কথার কোন উত্তর দিলেন না।

এইভাবে কতক্ষণ গেল—বিরহিণী প্রিয়াজি নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ—যেন গভীর ধ্যানমগ্না, সখিদ্বয় অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহাদের বদনে কোন কথাই নাই। এমন সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তন হইল—তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন—তখনি আবার আত্ম সম্বরণ করিয়া নিজেই সুস্থির হইলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার দুটী হস্ত নিজ দুই হস্তে প্রেমাবেগে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উত্তেজিত ভাবে কহিতে লাগিলেন।—

—"আপন বঁধুয়া বাঁধিয়া আনিব,
কে তারে রাখিতে পারে।
যদি কেউ রাখে ত্যজিব জীবন,
নারী-বধ দিব তারে।"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভার ভাবগতিক দেখিয়া—তাঁহার এই প্রেমোন্মাদ-দশার উৎকর্ষতার শেষাবস্থা দেখিয়া সখি কাঞ্চনা এবং অমিতা বালিকার ন্যায় ডুকারিয়া ডুকারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—প্রিয়াজির উত্তেজিত ভাব,—সুদৃঢ় সংকল্প এবং প্রেমোন্মাদ-প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া সখিদ্বয় পরম শঙ্কিতা হইলেন—কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না।

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজি সখিদ্বয়ের মনোভাব বুঝিয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া পুনরায় মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

—"গৌর গৌর করি জনম গোঙাইনু
দরশন নাহি ভেল।
তিল তিল করি, গৌর-বিরহ তাপে,
হৃদি মোর দহি গেল

রহি রহি মোর প্রাণ কাঁদে কেন
(সদাই) গোরা-রূপ মনে পড়ে।
রহি রহি আমি, চমকিয়া উঠি
(কে আমায়) ডাকে যেন প্রেম ভরে॥
(মোর) প্রাণবল্লভ ডেকেছেন মোরে
আর না রহিতে পারি।
(আমি) মরিব মরিব নিশ্চয় মরিব
মুখে বলি গৌর হরি॥"—
গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজির মর্ম্মব্যাথার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শ্রবণে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইল—আর বুঝাইবার কিছু নাই—তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞা—সকলি বুঝেন ও জানেন—লীলাময় শ্রীগৌরভগবান ও তাঁহার স্বরূপশক্তি লীলাময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর লীলারঙ্গ অতীব বিচিত্র—পরমাদ্ভুত—এবং পরম চমৎকারিতা-পূর্ণ—জীবজগতের পরমমঙ্গলকর এবং পারমার্থিক হিতকর। কৃপাময় ও কৃপাময়ী পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! প্রাণ ভরিয়া এই লীলারসাস্বাদন করুন—আর "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ!" বলিয়া আকুল প্রাণে কাঁদুন। লীলারসাস্বাদনই ভজনানুরাগের পরম ও চরম সীমা। বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদনই ভজনের পরিপাকাবস্থা এবং গৌর-প্রাপ্তির মুখ্য উপায়।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা স্বানুভাবানন্দে গৌরপ্রেম-সমাধি মগ্না—তিনি পরমা ধৈর্য্যবতী—কিন্তু আজ তাঁহার ধৈর্য্যের সকল দিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে—তিনি পুনরায় তাঁহার মর্ম্মী-সখিদ্বয়ের হস্ত ধারণ করিয়া পরম আকুলতাময় গৌরপ্রেমা-বেশে তাঁহার শেষ অনুরোধটি জানাইতেছেন,—

যথারাগ।

—"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
গৌর হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব॥
তোমরা প্রাণের সখি থেক মোর সঙ্গে।
মরণ কালে গৌর নাম লিখ মোর অঙ্গে॥
কাঞ্চনা প্রাণের সখি (গৌর) নাম দিও কানে।
মরা দেহ নড়ে যেন গৌরনাম শুনে॥
না পোড়াইও মোর অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখ নিম্ব-বৃক্ষ-ডালে॥
কবহুঁ যদি পিয়া আসে নিজ জন্মভূমে।
পরাণ পাওব হাম পদ দরশনে॥
পুন যদি চাঁদমুখ হেরি একবার।
গৌর গৌরাঙ্গ বলি উঠিব আবার॥"—

এবার আর মর্ম্মীসখিদ্বয় স্থির থাকিতে পারিলেন না—তাহারা ভজন-মন্দিরের ভূমিতলে আছাড়িয়া পড়িয়া উচ্চ ক্রন্দনের রোলে গৌরশূন্য গৌরগৃহে বিষম আর্ত্তনাদ-ধ্বনি উঠাইলেন,—কলির ভজনই যে রোদন, তাহা স্বয়ং আচরিয়া তাঁহারা কলির জীবকে শিক্ষা দিতেছেন—প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহাদের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—নির্জ্জন গৌরশূন্য গৌরগৃহে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে অন্যান্য সখি ও দাসীগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—সকলি স্বচক্ষে দেখিলেন—তাহাতে তাঁহাদের বক্ষে যেন শেল বিঁধিল—হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। একদিকে বিরহিণী গৌরবল্লভা জড়বৎ নিস্পন্দভাবে ভূমিতলে পড়িয়া আছেন—তিনি যেন প্রাণহীনা—অন্য দিকে তাঁহার গৌরবিরহিণী সখিদ্বয় তাঁহাদের নয়নসলিলে কর্দ্দমাক্ত ভূমিতলে আলুথালু-বেশে গড়াগড়ি দিতেছেন—মুখে তাঁহাদের কেবল—"হা গৌরাঙ্গ-গুণনিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!" ভজন-মন্দিরে যেন প্রেমনদী বহিতেছে,—এই প্রেমনদীর উৎপত্তিস্থান নদীয়ার মহাযোগপীঠ "শচীআঙ্গিনা।" গৌরাঙ্গ-জননী এবং গৌর-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নয়নচতুষ্টয় এই প্রেম-মন্দাকিনীর মূল উৎস।

কোথা দিয়া যে মাঘমাসের শীতের এত বড় রাত্রিটা কাটিয়া গেল গৌর-বিরহিণীত্রয় কেহ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—গৌরশূন্য গৌরগৃহদ্বারে আসিয়া প্রভাতী কীর্ত্তনের দল কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"নিশি হৈল ভোর উঠিল গৌর
কুসুম-শয়ন ছাড়ি।
বিষ্ণুপ্রিয়ারে জাগাইলা
অঙ্গ পরশ করি॥ ধ্রু॥
(তখন) কাঞ্চনা অমিতা প্রিয়সখি যত
মিলিল আঙ্গিনা মাঝে।

নদীয়া-যুগলে, মঙ্গল আরতি,
করিতে সকলে সাজে॥
আইলা মালিনী সীতাঠাকুরাণী,
সর্ব্বজয়াকে ল'য়ে।
শচীমাতা আসি, সম্ভাষিলা সবে
মধু-ভাষে কথা ক'য়ে॥
শুভ শঙ্খ বাজে, হুলু হুলু ধ্বনি
ঘৃত মধু ধুপ দীপে।
নদীয়া-নাগরী করিলা আরতি,
যুগলে নদীয়া ভূপে॥
অগুরু চন্দনে ভূষিলা শ্রীঅঙ্গে
বরষি কুসুম রাশি।
নিরখি নয়নে যুগল-মাধুরী
সবে বলে হাসি হাসি—
(ওহে) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ
উঠ উঠ বেলা হ'ল।
নদীয়ার লোক জাগিয়া উঠিল
চারিদিকে কোলাহল॥
কত সখি কত, বলিতে লাগিল
উপজিল কত হাসি।
দূরে থেকে দেখে যুগল আরতি
অভাগিয়া হরিদাসী॥"—

অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ-মনন পদ্ধতি।

প্রভাতী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি এবং তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের তখন বাহ্যজ্ঞান হইল, যে নিশি প্রভাত হইয়াছে—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা গৌরপ্রেম-বিহ্বলা বিরহবিধুরা প্রিয়াজিকে তখন ধরাসন হইতে উঠাইয়া ধরাধরি করিয়া বাহির বারান্দায় আনিলেন—তখনও এই কীর্ত্তন চলিতেছে—বিরহিণী গৌরবল্লভার তখনও অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থা—কীর্ত্তনের পদটি তিনি নীরবে শ্রবণ করিলেন। তৎপরে পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী ও সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর তাঁহার প্রাণবল্লভের উদ্দেশে সেখানে গলবস্ত্রে তিনি প্রণাম করিলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া পূর্ব্বস্মৃতি সকল তাঁহার মনে জাগরিত হইল। তিনি বিশেষ লজ্জিতভাবে একবার করুণ নয়নে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি চাহিলেন—সে চাহনীর মর্ম্ম—"আর সে সকল পূর্ব্বস্মৃতিকথায় কাজ কি সখি? এখন শেষের দিনের সম্বল **"গৌর হরি"** বল "গৌর হরি হরিবোল" বল—মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতার মনেও পূর্ব্বস্মৃতি সকল জাগরিত হইয়াছে—তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় সখির মনোভাব বুঝিয়া আর কোন কথা বলিলেন না—তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এদিকে প্রভাতে আসিয়া শচী-আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চের সন্নিকটে ঠাকুর বংশীবদন এবং ঈশান দীঘল হইয়া পড়িয়া আছেন—দুই জনেই প্রেমাবেশে আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিতেছেন—ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে "হা গৌরাঙ্গ গুণ-নিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন—তাঁহাদের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি অন্তঃপুরে বিরহিণী গৌর-বল্লভার কর্ণে পৌঁছিয়াছে—তিনি সখি কাঞ্চনাকে পাঠাইয়া অনুসন্ধান করিলেন—ইহারা কে? কেনই বা এত রোদন করিতেছেন? সখি কাঞ্চনা তৎক্ষণাৎ আঙ্গিনায় আসিয়া দেখিলেন ঠাকুর বংশীবদন ও ঈশান ভূমিতলে অর্দ্ধ-মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তখন তিনি তাঁহাদের নিকটে গিয়া বসিলেন এবং সসম্ভ্রমে ও সজলনয়নে কহিলেন—"ঈশান দাদা! বংশীবদন দাদা আমার! তোমাদের এরূপ দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া আমার যে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে—তোমাদের উচ্চ করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি বিরহিণী গৌর-বল্লভার কর্ণে গিয়াছে—তিনিই আমাকে এখানে পাঠাইলেন। দাদা! তোমরা কি চাও"—ঈশান ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে ধীরে ধীরে উঠিয়া সখি কাঞ্চনাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—"কাঞ্চনা দিদি! ঠাকুর বংশী-বদন দাদার মুখে শুনুন তিনি কি চান—আমার আর কিছু চাহিবার নাই—আমার সকল আকাঙ্ক্ষার শেষ হইয়াছে"—

ঠাকুর বংশীবদন ভিতরের কথা সকলি শুনিয়াছেন ঈশানের মনের ভাব তিনিও জানেন—বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনোভাবও কিছু কিছু তিনি শুনিয়াছেন। তিনি ভয়বিহ্বল চিত্তে উঠিয়া বসিয়া সখি কাঞ্চনার নিকট নিজ মনোভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—কাঞ্চনা দিদি! প্রভুর স্বপ্নাদেশে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে—ভাস্কর আসিয়া বহিরাঙ্গনে বসিয়া আছে—এক্ষণে শচীআঙ্গিনায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি

আনয়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর অনুমতি প্রয়োজন—তুমি তাঁহার শ্রীচরণে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া তাঁহার অনুমতি এবং আদেশ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে জানাইলে কৃত কৃতার্থ হইব—এবং প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইব,—নদীয়ার ভক্তগণের পক্ষ হইতে আমি দেবীর নিকট এই অনুমতি ও আদেশ প্রার্থনা করিতেছি"—

সখি কাঞ্চনা এই কথা শুনিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভা তখন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভজন-মন্দিরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন—এমন সময়ে সখি কাঞ্চনা ঠাকুর বংশীবদনের প্রার্থনাটি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি ঠাকুর বংশীবদনের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গৌরানুরাগরঞ্জিত কণক-কেতকীসদৃশ সজল-কমল-নয়নদুটি অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বামহস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদুমন্দ ক্ষীণ কাতর ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার প্রাণবল্লভের আদেশ সর্ব্বকাল ও সর্ব্বত্র সমভাবে বলবান। বংশীবদন ঠাকুর যে স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন—আমিও তাহাই পাইয়াছি। তিনি তাঁহার প্রভুর আদেশ অবশ্য পালন করিবেন। শচীআঙ্গিনায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার প্রেমসেবা প্রচার জীবজগতের পরম মঙ্গলকর।"—

সখি কাঞ্চনা পুনরায় গিয়া ঠাকুর বংশীবদনকে প্রিয়াজির আদেশ যথাযথ ভাবে জানাইলেন। অতিবৃদ্ধ ঈশান উচ্চৈস্বঃরে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন—অতিকষ্টে সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া নিজ কুটীরে পাঠাইলেন—ঈশান আর কোন কথা কহিলেন না—তাঁহার ভজন "কেবলই রোদন"—কলিহত জীবের ভজনই "রোদন"।

সখি কাঞ্চনা তাঁহার গৌরবিরহিণী প্রাণসখির নিকটে আসিয়া পুনরায় কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত—শীঘ্রই শচী-আঙ্গিনায় মহাসমারোহে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবে—নদীয়াবাসী ভক্তগণ এবং বঙ্গদেশের মোহান্তগণ—সকলেই এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন—কিন্তু আমার ঈশান দাদা কিছুই বলিতেছেন না—কেবল কাঁদিতেছেন—তাঁহার ক্রন্দনের আর নিবৃত্তি নাই"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা কথাটী শুনিলেন বটে,—কোন উত্তর করিলেন না—কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। উদাস নয়নে তিনি যেন কি ভাবিতেছেন।

কতক্ষণ পরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া সখি কাঞ্চনাকে ইঙ্গিতে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন—"সখি! চল এখন আমরা ভজন-মন্দিরে যাই"—সখি অমিতা সেখানেই ছিলেন—তিনি কখনও প্রিয়াজির সঙ্গ ছাড়া হন না—প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় তিনি সদাসর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন। দুই সখি মিলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে ধরিয়া লইয়া ভজন-মন্দিরে আসিলেন—তখন চারিদণ্ড বেলা হইয়াছে। ভজন-মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া যখন তাঁহারা বসিলেন—গৌরবক্ষবিলাসিনী বিরহবিহ্বলা প্রিয়াজি তখন মর্ম্মী সখিদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া অতি মৃদু করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"সখি! শ্রীমতি রাধিকার উক্তি একটী প্রাচীন পদে আছে",—

যথারাগ।

—"শীতল তছু অঙ্গবাস, পরশ-রস লালসে,
করল কুল-ধরম-গুণ নাশে।
সো যদি সখি তেজল, কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণাধিকা রে সখি, কাহে তোরা রোয়সি,
মরিলে করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি,
রাখবি দেহ বরজকি মাঝে॥
হামারি দুনো বাহু ধরি, সুদৃঢ় করি বাঁধবি,
শ্যামরূপী-তরু-তমাল-ডালে।
ললাট-হৃদি-বাহুমূলে, শ্যাম-নাম লেখবি,
তুলসী দাম দেয়বি মঝু গলে।
ললিতা লহ কঙ্কন, বিশাখা লহ অঙ্গুরী,
চিত্রা লহ,—

গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির গৌরপ্রেমাবেগে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল—তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না—"প্রিয়সখি কাঞ্চনার অঙ্গে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ যেন প্রেমাবেশে আপনা আপনিই ঢলিয়া পড়িল। পরম প্রেমভরে তাঁহার দুটী বাহুযুগলে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়সখিকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া দুইজনে মিলিয়া যেন একাঙ্গীভূত

হইলেন। প্রিয়সখি কাঞ্চনার বক্ষে বিরহিণী প্রিয়াজি নিজ বদন লুকাইয়া বালিকার ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—সখি কাঞ্চনার উষ্ণ-নয়নজলে তাঁহার পরিধান মলিন বস্ত্রখানি সিক্ত হইয়া গেল। সখি অমিতা নীরবে কাঞ্চনা-বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অপূর্ব্ব সখি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া প্রেমাবেগে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন, আর তাঁহাদিগের অন্তরঙ্গ প্রেম-সেবা করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। কাহারও বদনে কোন কথা নাই—গৌর-বিরহিণীত্রয়ের হৃদয়ে যেন কতশত ভাববৈচিত্রীর ফল্গুনদী বহিতেছে। ভজনবিজ্ঞা ও রাসরসজ্ঞা সুচতুরা সখী কাঞ্চনার মনপ্রাণ যেন প্রিয়াজির মনপ্রাণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া একীভূত হইয়াছে। দুটী গৌর-বিরহিণীর গৌর-প্রেমবিহ্বলতা এবং গৌর-বিরহ-জ্বালার শেষ সীমা উপস্থিত হইয়াছে, এরূপ বোধ হইতে লাগিল।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনোভাব সকলি জানেন সখি কাঞ্চনা। শ্রীরাধিকার উক্তি উপরি উক্ত প্রাচীন পদটীতে গৌরবল্লভার আত্মমর্ম্মকথা গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে—বৃষভানু-নন্দিনী আর সনাতন-নন্দিনী একতত্ত্ব —সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্ববিধ ভাব-সম্পদের একত্ব এবং সমত্ব স্বাভাবিক। ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই—তবে রসের গাঢ়ত্ব হেতু এই অভিনব লীলা-রসাস্বাদন যাঁহাদের হৃদয়ে অনুভূত হয়, তাঁহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণের লীলারঙ্গ আর শ্রীশ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলারঙ্গের অদ্ভুত ও পরমাশ্চর্য্য সমতা পরিলক্ষিত হয় এবং এই সমতামূলক লীলাবৈচিত্রীই লীলালোলুপ অধিকারী রসিক ভক্তজনের পরমাস্বাদনীয় পরম বস্তু ও পরমতত্ত্ব।

বহুক্ষণ পরে বিরহিণী গৌর-বল্লভা ধীরে ধীরে আত্ম-সম্বরণ করিলেন—প্রিয়সখি কাঞ্চনার প্রেমালিঙ্গন মুক্ত হইয়া তিনি একবার অতি কাতর ও বিষাদপূর্ণ-প্রেমাশ্রুযুক্ত নয়নে সখি অমিতার বদনের প্রতি চাহিলেন। মহাগম্ভীরা-প্রকৃতি সখি অমিতা এবার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না —তিনি প্রিয়াজির মলিন ও কাতর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন,—তাঁহার সর্ব্ববিধ গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যের বাঁধ যেন একমুহূর্ত্তে কে ভাঙ্গিয়া দিল—তিনি বালিকার মত বিরহিণী গৌর-বল্লভার ক্রোড়ে প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। প্রিয়াজি তখন তাঁহার প্রিয় সখিকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া পরম প্রীতি ও স্নেহভরে নিজবক্ষে ধারণ করিয়া মৃদুমধুর বচনে কানে কানে দু'একটি কি কথা বলিলেন—তাহা লোক-বিশ্রুতির অগোচর। একমাত্র সখি কাঞ্চনা তাহার মর্ম্ম বুঝিলেন—ক্ষণকালের মধ্যে বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রেমালিঙ্গন মুক্ত হইয়া সখি অমিতা তাঁহার প্রিয়সখির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন—প্রিয়াজির এই অন্তরঙ্গ-সেবাই তাঁহার মুখ্য ভজন—তাঁহার এখন আর অন্য কোন ভজন নাই।

বেলা তখন প্রহরেক হইবে—প্রিয়াজি ও তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রাতঃকালীয় ভজন আজ এই ভাবেই সম্পন্ন হইল। তাঁহারা এক্ষণে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া ভজন-মন্দির হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। দ্বারে দাঁড়াইয়া বিরহিণী প্রিয়াজি প্রেমাকুল প্রাণে উদাস নয়নে সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গাদেবীর শোভা দর্শন করিতেছেন। ফাল্গুন মাস—মৃদুমন্দ দক্ষিণানিল বহিতেছে—নদীয়াবাসী নরনারী-বৃন্দের গঙ্গাস্নানের এই সময়—তাঁহাদের গঙ্গাস্নানের পথ গৌর-শূন্য গৌর-গৃহদ্বার দিয়া—তাঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করিতে করিতে শচী-আঙ্গিনার বহির্দ্বারে প্রণাম করিতেছেন, আর "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!" বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভা বারান্দার ধারে দাঁড়াইয়া সকলি দেখিতেছেন, আর যেন উদাসমনে কি ভাবিতেছেন। তিনি ভজনমন্দিরের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন—মর্ম্মী সখিদ্বয় নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন—ইতি মধ্যে অকস্মাৎ প্রিয়াজি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন —তৎক্ষণাৎ সখিদ্বয় তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন—সখি কাঞ্চনার লক্ষ্য প্রিয়াজির বদনের প্রতি—তিনি মহা সন্ত্রাসিত হইয়া প্রিয়াজির মস্তকে ও বদনে জলের ছিটা দিতেছেন এবং মৃদু মৃদু বীজন করিতেছেন—সখি অমিতা প্রিয়াজির পাদমূলে বসিয়া তাঁহার হস্তপদাদি সেবায় নিযুক্ত আছেন —তিনি দেখিলেন তাঁহার প্রিয়সখির বাম হস্তের শাঁখা গাছটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অর্দ্ধেক অংশ হস্তে সংলগ্ন রহিয়াছে আর অপরার্দ্ধ ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে—ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে একটা ভয়াবহ অমঙ্গল-আশঙ্কার উদ্রেক হইল—তিনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন—কিন্তু মনোভাব গোপন

করিয়া তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে গিয়া আর একগাছি নূতন শাঁখা আনিলেন এবং গোপনে বস্ত্রাচ্ছাদিত প্রিয়াজির বামহস্তে পরাইয়া দিলেন—তাঁহার হস্তের ভগ্ন শাঁখা গাছটি গোপনে নিজ অঞ্চলে বাঁধিলেন। সখি কাঞ্চনাকে তখন এ সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

অন্যান্য সখি ও দাসীগণ গৌর-বল্লভার মূর্চ্ছাবস্থার কথা সখি অমিতার মুখে শুনিয়া সেখানে তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন—সকলে মিলিয়া প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ সেবা করিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

— 'জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত।"—
—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥"—

কিছুক্ষণ পরে বিরহিণী প্রিয়াজি আত্মসম্বরণ করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান পাইয়া নিজ বসন সম্বরণ করিলেন। অকস্মাৎ পতনে তাঁহার শরীরের কোন কোন স্থানে আঘাত লাগিয়াছে,—কিন্তু তিনি স্বয়ং কিছু বলিলেন না—তাঁহার বাম হস্তের নূতন শাঁখা গাছটির উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি একবার ভীত চকিত কাতর নয়নে সখি অমিতার বদনের প্রতি চাহিলেন—অমিতা তাঁহার এইরূপ চাহনীর মর্ম্ম বুঝিয়াও কোনরূপ কথা কহিলেন না—তিনি বদন অবনত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—সখি কাঞ্চনা অমিতার মলিন ও বিষণ্ণ বদনের ভাব এবং নয়নের অশ্রুধারা দেখিয়া বুঝিলেন কি একটা দুর্দ্দৈব ঘটনা ঘটিয়াছে।

সখি অমিতার ইঙ্গিতে অন্যান্য দাসী ও সখিগণ নিজ নিজ কার্য্যে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন—তখন বিরহিণী প্রিয়াজি পুনরায় ধীরে ধীরে ভজন-মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন—তাঁহার আদেশে মর্ম্মী সখিদ্বয় বাহিরে থাকিলেন—মন্দির দ্বার বাহির হইতে সখি অমিতা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সখিদ্বয় তখন দ্বারে বসিয়া সংখ্যানাম জপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুযোগ বুঝিয়া সখি অমিতা কাঁদিতে কাঁদিতে এই দুর্দ্দৈব ঘটনার কথা সখি কাঞ্চনাকে গোপনে কহিলেন এবং নিজ অঞ্চল হইতে ভগ্ন শাঁখা গাছটি বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। সখি কাঞ্চনা দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন—কিন্তু মুখে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না—পাছে সখি অমিতার ইহাতে মনে অধিকতর মর্ম্মবেদনার উদ্রেক হয়। তিনি মন স্থির করিয়া সখি অমিতাকে কহিলেন—"সখি অমিতে! দুর্দ্দৈব বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে—দোষ আমাদেরই—প্রিয়াজিকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিলে এরূপ ঘটিত না—ক্ষীণ ও দুর্ব্বল শরীরে তাঁহার দেহভার দুর্ব্বহ ও অসহ্য হইয়াছে—এক্ষণে আমাদের পক্ষে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন—আমাদের ভজনসাধনের এখন আর কোন প্রয়োজন নাই। যখন গৌরবল্লভার জীবনমরণের ভার আমাদের উপর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ স্বয়ং দিয়াছেন তখন তাঁহার সেবাই আমাদের ভজন-সার।" এই কথা বলিয়া প্রিয়াজির হস্তের ভগ্ন শাঁখা গাছটি তিনি চাহিলেন—কিন্তু সখি অমিতা তাহা দিলেন না—তিনি বলিলেন—"আমি ইহা সযত্নে পেটারির মধ্যে রাখিব—এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হইলে তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে পুষ্পাঞ্জলির সহিত ইহা উপহার দিব"—সখি কাঞ্চনা দেখিলেন সখি অমিতার এই সুদৃঢ় সংকল্পের মধ্যে একটা গুরুতর হতাশের ভাব আছে—সেই ভাবটী তাঁহার বদনেও প্রকাশ পাইতেছে—তাঁহার ভাবগম্ভীর বদনের প্রতি সখি কাঞ্চনা আর দ্বিতীয়বার চাহিতে পারিলেন না—আর তাঁহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

এখন দিবা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে,—বিরহিণী গৌর-বল্লভা নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে জপমগ্না—তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ও দ্বারদেশে বসিয়া সংখ্যানাম-জপমগ্না। মন্দির ভিতরে হঠাৎ করুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল—বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণ-বল্লভের কাষ্ঠ-পাদুকা দু'খানি বক্ষে করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন——আর আত্মনিবেদন করিতেছেন,—

যথারাগ।

—"প্রাণ-বল্লভ হে!
কতদিনে তব, দরশন পাব,
চরণ ধোয়াব, নয়ন জলে।
বুকের মাঝারে লুকায়ে তোমারে,
অভিমান ভরে, চাহিব ছলে।

ক'ব নাক' কথা, (পাছে) মনে পাও ব্যথা,
পদে দিয়ে মাথা, রহিব শুধু ॥
আর না কাঁদিব, নীরবে সাধিব,
লুকায়ে পিইব, চরণ-মধু ॥
গোপনে দু'জনে, বসিয়া নিজনে,
গাব তব সনে, পিরীতি-গান।
কেহ না দেখিবে, কেহ না শুনিবে,
পিরীতি-ভজন, প্রিয়ার মান ॥
গোপনে ভজিব, চরণ পূজিব,
আড়ালে দেখিব, পরাণ চোর।
হে প্রাণ রমণ, পরাণের ধন,
লুকান রতন, তুমি যে মোর ॥"—
—"আড়ালেতে থাকি, এ লীলা নিরখি,
(আমি) কাতরে কাঁদিব পরাণ-ভরি।
হরিদাসিয়ার জীবন আধার,
নদীয়ার চাঁদ গৌরহরি ॥"—

গৌর-গীতিকা।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বিরহিণী প্রিয়াজির সকরুণ মর্ম্মভেদী ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া ভজনমন্দিরের দ্বার ধীরে ধীরে নিঃশব্দে খুলিয়া ভিতরে গিয়া প্রিয়সখির নিকটে বসিলেন—কিন্তু গৌর-বল্লভার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই—তিনি স্বানুভাবানন্দে পুনরায় তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মনিবেদনের করুণ হইতেও করুণ ক্রন্দনের ধ্বনির ঝঙ্কার উঠাইলেন—

যথারাগ।

"প্রাণবল্লভ হে।
তুমি আছ মোর হৃদয় ভিতরে
নিরন্তর অধিষ্ঠান।
আমি আছি কোথা বলে দিয়ে নাথ!
বাঁচাও আমার প্রাণ ॥
বল বল নাথ, রেখেছ কি মোরে
(তোমার) চরণের রেণু করে।
শুনাতে এ কথা শুনিবার তরে,
(আমি) রয়েছি জীবন ধরে ॥
(মোর) মাথে দিয়ে পদ, বল বল নাথ,
তব পদে মোর ঠাঁই।
এ হরিদাসিয়া তবে ত বলিবে
গৌরহরি বল ভাই ॥"—

গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার আত্মনিবেদন গুলি তাঁহার প্রাণের অন্তস্তলের মর্ম্মব্যথাপূর্ণ দুঃখকথা—তাঁহার হৃদয়ের প্রাণঘাতীআত্মকথা,—তাঁহার মর্ম্মন্তুদ মনবেদনার অত্যান্তিব দুঃখপূর্ণ করুণ কাহিনী। মর্ম্মী সখিদ্বয় যতই প্রিয়াজির এই কাষ্ঠপাষাণ গলান আত্মনিবেদনের কথাগুলি শুনিতেছেন—ততই তাঁহাদের হৃদয়ে গৌর-বিরহানল দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিতেছে—তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না সখি কাঞ্চনা বিরহিণী গৌর-বল্লভার পশ্চাতে বসিয়া তখন তাঁহার মধুকণ্ঠে একটী গানের ধুয়া ধরিলেন—সখি অমিতা দোহার দিতে লাগিলেন—

যথারাগ।

—"বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ হে!
কাঁদাতে প্রিয়ারে এত সাধ কেন
বল বল দয়াময়।
আশ্রিত জনে দুখ দিয়ে এত
কি সুখ তোমার হয় ॥
কাঁদিলে দেখ না নয়নে চাহ না
এ কেমন ভালবাসা।
প্রাণে মরে গেলে না দেখ নয়নে
(তুমি) জীবনে না দিলে আশা ॥
(তোমার) চরণের তলে লুটায়ে লুটায়ে
কেঁদে মরে বিষ্ণুপ্রিয়া।
(ওহে) দীনের দয়াল, অনাথের নাথ,
(দশা তার) দেখে হয় নাকি দয়া ॥
একটি আশার কথা কি জান না
(তার) জুড়াইতে হৃদি-জ্বালা।
একবার ফিরে চাহিয়া দেখিলে
(বুঝি) মান যাবে শচী-বালা ॥
তোমার ধরম তুমিই জান হে!
(তোমার) প্রিয়া যে পরাণে মরে।
তোমার চরণ লাভের আশায়
বৃথায় জীবন ধরে ॥

(তুমি) দেখেও দেখ না দয়াল ঠাকুর
কেন গো তোমাকে বলে।
কি দয়া দেখালে আপন জনারে
বল দেখি মোরে খুলে॥
অভিমানে কাঁদি কখন বা রাগি,
কত কথা বলি তোমা।
কাঁদিয়া সাধিয়া করযোড় করি
কতবার চাহি ক্ষমা॥
দয়া করিবে না, দুখ বুঝিবে না,
ওহে বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ!
দাসী হরিদাসী করিছে চরণে
কোটি কোটি প্রণিপাত॥"—
গৌর-গীতিকা।

এই গানটি শেষ করিতে একটু বিলম্ব হইল—সখি কাঞ্চনার কণ্ঠস্বর পদটীর প্রতি চরণেই রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল—মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বর ভঙ্গ হইতেছিল—নয়নধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল—কিছুতেই যেন তিনি গানটী শেষ করিতে পারিতেছেন না। সখি অমিতা তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে বীজন করিতেছেন এবং পরম স্নেহভরে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে নিজ কোমল হস্ত বুলাইতেছিলেন। তাঁহার উষ্ণ নয়ন-জলে প্রিয়াজির পিষ্ঠদেশ ধৌত বিধৌত হইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রেম-সমাধি ভঙ্গ হইল—তিনি অন্তর্দ্দশায় ছিলেন—এখন তাঁহার বাহ্যদশা। তিনি সখি কাঞ্চনার আত্মনিবেদনের গানটি শুনিতে পান নাই। মর্ম্মী সখিদ্বয়কে অত্যন্ত বিষাদিত দেখিয়া দয়াময়ী প্রিয়াজির কোমল হৃদয় বিগলিত হইল—তিনি নিজ দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সখি-দুঃখ দূর করিবার জন্য মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার হস্ত ধারণ করিয়া পরম স্নেহভরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আজ আমার ভজনে মন লাগিতেছে না—সদাই আমার মনে আমার প্রাণবল্লভের অপরূপ রূপ,গুণ ও লীলাকথা মনে পড়িতেছে—পূর্ব্বস্মৃতি সকল একে একে মনে জাগরিত হইতেছে—তুমি সখি! গৌর-কীর্ত্তন কর—আমি শুনিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করি"—এই বলিয়া সখি অমিতার প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকেও বলিলেন—"সখি! প্রাণসখি অমিতে! তোমার মুখে গৌরকথা আমার বড় ভাল লাগে—তোমরা দু'জনে আজ গৌরলীলা গান করিয়া আমার পিপাসিত কর্ণ সুশীতল কর"—এই বলিয়া গৌর-প্রেমোন্মাদিনী সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পুনরায় পরম প্রেমাবেশে মর্ম্মী সখিদ্বয়কে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতার প্রাণে যেন আজ নব বলের সঞ্চার হইল—তাঁহারা এসময়ে তাঁহাদের প্রাণসখির এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া গৌরপ্রেমানন্দে ডগমগ হইলেন—তাঁহাদের বিষণ্ণবদনে বহুদিন হাসি ছিল না—অদ্য প্রিয়াজির কথায় তাঁহাদের বদন প্রান্তে যেন হাসির রেখা দেখা দিল—সর্ব্বজ্ঞা প্রিয়াজি সে হাসির মর্ম্ম বুঝিলেন এবং গৌরপ্রেমানুরাগরঞ্জিত নয়নে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আজ আমার প্রাণের কথা তোমাকে বলি শুন—গৌরকথা এবং গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলা গান ভিন্ন অন্যকথা আমার মনে একেবারেই ভাল লাগে না—আমার প্রাণবল্লভের রূপগুণ-লীলা-গান-মধু আকণ্ঠ পান করিয়াও আমার পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। যে কোন লোকই হউক—যে কোন ভাবেই হউক—গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বলিত যে কোন পদই লিখুন না কেন—তাঁহারা আধুনিকই হউন, আর প্রাচীনই হউন-ভক্তই হউন আর অভক্তই হউন,—তাঁহারা আমার পরম প্রিয় ও হিতকারী নিজজন জানিবে। যাঁহাদের গ্রন্থে গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির বর্ণন আছে—যাঁহাদের রচিত পদে একটীমাত্র গৌরনাম আছে—তাঁহাদের সেই গ্রন্থ বা পদ আমার বড়ই প্রিয়। সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! তোমরা আমার এই প্রাণের কথাটি প্রচার করিও—আমি গৌর-নামের ভিখারিণী—আমি গৌরলীলারসের কাঙ্গালিনী—আমার প্রাণ-গৌরাঙ্গের যাঁহারা গুণ-গান করেন—তাঁহারা আমার মাথার মণি।"—এই কথা বলিতে বলিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার কমল নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

সখি কাঞ্চনা গৌর-বল্লভার শ্রীমুখনিঃসৃত এই পরম উদার্য্যলীলার নিগূঢ় ভাব-সম্পত্তির মহা মহিমা-সাগরে তখন নিমজ্জিত ছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার যেন গৌরপ্রেমতন্দ্রার নেশা ছুটিল। তিনি প্রেমগদগদবচনে গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির চরণে নিবেদন করিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে তোমার প্রাণবল্লভের ঔদার্য্য-লীলা-সমুদ্রে বহুমূল্য ভাবরত্ন

রাজি আছে—যাহার মর্ম্ম সাধারণ ভক্তজনের দুর্ব্বোধ্য—পূজ্যপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রন্থে একটী কৃষ্ণনাম দেখিয়া তিনি তাঁহার তীর্থযাত্রা-সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নীলাচলে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ী গিয়া, তাঁহার মত কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি তীর্থভ্রমণে যাইতেছেন, এই কথা বলিয়া আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শতমুখে তাঁহার প্রসংশা করিয়া আত্ম-শোধন করিয়াছিলেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" শ্রীগ্রন্থ-রচয়িতা বসু রামানন্দের রচিত নিম্নলিখিত একটী পয়ার শ্লোকাংশ দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

—"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত।"—

এতই তোমার প্রাণবল্লভের পরমৌদার্য্যলীলার মহামহিমা! তুমিও তাঁহার মত যে সকল ঔদার্য্যলীলারঙ্গ প্রকট করিতেছ—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তোমারই উদারচরিত্রের মহামহিমা-সূচক।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখি কাঞ্চনার কথাগুলি শুনিয়া অন্তরে সুখী হইলেন বটে—কিন্তু বাহিরে দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সখি কাঞ্চনে! কাহার সঙ্গে কাহার তুলনা দিতেছ? আমার প্রাণবল্লভের কত অনন্ত গুণরাশি—কত অসীম উদারতা—কত অপার দয়া—তাহার কোট্যাংশের একাংশও আমাতে সম্ভবে না। সখি! আর বৃথা বাক্য ব্যয়ে অমূল্য সময় নষ্ট না করিয়া তুমি গৌর-গুণগান কর—আমি শুনিয়া কৃতার্থ হই!"

এই বলিয়া প্রিয়াজি নীরব হইলেন—তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে গৌরকীর্ত্তন-গানের ধুয়া ধরিলেন,—

শ্রীরাগ।

—"মরমে লাগিল রূপ না যায় পাসরা।
নয়নে অঞ্জন হৈয়া লাগিয়াছে পারা॥
জলে যদি ডুবে থাকি সেথা দেখি গোরা।
ত্রিভুবনময় গোরাচাঁদ হৈল পারা॥
তেঞি বলি গোরাচাঁদ অমিয়া-পাথার।
ডুবিল তরুণীমন না জানে সাঁতার॥
বাসুদেব ঘোষে কহে নব অনুরাগে।
সোনার বরণ গোরাচাঁদ হিয়ার মাঝে জাগে॥"—

গৌর পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি একমনে গান শুনিতেছেন—আর মনে মনে ভাবিতেছেন—"পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষের সৌভাগ্যের তুলনা নাই—ভাব-সম্পদে তাঁহার পদগুলি অতুলনীয়। তিনি বলিতেছেন,—

—"জলে যদি ডুবে থাকি সেথা দেখি গোরা।"—

কি সুন্দর ভাব! কিবা মধুর ভাষা! এই একটী কথায় তিনি তাঁহার গৌরপ্রেমের গভীরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন! ধন্য তাঁহার গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠা! গৌর-বল্লভা মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন,—এমন সময়ে সখি কাঞ্চনা আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

শ্রীরাগ।

—"কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ও রূপে মুগধ হৈল নদীয়া নগর॥
বাঁধিয়া চিকন কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গণ মালতী যুথি পারুলী বকুলে॥
মধুলোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ওরূপ দেখিতে প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে॥
মণি মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে॥
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে॥
মন্থর চলনি গতি দুদিকে হেলানী।
অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি॥
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস বলে নিছনি যাও তায়॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি নিবিষ্টচিত্তে গান শুনিতেছেন—আর তাঁহার প্রাণবল্লভের সেই নদীয়ানাগর নবনটবর মূর্ত্তির অপরূপ রূপরাশির ধ্যান করিতেছেন,—সখি কাঞ্চনা আজ গৌরপ্রেমানন্দে ডগমগ—তিনি তাঁহার প্রাণসখির আদেশে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার মনমত গানই করিতেছেন। তিনি পুনরায় ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ তুড়ি।

—"গৌর মনোহর নাগর শেখর।
হেরইতে মুরছই অসীম কুসুমশর॥

কাঞ্চনরুচিতর রচিত কলেবর।
মুখ হেরি রোঁয়ত শরদ সুধাকর ॥
জিনি মত্ত কুঞ্জর গতি অতি মন্থর।
অধর সুধারস মধুর হসিত ঝর ॥
নিজ নাম অন্তর জপয়ে নিরন্তর।
ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর ॥
হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর।
রাই রাই করি পড়ই ধরণীপর ॥
লোচন জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর।
রোঁয়ত করে ধরি পতিত নীচতর ॥
ও রস-সাগরে মগন সুরাসুর।
বিন্দু না পরশ বলরাম পর ॥"—

গৌর-পদতরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌরপ্রেমের অফুরন্ত উৎস—তিনি আজ গৌরপ্রেমানন্দে পরমোৎসাহে বিরহিণী-গৌরবল্লভার আদেশ পালন করিতেছেন। গৌর-পদ-সমুদ্র-রত্নের অক্ষয় ভাণ্ডারী তিনি—শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক অনন্ত পদরত্ন তাঁহার কণ্ঠস্থ—তিনি পুনরায় আর একটী পদের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ কানড়।

—"নাচত নগরে নাগর গৌর, হেরি মুরতি মদন ভোর,
যৈছন তড়িত রুচির অঙ্গ, ভঙ্গ নটবর-শোভনী।
কাম কামান ভুরুক জোর, করতহি কেলি শ্রবণ ওর,
গীম শোহত রতন পদক, জগজন-মনমোহিনী ॥
কুসুমে রচিত চিকুর পুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ,
পীঠে দোলয়ে লোটন তাব শ্রবণ কুণ্ডল-দোলনী।
মাহিষ দধি রুচির বাস, হৃদয়ে জাগত রাস-বিলাস,
জিতল পুলক কদম্বকোরক, অনুখন মন-ভোলনী ॥
গজপতি জিতি গমন ভাতি, প্রেমে বরষ দিবস রাতি,
হেরি গদাধর রোয়ত হাসত, গদগদ আধ বোলনী।
অরুণ নয়ন চরণ কঞ্জ, তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ,
নটনে বাজন ঝনর ঝনন, শুনি মুনিমন লোলনী ॥
মদন চৌদিকে শোহত ধাম, কনক কমলে মুকুতাদাম,
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন, কত রস-পরকাশিনী।
মহাভাবরূপ রসিকরাজ, শোভিত সকল ভকত মাঝ,
পিরীতি মুরতি ঐছন চরিত, রায় শেখর-ভাবণি ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী!

গান চলিতেছে, সঙ্গতের সহিত—এখন দিবা দ্বিপ্রহর—ইতিপূর্ব্বে দিবা দ্বিপ্রহরে এমনভাবে ভজন-মন্দিরে সখি কাঞ্চনা কখন গৌরকীর্ত্তন করেন নাই—আজ গৌর-প্রেমানন্দে তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান নাই! গানের ঝঙ্কার শুনিয়া অন্তঃপুরের অন্যান্য সখিগণ (১) বাদ্য যন্ত্রাদি সহ এই সঙ্গীত-মণ্ডপে যোগদান করিয়াছেন—বিরহিণী প্রিয়াজি সকল দেখিতেছেন এবং শুনিতেছেন—কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতেছেন না—নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরের বারান্দায় দিবা দ্বিপ্রহরে আজ যে গৌর-কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব মধুর ধ্বনি উঠিয়াছে—সে ধ্বনির ঝঙ্কার বিশ্বব্যাপী। সখি কাঞ্চনার কলকণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে—গৌরশূন্য গৌরগৃহ আজ অপূর্ব্ব গৌরকীর্ত্তনে মুখরিত। বিরহিণী গৌরবল্লভা গৌর-প্রেমাবিষ্টভাবে গৌর-কীর্ত্তন শুনিতেছেন। সখি কাঞ্চনা পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ কামোদ।

—"মধুর মধুর গৌরকিশোর, মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর, মধুর মধুর ঠাট ॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত, মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতল ভকত, গাওত মধুর গান ॥
মধুর হেলন, মধুর দোলন, মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর, মধুর মধুর ভাতি ॥
মধুর অধরে জিনি শশধর, মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি মধুর পিরীতি, মধুর মধুর ভাষ ॥
মধুর যুগল নয়ান রাতুল, মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর, বঞ্চিত শেখর রায় ॥"—

সখি কাঞ্চনার গান চলিতেছে,—

রাগ—কামোদ।

—"সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ সুন্দর, সুন্দর সুন্দর রূপ।
সুন্দর পিরীতিরাজ্যের যেমতি, সুঘড় সুন্দর ভূপ ॥

(১)—"পুংস্কোকিল-স্বর-মনোহর কণ্ঠনাদাঃ
সম্মন্দিরা যুগবিভূষিত পাণিপদ্মাঃ।
উচ্চৈর্জগুঃ সপদি নৃত্য মবেক্ষ্য তস্য
হৃষ্টা প্রমোদ মধুরং পুলকা কুলাঙ্গা ॥"—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।

সুন্দর বদনে সুন্দর হাসনি, সুন্দর সুন্দর শোভা।
সুন্দর নয়নে সুন্দর চাহনি, সুন্দর মানস-লোভা॥
সুন্দর নাসাতে, সুন্দর তিলক, সুন্দর দেখিতে অতি।
সুন্দর শ্রবণে, সুন্দর কুণ্ডল, সুন্দর তাহার জ্যোতি॥
সুন্দর মস্তকে সুন্দর কুন্তল, সুন্দর মেঘের পারা।
সুন্দর গীমেতে সুন্দর দোলয়ে সুন্দর কুসুমতারা॥
সুন্দর নদীয়া নগরে বিহার, সুন্দর গৌরাঙ্গচাঁদ।
সুন্দর লীলার সৌন্দর্য্য না বুঝে, শেখর জনম আঁধ॥"—

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌরবল্লভা স্তম্ভভাবে ভজন-মন্দির দ্বারে বসিয়া গৌর-কীর্ত্তন শুনিতেছেন—গৌরময়ী সনাতননন্দিনী আজ যেন ত্রিজগত গৌরময় দেখিতেছেন—সখি কাঞ্চনার গান আর থামে না—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই—রীতিমত সঙ্গতের সহিত গান চলিতেছে—গৌরশূন্য গৌরগৃহে আজ শ্রাবণের ধারার ন্যায় গৌর-নাম-কীর্ত্তন-মধু বর্ষিত হইতেছে, গৌরদাসদাসীবৃন্দ এই গৌর-নাম-মধু কলসে কলসে পূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন বিতরণের জন্য আপামর চণ্ডালে।

সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদা সখি কাঞ্চনা আজ গৌর-প্রেমোন্মাদিনীভাবে নদীয়া-নাগরী-ভাব-সম্পদযুক্ত প্রাচীন পদাবলী গাহিতেছেন—তিনি শুধু সঙ্গীতবিশারদা নহেন—নৃত্যকলাবিদ্যাতেও তিনি সবিশেষ পারদর্শিনী। আজি তিনি গৌরপ্রেমানন্দে সখিমধ্যস্থা গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সম্মুখে অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখাইয়া গৌরকীর্ত্তনে তাঁহার প্রিয়সখির প্রাণে অভূতপূর্ব্ব গৌরপ্রেমানন্দ দান করিতেছেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা প্রাণ ভরিয়া গৌর-নাম-রূপ-গুণ ও লীলামধু পান করিতেছেন। তিনি পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

শ্রীরাগ।

—"চাঁদ নিঙ্গাড়ি কে বা অমিয়া ছানল রে,
তাহে মাজল গোরা-মুখ।
মোতিম দরপন, সিন্দুরে মাজল,
হেরইতে কতই সুখ॥
ভূতলে কি উয়ল চাঁদ॥
মদন বেয়াধ কি, নারী-হরিণী-ধরা
পাতল নদীয়ামে ফাঁদ। ধ্রু॥

গেও মঝু ধরম, গেও মঝু সরম,
গেও মঝু কুল শীল মান।
গেও মঝু লাজ ভয়, গুরু গঞ্জনা চায়,
গোরা বিনু অথির পরাণ॥
গৌর-পীরিতে হাম, ভেল গরবিত
কুল মানে আনল ভেজাই।
জগদানন্দ কহ, ধনি ধনি তুয়া লেহ
মরি যাঁউ লইয়া বালাই॥"

গানের পর গান চলিতেছে—তাল মান সঙ্গীতের সহিত গৌর-কীর্ত্তন-রস-সাগরে উপস্থিত নদীয়ানাগরী-বৃন্দ হাবু ডুবু খাইতেছেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা-আনন্দ-স্বরূপা হইয়া গৌরপ্রেমানন্দ-সাগরে মগ্না—গৌরময়ী-গৌররঙ্গবিলাসিনী-গৌরপ্রেমানন্দে গৌরময় জগত দেখিতেছেন—তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ে গৌর-প্রেমানন্দ-ধারা অবিরল প্রবাহিত হইতেছে। সখি কাঞ্চনার গানের আর বিরাম নাই। তিনি তাঁহার কলকণ্ঠে পুনরায় গানের ধুয়া ধরিলেন,—

শ্রীরাগ।

—"জনু গোরচন, গরব বিমোহন, লোচন কুবলয় কাঁতি।
অতুলন সো মুখ, বিকচ সরোরুহ, অধরহি বান্ধুলি পাঁতি॥
আজু গৌরক দরশন বেলি।
মাইরি দিঠে ভরি, মাধুরী পিবইতে,
লাজ বৈরিণী দুঃখ দেলি॥ ধ্রু॥
নাসা তিল ফুল, দশন মুকুতা ফল,
ঝলমল অটমিকা চন্দ।
ভুরুযুগ চপল, ভুজগ যুগ গঞ্জই,
রঞ্জই কুলবতী বৃন্দ॥
গম্ভীর জলধি, অবধি বুঝি গুণনিধি,
কি কয়ল নিরমাণ।
জগদানন্দ ভণই, নবরঙ্গিনী ভেল তুয়া
অমিয়া সিনান॥" গৌরপদ-তরঙ্গিণী।

সখি কাঞ্চনার হৃদয়খানি গৌর-পদ-সমুদ্রবিশেষ—আজ সেই মহাসমুদ্রে গৌরপ্রেমের বাণ ডাকিয়াছে—মহা তুফান উঠিয়াছে—গৌর-প্রেম-তরঙ্গোদ্বেলিত গৌর-প্রেম-রস-সাগরে আজ গৌরশূন্য গৌরগৃহের অন্তঃপুরবাসিনী গৌরগতপ্রাণা সখি ও দাসীবৃন্দ সকলেই হাবুডুবু খাইতেছেন—বিরহিণী গৌরবল্লভার গৌর-প্রেমানুরাগরঞ্জিত কমল নয়নদ্বয়ে গৌর-

প্রেমের নদী বহিতেছে। নৃত্যকলাবিশারদা সখি কাঞ্চনা অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী করিয়া পুনরায় গান ধরিলেন,—

রাগ—কামোদ—কন্দর্প তাল।

—"দামিনী-দাম-দমন রুচি দরশনে,
দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোন কুসুম তাহে, কোন গণিয়ে রে
প্রান্তর অরুণ সন্তাপ॥
গোরা-রূপের যাউ বলিহারি।
হেরি সুধাকর, মুরছি চরণতলে পড়ি
দশনথ রূপ ধারী॥ ধ্রু॥
সুবরণ বরণ হেরি, নিজ কুবরণ জানি
আপন মনতাপে।
নিজ তনু জারি, ভষম সম করইতে,
পৈঠল আনল সন্তাপে॥
যো মম বিধিক অধিক নাহি অনুভব,
তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহ, পহুক তুলনা পঁহু,
নিরূপম গৌরকিশোর॥"—

অপূর্ব্ব সঙ্গতের সহিত সখি কাঞ্চনার গান চলিতেছে। সখি অমিতা সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া আছেন—সে চাহনির মর্ম্ম—"সখি আর কেন—কিছু বিশ্রাম কর,—বেলা যে তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইল—প্রিয়াজির যে নিয়মিত দৈনন্দিন ভজন শেষ হয় নাই"—সখি কাঞ্চনার বাহ্যজ্ঞান নাই—তিনি যেন পুনরায় নবোৎসাহে গৌরানুরাগে নয়নদ্বয় রঞ্জিত করিয়া সখি অমিতার মনভাবের প্রতি যেন কটাক্ষপাত করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গীর সহিত গান ধরিলেন,—

শ্রীরাগ।

—"চাঁচর চারু চিকুর চয় চূড়হি চঞ্চল চম্পক মাল।
মারুত চালিত, ভালে অলকাবলী,
জনু উছলিত অলি জাল।
মাইরি কো পুন বিহরই ইহ।
সুরধুনী তীরে ধীরে চলি আয়ত,
থির বিজুরী সম দেহ॥" ধ্রু॥
ঢল ঢল গণ্ডমণ্ডল, মণিমণ্ডিত ঝলমল কুণ্ডল বিকাশ।
বারিজ-বদনে বিহসি বিলোকনে বরবধূ বরত বিনাশ॥
কটি অতি ক্ষীণ পীনতহি চীনজ নীলিম বসন উজোর।
জগদানন্দ ভণ, শ্রী'চীনন্দন, সতীকুলবতী মতি-চোর॥—

সখি কাঞ্চনার দৃষ্টি আছে বিরহিণী প্রিয়াজির শ্রীবদনের প্রতি—সখি অমিতার দৃষ্টি কাঞ্চনার বদনের প্রতি—বিরহিণী গৌরবল্লভার কমল নয়নদ্বয় মুদ্রিত—তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের পাদপদ্মধ্যানমগ্না হইয়া গৌর-রূপ-গুণ-গান-রস-সাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিতা আছেন। এবার সখি কাঞ্চনার শুভদৃষ্টি পতিত হইল তাঁহার প্রিয় সখি অমিতার প্রতি—মর্ম্মী সখিদ্বয়ের নয়নে নয়নে যেমন অপূর্ব্ব মিলন হইল—তখন তাঁহাদের স্ব স্ব মনোভাব তাঁহাদের গৌর-প্রেমানুরাগরঞ্জিত প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নকোণে প্রকাশ পাইল। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয় সখি অমিতার মনোভাব বুঝিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের ভাণ দেখাইয়া কাতর নয়নে সখি অমিতার প্রতি চাহিয়া পুনরায় আরও একটী গানের ধুয়া ধরিলেন,—

যথা রাগ।

—'নিরখিতে ভরমে, মরমে মঝু পৈঠল,
যব সঞে গৌরকিশোর।
তব সঞে কোন কি করি, কাঁহা আছিয়ে
অনুভবি নহ পুন ঠোর।
কহিল শপথ করি তোয়।
দ্বিজকুল গৌরব, গৌরক সৌরভে,
চোর সদৃশ ভেল মোয়॥ ধ্রু॥
বিসরিতে চাহি, নহত পুন বিসরণ
স্মৃতিপথগত মুখচন্দ।
করে ধরি কতএ, যতন করি রাখব
অবিরত বিধি নিরবন্ধ॥
ধৈরজ আদি, পহিলে দূর ভাগল
হেতু কি বুঝিয়ে না পারি।
জগদানন্দ সব, অব সমুঝায়ব
রহ দিন দুই তিন চারি॥

সখি অমিতা তখন আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া পরম প্রেমভরে সখি কাঞ্চনার হাত দু'খানি ধরিয়া কানে কানে কি বলিলেন। তখন সখি কাঞ্চনার জ্ঞান হইল এ যে দিবা ভাগ—বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে—তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম

সখির এখনও দৈনন্দিন ভজন শেষ হয় নাই—সখি দাসী-বৃন্দ গৌরপ্রেমানন্দে গৌরকীর্ত্তনে বিভোর—অন্তঃপুরের সমাচার কেহই রাখেন না—এই অসময়ে তিনি যে এতক্ষণ সকলকে এখানে এরূপভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছেন—তাহাতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রিয়াজিরপাদমূলে ত্রাস্তভাবে বসিয়া পড়িলেন—সখি অমিতা ও অন্যান্য সখিবৃন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

গৌরকীর্ত্তনগান ভঙ্গ হইবামাত্র এদিকে বিরহিণী প্রিয়াজির হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি তাঁহার গৌরানুরাগ-রঞ্জিত কমল নয়ন দুটি উন্মীলিত করিবামাত্র দেখিলেন সখি কাঞ্চনা তাঁহার পাদমূলে বসিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—সর্ব্বজ্ঞা ও অন্তর্য্যামিনী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রাণসখির মনোভাব বুঝিয়াই তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া মৃদুমধুর করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন,—"সখি কাঞ্চনে! আমার আর ভজন কি? আমার প্রাণবল্লভের নামরূপগুণগান শ্রবণই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনসার—তুমিই আমার এই ভজনসহায়িনী,—তোমার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না—তোমার আজ বড়ই পরিশ্রম হইয়াছে—তোমাকে যৎকিঞ্চিত সেবা করিয়া ধন্য হই।"

এই বলিয়া গৌরবল্লভা সখি কাঞ্চনাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া পরম প্রেমভরে তাঁহাকে নিজ হস্তে বীজন করিতে লাগিলেন—নিজ বসনাঞ্চলে তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত বদনমণ্ডল মুছাইয়া দিলেন—সখি কাঞ্চনা প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তিনি আর গৌরবল্লভার কোন কথারই উত্তর দিতে পারিলেন না। বিরহিণী প্রিয়াজির ক্রোড়দেশে নিজ মস্তক ন্যস্ত করিয়া স্বানুভাবানন্দে তিনি শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে দেহানুসন্ধান রহিত হইলেন। গৌর-বল্লভা তখন স্বয়ং অতিশয় কাতরকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে মন্দ মন্দ গৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে!

—"আবার কবে আসবে তুমি
বল দয়াময়!
জীবের ভাগ্যে আবার কবে
হবে সে সময়।
ডাকছে তোমা আকুল প্রাণে
গাইছে নাম উদাস মনে
তোমার যত আশ্রিত জন
ব্যাকুল হৃদয়।
আবার কবে আসবে তুমি
বল দয়াময়॥"—

সখি কাঞ্চনার অঙ্গে প্রিয়াজি ধীরে ধীরে পরম প্রেমভরে তাঁহার ক্ষীণ অথচ কুসুম-কোমল মৃদু শ্রীহস্তখানি বুলাইতেছেন—আর মৃদুমন্দ মধুর ক্রন্দনের সুরে বলিতেছেন,—

প্রাণকান্ত হে!

—"সঙ্কীর্ত্তন উঠেছে জেগে
বিশ্ব গগনময়।
নারী নরে সমস্বরে গাইছে
তব জয়॥
সবাই বলে আসবে তুমি,
গৌরহরি হৃদয়-মণি,
আবার হবে নবদ্বীপে—
গৌরাঙ্গ উদয়।
(তাই) সঙ্কীর্ত্তন উঠেছে জেগে—
বিশ্ব গগনময়॥

সখি ও দাসীবৃন্দ সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া প্রেমময়ী গৌর-বল্লভার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শুনিতেছেন—সখি অমিতা অতি মৃদু মধুর স্বরে দোহার দিতেছেন—তাহাতে প্রিয়াজির অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে কীর্ত্তনের পরিশ্রম লাঘব হইতেছে। আর সখি চন্দ্রকলা মৃদুমন্দ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন—সখি বিষ্ণুপ্রিয়া খঞ্জনিতে মৃদু মৃদু তাল দিতেছেন। অতঃপর গৌরবিরহিণী প্রিয়াজি কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন—কাতর ক্রন্দনের সুরে পুনরায় মন্দমন্দ কীর্ত্তনের অস্ফুট ধুয়া ধরিলেন,—

জীবনধন হে।—

—"জগত জুড়ে লেগেছে আজি
হরিনামের মেলা।
সবার সাধ মনের সাধে
দেখ্‌বে নদীয়া-লীলা।

উদয় হও সদয় হ'য়ে
এসহে নাথ! সঙ্গে ল'য়ে
(তোমার) অন্তরঙ্গ ভক্তগণে
(আমার) জীবন সন্ধ্যা বেলা।
জগত জুড়ে লেগেছে আজি
(তোমার) হরিনামের মেলা॥"—

প্রাণসর্ব্বস্ব হে!

—"সে দিন কবে আস্‌বে বল
(হে) প্রাণরমণ।
ভাগ্যে কি মোর ঘটবে তব
চরণ দরশন॥
(আমি) ব'সে যে আছি আশার আশে
দিবস গণি মহোল্লাসে
স্বপ্ন দেখি রাত্রিদিনে
(তোমার) চন্দ্র-বদন।
সেদিন কবে আসবে বল
(হে) প্রাণ-রমণ।
দাসী হরিদাসী কহে
বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ হে!
(আর) বিলম্বে নাহি প্রয়োজন,
(কর) শুভ আগমন।"—গৌর-গীতিকা।

সখি কাঞ্চনার এখন অর্দ্ধবাহ্য দশা—তিনি প্রিয়াজির শ্রীমুখে এই গৌরাবাহন-গীতিটি শ্রবণ করিয়া বাহ্যজ্ঞান পাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—তাঁহার প্রিয়সখির গৌরবিরহ-কাতর প্রেমাশ্রুপূর্ণ মলিন শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার নয়নধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—গৌরবিরহজ্বালায় যেন তাঁর প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইতেছে—তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা প্রাণ সখির কণ্ঠদেশ নিজ বাহুযুগলে পরম প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কলকণ্ঠে গান ধরিলেন,—

যথারাগ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভ হে!
—"এস হৃদি-মাঝে, নব-নটবর সাজে,
যুগল হইয়ে দাঁড়াও হে!
বামে বিষ্ণুপ্রিয়া, অঙ্গ হেলাইয়া,
রসরাজ বেশে এস হে!
হৃদয়-আসনে এসে ব'স হে!
প্রেম পরকাশি, পিরীতের হাসি,
দু'জনার মুখে দেখি হে!
নয়ন ভরিয়ে রূপ হেরি হে!
(তুমি) তেরছ নয়নে, চাহ কার পানে,
(বড়) রসিক শেখর তুমি হে!
বিষ্ণুপ্রিয়া সনে, (মোর) হৃদয়-আসনে,
একবার এসে ব'স হে!
দু'নয়ন ভরি, যুগল মাধুরী,
হৃদি-মাঝে আমি হেরি হে!
বড় সাধ মনে, হেরি এ নয়নে,
যুগলরূপের ডালি হে!
সেই রূপে এস, (মোর) হৃদি-কুঞ্জে ব'স,
(নদীয়া) যুগলে আমি পূজি হে!
রসিক শেখর, গৌর নটবর,
প্রেম-রস-রঙ্গে এস হে!
(গৌর) প্রেমরসে মাতি, করিবে আরতি,
(নদীয়া)-যুগলে হরিদাসী হে!"—
গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা মস্তক অবনত করিয়া সখি কাঞ্চনার গানটী শুনিলেন—একবার প্রেমাশ্রুপূর্ণ কাতর আড় নয়নকোণে প্রিয়সখির প্রতি চাহিলেন—সে চাহনির মর্ম্ম—"আর কেন সখি এ সকল পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগরিত কর,—দুরাশা আর কেন মনে পোষণ কর"। এই বলিয়া তিনি সখি অমিতার প্রতি করুণ নয়নে আর একবার কাতরভাবে চাহিলেন—সে চাহনির মর্ম্ম—'তুমি সখি! একটী গান কর শুনি"—সখি অমিতা এসময়ে প্রিয়াজির অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তিনি ধীরে ধীরে গাহিলেন,—

যথারাগ।

কে মোরে মিলায়ে দিবে গৌর-রতন রে,
গৌর-রতন।
নদীয়ার চাঁদ গোরা পরাণের ধন রে,
পরাণের ধন॥
গৌর-বিরহে মোর পরাণ যে যায় রে,
পরাণ যে যায়।

আঁখির উপরে গোরা নাচিয়া বেড়ায় রে,*
নাচিয়া বেড়ায়॥
সেই তাঁর হাসি মুখ, সে মধুবচন রে,
সে মধুবচন।
কানের ভিতরে পশি, জুড়ায় জীবন রে,
জুড়ায় জীবন॥
নদীয়ার পথে নাচে সোনার গৌরাঙ্গ রে,
(আমার) সোনার গৌরাঙ্গ।
বাহু তুলে হরি বলে রূপের অনঙ্গ রে,
রূপের অনঙ্গ॥
কণক পুতলি গোরা নেচে চলে যায় রে,
(ঐ) নেচে চলে যায়।
প্রেমাবেশে হেলে দুলে আড়ে আড়ে চায় রে,
আড়ে আড়ে চায়॥
গলেতে মালতীমালা, নাসাতে তিলক রে,
(তাঁর) নাসাতে তিলক।
নদীয়ার পথে নাচে শচীর বালক রে,
শচীর বালক॥
ত্রিকচ্ছ কটিতে আঁটা ঝুটি বাঁধা কেশ রে,
(তাঁর) ঝুটি বাধা কেশ।
তিল ফুল জিনি নাসা চারু বাল বেশ রে,
(ও তাঁর) চারু বাল বেশ॥
গৌর কিশোর রূপে ভুবন ভুলায় রে,
ভুবন ভুলায়।
নদীয়া-বাসীর প্রাণ আনন্দে মাতায় রে,
আনন্দে মাতায়।
নদীয়ার প্রাণ গোরা মোর মনচোর রে,
মোর মনচোর।
সাধনের ধন মোর গৌরকিশোর রে,
গৌর কিশোর॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গোরা করুণাসাগর রে,
করুণাসাগর।
হরিদাসী চিতচোরা নদীয়া নাগর রে,
নদীয়া নাগর॥"—
গৌর-গীতিকা।

নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে দিবাভাগে আড়াই প্রহর-ব্যাপী গৌর-কীর্ত্তনযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিবার সময় আসিল যখন—তখন দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে। তখন সকলে মিলিয়া দাঁড়াইয়া সমবেত কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলী করিয়া সকল সখি ও দাসীগণ সমস্বরে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥"—

এই উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া বহিরাঙ্গণে পৌঁছিল—সেখানে নদীয়াবাসী গৌর-ভক্তবৃন্দ সকলে একত্রিত হইয়াছেন—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের জগজ্জনমনোহারী স্বপ্নাদিষ্ট অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি ভাস্করের গৃহ হইতে মহা সঙ্কীর্ত্তনের সহিত মহা সমারোহে সেখানে নীত হইয়াছেন—সেখানেও উচ্চ কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিয়াছে—

যথারাগ।

—"এস—নদীয়া-নাগর, গৌর সুন্দর, চিতপ্রাণ মন-হারী।
এস—গৌরচন্দ্র, ভুবন বন্দ্য, রাধাভাবকান্তি-ধারী॥
এস—হেমবরণ, প্রাণরমণ, নটনর্ত্তনকারী।
এস—নদীয়া-ইন্দু, দীনের বন্ধু, পাপীতাপীত্রাণকারী॥
এস—শচীনন্দন, জগবন্দন, গুপতকুঞ্জবিহারী।
এস—অদোষ দরশা, নদীয়ার শশী, অপরূপ রূপধারী॥
এস—জগতবন্ধু, করুণাসিন্ধু, সঙ্কীর্ত্তন-পরচারী।
এস—রসিক নাগর, শচীর কোঙর, ভবভয় দুখহারী॥
এস—কৃষ্ণস্বরূপ, প্রেমরসরূপ, ভকতি-ব্রজবিহারী।
এস—বর নটেন্দ্র, গৌরচন্দ্র, নবদ্বীপ-বিহারী॥
এস—প্রাণবল্লভ, বিষ্ণুপ্রিয়া-ধব মুনিমনচিতহারী।
এস—শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রিয়ার সঙ্গ, যুগল মূরতিধারী॥
তব—রূপে মুগ্ধ বিরহে দগ্ধ, হরিদাসী তরাচারী॥"—

এই ভাবে আবাহন-গীতি কীর্ত্তন করিয়া নদীয়ার গৌর-ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট অপরূপ শ্রীমূর্ত্তি মহা সমারোহে চৌদ্দমাদল কীর্ত্তনের সহিত শচী আঙ্গিনায় আনয়ন করিয়াছেন—সেখানে নদীয়াবাসী বহু লোকের সংঘট্ট হইয়াছে। দলে দলে কীর্ত্তনীয়া বৈষ্ণবগণ শচী-আঙ্গিনায় আসিয়া এই মহোৎসবে যোগদান করিতেছেন—একদলে গাহিতেছেন,—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীবপ্রতি কর প্রভু শুভদৃ

আর একদলে গাহিতেছেন,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী।"—

অন্য দলে গাহিতেছেন—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর দয়া কর হে।
(একবার) প্রিয়া সনে শচী-আঙ্গিনাতে দাঁড়াও হে॥"—

অপর দলে গাহিতেছেন,—

"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ,
গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া।"

চতুর্থ দলে গাহিতেছেন,—

—"বিবর্ত্তবিলাস গোরা নদীয়া-যুগল হে।
জীবের ভাগ্যে আজি নদীয়ায় উদয় হে॥"—

পঞ্চম দলে গাহিতেছেন—

—"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া।
জয়-নদীয়া-যুগল (বল) নাচিয়া নাচিয়া॥"—

এইরূপে দলে দলে অসংখ্য কীর্ত্তনের দলের মধুর কীর্ত্তনে শচী-আঙ্গিনা মুখরিত হইল।

অদ্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অধিবাস—ঠাকুর বংশীবদন সকল গৌর-ভক্তবৃন্দকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে নদীয়ায় সর্ব্ব গৌরভক্তগণের সমাগম হইয়াছে—চতুর্দ্দিকে বিশাল ও বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তি নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শচী-আঙ্গিনায় নীত হইয়াছেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখি ও দাসীবৃন্দ সহ অন্তঃপুরের বারান্দার অন্তরাল হইতে সকলি দেখিতেছেন—সকলি শুনিতেছেন। আজ যে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অধিবাস তাহা তিনি জানেন—সখি ও দাসীগণও জানেন। সেই জন্যই দিবাভাগে নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে আজ বিরহিণী প্রিয়াজির ইচ্ছায় ও তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রেরণায় পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার অধিবাস কীর্ত্তনের শুভারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে সেই সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইতেছে বহিরাঙ্গনে।

ইতি মধ্যে ঠাকুর বংশীবদন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অতি বৃদ্ধ প্রাচীন ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া সসম্ভ্রমে শচী-আঙ্গিনার অন্তঃপুর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আঙ্গিনার এক প্রান্তে শ্রীতুলসীমঞ্চের সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে গৌরপ্রেমানন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈ স্বরে গৌর-বল্লভার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—"দয়াময়ী বৈষ্ণব-জননি! কৃপাময়ী জগন্মাতা! শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি উপযুক্ত ভাস্কর দ্বারা গঠন করাইয়া শচীআঙ্গিনার বহির্বাটিতে সর্ব্বভক্তগণ মিলিয়া মহাসঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে আনয়ন করিয়াছেন—এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের শ্রীমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত করিয়া শুভ অধিবাস-কার্য্য সুসম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়। কল্য শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার শুভদিন স্থির হইয়াছে। এক্ষণে কৃপাময়ী নবদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী দেবি! কৃপা করিয়া অনুমতি দান করিয়া গৌর-ভক্তগণকে কৃত কৃতার্থ করুন"—এই বলিয়া গৌর-প্রেমানন্দে কাতরপ্রার্থনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতিবৃদ্ধ ঈশানও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া সেখানে উচ্চ ক্রন্দনের প্রাণঘাতী রোল উঠাইলেন—গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কর্ণে সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল—তিনি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন-প্রেমগদগদ বচনে দয়াময়ী গৌরবল্লভা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! তোমরা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে গিয়া মাঙ্গলিক শুভ শঙ্খধ্বনি করিয়া আমার প্রাণবল্লভকে কীর্ত্তনসহ অন্তঃপুরাভ্যান্তরে শুভ আবাহন কর"—সখি কাঞ্চনা ঠাকুর বংশীবদনের নিকট গিয়া সর্ব্বসমক্ষে গৌরবল্লভার আদেশ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন—প্রিয়াজির আদেশ—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার সখিবৃন্দ সকলে কীর্ত্তন সহ অন্তপুরপ্রাঙ্গণে আনয়ন করিবেন। তিনি ঈশানের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"ঈশান দাদা! তুমি অগ্রে গিয়া লোকজনকে সসম্ভ্রমে সরাইয়া দাও"—ঠাকুর বংশীবদন ও ঈশান গৌরবল্লভার উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বহির্বাটিতে গিয়া প্রিয়াজির আদেশ উপস্থিত ভক্তগণকে জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা পরমানন্দে "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ" ধ্বনি দিয়া যেমন ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন, অমনি বহির্দ্বারের কপাট বন্ধ হইল এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি সমন্বিত কীর্ত্তন সহ প্রিয়াজির সখি ও দাসীবৃন্দ বহিরাঙ্গণে গমন করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া

প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়া সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—তৎপরে তাঁহাদের কীর্ত্তন সহ সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া শ্রীমূর্ত্তি অন্তঃপুরাঙ্গণে আনয়ন করিলেন। কীর্ত্তনে মূল গায়িকা সখি কাঞ্চনা—তিনি গাহিতেছিলেন,—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
(একবার) প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥"

অন্তঃপুরে যখন এই কীর্ত্তনধ্বনি উঠিল—তখন সেখানকার নদীয়াবাসী গৌরভক্তগণ বহিরাঙ্গণে একত্রিত হইয়া পুনরায় সেই কীর্ত্তনে যোগ দিলেন,—

"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥"

শচীআঙ্গিনার অন্তঃপুর ও বহিরাঙ্গনের উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি মিলিত হইয়া সমগ্র নবদ্বীপ মুখরিত করিল—নদীয়াবাসী নরনারী বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলে একত্রে কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া শচীআঙ্গিনায় ছুটিয়া আসিল। সকলের মুখেই তখন এই কীর্ত্তন,—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত"

এদিকে অন্তঃপুর প্রাঙ্গণ-দ্বার বন্ধ। সেখানে অন্য কাহারও যাইবার অধিকার নাই—কেবল প্রিয়াজির সখি ও দাসীবৃন্দ আজি গৌর-প্রেমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁহাদের প্রাণের ইষ্টদেবতার শ্রীমূর্ত্তির শুভ অধিবাস করিতেছেন—তাঁহাদের এই গৌরানুরাগপূর্ণ প্রেমপূজার অধিবাসের গান, মন্ত্র, বাদ্যাদি সকলি স্বতন্ত্র। সখিগণ মণ্ডলী করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তিকে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন সহ সাত বার পরিক্রমা ও প্রদক্ষিণ করিলেন—দাসীগণও সঙ্গে আছেন।

বিরহিণী গৌরবল্লভা কিন্তু স্তম্ভভাবে নিজ সিদ্ধাসনে ভজন-মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন—তাঁহার কমলনয়নদ্বয় নিমিলিত—নয়নকোণে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে—তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যভাব—তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীবদনের প্রতি তিনি যেন চেষ্টা করিয়াও চাহিতে পারিতেছেন না—ধ্যানযোগে অন্তরে দর্শন করিতেছেন। তাঁহার হস্তে ইষ্টনামের জপমালা আছে—কিন্তু হস্তাঙ্গুলি বন্ধ আছে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার দুই পার্শ্বে কাঞ্চনা ও অমিতা আসিয়া বসিলেন। সখি চন্দ্রকলা ও সখি বিষ্ণুপ্রিয়া মাঙ্গলিক প্রেম-আরতির আয়োজনে ব্যস্ত—সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে আর দুই জন অন্তরঙ্গা সখি —সুকেশী ও সুরসুন্দরী অন্তঃপুর হইতে প্রভুদত্ত প্রিয়াজির পট্টসাড়ী এবং স্বর্ণালঙ্কারাদি আনয়ন করিলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতার প্রাণের বাসনা তাঁহাদের প্রাণসখিকে দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের বামে দাঁড় করাইয়া যুগলে মাঙ্গলিক আরতি করিয়া প্রেমসেবার শুভারম্ভ করিবেন—কিন্তু তাঁহাদের এই প্রাণের বাসনাটি বিরহিণী গৌরবল্লভা পূর্ণ করেন নাই—তাহার নিগূঢ় রহস্য আছে—যাহা প্রিয়াজিই জানেন।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট অপূর্ব্ব দারুমূর্ত্তি অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার সখি ও দাসীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজিত আছেন—মণ্ডলী করিয়া তখনও সখিগণের উচ্চ কীর্ত্তন চলিতেছে—

"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
প্রিয়া প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥"

গৌরবল্লভার চক্ষের সম্মুখেই তাঁহার প্রাণবল্লভের এই অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন—তিনি স্তম্ভভাবে দূরে বসিয়া পতি-পাদপদ্মধ্যানরতা। তাঁহার শ্রীবদনের ভাবে মর্ম্মী সখিদ্বয় বুঝিলেন—তিনি যেন গৌর-প্রেমানন্দে ডগমগ করিতেছেন—তাঁহার গৌরানুরাগরঞ্জিত নিমিলিত কমল নয়নদ্বয় হইতে শচী আঙ্গিনায় আজ প্রেমনদী বহিতেছে। তাঁহার নয়নের উত্তপ্ত সলিলসম্পাতে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণ-কমল-যুগল সিক্ত করিতেছে—সকল সখি ও দাসীবৃন্দের দৃষ্টি এক্ষণে বিরহিণী গৌরবল্লভার শ্রীবদনের প্রতি পতিত হইয়াছে। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা প্রিয়াজির দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহারা ভাবিতেছেন তাঁহাদের প্রিয়সখি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেই তাঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ করিবেন।

এই ভাবে কতক্ষণ গেল। অকস্মাৎ বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উন্মাদিনীর মত তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীবদনের প্রতি একবার সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া দ্রুত বেগে অসম্বর বসনে আঙ্গিনায় ছুটিলেন।

নিমেষের মধ্যে এই কার্য্য তিনি করিলেন,—মর্ম্মী সখিদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন—কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। গৌরপ্রেমোন্মাদিনী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই পরম প্রেমাবেগে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

—"সেই ত পরাণ নাথে দেখিতে পাইনু।
যাঁর লাগি মনাগুণে দহিয়া মরিনু॥"—

এই কয়েকটী কথা বলিয়াই তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণতলে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া দীঘল হইয়া পড়িলেন—এবং বালিকার মত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার প্রাণঘাতী করুণ ক্রন্দনের আর বিরাম নাই—তখন কীর্ত্তন বন্ধ হইল—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার দুই পার্শ্বে বসিয়া অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন—অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই তাঁহাকে ভূমিতল হইতে উঠাইতে পারিলেন না—তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণতলে ধূলায় লুটাইতেছেন—নয়ন-সলিল-সম্পাতে ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত হইল। তিনি অস্ফুট করুণস্বরে প্রেম-গদগদ-বচনে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছেন—

—"হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা প্রাণবল্লভ! তোমার এই শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আমি কি করিব? তুমি আমার সচল-প্রাণনাথ—সচল জগন্নাথ—অচল প্রাণনাথে আমার কি প্রয়োজন?"—

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ভিন্ন একথা অন্য কেহ শুনিতে পাইলেন না। মর্ম্মী সখিদ্বয় সকলি জানেন—তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ—গৌরবল্লভার এই মর্ম্মভেদী হৃদিবিদারক কথা-গুলি শুনিয়া তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন—কাঁদিয়া আকুল হইলেন—কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না—তাঁহাকে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণতল হইতে কোন ক্রমেই উঠাইতে পারিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাদিগকে যুগলে বসাইয়া মাঙ্গলিক আরতি করিবার বাসনা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। তবে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ালিঙ্গিত বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তিতেই নদীয়া-যুগল বিগ্রহের অপ্রকট-প্রকাশ দর্শনলাভের সৌভাগ্য পাইবেন।

মাঙ্গলিক আরতির সকল আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হইয়াছে—তখন গোধূলি কাল—সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ—পরদিন গৌরপূর্ণিমাতিথির আরাধনা এবং সেই শুভদিনেই শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অধিবাসের জন্য সর্ব্ব গৌরভক্তগণ যথাবিধি সকল আয়োজন করিয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার পর সকল মোহান্ত বৈষ্ণবগণ মিলিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অধিবাস কীর্ত্তন করিবেন। তাহার সকল উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভক্তগণ কেবলমাত্র প্রিয়াজির অনুমতি অপেক্ষা করিতেছেন।

সখি কাঞ্চনা বিরহিণী প্রিয়াজির কানে কানে এসকল কথা বলিলেন এবং তাঁহার সখিবৃন্দের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মাঙ্গলিক আরতি করিবার অনুমতি চাহিলেন। তিনি প্রিয়াজিকে এই অবস্থায় ভূমিতল-শায়িতা দেখিয়া স্বয়ং আরতি কীর্ত্তনে যোগ দিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাও তাঁহাকে বলিলেন। তখন গৌরবল্লভা আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণতল ছাড়িলেন না। তাঁহার পরিধান বস্ত্র কর্দ্দমাক্ত—তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই—সখিগণ নববস্ত্রাদি লইয়া দণ্ডায়মান—সে দিকে দৃষ্টিপাত নাই। সখি কাঞ্চনা মহা বিপদে পড়িলেন—তাঁহার মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ হইলই না—এখন তাঁহার প্রিয়সখিকে স্থানান্তরিত করিবারও সুযোগ পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়াই আরতি করিতে হইবে, এই ভাবিয়া অতি কাতরভাবে তিনি তাঁহার প্রাণসখির হস্তখানি ধারণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নিবেদন করিলেন,—"প্রিয় সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি একটু সরিয়া তোমার প্রাণবল্লভের বাম দিকে উপবেশন কর—আমরা তোমাদের যুগল আরতি করিয়া জীবন সার্থক করি"—বিরহিণী গৌরবল্লভা কথাগুলি শুনিয়া গেলেন—কোন উত্তর দিলেন না। সখি কাঞ্চনা তখন বড় বিপদে পড়িয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি! প্রাণসখি! ইহাতে তোমার অসম্মতি কেন? আমাদের মনে একটু সুখ দিতে তুমি এত কৃপণতা করিতেছ কেন?"—তখন গম্ভীরভাবে প্রিয়াজি কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে। আমাকে তোমরা আমার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণতল হইতে ভ্রষ্ট করিও না। আমি তাঁহার শ্রীচরণের দাসী—একথা যেন তোমাদের স্মরণ থাকে।"—এই কথা বলিয়াই তিনি সখি কাঞ্চনাকে স্বয়ং মাঙ্গলিক আরতি করিতে অনুমতি দিলেন—সখি কাঞ্চনা আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। ঠিক

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঙ্গলিক আরতি আরম্ভ হইল—সখিগণ কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলেন মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি ও শুভ শঙ্খধ্বনির সহিত আরতি আরম্ভ হইল—সখি কাঞ্চনা স্বয়ং আরতির গান ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"জয় শচীনন্দন, জগজ্জনবন্দন,
জগন্নাথ-নন্দন, সর্ব্বগুণনিধিয়া।
জয় সনাতন-নন্দিনী, ত্রিভুবনবন্দিনী,
গৌর-সোহাগিনী, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
জয় নদীয়া-পুরন্দর, গৌর বিশ্বম্ভর,
রসসাগর নাগর, নবদ্বীপ-ইন্দু।
জয় নবদ্বীপেশ্বরী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী,
পদ যুগলে ধরি, দেহ করুণাবিন্দু॥
জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ, নবদ্বীপ মাধব,
কান্তি নব নব, নটনর্ত্তনকারী।
জয় ভক্তিস্বরূপিণী, গৌর-প্রেমদায়িনী,
জীবদুখহারিণী, হ্লাদিনী বরনারী॥
জয় নটবর নাগর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সুবেশ মনোহর, নবদ্বীপ-বনয়ারী।
জয় রাজরাজেশ্বরী মরি মরি মাধুরী,
গৌরাঙ্গচিত্তহারী, শ্রীঅবতার-নারী॥
আঁখিনীরে ভাসি ভণয়ে হরিদাসী,
যুগল-বিলাসী জয় গৌরহরি॥"—

গৌর-গীতিকা।

অতঃপর সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ।
গৌরাঙ্গের প্রাণ-বিষ্ণুপ্রিয়া॥"

বিরহিণী গৌরবল্লভা গলবস্ত্রে করযোড়ে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণতলে বসিয়া মানসিক প্রেমপূজা করিতেছেন—তাঁহার কমলনয়নদ্বয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির চরণদ্বয়ে যেন লিপ্ত হইয়া আছে—তিনি আজ ধ্যানমগ্না মহা তপস্বিনীর মত যেন কোন নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ গভীর তপস্যানিরতা—তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে—শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে—তাঁহার অঙ্গগন্ধে অন্তঃপুর-আঙ্গিনা মহমহ করিতেছে—সখিবৃন্দ তাঁহাকে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির সহিত বারম্বার পরিক্রমা করিতেছেন আর সঙ্গতের সহিত কীর্ত্তন গান গাহিতেছেন,—

যথারাগ।

—"(তোরা) বদন ভরে, বল্ দেখিরে
(জয়) গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
প্রাণ জুড়াবে প্রেম পাবে
ঘুচ্‌বে ভবের মায়া॥
যুগল নামে, ডাক্‌লে গোরা
যুগল হ'য়ে আসে।
যুগল হ'য়ে কলির জীবের
মনের তম নাশে॥
আয়রে সব পাপী তাপী
সময় বহে যায়।
(নদীয়া) যুগল মিলন ভবে অতুলন
দেখ্‌বি যদি আয়॥
(তোরা) দেখ্‌রে চেয়ে বনের পাখী
যুগল নাম গায়।
যুগল রসে মত্ত হ'য়ে
মলয় পবন বয়।
(জয়) গৌরবিষ্ণু- প্রিয়া নামে
গঙ্গা উজান বয়॥
ঐ দেখ্‌রে চেয়ে—
যুগল হয়ে মধুর ভাবে
হাস্‌বে গোরা রায়।
ওরে সব নদেবাসী—
(তোরা) দেখ্‌বি যদি আয়॥
চল্‌ছে নদী সাগর পানে
যুগল নাম গেয়ে।
বনের পশু যুগল নামে
আস্‌চে দেখ ধেয়ে॥
বৃক্ষ লতা দুল্‌ছে দেখ
যুগল-মহিমায়।
স্থাবর জঙ্গম সবাই মিলে
যুগল নাম গায়।
(প্রিয়া) সঙ্গ পেয়ে হাস্‌চে দেখ
নদের গৌরশশী।

বঞ্চিত সুধু এ হেন সুখে
দুখী হরিদাসী ॥”—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াচরিত।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ধ্যানমগ্না বিরহিণী গৌরবল্লভার দুই পার্শ্বে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া আছেন—তাঁহারা আর এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারেন নাই—তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাসখি বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরঙ্গসবায় তাঁহারা নিযুক্ত আছেন। এইভাবে চারিদণ্ড রাত্রি গত হইল।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি অদ্য দিব্য সুগন্ধি ফুল সাজে সজ্জিত হইয়াছেন—সখিগণ আজ তাঁহাকে মনের সাধে নানাবিধ ফুলসাজে সজ্জিত করিয়াছেন। তাঁহার গলদেশে সুগন্ধ মালতী ফুলের মালা—শ্রীহস্তে ফুলের বলয়—কর্ণে কদম্ব পুষ্পের কুণ্ডল—মস্তকে কৃষ্ণচূড়া ফুলের মুকুট-শ্রীচরণদ্বয়ে অশোক ফুলের কলির সুন্দর নূপুর শোভা পাইতেছে—তাহাতে চম্পক পুষ্পের ঝুমুর বাঁধা রহিয়াছে—কটিদেশে গাঁদা ফুলের কিঙ্কিণী—দুই বাহুমূলে বকুলফুলের তাড়—শ্রীচরণতলে রাশি রাশি পদ্মপুষ্প শোভা পাইতেছে—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের সর্ব্ব অঙ্গ আজ ফুলসাজে সুসজ্জিত—শচী-আঙ্গিনায় আজ ফুলসাজে সুসজ্জিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে।

গৌরবল্লভার অসংখ্য সখি ও দাসীবৃন্দ আজ পুষ্পোদ্যান হইতে নানা জাতি সুগন্ধ পুষ্প আহরণ করিয়া মালা গাঁথিতেছেন—আর পরস্পরে গুণ গুণ স্বরে গৌরপ্রেমানন্দে গান গাহিতেছেন—

যথারাগ।

(সখি) “সাজা লো শয়নগৃহ পুষ্প থরে থরে।
(আজ) বসাব তাহার মাঝে শচী দুলালেরে॥
গোলাপ টগর চাঁপা,
তুলি লই হ'তে খোঁপা,
ছুড়িয়া মারিব সখি! গোরা-দেহ পরে।
নদীয়া-নাগরে ভজ কুসুমের শরে॥
শতদল পদ্ম দিয়ে সাজাব চরণ।
যেখানে যা সাজে দিব ফুল আভরণ॥
সুগন্ধি চন্দন দিয়া,
ফুল ডালি সাজাইয়া,
গোরার চরণে দিব করিয়া যতন।
পরাণের ধন গোরা ব্রজের রতন।”—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত।

শচী-আঙ্গিনায় আজ গৌরপ্রেমানন্দের তুফান উঠিয়াছে—সখি ও দাসীগণের আনন্দের আর পরিসীমা নাই—কিন্তু গৌরবক্ষবিলাসিনী এখন পর্য্যন্ত ধ্যানমগ্না—তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীচরণকমলতলে ধরাসনে উপবিষ্টা হইয়া তিনি মহাযোগিনীর ন্যায় যোগমগ্না—ভক্তিযোগের চরম সীমায় তিনি আজ উপনীতা—তপস্যার শেষ সীমার তিনি আদর্শ দেখাইতেছেন। স্বয়ং আচরণ করিয়া গৌরপ্রেমযজ্ঞের পূর্ণাহুতি তিনি আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণে প্রদান করিতেছেন।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির কণ্ঠদেশ হইতে মালতী ফুলের সুগন্ধি প্রসাদী সুন্দর মালা গাছটি ধ্যানমগ্না গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শ্রীমস্তকোপরি পতিত হইল। উপস্থিত সখি ও দাসীবৃন্দ “জয়শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ” বলিয়া প্রেমানন্দে উচ্চ জয়ধ্বনি দিলেন—মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি এবং শুভ শঙ্খ ধ্বনিতে শচী-আঙ্গিনা মুখরিত হইল—বিরহিণী গৌরবল্লভার তখন হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান হইল,—তিনি তখন তাঁহার প্রাণ-বল্লভের আশীর্ব্বাদী প্রসাদী মালাগাছটি বক্ষে ধারণ করিয়া করুণ ও কাতর ক্রন্দনের স্বরে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া করযোড়ে আত্মনিবেদন করিলেন,—

প্রাণবল্লভ হে! যথারাগ।

—“যেন জনম জনমান্তরে পাই তোমারে।
এই বর দাও নাথ! তুমি আমারে॥
ইহজনমের সুখ,— তোমার সে হাসি মুখ,
আর না হেরিব কভু পরাণ-ভরে।
(মোর) এ দুখের নাহি ওর, হৃদয়ে যাতনা ঘোর,
সহিতেছি নিশি দিশি—বসিয়া ঘরে॥
ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়া, তোমার এ বিষ্ণুপ্রিয়া
জুড়ায় হৃদয় জ্বালা—জনম তরে।
(যেন) জনম জনমান্তরে—পাই তোমারে॥”—

প্রাণকান্ত হে!

—“সুখে থাক গুণমণি,—এই প্রার্থনা।
ইহা ভিন্ন অন্য মোর—নাহি কামনা॥

যখন যেখানে থাক, দাসী ব'লে মনে রেখ
(ঐ) চরণের রজ দিতে—যেন ভুল না।
মন্দ-ভাগিনী ব'লে, বঞ্চিত করিলে ছলে,
সেবা অধিকারে তব—একি ছলনা।
চরণের রজ দিতে, আন যদি কর চিতে
ইহার অধিক আর কিবা করুণা॥
সুখে থাক গুণমণি—এই প্রার্থনা॥"—

প্রাণরমণ হে!

"—এ জীবন ভরি আমি কাঁদিব বৃথা।
মরিলেও নাহি যাবে মরম ব্যথা॥
বিধি হ'ল মোরে বাম, পেয়ে নিধি হারালাম,
কারেই বা বলি আমি এ দুঃখ-কথা।
ত্রিজগতে নাহি ঠাঁই, মনের মানুষ নাই,
কি পাপে এ তাপ মোরে দিলা বিধাতা॥
জানি সুধু দাসী আমি, তুমি জগতের স্বামী
তোমার পরাণে দিব কেমনে ব্যথা।
(আমি) আপন দুখের আর কব না কথা॥"—
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপ-গীতি।

এই আত্মনিবেদনের পদটির মর্ম্ম বুঝিয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতা মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন—তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—অস্ফুট ক্রন্দনের সুরে তাহাদের প্রাণসখিকে কহিলেন—"প্রিয় সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! ইতিপূর্ব্বে তুমিই ত বলিয়াছ—

—"সেই ত পরাণ-নাথে দেখিতে পাইনু।
যার লাগি মনাগুণে দহিয়া মরিনু॥"—

তবে পুনরায় আর কেন এমন করিয়া বিলাপ করিতেছ? তোমারই বিরহ শান্তির জন্য তোমার প্রাণবল্লভ এই শ্রীবিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন—এখন এই শ্রীমূর্ত্তির প্রেমসেবা তুমি স্বয়ং কর—এবং সর্ব্বগৌরভক্তগণকে তোমার এই আদর্শ প্রেমসেবার রীতি শিক্ষা দাও"—

বিরহিণী প্রিয়াজি মর্ম্মী সখির কথাগুলি শুনিয়া গেলেন মাত্র—কোন কথা কহিলেন না।

এক্ষণে বিধিনিয়মে শ্রীমূর্ত্তির অধিবাসের সময় উপস্থিত হইয়াছে—বহিরাঙ্গণে গৌরভক্তগণ সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রিয়াজির অনুমতি অপেক্ষা করিতেছেন। অতিবৃদ্ধ ঈশান প্রভুর অন্তপুরের দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছেন—তাঁহাকে সর্ব্বগৌরভক্তগণের পক্ষ হইতে ঠাকুর বংশীবদন জানাইলেন—"শ্রীমূর্ত্তির অধিবাসের শুভকাল উপস্থিত—এখন গৌরবল্লভার অনুমতি প্রয়োজন। তুমি এই কার্য্যভার গ্রহণ কর"। ঈশান আসিয়া বিস্তীর্ণ অন্তঃপুরের আঙ্গিনার এক প্রান্তে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে দীঘল হইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—সে করুণ ক্রন্দনের উচ্চ স্বর সখি কাঞ্চনার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি উঠিয়া ঈশানের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঈশান দাদা! তুমি কাঁদিতেছ কেন? কি হইয়াছে বল দাদা।" তখন ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন—"কাঞ্চনা দিদি! আমার মাথা মুণ্ড আর বলিব কি? বংশীবদন দাদা বলিলেন প্রভুর অধিবাসের শুভকাল উপস্থিত—প্রিয়াজির অনুমতি সর্ব্বগৌরভক্তগণ অপেক্ষা করিতেছেন।"—সখি কাঞ্চনা সকলি বুঝিলেন—ঈশানকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া তিনি বিরহিণী প্রিয়াজির নিকটে আসিয়া গৌরভক্তগণের নিবেদনটি জানাইলেন। তখন বিরহিণী গৌরবল্লভা মৃদুমধুর বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! এখন আমরা ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে যাই—সেখান হইতে অন্তরালে থাকিয়া আমরা শুভ অভিষেক কর্ম্ম দর্শন করিব। সখি ও দাসীগণকে বল, তাঁহারা যেন সকলে দূর হইতে দর্শন করেন। এই অন্তঃপুরপ্রাঙ্গনেই আমার প্রাণবল্লভের শুভ অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইবে—এইখানেই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইবে"—সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির এই আদেশ ঈশানের দ্বারা ঠাকুর বংশীবদনকে জানাইলেন।

অতঃপর মর্ম্মীসখিদ্বয় বিরহিণী প্রিয়াজিকে দুই পার্শ্বে দুইজনে ধরাধরি করিয়া ভজন-মন্দিরে লইয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসাদী এবং আশীর্ব্বাদী মালাগাছটি সযত্নে অঞ্চলে বাঁধিয়া সঙ্গে লইলেন। সখি ও দাসীবৃন্দ সকলেই প্রিয়াজির আদেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিস্তীর্ণ অন্তঃপুরের আঙ্গিনা তখন গৌরভক্তবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। অধিবাসের কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত—শচী-আঙ্গিনায় পুনরায় গৌরকীর্ত্তনের ধুম উঠিল,—মাল্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া উপস্থিত গৌরভক্তগণ

গৌরপ্রেমানন্দে মহা সংকীর্ত্তনে সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে আহ্বান করিলেন। নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ-সকলেই আজ শচী আঙ্গিনায় অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন—বহুদিনের পর আজ তাঁহাদের এই সৌভাগ্য লাভ হইল দেখিয়া সকলেই প্রেমানন্দে "জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ"—"জয় শচীনন্দন গৌরহরি"—উচ্চ ধ্বনি দিতে লাগিলেন—নদীয়া রমণীবৃন্দের মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি এবং শুভ শঙ্খধ্বনিতে শচী-আঙ্গিনা মুখরিত হইল। কিন্তু তাঁহারা গৌরবল্লভা ও তাঁহার সখি ও দাসীবৃন্দের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিতে পাইলেন না। ইহাতে অনেকের মনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল—বিশেষতঃ নদীয়া রমণীগণ ইহাতে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন—তাঁহারা বিরহিণী গৌর-বল্লভার দর্শন আশায় অশ্রুপূর্ণ সতৃষ্ণলোচনে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন—কিন্তু অন্তঃপুরের একটী প্রাণী মাত্রেরও সাক্ষাৎ পাইলেন না।

শচীআঙ্গিনার সম্মুখেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের গৃহদেবতার প্রকাণ্ড ঠাকুর মন্দির—সেই ঠাকুর মন্দিরের পার্শ্বে বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনোপরি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইল—ঘন ঘন হরিধ্বনি ও জয়ধ্বনিতে নদীয়া-গগন মুখরিত হইল—উচ্চ কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিল—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী"—

এইরূপ উচ্চ নামকীর্ত্তনযজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শুভ অধিবাস ক্রিয়া মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখী ও দাসীবৃন্দসহ ভজনমন্দিরের এবং অন্তঃপুরের কক্ষদ্বার দিয়া এই বিধি-নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত শুভ অধিবাস-কর্ম্ম দর্শন করিলেন—রাত্রি দ্বিপ্রহরে এই শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল। তাহার পর সখি কাঞ্চনা ও অমিতা বহু কষ্টে প্রিয়াজিকে তাঁহার প্রাণবল্লভের সামান্য কিছু অধরামৃত প্রসাদ ভোজন করাইলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভার দৈনন্দিন ভজনক্রিয়া আজ এইভাবেই সম্পন্ন হইল। রাত্রির ভজনক্রিয়া যথারীতি গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলাগানে মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ সংসাধিত হইল। এই ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল—পরদিন প্রভাতে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথির আরাধনা এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

সিলং (আসাম)
শারদিয়া মহাষ্টমী
২৪শে আশ্বিন ১৩৩৯ সাল
রাত্রি তৃতীয় প্রহর।

(২৭)

—"গৌররূপোঽভবৎ সা তু শক্তির্বিষ্ণুপ্রিয়া কলৌ।
ভজতেঽনন্যয়া ভক্ত্যা শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতনী"—

অদ্য শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শুভ আবির্ভাবতিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমার নাম দিয়াছেন মহাজনগণ গৌরপূর্ণিমা। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মতিথির মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন—

—"শ্রীচৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পূর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি মুক্তি-স্বরূপিণী।
যঁহি অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥"—

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় তাঁহার রচিত শ্রীবংশীলীলামৃত শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

—"গৌর জন্মতিথি পুণ্যাং ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনীং।
প্রত্যব্দং পূজয়েদ্ভক্ত্যা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং যথা॥
যে কুর্ব্বন্তি নরা ভক্ত্যা গৌরজন্মব্রতং পরং।
তে গচ্ছন্তি পরং ধাম সদানন্দময়ং হরেঃ"—

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শুভজন্মতিথি ফাল্গুনী-পূর্ণিমা গৌরভক্ত মাত্রেরই পরম প্রিয় আরাধনার বস্তু। সমস্ত বৎসরটা ধরিয়া তাঁহারা এই শুভতিথির ও শুভদিনের সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন। শাস্ত্রোক্ত সমস্ত যাগযজ্ঞ ও ব্রতনিয়মাদির ফল তাঁহারা এই এক শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা-তিথির আরাধনাতেই প্রাপ্ত হন।

এই ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-তিথি জীবজগতের পক্ষেও বড় শুভদিন—জগজ্জীবের ভাগ্যে এমন ভুবনমঙ্গল শুভদিন কখন আসে নাই। ২২শে ফাল্গুন ১৪০৭ শক শনিবার পূর্ব্বফাল্গুনীনক্ষত্র, সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, অষ্টবিংশ দণ্ড, পঞ্চ-পঞ্চাশৎ পল সময়ে শুভ চন্দ্রগ্রহণ কালে শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ শচীগর্ভসিন্ধু হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হন।

আজ সেই শুভদিন—সেই শুভ গৌর-পূর্ণিমা-তিথির বিশিষ্ট আরাধনার দিন। এই শুভদিনে গৌর-বিরহিণী সনাতন-নন্দিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সেবিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে ঠাকুর বংশীবদন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে ধামেশ্বর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের দারুময় শ্রীবিগ্রহ প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি—আজ সাড়ে চারিশত বৎসর হইতে সেবক গোস্বামীগণ দ্বারা পরম ভক্তিভরে পূজিত ও সেবিত হইয়া আসিতেছেন।

অতি সুন্দর সুগঠন সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেই মনপ্রাণ মুগ্ধ হয়—অতি বড় দাম্ভিক, ধনী, বিদ্যাভিমানী, জ্ঞানী—মহা যোগীপুরুষও এই অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মস্তক নত করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করেন—হিন্দু রাজা মহারাজা,—এমন কি বিধর্ম্মী যবনরাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি পর্য্যন্ত এই শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী সেবিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত এই আদি প্রাচীন শ্রীবিগ্রহের শ্রীমুখের ভাবটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোকের ন্যায় সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অপূর্ব্ব রূপমাধুরীবিশিষ্ট। যখন কোন পর্ব্বোপলক্ষে সেবাইত গোস্বামীগণ ধামেশ্বর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে নাগরীবেশে সুসজ্জিত করেন তখন ভক্ত-সাধকগণের মনে হয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ালিঙ্গিত এই শ্রীবিগ্রহটিই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী—তিনিই তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে স্বীয় অন্তরের মধ্যে ধারণ করিয়া "অন্তঃ গৌর বহিঃ বিষ্ণুপ্রিয়া" রূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে বিরাজমান। এই প্রাথমিক তত্ত্বজ্ঞানটি তখন সাধকের মনমধ্যে স্বতঃই উদিত হয় এবং পরে ইহা ধ্যানে পরিস্ফুট হয় যে এই অপূর্ব্ব শ্রীবিগ্রহটি ইহা একক শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নহে—ইহা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গমিলিতবপু শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-বিগ্রহ। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ" তত্ত্বকথাটি তখন স্বতঃই সাধকের মনে আসিয়া উদয় হয় এবং "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং" তত্ত্বটিও তখনই প্রকৃতভাবে পরিস্ফুট হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গচরণ স্মরণপূর্ব্বক একটু গাঢ়ভাবে ধ্যানস্থ হইয়া চিন্তা করিলেই "দেহভেদ"ও পরিস্ফুট হয়, অর্থাৎ মনঃশ্চক্ষে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের যুগল শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। তৎপরেই প্রাচীনতত্ত্ব "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং" শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ" শ্রীমূর্ত্তির প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া "দেহভেদং গতং তৌ" শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি স্বতন্ত্রভাবে সাধকের মনঃশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়—তখন গৌরপ্রেমানন্দে তাঁহাদের প্রাণ ভরিয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব,—শ্রীরাধাতত্ত্ব,—শ্রীগৌরতত্ত্ব,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব এবং সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল-তত্ত্ব একে একে সকলই তাহাদের মনে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে পরানন্দের অনুভূত হয়—এবং প্রাণে প্রাণে এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বানুভূতির স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-লিঙ্গিত শ্রীধামেশ্বর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট দারুময়ী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই সর্ব্বশাস্ত্র-তত্ত্বসার ভগবদনুভূতি এবং নিজদনুভুতির বিকাশ হইয়া সাধক-হৃদয় গৌরপ্রেমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হয়—মন গৌরানুরাগে প্রমত্ত হয়—প্রাণ গৌর-যুগলসেবানুরাগে উৎফুল্ল হয়। কৃপাময় গৌরভক্ত পাঠকগণ যখন শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিবেন তখন কৃপা পূর্ব্বক জীবাধম গ্রন্থকারের স্বানুভূতির সহিত কিছু সহানুভূতি দেখাইলে কৃতকৃতার্থ মনে করিব—আপনাদের চরণে চিরদিনের জন্য দাস হইয়া থাকিব।

অন্ত শচী-আঙ্গিনার অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণের বাব আর বন্ধ নাই—এই বিস্তৃত প্রাঙ্গনের সম্মুখে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের গৃহদেবতার ঠাকুরমন্দিরে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এই মন্দিরটি প্রাচীন মন্দির কিন্তু নূতন করিয়া উ[illegible]ক্তভাবে পুনর্গঠিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। সুরম্য ও সুস[illegible]ত দিব্য রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন,—শচী-আঙ্গিনার আজ অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে—গৌর-শূন্য গৌর গৃহ আজ উজ্জ্বল এবং মনোরম নব শোভা ধারণ করিয়াছে—চতুর্দ্দিকে ধ্বজা পতাকা, পরিশোভিত,—গৌরগৃহদ্বারে এবং নদীয়ার প্রসস্ত রাজপথে নদীয়া বাসীর প্রতি গৃহদ্বারে কদলী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে—এবং মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে—তাহার উপর মাঙ্গলিক আম্রশাখা ও নারিকেল ফল শোভা পাইতেছে—চতুর্দ্দিক আজ শুভ শঙ্খঘণ্টার মাঙ্গলিক ধ্বনি এবং কুলনারীবৃন্দের শুভ হুলুধ্বনিতে পরিপূর্ণ—নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে—

দলে দলে নগরকীর্ত্তন গৌরগৃহাভিমুখে আসিতেছে—নদীয়ার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকলেই আজ প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া গৌরগৃহে আসিয়া এই শুভকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন—নদীয়াবাসী বালবৃদ্ধ যুবা ও কুলনারীবৃন্দ সেখানে একত্রিত হইয়া সকলেই প্রেমানন্দে আজ উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছে—"জয় বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ! জয় শচীনন্দন! জয় গৌরহরি!" রবে নদীয়া-গগন মুখরিত—নানাবিধ রত্নালঙ্কারে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি সুসজ্জিত হইয়াছে—রত্নখচিত পীতাম্বরী পট্টবস্ত্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীঅঙ্গ পরিশোভিত—শ্রীমস্তকে স্বর্ণমুকুট—বক্ষে বহুমূল্য মণিরত্নহার—শ্রীহস্তে সুবর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদ ও বলয়—শ্রীচরণে সোনার নূপুর অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে—নটবর নদীয়া-নাগরবেশে আজ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ শচী-আঙ্গিনার মহা যোগপীঠে দণ্ডায়মান। তাঁহার অপরূপ রূপের ছটায় শচী-আঙ্গিনা আজ উদ্ভাসিত—নদীয়া-নাগরীবৃন্দ যূথে যূথে শচী-আঙ্গিনায় আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন—তাঁহারা গান ধরিয়াছেন,—

যথারাগ।

—"রূপ দেখ্‌বি যদি আয়।
রূপের সাগর বহে শচী-আঙ্গিনায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগোরা প্রেমানন্দ-রসে ভোরা
দেখ সবে আসিয়াছে পুনঃ নদীয়ায়।
ওগো সব নদেবাসী (তোরা) দেখ্‌বি যদি আয়॥"

নদীয়া-বালকবালিকাগণেও পরমানন্দে গান গাহিতেছে—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগোরা এসেছে আবার।
সন্ন্যাসের ভারিভুরি গিয়াছে তাহার॥"

নাগরিক সাধারণ লোকে গৌর-প্রেমানন্দে গান করিতেছে—

যথারাগ।

—"তোমার চরণে কিবা অপরাধ
করেছিনু মোরা জানিনে।
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া
গিয়েছিলে তুমি কোন্ খানে?
সোনার সংসার ক'রে ছারখার
(ওগো) গিয়েছিলে তুমি কোন্ খানে?
(তুমি) ঘরের ঠাকুর আসিয়াছ ঘরে
তোমার প্রিয়ার সাধনে।
(তোমায়) আর না ছাড়িবে স্বজনে॥
হরিদাসিয়ার জীবন আধার
(আবার) এসেছে আপন ভবনে॥"— গৌরগীতিকা

গৌরনামের অষ্টপ্রহর চলিতেছে—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারী॥"—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন স্বয়ং বংশীবদন ঠাকুর,—তিনিই শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা-তিথিতে শুভদিন স্থির করিয়া সর্ব্বত্র গৌরভক্তগণকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীধামে এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে মহা-মহোৎসবের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন। নানা স্থানের গৌরভক্তগণ শ্রীধামে আসিয়া এই শুভ কার্য্যে যোগদান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন—শ্রীপাট খেতরিতে ঠাকুর নরোত্তম প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-যুগল বিগ্রহের শুভ প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন শ্রীনিবাসআচার্য্য মহাশয়। শ্রীধাম নবদ্বীপের এই স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর বংশীবদন। ইঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীল মনোহরদাস বাবাজী মহারাজ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—তাহার নাম "অনুরাগবল্লী"—এই গ্রন্থখানি ১৬১৮শকে রচিত হয়—ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর কঠোর ভজন কথা বিস্তারিত লিখিত আছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কথাও এই গ্রন্থে এবং বংশীশিক্ষা শ্রীগ্রন্থে লিখিত আছে। শ্রীল মনোহর দাস তাঁহার শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

—"দিন স্থির করি তবে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার।
সর্ব্ব ঠাই পত্র দিলা চটের কুমার॥ (১)

(১) শ্রীধাম নবদ্বীপের দক্ষিণ কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম নিবাসী উচ্চ সদ্‌ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত শ্রীল দুকড়ি (মাধব) চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুর বংশীবদনের পিতা ছিলেন। ঠাকুর বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দের "বংশীর" অবতার। ১৪১৬ শকে চৈত্রপূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীল দুকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতি সুনীলার গর্ভে বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ তাঁহাকে গোপনে রসরাজ মন্ত্র প্রদান করিয়া প্রেমভক্তির গূঢ়রহস্য রসরাজতত্ত্ব তাঁহার নিকটেই প্রথম উদ্ঘাটন করেন।

নিরূপিত দিনে সবে কৈল আগমন।
শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা তবে করেন বদন ॥
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার কৈল আয়োজন যত।
শ্রীঅনন্তদেব নারে বর্ণিবারে তত ॥
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে আসি যত দেবগণ।
প্রতিষ্ঠার কালে গোরা করেন দর্শন ॥
প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন।
সকলে করান মহাপ্রসাদ ভোজন ॥"—অনুরাগবল্লী।

মহা সমারোহে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা-কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিরহিণী গৌর-বল্লভা সেদিন পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সেই এক ভাবে মৌনব্রতাবলম্বিনী,—ভজনমন্দিরে তিনি একাকিনী পতিপাদ-পদ্ম-ধ্যান-মগ্না। মর্ম্মী সখিদ্বয়ের পর্য্যন্ত সেদিন তাঁহার নিকটে যাইবার অধিকার নাই—এইরূপ প্রিয়াজির কঠিন আদেশ। শচী-আঙ্গিনায় এত ধূমধাম—এত লোক-সংঘট্ট—এত মহামহোৎসবের ব্যাপার—এত সঙ্কীর্ত্তনের ধুম—ইহার কিছুর মধ্যেই বিরহিণী গৌরবল্লভা নাই—তিনি অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের সম্মুখে তাঁহার ভজনমন্দিরেই আছেন—দ্বার রুদ্ধ,—বাহিরের কোন সংবাদই তিনি রাখেন না। গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর গৌরপূর্ণিমা তিথি-আরাধনার বিধিনিয়মগুলি পাষাণের রেখার ন্যায় চিরস্থায়ী নিয়ম। এতদিন পর্য্যন্ত কোন কারণে তাঁহার এই বিধিনিয়মগুলি কোন বৎসর ভঙ্গ হয় নাই। মর্ম্মীসখি কাঞ্চনা ও অমিতা অন্যান্য সখি ও দাসীগণ লইয়া অন্তঃপুরের নির্জ্জন একটী কক্ষে বসিয়া গৌরনাম জপে মগ্না—তাঁহারাও উপবাসী। সখি কাঞ্চনা মধ্যে মধ্যে ভজন-মন্দিরের গবাক্ষদ্বার দিয়া গৌরবিরহিণী প্রিয়সখির সংবাদ লইতেছেন। তিনি তাঁহার সিদ্ধাসনে বসিয়া নিশ্চেষ্টভাবে জপমগ্না—সম্মুখে তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রূপসাম্য চিত্রপটখানি—আর নিম্নে তাঁহার শ্রীচরণ-পাদুকাদু'খানি,—দিব্যাসনে বিরাজমান। একটী ঘৃতদীপ দিবারাত্রি মিটি মিটি জ্বলিতেছে।

এক্ষণে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর—মহামহোৎসবের লোক-কোলাহল এবং লোক-সংঘট্ট তখন নিবৃত্তি হইয়াছে—কেবল অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলিতেছে—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারি ॥"—

সখি কাঞ্চনা অমিতাকে সঙ্গে করিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরের গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন,—তাঁহাদের প্রাণসখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গলবস্ত্রে করযোড়ে করুণ ক্রন্দনের সুরে প্রেমগদগদবচনে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিতেছেন—

যথারাগ।

—"দয়া কর দয়ানিধি নবদ্বীপ-চন্দ্র।
না জানি ভজন আমি আর মন্ত্রতন্ত্র ॥
জানি শুধু প্রাণবঁধু তুয়া মুখচন্দ।
প্রেমে মাখা ঢল ঢল আনন্দ-কন্দ ॥
আর জানি তুমি শুধু করুণার সিন্ধু।
পতিত পাবন প্রভু তুমি দীনবন্ধু ॥
বুঝি শুধু তুয়া নাম সার সর্ব্ব ধর্ম্ম।
তুয়া নাম গান সর্ব্ব ভক্তিশাস্ত্র মর্ম্ম ॥
আনন্দ-নীরে ভাসি, হেরি পদদ্বন্দ্ব।
বন্দন হেরিলে হয় নাশ ভব বন্ধ ॥
তুয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন, তুয়া ভক্তসঙ্গ।
লীলাকথা আলাপন, ভজনের অঙ্গ ॥
নাহি বুঝি কুল মান, তুয়া নাম সর্ব্ব।
গৌরদাসী বলে যদি, ইহ বড় গর্ব্ব ॥
দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া করেন নিবেদন আয়।
দাসী হরিদাসী গায় নামেরই মাহাত্ম্য ॥"—
গৌর-গীতিকা।

বিরহিণী প্রিয়াজির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ক্ষীণতর বোধ হইতে লাগিল—ক্রমশঃ তাঁহার বাক্রুদ্ধ হইয়া আসিল—তিনি নীরবে বহু ক্ষণ থাকিলেন—নয়ন-ধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে,—নিস্পন্দভাবে তিনি তাঁহার আসনে বসিয়া আছেন। মর্ম্মী সখিদ্বয় গবাক্ষদ্বার দিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির কঠোর গৌর-ভজন-প্রণালী দর্শন করিতেছেন—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তাঁহারা ভাবিতেছেন কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে—কতক্ষণে তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা প্রিয়সখির ভজন শেষ হইবে—মৌনব্রত উদ্‌যাপন করিয়া তিনি শ্রীমন্দিরের বাহিরে আসিবেন।

শচী-আঙ্গিনায় অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলিতেছে—শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের অন্তরঙ্গ সকল ভক্তগণই এই কীর্ত্তনে আছেন—সকলেরই মনে আজ গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-

দেবীর কঠোর গৌরভজনাদর্শের মহামহিমার প্রভাব বিশিষ্ট-ভাবে জাগরিত হইয়াছে। প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী গৌরবক্ষ-বিলাসিনীর প্রকৃত তত্ত্ব আজ তাঁহাদের সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে—আজ তাঁহাদের সর্ব্বক্ষণই মনে হইতেছে শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের রচিত সেই পুণ্যশ্লোকটি,—

—"অনাদৃত্যোদ্গীতামপি মুনিগণৈর্বৈদিক মুখৈঃ।
প্রবীণাং গান্ধর্ব্বামপি চ নিগমৈস্তৎপ্রিয়তরাং॥
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটী দাম্ভিকতয়া।
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি না যামি ব্রতমিদং॥"—(১)

আর তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেছেন গৌর-বল্লভা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পাদ-পদ্মে দাসীত্ব স্বীকার ভিন্ন গৌরপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাদিগের মনে আরও একটী নব ভাবের উদয় হইতেছে, সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীব্রজযুগলের ন্যায় শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও উপাসনার প্রচার এখন প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ মনোভাবের মূলে যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছা বা প্রেরণা অন্তর্নিহিত আছে—তাহাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন। এই প্রেরণার ফলে প্রথমে শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—তৎপরে শ্রীপাট, শ্রীখেতরীতেও মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-যুগল শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার শুভারম্ভ হয়।

এক্ষণে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—শচী-অঙ্গনে কীর্ত্তন-রণরঙ্গে গৌরভক্তগণ মাতিয়া উঠিয়াছেন—তাঁহাদের গৌর-প্রেমানন্দে ঘনঘন উচ্চ জয়ধ্বনি এবং গৌরপ্রেমাবেশে উদ্দণ্ড নৃত্যবিলাসে সমগ্র নদীয়া যেন টলমল করিতেছে—কিন্তু বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার নিভৃত ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে একান্তে বসিয়া পতিপাদ-পদ্ম-ধ্যানমগ্না—অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশও করিতেছে না,—মর্ম্মী সখিদ্বয় ভজন-মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া গবাক্ষ দিয়া সাশ্রুনয়নে মহা উদ্বিগ্নচিত্তে বিরহিণী প্রিয়াজির মহাজ্যোতির্ম্ময়ী তপস্বিনী-মূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন।

অর্থ,—বীণাবাদক নারদাদি মুনিগণ বেদমন্ত্রে যাঁহার নাম গান করিয়াছেন—সেই প্রবীণা গান্ধর্ব্বা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাকে দাম্ভিকতা বশতঃ অনাদর করিয়া যে কপটী কেবল গোবিন্দের ভজনা করে,—তাহার অপবিত্র সমীপদেশে আমি ক্ষণকালও গমন করি না—ইহাই আমার স্থির ব্রত।

ক্রমশঃ প্রভাত হইল—পিক কুক্কুটাদি পক্ষীর কলরবে নদীয়াবাসী নরনারী সকলে জাগরিত হইল—বালার্ক-কিরণচ্ছটায় গঙ্গাতীরস্থ বনরাজি গৌরপ্রেমে উদ্ভাসিত হইল—প্রাতঃসমীরণ গুণ গুণ করিয়া গৌরগান গাহিতে লাগিল—নদীয়াবাসী গৌরভক্ত নরনারীবৃন্দ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া কি করেন—নিম্নলিখিত পদটিতে তাহা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে—

যথারাগ—

—"প্রভাত হ'লে, গৌর ব'লে, শয়ন হ'তে উঠিয়া।
গৌর হরি, স্মরণ করি, হৃদয় উঠে মাতিয়া॥

তাঁহারা দেখেন—

প্রভাত বায়, বহিয়া যায়, গৌর গান গাহিয়া।
তরুর শাখে, পাপিয়া ডাকে, গৌরনাম অমিয়া॥
তরুণ রবি, গৌরছবি, সোনার রং মাখিয়া।
কিরণ ধারে, অমিয়া ঢারে, জগতময় ছাইয়া॥
আকাশ গায়ে, মেঘের দ্বারে গৌর-রূপ হেরিয়া।
গৌর নামে, গৌর-গানে, উঠেছে জীব মাতিয়া॥
রূপের আলা, শচীর বালা, চলেছে যেন নাচিয়া।
কিরণ ছটা, রূপের ঘটা, ভুবন আলো করিয়া॥
ভরিয়া আঁখি, সে রূপ দেখি, আপনা হারা হইয়া।
যেদিকে হেরি, গৌরহরি, নয়ন গেল ধাঁধিয়া॥
(তাঁরে) ধরিতে নারি, নয়নে বারি, জনম গেল কাঁদিয়া।
হরিদাসিয়ার, কাঠ অন্তর, গেল না কেন ফাটিয়া॥"—

গৌর-গীতিকা।

এইভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরভক্ত নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ প্রত্যহ প্রত্যূষে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-মনন রূপ প্রাথমিক ভজনারম্ভ করেন। অদ্য তাঁহারা সকলেই গৌরপ্রেমানন্দে শচীআঙ্গিনায় অতি প্রত্যূষেই ছুটিয়াছেন—আজ সেখানে অষ্টপ্রহর গৌরকীর্ত্তনের দধিমঙ্গল-উৎসব—বহু লোকের সমাগম হইয়াছে—প্রভাতী কীর্ত্তনের মধুর সুর উঠিয়াছে—

—"ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, কহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
লহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম রে।
যে জন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজে,
সে হয় আমার প্রাণ রে॥"—

স্বয়ং অবধূত শ্রীশ্রীনিত্যানচন্দ্র কোথা হইতে ছুটিতে ছুটিতে অকস্মাৎ প্রাতে আসিয়া ঠিক সময়ে এই প্রভাতী কীর্ত্তনের

ধুয়া ধরিলেন। তিনি গৌরপ্রেমানন্দে প্রেমোন্মত্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে শচী-আঙ্গিনায় গৌরপ্রেমের তুফান উঠাইলেন—তখন সর্ব্বভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মণ্ডলী করিয়া গৌরপ্রেমাবেশে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমার কুলের ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ রায় গৌরপ্রেমানন্দে আজ উন্মাদের ন্যায় লম্ফঝম্প করিয়া সমগ্র শচী-আঙ্গিনায় গৌর-প্রেমের বন্যা উঠাইলেন—তাঁহার পরিধানবস্ত্র প্রেমাবেশে কটিদেশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে শান্তিপুরনাথ শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সেখানে আসিয়া তাঁহাকে পুনরায় বসন পরাইয়া দিয়া দুইজনে গৌরপ্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া একসঙ্গে সুরে সুর মিলাইয়া এই কীর্ত্তন গানে যোগ দিলেন—

—"ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, কহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
লহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম রে।
যে জন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজে—
সে হয় আমার প্রাণ রে॥"

শচী-আঙ্গিনায় তখন গৌর-প্রেম-মহাসাগরের অপূর্ব্ব তরঙ্গ উঠিল—সেই উত্তাল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে সর্ব্ব নদীয়াবাসীর প্রাণে গৌরপ্রেমের প্রবল তুফান উঠাইল—নদীয়া-গগন প্রকম্পিত করিয়া কীর্ত্তন-ধ্বনি উঠিল—

—"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,—প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া"—

নদীয়ার জলস্থল অন্তরীক্ষ এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দে মুখরিত হইল—পতিতপাবনী সুরধুনীর তরঙ্গমালা গৌর-প্রেমোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত ধবলফেনপুঞ্জসহ উজান বহিতে লাগিল—নদীয়ার আকাশে, পবনে, সলিলে ও স্থাবরজঙ্গমে গৌরপ্রেম-তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অপূর্ব্ব মধুময় ধ্বনি ধ্বনিত হইতে লাগিল। শান্তিপুরের বুড়ামালি আর আমার কুলের ঠাকুর অবধূত নিত্যানন্দরায় উভয়েই গৌরপ্রেমানন্দে কটি দোলাইয়া, অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—

"জয় গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া,—প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।"—

সর্ব্বভক্তগণ তখন সমস্বরে দোহার দিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের এই অপূর্ব্ব জয়ধ্বনি নদীয়ার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালভেদী এই জয়ধ্বনি বৈকুণ্ঠ ভেদ করিয়া গোলোকে প্রবেশ করিল। (১)

"জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" ধ্বনি উঠিল গগনে।
চমকিলা ত্রিদিবেতে সকল দেবগণে।
ভেদিয়া ত্রিদিব, ধ্বনি বৈকুণ্ঠেতে গেলা।
লক্ষ্মী নারায়ণে ধ্বনি উভে চমকিলা॥
মহালক্ষ্মীর নাম শুনি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
সসম্মানে করযুড়ি বন্দিলা আপনি॥
নারায়ণ জিজ্ঞাসিলেন কাহাকে বন্দিলা।
"গোলোকেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া" লছিমি কহিলা॥
"জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" বলি তবে নারায়ণ।
সসম্ভ্রমে নতশিরে করিলা বন্দন॥
বৈকুণ্ঠ ভেদিয়া তবে উঠে জয়ধ্বনি।
গোলোকেতে রাধাকৃষ্ণ আনন্দিত শুনি॥
"জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" ধ্বনি কর্ণে রাধিকার।
বাজিল মধুর অতি,—মধুর ঝঙ্কার॥
রাধা কহেন প্রাণকান্ত। কি অপূর্ব্ব নাম।
কৃষ্ণ বলেন বিষ্ণুপ্রিয়া তব এক নাম॥
গৌর-গোবিন্দরূপে নব বৃন্দাবনে।
তব সঙ্গে আছি আমি নবদ্বীপ ধামে॥
কৃষ্ণ-গোবিন্দ আর গৌর-গোবিন্দ।
অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞানে পরম আনন্দ॥
রাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া নামে অদ্বয় সম্বন্ধ।
নামমাত্র ভেদ ইহা শাস্ত্রের নির্ব্বন্ধ॥
এত কহি রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসে।
(জয়) "বিষ্ণুপ্রিয়া" ধ্বনি উভে দেন প্রেমাবেশে॥
গোলোকের পরিকর তবে সবে মিলি।
কীর্ত্তনের শুভারম্ভে প্রেমে ঢলাঢলি॥
"জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" বলি সবে প্রেমানন্দে।
মাতিলা কীর্ত্তন-রঙ্গে পরম আনন্দে॥
"জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" বলি ঊর্দ্ধে বাহু তুলি।
নাচিলা কীর্ত্তনে তবে কৃষ্ণ বনমালী॥
গোলোকেতে নবদ্বীপ হইলা প্রকাশ।
গৌর-কৃষ্ণ অদ্বয়তত্ত্ব হইলা বিকাশ॥
রসিক ভকতজনে উল্লসিত হিয়া।
কীর্ত্তন আরম্ভিলা (জয়) গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া॥
ব্রজের যুগল ভেল নদীয়া-যুগল।
প্রেমানন্দে সবে বলে গৌর হরিবোল॥
দাসী হরিদাসী ভণে গোলোকের রঙ্গ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাগে কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ॥ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গল।

বহুদিন পরে নদীয়ায় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আজ হঠাৎ আসিয়াছেন—অবধূত নিত্যানন্দ রায়ও বহুদিন পরে আজ নদীয়ায় শুভাগমন করিয়াছেন—দুইজনে এক সঙ্গে আসেন নাই—পরামর্শ করিয়া আসেন নাই—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের প্রেরণায় তাঁহারা কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আজ বহুদিন পরে নদীয়ায় শুভবিজয় করিয়াছেন। নদীয়া-বাসী গৌরভক্তগণ তাঁহাদিগকে পাইয়া গৌর-প্রেমানন্দে প্রমত্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা-তিথির আরাধনা প্রতি-বৎসরেই হয়—গৌরগৃহে গৌরভক্তগণ একত্রিত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে এই মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন—কিন্তু এবৎসর যেন এই উৎসবে একটানবভাবের প্রেরণায় সকলেই উৎফুল্ল হইয়াছেন—নব বৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপ-ধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট নবভাবের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার শুভসংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই, যেন সেই নবভাবটিও ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত ছিল—যিনি তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাদেশ দিয়াছিলেন—তাঁহারই ইচ্ছায় এবং তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহারই অন্তরঙ্গ একান্ত অনন্যশরণ ভক্তপার্ষদ-গণের হৃদয়ে, সেই নবভাবটী আজ জাগরিত হইয়া কীর্ত্তন-মুখে সূত্ররূপে শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-নামের কীর্ত্তন প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু একদিন শচী-আঙ্গিনায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগলরূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইয়া যে অদ্ভুত লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছিলেন—তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া-ছেন (১)। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীনদীয়া যুগল-রূপের অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ মাধুরী দর্শনে গৌরপ্রেমানন্দে বিভোর হইয়া যে মধুর লীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছিলেন, তাহা মূল শ্রীগ্রন্থপাঠে আস্বাদনীয়। নিম্নলিখিত পদটিতে এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গটি অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

(১) যখন থাকয়ে লক্ষ্মী সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দে বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল॥

যথারাগ।

নিত্যানন্দ হেরল যুগল রূপ।
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেম-রস কূপ॥
বৈঠহি দুহুঁজন শ্রীশচী-অঙ্গনে।
ভাসাওল ভুবন প্রেম-তরঙ্গে॥
প্রিয়া-বদন হেরি পঁহু মোর হাসে।
প্রেমকথা কহে গদগদ ভাষে॥
গৌর-অঙ্গ পরশ-সুখে ভোর।
লছমি বিরাজে নারায়ণ-কোর॥
শচী-গৃহে গৌরাঙ্গ-মধুর-বিলাস।
হেরয়ে নিত্যানন্দ যুগল পরকাশ॥
ভাবে বিভোর তনু নিতাই বিহ্বল।
পুলকাশ্রু ধারা আঁখে হাসে খল খল॥
নাচত আনন্দে ফিরত শচী-আঙ্গিনায়।
প্রেমতরঙ্গে আজু নদে ভেসে যায়॥
অঙ্গ বসন খসি পড়ল ভূতল।
তৈখনে পহুঁ আসি দরশন দেল॥
নিজ বসন ঝাঁপি নিতাইর অঙ্গে।
কতহি বোলয়ে পহুঁ প্রেম-পরসঙ্গে॥
পীরিতি আদর ইহ বসন যৌতুক।
অন্তরালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেখয়ে কৌতুক॥
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া যুগল মূরতি।
ভণয়ে হরিদাসী প্রেমানন্দে মাতি॥"—

গৌর-গীতিকা।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও তাঁহার গৃহিণী শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল প্রেম-রসানন্দী ছিলেন—তাহার প্রমাণও শ্রীগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহাদেরও গুপ্ত মনোভাব এক্ষণে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিবার শুভকাল ও সুযোগ উপস্থিত। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ইচ্ছায় এবং তাঁহারই আকর্ষণে শ্রীশান্তিপুরনাথ বৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ রায় এই মহামহোৎ-সবে যোগদান করিতে আসিয়াছেন—গৌরশূন্য গৌরগৃহে তাঁহাদের আর আসিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদেশে তাঁহারা এই উৎসব দর্শনে এবৎসর অকস্মাৎ আসিয়া নদীয়ায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাহা-দিগকে দেখিয়া সর্ব্বভক্তগণ পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন এবং পরমানন্দ পাইয়াছেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার ভজন-মন্দিরের দ্বার এখনও রুদ্ধ —বেলা চারিদণ্ড হইয়াছে—এখনও শচী-আঙ্গিনায় কীর্ত্তন চলিতেছে—শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মূল গায়করূপে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিয়াছেন—

"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥"—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

মহাবিষ্ণুর অবতার সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নয়ন-জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—গৌরপ্রেমানন্দে গৌর-আনা-গোসাঞি ঠাকুর আমার জগজ্জীবের মঙ্গলকামনা করিতেছেন—আর প্রেমগদগদকণ্ঠে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছেন—

"—ওহে বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
কলিহত জীবপ্রতি কর শুভদৃষ্টিপাত।"

উপস্থিত গৌরভক্তবৃন্দ গৌর-প্রেমানন্দে পরম বিহ্বল হইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চরণে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া জনে জনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন, আর কীর্ত্তনে আখর দিতেছেন—

—"ওহে শান্তিপুরনাথ!
তোমার চরণে করি কোটি প্রণিপাত।"—

গৌর-প্রেমোন্মত্ত গৌর-আনা গোসাঞির কর্ণে একথা প্রবেশ করিল না—তিনি তাঁহার নিজভাবে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"—জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥"—

অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী করিয়া মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন। শচী-আঙ্গিনা আজ লোকে লোকারণ্য—সকলেই এই কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মধুর নাম উচ্চারণ মাত্রেই গৌর-প্রেমোন্মত্ত কীর্ত্তনীয়া ভক্তগণের হৃদয়ে নাম ও নামীর একত্রীভূত যুগলমাধুরীপূর্ণ অপরূপ যুগল-মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইতেছে—

তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে দিব্য রত্নবেদীর উপরে সুসজ্জিত রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীনদীয়া যুগল শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। অবধূত নিতাইচাঁদ তখন স্বয়ং কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ গৌরাঙ্গ আমার।
প্রিয়াসনে বস তুমি দেখিব আবার।
এই যে নদীয়া-ধামে, প্রিয়াজিকে ল'য়ে বামে,
আসিয়া বস হে তুমি ওহে প্রাণাধার।
সে দিন আসিবে কবে, "গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" রবে,
আনন্দে কলির জীব গাবে জয়গান।
যুগল-মাধুরী হেরি, (তাদের) ঝরিবে যে আঁখিবারি,
তাহাতেই তারা সবে পাবে পরিত্রাণ॥
দিবে তারা গড়াগড়ি, যুগল চরণ স্মরি,
শচী-আঙ্গিনার মাঝে লুটাবে ধুলায়।
দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি (বিষ্ণুপ্রিয়ার) প্রাণগৌরাঙ্গ বলি,
কাঁদিয়া আকুল হবে নয়ন-ধারায়॥
দাসী হরিদাসী ভাবে, হেন দিন কবে হবে,
ধূলি হয়ে রব আমি নিতাইর পায়॥

গৌর-গীতিকা।

শচী-আঙ্গিনায় কীর্ত্তনের ধুম উঠিয়াছে—বেলা এক প্রহর অতীত হইতে চলিল—কীর্ত্তন আর থামে না—দধি-মঙ্গল এবং পূর্ণাহুতি প্রভৃতি বিধিনিয়মের আর অবসর হয় না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত তখন প্রভু নিত্যানন্দের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে শেষ কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন—

"(আমার) পাগ্‌লা নিতাইর বোল।
গৌরহরি হরিবোল।"

তখন অবধূত নিতাইচাঁদ গৌর-প্রেমানন্দে উচ্চ জয়ধ্বনি দিলেন—

"গৌরহরি হরিবোল।"
"গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বোল।
"রাধে গোবিন্দ বোল।
"জয় রাধে গোবিন্দ বোল।
"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বোল।"—

তখন পশ্চাৎ হইতে গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু অবধূত নিত্যানন্দপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কটি দোলাইয়া মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া॥
প্রভু বলে নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর।
নিত্যানন্দ হয় হয় করয়ে উত্তর॥ ইত্যাদি।
মধ্যখণ্ড একাদশ অধ্যায়।
শ্রীচৈতন্যভাগবত।

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি।

শ্রীবাস পণ্ডিত নিকটেই ছিলেন—তিনিও আর থাকিতে না পারিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন,—

"—জয় নন্দনন্দন জয় বংশীধারী।"
জয় রাধাবল্লভ নিকুঞ্জবিহারী"—

পুনরায় গৌর-কৃষ্ণ কীর্ত্তনের দুই দল হইল। একসঙ্গে দুই দণ্ডকাল সর্ব্ব গৌর-ভক্তগণ এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে পুনরায় যোগ দিলেন,—কীর্ত্তন পালাপালি ভাবে চলিল।

অতঃপর শ্রীবাস পণ্ডিতের বিশিষ্ট অনুরোধে দধিমঙ্গল ও পূর্ণাহুতি প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধান করিয়া অবধূত নিতাইচাঁদ এবং গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীশান্তিপুরনাথকে অগ্রণী করিয়া সকলে কীর্ত্তন লইয়া নগরভ্রমণে বাহির হইলেন—বিশাল লোকসংঘট্টসহ শচীআঙ্গিনা হইতে বাহির হইয়া নদীয়ার রাজপথে আসিয়া যখন কীর্ত্তন উপস্থিত হইল—তখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর—নগর ভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতীরে মহাসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বজ্রনাদী হুহুঙ্কারে এবং অবধূত নিতাইচাঁদের উদ্দণ্ড নৃত্যবিলাসে সমগ্র নদীয়া প্রকম্পিত হইতেছে। সুবিস্তৃত ও প্রশস্ত বালুকাময় সুরধুনীতটে আজ কেবল অগণিত নরমুণ্ডই দৃষ্ট হইতেছে—ভীষণ লোকসমুদ্র হইতে একই ধ্বনি উঠিতেছে—

—"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
প্রাণগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া"—

এই উচ্চ ধ্বনি নদীয়া-গগন ভেদ করিয়া স্বর্গদ্বার দিয়া বৈকুণ্ঠ হইয়া গোলোকে পৌঁছিল। বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দেবীসহ চতুর্ভুজ নারায়ণ এবং গোলোকেশ্বরী মহালক্ষ্মী শ্রীরাধাসহ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই নব নামকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রত্নসিংহাসন হইতে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া দাঁড়াইলেন—এই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ নবভাবের শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল শ্রীনাম-কীর্ত্তনের তাঁহারা সম্মান করিলেন—এবং এই নামরূপী মহা সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দাখ্য বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশে উৰ্দ্ধবাহু হইয়া সকলেই স্তুতি বন্দনা করিলেন।

এই মহা সঙ্কীর্ত্তনের দলসহ গৌরভক্তগণ যখন পুনরায় শচী-আঙ্গিনায় ফিরিয়া আসিলেন তখন দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে—পুনরায় কিছুক্ষণ অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে কীর্ত্তন হইল। শচীমাতার উক্তি শেষ কীর্ত্তন পদটী গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া স্বয়ং গান করিলেন—

"—নগর সঙ্কীর্ত্তন করি, গৌর এলো ঘরে।
গৌর এলো ঘরে, আমার নিতাই এলো ঘরে॥"—

ভক্তবৃন্দ ধুয়া ধরিলেন,—

—"সঙ্কীর্ত্তন করিয়ে প্রভু নগরে নগরে।
প্রেমানন্দে গণসহ আইলেন ঘরে॥
ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর নিল কোলে॥
নেতের অঞ্চল দিয়ে ধুলি ঝাড়ি দিল।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমল।"—

এই সময়ে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের অতি বৃদ্ধ প্রাচীন ভৃত্য শ্রীঈশান সেখানে আসিয়া দীঘল হইয়া পড়িয়া গৌর-আনা-গোসাঞি এবং অবধূত নিতাইচাঁদের শ্রীচরণ-কমলদ্বয় দুই ক্ষীণ বাহু প্রসারিয়া পরম গৌরপ্রেমাবেশে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেমগদগদভাষে অস্ফুট কাতর ক্রন্দনের করুণ স্বরে কহিলেন—

—"ঠাকুর! আমার বাপের ঠাকুর গৌর-আনা-গোসাঞি! আমার দাদা ঠাকুর—আমার ঠাকুরের ঠাকুর—আমার চৌদ্দপুরুষের ঠাকুর—অবধূত নিতাইচাঁদ! তোমরা যে বলিতেছ—"আমার গৌর এলো ঘরে"—ঠাকুর! কৈ আমার প্রাণগৌর? কৈ আমার বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ? আমাকে কৃপা করিয়া একবার তোমরা আমার কাঙ্গালের ঠাকুর জীবনসর্ব্বস্বধন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভকে দেখাইয়া দাও—তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও পূজায় আমার মত জীবাধমের প্রাণে শান্তি হইতেছে না। আমি চাই আমার সচল বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ—আমি চাই আমার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-নাথের বামে আমার পরম পূজনীয়া ঠাকুরাণীকে দেখিতে। তোমরা আমার ঠাকুরের ঠাকুর—জগতগুরু—তোমাদের ইচ্ছাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়—তোমরা সব করিতে পার—তোমরা বাঞ্ছাকল্পতরু। মুঞি শচী-আঙ্গিনার উচ্ছিষ্টভোজী অধম কুকুর—আমার এই ক্ষুদ্র বাসনাটি তোমরা দুইজনে পূর্ণ কর—আমাকে কৃতকৃতার্থ কর—নতুবা তোমাদের চরণাঘাতে আমার মাথার

খুলিখান ভাঙ্গিয়া দাও”—এই কথাগুলি বলিতে অতিবৃদ্ধ ঈশানের হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—তিনি সজোরে দুই প্রভুর পদতলে পড়িয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। তাঁহার উচ্চ ক্রন্দনের রোলে তখন কীর্ত্তন বন্ধ হইয়া গেল।

গৌর-আনা-গোসাঞি এবং গৌরাগ্রজ অবধূত নিতাই-চাঁদ দুইজনে মিলিয়া তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন চীরপরিধান জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালময় ঈশানের দেহযষ্টিখানি পরম স্নেহভরে ক্রোড়ে করিয়া, শচীআঙ্গিনার অন্তঃপুর প্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উভয়ে বসিয়া,তাঁহারা পরম প্রেমভরে অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া, কত না সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—মহাবিষ্ণুর অবতার এবং মূল সঙ্কর্ষণের অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও অবধূত নিতাইচাঁদ আজ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের অতিবৃদ্ধ ভৃত্য শ্রীঈশানের সেবায় নিযুক্ত। ঈশানের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই—শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ভক্ত মহাজন সকলেই দুই প্রভুসহ শ্রীঈশানকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছেন—তাঁহাদের সকলেরই নয়নে প্রেম-ধারা—বদনে “ধন্য ঈশান”—উপস্থিত সর্ব্ব গৌরভক্তগণের প্রাণে শ্রীঈশানের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দে তাঁহার গুণগানের বাসনা জাগরিত হইয়াছে—প্রেমাবেশে তাঁহারা এই অতিবৃদ্ধ দাস্যপ্রেমের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীঈশানকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। শ্রীঈশান প্রেমমূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া অন্তর্বাহ্য দশায় দুই প্রভুর ক্রোড়ে শয়ান আছেন—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ গেল—তখন পরম দয়াল নিতাইচাঁদ ঈশানের কর্ণমূলে “গৌরহরি হরিবোল” ধ্বনি বারত্রয় করিবা মাত্রই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি তখন আত্ম সম্বরণ করিয়া মহা লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে উঠিয়া দুই প্রভুর শ্রীচরণতলে পড়িয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার নয়নজলে শচীআঙ্গিনায় প্রেমনদী প্রবাহিত হইল। তৎকালিক ঈশানের অবস্থা দেখিয়া সর্ব্ব গৌরভক্তগণের নয়নের দরদরিত প্রেমাশ্রুধারায় কীর্ত্তনভূমি কর্দ্দমাক্ত হইল।

শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং অবধূত শ্রীনিতাই-চাঁদ দুইজনে তখন কি গুপ্ত পরামর্শ করিলেন—পরমাদরে ঈশানকে পুনরায় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে লইয়া গেলেন এবং গোপনে মৃদু-মধুর বচনে অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ কহিলেন—“ঈশান তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল শ্রীমূর্ত্তি ধ্যান কর—তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে”—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ঈশানের কানে কানে গোপনে বলিলেন—“ঈশান! তুমি মহা ভাগ্যবান—তুমি শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ভিখারী—অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপা ব্যতীত এ সৌভাগ্য উদয় হইবার কাহারও সম্ভব নহে। তোমার প্রতি পরম দয়াল অভিন্নগৌরাঙ্গ নিতাইচাঁদের কৃপা হইয়াছে—এখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে”।

এই বলিয়া দুই প্রভুর মধ্যভাগে ঈশানকে দাঁড় করাইলেন—বৃদ্ধ ঈশানের তখন কম্পিত কলেবর—চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত—নয়নধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি অন্ত-শ্চক্ষু দ্বারা যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার প্রাণ প্রেমানন্দে ভরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে রত্নবেদীর উপর অপূর্ব্ব রত্নসিংহাসনে সখিগণবেষ্টিত শ্রীশ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল শ্রীমূর্ত্তি, অপূর্ব্ব রাস-বিলাস লীলারঙ্গে বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রধানা সখি কাঞ্চনা যুগলআরতি করিতেছেন—নদীয়া-নাগরীবৃন্দ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন করিতেছেন—

যথারাগ।

—“আরতি কিয়ে নদীয়া-নাগরী।
কাঞ্চনাদি সখি দেয় আয়োজন করি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজয়ে কাঁশরী।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে বোলে গৌরহরি।
বিশুদ্ধ গো-ঘৃত ঢালি, সপ্তপ্রদীপ জ্বালি,
শ্রীমুখ হেরত মন-প্রাণ ভরি।
সুগন্ধ চন্দন নিয়ে, ধূপ গুগ্‌গুল দিয়ে,
আরতি কিযে নদীয়া-নাগরী॥
শঙ্খভরি সুশীতল, সুবাসিত গঙ্গাজল,
শ্রীঅঙ্গ ধোয়ায়ত সুযতন করি।
অঞ্চল ধরিয়া করে, কত না সোহাগ ভরে,
শ্রীঅঙ্গ মুছাওত অতি ধীরি ধীরি॥
মল্লিকা মালতি যূথি, সুচিকন মালা গাঁথি,
সখিগণ সাজাওত কিশোর কিশোরী।
ফুল আনি রাশি রাশি, সখিগণ হাসি হাসি,
চারি দিকে ছড়াওত বোলে গৌরহরি॥
সখিগণ হাসি হাসি, প্রেমানন্দে ভাসি ভাসি,
চামর ঢুলায়ত যাই বলিহারি”॥—

ভাগ্যবান ঈশান সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—তিনি পুনরায় বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন—পুনরায় দুই প্রভু তাঁহাকে পরম প্রেমভরে ক্রোড়ে করিয়া সেখানেই বসিলেন এবং তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন—

আজ ঈশান যাহা দেখিবার সৌভাগ্য পাইলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় শ্রীনিবাস আচার্য্য সেই সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন স্বয়ং গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সাক্ষাৎ অপার কৃপায়—

"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"।

সাধারণ ভক্তের ভাগ্যে সে পরম গুহ্য লীলারঙ্গ দর্শন লাভ হয় না। শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চিহ্নিত দাস ছিলেন—তিনি প্রিয়াজির কৃপায় শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের মধুর নিত্য-লীলা-রঙ্গ স্বপ্নে দেখিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন,—যথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে—

—"ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষয়।
স্বপ্নে প্রভু-গৃহে শোভা-বিলাস দেখয়॥
আগে দেখে স্বর্ণময় নদীয়া নগর।
সুরধুনী ঘাট রত্নে বাঁধা মনোহর॥
তারপর দেখে গৌরচন্দ্রের আলয়।
ইন্দ্রাদির সে স্থান শোভার যোগ্য নয়॥
কৈছে কুন বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলা ভবন।
চতুর্দ্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর আবরণ॥
পৃথক পৃথক খণ্ড সংখ্যা নাহি তার।
যবে যথা ইচ্ছা তথা প্রভুর বিহার॥
অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্প উদ্যান শোভয়।
তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময়॥
মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ।
তার তলে শোভাময় রত্ন সিংহাসন॥
সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলসয়।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বামে দক্ষিণে শোভয়॥
নানা অলঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর॥
ভুবন মোহন শোভা করি নিরীক্ষণ।
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন॥
যোগায় তাম্বুল মালা চন্দন সকলে।
প্রিয়াসহ প্রভু বিলসয়ে সখি মেলে॥"—

এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গকে গোস্বামীশাস্ত্রে অপ্রকট প্রকাশ-লীলা বলেন,—অদ্যাপিও এইরূপ অপ্রকট-প্রকাশ-লীলারঙ্গ শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রকট রহিয়াছেন,—কিন্তু এই অপূর্ব্ব নিত্যলীলা সকলের ভাগ্যে দর্শনলাভ হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

—"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"॥—

ভাগ্যবান শ্রীঈশানের ভাগ্যে সেই অপ্রকট প্রকাশের অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ আজ দর্শনলাভ হইল যাঁহাদিগের কৃপাবলে, তাঁহারা ভিন্ন, আর মহা ভাগ্যবান ঈশান ভিন্ন, অন্য কেহ তাহা দেখিবার সৌভাগ্যও পাইলেন না—আর এ শুভ সংবাদ কেহ জানিতেও পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে ঈশান বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তিনি পাগলের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া দুই প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া"।

তখন পুনরায় উপস্থিত গৌরভক্তগণ সেই কীর্ত্তনে যোগ দান করিলেন। এই সময়ে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির ধূপারতি আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এইরূপ ধূপারতি ঠাকুর মন্দিরে প্রত্যহ হয়—অদ্যকার এই ধূপারতির পর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের গৌরপ্রেমোন্মত্ত পুরাতন ভৃত্য অতি-বৃদ্ধ ঈশানের অপূর্ব্ব কীর্ত্তন চলিল—গৌর-প্রেমানন্দে টলমল হইয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীবদনের প্রতি নির্নিমেষ লোচনে একদৃষ্টে চাহিয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে তিনি কীর্ত্তনের সুর ধরিয়াছেন—

যথারাগ।

"জয় শচীনন্দন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন।
অদ্বৈতের আনা-ধন জয় শচীনন্দন॥
নিত্যানন্দের প্রাণসখা জয় শচীনন্দন।
শচীমাতার দুলালিয়া জয় শচীনন্দন॥
নরহরির চিতচোরা জয় শচীনন্দন।
নাগরীমনমোহনিয়া জয় শচীনন্দন॥
নদেবাসীর প্রাণগোরা জয় শচীনন্দন।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ জয় শচীনন্দন॥

(ওগো) ঈশানের দাদাঠাকুর জয় শচীনন্দন।
একবার সচল হ'য়ে এস এস হে। ধ্রু ॥
প্রিয়াসহ বস প্রভু শচীআঙ্গিনায়।
(তোমার) যুগলরূপ হেরি (মোর) প্রাণ যেন যায় ॥
গৌরগীতিকা।

উপস্থিত গৌরভক্তগণ এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন—সকলের মুখেই সেই একই কথা,—

(তোমার) "যুগল রূপ হেরি প্রাণ যেন যায় হে!
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণ গৌরাঙ্গ!
একবার সচল হ'য়ে এস এস হে॥"—

গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঈশানের এই কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন. ঈশান দীঘল হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণতলে ধূলাবলুণ্ঠিত-দেহে আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া দুই প্রভু উঠাইলেন এবং কীর্ত্তনস্থলী হইতে এক পার্শ্বে লইয়া গিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার সেবা সুশ্রুষা করিতে লাগিলেন—তিনি লজ্জায় মৃতবৎ হইয়া করযোড়ে কহিলেন "আমার বৈষ্ণব ঠাকুরগণ! মুঞি অস্পৃশ্য পুরীষের কীট—আমাকে লইয়া এরূপ বিড়ম্বনা করিলে আমি প্রাণে মরিয়া যাইব"—তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বহির্ব্বাটীতে তাঁহার নিজ ভজনকুটীরে লইয়া গেলেন।

এদিকে বিস্তৃত বহিরাঙ্গনে এবং গৌরগৃহের সম্মুখে বিস্তীর্ণ গঙ্গাতটে অগণিত লোক মহামহোৎসবে প্রসাদ ভোজন করিতে পঙ্‌ক্তে বসিয়াছে—স্তুপাকার অন্নব্যঞ্জন, দধি দুগ্ধ, পায়স মিষ্টান্ন বহির্ব্বাটীর ভাণ্ডার হইতে লইয়া গিয়া দলে দলে বহু লোক পরিবেশন করিতেছে—গৌর-গৃহের মহালক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী বুদ্ধিমন্তখান, পুরুষোত্তম সঞ্জয় এবং সেন শিবানন্দ। মহালক্ষ্মীর অক্ষয় ভাণ্ডারে কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই—মহালক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কৃপায় প্রসাদ যতই বিতরিত হইতেছে, অক্ষয় ভাণ্ডার ততই পরিপূর্ণ বোধ হইতেছে।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং অবধূত নিতাইচাঁদ প্রভুদ্বয় পরম প্রেমানন্দে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া এই মহামহোৎসবে বৈষ্ণবভোজন পরিদর্শন করিতেছেন—চতুর্দ্দিকে প্রেমধ্বনি উঠিতেছে—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌরাঙ্গ!"

তীরে অসংখ্য সুবৃহৎ সুন্দর চন্দ্রাতপতলে প্রসাদভোজনে উপবিষ্ট বিশাল জনসঙ্ঘ গৌর-আনা-গোসাঞি শ্রীশান্তিপুরনাথ এবং অভিন্ন-গৌরাঙ্গ অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সম্মুখে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমাশ্রুলোচনে প্রেমগদগদকণ্ঠে কীর্ত্তনের প্রেমধ্বনি দিতেছে,—

"জয় জয় গৌরচন্দ্র বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জয় জয় নিত্যানন্দ বসু-জাহ্নবা-নাথ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত শ্রী-শ্রীসীতানাথ।
জীবপ্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥
যুগল চরণে তব কোটী প্রণিপাত।
মো অধমে কৃপা করি কর আত্মসাথ॥
দাস হরিদাস কহে করি যোড় হাত।
গৌর-বিরহে প্রিয়া করে প্রাণপাত॥"

করযোড়ে দণ্ডায়মান এই বিপুল জনসঙ্ঘের নয়ন সলিল-সম্পাতে পাত্রস্থিত প্রসাদান্ন সিক্ত হইয়া যাইতেছে—ইহা দেখিয়া পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ এবং পরম কারুণিক শ্রীসীতানাথ তাঁহাদের আজানুলম্বিত ভুজযুগ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সকলকে উচ্চৈঃস্বরে উপবেশন করিতে আদেশ করিলে সকলে পুনরায় প্রসাদ ভোজনে বসিলেন। তখন পুনরায় তাঁহারা সকলে মিলিয়া বজ্রনাদী জয়ধ্বনি দিলেন—"**জয় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ**"। শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের পরম প্রেমময় নামের ঘনঘন জয়ধ্বনি শুনিয়া সুরতরঙ্গিনী গৌর-প্রেমানন্দে উদ্বেলিত হৃদয়ে তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনি করিলেন—"**জয় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ**"—নদীয়ার আকাশে, পবনে, স্থাবর জঙ্গমে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল "**জয় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ**।" এই জয়ধ্বনি স্বর্গ মর্ত্ত ধরাতল ভেদ করিয়া অন্যান্য সর্ব্বলোক ব্যপ্ত হইল।

জগজ্জীবের এই আর্ত্তিপূর্ণ ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল প্রেমাহ্বানের করুণ-ক্রন্দনধ্বনি নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে সিদ্ধাসনে উপবিষ্টা পতি-পাদ-পদ্ম-ধ্যান-রতা গৌর-বক্ষ বিলাসিনী জগন্মাতা বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল—তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। পরম করুণাময়ী সনাতন-নন্দিনী গৌরবল্লভা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভজন-মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার প্রাণ ব্রজের

মধুর কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্ব দৈববাণী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দৈববাণী হইল—

"প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে! উপস্থিত এই বিপুল জনসঙ্ঘকে আজ তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে দর্শন দান করিয়া তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল কর—ইহাই আমার শেষ আদেশ ও তোমার শেষ কার্য্য—"

বিরহিণী গৌরবল্লভা এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভজনমন্দির মধ্যে উন্মাদিনীর ন্যায় ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন। গৌর-অঙ্গ-গন্ধে ভজনমন্দির মহমহ করিতেছে,—কিন্তু বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন।

তখন রাত্রি চারিদণ্ড—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই জনেই দ্বারদেশে বসিয়া বৈষ্ণবভোজন দর্শন করিতেছিলেন—তাঁহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই দিন উপবাসী বিরহিণী গৌরবল্লভাকে ধরাধরি করিয়া বারান্দায় আনিলেন। দয়াময়ী ভক্তবৎসলা সনাতন-নন্দিনী তখন অতি ক্ষীণকণ্ঠে তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে কাতর ক্রন্দনের স্বরে কাণে কাণে কহিলেন—"সখি! প্রাণসখি! আজ দুইদিন যাবৎ আমি গৌরভক্তগণের চরণ দর্শন পাই নাই—তাঁহাদের সরল প্রাণের আকুল আহ্বানে ও কাতর ক্রন্দনে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে—আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে—কাঁথাপটখানি অন্তঃপুর হইতে এখানে আনিতে বল—আমি তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া এই মন্দির বারান্দায় আজ সর্ব্বসমক্ষে দাঁড়াইব—এই সংবাদ ভক্তগণকে দাও এবং অনুমতি দাও তাঁহারা সকলে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া এই হতভাগিনীকে যেন দর্শনদানে কৃত কৃতার্থ করেন"। এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি সেই স্থানে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মহামহোৎসবে সমাগত বৈষ্ণবদিগের ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

সখি অমিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়াজির আদেশ প্রতিপালন করিলেন—অন্যান্য সখি ও দাসীগণ ব্যস্ত হইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সখি কাঞ্চনা স্বয়ং তাঁহার প্রাণসখির সর্ব্বাঙ্গ কাঁথাপটে আচ্ছাদন করিয়া বহিঃরাঙ্গণের অন্তরঙ্গ গৌরপার্ষদবর্গকে প্রিয়াজির সেখানে শুভ বিজয় এবং তাঁহার কৃপাদেশবাণীর সংবাদ দিলেন। পরে ক্রমশঃ সমস্ত লোকে এই শুভ সংবাদ পাইলেন। এই শুভ সংবাদবাহক মহা সৌভাগ্যবান শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের সেই পুরাতন ভৃত্য শ্রীঈশান।

তখন বৈষ্ণবভোজনব্যাপারসংক্রান্ত মহোৎসবের শেষ হইয়াছে—বহিরাঙ্গণের গৌর-ভক্তগণ অন্তঃপুরাঙ্গণে ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহারা দূর হইতে গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীচরণনখরজ্যোতির অপূর্ব্ব ছটা মাত্র দর্শন করিয়াই প্রাঙ্গণে প্রেমানন্দে ঢলিয়া পড়িলেন। (১) গৌরবক্ষ-বিলাসিনীর শ্রীচরণকমলের দশ নখচন্দ্র হইতে যেন কোটী চন্দ্রের কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে—গৌর-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র সময় বুঝিয়া সেখানে আসিয়া যেন গৌরবল্লভার শ্রীচরণকমলতলে লুটোপুটি খাইতেছেন। পরমেশ্বরী গৌরবল্লভার কাঁথাপটাবৃত শ্রীঅঙ্গ হইতে কোটি চন্দ্রের পরম স্নিগ্ধ কিরণসম্পাতে শচীআঙ্গিনা মুখরিত

(১) পিঁড়াতে কঁড়ার টানা বস্ত্রের আছয়ে।
তাহার ভিতরে ঠাকুরাণী ঠাড় হয়ে॥
আঙ্গিনাতে সব ভক্ত একত্র হইলে।
দাসী যাই কঁড়ার বস্ত্রেক ধরি তোলে॥
চরণকমল মাত্র দর্শন পাইতে।
কেহ কেহ ঢলিয়া পড়য়ে কোন ভিতে॥
দেখিতে চরণ-চিত্র করয়ে প্রতীত।
উপমা দিবারে লাগে দুঃখ আর ভীত॥
তথাপি কহিয়ে কিছু শাখাচন্দ্র ন্যায়।
না কহি রহিতে চাহি রহা নাহি যায়॥
উপরে চমকে শুদ্ধ সোণার বরণ।
দশ নখচন্দ্র প্রকাশে কিরণ॥
চরণের তল অরুণের পরকাশ।
মধুরিমা সীমা কিবা সুধার নির্য্যাস॥
তিলার্দ্ধ দর্শন করিলে কাণ্ডার পড়য়ে।
তবে সেই প্রসাদান্ন বাহির করয়ে॥
সেবিকা ব্রাহ্মণী দেই এক এক করি।
যে কেহ আইসে তার হ'য়ে বরাবরি॥

অনুরাগবল্লী।

করিয়াছে। আকাশপথে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও দেবীগণ দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া প্রেমানন্দে গোলোকের মহালক্ষ্মী গৌরবল্লভার দুর্লভ শ্রীচরণকমল দর্শন করিয়া আজ কৃত-কৃতার্থ মনে করিতেছেন—শ্রীশ্রীগোকুলচন্দ্রমা নবদ্বীপচন্দ্রের শ্রীচরণকমল দর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে কতবার ঘটিয়াছে—কিন্তু শ্রীশ্রীগোকুলেশ্বরী গৌর-বল্লভা সনাতন-নন্দিনীর দুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় নাই। আজ সেই শুভ দিন—শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত—আজ দয়াময়ী গৌরবল্লভার অযাচিত কৃপায় ব্রহ্মাদি দেবতা হইতে আচণ্ডাল পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীচরণকমল-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিল। পরম স্বতন্ত্রা বিশ্বকর্ত্রী জগতপ্রসূ ইচ্ছাময়ী গৌরবক্ষ-বিলাসিনী সনাতননন্দিনীর অহৈতুকী কৃপাবৃষ্টি হইতেছে আজ কলিহত জগজ্জীবের প্রতি—আজ আর কেহ বাদ পড়িবে না—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের আদেশে তাঁহার স্বরূপশক্তি বৈষ্ণবজননী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনে আজ এই অপূর্ব্ব অহৈতুকী কৃপাবর্ষণের ভাবটির উদয় হইয়াছে—মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পূর্ব্বে একদিন তাঁহার প্রিয়তমা প্রাণবল্লভাকে নিভৃতে বসিয়া বলিয়াছিলেন—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি পূর্ণ শক্তি মোর,
শক্তি-হারা হয়ে কি খেলা খেলিব আমি?
নাম প্রেম বিলাইতে হবে এই কলিযুগে,
অযাচিত ভাবে সর্ব্ব জীবে।
নিজ গুপ্তবিত্ত গোলকের ধন,—প্রেম,—
পাবে আচণ্ডালে এই কলিযুগে।
কেহ নাহি যাবে বাদ—
ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পাষণ্ডী দুর্জ্জন,
পাপী, তাপী, দুরাচার,
স্ত্রী শূদ্র স্থাবর জঙ্গম,
কেহ নাহি যাবে বাদ।
কালবশে কলিহত জীব বিপন্ন সতত,
জর্জ্জরিত দুঃখতাপে।
হৃদয় তাদের উপক্রুত সতত রোগ-শোকে,
হাহাকার তাদের প্রতি ঘরে ঘরে,
পাষাণের রেখা মত হৃদয়ে তাদের,
দুঃখ-শোক-চিন্তা-রেখা—
রয়েছে অঙ্কিত সতত।
আহা! গাত্রে বেত্রাঘাত মত
তাদের সর্ব্ব হৃদয় ভরি
ক্ষত অগণন।
ত্রিতাপের জ্বালা তাদের করিবারে দূর,—
শান্তিবারি সিঞ্চিতে হৃদয়ে তাদের—
নাম রূপী কৃষ্ণ ভগবান,
প্রেমরূপ মহৌষধি—
কৃপা করি দিবেন তাদের স্বহস্তে।
তবে ক্ষত হবে দূর
তাপ জ্বালা সব যাবে দূরে,
হৃদি প্রাণ হইবে সরস;
তবে প্রেম সঞ্চারিবে হৃদয়ে তাদের।
হবে এই লীলায় করুণার ছড়াছড়ি,—
কৃপার অবিশ্রান্ত বৃষ্টি।
দুঃখী তাপী জীবের করুণ ক্রন্দনে,
আর তাদের হাহাকার আর্ত্তনাদে—
কৃপা পরবশ হ'য়ে
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দিবেন দরশন
নর-বপু ধরি।
নদীয়ায় আবির্ভাব তাঁর
এই লীলা পুষ্টি তরে।
আমি সাজিব সন্ন্যাসী—
ধরি ভিখারীর বেশ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁদিয়া বেড়াব দ্বারে দ্বারে।
লীলা-সহায়িনী বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি মোর,—
পতি-বিরহ-সাগরে ঝম্প দিবে
পাগলিনী মত।
মাতা মোর পুত্রশোকে হ'য়ে শোকাকুলা
সকরুণ আর্ত্তনাদে
জাগাবেন কলিজীবে মোহনিদ্রা হ'তে।
উঠিবে জগতে বিষম করুণ-ধ্বনি—
প্রিয়ামুখে আর মাতৃমুখে।
করুণ-রসে ভরিবে ভুবন,—
করুণ স্বরে কাঁদিবে পৃথিবী,
স্থাবর জঙ্গম নাহি যাবে বাদ।

প্রেমভক্তি স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়ে!
এই লীলায় সহায়িনী তুমি মোর।—
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক

অন্যত্র,—
প্রিয়াজির উক্তি,—প্রভুর প্রতি,—
—"কে তুমি? মনে মনে বুঝে দেখ,
বলে কাজ নাই
কি তুমি? কি হেতু আবির্ভাব তব এই নদীয়ায়?
নির্ব্বিকার পরম পুরুষ তুমি—
পদ্মপত্রে জলবৎ সংসারে নির্লিপ্ত।
তুমি সর্ব্বত্যাগী—তুমি সর্ব্বভোগী,
সর্ব্বজীবে তুমি বিদ্যমান।
কে তোমা চিনিতে পারে
তুমি না চিনালে?
কৃপা করি চরণের দাসী বলে—
করেছ গ্রহণ এ অভাগীরে—
কৃপা ক'রে হে বহুবল্লভ!
শ্রীচরণতলে মোরে দিয়েছ আশ্রয়।
চিনেছি তোমারে আমি—তব কৃপাবলে,—
ভাগ্যবতী আমি—
ছল না করিহ মোর সনে নাথ!
তুমি যাহা,—আমি জানি,
আমি যাহা—তুমি জান,
তুমি আমি ভিন্ন নহি,
নাহি ভেদাভেদ তোমাতে আমাতে নাথ!
তুমি সর্ব্বত্যাগী হবে—ভাল কথা,
কিন্তু আমি সর্ব্ব মধ্যে নহি।
তোমা মধ্যে আমি—আমা মধ্যে তুমি—
সর্ব্বভূতে তুমি আমি বিদ্যমান।
সত্যকথা—শাস্ত্র কথা ইহা—
সে অংশরূপে—অংশরূপিণী আমি তব সেথা।
পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ
পরম পুরুষ তুমি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং,
তব কৃপাবলে—ভাগ্যবতী আমি—
পতিরূপে পাইয়াছি তোমা
জনম জন্মান্তরের সুকৃতির বলে।
আমি পূর্ণ শক্তি তব,
কৃপাবশে তুমি মোর প্রাণপতি
হৃদয় ঈশ্বর।
সর্ব্বত্যাগী হ'লে তুমি—ছাড়িতে নারিবে মোরে।
শক্তি শক্তিমান একে দুই—দু'য়ে এক—
বিচ্ছেদ নাহিক সেথা—
পরিপূর্ণ ঘন-আনন্দ-স্বরূপ তুমি আমি।
সকলি ত জান তুমি নাথ।
তবে কেন কর ছল আমা সনে?
লোক শিক্ষা তরে
প্রেমভক্তি শিখাইতে কলিজীবে
এস নাথ! দুই জনে মিলি
যুগলে লীলারঙ্গ করি এই নদীয়ায়,—
দেখুক জগতজীব মোদের প্রেমপূজা,—
তারা শিখুক প্রেমের ভজন-রীতি,—
বুঝুক প্রেমভক্তি—প্রেমের সংসার—
প্রেমের জগত দেখুক জগতজন।
তুমি ত পরম প্রেমিকবর প্রেম-অবতার—
প্রেমবশী, প্রেমের অধীন,
বুঝাও জগতজীবে—
কি সুন্দর প্রেমের সংসার।
তুমি প্রেমময় প্রেমের ঠাকুর,
কৃপা করি ভাসাইয়া প্রেমবন্যা
জগতের প্রতি গৃহে গৃহে
প্রেমময়, মধুময় কর ত্রিজগত।
শীতল হউক বিশ্ব,
উঠুক প্রেমের তরঙ্গ প্রতি জীব-হৃদে;
কর প্রেম দান নাথ! স্থাবর জঙ্গমে—
উঠুক প্রেমের তুফান এ মর জগতে;
বিশ্বনাথ! বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দাও জীবে,
দাও শিক্ষা প্রেমধর্ম্ম ম্লেচ্ছ ও যবনে।
পদযুগে তব নাথ!
এ মোর মিনতি।
এই নদীয়ায় কর এই প্রেমলীলারঙ্গ
কৃপা করি লহ নাথ! লহ মোরে সাথে—
যুগলবিগ্রহরূপে নবদ্বীপধামে,—

রহিব আমি তব সঙ্গে এক সাথে,—
লীলা-সহায়িনী আমি তব
চরণের দাসী ;
সর্ব্বভাবে সহায় হইব আমি তব
জীবোদ্ধার কাজে।"— শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক।

নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দ এবং এই মহামহোৎসবে সমাগত গৌরভক্তগণ এবং অপরাপর অগণিত অতিথি অভ্যাগত দর্শক-বৃন্দের মধ্যে আজ আর কৃপাময়ী জগন্মাতা প্রিয়াজির সাক্ষাৎ কৃপালাভে কেহই বঞ্চিত হইলেন না। শচী-আঙ্গিনার বিস্তৃত অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে দলে দলে নরনারীবৃন্দ গঙ্গাতীর হইতে প্রবেশ করিতেছে—আর মহাজ্যোতির্ম্ময়ী, মহামহিমময়ী মহা ঐশ্বর্য্যময়ী গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর শ্রীচরণ-কমল-নখর-চন্দ্রিমা-কিরণচ্ছটা দর্শন করিয়া গৌরপ্রেমানন্দে "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" বলিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে। বহু লোক দর্শনমাত্রই গৌরপ্রেমাবেশে আঙ্গিনায় ঢলিয়া পড়িতেছে—বহু স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতেছে—"হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ! একি তব অদ্ভুত লীলারঙ্গ! বহু ভক্তগণ দর্শনান্তর দূরে দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন—বহু কুলকামিনীগণ গৌরপ্রেমাবেশে বালিকার ন্যায় গুমরিয়া গুমরিয়া মুখে বস্ত্র দিয়া কাঁদিতেছেন।

বহির্বাটীতে অত্যন্ত লোকসংঘট্ট হইয়াছে। নদীয়ার ভক্ত যুবকদল দলে দলে দর্শকবৃন্দের এই অপূর্ব্ব দর্শনের সুবিধার জন্য মহা সম্ভ্রমের সহিত বিনয়নম্রবচনে বিশাল জনসঙ্ঘ পরিচালিত করিতেছেন। আজ মহৈশ্বর্য্যময়ী জগজ্জননী গৌর-বল্লভা প্রায় আড়াই দণ্ড কাল তাঁহার ভজন-মন্দিরের বারান্দার উপর সেই কাণ্ডাপট মধ্যে একই ভাবে অসাধারণ ধৈর্য্য ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি কাণ্ডাপটের ভিতর হইতে কলিহত জগজ্জীবের প্রতি এক এক বার শুভ দৃষ্টিপাত করিতেছেন—তাহাতেই তাহাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ হইতেছে।

শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দুইজনে দূরে দাঁড়াইয়া গৌরবল্লভার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যময়ী মহামহিমা এবং অপার করুণার কথা চিন্তা করিতে করিতে স্তম্ভভাবে বিভাবিত হইয়াছেন—নিষ্পন্দভাবে জড়বৎ তাঁহারাও দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহাদের নয়নের দৃষ্টি গৌরবল্লভার শ্রীচরণ-নখ-চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ কিরণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ছটার প্রতি যেন লিপ্ত হইয়া আছে। তাঁহারাও আজ এই প্রথম গৌরবল্লভার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যভাব সন্দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন—আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। অবধূত নিতাইচাঁদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন ধ্যানমগ্ন আছেন—তিনি দেখিতেছেন শচী-আঙ্গিনার সেই পূর্ব্বলীলারঙ্গ—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের সেই যুগল-বিলাস-রঙ্গ—স্নেহবতী শচীমাতাকে দেখিতেছেন—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নদীয়ার পার্ষদভক্তগণসঙ্গে প্রকট-বিহার-লীলারঙ্গ দেখিতেছেন। এখন অপ্রকট প্রকাশের কাল উপস্থিত—প্রভুদ্বয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের প্রকটাপ্রকট বিহার সকল লীলারঙ্গ দর্শনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাধিকারী—তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উপস্থিত অন্যান্য নিত্যপার্ষদগণও শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের শচী-আঙ্গিনায় প্রকট-বিহার-লীলারঙ্গ দর্শন করিতেছেন—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের বামে প্রিয়াজিকে দর্শন করিতেছেন এবং গৌরপ্রেমানন্দে প্রেমধ্বনি দিতেছেন "জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ"। এই যে শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল-দর্শন-সৌভাগ্য, ইহা সকলের পক্ষে সুলভ নহে—"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়"—এই সকল ভাগ্যবান শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নিত্যপার্ষদভক্তগণ।

দলে দলে লোক আসিয়া শচী-আঙ্গিনায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পরম বৈরাগ্যময়ী তপস্বিনী শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার পরম মাধুর্য্যময়ী শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণ-কমল-নখ-চন্দ্রিমার অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় পরম স্নিগ্ধ ছটা দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছে। ক্রমে যখন সর্ব্ব লোকের এই অপূর্ব্ব দর্শন-সৌভাগ্যোদয়ে সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রেমানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল—তখন সর্ব্ব লোকমুখে কেবল "জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া—প্রাণগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া" এই অপূর্ব্ব নবভাবের পরম চমৎকারিতাপূর্ণ জয়ধ্বনি শ্রুত হইল সর্ব্বনদীয়ায়—শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের এই অপূর্ব্ব অপ্রকট-প্রকাশ-প্রেমলীলারঙ্গকথা প্রচারিত হইল।

বিরহিণী গৌরবল্লভার আদেশে তখন তাঁহার প্রাণ-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তির আরতি আরম্ভ হইল। এই আরতি বিধিনিয়মে স্বয়ং ঠাকুর বংশীবদন করিলেন—শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর খোল করতালযোগে গৌরভক্তগণ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন করিলেন—নদীয়ার কুললননাগণ শুভ শঙ্খ বাজাইয়া

মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। আরতির শেষে পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত॥"

কীর্ত্তনান্তে পুনরায় জয়ধ্বনি——এই জয়ধ্বনি দিলেন স্বয়ং অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ—

যথারাগ।

—"আনন্দে বল জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
সংসার বাসনা যাবে শুদ্ধ হবে হিয়া॥"

উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনোন্মত্ত গৌরভক্তগণের এই জয়ধ্বনি নদীয়াগগন প্রকম্পিত করিল—মৃদঙ্গ করতালধ্বনিতে সমগ্র নবদ্বীপ মুখরিত হইল। পরিশেষে শ্রীবাসপণ্ডিত আসিয়া এই অপূর্ব্ব আরতি কীর্ত্তনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলেন,—

যথারাগ।

—"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া জয় শচীমাতা।
নিতাই জাহ্নবা জয় অদ্বৈত-সীতা।"—

শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বশেষে আসিয়া কটি দোলাইয়া মধুর নৃত্য করিতে করিতে শেষে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

—"প্রেমদাতা নিতাই বলে
গৌরহরি হরিবোল।
(আমার) পাগ্‌লা নিতাইর বোল
গৌরহরি হরিবোল।"

তখন অবধূত নিতাইচাঁদ সম্মুখে আসিয়া গৌর-প্রেমানন্দে হুঙ্কার করিয়া ধুয়া ধরিলেন—

—"(আমার গৌর-আনা-গোসাঞির বোল।
জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বোল।"

শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরপ্রেমাবেশে পুনরায় সম্মুখে আসিয়া ধুয়া ধরিলেন—

—"জয় জয় নবদ্বীপ শ্রীশচী-অঙ্গন।
নদীয়া-যুগল লীলা যথা দরশন॥
জয় নবদ্বীপ-রজ মস্তকেতে ধরি।
(বল) জয় বিষ্ণুপ্রিয়া জয় জয় গৌরহরি॥

এই ভাবে আরতি-কীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের যথারীতি ভোগ এবং ভোগারতি হইল। গৌর-বল্লভার আদেশে তখন অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের দ্বার বন্ধ হইল।

এখন আর অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে বাহিরের লোক কেহ নাই—অতঃপর বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে। এখন চল আমি আমার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির চরণে একটী দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জীবন ধন্য করি"—তখন মর্ম্মী-সখিদ্বয়সহ ধীরে ধীরে প্রেমময়ী গৌরবল্লভা আঙ্গিনায় নামিলেন—অন্যান্য সখি ও দাসীবৃন্দ সকলেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। শ্রীমন্দিরের জগমোহনের নিম্নে দাঁড়াইয়া বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির আপাদমস্তক এবং প্রতিঅঙ্গ পরম-প্রেমভরে নির্ণিমেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিলেন—তাঁহার বদনে কোন কথা নাই—নয়নদ্বয়ে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা বহিতেছে—দর্শনান্তে আঙ্গিনার মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ধুল্যবলুণ্ঠিত দেহে গৌরভক্তগণের পদরজে একবার গড়াগড়ি দিলেন—ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া গলবস্ত্রে করযোড়ে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনের সুরে আত্মনিবেদন করিলেন। যথা,—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে—

—"কি দিয়ে আমি সাজাব তোমায়
চিরদিন তুমি সুন্দর।
বস হে তুমি উজল করি
মম মানস-মন্দির॥"—

পুনশ্চ—

প্রাণকান্ত হে!—

কাঁদাতে আমায় এত সাধ কেন
বল বল দয়াময়!
আশ্রিত জনে দুখ দিয়ে এত
কি সুখ তোমার হয়॥"—

বিরহিণী গৌরবল্লভার গৌরপ্রেমাবেগে কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া আসিল—আর কিছুই তিনি বলিতে পারিলেন না—তাঁহার দুই পার্শ্বে মর্ম্মী সখিদ্বয় বসিয়া আছেন—তিনি প্রেমাবেশে তাঁহাদের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন—তাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তখন সখীগণ মন্দ মন্দ গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌরাঙ্গ
গৌরাঙ্গের প্রাণ বিষ্ণুপ্রিয়া"—

কিছুক্ষণ পরে বিরহিণী প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে। তুমি আমাকে আমার প্রাণবল্লভের একটু চরণামৃত, আর একটী চরণতুলসী আনিয়া দাও"—তৎক্ষণাৎ সখি কাঞ্চনা স্বয়ং গিয়া চরণামৃত ও তুলসী আনিয়া দিলেন—এবং অতি বিনীতভাবে মৃত্ব করুণ কাতরস্বরে কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আজ দুই দিন তুমি উপবাসী—তোমার প্রাণবল্লভের কিঞ্চিৎ প্রসাদ লইয়া যাইতে অনুমতি কর"। বিরহিণী প্রিয়াজি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—সাশ্রুনয়নে প্রাণ-সখির বদনের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—"প্রিয় সখি! আমার প্রাণবল্লভের অধরামৃতের আমি চিরদিন ভিখারিণী। সে সৌভাগ্যে যেন বঞ্চিত না হই। আমার জপের তণ্ডুল গুলিও এই সঙ্গে লইয়া চল—পাক করিয়া আমার প্রাণবল্লভের ভোগ লাগাইয়া আমি তাঁহার ভুবনমঙ্গল শুভ জন্মতিথির ব্রতোপবাসের পারণ করিব"—

তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল—তিনি পুনরায় তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া সখি ও দাসী-বৃন্দসহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া সুস্থির হইয়া তাঁহার সংখ্যানামজপসিদ্ধ আতপ তণ্ডুল গুলি স্বয়ং পাক করিয়া অলবন ও অনুপকরণ শুধু অন্ন গুলি তাঁহার প্রাণবল্লভকে নিবেদন করিয়া তবে কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইলেন—সেই সঙ্গে মহামহোৎসবের প্রসাদের কণিকা মাত্র গ্রহণ করিলেন। গৌরবক্ষবিলাসিনী সনাতননন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার বিধিনিয়ম পাষাণের রেখার মত যথাশক্তি আজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কঠোর ভজন-বৃত্তান্ত এবং শ্রীনামগ্রহণ-রীতি প্রেম-বিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে—যথা—

—"ঈশ্বরীর নাম গ্রহণ শুন ভাই সব।
যে কথা শ্রবণে লীলার হয় অনুভব॥
নবীন মৃৎ-ভাজন আনি দুই পাশে ধরি।
এক শূন্যপাত্র আর পাত্র তণ্ডুল ভরি॥
এক বার জপেন ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর।
এক তণ্ডুল রাখেন পাত্রে আনন্দ অন্তর॥
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লয়েন হরিনাম।
তাতে যে তণ্ডুল হয় লৈয়া পাকে যান॥
সেই সে তণ্ডুল মাত্র রন্ধন করিয়া।
ভক্ষণ করান প্রভুকে অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥
রাত্রি দিন হরিনাম প্রভুর সংখ্যা যত।
সে চেষ্টা বুঝিতে নারি বুদ্ধি অতি হত॥
প্রভুর প্রেয়সী যিঁহো তাঁহার কি কথা!
দিবানিশি হরিনাম লয়েন সর্ব্বথা॥
তাঁহার অসাধ্য কিবা নামে এত আর্ত্তি।
নাম লয়েন তাতে রোপণ করেন প্রভুর শক্তি॥

সাধ করিয়া কি মহাজন কবি শ্রীশ্রীগৌর-বল্লভার স্তুতি করিয়া বন্দনা করিয়াছেন—

—"চৈতন্য-বল্লভা তুমি জগত ঈশ্বরী।
তোমার দাসীর দাসী হৈতে বাঞ্ছা করি॥"—প্রেঃ বিঃ

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে বিরহিণী প্রিয়াজি যৎকিঞ্চিৎ প্রাণধারণোপযোগী প্রসাদ পাইয়া মর্ম্মীসখিদ্বয় সহ পুনরায় অন্তঃপুর হইতে ভজন-মন্দিরে আসিলেন। তখন নিভৃতে বসিয়া তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের সহিত কয়েকটী কথা হইল। সখি কাঞ্চনা প্রথমে প্রশ্ন করিলেন—"প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার প্রাণ বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির সেবাপূজার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে?"—প্রিয়াজি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"ঠাকুর বংশীবদনের প্রতি বিধিনিয়মে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির সেবাপূজার ভার দিয়াছেন আমার প্রাণ-বল্লভ স্বয়ং—তিনিই তাহা করিবেন। তিনিই শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম পূজারী। তবে রাত্রিতে আমি নির্জ্জনে আমার প্রাণ-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তির প্রেম-সেবা স্বয়ং করিব। দিবাভাগে অন্তঃপুর প্রাঙ্গনের দ্বার এখন হইতে আর বন্ধ থাকিবে না। গৌর-ভক্তগণের গৌর-দর্শনের পথে কোন রূপ বিঘ্ন যেন না ঘটে—ঈশান, দামোদর পণ্ডিত ও ঠাকুর বংশীবদনকে একথা বুঝাইয়া দিবে।"

এই কথা কয়টী বলিয়া গৌর-বল্লভা নিজ সিদ্ধাসনে বসিয়া সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন। সখি কাঞ্চনা তৎক্ষণাৎ ঈশানকে ডাকাইয়া প্রিয়াজির আদেশবাণী জ্ঞাপন করাইলেন সেই দিন হইতেই সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য প্রাতে শ্রীমূর্ত্তির মঙ্গল আরতির ব্যবস্থা হইল। ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং ঠাকুর বংশীবদনকে প্রিয়াজির আদেশ জানাইলেন।

মর্ম্মীসখিদ্বয়ও নিজ নিজ সংখ্যানাম জপে মগ্ন হইলেন। নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দির নিস্তব্ধ ও নীরব—রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে—এখনও গৌর-বিরহিণী তাঁহার সংখ্যানাম জপে মগ্না। মন্দিরাভ্যন্তরে একটী মাত্র ঘৃতদীপ মিটি মিটি জ্বলিতেছে। অকস্মাৎ গৌরবল্লভার অস্ফুট ক্রন্দনের কাতর স্বর শুনিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের জপ-সমাধি ভঙ্গ হইল—তাঁহারা নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখিলেন—প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভের কাষ্ঠপাদুকা দু'খানি দুই হস্তে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া করুণ হইতেও মহা সকরুণ ক্রন্দনের স্বরে তাঁহার প্রাণকান্তের চরণে আত্মনিবেদন করিতেছেন—

যথারাগ।

—"প্রাণবল্লভ হে!

(আমার) নামে রুচি হবে কবে?

(গৌর) নাম করিতে, নয়ন ঝরিবে

শরীরে পুলক হবে॥"—

'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।

হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥"

এই কয়টি কথা বলিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভা আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না—তাঁহার নয়নদ্বয়ে শতধারা বহিতেছে—চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তাঁহার প্রাণবল্লভের কাষ্ঠপাদুকা দু'খানি একবার মস্তকে তুলিতেছেন—আবার বক্ষে ধারণ করিতেছেন—আর ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বালিকার মত কাঁদিতেছেন - মধ্যে মধ্যে প্রাণঘাতী মর্ম্মভেদী ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে—

—"প্রাণবল্লভ হে—

(আমার) নামে রুচি কবে হবে?"—

মর্ম্মী সখিদ্বয় নিকটেই আছেন—কিন্তু তাঁহাদের প্রিয়সখির এই অপূর্ব্ব গৌরভজন-পথে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাইতে তাঁহারা সাহস করিতেছেন না—আর তাঁহাদের ইচ্ছাও হইতেছে না—এ সময়ে কোনরূপ অন্তরঙ্গসেবা করি। তাঁহাদের নয়নে ও শ্রবণে মহাতপস্বিনী প্রিয়াজির এই অনির্ব্বচনীয় ও অত্যাদ্ভুত গৌরনামানুরাগপূর্ণ অপূর্ব্ব প্রেমচেষ্টা এবং গৌরানুরাগ-রঞ্জিত পরম চমৎকারিতাপূর্ণ আত্মনিবেদনের মর্ম্মভেদী বাক্যবিন্যাসের অপূর্ব্ব কথনভঙ্গী মধুর হইতে মধুর বোধ হইতেছিল। তাঁহারা এই অপরূপ পাষাণ-গলান পরম করুণ দৃশ্য দর্শনে গৌরপ্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তাঁহারা দেখিতেছেন বিরহিণী গৌর-বল্লভার অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীমূর্ত্তিখানি যেন প্রেম-ভক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ। এই অপরূপ মূর্ত্ত-বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া তাঁহারা কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। এইভাবে কতক্ষণ যে গেল, তাহা তাঁহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল—অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির মঙ্গলারতির সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে—ক্রমে ক্রমে দলে দলে নদীয়া-বাসী নরনারী—যূথে যূথে নদীয়াবাসিনী কুলবধুগণ,—বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই শচী-আঙ্গিনার দিকে আজ ছুটিতেছে—তাঁহাদের সকলের মুখেই—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"—

বিস্তীর্ণ শচী-আঙ্গিনা নদীয়াবাসী নরনারীগণে পরিপূর্ণ হইল। তখন ঘড়ি ঘণ্টা মৃদঙ্গ করতাল কাঁসর ঝাঁজর প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসহ প্রভাতী কীর্ত্তনারম্ভ হইল,—

যথারাগ।

—জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া

বিবর্ত্ত বিলাস-যুগল হে।

যাঁহার মহিমা, বেদে না পায় সীমা,

সে ধন উদয় নদীয়ায় হে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করে, যে লীলা দর্শন করে,

করযোড়ে শচীমায়ের দ্বারে হে॥

(তাঁরা) নর দেহে জনমিল, গৌরলীলা আস্বাদিতে

ব্রহ্মা হরিদাস ভেল, শঙ্কর অদ্বৈত ভেল,

জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,

বিবর্ত্ত-বিলাস যুগল হে॥"—

তখন বিরহিণী গৌরবল্লভাকে মর্ম্মী সখিদ্বয় ধরাধরি করিয়া মন্দিরের বারান্দায় বাহির করিলেন—তিনিও মঙ্গল-আরতি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মর্ম্মী সখিদ্বয় তখন প্রিয়াজিকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।

নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শিলং পাহাড়
আশ্বিন সংক্রান্তি
সোমবার তৃতীয়া
রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(২৮)

"বন্দে তাং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীমদ্ভুতচেষ্টিতাম্।
যস্য প্রসাদাজ্জ্ঞোপি তৎ স্বরূপং নিরূপয়েৎ

বর্ষাকাল,—শ্রাবণ মাস,—শ্রীশ্রীঝুলন-যাত্রা সমাগত—[illegible]রশূন্য নদীয়ায় আর সে পূর্ব্বের মত ঝুলনোৎসবে [illegible]য়াবাসীর হৃদয়ে আনন্দ কোলাহল ও আড়ম্বর আয়োজনাদির উৎসাহপূর্ণ তীব্র বাসনার উদ্রেক নাই। কিন্তু শ্রীনবদ্বীপধামের শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে অনাদি-অনন্তকাল হইতে পুষ্পোদ্যানের রত্নবেদীস্থ রত্নসিংহাসনোপরি অধিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের নিত্য রাসবিলাসরঙ্গ ও ঝুলনানন্দের নিত্য নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড প্রেম-পীযূষধারা শ্রাবণের ধারায় ন্যায় নিত্য প্রবাহিত হইতেছে। সে অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ-সমুদ্রের প্রেম-তরঙ্গোচ্ছাসের নৃত্য-বিলাস-ভঙ্গীর অপরূপ সৌন্দর্য্যচ্ছটার প্রাণারাম মাধুরী বিকাশের বিরাম নাই। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-নদীয়া-যুগলের নিত্য সখি নদীয়া-নাগরীবৃন্দের চিন্ময়-রস-ভাবিত হৃদি-নদীয়ায় নিত্য রাসলীলা এবং হিন্দোল-লীলারঙ্গের প্রেমানন্দোৎসব নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। নিত্য নবদ্বীপ নিত্যানন্দ ধাম—এই ধামে নিত্য রাসবিলাসরঙ্গে নদীয়ানাগরীরূপা নিত্য সখিবৃন্দ নৃত্যকীর্ত্তন-নিত্যানন্দে নিত্য প্রমত্তা এবং তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব প্রেমসেবায় নিত্য কিশোর কিশোরী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ পরম প্রেমানন্দে নদীয়ার পুষ্পোদ্যানে সুমধুর রাসলীলা-রস-রঙ্গে অনাদি অনন্তকাল হইতে নিত্যবিলাস করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ একমাত্র রসিক গৌরভক্তবৃন্দের বেদ্য এবং নিত্য ধ্যানের বিষয়।

এখন অপরাহ্নকাল—মর্ম্মী সখিদ্বয়সহ বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার ভজন-মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া বর্ষার দুকুলপ্লাবী গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতেছেন। অদ্য ঝুলন-পূর্ণিমা-তিথি—সান্ধ্য নদীয়া-গগনে অস্তোন্মুখ রবি ও উদয়োন্মুখ শশী এতদুভয়ের অপূর্ব্ব মিলন-দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া সখি কাঞ্চনার মনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নদীয়া-লীলার অপূর্ব্ব ঝুলনোৎসবের সুমধুর পূর্ব্ব-স্মৃতি সকল একে একে জাগরিত হইল। তাঁহার হৃদি-নদীয়ায় ঝুলনোৎসবানন্দের অপূর্ব্ব চিত্রখানি যেন অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল,—সেই বর্ষাকাল—সেই শ্রাবণ মাস—সেই অবিশ্রান্ত শ্রাবণের বারিধারা—সেই সে প্রাণারাম নদীয়াধাম—সেই বর্ষার সুর-তরঙ্গিণীর মন-প্রাণমুগ্ধকর দুকুলব্যাপী অপূর্ব্ব প্রেম-তরঙ্গভঙ্গী—সেই মায়াপুর যোগপীঠে অপূর্ব্ব মনোহর পুষ্পোদ্যান—সেই রত্নবেদীতলে কেলিকদম্ববৃক্ষমূলে অপূর্ব্ব মহামূল্য মণিরত্নখচিত বিচিত্র লতা-পুষ্প-মাল্যশোভিত হিন্দোল সুবর্ণখচিত রেশমী রজ্জুতে দোদুল্যমান—তদুপরি বিচিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান এবং নানালঙ্কারভূষিতা সখিগণ পরি-বেষ্টিতা শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অতি চমৎকারিতা-পূর্ণ অপূর্ব্ব প্রেমরসরঙ্গে মৃদুমন্দ দুলিতেছেন—নিত্য চিন্ময়ধাম নদীয়ার অপূর্ব্ব হিন্দোল-লীলার সেই সকল মধুময় স্মৃতি সখি কাঞ্চনার হৃদয়-পটে একেএকে অকস্মাৎ উদিত হইল—তাঁহার মনপ্রাণ নদীয়া-যুগলরসে পরিসিক্তিত ও প্রমত্ত হইল। পরম প্রেমানন্দে তিনি দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্যা হইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কলকণ্ঠে একটী ঝুলন-গীতির ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"সুন্দর শাওনক কাঁতি।
সুন্দর মেহ মন্দ হি বরখত
সুন্দর পূর্ণিমাক রাতি॥
সুন্দর সুরধুনী তীর।
সুন্দর সুখ সমীরণ সঞ্চরু
সুন্দর তটিনী নীর॥
সুন্দর উপবন শোহে।
সুন্দর পুষ্প লতা-তরু পুষ্পিত
সুন্দর জন মন মোহে॥
সুন্দর তহি এক কুঞ্জ।
সুন্দর ভৃঙ্গ বলী গুণ গুঞ্জত
কূজত কোকিলা-পুঞ্জ॥
সুন্দর কুঞ্জক মাঝ।
সুন্দর পুষ্প দোলা তহি রাজত
সুন্দর পুষ্পক সাজ।
তথি পর সুন্দর গৌর।
সুন্দরী গোরা প্রিয়াসনে ঝুলত
সুন্দরী-গণ-মন-চোর॥
সুন্দর ফুলময় সাজ।
সুন্দর গৌর গোরী বর সুন্দরী
সুন্দরী তরুণী সমাজ॥

সুন্দরী সব দেই দোল।
সুন্দর দোল দোলে নব দম্পতী
সুন্দরী জয়, সবে বোল॥
সুন্দর গৌর সুচন্দ।
সুন্দর আঁখি পাখী কিয়ে খঞ্জন,
রঞ্জন হাস সুমন্দ॥
সুন্দরী প্রিয়া মৃদুহাস।
সুন্দর সোই রূপ-যুগ-মাধুরী
হেরব গোপাল কি দাস॥" তত্ত্ব-সন্দর্ভ।

সখি কাঞ্চনার সুমধুর গানের ঝঙ্কার অন্তঃপুরের অন্যান্য সখিগণের কর্ণে পৌঁছিল—তাঁহারা সকলে ভজন-মন্দিরে আসিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। সখিমণ্ডলমধ্যস্থা গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজি অধোবদনে বসিয়া গৌরপ্রেমাবেশে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—তিনি এখন স্তম্ভভাবাপন্না,—কিন্তু তাঁহার অর্দ্ধবাহ্যভাবাবস্থা। সখি অমিতা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন। অন্যান্য সখিগণ পরম প্রেমানন্দে সঙ্কীর্ত্তন গীতবাদ্যরসে মগ্না। সখি কাঞ্চনার কলকণ্ঠের গান রীতিমত সঙ্গতের সহিত চলিতেছে। শ্রাবণের বারি-ধারা অবিশ্রান্ত পড়িতেছে—ঘনঘটাচ্ছন্ন নদীয়াকাশের বজ্রগম্ভীরনাদে নবদ্বীপবাসী নরনারীবৃন্দ মহা ভীত ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরে এই সময় পরম চমৎকারিতাপূর্ণ অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের প্রবল স্রোত বহিতেছে,—ঘন বরষার অজস্র সলিল-সম্পাতের স্রোতের ন্যায় অপরূপ ঝুলনানন্দের এই খরতর প্রেম-পীযূষ-স্রোত ক্ষণ-স্থায়ী নহে—নিত্য নবদ্বীপধামে এই অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ-লহরী নিত্যদাস গৌর-ভক্তগণের হৃদয়ে অনাদি অনন্তকাল হইতে নিত্য পরমানন্দ প্রদান করিতেছে।

সখি অমিতা বিরহিণী গৌর-বল্লভার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং সখি কাঞ্চনার গানও শুনিতেছিলেন। গানটি শেষ হইলেই তিনি সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে তাঁহার প্রিয় সখিকে দিয়া অকস্মাৎ গৌরপ্রেমোন্মাদিনীর ন্যায় আলুথালুবেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পরম গম্ভীর-প্রকৃতি—কিন্তু তাঁহার সেই স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যভাব ও ধৈর্য্যের বাঁধ আজ যেন অকস্মাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল—তিনি গৌর-প্রেমাবেগে গ্রহগ্রস্তের ন্যায় অন্যান্য সখিগণকে উঠিয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন—তৎক্ষণাৎ তাঁহারা যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। তখন সখি অমিতা সর্ব্বসখিবৃন্দকে লইয়া মণ্ডলী করিয়া স্তম্ভভাবাপন্না সখি কাঞ্চনার ক্রোড়স্থিতা গৌর-বল্লভাকে মধ্যে রাখিয়া অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক আর একটী ঝুলন-গীতির ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ—

—"আয় তোরা আয় দেখ্‌বি যদি ঝুলন নদীয়ায়।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগোরা দুল্‌ছে হিন্দোলায়॥
(যত) নদীয়ার নাগরী, প্রেমানন্দে প্রাণ ভরি,
পুষ্পোদ্যানে যুগলে আনন্দে দোলায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, শত শুভ শঙ্খ গাজে,
ভাগ্যবতী সখিগণে চামর ঢুলায়॥
প্রেমরসে টলমল, শ্রীনদীয়া-যুগল,
দুঁহু দোঁহাকার অঙ্গে ঢলিয়া পড়য়।
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগোরা,
বদনে মধুর হাসি আড় নয়নে চায়॥
গোরার হাতে মোহন বাঁশি, কামিনীর কুলনাশী,
বংশীশিক্ষা-লীলা মনে করয়ে উদয়।
দাস বিশ্বম্ভর ভণে, নদীয়া-যুগল প্রেমে,
শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়॥"

সখি কাঞ্চনা এক্ষণে বিরহিণী প্রিয়াজিকে ক্রোড়ে ধরিয়া একবার তাঁহার বদনের প্রতি—আর বার সখি অমিতার প্রতিঅঙ্গের প্রতি গৌরানুরাগ-রঞ্জিত নয়ন কোণে পরম প্রেমানন্দে চাহিতেছেন—আর উৎকর্ণ হইয়া সখির গান শুনিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন, আজ তাঁহার প্রিয়সখি অমিতা অকস্মাৎ যেন মধুকণ্ঠা হইয়াছেন—তাঁহার অপেক্ষাও শতগুণ মধুকণ্ঠা হইয়াছেন—তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্য-ভঙ্গীতে অপরূপ চমৎকারিতাপূর্ণ মধুরতা দৃষ্ট হইতেছে—নদীয়া-যুগল-বিলাস-রস-সাগরে আজ তিনি যেন ঝম্প প্রদান করিয়াছেন—এই অপূর্ব্ব রস-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি যেন আজ গৌর-প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। সখি অমিতার এই অপূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া উপস্থিত সখিবৃন্দ সকলেই গৌরপ্রেমানন্দে প্রমত্তা হইয়া অপরূপ মধুর সঙ্গতের সহিত নৃত্যবিলাসরঙ্গে নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দির মুখরিত করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে বিরহিণী গৌর-বল্লভার অকস্মাৎ বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন সখি অমিতা মধুর নৃত্যভঙ্গী করিয়া অতি সুন্দর গান করিতেছেন—প্রিয়সখি অমিতার গান তাঁহার বড় ভাল লাগে—তিনি উৎকর্ণ হইয়া গানটি আমূল শ্রবণ করিলেন—গৌরানুরাগপূর্ণ ছলছল নয়নকোণে একবার অতিকষ্টে প্রিয় সখির বদনের প্রতি চাহিতেই উভয়ের নয়নে নয়নে মিলন হইবামাত্র প্রিয়াজি যেন মরমে মরমে মরিয়া গেলেন—তাঁহার নয়নদ্বয় ফিরাইয়া লইয়া তিনি অধোবদন হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির তাৎকালিক মনোভাবের মর্ম্ম—"এখন আর সখি এ সব রসরঙ্গকথা কেন?"—

সখি কাঞ্চনা বড়ই সুচতুরা ও সুরসিকা—তিনি সকলি বুঝিলেন—তাঁহার প্রিয়সখি অমিতার সঙ্গে একযোগে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য-গীত-রসরঙ্গে প্রমত্তা হইবার তাঁহার মনে বড় সাধ হইল। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন—তাঁহাকে সুস্থির দেখিয়া সখি কাঞ্চনাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন—প্রিয়সখি অমিতাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য-ভঙ্গী প্রদর্শনপূর্ব্বক বাম হস্তে তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তখানি উত্তোলন করিয়া প্রিয়সখির সঙ্গে অপূর্ব্ব মধুময় নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার গানের দোহার দিতে লাগিলেন,—

—"আয় তোরা আয় দেখ্‌বি যদি ঝুলন নদীয়ায়।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগোরা দুলছে হিন্দোলায়॥"—

তখন সেখানে গৌরপ্রেমের অপূর্ব্ব প্রবল তরঙ্গ উঠিল,—পরম উৎসাহের সহিত উপস্থিত সখিবৃন্দ যেন নবভাবে প্রণোদিত হইয়া নর্ত্তনকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্তা হইলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভার তখন নিপটবাহ্য—তিনি সকলি বুঝিতেছেন—কিন্তু গৌরপ্রেমাবেশে কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না—লজ্জায় তিনি তাঁহার গৌর-বিরহকাতর মলিন বদনখানি আবৃত করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ গেল—বর্ষার অবিশ্রান্ত বৃষ্টি তখন নিবৃত্তি হইয়াছে—পথ ঘাটে লোকজন যাতায়াত করিতেছে। গৌরশূন্য গৌরগৃহের সম্মুখের পথে গঙ্গাতীরে একটী নগর-কীর্ত্তনের দল বাহির হইয়াছে। মধুর করতালের মৃদঙ্গধ্বনি বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার নিপটবাহ্যাবস্থার অকস্মাৎ রূপান্তর হইল,—দিব্যোন্মাদের লক্ষণ দেখা দিল,—তিনি গৌর-প্রেমাবেগে উন্মাদিনীর ন্যায় "হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র! হা গৌরাঙ্গ প্রাণবল্লভ! তুমি আমাকে বংশীধ্বনি দ্বারা ডাকিতেছ—আমি যে আর গৃহে রহিতে পারিতেছি না—তোমার অপূর্ব্ব খোলকরতালধ্বনিই আমার প্রাণবল্লভ গৌরাকৃতি শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি—**তুমিই আমার বর্ণচোরা শ্যামসুন্দর**—তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণে আমি কি আর গৃহে রহিতে পারি? প্রাণ-বল্লভ হে! প্রাণকান্ত হে! যাই আমি যাই"—এই বলিয়া তাঁহার মর্ম্মীসখি কাঞ্চনা ও অমিতার দুই হস্ত নিজ দুই হস্তে ধারণ করিয়া দ্রুতবেগে আলুথালুবেশে ভজন-মন্দিরের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলেন,—আর মর্ম্মী সখিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন ভক্তিপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ করুন,—

রাগ মল্লার।

"কান পাতি বিষ্ণুপ্রিয়া
বলে সখি, শুন রাজপথে দেখ
বাজিছে মৃদঙ্গ করতাল। ধ্রু॥
(মধুর) মৃদঙ্গরব, কানেতে বাজিয়া,
মরমে পাশল মোর।
আয় সখি আয়, গৃহে থাকা দায়,
যাওব যথা গোর॥
(মোর) কাজ নাই কুলে, ছাই দিব তুলে,
করব যা' লাগে ভাল।
(প্রাণ) বঁধুয়া বাহিরে, আমি গৃহ মাঝে,
ইহ না দেখায় ভাল॥
ইহ বলি মুখে, মলিন বসনে,
আবরি সকল অঙ্গ॥
ধায় বিষ্ণুপ্রিয়া, এ হরিদাসিয়া,
ধায় পাছু তাঁর সঙ্গ॥

তখন সখি কাঞ্চনা তাড়াতাড়ি মহা সশঙ্কিত হইয়া বিরহিণী প্রিয়াজিকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ভজন-মন্দিরের দ্বারে বসিলেন—গৌরপ্রেমোন্মাদিনী প্রিয়াজি গৌরপ্রেমাবেগে দুই একবার জোর করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু উঠিতে পারিলেন না—গৌরপ্রেমাবেশে তাঁহার যেন সর্ব্বঅঙ্গ অবশ ও শিথিল হইয়া পড়িল—তিনি

সখিক্রোড়ে প্রেমমূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন—তখন সকলে মিলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন।

ওদিকে সখি অমিতার ভাবাবেশ এখনও যায় নাই—তিনি দেখিতেছেন বিরহিণী প্রিয়াজিকে যেন বিদগ্ধ নাগররাজ গৌরচন্দ্র সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া মধুর প্রেমরসে ভাসিতেছেন। সখি অমিতা তাঁহার ঝুলনগীতির পুনরায় সুর ধরিয়াছেন—

—প্রেমরসে টলমল, শ্রীনদীয়া-যুগল
দুঁহু দুঁহাকার অঙ্গে ঢলিয়া পড়য়।
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগোরা,
বদনে মধুর হাসি আড় নয়নে চায়॥

সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির সুরে সুর মিলাইয়া দোহার দিতেছেন—কিছুক্ষণ পরে তিনিই ধুয়া ধরিলেন—

—"গোরার হাতে মোহন বাঁশি, কামিনীর কুলনাশী,
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগোরা, দুলছে হিন্দোলায়।
আয় তোরা আয় দেখ্‌বি যদি ঝুলন নদীয়ায়॥"

বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রেম-মূর্চ্ছাবস্থাতেই শুনিতেছেন—

—"গোরার হাতে মোহন বাঁশী——"

প্রিয়াজি তাঁহার প্রাণবল্লভকে ধ্যানে দর্শন করিতেছেন যেন **"বংশীধারী রাধাবল্লভ"**। তিনি অকস্মাৎ বাহ্যজ্ঞান পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় অতিশয় হৃদিবিদারক ক্ষীণ করুণ ক্রন্দনের অস্ফুটস্বরে কহিলেন—"কোথায় আমার মদনমোহন শ্যামসুন্দর প্রাণবল্লভ হে! এস আমার বংশীধারী গৌরাকৃতি মদনগোপাল বৃন্দাবনচন্দ্র এস—এস আমার প্রাণবল্লভ গৌরসুন্দর এস—প্রাণকোটি সর্ব্বস্বধন! এস আমার নিকটে বস—কাছে এস—এস আমার প্রাণরমণ শচীনন্দন গৌরহরি এস। প্রাণবল্লভ হে! প্রাণকান্ত হে! আমার সঙ্গে দু'টি রসকথা কহ—আমার চির পিপাসিত প্রাণ শীতল কর"—

এই কথা কয়েকটী কহিতে কহিতে বিরহিণী প্রিয়াজির যেন হৃৎপিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার বদনচন্দ্রের প্রফুল্লতা—নয়নের প্রেমধারা—অধরে কৃষ্ণনামের মৃদু স্পন্দনে বোধ হইতেছে তিনি যেন কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকার ভাবেই পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন। তাঁহাকে তাঁহার মর্ম্মী সখিবৃন্দ কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকাই দেখিতেছেন। শ্রীশ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া অদ্বয়তত্ত্ব,—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া রাধাতত্ত্ব,—তিনি যে অভিন্ন রাধা।

বিরহিণী গৌরবল্লভার এখন অর্দ্ধবাহ্যদশা—সখি কাঞ্চনার নৃত্যকীর্ত্তনানন্দের এতক্ষণে নিবৃত্তি হইয়াছে। রাজপথে নগর-কীর্ত্তনের দল তখন গৌর-গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া পুনরায় একটী অপূর্ব্ব প্রাচীন গৌরকীর্ত্তন পদের ধুয়া ধরিল।

যথারাগ।

—"মাধা দেখ্‌রে এত শুধু গৌর নয়।
ইহার গোরা রূপের মাঝে কাল বরণ দেখা দেয়॥ ধ্রু॥
অরুণ বসন পরা যেন পীত ধড়ার প্রায়।
উহার মাথার চাঁচর কেশ চূড়ার মত দেখা যায়॥
তুলসীর মালা যেন বনমালা শোভা পায়।
করেতে যে দণ্ড ধরে বংশী যেন দেখি তায়॥
হরি হরি বলে মুখে রাধা রাধা শুনা যায়।
দীন নন্দরাম কহে **ব্রজের রতন নদীয়ায়**॥"

গৌর-পদ-তরঙ্গিণী।

বিরহিণী গৌরবল্লভা সখিবৃন্দের সেবা শুশ্রূষায় ক্রমশঃ বাহ্য পাইলেন—মর্ম্মী সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া বসাইলেন—তিনি উদাস নয়নে ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন—এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত উৎকর্ণ হইয়া উক্ত পদটীর মধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন। কতক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার গলদেশে পরম প্রেমভরে নিজ বাহু বেষ্টন করিয়া প্রেমগদগদকণ্ঠে মৃদুমধুরভাবে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমি কি কিছু চাঞ্চল্য করিয়াছি—তোমাদের বদনের প্রতি চাহিতে আমার যেন লজ্জা বোধ করিতেছে। সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! অনেক দিনের পর তোমার শ্রীমুখে আমরা আজ অপূর্ব্ব গৌরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিলাম। শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দর যে অদ্বয়তত্ত্ব তাহা তুমি স্বয়ং বুঝাইলে সখি! কীর্ত্তনীয়া গৌরভক্তগণের মুখ দিয়া,—তুমিই ত বলিলে তোমার প্রাণবল্লভই **"ব্রজের রতন,"**—এখন তিনি নদীয়ায় নদীয়ার চাঁদ।

বিরহিণী প্রিয়াজি মস্তক অবনত করিয়া সকল কথাই

শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না—কারণ তিনি বুঝিলেন তাঁহার প্রেমমূর্চ্ছাবস্থায় অসংযত ভাবে প্রলাপের ন্যায় ঐশ্বর্য্যভাবের কথা কিছু বলিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার প্রাণবল্লভ যে শ্রীরাধাবল্লভ—গৌরসুন্দরই যে শ্যামসুন্দর,—আজি এই প্রথম তাঁহার শ্রীমুখে সখিবৃন্দ শ্রবণ করিলেন। গৌরবল্লভার শ্রীমুখে গৌরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মর্ম্মী সখিবৃন্দ আজি পরমানন্দ পাইয়াছেন।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-রাধাতত্ত্ব এক তত্ত্ব না হইলে ঠাকুর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত "ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই" নিস্ফল হয়। শ্রীবৃহৎভাগবতামৃত শ্রীগ্রন্থে লিখিত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সিদ্ধান্তও বিফল হয়। তিনি লিখিয়াছেন,—

—"যাদৃশো ভগবান কৃষ্ণো মহালক্ষীরপীদৃশী।
তস্য নিত্য প্রিয়া সান্দ্রা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহাঃ॥"

এ সকল তত্ত্বকথার স্থান এ গ্রন্থে নহে—তথাপি কিছু কিছু আসিয়া পড়ে। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

—তত্ত্ব বলি না কর আলস।
যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হয় সুদৃঢ় লালস॥"—

"শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সন্দর্ভে" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব অতি বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি বিধি-নিয়মে মহা সমারোহে শচী-আঙ্গিনার অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণের শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঠাকুর শ্রীবংশীবদন তাঁহার বৈধী সেবা-পূজার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। যথা বংশীশিক্ষায়,—

—"প্রতিদিন পূজাকালে শ্রীবংশীবদন।
প্রভুর চরণে করে তুলসী অর্পন॥"—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তিপূজা শ্রীধাম নবদ্বীপে এই প্রথম। কিরূপ ধ্যান মন্ত্রে তাঁহার সেবা পূজা হইত তাহার আভাস মাত্র লিখিত হইয়াছে "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গল" শ্রীগ্রন্থে—কৃপাময় পাঠকগণ কৃপা করিয়া এই শ্রীগ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন। বিধি-মার্গে শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবা ও পূজা ঠাকুরবংশীবদনই সর্ব্ব প্রথমে শ্রীধাম নবদ্বীপে প্রচার করেন এবং গৌরবক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজির আদেশে সখি কাঞ্চনা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মধুর ভজন ও রাগমার্গের প্রেমসেবা প্রচার করেন। স্বয়ং গৌরবল্লভা প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির প্রেমসেবা করিতেন—মর্ম্মী সখিগণ সঙ্গে তিনি স্বয়ং আচরিয়া এই প্রেমসেবা কলিহত জীবগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। নদীয়া-নাগরীগণ কাঞ্চনাদি সখিরূপা গুরু-কৃপায় এই প্রেমসেবার বিস্তার করেন।

গৌরবল্লভার আদেশে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের দ্বার এখন উন্মুক্ত থাকে। গৌরভক্তগণ এখন শচী-আঙ্গিনার অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন—প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সর্ব্বনদীয়ার নরনারী-বৃন্দ দলে দলে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়নগৃহ তাঁহার প্রাণবল্লভা শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর ভজনমন্দির—ইহারই অপর নাম নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির। এই ভজনমন্দির নিভৃত অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে অবস্থিত এবং ইহার পশ্চাতে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড—এই স্থানে ঠাকুর-মন্দিরের পুষ্পোদ্যান—তৎপশ্চাতে শ্রীশ্রীনদীয়াযুগলের পুষ্পোদ্যান-রাসলীলাস্থলী—সে স্থানে প্রবেশ করিবার পুষ্পলতাবেষ্টিত সুবৃহৎ একটি তোরণ আছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়নমন্দিরের দুই পার্শ্বে দুইটি সুসজ্জিত সুরম্য কক্ষ আছে—ইহার চতুর্দ্দিকে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত বিস্তৃত বারান্দা। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শয়নমন্দিরের চতুর্পার্শ্বেই ঘেরা বারান্দা—এই বারান্দায় বসিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি গঙ্গার শোভা সন্দর্শন করেন—অন্তঃপুর আঙ্গিনার দিকের বারান্দা হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং নাট মন্দিরের কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করা যায়। কিন্তু আঙ্গিনার লোকজন কেহ শয়ন-কক্ষের বারান্দায় লোকজনকে দেখিতে পায় না। বিরহিণী প্রিয়াজি এক্ষণে তাঁহার এই ভজন-মন্দিরের সম্মুখ বারান্দায় বসিয়া মর্ম্মী সখিগণের সহিত গৌরকথায় ইষ্ট-গোষ্ঠী করিতেছেন।

'অন্তঃপুর আঙ্গিনায় সমাগত নদীয়ার গৌরভক্ত নরনারী-বৃন্দ গৌর দর্শন করিয়া এই মহাগম্ভীরা-মন্দিরের পাদপীঠে গৌর-বল্লভার উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন—সকলেই তাঁহার শ্রীচরণদর্শনভিখারী—কিন্তু সকলের পক্ষে সে মহা সৌভাগ্য লাভ হয় না—এই তাঁহাদের মহা দুঃখ। মহা সৌভাগ্যবান কয়েকটী মাত্র বিশিষ্ট

অনন্তশরণ নিজজন নিষ্কিঞ্চন গৌরাঙ্গপার্ষদভক্ত সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া বহির্দ্বারে পড়িয়া থাকেন এবং "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ!" বলিয়া ক্রন্দন করেন—তাঁহাদেরই প্রতি কৃপা করিয়া গৌরবল্লভা সন্ধ্যার প্রাকালে একটীবার তাঁহার শিব-বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত শ্রীচরণযুগল দর্শন-সৌভাগ্য-দান করেন এবং তাঁহাদিগকেই কণিকা মাত্র প্রসাদ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীঅনুরাগ-বল্লী গ্রন্থে লিখিত আছে,—

—"বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণ মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আস্ পাশ্।
একত্র হ'য়ে অভ্যন্তর যান সব দাস॥
তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্যশরণ তাঁর অতি কৃপাপাত্র॥"—

দিবাভাগে বিধিনিয়মে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির পূজা, ভোগ আরতি প্রভৃতি ঠাকুর বংশীবদন সকলি স্বয়ং সমাধান করেন—অভ্যাগত অতিথি, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহু সাধুগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমন্দিরে এখন নিত্য প্রসাদ পান সন্ধ্যার প্রাকালে। সন্ধ্যারতি এবং রাত্রিতে ভোগাদি কৃত্য সমাধান করিয়া সেবক সকলে বহির্বাটিতে যান,—যখন রাত্রিকালে অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণের দ্বার রুদ্ধ হয়। তখন গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী মর্ম্মী সখিগণসঙ্গে নিজ ভজন-মন্দির হইতে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীমন্দিরে প্রেমসেবার জন্য শুভ বিজয় করেন।

বিরহিণী প্রিয়াজির পরিধানে মলিন বসন—জীর্ণশীর্ণ দেহ—রুক্ষ কর্ত্তিত কেশদাম—নয়নে শতধারা—মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা দুই পার্শ্বে ধরাধরি করিয়া ভজন-মন্দির হইতে তাঁহাকে লইয়া অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি-পূজার মন্দিরে লইয়া গেলেন—তখন রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে। অন্যান্য সখি ও দাসীগণও সঙ্গে আছেন—সকলেই প্রেমপূজার পূর্ণ সজ্জা ও উপকরণাদি সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন—সুগন্ধি পুষ্পমালিকাপূর্ণ স্বর্ণথালি,—অগুরুচন্দনচুয়ার স্বর্ণ কটোরা—সুবাসিত পানীয় জলের সুবর্ণ পাত্র—শ্রীচরণ ধৌত করিবার জন্য সুবর্ণ ঝারি—ধূপধুনার রজতপাত্র—নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের স্তবক—সুবর্ণমণ্ডিত চামর—শঙ্খ ঘণ্টা পঞ্চপ্রদীপ—নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও নৈবেদ্য থরে থরে সুবর্ণ থালিতে সুসজ্জিত—ভোগের জন্য ঘৃতপক্ব নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি পরিপূর্ণ বহু সুবর্ণ থালি—সখি ও দাসীগণ গৌরনাম করিতে করিতে বহুমূল্য সুবর্ণখচিত বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। সমস্ত দিন ধরিয়া তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের প্রেমসেবার জন্য স্বহস্তে এই সকল প্রেমসেবার উপকরণাদি প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রধানা সখিদ্বয় কাঞ্চনা এবং অমিতার তত্ত্বাবধারণে এই সকল প্রেমপূজা ও সেবার উদ্যোগ এবং দ্রব্যাদির আয়োজন নিত্য হয়। গৌরবক্ষ-বিলাসিনী রাজরাজেশ্বরী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর কিন্তু কাঙ্গালিনীর বেশ,—ইহা দেখিয়া সখী ও দাসীগণ অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান,—তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার সাহস কাহারও হয় না। সখি ও দাসীগণের মনঃদুখের সীমা নাই। এজন্য সকলেরই মন নিরানন্দে পরিপূর্ণ। একজন প্রিয়াজির মুখরা ও বুদ্ধিহীনা দাসীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ ভার সে দিন একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল—সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। গুরুকৃপা সখির অনুমতি লইয়া একটু অগ্রসর হইয়া বিরহিণী গৌর বল্লভাকে উদ্দেশ করিয়া সেই দীনা ও বুদ্ধিহীনা দাসিটি করযোড়ে তাঁহার মন-বেদনা প্রিয়াজির শ্রীচরণে নিবেদন করিল।

যথারাগ।

—"নদীয়ার চাঁদ, রাজরাজেশ্বর,
রাজরাজেশ্বরী তুমি গো।
কেন ভিখারিণী, সাজিয়াছ বল,
কাঁদ কেন তবে বল গো॥
কোটি কল্প যুগ, ধ্যান ধারণা
করিয়া যাঁহারে মিলে না।
(সেই) অখিলের নিধি, গৌর গুণমণি,
তোমারে করে গো সাধনা।
শিব বিরিঞ্চির, সাধনার ধন,
তোমার অঞ্চলে বাঁধা গো।
কি দুঃখ তোমার, কেন কাঁদ তুমি,
কিসের অভাব হ'ল গো॥
ত্রিলোকের পতি, করতলে তব,
গোলোকের সুখ তব ঠাঁই।

নদীয়া-বিপিনে, ব্রজরাজ গোরা,
তুমি গো মোদের নদীয়া-রাই ॥
নয়নের জল, দেখিতে পারি না,
মলিন বসন ছাড় গো।
পরি আভরণ, বসন ভূষণ,
(একবার) মুখ তুলে তুমি চাহ গো ॥
কোটি কণ্ঠে, ডাকিছে তোমাকে,
শুনিতে কি তুমি পাও না।
কাতর পরাণে, জগজনে ডাকে,
(একবার) প্রাণনাথ বামে বস না ॥
এস তুমি এস, নদীয়ার রাণী,
(মোরা) সাজাই তোমারে ভূষণে।
যেখানে যা সাজে, বস্ত্র অলঙ্কারে,
(দিব) অলক্তক-রাগ চরণে ॥
(তুমি) জগত ঈশ্বরী, ভিখারিণী বেশ,
তোমাতে কভুত সাজে না।
রাজরাজেশ্বরী, বেশেতে তোমারে,
সাজায়ে দিব গো এস না ॥
গোরাচাঁদ পাশে (আজ) বসাব তোমারে
ফুল সাজে তাঁরে সাজায়ে।
(তাঁরে) এনেছি-ধরিয়া, নীলাচল হ'তে,
কত না সাধনা করিয়ে ॥
ঐ দেখ সেই, নদীয়ার চাঁদ
দাঁড়ায়ে তোমার মন্দিরে।
(নব) নটবর বেশ, পুনঃ পরায়েছি,
আনিয়া নদীয়া ভিতরে ॥
দূরে দিছি ফেলে, করঙ্গ কৌপীন,
আর না পরিবে বঁধুয়া।
(আর) যাইতে দিব না, নদীয়া বাহিরে,
রাখিব তাঁহারে ধরিয়া ॥
দেখ গো চাহিয়ে, তোমারই মন্দিরে,
এসেছে গৌরাঙ্গরায়।
সলাজ নয়নে চোরের মতন
তোমারি পানেতে চায় ॥
কহে হরিদাসী আঁখিনীরে ভাসি
(একবার) দাঁড়াও যুগলে দু'জনে।
হৃদয়ের ধন নদীয়া-যুগল
আজি হেরিবে সে নয়নে ॥

গৌর-গীতিকা।

এইভাবে আত্মনিবেদন করিয়া সেই দীনা বুদ্ধিহীনা দাসীটি শ্রীমন্দিরের সম্মুখে গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচরণতলে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার এই অযোগ্যা দাসিটির কাতর আত্মনিবেদন-বাক্যগুলি সকলি শুনিলেন এবং প্রেমবিহ্বলভাবে তাঁহার প্রতি একটীবার কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন—পুনরায় নয়ন ফিরাইয়া পরম করুণনয়নে সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—সে নীরব ক্রন্দনের মর্ম্ম—"সখি! এসকল কথা আর কেন? তোমার দাসীটি বড়ই বুদ্ধিহীনা—উহাকে বুঝাইয়া দিও, সে দিন আমার নাই—সে সৌভাগ্য আমি করি নাই সখি! আমি তোমাদের শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের শ্রীচরণের দাসী মাত্র—তাঁহার শীতল শ্রীচরণকমলতলে একটু স্থান পাইলেই কৃতকৃতার্থ মনে করিব।" এই বলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমন্দির-বারান্দায় উঠিয়া গললগ্নী-কৃতবাসে প্রণাম করিয়া ভূমিতলে আসন গ্রহণ করিলেন। সেই দীনা দাসীটির হস্তে তাঁহার বসিবার একখানি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যখচিত রত্নাসন ছিল—সে ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া প্রিয়াজিকে আসন দিল—বিরহিণী সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না—তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণকমলের প্রতি—শ্রীবদনের প্রতি আজ তিনি বদন তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না,—তাঁহার কমলনয়নদ্বয় অবনত করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীচরণ-নখর-চন্দ্রিমাচ্ছটার পরম স্নিগ্ধজ্যোতি দর্শন করিতেছেন,—আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন।

এদিকে প্রেমপূজার সমস্ত সজ্জা ও দ্রব্যাদি শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে সখিগণ সজ্জিত করিলেন—পুষ্পমালিকায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ সুসজ্জিত করিলেন—অগুরু চন্দনে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিলেন—ধূপ ধুনা ও নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যে শ্রীমন্দির মহ মহ করিতে লাগিল—শুভ শঙ্খ ও মাঙ্গলিক হুলুধ্বনিতে শচী-আঙ্গিনা মুখরিত হইল—সখিগণ আরতির সমস্ত আয়োজন করিলেন। তখন

সখি কাঞ্চনা পরম প্রেমভরে প্রেমাশ্রুনয়নে তাঁহার বিরহিণী প্রিয়সখি গৌরবল্লভার নিকটে গিয়া সকাতরে নিবেদন করিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আরতির সকল উদ্যোগ হইয়াছে—তুমি সখি আজি তোমার প্রাণবল্লভের আরতি কর—আমরা দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করি"—বিরহিণী গৌরবল্লভা একবার প্রিয়সখির বদনের প্রতি কাতর নয়নে চাহিলেন—তাঁহার নয়নে প্রেমধারা বহিতেছে—প্রেমগদগদ মধুর বচনে করযোড়ে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমিই তোমাদের শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শচীনন্দনের আরতি কর—আমি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হই"। সখি কাঞ্চনা নীরবে অশ্রুপাত করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না॥

বিরহিণী গৌরবল্লভা তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির পদপ্রান্তে জপমালাহস্তে বসিয়া আছেন—তাঁহার কমল নয়নদ্বয় শ্রীচরণ হইতে ক্রমশঃ তাঁহার প্রাণ-বল্লভের প্রতি অঙ্গ দর্শন-লালসায় যেন লালায়িত, কিন্তু তিনি সরমে তাঁহার শ্রীবদনের প্রতি যেন নয়নে নয়ন মিলাইয়া চাহিতে পারিতেছেন না। মর্ম্মী সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া পরম প্রেমভরে কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার প্রাণবল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট এই শ্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার বিশিষ্ট আবির্ভাব হইয়াছে—তুমি দর্শনমাত্র বলিয়াছিলে,—

—"সেই ত পরাণ-নাথে দেখিতে পাইনু।
যাঁর লাগি মনাগুণে দহিয়া মরিনু॥"—

এখন আর আমাদের নিকট তোমার কোনরূপ লজ্জার প্রয়োজন নাই। প্রাণসখি! চল তুমি স্বয়ং আরতি কর—তোমার প্রাণবল্লভ তোমারই প্রেম-আরতি চাহেন।" বিরহিণী গৌরবল্লভা নীরবে কথা কয়টি শুনিলেন এবং গৌর-প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া সেখানেই প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তখন মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই গৌর-অঙ্গ-গন্ধে শ্রীমন্দির মহ মহ করিতে লাগিল—শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে দিব্যালোক প্রকাশিত হইল—শ্রীবিগ্রহের বদনমণ্ডল হইতে কোটিচন্দ্র সুশীতল অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ তেজপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ছটা নির্গত হইতে লাগিল। প্রেমাবিষ্টভাবে শ্রীমূর্ত্তির প্রতি সকলেই চাহিয়া আছেন—উপস্থিত সকলেই দেখিতেছেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শ্রীবদনকমলে যেন ঈষৎ মৃদু হাসির রেখা দেখা যাইতেছে—এমন সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল,—

—"বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রিয়তমে! তবৈবাহমবেহি মাং।
যে তু বিষ্ণুপ্রিয়া লোকে তে মে প্রিয়তমা প্রিয়ে॥
যথা জ্বালাপাবকয়োর্ভেদো নাস্তি তথা বয়োঃ।
তথাপি লোক শিক্ষার্থং সন্ন্যাসমাচরাম্যহং॥
ত্যক্ত্বাহং শ্রীনবদ্বীপং ন যাস্যামি কচিৎ প্রিয়ে।
সর্ব্বদাত্রৈব সান্নিধ্যং দ্রক্ষ্যামি ত্বং মমাজ্ঞয়া॥
যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা ন যযৌ নন্দনন্দনঃ।
নবদ্বীপং পরিত্যজ্য তথা যাস্যামি ন কচিৎ॥"—(১)

চৈতন্যতত্ত্বদীপিকা।

এই যে দৈববাণী হইল—ইহা উপস্থিত সকলেই শ্রবণ করিলেন—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিরহিণী-গৌরবল্লভার প্রেম-মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি যেন চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন—পরম প্রেমাবেশে তিনি ইতিউতি চাহিতে লাগিলেন—কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার দুইপার্শ্বে বসিয়া আছেন—এই দৈববাণী তাঁহারাও শুনিয়াছেন—কিন্তু বিরহিণী গৌরবল্লভার মন এরূপ দৈববাণীতে শান্ত হইতেছে না—তাহা তাঁহারা বুঝিলেন—তাঁহাদের প্রিয় সখিকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহাই তাঁহারা ভাবিতেছেন। এইভাবে কতক্ষণ গেল।

---

(১) অর্থ—প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমি তোমারই—এ জগতে যাহারা বিষ্ণুর প্রিয়, তাহারাই আমার প্রিয়। তুমি ত সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি নিশ্চয় জানিও তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। অগ্নি ও অগ্নির জ্বালাতে যেমন কোন ভেদ নাই—তেমনি তোমাতে ও আমাতে কিছু ভেদ নাই। কেবল লোকশিক্ষার জন্য আমি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছি জানিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না, সর্ব্বদাই তোমার নিকটে আমি থাকিব। যেমন শ্রীধাম বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোথাও গমন করেন নাই, তদ্রূপ আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া আমি কোথাও যাইব না।

এখন আরতির সময় হইয়াছে—সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজিকে তখন পুনরায় আর একবার তাঁহার প্রাণবল্লভের আরতির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। দৈববাণীর কথা তুলিয়া তিনি প্রিয়াজির কানে কানে কি বলিলেন—তাহাতে তিনি মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রাণসখির অনুমতি লইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন—চতুর্দ্দিকে শুভশঙ্খ বাজিয়া উঠিল—উপস্থিত সখি ও দাসীবৃন্দের মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি শ্রুত হইল—মৃদঙ্গমন্দিরা খোল করতাল যোগে আরতি কীর্ত্তন আরম্ভ হইল—

গৌরীরাগ।

—"জয় জয় আরতি গৌর-কিশোর।
বিলসত সিংহাসনে যনু কনকাচল
ডগ-মগ জগত-যুবতী-চিতচোর॥ ধ্রু॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে গর গর আরতি,
করু নিজ নাথ নেহারি।
দক্ষিণ ভাগে, ভাঁতি রীতি অদভুত,
নিত্যানন্দ রসভোর।
বামে গদাধর, সরসভঙ্গী তঁহি
যোই ধরত নব ছত্র উজোর॥
শ্রীবাস বরষত কুসুমাঞ্জলী
চামর করু নরহরি অনিবার।
শুক্লাম্বর চরচত চন্দন,
গুপ্ত মুরারি করত জয়কার॥
মাধব বাসু ঘোষ, পুরুষোত্তম বিজয়
মুকুন্দ আদি গুণী ভূপ।
গায়ত মধুর, রাগ শ্রুতি মুরছনা
গ্রাম সপ্তস্বর ভেদ অনুপ॥
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক বীণ,
নিশান বেণু চলু ওর।
ঘন ঘন ঘণ্টা, ঝম ঝমকত ঝাঝরি
ঝন্ ঝন্ ঝাঁজ গরজে ঘন ঘোর॥
নাচত পরম হর্ষে বক্রেশ্বর
সরস ভাতি গতি নটন সুঠার।
উঘটত ধিকট ধিকট, ধিধি কটতক থৈ থৈ
থৈতি বিবিধ পরকার॥
বিবশ পূরব রসে, রসিক গদাধর
শ্রীধর গৌরীদাস হরিদাস।
কো বিরচব সব, ভকত মত্ত অতি,
গৌর-মুখ মধুরিম হাস॥
সুরগণ গগণে, মগন গণসহ
সুরপতি কত যতনে করত পরিহার।
পার্ব্বতীপতি, চতুরানন পুলকিত,
ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার॥
ত্রিভুবনে উলস, শেষ যশ বরণত,
স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি
নরহরি পঁহু, ব্রজভূষণ রসময়
নদীয়াপুর পরমানন্দকারী॥"—

পদকল্পতরু।

বিরহিণী গৌরবল্লভা শ্রীমন্দিরের এক প্রান্তে একাকিনী বসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তিপূজা ও আরতি দর্শন করিলেন—তাঁহার নয়নে যেন প্রেম-নদী বহিতেছে, প্রাণে প্রেমানন্দের প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে—তিনি দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পার্ষদ ভক্তগণ একত্রিত হইয়া আজ শচী-আঙ্গিনায় কি সুন্দর আরতি-কীর্ত্তন করিতেছেন! গৌর-আনা-গোসাঞি স্বয়ং আরতি করিতেছেন—গৌরাগ্রজ শ্রীনিতাইচাঁদ আর যত অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এই আরতি-কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া শচী-আঙ্গিনায় প্রেমানন্দের তুফান উঠাইয়াছেন। বিরহিণী প্রিয়াজি এই প্রথম দেখিলেন শচী-আঙ্গিনায় তাঁহার প্রাণবল্লভকে শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য আরতি করিলেন—নদীয়ায় মহাপ্রকাশ লীলারঙ্গের সময়ে গৌর-আনা-গোসাঞিপ্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁহার প্রাণবল্লভের ঐশ্বর্য্যভাবে যে অভিষেক, পূজা ও আরতি প্রভৃতির বিধিনিয়মে অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া গ্রহণ ও ঘোষণা করিয়াছিলেন,—তাহা তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন মাত্র—এক্ষণে সেই লীলার অপূর্ব্ব পুনরভিনয় শচী-অঙ্গনে দর্শন করিয়া তাঁহার মনে একটী অপূর্ব্ব নবভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিতেছেন তাঁহার প্রাণবল্লভ কি স্বয়ংভগবান সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ? তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি কি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি? তবে তাঁহার হাতে বাঁশি নাই কেন? মস্তকে ময়ুরপুচ্ছের চূড়া কৈ?

তাঁহার গোপরূপ ও গোপবেশ কৈ? তাঁহার বর্ণ গৌর কেন? গৌর-বল্লভা এইরূপ একটী নবভাবে বিভাবিত হইয়া চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া যেন ধ্যানস্থা হইলেন। তখন আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে—সকলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন —কিন্তু বিরহিণী গৌরবল্লভা নিজ আসন হইতে উঠিলেন না—তিনি তখন তাঁহার প্রাণবল্লভের স্বরূপতত্ত্ব-বিচার-চিন্তায় নিমগ্না—তাঁহার পাদপদ্ম-ধ্যানাবিষ্টা। সর্ব্বাগ্রে সখি কাঞ্চনার দৃষ্টি বিরহিণী প্রিয়াজির উপর পতিত হইল—তিনি আরতি শেষ করিয়াই তাঁহার প্রিয়সখির নিকটে আসিয়া বসিলেন—সখি অমিতাও আসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—প্রিয়াজি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা—তাঁহার কমল নয়নদ্বয় মুদ্রিত—কিন্তু নয়নকোণে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে।

এই ভাবে প্রায় চারি দণ্ড কাল অতিবাহিত হইল—শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে আরতির পর সখিগণের কীর্ত্তন চলিতেছে—

যথারাগ।

—"বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি, প্রেমরসে ভোর॥
নবদ্বীপ যোগপীঠে বসিবে দুজনে।
আনন্দে করিব মুঞি চামর ব্যজনে॥
নদীয়া-যুগল-অঙ্গে চন্দন মাখাব।
কর্পূর তাম্বুল দুঁহু অধরেতে দিব॥
মালতির মালা গাঁথি দুঁহু গলে দিব।
প্রাণ ভরি শ্রীযুগলের বদন হেরিব॥
কাঞ্চনা অমিতা আদি যত সখিবৃন্দ।
(তাঁদের) আদেশে করিব সেবা চরণারবিন্দ॥
অধরের সুধাসিক্ত চর্ব্বিত তাম্বুল।
প্রসাদ মাগিয়া ল'ব হইয়া ব্যাকুল॥
কবে মুঞি হব এই সেবা অভিলাষী।
নিশিদিন তাই ভাবে দাসী হরিদাসী॥"—

গৌর-গীতিকা।

অনেকক্ষণ পরে বিরহিণী গৌরবল্লভার প্রেম-সমাধি ভঙ্গ হইল—তখন তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, লজ্জিত ভাবে সখি কাঞ্চনাকে মৃদু মধুর কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি কাঞ্চনে। আরতি কি শেষ হইয়া গিয়াছে? সখি কাঞ্চনা উত্তর করিলেন—"অনেকক্ষণ। এতক্ষণ তুমি সখি! কোন্ অপরূপ ভাব-রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলে?"—বিরহিণী প্রিয়াজি কোন উত্তর দিলেন না—কিন্তু তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—সখি কাঞ্চনা তখন পরম প্রেমাবেশে তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার কি হইয়াছে—তুমি কি দেখিয়াছ আমাকে খুলিয়া বল দেখি? আমার নিকট তোমার আর লজ্জা কি?" তখন বিরহিণী প্রিয়াজি অতি মৃদুস্বরে সখি কাঞ্চনার কাণে কাণে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার প্রাণবল্লভ—তোমাদের নদীয়া-নাগর নবনটবর গৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে আজ দেখিলাম শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ আর শ্রীগৌর-গোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তিতে কোন প্রকার প্রভেদ নাই—কেবল একের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ—অপরের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, - এইমাত্র প্রভেদ। একজন শ্যাম সুন্দর আর একজন গৌরসুন্দর। তবে কি সখি! আমার প্রাণবল্লভ শচীনন্দন গৌরহরি নহেন? তবে কি তোমাদের দুখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার তিনি প্রাণবল্লভ নহেন?" এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রিয়সখির গলদেশ দুটি ক্ষীণ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—সখি অমিতা সকলি বুঝিতে পারিয়াছেন,—তিনি এবং কাঞ্চনা অভেদাত্মা এবং সর্ব্বজ্ঞা—প্রিয়াজির মনের ভাব সকলি তাঁহারা জানেন। ঐশ্বর্য্য-ভাব-গন্ধশূন্য গৌর-বল্লভার মনে আজ তাঁহার প্রাণবল্লভের স্বরূপতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যভাবপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব দর্শনে লৌকিকী-লীলায় তাঁহার মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে,—তাহার অভি-ব্যক্তিরূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাস্বাদিত এই গৌরতত্ত্বব্যঞ্জক অপূর্ব্ব লীলাংশটি গৌরভক্ত মাত্রেরই পরমাস্বাদনীয় বস্তু।

সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার প্রিয়সখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর মনোভাবানুযায়ী সান্ত্বনাবাক্যে গৌর-বল্লভাকে বুঝাইলেন—তোমার প্রাণবল্লভ তাঁহার ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন—"ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম"—ইহাই তাঁহার উপদেশবাক্য। তিনি সকলের প্রতি ইহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। প্রিয়সখি! তোমাকেও ত তিনি এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিতেন—প্রচ্ছন্ন-অবতার-নারী তুমি —

ইহা তুমি জান। এক্ষণে তাঁহার স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার স্বরূপতত্বের বিশিষ্ট আবির্ভাব শ্রীগৌর-গোবিন্দ রূপে তোমাকে যে অপরূপ দর্শন দান করিলেন—ইহা তোমার প্রতি তাঁহার বিশিষ্ট কৃপার নিদর্শন। তোমার প্রাণ-বল্লভ শচীনন্দন গৌরহরিই শ্রীগৌর-গোবিন্দ—আর শ্রীগৌরগোবিন্দই শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ। আর তুমি সেই অদ্বয়-জ্ঞান-লক্ষণ স্বয়ং সিদ্ধ-সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদত্রয়শূন্য শক্তিমত্তত্বের মূর্ত্তিমতী পরাশক্তি। গৌরবর্ণ গোবিন্দই তোমার প্রাণ-বল্লভ—তিনিই কলিজীবের পরতত্ব এবং পরমোপাস্য। এই পরতত্ব যখন মূর্ত্তিমতী পরাশক্তি এবং শক্তিমান এই উভয় রূপে প্রতিভাত হন, তখন সাধক সম্প্রদায় তাঁহাকে যুগলরূপে উপাসনা করিয়া জীবন ধন্য মনে করেন। ব্রজযুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন ব্রজবাসীজনের পরমোপাস্য তেমনি নদীয়া-যুগল শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ নদীয়াবাসীজনের পরমোপাস্য। ব্রজজন ও নদীয়াজন একতত্ব ও একই বস্তু। তুমি আমাদের **নদীয়ার রাই** আর তোমার প্রাণবল্লভ আমাদের **ব্রজের কানাই**। আমরা তোমাদের তত্ব সকলি জানি এবং দেখি তোমার প্রাণ-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ কত লুকোচুরি লীলারঙ্গ করিতেছেন—সাধ করিয়া কি মহাজন ভক্তকবি লিখিয়াছেন,—

"(ঐ) গোরারূপের মাঝে কাল বরণ ঝলক দেয়।
(এ যে) ব্রজের রতন নদীয়ায়।"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা অতিশয় নিবিষ্ট-মনে পরম গৌর-প্রেমাবিষ্টভাবে এই সকল কথাগুলি শুনিলেন—কিন্তু কোনরূপ উত্তর দিলেন না। তিনি নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন কোন প্রগাঢ় চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কোন অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্ট ভাব-রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন।

অনেকক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি সকরুণ নয়নে চাহিয়া কাতর বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমার কথাগুলির মর্ম্ম আমি বিন্দুমাত্রও বুঝিলাম না। শচীনন্দন নদীয়াবিহারী গৌরহরিই আমার প্রাণ-বল্লভ—তিনিই আমার উপাস্য—তিনিই আমার জীবন সর্ব্বস্বধন—তিনিই আমার কৃষ্ণ"।

এই বলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ছলছল নয়নে করুণস্বরে তাঁহার গৌর-বিরহ-দুঃখ-কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিলেন—

যথারাগ

সখি

—"গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥
হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ মোর কোথা গেল চলি॥"—

বাসু ঘোষ।

এই কয়টী কথা বলিতেই বিরহিণী গৌর-বল্লভার প্রাণ যেন ফাটিয়া গেল—হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—তিনি গৌর-বিরহ-তাপে দাবদগ্ধ হরিণীর ন্যায়, ঠাকুর মন্দিরের বারন্দায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন—তাঁহার কেশদাম আলুলায়িত—পরিধান বস্ত্র অসম্বর—সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসর—বদনে কেবল—

—"গেল গৌর না গেল বলিয়া"—

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন—বহুক্ষণ পরে তাঁহার যেন একটু তন্দ্রাবেশ আসিল—তিনি সেই অবস্থাতেই মৃদু কাতরস্বরে বলিতেছেন,—

—"গেল গৌর না গেল বলিয়া"—

মর্ম্মী সখিদ্বয় সকলি জানেন—সকলি বুঝিতেছেন—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের অপ্রকট-প্রকাশ-লীলারম্ভের কাল উপস্থিত,—তাহাও তাঁহারা জানেন। এখন বিরহিণী গৌর-বল্লভা প্রিয়াজিকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করেন—তাই ভাবিয়া তাঁহারা আকুল হইয়াছেন। সখি কাঞ্চনা বড়ই সুচতুরা, বিরহিণী প্রিয়াজির তৎকালোচিত গৌর-বিরহ-ভাবের কথাতেই তাঁহার উৎকণ্ঠিত মন শান্ত করিতে হইবে—এই ভাবিয়া অতি ধীরে ধীরে প্রিয়াজির কানে কানে কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমারই উক্তি তোমার প্রাণ-বল্লভের বিরহগীতি গৌরভক্ত মহাজনগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাঁহারা তোমার প্রাণ-বল্লভের পার্ষদ ভক্ত ও একান্ত নিজজন—তোমার মনের ভাব তাঁহারা কি করিয়া জানিলেন সখি! তুমি অনুমতি করিলে সেই সকল পদাবলী আমি গান করিতে পারি।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তখন আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন—পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে কাতর ক্রন্দনের

স্বরে কহিলেন—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে! আমার প্রাণ-বল্লভের নিজজন আমার মত দুখিনী ও মন্দভাগিনীকে যে স্মরণ করেন,—সে আমার পরম সৌভাগ্য। আমার দুঃখে তাঁহাদের প্রাণ গলে সে তাঁহাদের মহাপ্রাণের পরমোদারতা ও মহত্ত্ব। আমার প্রাণ-বল্লভের দুর্বিসহ বিরহজ্বালাপূর্ণ এ পাপ হৃদয়ের মর্ম্মব্যাথার যে কোন সহানুভূতিসূচক কথা আমার পক্ষে এখন পরম মঙ্গলকর—আমার এ অকথন গৌরবিরহ-ব্যাধির নিদান পরমৌষধ। তুমি সখি! সেই সকল মহাজনকৃত বিরহগীতি আমাকে শুনাইয়া কৃতকৃতার্থ কর"—তখন সখি কাঞ্চনা সখিবৃন্দসহ সঙ্গতের সহিত প্রিয়াজির বারমাস্যা গান আরম্ভ করিলেন,—

প্রিয়াজির উক্তি,—

প্রিয়াজির বারমাস্যা বিরহ-গীতি।

রাগ ধানসী।

(১)

—"পহিলহি মাঘ, গৌরবর নাগর,
দুখ-সাগরে হাম ডারি।
রজনীক শেষে, সেজ সঞে ধায়ল,
নদীয়া করিয়া আঁধিয়ারি॥
সজনি বিয়ে ভেল নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে যত ছিল সুখ,
এবে ভেল দুখ পরচুর॥ ধ্রু॥
নিজ সহচরীগণ, রোয়ত অনুখণ,
জননী লুঠত মহা রোই।
হা হা মরি মরি, ফুকরই, বেরি বেরি
অন্তর গর গর হোই॥
সো নাগরবর, রসময় সাগর,
যদি মোহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জিউ, ধরব হাম সুন্দরি,
জনম গোঙায়ব রোই॥

(২)

দোসর ফাল্গুন, গুণসঞে নিমগন,
ফাগু সুমণ্ডিত অঙ্গ।
সঙ্গে, সঙ্গিয়া যত, মৃদঙ্গ বাজত,
গাওত কতহুঁ তরঙ্গ॥
সজনি, সুন্দর গৌর-কিশোর।
রসময় সময়, জানি করুণাময়,
এবে ভেল নিরদয় মোর। ধ্রু॥
কুসুমিত কানন, মধুকর গাওন,
পিককুল ঘন ঘন রোল।
গৌর-বিরহ-দাব- দহে দগধ হাম,
মরি মরি করি উতরোল॥
মৃদু মৃদু পবন, বহই চিত মাদন;
পরশে গরল সম লাগি।
যাকর অন্তরে, বিরহ বিথারল,
সো জগভরি দুখভাগী॥

(৩)

মধুময় সময়, মাস মধু আওল,
তরু নব পল্লব শাখ।
নব-লতিকা পর, কুসুম বিথারল,
মধুকর মৃদু মৃদু ডাক॥
সহচরি! দারুণ সময় বসন্ত।
গোরা-বিরহানলে, যো জন জারল,
তাহে পুন দগধে দুরন্ত। ধ্রু॥
নব নদীয়াপুর, নব নব নাগরী,
গৌর-বিরহ-দুখ জান।
নিজ মন্দির তেজি, মোহে সমঝাহিতে,
তব চিত্তে ধৈরজ না মান॥
কাঞ্চন দহন, বরণ অতি চিকণ,
গৌর বরণ দ্বিজরায়।
যব হেরব পুন, তব দুখ মোচন,
করব কি মন পাতিয়ায়॥

(৪)

দুখময় কাল, কাল করি মানিয়ে,
আওল মাহ বৈশাখ।
দিনকর কিরণ, দহন মম দারুণ,
ইহ অতি কঠিন বিপাক॥
খরতর পবন, বহই সব নিশি দিন,
উমরি গুমরি গৃহ মাঝ।
গোরা বিনু জীবন, রহয়ে তছু অন্তরে,
তাহে দুখ সমূহ বিরাজ॥
মন্দ-তরঙ্গিত, গন্ধ-সুগন্ধিত,
আওত মারুত মন্দ।

গৌর-সুসঙ্গ, বিভঙ্গ ষদঙ্গহি,
লাগয়ে আগি প্রবন্ধ॥
কো করু বারণ, বিরহ নিদারুণ,
পর কারণ দুখভাগী।
অতি করুণাময়, সো শচীনন্দন,
যা কর হোই বিরাগী॥

(৫)

গণি গণি মাহ, জৈষ্ঠ অব পৈঠল,
আনল সম সব জান।
কানন গহন, দাব ঘন দাহন
ভয়ে মৃগী করত পয়ান॥
মধুরিম আম্র, পনস সরসাবলী,
পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন, কুহু কুহু বোলত,
শুনি যেন বরজ বিশাল॥
ইথে যদি কাঞ্চন- বরণ গৌর তনু,
দরশন আধ তিল হোই।
তব দুখ সকল, সফল করি মানিয়ে,
কি করব ইহ সব সোই॥
মধুকর নিকর, সরোরুহ মধুপর,
বেরি বেরি পিবে করু গান।
ঐছন গৌর- বদন সরোরুহ,
মধু হাম করব কি পান॥

(৬)

ঘন ঘন মেঘ, গরজে দিন যামিনী,
আওল মাহ আষাঢ়।
নবজলধর পর, দামিনী ঝলকয়ে,
দাহ দ্বিগুণ তঁহি বাঢ়॥
সহচরি। দৈবে দারুণ মোহে লাগি।
শরদ-সুধাকর, সম মুখ সুন্দর,
সো পহুঁ কাঁহা গেও ভাগি॥ ধ্রু॥
অন্তর গর গর, পাঁজর জর জর,
ঝর ঝর লোচন বারি।
দুখকুল-জলধি, মগন ভছু অন্তর,
তাকর দুখ কি নিবারি॥
যদি পুন গৌরচাঁদ, নদীয়াপুর,
গগনে উজোরয়ে নিত।
তব সব দুখ বিফল করি মানিয়ে,
হোয়ত তব থির চিত॥

(৭)

পুন পুন গরজন, বজর নিপাতন,
আওল শাওন মাহ।
জলধর তিমির, ঘোর দিন যামিনী,
ঘর বাহির নাহি যাহ॥
সজনি। কো কহে বরিষা ভাল।
ধরাধর জল, ধারা লাগয়ে,
বিরহিণী তীর বিশাল॥ ধ্রু॥
একে হাম গেহি, লেহি পুন কো করু
ঝাঁপর অন্তর মোর।
তিতি থনে মরি মরি, গৌর গৌর করি,
ধরণী লোটহি মহা ভোর।
গণি গণি দিবস, মাস পুন পূরল,
মাস মাস করি সাত।
ইথে যদি গৌরচন্দ্র, নাহি আওল,
নিচয় মরণ কি বাত॥

(৮)

আওল ভাদর, কো করু আদর,
বাদর তবহি লজাত।
দাদুরি দাদুর, রব শুনি বেরি বেরি,
অন্তরে বরজ বিঘাত॥
কি কহব রে সখি! হৃদয়ক বাত।
পরিহরি গৌরচন্দ্র, কাঁহা রাজত,
দুয় এক সহচর সাথ! ধ্রু॥
যদি পুন বেরি, শান্তিপুর আওল,
কাহে না আওল নিজ ধাম।
তাঁহা সংকীর্ত্তন, প্রেম বিথারল,
পূরল ভছু মনকাম॥
দুরগত পতিত, দুখিত যত জীবচয়,
তাহে করুণা করু যোই।
তাহে পুন তাপ, রাশি পরিপূরিয়া
মোহে কাহে তেজল সোই॥

(৯)

আওল **আশ্বিন**, বিকসিত সব দিন,
জল থল পঙ্কজ ভাল ॥
মুকুলিত মল্লিকা, কুসুমভরে পরিমলে,
গন্ধিত শরত কাল ॥
সজনি কত চিত ধৈরজ হোই।
কোমল শশীকর, নিকর সেবন পর,
যামিনী রিপু সম হোই। ধ্রু ॥
যদি শচীনন্দন, করুণা পরায়ণ,
যাপর নিরদয় ভেল।
তাকর সুখময়, সময় বিপদময়,
লাগয়ে যৈছন শেল ॥
ঘুমহীন লোচন, বারি ঝরত ঘন,
জনু জলধরে বহে ধার।
ক্ষিতিপর শুই, রোই দিন যামিনী
কো দুখ করব নিবার ॥

১০

আওল **কাতিক**, সব জন নৈতিক,
সুরধুনী করত সিনান।
ব্রাহ্মণগণ পুন, গঙ্গা তর্পণ,
করতহি বেদ বাখান ॥
সখি হে ! হাম ইহ কছু নাহি জান।
গৌর-চরণযুগ, বিমল সরোরুহ,
হৃদি করি অনুখণ ধ্যান। ধ্রু ॥
যদি মোর প্রাণনাথ বহুবল্লভ
বাহুরায় নদীয়াপুর।
ধরম করম সব, কছু নাহি খোঁজব,
পিয়ব প্রেম মধুর ॥
বিধি বড় নিদারুণ, অবিধি করয়ে পুন,
সরবস যাহে দেই যোই।
তাকর ঠামে, লেই পুন পরিহরি,
পাপ করয়ে পুন সেই ॥

(১১)

আওল **আঘ্রাণ**, মাহ নিরায়ণ,
কোন্ করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিণী জন, দেহ বিঘাতন,
তাহে ঘন শীত কৃতান্ত ॥
শুন সহচরি ! এবে ভেল মরণ বিশেষ।
পুনরপি গৌর-কিশোর, চিতে হোওত,
ভরসা দুখ অবশেষ ॥ ধ্রু ॥
নিজ সহচরিগণ, আওত নাহি পুন,
কার মুখে না শুনিয়ে বাত।
তব কাহে ধৈরজ, মানব অন্তর,
অতএব মরণ অবঘাত ॥
যদি পুন স্বপনে, গৌরমুখ-পঙ্কজ,
হেরিয়ে দৈব বিধান।
তবহি সকল করি, মানিয়ে নিশিদিন,
আধ তিল ধৈরজ মান।

(১২)

আওল **পৌষ** মাহ অতি দারুণ,
তাহে ঘন শিশির নিপাত।
থরহরি কম্পিত, কলেবর পুন পুন,
বিরহিণী পর উৎপাত ॥
সজনি ! আর কি হেরব গোরামুখ।
গণি গণি মাহ, বরষ অব পূরল,
ইথে পুন বিদরয়ে বুক ॥ ধ্রু ॥
তোমারে কহিয়ে পুন, মরণক বেদন,
চিত মাহা কর বিশোয়াশ।
গৌর-বিরহ-জ্বরে, ত্রিদোষ হইয়া জারে,
তাহে কি ঔষধ অবকাশ ॥
এত শুনি কাহিনী, নিজ সব সঙ্গিনী,
রোই রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবনে ভণে, ধৈরজ ধরহ মনে,
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি ॥"

পদকল্পতরু।

বিরহিণী গৌরবল্লভা সখিমুখে তাঁহার বারমাস্যা-বিরহ-কাহিনীগুলি নিবিষ্টচিত্তে একে একে সকলি শ্রবণ করিলেন। মহাজনকবি এই পদকর্ত্তা ভুবনদাস কে ? তাঁহার কিছু পরিচয় পাইবার জন্ম তিনি ব্যগ্রতা সহকারে তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধ্বী কাঞ্চনা বলিলেন—"ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র

এবং রাধামোহন ঠাকুরের সহোদর।" শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চিহ্নিত দাস—তাঁহার বংশধর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর লীলাকথা লিখিবেন না ত আর কে লিখিবে? পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরও প্রিয়াজির বিরহগান গাহিয়াছেন। তিনিও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের রসিক ভক্ত ছিলেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই যে মহাজন কবিগণ—ইহাঁরা আমার মনের ভাব এবং মর্ম্মব্যাথা কি করিয়া জানিলেন ও বুঝিলেন সখি?"—তখন সখি কাঞ্চনা বলিলেন—"প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি কৃপা করিয়া যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে গৌরপ্রেমের তরঙ্গ উঠাইয়াছ—তুমি দয়া করিয়া যাঁহাদিগকে সুমধুর গৌরলীলা বর্ণনের যোগ্যতা ও শক্তি দান করিয়াছ—তাঁহারা সকলেই তোমাদের রসিক ভক্ত—তোমাদের প্রেম-লীলা-রঙ্গই তাঁহাদের জীবাতু—তোমাদের বিরহ, মিলন এবং সম্ভোগ-রস-ভাণ্ডারের উপযুক্ত ভাণ্ডারী এই সকল রসিক গৌরভক্তগণ। বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনই ইহাদের ভজনসাধনের মূল মন্ত্র। সখি! তোমাদের যুগলসেবা প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক রসিকভক্ত ঠাকুর নরোত্তম দাসের প্রার্থনা ও ভজন-প্রণালী কি শুনিবে?"—

বিরহিণী গৌরবল্লভা প্রসন্ন মনে অনুমতি দিলেন—সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে গানের ধুয়া ধরিলেন,—

—"জীবনে মরণে গতি, রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি
দোঁহার পীরিতি-রস-সুখে।
যুগল সঙ্গতি যারা, মোর প্রাণ গলে হারা
এই কথা রহু মোর বুকে॥
যুগল চরণসেবা, যুগল চরণ ধেয়াবা,
যুগলের মনের পীরিতি।
যুগল কিশোর রূপ, কাম-রতি-গণ ভূপ,
মনে রহু ও লীলাকি রীতি॥
দশনেতে তৃণ করি, হা! কিশোর কিশোরী,
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজকুমার শ্যাম, বৃষভানু-নন্দিনী নাম,
শ্রীরাধিকা রামা মনোহারী॥
কনক কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাঁই,
দরপ দরপ করু চুর।
নটবর শেখরিণী, নটনীর শিরোমণি,
দুঁহু গুণে দুহুঁ মন ঝুর॥
শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
ভাবভূষণ করু শোভা।
নীল পীতবাস ধর, গৌরশ্যাম মনোহর,
উভয়ের ভাবে দুঁহু লোভা॥
আভরণ মণিময়, প্রতি অঙ্গে অভিনয়,
কহে দীন নরোত্তম দাস।

নিশি দিন গুণ গাই, পরম আনন্দ পাই,
মনে মোর এই অভিলাষ॥
রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত
লোক-বেদ-সার এই বাণী।
সখির অনুগা হৈয়া, ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণি।
রাধিকার সখি যত, তাহা বা কহিব কত,
মুখ্য সখি করিব গণন।
ললিতা বিশাখা তথা, চিত্রা চম্পকলতা,
রঙ্গ দেবী সুদেবী কথন॥
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখি লেখা,
এবে কহি নর্ম্ম সখিগণ।
রাধিকার সহচরী, প্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম ধরি,
প্রেমসেবা করে অনুখন॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সার, শ্রীরতি মঞ্জরী আর,
আনন্দ মঞ্জরী মঞ্জুনালী।
শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,
প্রেমসেবা করি কুতুহলী॥
এসব অনুগা হইয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া,
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।
রূপে গুণে ডগমগি, সদা হ'ব অনুরাগী
বসতি করিব সখি মাঝ॥
বৃন্দাবনে দুহু জন, চতুর্দ্দিকে সখিগণ,
সময় বুঝিব রসসুখে
সখির ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে
তাম্বুল যোগাব চাঁদ মুখে॥
যুগল চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,
অনুরাগী থাকিব সদাই।

সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা,
রাগ পথের এই যে উপায় ॥
সাধনে যে ধন চাই, সিদ্ধদেহে তাহা পাই,
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধন গতি,
ভকতি লক্ষণ তত্ত্বসার ॥
নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখিগণ গণনাতে আমারে লিখিবে তাতে
তবহি পূরব অভিলাষ ॥
যুগল চরণ প্রীতি, পরম আনন্দ তথি,
রতি, প্রেমময় পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম, উপায় করে৺ রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥
মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুর ধাম,
যুগল-বিলাস স্মৃতি-সার।
সাধ্য সাধন এই, ইহা পর আর নেই,
এই তত্ত্ব সর্ব্ব বিধি সার ॥"—
প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অতিশয় মনোযোগের সহিত রাগের ভজনতত্ত্বগুলি একে একে সকলি শুনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভজনসম্বন্ধে এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বকথা তিনি সকলই জানেন—কারণ তাঁহার প্রাণবল্লভের আদেশানুযায়ী গৌর-বল্লভা এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণভজনও করেন। রাগমার্গের ভজন-পন্থা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ। তিনি তাঁহার প্রাণ-বল্লভ দুই পক্ষেই—কুলস্ত্রীগণের স্বামীই প্রাণবল্লভ এবং তাঁহাদিগের ইষ্টদেবও প্রাণবল্লভ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তাঁহার প্রাণবল্লভ সিদ্ধমন্ত্র দীক্ষা দিয়াছিলেন সন্ন্যাসের পূর্ব্বে,—এবং তাঁহাকে রাগমার্গের ভজন-পন্থা শিক্ষাও দিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং (১)। অতএব এ সকলি তিনি জানেন, তথাপিও প্রচ্ছন্ন অবতার-নারী গৌর-বল্লভা অজ্ঞতার ভাণ করিয়া তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চন'কে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমি বিধি ও রাগমার্গে ভজন-বিজ্ঞা—তুমিই আমার সখিরূপা গুরু,—আমাকে তোমাদের অতি গুহ্য এই ভজনবিদ্যা শিক্ষা দিয়া কৃত কৃতার্থ কর—ঠাকুর নরোত্তমের উপদেশগুলি সব আমি বুঝিতে পারিলাম না,—বহুবিষয়ে আমি অধিকারিণীও নহি! কি করিলে এই সখিরূপা শ্রীগুরুর আনুগত্য লাভ করিতে পারি—তাই তুমি আমাকে উপদেশ কর। তুমিই আমার গৌরপ্রেমের গুরু"। এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি গৌরপ্রেমাবেশে তাঁহার প্রিয়সখির হাত ধরিয়া কত না অনুনয় বিনয় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সখি কাঞ্চনা মহা বিপদে পড়িলেন—তিনি অতিশয় সুচতুরা—বাম-প্রখর স্বভাবা—অতিশয় স্পষ্ট বক্তা—তাঁহার মনে তখন একটী প্রাচীন পদের কথা মনে পড়িল—রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে তাঁহার প্রাণবল্লভাকে কৃষ্ণপ্রেমের গুরু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। গৌর-কৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া অদ্বয়-তত্ত্ব-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকাতে কৃষ্ণ-প্রেমের গুরুবুদ্ধিব্যঞ্জক রসশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বাক্য সকলই শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধেও প্রযুজ্য হইতে পারে। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা মনে মনে এইরূপ একটী ভাব পোষণ করিয়া সেই মহাজনী পদটী স্মরণ করিতে লাগিলেন।

বিরহিণী গৌরবল্লভা অন্তর্য্যামিনী। তাঁহার মর্ম্মীসখি কাঞ্চনার মনে যে নিগূঢ় ভাবটির উদয় হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনি তাঁহার পূর্ব্বকথা এখন চাপা দিয়া পুনরায় কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! শ্রীকৃষ্ণভজনে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার সখিবৃন্দের আনুগত্য স্বীকার করিতে অস্বীকার করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ-স্বরূপের প্রাণবল্লভা বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরী শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীবৃন্দাবনে রাসলীলা দর্শনে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন কেন বল দেখি?" সখি কাঞ্চনা এই প্রশ্ন শুনিয়াই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন বিরহিণী প্রিয়াজির মনের ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন ভাব ধারণ করিল কেন? কিন্তু তিনি অতিশয় চতুরা—তাঁহার প্রাণসখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনোভাব বুঝিতে তাঁহার মত বুদ্ধিমতী এবং সুচতুরা মর্ম্মীসখির কিছু বাকি রহিল না। তিনি কিছুক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা করিলেন—তারপর উত্তর দিলেন,—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং গোলকেশ্বরী মহালক্ষ্মী

(১) দীক্ষিতা প্রভুনা তেন পত্নী-বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং।
সিদ্ধোমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং সদীক্ষয়েৎ।
ইতি-শাস্ত্র বলাদ্ধেতো স্বভার্য্যা মুপদিষ্টবান্ ॥
—চৈতন্য-তত্ত্ব-দীপিকা।

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী অভিন্ন-তত্ত্ব, কিন্তু লীলার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের লীলানুরূপ স্বরূপপ্রকাশের লীলাসহায়িনীসূত্রে যে নাম ও রূপ ধারণ করেন, তাহার অধিকার-তত্ত্বানুরূপ তৎস্বরূপ প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবহারিক লৌকিকী-লীলা প্রকট করেন। সেই লীলাসূত্রে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী এক পত্নী-ধর মহৈশ্বর্য্যশালী শ্রীশ্রীনারায়ণ-স্বরূপের অঙ্কলক্ষ্মীরূপে বহুবল্লভ অখিলরসামৃতসিন্ধু রসরাজ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের রাসলীলা দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।"

গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তখন পরম গম্ভীরভাবে বিনতবদনে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বাম হস্তের অঙ্গুলির নখর-মণি খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন—"সখি! আমি কুলের কুলবধূ—আমি কুল-শীল-মানের অপেক্ষা রাখি—আমার অদৃষ্টে ব্রজের পরকীয়াভাবের ভজন সম্ভব নহে—সুতরাং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-দর্শন-সৌভাগ্য আমার নাই। তুমি যদি কৃপা করিয়া গুরুরূপা সখিরূপে আমাকে ব্রজযুগলের শ্রীচরণান্তিকে দাসীরূপে সমর্পণ কর, তাহা হইলে জীবন সার্থক মনে করি এবং চিরদিন তোমার শ্রীচরণের দাসী হইয়া থাকি।" এই বলিয়া প্রিয়াজি সখি কাঞ্চনার চরণে মস্তক নত করিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আজ তোমার মুখে যে ভাবের কথাটি শুনিলাম, ঠিক এই ভাবের কথা লইয়া বৈষ্ণব সমাজে নদীয়া-যুগলভজনসম্বন্ধে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে,—সেই দ্বন্দ্বের ফলে ঠাকুর নরোত্তম ও নরহরির অভিপ্সীত প্রাণের আশার পথে এবং বহু রসিক গৌরভক্তজনের শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল উপাসনার পথে কণ্টক রোপিত হইবে। স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ প্রসঙ্গে শ্রীজীব-গোস্বামী-চরণকে স্বকীয়াবাদের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। তুমি সর্ব্বজ্ঞা ও অন্তর্য্যামিনী—তোমার এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ শিববিরিঞ্চিরও অগোচর—তুমি এখন যে প্রশ্ন স্বয়ং উঠাইলে—সেই প্রশ্নই নদীয়া-যুগলভজন প্রচারের পথে অন্তরায় হইবে"।

বিরহিণী গৌরবল্লভা স্বভাবতই আত্মতত্ত্বগোপনাভিলাষিণী এবং ঐশ্বর্য্যভাবগন্ধশূন্যা। তিনি তাঁহার প্রিয়সখির মুখে তাঁহাদের যুগল-ভজন-রহস্য-কথা কয়েকবার শুনিয়াছেন—কিন্তু সে সম্বন্ধে নিজ অভিমত কখন প্রকাশ করেন নাই। বরঞ্চ তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের দাসীত্ব-পদকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের দাসীত্বপদ-গৌরবেই তিনি সর্ব্বদা গরবিণী মনে করিতেন। প্রচ্ছন্ন অবতারনারীর এই প্রচ্ছন্নত্বভাবটি বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর। সেই প্রচ্ছন্নত্ব সর্ব্বভাবে সর্ব্বকাল রক্ষা করিবার জন্যই গৌর-বল্লভা সর্ব্বদাই চিন্তিতা থাকিতেন—কিন্তু তাঁহার মর্ম্মী সখিগণের নিকট তাঁহার ভারিভুরি সকল সময়ে খাটিত না।

এক্ষণে গৌর-বল্লভা তাঁহার এই প্রশ্নসম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনার শেষ কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি তাঁহাকে মৃদু মধুর বচনে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! এসকল অবান্তর কথা-প্রসঙ্গ এখন আমার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। আমি গৌর-বিরহিণী,—আমার প্রাণবল্লভ বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন করিয়া যে অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ লীলাচলে প্রকট করিয়াছিলেন—তাঁহারই আদেশে আমি নবদ্বীপে বসিয়া তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। ইহাই আমার প্রকৃষ্ট ভজন। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমার এই গৌরভজনের অনুকূল পন্থা গৌর-বিরহসম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন মহাজনী পদ আমাকে কৃপা করিয়া শুনাইয়াছ—তাহাতে আমি আমার ভজনাদর্শের অনুকূল বস্তু বহু পাইয়াছি। যদি ঐরূপ পদ আরও কিছু থাকে, সেই গুলি তুমি আমাকে শুনাইয়া কৃত কৃতার্থ কর"—

আত্মস্বরূপ প্রকাশ সম্বন্ধে সখি কাঞ্চনার মুখ এইভাবে বন্ধ করিয়া তিনি পুনরায় প্রাচীন পদাবলী গান করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সখি কাঞ্চনা তাঁহার প্রিয়সখির তাৎকালিক মনভাব বুঝিয়া তখন আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। তিনি বলিলেন—"সখি! তোমার উক্তি প্রাচীন মহাজন রচিত গৌর-বিরহ-রসাস্বাদনবিষয়ক বহু পদাবলী আছে—তাহার মধ্যে বারমাস্যা পদগুলি এখন তোমাকে শুনাইতেছি—ইহাতেই অদ্য রাত্রি শেষ হইবে"। এই বলিয়া তিনি তাঁহার কলকণ্ঠে সেই গভীর নিশীথে গৌরপ্রেমাবেশে গান গাইতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য সখিগণ ও দাসীগণ সকলেই সেখানে আছেন। রীতিমত সঙ্গতের সঙ্গে গানের ধুয়া ধরিলেন,—

পঠমঞ্জরী বা কৌ-রাগিণী।

—"ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ দীপ গন্ধে।
সঙ্কীর্ত্তন করাইব মনের আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! তোমার জন্মতিথি পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ যুবা॥
—"চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউপিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কাঁদে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীরা বুলে।
তুমি দূরদেশে আমি গোঙাব কার কোলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! আমি কি বলিতে জানি।
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী॥
—"বৈশাখে চম্পকলতা নূতন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোচা॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কাঁধে।
সে রূপ না দেখি মুঞি জীব কোন ছাঁদে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র॥
—"জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড তাপ প্রকাণ্ড সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ রাতা॥
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কাঁদে নিশিদিন।
ছট্ ফট্ করে যেন জল বিনু মীন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
—"আষাঢ়ে নূতন মেঘ দাদুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিবেক বাদে॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট॥
ও গৌরাঙ্গ পহু হে! মোরে সঙ্গে লয়ে যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও॥
—"শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা॥
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে চিন্তিয়া মোর দেহে না রহে জীবন॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥
—"ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! বিষম ভাদ্রের খরা।
প্রাণনাথ নাহি যার, জীয়ন্তে সে মরা॥
—"আশ্বিনে অম্বিকাপূজা দুর্গা মহোৎসবে।
কান্ত বিনা যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে॥
শরত সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল, অন্তর বিদরে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ॥
—"কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা।
কেমনে কৌপিন বস্ত্রে আচ্ছাদিবা গা॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এই অভাগিনী মুঞি হেন পাপ রাশি॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি॥"

এতক্ষণ বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী স্থির হইয়া সখি কাঞ্চনার মুখে গান শুনিতে ছিলেন—উপরোক্ত পদাংশ শ্রবণ করিয়াই তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন—সখি অমিতা তাঁহাকে পরম প্রেমভরে ক্রোড়ে করিয়া একান্তে বসিলেন—সখি কাঞ্চনা তখন গান বন্ধ করিলেন এবং প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বিরহিণী গৌরবল্লভা আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় গান করিতে অনুমতি দিলেন - তখন সখি কাঞ্চনা পুনরায় ধুয়া ধরিলেন,—

"—অগ্রাণে নূতন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্বসুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে॥
পাটনেত ভোটে প্রভু শয়ন কম্বলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে॥
ও গৌরাঙ্গ পহুঁ হে! তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া॥

—"পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূরদেশে।
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! পরবাস নাহি শোহে।
সঙ্কীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে॥
—"মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব॥
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সন্ততি॥
ও গৌরাঙ্গ পঁহু হে! মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস।"—

গৌরপদ তরঙ্গিণী।

বিরহিণী প্রিয়াজি আত্মকথা শুনিতে শুনিতে সরমে মস্তক অবনত করিলেন—এখন এতকাল পরে এই সকল তাৎকালিক মনের গুহ্য কথাগুলি পদকর্ত্তা লোচন দাস কি করিয়া জানিতে পারিলেন, গৌরবক্ষবিলাসিনী মনে মনে তাই ভাবিতে লাগিলেন—তিনি লজ্জায় যেন মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিতেছেন না—পরমা গম্ভীর প্রকৃতি গৌর-বল্লভা আজ যেন সখিসমাজেও পরম লজ্জিতা বোধ করিতেছেন—কিন্তু ইহা তাঁহার বাহ্যভাব। অন্তরে তিনি তাঁহার গৌরবিরহকথা শ্রবণ করিয়া মহা সন্তুষ্টই আছেন।

সখি কাঞ্চনা গানটী শেষ করিয়া তাঁহার প্রিয়সখির নিকটে গিয়া বসিলেন এবং তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া প্রেমগদগদভাবে কহিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! ইহাতে লজ্জা কি? তোমাদের অপূর্ব্ব প্রেমলীলারঙ্গ এবং বিরহকাহিনী ত্রিজগতে অতুলনীয়, বিপ্রলম্ভরসপুষ্টিকর এই সকল মহাজনী পদাবলী তোমাদের রসিক ভক্তগণের পরমাস্বাদ্য এবং তাঁহাদের ভজনের মূল,—তাঁহাদের জীবাতু।

বিরহিণী প্রিয়াজি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "সখি কাঞ্চনে! গৌরপার্ষদ লোচনদাসের কিছু পরিচয় পাইলে পরম সুখী হইব।" তখন সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! লোচনদাস খণ্ডবাসী ঠাকুর নরহরির বিশিষ্ট কৃপাপাত্র এবং চিহ্নিত দাস। ইনিই ঠাকুর নরহরির আদেশে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া বৈষ্ণবজগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই শ্রীগ্রন্থের একস্থানে তিনি তোমাদের নিগূঢ় অপূর্ব্ব যুগল-বিলাস রঙ্গ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রিতে তোমার প্রাণ-বল্লভ তোমার সহিত যে রহোলীলারঙ্গ প্রকট করিয়াছিলেন—তাঁহার বিবরণ একমাত্র এই রসিকভক্তবর লোচনদাসই তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া সমগ্র রসিকভক্তমণ্ডলীর ধ্যেয় বস্তু শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজন-পন্থার মূলমন্ত্রস্বরূপ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া জীবজগতের অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। প্রিয়সখি! তুমি যদি সে সকল গুহ্যকথা এখন শুনিতে চাহ, আমি গান করিয়া তোমাকে এখনি তাহা শুনাইতে পারি"—

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার বহু দিনের এসমস্ত গুহ্য প্রেমকথা এখন শুনিয়া প্রথমতঃ শিহরিয়া উঠিলেন—তিনি বুঝিলেন তাঁহার প্রাণ-বল্লভের বিশিষ্ট কৃপাদেশ ভিন্ন পদকর্ত্তা লোচনদাসের এতদূর সাহস হইবে কেমনে? গৌরবল্লভা ভাবিতেছেন তিনি এবং তাঁহার প্রাণ-বল্লভ ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ সে রাত্রির ঘটনা জানিতে পারে নাই। আমার প্রাণ-বল্লভের রসিক ভক্তবর ঠাকুর নরহরির কৃপা ভিন্ন তাঁহার কৃপাপাত্র লোচন দাস এই প্রেমগুহ্যাতিগুহ্য নিগূঢ় পরম রহস্যপূর্ণ বিষয়টি জানিতে পারা অসম্ভব। বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এইরূপ মনে মনে ভাবিতেছেন এবং সেই পদটী সখি কাঞ্চনার মুখে শুনিতেও তাঁহার প্রাণে বাসনা হইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় মুখে কিছু বলিতে পারিতেছেন না। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা সর্ব্বজ্ঞা—প্রিয়াজির বদনের ভাব দেখিয়াই তিনি তাঁহার মনভাব বুঝিয়াছেন—তিনি আর উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই সেই পদটীর ধুয়া ধরিলেন,—যথা, শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

যথারাগ।

—"ছেড়ে গেলে মরি যাব গৌরাঙ্গ রে।
কার মুখ চাঞা রব গৌরাঙ্গ রে॥"—ধ্রু॥
—"রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ হিয়ায়।
আছিল অধিক করি পিরীতি বাড়ায়॥
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
যে কথায় থাকয়ে অন্তর সুস্থ হঞা॥
পুরজনে পরিতোষ যার যে উচিত।
এই মনে সবাকারে করয়ে পিরীত॥

বৈরাগ্য আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি।
ঘরে ঘরে নিজ প্রেম পরকাশ করি॥
কারু ঘরে হাস্য পরিহাস কথা কহে।
যার যেন হিয়া তেন মতে সব মোহে।
আছিলা গুপুত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে।
মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে॥
নানা আভরণ পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
হাস বিলাস রসময় অনুক্ষণ॥
সব লোক জানিলেক নহিব সন্ন্যাস।
স্বচ্ছন্দ হউক সব লোক নিজ দাস॥
—"শয়ন মন্দিরে সুখে শয়ন করিলা।
তাম্বুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা॥

পূর্ব্বোক্ত পদটী বিরহিণী গৌর-বল্লভা স্থিরভাবে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রির অপূর্ব্ব স্মৃতিকথা সকল একে একে মনে আসিতে লাগিল—তিনি গৌর-বিরহাবেশে ক্রমশঃ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনা গান ধরিলেন—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ—
"শয়ন মন্দিরে সুখে শয়ন করিলা।
তাম্বুল স্তবক করে বিষ্ণুপ্রিয়া গেলা॥"—

তখন বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মলিন পরিধান বসনা-ঞ্চলে নিজ বদনচন্দ্র আবরিত করিয়া বসিলেন—তিনি লজ্জায় যেন মরমে মরিয়া গেলেন—সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি কাতর নয়নে একবার চাহিলেন—সে চাহনির মর্ম্ম সখি—"আর কেন? এখানেই গান বন্ধ কর"—কিন্তু সখি কাঞ্চনা তখন নদীয়া-যুগল-রসোল্লাসে উন্মাদিনী হইয়াছেন—প্রিয় সখির ইঙ্গিতের কাতর প্রার্থনার মর্ম্ম তিনি যেন বুঝিয়াও বুঝিলেন না—তিনি তাঁহার নিজ ভাবোচিত প্রেমানন্দরসে মগ্ন হইয়া গাহিতে লাগিলেন,—

—"হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু আইস আইস বলে।
পরম পিরিতি করি বসাইল কোলে॥"

বিরহিণী প্রিয়াজি এতক্ষণ বসিয়া ছিলেন,—সখি অমিতা তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন,—এক্ষণে তিনি লজ্জায় বদন অবনত করিয়া গৌরপ্রেমাবেশে সখি অমিতার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন—এবং তাঁহার ক্রোড়ে বদন লুকাইয়া নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা সখি কাঞ্চনার মুখ চাপিয়া ধরিয়া এসময়ে এরূপ গান গাইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করি—কিন্তু কার্য্যে তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—কারণ এসকল অপূর্ব্ব মহাজনী পদগুলি সকলি শুনিতে তাঁহারও মনে একটা প্রবল বাসনা হইয়াছে—ইহার শ্রবণে তাঁহারও প্রাণে কে যেন একটা প্রেরণা-শক্তি দিতেছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণবল্লভের অতি নিগূঢ় রহোলীলারহস্য সকল তাঁহার অনঙ্গশরণ একান্ত অন্তরঙ্গ রসিকভক্তগণের মনে প্রেরণা দিয়া তিনিই লিখাইয়াছেন—এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই ইহা জগতে প্রকাশ হইয়াছে। এরূপ একটা ভাবতরঙ্গ প্রিয়াজির মনেও খেলিতেছে। এজন্য তিনিও বাহ্যে কোন প্রকার নিষেধ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন না। অন্তরে অন্তরে তাঁহার ইহাতে অনুমোদন আছে—তাঁহার মনোভাব সখি কাঞ্চনা জানেন—তাই তিনি আজ প্রাণ খুলিয়া গৌরপ্রেমা বেশে সর্ব্ব সখি-সমাজে—শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের এই অত্যন্ত নিগূঢ় রহোলীলারঙ্গ গান করিয়া আত্মশোধন করিতে-ছেন। তিনি গান গাহিতে লাগিলেন পরম প্রেমাবেশে—

যথারাগ।

—"বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিল।
অগোরু কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল॥
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা অঙ্গে।
শ্রীমুখে তাম্বুল তুলি দিল নানা রঙ্গে॥
তবে মহাপ্রভু সে রসিক শিরোমণি।
বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি॥

গান শুনিতে শুনিতে বিরহিণী গৌরবল্লভা গৌরপ্রেম-রসালসে সখি অমিতার ক্রোড়ে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছেন—তাঁহার এখন অন্তর্বাহ্য দশা—তিনি নিস্পন্দভাবে আছেন—সখি অমিতা তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত আছেন। সখি কাঞ্চনার গান চলিতেছে,—

—"দীর্ঘকেশ কামের চামর যিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা॥
মেঘ বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥

সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর।
শশী কোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥
খঞ্জন নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু কাম কামানের গুণ করিলেক॥
অগোর কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পারতেখে॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভুষিত তাঁহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥
ত্রৈলোক্য-মোহিনী রূপ নিরখে বদন।
অধর-মাধুরী সাধে করয়ে চুম্বন॥
ক্ষণে ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন করে।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে॥
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম অগোচর॥
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরি প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস॥
হৃদয় উপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা॥
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥
রজনীর শেষে প্রভু উঠিলা সত্বর।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর॥"—

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।

বিরহিণী প্রিয়াজি সখি-ক্রোড়ে প্রেমাবেশে শায়িত,—তিনি আজ যেন তাঁহার প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসের পূর্ব্ব-রাত্রির ন্যায় তাঁহার গৌরালিঙ্গিত শ্রীঅঙ্গখানি গৌরপ্রেমাবেশে প্রাণসখির অঙ্গে এলাইয়া দিয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতেছেন—উপরিউক্ত পদটীর শেষ চরণে আছে,—

—"বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর"।—

সেই "অতি ঘোরতর" নিদ্রায় আজ যেন গৌরবল্লভা সখি-ক্রোড়ে নিদ্রিতা। সুন্দর তাল-মান-লয়-সুরসংযোগে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুস্বরে সখিবৃন্দ সকলে মিলিয়া আজ এই অপূর্ব্ব গানটী গাইতেছেন—কিন্তু যাঁহার বিরহশান্তির উদ্দেশ্যে এই অতি নিগূঢ় রহোলীলার পরম গুহ্যরহস্যপূর্ণ এই পদটীর গানের অবতারণা—তিনিই আজ ঠিক এই সময়ে ঘোরতর প্রেম-নিদ্রায় অভিভূত। তাঁহার এখন প্রেমসমাধি অবস্থা।

সখি কাঞ্চনা তখন গানটী শেষ করিয়া তাঁহার প্রিয়-সখির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এখন তাঁহার মর্ম্মীসখীদ্বয় নানাভাবে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা এবিষয়ে পরম দক্ষ। তিনি তাঁহার প্রাণসখির কানের উপর মুখ দিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—

—"হৃদয় উপরে থোয় না ছুঁয়ায় শয্যা।
পাশ পালটিতে নারে দোঁহে এক মজ্জা"॥

এই দুই চরণ দুই তিন বার মৃদু মধুরস্বরে গাহিতে গাহিতেই বিরহিণী গৌর-বল্লভা পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন এবং ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া একবার সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি সকাতর কটাক্ষপাত করিলেন,—সে চাহনির মর্ম্ম—"আর এসময়ে এত লজ্জা দাও কেন সখি?" তিনি তাঁহার মলিন বদনখানি বসনাঞ্চলে ঝাঁপিয়া পুনরায় পাশ ফিরিলেন,—কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। তখন সখি কাঞ্চনা প্রভুর সন্ন্যাসের পর দিন প্রিয়াজির তাৎকালিক মর্ম্মান্তিক শোচনীয় প্রাণঘাতী অবস্থা মনে করিয়া ঠাকুর লোচন দাসের লিখিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মর্ম্মন্তুদ বিরহ-কাহিনী-গুলি সখিসমাজে বর্ণনা করিলেন। সম্ভোগান্তের পর ভীষণ বিরহাগুনের জ্বালা যে কি ভয়ানক, তাহা এই বর্ণনায় অতি সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে;—

—"বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে হিয়া নাহিক সম্বিত।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে উন্মত্ত চিত॥
বসন সম্বরে নাহি না বান্ধয়ে চুলি।
হা কান্দ কান্দনা কাঁদে উন্মতি পাগলী॥"—

তিনি কি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছেন, তাহাও ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীগ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন;—যথা—

—"প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে ধরিয়া।"—

গৌর-বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন;—

"জ্বালহ আগুনি আমি মরিব পুড়িয়া"—

তিনি আর কি করিতেছেন—

—"গুণ বিমাইতে নারে মরয়ে মরমে।
সবে এক বোলে দেবী, এই ছিল করমে॥"

তিনি আরও কি বলিতেছেন তাহাও ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—আর প্রাণ ভরিয়া কাঁদুন—

—"অমিয়া অধিক যত তোর যত গুণ।
এখনে সকলি সেই ভৈগেল আগুন॥"

সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রির যুগল-বিলাস-রস-রঙ্গকথা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে—তাই বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাহা মনে মনে স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে গৌর-বিরহানলে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছেন—যথা—

—"রহস্ত-বিনোদ কথা কহিবারে নারে।
হিয়ার পোড়নি পোড়ে অতি আর্ত্ত স্বরে॥"

এক্ষণে বিরহিণী প্রিয়াজির পূর্ব্ব-স্মৃতি-কথা সকলই স্বপ্নবৎ মনে পড়িতেছে—এখনও তিনি পূর্ব্ববৎ দারুণ দ্বিগুণিত মর্ম্মপীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এই সকল গুহ্যলীলাকথা শ্রবণ করিয়া একদিকে যেমন তীব্র বিপ্রলম্ভ-রসাস্বাদন করিতেছেন—অন্য দিকে তাঁহার চিত্তে একটা প্রবল চিন্তার উদ্রেক হইয়াছে। ঠাকুর লোচনদাস এ সকল গুহ্যাতিগুহ্যকথা জানিলেন কিরূপে? ক্রমশঃ ধীরে ধীরে গৌরবল্লভা আত্মসম্বরণ করিলেন—তিনি উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু তাঁহার বদন অবনত—নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমধারা বহিতেছে—পরিধেয় বসনখানি অশ্রুসিক্ত—ভূমিশয্যা কর্দ্দমাক্ত—মর্ম্মী সখীদ্বয় মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন—এইভাবে কিছুক্ষণ গেল—তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া সখি কাঞ্চনাকে কাণে কাণে কহিলেন—"এখন সখিবৃন্দ ও দাসীগণকে অন্তঃপুরে যাইতে বল।" সখি কাঞ্চনার ইঙ্গিতে তাঁহারা সকলে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন—কেবলমাত্র মর্ম্মী সখি অমিতা সেখানে রহিলেন।

তখন বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরে ধীরে সখী কাঞ্চনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি কাঞ্চনে! ঠাকুর লোচন দাস আমাদের এ সকল পরম নিগূঢ় রাহোলীলা-রহস্য-কথা কি করিয়া জানিলেন? আর কেনই বা তাঁহার গ্রন্থে সাধারণে ইহা প্রকাশ করিলেন? আমার পক্ষে ইহা যে বড় লজ্জার কথা।" সখি কাঞ্চনা উত্তর করিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার প্রাণবল্লভের বিশিষ্ট কৃপাপাত্রী পণ্ডিত শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীকে তোমার মনে পড়ে কি?" প্রিয়াজি উত্তর করিলেন—"হাঁ সখি! তিনি ত আমাদের বাড়ীতেই সর্ব্বদাই থাকিতেন—আমার পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর তিনি নিত্য-সঙ্গিনী ছিলেন—তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন সন্ন্যাসের পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনিই ত আমাকে রত্নালঙ্কারে সাজাইয়া মনমত বেশভূষা করাইয়া আমার প্রাণবল্লভের শয়নকক্ষে পাঠাইয়াছিলেন। আমার সে কথা বেশ স্মরণ আছে। তাহাতে কি হইল?"—সখি কাঞ্চনা তখন বলিলেন,—"প্রাণসখি আগে আমার কথা গুলি একে একে শুনিয়া যাও। তাহার পর প্রশ্ন করিও। তোমার প্রাণবল্লভের লীলা-লেখক—ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস "শ্রীচৈতন্যভাগবত" শ্রীগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বৈষ্ণব-জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন—তাঁহাকে তোমার প্রাণবল্লভের পার্ষদভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাসাবতার বলেন। শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র ঠাকুর বৃন্দাবন দাস, ঠাকুর লোচন দাস লিখিত "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" শ্রীগ্রন্থ পাঠকালে তোমার প্রাণবল্লভের সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রির এই বেদগোপ্য যুগলবিলাস-লীলারঙ্গ বর্ণিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং তাঁহার মনে একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ মহাবৈরাগ্যবান কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্ত তোমার প্রাণবল্লভ সন্ন্যাসের পূর্ব্বরাত্রিতে এরূপ একটা অসম্ভব বিস্ময় ও সন্দেহজনক লীলারঙ্গ প্রকট করি-বেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনিও এই নিগূঢ়-লীলা কথাটি অবগত ছিলেন না। এজন্য তাঁহার গ্রন্থেও ইহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের মনের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার পূজনীয়া জননী শ্রীনারায়ণী দেবীকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—ইহার উত্তরে তাঁহার জননী বলেন ঠাকুর লোচন দাসের উক্তি অসত্য বা মনঃকল্পিত নহে। তিনি সেই কাল রাত্রিতে প্রভুর গৃহে উপস্থিত ছিলেন এবং গোপনে এই লীলারঙ্গের আভাস কিছু কিছু পাইয়াছিলেন। মাতৃমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তখন ঠাকুর বৃন্দাবন দাস মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি অতিশয় মনোযোগের সহিত এই গুহ্যাতিগুহ্য কথাগুলি শুনিলেন—এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার প্রাণবল্লভের রসিকভক্ত ঠাকুর নরহরির

কৃপাবলে তাঁহারই বিশিষ্ট কৃপাপাত্র ঠাকুর লোচনদাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রাণবল্লভের এই সকল নিগূঢ় লীলারঙ্গকথা যখন তিনি জানিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রাণবল্লভের বিশিষ্ট কৃপাদৃষ্টি আছে, তাহা নিশ্চিত—তাঁহার বিশিষ্ট কৃপা ও প্রেরণা ভিন্ন এসকল পরম গুহ্য রহোলীলাকথা গ্রন্থে বর্ণন এবং রসিক-ভক্ত সমাজে প্রচার করিবার সাহস কাহারও হইতে পারে না।

"শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" শ্রীগ্রন্থখানিতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের মাধুর্য্যলীলা বর্ণন আছে—আর "শ্রীচৈতন্যভাগবতে" তাঁহার ঐশ্বর্য্য-ভাবের লীলা বর্ণন আছে। এই দুইখানি শ্রীগ্রন্থই গৌর-বল্লভার অনুমোদিত এবং প্রাচীন নিত্যসিদ্ধ গৌর-পার্ষদ ও গোস্বামীচরণগণের সমাদৃত। নদীয়া-নাগরী ভাবের পদাবলী বহু প্রাচীন মহাজনগণ লিখিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন—এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের এই নদীয়া-নাগরী-ভাবের মধুর ভজন-প্রণালীও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীখণ্ডের ঠাকুর নরহরি ব্রজের মধুমতী—তিনিই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বল্লভের মধুর ভাবের ভজনের মূল গুরু। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের এই নাগরী-ভাবের মধুর ভজনের অধিকারীর সংখ্যা বিরল। ঠাকুর নরহরি তাঁহার বিশিষ্ট কৃপাশক্তিপাত্র ঠাকুর লোচনদাসকে এই বিশুদ্ধ নাগরীভজনের অধিকারী বিচার করিয়া ইহার প্রচারের আদেশ দেন। তাহার ফলে ঠাকুর লোচনদাসের প্রসিদ্ধ "ধামালি" পদরত্ন সমুদয় রচিত হয়। রসরাজ গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রসিকভক্ত মহাজনগণ নদীয়া-নাগরীভাবকে বহুমাননা করিয়া গিয়াছেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনের ভাব মনে রাখিয়াই তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তোমার কথাগুলি আমার সকলি নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে—আমাকে তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ-বল্লভের মধুর ভজন-তত্ত্ব শিক্ষা দিলে কৃতকৃতার্থ হইব—তুমি সর্ব্বভাবে আমার গৌর-ভজনের গুরু—গৌরতত্ত্ববিদা রসশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিতা শ্রীমতি কাঞ্চনমালা দেবী আমার পরম গুরুরূপা সখি। তোমারই কৃপাবলে আমি রসরাজ গৌরভজনে সফলতা লাভ করিব"।

সখি কাঞ্চনা প্রিয়াজির কথা গুলি শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন—উত্তরে কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রীরাধিকার প্রতি—

যথারাগ।

—"রাই, তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে॥
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুন হে কিশোরি চারিদিকে হেরি
যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥
ভজন সাধন জানে যেই জন
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি॥"—

পদকল্পতরু।

রসিকশেখর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মহাভাবস্বরূপিণী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

—"আমার ভজন **তোমার চরণ**
তুমি রসময়ী নিধি।"

পূজ্যপাদ শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিতেছেন—

—"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম, গুরু,—আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥"—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পূজ্যপাদ ঠাকুর নরোত্তম দাস বলিতেছেন,—

—রাধিকা-চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা চরণাশ্রয়, যে করে সে মহাশয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যাঁর ধাম,
কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধা গুণ-গান, না শুনিল মোর কান,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥
তাঁর ভক্ত-সঙ্গ-কথা, রসলীলা প্রেমকথা
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নেই,
না শুনিয়ে তার যেন নাম॥
কৃষ্ণনাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই,
রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা ধন্দ॥
অহঙ্কার অভিমান, অসৎসঙ্গ অসৎ জ্ঞান,
ছাড়ি ভজ গুরুপাদপদ্ম॥"—

অতএব,— প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা।

অভিমান ছাড়ি ভজ গৌরভগবান।
অহঙ্কার ছাড়ি কর গৌরসঙ্কীর্ত্তন॥
মধুরভাবে শ্রীগৌরাঙ্গে করিলে সেবন।
অচিরাতে পাবে রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥
নদীয়া-যুগল সেবা অগ্রে কর ধ্যান।
তবে ত পাইবে ব্রজরসানুসন্ধান॥
নবদ্বীপ-রসে ডুবি ব্রজরস পাবে।
সাধু মোহান্ত-বাক্য হেলা না করিবে॥

—তথাহি—ঠাকুর নরোত্তম দাসের প্রার্থনায়,—

—"গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন জন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"—

নিগূঢ় ব্রজ-রস-মাধুরী ভজন-তত্ত্বের এখানেই শেষ সীমা ও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা। "দেহি পদপল্লবমুদারং" বাক্যের পুনরুক্তি মাত্র এই প্রাচীন পদটিতে করা হইয়াছে। সখি কাঞ্চনা ব্রজরসজ্ঞা। শ্রীগুরুরূপা সখির কৃপায় ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে আর শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরে অদ্বয়তত্ত্ব জ্ঞানবিৎ হইয়া শ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব উত্তমরূপেই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব যে অদ্বয় বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব তাহাও তাঁহার অবিদিত নাই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে তাঁহার "প্রেমের গুরু" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি যে ভাবে তাঁহার এই প্রেমের গুরুর ভজন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ উচ্চ ভাবটি সখিকাঞ্চনা তাঁহার মনে মনে পোষণ করিয়া গৌরপ্রেমানন্দে বিভোর হন। নবদ্বীপ-রস-ভজন-সারতত্ত্বের পরিপাটির পরিপক্কতা, পরিপূর্ণতা ও সীমা দেখাইবার জন্য সখি কাঞ্চনা গৌরবক্ষবিলাসিনী নবদ্বীপময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে এই প্রাচীন পদরত্নগুলি শুনাইলেন।

অন্তর্য্যামিনী গৌরবল্লভা নবদ্বীপ-রস-রসিকা কাঞ্চনার মনভাব বুঝিয়াই এই গানটী শুনিয়া কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন ভয়ে ভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! গানটী তোমার কেমন লাগিল?" বিরহিণী প্রিয়াজির প্রসন্নবদনে তখন মৃদু মধুর হাসির ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। তিনি তাঁহার মর্ম্মীসখির বদনের প্রতি একটী কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া মৃদু মধুরবচনে কহিলেন—"প্রিয় সখি কাঞ্চনে! তোমাদের নন্দগোপকুমার শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগতে গুরু করিবার আর লোক খুঁজিয়া পাইলেন না—এ বড় পরমাশ্চর্য্য নিগূঢ় রহস্য-পূর্ণ কথা। তুমি ত বৃষভানু-নন্দিনীর প্রিয় সখির ললিতা অবতার—সখি ললিতা শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ—তাহা হইলে

তিনিও ত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের গুরু,—অতএব তুমি আমার গুরুর গুরু পরম গুরু।"

এই কথার উত্তরে সখি কাঞ্চনা কি যে বলিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। গৌরবক্ষ-বিলাসিনী মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সর্ব্ব রসিকা-নাগরী-গোষ্ঠীর শিরোমণি,—সর্ব্ববিধ চাতুরী ও চতুষষ্টিকলা বিদ্যাবতীর তিনি চূড়ামণি,—তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্যের সমকক্ষ ত্রিভুবনে কেহ নাই।

সখি কাঞ্চনাকে উত্তর দিবার আর অবসর না দিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া প্রভাতীকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন—তখন প্রভাতীকীর্ত্তনের প্রথম দল আসিয়া শ্রীমন্দিরের বহির্দ্বারে কীর্ত্তন করিতেছে,—

ষথারাগ।

—"জাগহ জন-মন-চোর চতুরবর
সুন্দর নদীয়া-নগর-বিহারী।
রাধা রমণী-শিরোমণি রসবতী
তাকর হৃদয়-রতন-রুচিকারী॥
কি কহিব পুন পুন নিশি ভেল ভোর।
কৈছন অলস, কিছুই নাহি সমুঝিয়ে
হৃদয়ে সন্দেহ রহত বহু মোর॥ ধ্রু

গৌর-বল্লভা তাঁহার প্রাণ-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সখি অমিতাকে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিয়া সখি কাঞ্চনার সহিত নিজ ভজন-মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন—তখন দলে দলে প্রভাতীকীর্ত্তনের গ্রাম্য দল আসিয়া শচীঅঙ্গন পূর্ণ করিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদ-পদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শিলংপাহাড়
১৩ই কার্ত্তিক ১৩৩৯ সাল
অন্নকূট শ্রীগৌরগোবর্দ্ধন পূজা
রাত্রি দ্বিপ্রহর।

(২৯)

—"সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বিলাস-বিভ্রমৈঃ
ররাজ রাজদ্বর হেমগৌরঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-লালিতপাদ-পঙ্কজং
রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্র মৌলিঃ॥

মুরারি গুপ্তের কড়চা।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তাঁহার শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা ঠাকুর বংশীবদন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন; তিনি স্বয়ং প্রত্যহ বিধি-নিয়মে যথারীতি শ্রীবিগ্রহের সেবাপূজা প্রভৃতি করিতেন। নদীয়ার বৃদ্ধ জমিদার বুদ্ধিমন্তখানপ্রমুখ ধনী গৌরভক্তগণ শ্রীবিগ্রহসেবার জন্য নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার শচী-আঙ্গিনায় প্রেরণ করিতেন,—তাঁহারা সকলে মিলিয়া রীতিমত রাজসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহা সমারোহে নিত্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের রাজভোগ হইত এবং শচী-আঙ্গিনায় প্রত্যহ বহু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব অতিথি ও অভ্যাগত মহা সমাদরে উত্তম উত্তম প্রসাদ পাইতেন। ঠাকুর বংশীবদন শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-বল্লভের শ্রীবিগ্রহের প্রথম পূজারী। এখনকার মত বেতনভোগী পূজারী তখন ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ভক্তগণই স্বেচ্ছায় পূজারী হইতেন।

বিধিনিয়মে দৈনন্দিন সেবা পূজা ভোগ আরতি প্রভৃতি বিধিভক্ত্যনুষ্ঠানাদি নিত্য ক্রিয়া-কলাপ ঠাকুর বংশীবদন স্বয়ং করিতেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা গভীর রাত্রিতে মর্ম্মী-সখিসঙ্গে প্রতিদিন নির্জ্জনে শ্রীমন্দিরে আসিয়া তাঁহার প্রাণবল্লভের প্রেমসেবা করিতেন। তাঁহার প্রাণবল্লভের রূপসাম্য চিত্রপটখানি ও কাষ্ঠপাদুকা দু'খানি তিনি সঙ্গে লইয়া আসিতেন এবং অতি প্রত্যূষে তিনি স্বয়ং তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তির বিধি ও প্রেমসেবা কিছুদিন পর্য্যন্ত চলিল।

নদীয়ার ভক্তগণ অন্তঃপুর-আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার পাইয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছেন। তাঁহারা নিত্য আসিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া যান এবং প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্দিরে আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ-দান করিয়া জীবন সার্থক মনে করেন। নদিয়াবাসীগণও নিত্য

শচী-আঙ্গিনায় দুই বেলা আগমন করিয়া শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ও কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। কিন্তু বিরহিণী প্রিয়াজির দর্শনলাভ তাঁহাদের পক্ষে সুদুর্লভ। কারণ তিনি তাঁহার পাষাণের রেখার মত পূর্ব্ব-নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

নদীয়ার অনন্যশরণ কয়েকটী ভাগ্যবান গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠ নিষ্কিঞ্চন গৌরভক্তকে ভক্তবৎসলা গৌরবল্লভা তাঁহার অন্তঃপুরে নিত্য অপরাহ্নে যথাসময়ে ও যথানিয়মে পূর্ব্ববৎ দর্শন দান করেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রাণবল্লভের কণিকা-প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ নদীয়াবাসী ভক্তগণের এবং বিশেষতঃ তাঁহার স্বজাতীয়া ভক্তরমণীগণের,—এমন কি তাঁহার মাতৃস্থানীয়া ও পূজনীয়া বয়োবৃদ্ধা বৈষ্ণবগৃহিণীগণের জন্য তাঁহার শ্রীচরণদর্শন লাভ ও কণিকা-প্রসাদ লাভের সম্ভাবনার পথে বিশেষ অন্তরায় রাখিয়াছেন। ইহা ইচ্ছাময়ী স্বতন্ত্রা গৌরবল্লভার ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছামূলে বিশিষ্ট নিগূঢ় রহস্যমূলক কোন বস্তু আছে, যাহা লোকবুদ্ধির অগোচর।

বিরহিণী গৌরবল্লভার এই ব্যবস্থায় নদীয়ার গৌরভক্ত-রমণী-বৃন্দ, বিশেষতঃ তাঁহার পরম হিতৈষিণী পূজনীয়া মাতৃস্থানীয়া বৃদ্ধা বৈষ্ণবগৃহিণীগণ মর্ম্মান্তিক দুঃখ পান—এ দুঃখ—এ মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা তাঁহাদের রাখিবার স্থান নাই—কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও নাই। তাঁহারা একটী অতি বড় আশার ক্ষীণ প্রদীপ হৃদয়ে জ্বালিয়াছিলেন যে নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্ত্তিযুগল দর্শন সৌভাগ্য পাইবেন—এখন দেখিতেছেন সে আশায় তাঁহারা বঞ্চিতা। এজন্য তাঁহাদের মনস্তাপের আর পরিসীমা নাই।

কয়েকটী প্রধানা মাতৃস্থানীয়া বর্ষীয়সী বৈষ্ণব-গৃহিণী এক দিন একত্রে শ্রীবাসাঙ্গণে বসিয়া গোপনে যুক্তি পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহাদের মনদুঃখ প্রিয়াজির চিহ্নিত দাস এবং বিশিষ্ট কৃপাপাত্র ঈশানকে জানাইবেন। এই উদ্দেশে একদিন প্রাতঃস্নানের সময় শচী-আঙ্গিনার বহির্দ্বারে ঈশানকে দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের দুঃখ-কথা ও মন-ব্যথা জানাইলেন। ঈশান তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে কাঁদিতে কাঁদিতে কম্পবান শরীরে সেখানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অতি কাতর স্বরে নিবেদন করিলেন—"কৃপাময়ী আমার মা জননী সকল! মুঞিপাপিষ্ঠ এই শচী-আঙ্গিনার উচ্ছিষ্টভোজী পালিত কুক্কুর—আমার ঠাকুরাণী পরম স্বতন্ত্রা—তিনি ইচ্ছাময়ী—আপনাদের এই পরম সাধু প্রার্থনা তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেও আমার ক্ষুদ্র প্রাণে ভয় হয়—তবে আপনাদিগের শুভাশীর্ব্বাদে বলীয়ান হইয়া মুঞি নরাধম সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে আপনাদের এই শুভ প্রার্থনাটী জানাইতে চেষ্টা করিব। সকলি ঠাকুরাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—তিনি পরম স্নেহবতী ও দয়াবতী—আপনারা তাঁহার পরমাত্মীয়া,—আমার পরমপূজ্যা—সকলে মিলিয়া মুঞি নরাধম মহাপাপিষ্ঠকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার ঠাকুরাণীকে রাখিয়া এবং এই পাপ মুখে "হা বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ" বলিয়া এই নশ্বরদেহ ত্যাগ করিতে পারি, এই বলিয়া ঈশান নিজহস্তে তাঁহার দুই গালে চপটাঘাত করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন এবং সেখানে পড়িয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তখন উপস্থিত বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া কত না সান্ত্বনাবাক্যে সুস্থির ও শান্ত করিয়া সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই ভাবে দুই এক দিন গেল —ঈশান মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন—বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবনের পন্থা দেখিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ঈশান একদিন প্রাতে অন্তঃপুর-আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চতলে দীঘল হইয়া পড়িয়া বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন—বিরহিণী গৌরবল্লভা সেই সময় তাঁহার রাত্রিভজন শেষ করিয়া সখিসঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছিলেন। বৃদ্ধ ঈশানের করুণ ক্রন্দনরোল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সখি কাঞ্চনাকে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! ঈশানের কি হইয়াছে দেখ, তাহার দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা যদি আমার থাকে, তাহা আমি অবশ্যই করিব,—তাঁহার নিকট যাইবার এখন আর আমার সামর্থ্য নাই—তুমি সখি! ঈশানকে আমার সম্মুখে লইয়া এস—আমি এখানে একটু বসি।" এই বলিয়া জীর্ণা-শীর্ণা মলিনবসনা গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সেখানেই বসিয়া পড়িলেন। তিনি এক্ষণে কঙ্কালসার হইয়াছেন,—সখি অমিতা তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

সখি কাঞ্চনা অতি সমাদর করিয়া ঈশানকে লইয়া গৌরবল্লভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। দয়াময়ী বৈষ্ণব-জননী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া আকুল হইলেন—ঈশানও তাঁহার চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া প্রিয়াজির শ্রীচরণতলে পুনরায় দীঘল হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহাকে পুনরায় পরম সমাদরে হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইলেন। অতিবৃদ্ধ ঈশানের সর্ব্ব অঙ্গ গৌরপ্রেমাবেশে থরথর কম্পবান—অতি জীর্ণ দেহযষ্টিখানি অস্থি চর্ম্মসার—মাজা আর সোজা করিতে পারেন না,—কোন গতিকে একগাছি বংশযষ্ঠিতে ভর দিয়া করযোড়ে তিনি প্রিয়াজির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তখন পরম দয়াবতী ভক্তবৎসা গৌরবল্লভা অতিশয় স্নেহভরে সস্নেহবচনে ঈশানকে কহিলেন, "ঈশান! তুমি এত কাঁদিতেছ কেন বাপ্? তোমার দৈন্যপূর্ণ-কাতর ক্রন্দনস্বর শুনিলে যে আমার বুক ফাটিয়া যায়,—তোমার কি দুঃখ আমাকে খুলিয়া বল বাপ্! আমি আমার প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিব"। এতক্ষণে সাহস পাইয়া অতি বৃদ্ধ ঈশান কাঁদিতে কাঁদিতে, করযোড়ে নিবেদন করিলেন—দয়াময়ী মাগো! তুমিই আমার ইষ্টদেবী, তোমার ঐ রাঙ্গা পা দু'খানির ধুলিকণাই এখন আমার একমাত্র সম্বল! ভজন সাধন মুক্তি কিছুই জানি না—প্রভু আমাকে তোমার ঐ রাঙ্গা চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমার একটী প্রার্থনা আপনার শ্রীচরণ-কমলে আজ আমি করযোড়ে নিবেদন করিতে আসিয়াছি—আপনি অভয় দান করেন ত নিবেদন করিতে পারি"—এই বলিয়া ঈশান নীরবে পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তখন বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহাকে অভয় দান করিয়া পরম স্নেহভরে কহিলেন—"ঈশান! তুমি আমার বড় আদরের বস্তু,—তুমি আমার প্রাণবল্লভকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছ—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই—তোমার প্রার্থনাটী কি একবার আমাকে খুলিয়া বল ত বাপ্।" তখন ঈশান সাহসে ভর করিয়া প্রেমপুলকাঞ্চিত কম্পবান কলেবরে করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—"দয়াময়ী মাগো! নদীয়ার বৈষ্ণবগৃহিণীগণ আপনার শ্রীচরণ দর্শনের ভিখারিণী এবং আপনার প্রদত্ত প্রভুর কণিকা-প্রসাদের ভিক্ষার্থিনী। নদীয়ার নিষ্কিঞ্চন ও অনন্যশরণ গৌর-ভক্তগণ যেমন অপরাহ্নে নিত্য আপনার শ্রীচরণ দর্শন ও কণিকা প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন—তদ্রূপ নদীয়া-বাসিনী গৌর-গত-প্রাণা বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের প্রতি আপনি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন-দানে ও প্রভুর কণিকা-প্রসাদদানে কৃতার্থ করুন—ইহাই আমার ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা।"

বিরহিণী গৌরবল্লভা ঈশানের এই কথাগুলি শুনিয়া প্রথমতঃ নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন—তৎপরে অতি মৃদু-মধুরবচনে কহিলেন—"ঈশান! তুমি জান নদীয়ার বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ অনেকেই আমার পরম পূজ্যা। কেহ কেহ মাতৃতুল্যা পূজনীয়া; আমার চরণ দর্শন তাঁহারা করিবেন—আমার পক্ষে এ বড় বিষম অপরাধের কথা,—মৃত্যুতুল্য,—এ কথা মনে হইলেও আমার সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। তবে তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া আমার মত অভাগিনীকে তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন-দানে কৃতার্থ করেন, তাহা হইলে আমিই তাঁহাদের চরণধূলি লইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিব। আমার প্রাণবল্লভের কণিকা-প্রসাদ গ্রহণের তাঁহাদের মনবাসনা পূর্ণ করিতে কোনই বাধা নাই। তবে ইহার মধ্যে একটী নিগূঢ় ভজন-রহস্য-কথা আছে। তুমি যে সকল পরম ভাগ্যবতী বৈষ্ণব-গৃহিণীর কথা বলিতেছ—তাঁহারা অনেকেই আমার প্রাণবল্লভের মাতৃস্থানীয়া, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাৎসল্যরসের এক একটি মূর্ত্ত-বিগ্রহ তাঁহারা—তাঁহাদের পুত্রস্থানীয় নদীয়ার চাঁদের প্রসাদ ভোজন বাৎসল্যভাবে গৌরভজনের প্রতিকূল হইবে। ইহার সামঞ্জস্য করিয়া যদি তাঁহারা আমার প্রাণবল্লভের প্রসাদের ভিখারিণী হন, উত্তম,—তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে। আমার মত মন্দভাগিনীকে তাঁহারা যদি দর্শন ও চরণের ধুলিদানে কৃতকৃতার্থ করেন—সেত আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি তাঁহাদিগকে আমার এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও—এবং তাঁহাদের অভিমত আমাকে জানাইলে, আমি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা, এবং ঈশান ভজনচতুরা এবং সর্ব্বসাধন-তত্ত্ববিজ্ঞা গৌরবল্লভার অতি সারগর্ভ ভজনোপদেশপূর্ণ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া প্রিয়াজির বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—কেহ

আর কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন না। অতিবৃদ্ধ ঈশান তখন কম্পান্বিত কলেবরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রেম-গদগদবচনে হেঁট মুখে প্রিয়াজির পাদপদ্মে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—"দয়াময়ী মাগো! মুঞি জীবাধম মূর্খ, নীচ এবং ভজন-সাধন-হীন। তুমি ঠাকুরাণী বৈষ্ণব-জননী এবং জগত-জননী—সর্ব্ব-তত্ত্বসার তোমার রাঙ্গা চরণ দু'খানি। তোমার কথার মর্ম্ম—মুঞি পাপিষ্ঠ কি বুঝিব? আর পরম পূজ্যা মাতৃস্থানীয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশ বৈষ্ণবশক্তি বৈষ্ণব-গৃহিণীগণকেই মুঞি বা কি বুঝাইব? কৃপাময়ি মাগো! তুমি আমার ঠাকুরের ঠাকুরাণী—তোমরা দুইজন কে কাহার গুরু তাহা মুঞি নরাধম কি বুঝিব? অতএব আমার সকাতর প্রার্থনা, আমার পরম পূজনীয়া কাঞ্চনা দিদিকে এসকল কথা বৈষ্ণব-গৃহিণীগণকে বুঝাইয়া দিবার ভার দিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। মুঞি তাঁহাদের সংবাদ দিব—তাঁহারা অন্তঃপুরাঙ্গণে আসিলে কাঞ্চনা দিদি তাঁহাদিগকে আপনার আদেশবাণী সকল বুঝাইয়া দিবেন। মুঞি জীবাধমের এই প্রার্থনাটি মঞ্জুর করিতে আজ্ঞা হউক।"—এই বলিয়া পুনরায় দীঘল হইয়া ঈশান প্রিয়াজির শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তখন বিরহিণী গৌরবল্লভা অগত্যা ঈশানের প্রার্থনাটি মঞ্জুর করিতে বাধ্য হইলেন এবং সখি কাঞ্চনাকে বলিলেন—"সখি কাঞ্চনে! যদি কৃপা করিয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে শুভাগমন করেন—তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া বলিও আমার মত মন্দভাগিনীকে তাঁহারা তাঁহাদের পদধূলি দিতে যেন বিস্মৃত না হন,—ইহাই আমার তোমার চরণে কাতর প্রার্থনা।

সখি কাঞ্চনা লজ্জায় ও ক্ষোভে জিহ্বা কর্ত্তন করিলেন—প্রিয়াজির কথায় বৈষ্ণবীয় দৈন্যবোধক "চরণে" শব্দটীর প্রয়োগে তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইলেন—কিন্তু কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। গৌরবল্লভা অন্তর্য্যামিনী—তিনি তাঁহার প্রিয়সখির বদনের ভাব দেখিয়াই তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া লইলেন। তিনি তখন সপ্রেমনয়নে তাঁহার প্রিয়সখির শুষ্ক ও বিরস বদনের প্রতি চাহিয়া পুনরায় কহিলেন—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে! তুমি যে আমার গৌর-প্রেমের গুরু—তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?"

ঈশান প্রিয়াজির আদেশে অঙ্গিনা হইতে উঠিয়া দেহে নিজ হাতে নিজ কর্ণদ্বয় মর্দ্দন করিতে করিতে প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনের ভাব,—এমন কর্ম্ম আর কখন করিব না—ঠাকুরাণীর ভাব ও তত্ত্ব দুরধিগম্য—তাঁহার চরিত্রও ততোধিক দুর্ব্বোধ্য। আমি অতিবড় দুঃসাহস করিয়াছিলাম—তাহার ফল হাতে হাতে পাইলাম। এখন বৈষ্ণব-গৃহিণীগণকে কাঞ্চনাদিদির হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া দেখিব তিনি কি ভাবে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হন এবং এই কঠিন সমস্যার সমাধান করেন। এই কথাগুলি মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে ঈশান বহিরাঙ্গণে আসিলেন—তাঁহার মন অপ্রসন্ন,—শরীর অবসন্ন,—প্রাণে যেন সুখ নাই—হৃদয় যেন শুষ্ক ও নীরস।

বহিরাঙ্গণের দ্বারদেশে—গঙ্গার পথে বর্ষীয়সী বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ প্রতিদিন প্রাতে ঈশানের আশা-পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। সে দিন গঙ্গাস্নানের সময় তাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া গৌর-কথার ইষ্ঠ-গোষ্ঠী করিতেছেন। গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহারা বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আসিবেন—ইহাই তাঁহাদের দৈনন্দিন নিত্য কর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে আছেন শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী দেবী, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-গৃহিণী সর্ব্বজয়া দেবী, প্রভুর ধাত্রীমাতা নারায়ণী দেবী, গুরুপত্নী সুলোচনা দেবী, বংশীবদন ঠাকুরের জননী চন্দ্রকলা দেবী, গদাধর পণ্ডিতের জননী রত্নাবতী দেবী, গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহিণী শ্রীদেবী প্রভৃতি মহাপ্রভুর মাতৃস্থানীয়া অনেকেই আছেন। এই সকল বর্ষীয়সী বৈষ্ণব-গৃহিণীগণই ঈশানকে দিয়া গৌরবল্লভাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

অতিবৃদ্ধ ঈশান আসিয়া পথি মধ্যে দীঘল হইয়া পড়িয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগের চরণে নিবেদন করিলেন—"কৃপাময়ী মা সকল! আমার পূজনীয়া ঠাকুরাণীর শ্রীচরণকমলে আপনাদের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া আসিয়াছি,—আমার কাঞ্চনা দিদি আপনাদিগকে তাঁহার আদেশবাণী বুঝাইয়া দিবেন—আপনারা গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যখন শচী-অঙ্গিনায় শুভাগমন করিবেন,—তখন আমি কাঞ্চনাদিদিকে সংবাদ দিলেই তিনি

আসিবেন এবং সমস্ত কথা তিনিই আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন—মুঞি মূর্খ,—ঠাকুরাণীর সকল কথার মর্ম্ম মুঞি বুঝিতে পারি নাই,—এবং তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই,—আপনারা এই জীবাধম নরপশুটাকে ক্ষমা করিবেন”—এই বলিয়া ঈশান কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের মনে নানা ভাবের উদয় হইল—তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত না করিয়া আনমনা হইয়া সকলে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন।

ঈশানকে পরম স্নেহভরে মিষ্টকথায় তুষ্ট করিয়া তাঁহারা বলিলেন—“ঈশান! আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া শীঘ্রই আসিতেছি। তোমার কাঞ্চনাদিদিকে আমরা শ্রীমন্দিরে গৌরদর্শনে আসিলে সংবাদ দিও।”—ঈশান পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে নিজ ভজনকুটীরে গমন করিলেন।

বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ গঙ্গাস্নানে যাইতে যাইতে পরস্পরে নানা বিষয়িণী গৌরকথার প্রসঙ্গ তুলিলেন—তন্মধ্যে অগ্রকার প্রসঙ্গই মুখ্য। বিরহিণী প্রিয়াজির দর্শনলাভ যে সুদুর্লভ, তাহা তাঁহারাও জানেন—তবে সখি কাঞ্চনার দর্শন পাইবার আশা যে পাইয়াছেন—তাহাতেই তাঁহাদের প্রাণে আনন্দ হইয়াছে—মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। যথাকালে বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ গঙ্গাস্নান সমাধান করিয়া গৌর-গৃহে আসিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে ঈশান আসিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া পরম সমাদরে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের একটী নির্জ্জন কক্ষে বসাইলেন। তখনই সেখানে সখিকাঞ্চনা আসিয়া তাঁহাদিগকে জনে জনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিলেন —“মাগো! আজ বহুদিন পরে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলাম। বড় অভাগিনী আমরা—আপনাদের বড় আদরের ও স্নেহের স্বর্ণপুত্তলিকাটীকে লইয়া আমরা যে কি বিপদে পড়িয়াছি, তাহা অন্তর্য্যামী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভই জানেন”—এই কথা বলিতে বলিতে সখি কাঞ্চনার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি সেখানে ছিন্নমূল তরুর স্থায় বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের পদতলে দণ্ডবৎ পড়িয়া বালিকার স্থায় ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেই লাগিলেন। বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ তাঁহার নিকট মণ্ডলী করিয়া বসিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া তখন মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহারা সখি কাঞ্চনাকে দেখিয়া প্রথমে চিনিতেই পারেন নাই। এখন আর সে কাঞ্চন-মালা তিনি নহেন। জীর্ণা শীর্ণা রুক্ষকেশা মলিনবসনা সাক্ষাৎ যেন বৈরাগ্যমূর্ত্তি,—গৌরপ্রেমোন্মাদিনী উদাসিনী তপস্বিনীর বেশ,—কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে —সখি কাঞ্চনার পরম পবিত্র অঙ্গ-গন্ধে সে স্থানটি যেন মহ মহ করিতেছে—কৃষ্ণপাগলিনী কাঞ্চনমালা এখন গৌরপ্রেম-পাগলিনী।

শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী সখি কাঞ্চনাকে পরম স্নেহভরে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছেন—নিজ বসনাঞ্চলে প্রেমাশ্রুপরিপূর্ণ বদনমণ্ডল মুছাইয়া দিতেছেন—অন্যান্য বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ সকলে মিলিয়া কাঞ্চনার অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত আছেন।

কিছুক্ষণ পরে সখি কাঞ্চনা আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—লজ্জায় যেন তিনি মরমে মরিয়া গেলেন। বিনতবদনে অতি মৃদুস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—“মাগো! কি আর বলিব আমি—আমার প্রিয়-সখি আপনাদিগের বড় আদরের নিমাইর বৌ—এখন আর সে বৌমা নাই—তাঁহাকে লইয়া আমরা যে কি বিষম বিপদে পড়িয়াছি—তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ভাষা নাই। সে কহিবার কথা নহে—শুনিবারও কথা নহে—সুতরাং সে কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই। মাগো! আপনাদের প্রার্থনাটি ঈশানদাদা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—তিনি কি উত্তর দিয়াছেন, যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন মাগো! আমি আপনাদিগকে দু'টি কথায় বলিতে পারি। আপনারা পরম স্নেহবতী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মাতৃস্থানীয়া। আপনাদের সেবা ও মর্য্যাদা রক্ষা করা আমাদের পরম কর্ত্তব্য। আমার প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়া আপনাদের বড় স্নেহের বৌমা—তিনি আপনাদের দুইটী প্রার্থনার দুইটী উত্তর দিয়াছেন। প্রথমতঃ সাধারণ ভক্তগণের ন্যায় তাঁহার চরণ-দর্শন-প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত আপনাদের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছেন —আপনারা তাঁহার পূজনীয়া এবং মাতৃস্থানীয়া—আপনাদের শ্রীচরণধুলি পাইলে তিনি কৃতকৃতার্থ মনে করেন। আপনাদের নীতিবিরুদ্ধকথা শুনিয়া তিনি কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কাঁদিতেই কাঁদিতে বলিয়াছেন—তাঁহারা যদি

কৃপা করিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণধূলি তাঁহার মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে শচী-আঙ্গিনায় শুভাগমন করেন—তবে যেন আশীর্ব্বাদ করেন, তাঁহাদের স্নেহের ও আদরের বিষ্ণুপ্রিয়া "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা নাথ বিশ্বম্ভর।" বলিয়া সেই মুহূর্ত্তেই এই নশ্বর দেহ যেন ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় কথা—তাঁহার প্রাণ-বল্লভের কণিকা-প্রসাদ দানও তাঁহার পক্ষে এবং আপনাদের পক্ষেও নীতি-বিরুদ্ধ কথা—আপনারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের মাতৃস্থানীয়া বাৎসল্য-রসের শ্রেষ্ঠা অধিকারিণী—আপনাদের স্নেহাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী প্রিয়তম পুত্রস্থানীয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের প্রসাদ গ্রহণের প্রার্থনা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ও নীতিবিরুদ্ধ অলৌকিক কার্য্য। যদি আপনারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভকে শ্রীগৌর-ভগবান্ মনে করেন তাহা হইলে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির প্রসাদ, ঠাকুর বংশীবদনের নিকট হইতে অনায়াসে পাইতে পারেন। আমার প্রিয়সখির রাগমার্গের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য-ভজন-পদ্ধতি আপনাদের অবিদিত নাই—তাহাতে ঐশ্বর্য্যগন্ধের লেশাভাসও নাই—ইহাতে দুঃখিত হইবার কোন কারণ নাই। এক্ষণে আপনারা মাগো! আপনা আপনিই নিজ নিজ মনে বিচার করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন—তাহা আপনাদের বৌমা পালন করিতে প্রস্তুত আছেন"—

শ্রীবাসগৃহিণীপ্রমুখ বৈষ্ণবগৃহিণীগণ সখি কাঞ্চনার ভজনবিজ্ঞতাপূর্ণ শাস্ত্রযুক্তিসম্মত বাৎসল্য ভাবে গৌর-উপাসনা-তত্ত্বপূর্ণ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া অন্তরে মহা সন্তুষ্ট হইয়া প্রকৃত রাগাত্মিকাভক্তির সাধন-ভজন-প্রণালী শিক্ষা করিলেন। দলপত্নী মালিনী দেবী অন্যান্য বৈষ্ণব-গৃহিণী সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উত্তর দিলেন—"সখিরূপা গৌরভজনের গুরু কাঞ্চনে! তোমার প্রিয়সখির উপদেশপূর্ণ বাৎসল্য-ভাবে গৌর-ভজন-তত্ত্ব-কথা শ্রবণে আমাদের চক্ষু ফুটিল—দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তোমরাই গৌরভজনের প্রকৃত গুরু,—নদীয়ানাগরীগণই সখিরূপা পরম গুরু—তাঁহারাই প্রকৃত গুরুতত্ত্ব। তোমার প্রিয়সখি গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিশুদ্ধ রাগ-মার্গের বিচারপ্রণালী আমরা সসম্ভ্রমে মানিয়া লইলাম। আমাদের দু'টি প্রার্থনাই বাৎসল্য-ভাবের গৌরভজনের যে সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তাহা এখন আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আমরা আর কিছু বলিতে চাহি না। তোমার প্রিয়সখির দর্শন লাভ আমাদের পক্ষে সুদুর্লভ—তোমাদের সৌভাগ্য শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত। তোমাদের মধুরভাবে গৌরভজন-পদ্ধতি শ্রেষ্ঠাধিকারীর পক্ষে প্রযুজ্য—আমরা কনিষ্ঠাধিকারী। তোমার প্রিয়সখিকে বলিও তিনি যেন আমাদের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি রাখেন।"—

এই বলিয়া শ্রীবাসগৃহিণী শ্রীমালিনীদেবী প্রমুখ বর্ষীয়সী বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আত্মগ্লানিতে কাতর হইয়া সখি কাঞ্চনা অতিশয় লজ্জিতভাবে তাঁহাদিগকে জনে জনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া বিদায় দিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বিরহিণী প্রিয়াজি তখন সখি অমিতার সহিত ভজন-মন্দিরে আসিয়াছেন—সখি কাঞ্চনা আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন। গৌর-বল্লভা জানিতেন না শ্রীবাস-গৃহিণী প্রমুখ তাঁহার মাতৃস্থানীয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ তাঁহার অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে আসিয়াছিলেন। সখি কাঞ্চনা গৌরকথা-প্রসঙ্গে সে কথা তাঁহার প্রিয়সখিকে জানাইলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভা কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! আমার মাতৃস্থানীয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে আমার প্রাণবল্লভের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে প্রত্যহ আসেন, তাহা আমি জানি—অদ্য ঈশানের মুখে তাঁহাদের প্রার্থনা দ্বয়ের উত্তর তোমার মুখে তাঁহারা অবশ্যই পাইয়াছেন। তাঁহারা শুনিয়া কি বলিলেন?"—তখন সখি কাঞ্চনা, তাঁহাদের শেষ কথাগুলি সকলি একে একে যথাযথ প্রিয়াজিকে কহিলেন। তিনি শুনিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন—তাঁহাদের শ্রীচরণধুলিতে তিনি বঞ্চিতা—এ দুঃখ তাঁহার জীবনে যাইবে না—তাঁহাদের সাক্ষাৎ দর্শন ও আশীর্ব্বাদেও তিনি বঞ্চিতা—ইহাও তাঁহার মত মন্দভাগিনীর দুর্ভাগ্যের চরম সীমা। এই বলিয়া তিনি নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন—চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। অদ্ভুতচেষ্টিতা লীলাময়ী প্রিয়াজির লীলারঙ্গ-রহস্য বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই।—লীলাময় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের লীলারঙ্গরহস্যও দুর্ব্বোধ্য হইলেও তাঁহার পার্ষদভক্তগণের অনুভববেদ্য। কিন্তু প্রিয়াজির অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ-রহস্যের অনুভূতি একমাত্র তাঁহারই কৃপাকটাক্ষ সাপেক্ষ।

মাতৃস্থানীয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের মনদুঃখ দূর করিবার

শক্তি গৌর-বল্লভার নাই—এরূপ কথা নহে—কিন্তু তিনি তাঁহাদের একটী দুঃখ দূর করিতে গিয়া আর একটী গুরুতর দুঃখের সৃষ্টি করিবেন,—ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। বিশেষতঃ প্রিয়াজির শ্রীচরণ-দর্শন-বাসনার প্রার্থনা তাঁহার মাতৃস্থানীয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের পক্ষে অযৌক্তিক এবং নীতিবিরুদ্ধ তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। পরম মাধুর্য্যপূর্ণ নরলীলার অভিনয়কর্ত্রী এবং সহায়িণী গৌর-বল্লভার পক্ষে ঐশ্বর্য্য-ভাবান্বিত এরূপ প্রার্থনার প্রশ্রয় দেওয়া মাধুর্য্য-ভজন-গৌরব-হানিকর এবং তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের বিরুদ্ধভাবদ্যোতক। পক্ষান্তরে বাৎসল্যরসময়ী মাতৃবর্গের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি তাঁহাদের রাগানুগা-ভজন-বিজ্ঞতার বিপরীত ভাবব্যঞ্জক বোধে প্রিয়াজির পক্ষে অনাদরণীয়া। স্বয়ংভগবতীর স্ব-স্বরূপতত্ত্বের উপযুক্ত ব্যবহার-চতুরতা ও ভজনবিজ্ঞতার প্রকৃত আদর্শ দেখাইলেন সনাতন-নন্দিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী তাঁহার এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গপ্রসঙ্গে এবং তাঁহার মাতৃস্থানীয়া বৈষ্ণবগৃহিণীগণ বাৎসল্যভাবের উপযুক্ত ভজনোপদেশ পাইলেন তাঁহাদের পুত্রবধু-স্থানীয়া স্বয়ং ভগবতী গৌরবল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিকট—ইহাও তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য।

লীলাময়ী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই সকল লীলারঙ্গ-রহস্য-কথা তাঁহার বিশিষ্ট অন্তরঙ্গা সখিগণ মধ্যেই আলোচিত হইল—অন্যে কেহ ইহা জানিতে পারিলেন না। অন্তঃপুর প্রকোষ্ঠে বসিয়াই এই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ লীলারঙ্গের অভিনয় হইল। বিরহিণী প্রিয়াজি তখন দূরবর্ত্তী একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন।

যথানিয়মে পূর্ব্বাহ্নে বিরহিণী প্রিয়াজি মর্ম্মী সখিদ্বয় সঙ্গে নিজ ভজন-মন্দিরে আসিলেন—তাঁহার দৈনন্দিন ভজনক্রিয়া সমাপন করিয়া, মর্ম্মী সখিসঙ্গে গৌরকথার ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ করিলেন। গৌরবল্লভা সেদিন পরম গম্ভীরভাবে কথা কহিতেছেন—তাঁহার শ্রীবদনের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় কিছু শঙ্কিতা হইলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা সখি কাঞ্চনাকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে অথচ দুঃখিতান্তঃকরণে মর্ম্মভেদী করুণ স্বরে কহিলেন—

—"বাহিরে নাগর রাজ, ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী বধে সাবধান।"

এই কথা কয়টী তাঁহার রাধাভাবাঢ্য প্রাণবল্লভের শ্রীমুখোক্ত,—ব্রজ-নাগর-রাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি।

এই কথা কয়টি বলিয়াই বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার তাৎকালিক গাম্ভীর্য্যভাব যেন দূরে সরিয়া গেল—অধিরূঢ় দিব্যোন্মাদের লক্ষণ সকল একে একে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার কথাগুলি প্রলাপের মত বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরবে তিনি কি ভাবিলেন—পরে উৎঘূর্ণায়মান নয়নদ্বয়ে পাগলিনীর ন্যায় ইতিউতি চাহিয়া পুনরায় কহিলেন—

—"সুখ লাগি কৈল প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায়, না রহে পরাণ।
সখি হে! না বুঝিয়ে বিধির বিধান॥"

এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে বিরহিণী গৌরবল্লভার পরিধান বসন অসম্বর হইয়া পড়িল—রুক্ষ কেশদাম শুষ্ক বদনোপরি পতিত হইয়া তাঁহার মলিন বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিল তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় মস্তক ঢুলাইতে লাগিলেন,—আর অধোবদনে কাষ্ঠ-পাষাণ-ভেদী মর্ম্ম-বেদনার করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

—"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গোরা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব॥"—

মর্ম্মী সখিদ্বয় বিরহিণী প্রিয়াজির দুই পার্শ্বে তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া বসিয়া মনদুঃখে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তাঁহাদের প্রিয় সখিকে আর বুঝাইবার কিছু নাই—এখন শান্তনার শান্তিময় ভাষা নীরব ক্রন্দনে পরিণত হইয়াছে—অন্তর্য্যামিনী গৌরবল্লভা সকলি জানেন এবং বুঝেন—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মর্ম্মী সখিদিগের দুঃখে তিনি মর্ম্মাহতা—দিব্যোন্মাদাবস্থায়ও তাঁহার মনে তাঁহার অন্তরঙ্গা নিত্য-সখিদিগের দুঃখকথার স্মৃতি উদয় হয়। তিনি অতঃপর কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিলেন—বিরহিণী প্রিয়াজি এখন স্থির হইয়া বসিলেন—গৌর-প্রেমা-বেগে তিনি কিছুক্ষণ পরেই সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে পুনরায় ঢলিয়া পড়িলেন—এই অবস্থাতেই তিনি করযোড়ে তাঁহার প্রাণবল্লভের উদ্দেশে আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন,—

যথারাগ।

প্রাণবল্লভ হে !

—"তোমার চরণ-তরি করি ভরসা।

হয়েছে আমার দেখ কি ঘোর দশা॥

ভজনে নাহিক মন, চিত সদা উচাটন,

গর গর সদা রাগে পরুষ ভাষা।

বুদ্ধি হয়েছে মোর করম-নাশা॥

প্রাণকান্ত হে !

—"তোমার বিরহ-দুখ হৃদয় ভরা।

বিপদ হয়েছে মোর ভজন করা॥

নাম না লইতে পারি, স্মরণেতে ঝরে বারি,

আঁখিয়ার দু'নয়ন,—নাসিকা ঝরা।

কি করি ভজিব তোমা—হে চিত-চোরা॥

নদীয়ার চাঁদ হে !

—"নিশায় নাহিক নিঁদ কি করি আমি।

বুঝিনা ত কি যে করি দিবস যামি॥

বিধির ভজন পথে, মন নাহি চাহে যেতে,

দুখভারে ডাকি তোমা হে গুণমণি।

ভজন কি বলে ইহা,—বল ত শুনি॥

জীবনধন হে !

—"ঘুরি ফিরি ঢুঁড়ি তোমা শচী-অঙ্গনে।

(তব) নাম করি গুণ গাই আপন মনে॥

সখি কোলে পড়ি ঢলি, কাহাকে না কিছু বলি,

মনের দুখের কথা—রাখি গোপনে।

সখিগণ দুঃখ পায়—ভাবি না মনে॥

প্রাণসর্ব্বস্ব হে !

—"হারাণ-ধন মোর প্রাণের গোরা।

কোথা গেলে পাব দেখা সে মন-চোরা॥

কেবা মোরে ল'য়ে যাবে, তোমার চরণতলে,

তাই ভাবি নিশিদিন পাগল পারা।

কহে দাসী হরিদাসী, দুখের সাগরে ভাসি,

মনের মাঝারে দেখ প্রাণের গোরা॥"—

গৌর-গীতিকা।

মর্ম্মী সখিদ্বয় বিরহিণী প্রিয়াজির অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত আছেন,—তাঁহার আত্মনিবেদনের কথাগুলি বড়ই মর্ম্ম-স্পর্শী—বড়ই হৃদিবিদারক। এক্ষণে গৌরবল্লভা আত্ম-সম্বরণ করিয়াছেন,—তাঁহার দিব্যোন্মাদদশার শঙ্কাপূর্ণ ভাব সঙ্কোচ করিয়াছেন,—তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মর্ম্মান্তিক মনদুঃখ বুঝিয়াই তিনি এরূপভাবে শঙ্কাজনক পূর্ব্বভাব সঙ্কোচ করিয়াছেন। এক্ষণে গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়ের কণ্ঠদেশে পরম প্রেমভরে তাঁহার দুই হস্ত সমর্পণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে গৌরানুরাগরঞ্জিত কমল নয়নদ্বয় নিজ বসনাঞ্চলে মুছিতে মুছিতে প্রেমগদগদ বচনে কহিতেছেন,—

যথারাগ।

—"গৌর গরবে হাম, জনম গোঙায়নু,

অব কাহে নিরদয় ভেল।

পরিজন বচনহি, গরলে গরাসল,

গেহ দহন সম ভেল॥

সোঙরিতে সো মুখ, হৃদয় বিদারত,

পাঁজরে বজরক শেল॥

উঠি বসি করি কত, ক্ষিতি মহা লুঠত,

পরম আনল সম অঙ্গ।

সখি কি করব, কা দেই সম্বাদ পাঠাওব,

মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ॥"—

পদকল্পতরু।

এই কথা বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার মর্ম্মী সখি-দ্বয়ের প্রেমালিঙ্গন মুক্ত হইয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল—ভজন-মন্দিরের প্রাচীরের ভিতে ঠেস দিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই পার্শ্বে গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রিয়াজির নয়নে যেন প্রেমনদী বহিতেছে—গৌরপ্রেম-নির্ঝরিণীর মুক্ত প্রবাহ-সলিলে ভজনমন্দির যেন পরিপ্লাবিত হইয়া অঙ্গনে পড়িতেছে। তাঁহার ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিতেছে—পদাঙ্গুলি দ্বারা তিনি যেন ভূমিতলে কি লিখিতেছেন—গৌর-প্রেমোন্মাদিনী প্রিয়াজির পুনরায় ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। মর্ম্মী সখি তাঁহার মনভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"জনমহি গৌরক গরবে গোঁয়ায়নু

সে কিয়ে এত দুখ সহই।

উরু বিনু সেজ, পরশ নাহি জানত
সো তনু অব মহী লুঠই ॥
বদন মণ্ডল, চাঁদ ঝলমল
সো অতি অপরূপ শোহে ।
রাহু ভয়ে শশী, ভূমে পড়ল খসি,
ঐছন উপজল মোহে ॥
পদ-অঙ্গুলি দেই, ক্ষিতিপর লেখই,
যৈছন বাউরি পারা ।
ঘন ঘন নয়নে, নিঝরে বারি ঝরু,
যৈছন শাঙন-ধারা ॥
খেনে মুখ গোই, পানি অবলম্বই
ঘনে ঘনে বহয়ে নিশ্বাস ।
সোই গৌরহরি, পুনহি মিলায়ব,
নিয়ড়হি মাধবদাস ॥"

পদকল্পতরু ।

পুনরায় বিরহিণী গৌরবল্লভা হঠাৎ ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন—যেন তিনি কি এক বিষম ঘোর অচিন্ত্য চিন্তায় মগ্না,—মুখে কোন কথা নাই—নয়নে অনবরত শ্রাবণের ধারা বহিতেছে,—মর্ম্মী সখিদ্বয় দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া আছেন এবং তাঁহারাও অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। ভজন-মন্দিরে গৌরপ্রেমের পাথার বহিতেছে।

এইভাবে অনেকক্ষণ গেল—কাহারও মুখে কোন কথা নাই—নয়নে নয়নে মিলনও নাই—সকলেই অধোবদন—নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরে অন্তঃসলিলা প্রেম-মন্দাকিনী বহিতেছে। গৌরবিরহিণীত্রয়ের মন-ভাবরূপ তরঙ্গোচ্ছাস তাঁহাদের মানস-সরোবরেই উত্থিত ও লীন হইতেছে—মধ্যে মধ্যে সেই উচ্ছাসের আলোড়নক্রিয়া বহিরিন্দ্রিয় নাসিকাদ্বারে দীর্ঘ নিঃশ্বাসরূপে প্রকাশিত হইতেছে এবং নয়নে প্রেমধারা রূপে বিকাশ হইতেছে।

এক্ষণে দিবা এক প্রহর অতীত হইয়াছে—বিরহিণী গৌর-বল্লভার তখন দৈনন্দিন ভজন সাধন কিছুই হয় নাই। অনেকক্ষণ পরে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অতি কষ্টে নিজ মলিন বসনাঞ্চলে পরম স্নেহভরে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের নয়নের অশ্রু-সলিল স্বহস্তে মুছাইয়া দিলেন। তাঁহারা প্রেমগদগদভাবে তাঁহাদের প্রিয়সখির হস্ত দু'খানি পরম প্রেমভরে বক্ষে ধারণ করিয়া তখন ধীরে ধীরে কহিলেন,—"সখি! প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! বল দেখি তোমার মনে আজ কি ভাবের উদয় হইয়াছে—আমরা তোমার একান্ত নিজজন—আমাদের নিকট তুমি অকপটে তোমার মনভাব প্রকাশ করিয়া বল, তাহাতে তোমার দুঃখের অনেক লাঘব হইবে"—

তখন বিরহিণী গৌরবল্লভা কান্দিতে কান্দিতে গৌর-প্রেমাবেগে বিহ্বল হইয়া কহিলেন—প্রিয়সখি কাঞ্চনে! প্রাণসখি অমিতে! আমি মহা অপরাধিনী—আমার মত মন্দভাগিনী ত্রিজগতে দ্বিতীয় কেহ নাই,—নদীয়ার বৈষ্ণবগৃহিণীগণ আজ আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা সকলেই আমার পরম পূজ্যা এবং মাতৃস্থানীয়া। আমার প্রাণবল্লভ তাঁহাদের কত সম্মান করিয়া গিয়াছেন—তাহা ত আমার অবিদিত নাই। আমি আজ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বিষম অপরাধিনী হইয়াছি—আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় দাউ দাউ জ্বলিতেছে—কিছুতেই আমার প্রাণে শান্তি বোধ হইতেছে না—আমার এতদিনের ভজন সাধন সকলই নিষ্ফল হইল। এখন আমি কি করি সখি? কি উপায়ে আমার এই ভীষণ অপরাধ ভঞ্জন হয়—তাহার উপায় তোমরা সখি কর—নচেৎ আমার প্রাণ রক্ষা দায় হইবে"—

এই বলিয়া বিরহিণী গৌর-বল্লভা কাঁদিয়া আকুল হইলেন—মর্ম্মী সখী কাঞ্চনার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন—তাঁহার উষ্ণ অশ্রুজলে সখি কাঞ্চনার পরিধান বস্ত্র সিক্ত হইল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল,—অতঃপর সখি কাঞ্চনা প্রেম-গদ-গদভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন—প্রাণসখি! ইহার জন্য এত চিন্তা কেন? তুমিই তোমার অপরাধ-ভঞ্জনের উপায় আপনিই করিবে—আমি বৈষ্ণব-গৃহিণী-গণকে মহা সমাদরে আহ্বান করিয়া তোমার নিকটে এখনি আনিয়া দিব—তুমি সখি, অনুমতি করিলেই এখনই এ কার্য্য সংসাধিত হইবে"—

ভক্ত-বৎসলা বিরহিণী প্রিয়াজি কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন—পরে প্রেমাশ্রুবিগলিত কমল নয়ন-দ্বয় নিজ বসনাঞ্চলে মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—মর্ম্মীসখী কাঞ্চনার দুটী হস্ত পরম প্রেম-ভরে নিজ দুই হস্তে ধারণ করিয়া গৌরানুরাগরঞ্জিত নয়নে কহিলেন—"প্রাণসখি কাঞ্চনে! তুমি কৃপা করিয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণকে মহা সমাদরে নিমন্ত্রণ

করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটীরে আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগের চরণে ধরিয়া আমার এই মহদপরাধ ভঞ্জন করিব।”

সখি কাঞ্চনা তাঁহার মহা স্বতন্ত্রা প্রাণ-সখির এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দর্শনাভিলাষিণী হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার অতিবৃদ্ধ ঈশান দাদাকে স্মরণ করিলেন এবং ভজন-মন্দির মার্জ্জনাকারিণী একটী দীনা দাসীকে আদেশ করিলেন “ঈশান দাদাকে অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে আসিতে বল।” তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালিত হইল। ঈশান আসিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য-সহকারে আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চের সম্মুখে দীঘল হইয়া পড়িয়া ভূমিলুণ্ঠিত দেহে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার নিকট আসিয়া হস্ত ধারণ করিয়া পরমপ্রেমভরে উঠাইয়া প্রেম-গদ-গদভাবে কহিলেন—“ঈশান দাদা! তোমার ঠাকুরাণীর আদেশ হইয়াছে অদ্য যে কয়টী বৈষ্ণব-গৃহিণী এখানে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া অদ্যই মধ্যাহ্নে শচী-আঙ্গিনায় লইয়া আসিতে হইবে। তোমার উপর এই গুরুভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।”

অতিবৃদ্ধ ঈশান এখনও চলিতে ফিরিতে বেশ পারেন—নিত্য গঙ্গাস্নান করেন—শ্রীধাম নবদ্বীপের সকল বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে বহু সম্মান করেন। তিনি তাঁহার ঠাকুরাণীর আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি প্রেমগদগদভাবে কহিলেন—“কাঞ্চনা দিদি! মুঞি নরাধম ঠাকুরাণীর পালিত কুকুর—মুঞি নিমন্ত্রণ করিলে আমার পরম পূজনীয়া বৈষ্ণবগৃহিণীগণ আসিবেন ত?” সখি কাঞ্চনা তখনই উত্তর দিলেন —ঈশান দাদা! লক্ষ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলেও তাঁহাদের তত সুখ হইবে না,—এত সুখ হইবে তোমার নিমন্ত্রণে—তোমাকেই তাঁহারা উপযুক্ত মনে করিয়া এ বিষয়ে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তুমি দাদা! নিঃসঙ্কোচে তোমার ঠাকুরাণীর আদেশ পালন কর”। বৃদ্ধ ঈশান আত্মস্তুতি শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক গৌরনাম স্মরণ করিলেন এবং অবনতমস্তকে প্রিয়াজির উদ্দেশে সেখানে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আদিষ্ট কার্য্যে গমন করিলেন।

বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ অসময়ে নিজ নিজ গৃহে অতি বৃদ্ধ ঈশানকে দর্শন করিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে তাঁহার শুভাগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে বিগলিত-হৃদয় হইয়া সকলে একত্রিত হইয়া মধ্যাহ্নকালে শচী-আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে কে কে আছেন পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবী,—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-পত্নী সর্ব্বজয়াদেবী,—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের ধাত্রীমাতা নারায়ণীদেবী,—শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহিণী গৌরসুন্দরের শিক্ষাগুরুপত্নী শ্রীদেবী,—শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের জননী চন্দ্রকলাদেবী,—শ্রীগদাধরপণ্ডিত-জননী রত্নাবতীদেবী,—সুদর্শন পণ্ডিতের গৃহিণী মহাপ্রভুর গুরু-মাতা সুলোচনাদেবী প্রভৃতি বর্ষীয়সী নদীয়ার বৈষ্ণবগৃহিণী-গণ অনেকেই বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে শচী-আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সখি কাঞ্চনাপ্রমুখ প্রিয়াজির সখিবৃন্দ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের একটী সুরম্য ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে তাঁহাদিগকে দিব্যাসন দিলেন। দাসীগণ আসিয়া তাঁহাদিগের পদ ধৌত করিয়া দিলেন এবং নূতন গামছায় শ্রীচরণ মুছাইয়া দিয়া পাদোদক পান করিলেন। তাঁহারা সকলে দিব্যাসনে উপবেশন করিলে সখি কাঞ্চনা ভজন-মন্দিরে গিয়া প্রিয়াজিকে তাঁহাদের শুভাগমন সংবাদ দিলেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা তখন সংখ্যা-নাম জপে মগ্ন ছিলেন। তৎক্ষণাৎ জপ শেষ করিয়া তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সখি কাঞ্চনাকে এই সকল বৈষ্ণব-গৃহিণী-দিগের উপযুক্ত উত্তম প্রসাদের সুব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন,—আরও কানে কানে বলিলেন, ইঁহাদিগের বিদায়-কালীন প্রত্যেককে নবপট্টবস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাঁহা-দিগের মর্য্যাদার উপযুক্ত বিদায় দানেরও যেন সুব্যবস্থা হয়। সখি কাঞ্চনা পরমানন্দে প্রিয়াজির আদেশ পালনের সুব্যবস্থা করিলেন—এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নদীয়ার বৈষ্ণবগৃহিণী-গণের প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। মহালক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই—ক্ষণমাত্রেই সকল ব্যবস্থা হইয়া গেল।

বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর শরীর কঙ্কালসার,—দেহযষ্টি-খানি অতি জীর্ণ ও শীর্ণ—রুক্ষ কেশদাম,—মলিন বদন—পরিধানেও মলিন বসন—নয়নের দরদরিত ধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—অতিশয় দুর্ব্বল শ্রীঅঙ্গখানি সর্ব্বদাই থর থর কাঁপিতেছে—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই পার্শ্বে

তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বৈষ্ণবগৃহিণীগণের সম্মুখে ধীরে ধীরে গৃহে লইয়া গেলেন।

গৌরবক্ষ-বিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী গলবস্ত্রে তাঁহাদিগকে জনে জনে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন—বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ বহুদিন পরে বিরহিণী গৌরবল্লভার দর্শনলাভ সৌভাগ্য পাইয়াছেন—কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতেই পারিতেছেন না, কিন্তু প্রিয়াজি তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। বৈষ্ণবগৃহিণীগণ গৌরবল্লভাকে দেখিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—প্রিয়াজি করযোড়ে তাঁহাদিগকে স্ব স্ব আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন—তাঁহারা সকলে যথা-স্থানে উপবেশন করিলে তিনি মর্ম্মীসখিদ্বয়সহ তাঁহাদিগের পদতলে উপবেশন করিলেন। দীনা ভিখারিণীর স্থায় রাজরাণী গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী আজ নদীয়ার বৈষ্ণবগৃহিণীগণের কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া করযোড়ে অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তখন শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহিণী মালিনী-দেবী প্রমুখ বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ একে একে দিব্যাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া গৌর-বল্লভাকে বেষ্টন করিয়া মণ্ডলী করিয়া ভূমিতলে বসিলেন—শ্রীমালিনীদেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন—নিজ বসনাঞ্চলে তাঁহার কমল নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিয়া পরম স্নেহভরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"বৌমা! তোমাকে বহুদিন পরে দেখিয়া আমাদের নিমাই চাঁদের ও তোমার বাল্য-লীলা-স্মৃতি সকল একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে,—তোমাদের গৃহস্থ-লীলারঙ্গ যেন চক্ষের উপর ভাসিতেছে—তোমার পূজনীয়া শাশুড়ীঠাকুরাণীর প্রত্যেক কথা আজ আমাদের মনে উদয় হইতেছে—তোমাকে দেখিয়া চিনিবার সাধ্য নাই সত্য,—কিন্তু তোমার এই মহাতপস্বিনী মূর্ত্তির অপূর্ব্ব পরম স্নিগ্ধ-জ্যোতি আমাদিগকে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়াছে—তোমার বিকট বৈরাগ্যের কথা—তোমার কঠোর তপস্যা ও নির্জ্জন ভজনের কথা লোকমুখে আমরা সকলি শুনিয়াছি। অদ্বৈত-গৃহিণী সীতাদেবীর মুখেই তাহা সকলি শুনিয়াছি,—কিন্তু আজ তোমার এই মহাতপস্বিনী ও তেজস্বিনী ঐশী শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আমরা সকলেই পরম বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তোমার মত তপস্বিনী সতী-সাধ্বীর শরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি মা! আমাদিগকে একটু কৃপা করিও,—আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিও—তাহা হইলেই আমাদের নদীয়ার চাঁদ গৌরহরির কৃপালাভে আমরা সমর্থ ও কৃতকৃতার্থ হইব। তোমার ও তোমার নদীয়া-নাগরী সখিবৃন্দের কৃপাপ্রাপ্তিরই নামান্তর গৌরপ্রাপ্তি। আর গৌর-প্রাপ্তির অর্থ ই গৌরসেবাপ্রাপ্তি। নদীয়া-নাগরীভাবে মধুর রসের গৌর-ভজনের অধিকারিণী হইবার সৌভাগ্য এজন্মে আমাদের নাই—তুমি আমাদের গৌরগোপাল-বক্ষ-বিলাসিনী—তোমার এবং তোমার সখিবৃন্দের কৃপা হইলে পরজন্মেও যেন আমরা সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি,—ইহাই আমাদের কাতর প্রার্থনা।"

এতগুলি কথা স্থিরচিত্তে ও স্থিরভাবে অধোবদনে বসিয়া অবগুণ্ঠনবতী প্রিয়াজি এতক্ষণ শুনিলেন। তিনি লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে যেন স্তম্ভভাবাপন্ন হইয়া বসিয়া আছেন—তাঁহার পরম গম্ভীর ভাব,—যেন কত কি ভাবিতেছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা, তাঁহার নিকটেই বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই—নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ মধ্যে গভীর নীরবতা নির্ব্বিবাদে স্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছে। এই ভাবে কতক্ষণ যে গেল, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। বিরহিণী গৌর-বল্লভা শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনী-দেবীর ক্রোড়ে প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িয়াছেন—মালিনীদেবী পরম স্নেহভরে তাঁহাকে মৃদুমন্দ ব্যজন করিতেছেন। দরদরিত নয়নধারায় প্রিয়াজির বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—তিনি নির্নিমেষ নয়নে মালিনীদেবীর বদনের প্রতি কাতরপ্রাণে চাহিয়া আছেন—সে চাহনীর মর্ম্ম,—"আপনাদের চরণে ধরি,—আপনারা আশীর্ব্বাদ করুণ যেন আপনাদের নদীয়ার চাঁদ এ মন্দভাগিনীকে অন্তিমকালে তাঁহার শ্রীচরণ-কমলে একটু স্থান দেন"।

বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—মালিনীদেবীর ক্রোড়ে তিনি এতক্ষণ শয়ান ছিলেন—এক্ষণে বুঝিতে পারিয়া সরমে যেন মরিয়া গেলেন। তিনি গললগ্নীকৃতবাসে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চরণধূলি গ্রহণ করিয়া নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন—মালিনীদেবী পরম সমাদরে তাঁহাকে উঠাইয়া সস্নেহে তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি সতি বিষ্ণুপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রিয়া—গৌরপ্রিয়া। তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমাদের পরম স্নেহের পুতুলী গৌরহরির নিত্যবিলাস,—সেখানেই তাঁহার সর্ব্ব

লীলাস্থলী ও বিশ্রাম স্থান। আমাদের নিমাইচাঁদ **বিষ্ণুপ্রিয়া-লিঙ্গিত** বিগ্রহ—তোমাদের লীলারঙ্গ আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। আমাদিগের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিও।"

বিরহিণী গৌরবল্লভা কথাগুলি শুনিয়া গেলেন মাত্র—কোন উত্তর দিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া জনে জনে সকলকে পুনরায় গলে বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের শ্রীচরণে কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর প্রিয়াজির ইঙ্গিতে বৈষ্ণব-গৃহিণীগণকে পরম সমাদরে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বিচিত্র ও বহুবিধ উত্তম প্রসাদে ভূরিভোজন করাইলেন—সেখানে তিনি স্বয়ং দাঁড়াইয়া পরমানন্দে এই সকল বর্ষীয়সী নদীয়া-বাসিনী পূজনীয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। গৌর-প্রেমানন্দে প্রিয়াজির কমল নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমধারার পরম পূত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। প্রিয়াজির আদেশে ভোজনান্তে তাঁহাদিগকে সখি কাঞ্চনা ও অমিতা নব পট্ট-বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদিসহ যথোপযুক্ত সম্মান সহকারে বিদায় দিলেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌর-সুন্দর পরমোদার এবং অবতার-সার। তাঁহার পরমৌদার্য্য-লীলারঙ্গই তাঁহার এই বিশিষ্ট অবতারের মূলমন্ত্র। তিনি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীশ্যামসুন্দরের বিশিষ্ট আবির্ভাব ("আবির্ভাব বিশেষঃ")। তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী শক্তিশক্তিমান অদ্বয়তত্ত্ব প্রমাণে তদ্রূপ পরমোদার-লীলারঙ্গ-প্রকটকারিণী পরাশক্তি শ্রীরাধিকার বিশিষ্ট আবির্ভাব। নদীয়ার বৈষ্ণব-গৃহিণী-গণকে তিনিও তাঁহার পরমৌদার্য্য-লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তাঁহার পাষাণের রেখার মত কঠোর নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া তাঁহাদিগকে নদীয়ার মহাগম্ভীরা মন্দিরা-ভ্যন্তরে প্রবেশলাভের সৌভাগ্য ও সুযোগ দিলেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁহাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া পরম স্বতন্ত্রা ও পরমোদার গৌরকান্তার প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। গৌর-বল্লভা তাঁহার স্বজনপ্রিয়তা ও ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিয়া নদীয়ার বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের মনদুঃখ দূর করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবশী স্বয়ং ভগবান আর তাঁহার প্রাণ-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীও তদ্রূপ ভক্তবশী স্বয়ং ভগবতী।

এক্ষণে অপরাহ্ণকাল—ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভ মাত্র। বসন্তানিল মৃদুমন্দ বহিতেছে,—সুরধুনীতীরে মৃদুমন্দ মারুতান্দোলিত বৃক্ষলতাদির প্রাকৃতিক শোভা দর্শনানন্দে বিভোর হইয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতা ভজন-মন্দিরের বারান্দার নিকটবর্ত্তী একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীর দৈনন্দিন লীলাকথা আলোচনা করিতেছেন। বিরহিণী গৌরবল্লভা নিজ ভজন-মন্দিরাভ্যন্তরে বসিয়া একাকিনী নির্জ্জন ভজনরতা—মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। তাঁহারই আদেশে মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাকে একাকিনী ভজনগৃহে রাখিয়া বাহির বারান্দার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া স্ব স্ব ভজনরতা। এরূপ ব্যবস্থা বিরহিণী প্রিয়াজি মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন। ইহাতে সুবিধা অসুবিধার দুই দিকই আছে। মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাদের প্রিয়সখি এবং তাঁহার প্রাণ-বল্লভের অপূর্ব্ব লীলা-রঙ্গ ও বিলাস-বিভ্রমের মধুর কাহিনীগুলি নির্জ্জনে বসিয়া আলোচনা ও আস্বাদন করিবার সুযোগ ও সময় পান—এই একটা দিক। অপর দিকে বিরহিণী প্রিয়াজি স্বয়ং নির্জ্জন ভজনপ্রিয়া—তাঁহাকে সেই সুযোগ প্রদান করাও মর্ম্মী সখিদিগের বিশিষ্ট সেবাকার্য্য—ইহাও আর একটা দিক। এই কারণে মধ্যে মধ্যে প্রিয়াজিকে একাকিনী ভজনগৃহে রাখিয়া তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় নির্জ্জনে তাঁহাদের মনমত ভজনসাধনে মধ্যে মধ্যে ব্যাপৃতা থাকেন।

সখি কাঞ্চনা তাঁহার একটী দীনা দাসীর রচিত প্রিয়াজির একটা দণ্ডাত্মিকা লীলা-স্মরণ-মনন-পদ্ধতি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রিয়সখি অমিতাকে শুনাইতেছেন। দীনা দাসীটি করযোড়ে ও গলবস্ত্রে দ্বারদেশে দূরে দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিতেছে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর দণ্ডাত্মিকা লীলাস্মরণমননপদ্ধতি।

দিবা-লীলা।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী উঠি প্রাতঃকালে।
প্রণমি গৌরাঙ্গ-পদে শচীগৃহে চলে॥
প্রণমিয়া শচীমাতা হস্তমুখ ধুঞা।
প্রণময়ে নারায়ণে দেবগৃহে যাঞা॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া গললগ্নী বাসে।
পড়েন প্রিয়াজি স্তব মনের উল্লাসে॥
এই কার্য্যে যায় তাঁর দণ্ডেক সময়।
কাঞ্চনাদি সখি তবে আসিয়া মিলয়॥

হাসিমুখে সখিগণে করি সম্ভাষণ।
গঙ্গাস্নানে সখি সঙ্গে করেন গমন॥
সুগন্ধি তৈলেতে করি কেশ সংস্কার।
শচীমাতা সঙ্গে চলে সুরধুনীধার॥
পট্টবস্ত্র ল'য়ে চলে সঙ্গে দুই দাসী।
মৃদুপদে ঠাকুরাণী চলে হাসি হাসি॥
সুরধুনী দেখি দেবী স্তুতিনতি করি।
পরশেন গঙ্গাজল মস্তকেতে ধরি॥
সখিসঙ্গে মনসাধে স্নান করি জলে।
আইসেন গৃহবাসে মহা কুতূহলে॥
এই কার্য্যে প্রিয়াজির দুই দণ্ড যায়।
গৃহে ফিরি দেখে প্রভু অঙ্গণে বৈঠয়॥
বহিরাঙ্গণে বসি ভক্তগণ সঙ্গে।
কহিছেন কৃষ্ণকথা প্রেমরস-রঙ্গে।
কুটিল চাঁচর কেশ বিছাইয়া দিয়া।
ডাবাতিয়া বক্ষদেশ প্রসার করিয়া॥
কুলবতীর সতীধর্ম্ম কটাক্ষে নাশিয়া।
বসি আছে মনসুখে গোরা বিনোদিয়া॥
গদাধর নরহরি দাঁড়াইয়া পাশে।
সুগন্ধি তৈল দেন বিনাইয়া কেশে॥
কাঞ্চনা আড়ালে হাতে ধরি বিষ্ণুপ্রিয়া।
দেখান গৌরাঙ্গ-রূপ মনমোহনিয়া॥
দেখে পাছে শচীমাতা ভাবিয়া সরমে।
দ্রুতগতি যান দেবী আপন করমে॥
তবে দেবগৃহে গিয়া পূজাসজ্জা করি।
নিত্যকৃত্য করে দেবী মালা হাতে ধরি॥
পাকগৃহে তবে যান গৌর-বিনোদিনী।
উদ্যোগ করিয়া দেন নদীয়া-রমণী॥
শচীমাতা আসি দেন পাকের আদেশ।
কি কি পাক হবে নিত্য, তার উপদেশ॥
চারি দণ্ড যায় তাঁর এই সব কাজে।
রন্ধনে বিলম্ব হ'লে মরি যান লাজে॥
শচী-মার উপদেশ শিরে করি মানি।
প্রণমিয়া তাঁকে, পাকে যান ঠাকুরাণী॥
গৌর-পাদ-পদ্ম মনে করিয়া স্মরণ।
আজ্ঞা মত ব্যঞ্জনাদি করেন রন্ধন॥

শাক সুক্তা নিম্বরসা মোচাঘণ্ট আর।
নিত্য হয় গৌর-গৃহে ব্যঞ্জন সম্ভার॥
নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি প্রভুপ্রিয় জানি।
রন্ধন করেন যত্নে গৌরাঙ্গ-ঘরণী॥
সঙ্গে করি প্রভু আনেন গৃহে নিতি নিতি।
দশ বিশ জন সাধু অভ্যাগত যতি॥
ইহা ভিন্ন ভক্তগণে প্রসাদ বণ্টন।
অতএব গৌর-গৃহে প্রচুর রন্ধন॥
একেশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া করেন সকলি।
মাঝে মাঝে শচীমাতা দেন কিছু বলি॥
আদর সোহাগে তিনি তোষেণ বধূরে।
শিখায়েন পাক-কার্য্য বচন মধুরে॥
বধূ সঙ্গে পাকশালে থাকি ক্ষণে ক্ষণ।
দেখান শিখান যত্নে পাকের বিজ্ঞান॥
স্নান হতে ইতিমধ্যে আইলে প্রভু গৃহে।
পদ ধৌত তরে ঈশান ঝারি লয়ে রহে॥
বিষ্ণুগৃহে গিয়া তবে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
বিধি মত পূজা পাঠ তবে সাঙ্গ করি॥
দণ্ডবৎ পরণাম করিয়া বিগ্রহে।
বহুক্ষণ মুখচন্দ্র দর্শনেতে রহে॥
ইহা দেখি শচীমাতা বধূরে কহয়ে।
প্রসাদ আনিয়ে দাও আমার নিমায়ে॥
ধৌত করি হস্ত পদ প্রিয়াজি তখন।
বিষ্ণু নৈবেদ্য আনি প্রাণেশ্বরে দেন॥
হাসি মুখে রসকথা কহি দুটি ধীরে।
সুবাসিত তাম্বুল দেন প্রভুর শ্রীকরে॥
তবে পুনঃ যান দেবী রন্ধন গৃহেতে।
সাত দণ্ড যায় ভোগ প্রস্তুত করিতে॥
মধ্যাহ্নে লাগয়ে ভোগ শাস্ত্রবিধিমতে।
দেবগৃহে লয়ে যান শাশুড়ী বধূতে॥
তবে হয় ভোগারতি দেখে ভক্তগণ।
প্রিয়াজি দেখেন গুপ্তে সহ সখিগণ॥
তবে হয় রীতিমত অতিথি সৎকার।
স্বয়ং পরিবেষ্টা হন গৌরাঙ্গসুন্দর॥
জলবিন্দু না লয়েন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
যাবৎ না পান প্রসাদ গৌর-বিনোদিয়া॥

ভোজনে বসেন প্রভু কমল লোচন।
শচীমাতা বসি কাছে করেন ব্যজন ॥
স্বয়ং প্রিয়াজি তবে করেন পরিবেশন।
অন্তরালে সখিগণ করেন দর্শন ॥
ভোজনান্তে যান প্রভু শয়ন গৃহেতে।
চকিতে চলেন দেবী তাম্বুল হস্তেতে ॥
নিত্য পদসেবা তাঁর ভোজনান্তে রীতি।
নিয়ম রক্ষা করি দেবী আসেন ঝটিতি ॥
তবে আসি পাকগৃহে শাশুড়ী ভোজনে।
করায়েন বিষ্ণুপ্রিয়া অতি সযতনে ॥
শচীমার অনুরোধ একত্রে ভোজন।
না পারেন বিষ্ণুপ্রিয়া করিতে লঙ্ঘন ॥
প্রসাদ প্রচুর দিয়ে শচীমার পাতে।
ভোজন করেন তবে শাশুড়ী বধূতে ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু-অবশেষ।
আনিয়া করেন সেবা আনন্দ বিশেষ ॥
শচীমা আদরে দেন প্রসাদ তুলিয়া।
শাশুড়ী বধূতে খান একত্রে বসিয়া ॥
সখিগণ সঙ্গে বসি পায়েন প্রসাদ।
পূর্ণ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুড়ীর সাধ ॥
পাঁচ দণ্ড কাল যায় এই কাজে তাঁর।
পরিপূর্ণ থাকে তবু পাকের ভাণ্ডার ॥
দাস দাসী পরে পায় মহা পরসাদ।
পরিবেশনে প্রিয়াজির হয় বড় সাধ ॥
অন্ন নাহি আসে হাতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার।
গৌরগৃহে নিত্যস্থিতি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ॥
দাস দাসী অভ্যাগত প্রসাদ পাইলে।
শাশুড়ীকে লয়ে যান বিশ্রামের স্থলে।
নিত্য পদসেবা তাঁর করি আনন্দেতে।
তবে দেবী আইসেন আপন গৃহেতে ॥
তিন দণ্ড যায় ইথে দেবীর সময়।
সখিসঙ্গে গৌরকথা-রসে বিলসয় ॥
নিদ্রা ভঙ্গে উঠি যবে শ্রীশচীনন্দন।
হস্ত মুখ ধুঞা করেন বাহিরে গমন ॥
সতর্কে প্রিয়াজি রহে অবসর ঢুঁড়ি।
চকিতে চলেন পানবাটা হস্তে করি ॥

সখিগণ অন্তরালে থাকিয়া তখন।
গোপনে শুনেন প্রভু-প্রিয়াজি-কথন।
রসকথা কহি প্রভু যান পুষ্পোদ্যানে।
প্রিয়াজি পশ্চাতে যান সখিগণ সনে ॥
প্রাচীরে বেষ্টিত ভূমি গুপ্ত বৃন্দাবন।
মধ্যে এক সরোবর সুন্দর শোভন ॥
রত্নবেদী মনোহর সেই পুষ্পোদ্যানে।
প্রিয়াসহ বৈসে প্রভু আনন্দিত মনে ॥
কাঞ্চনা অমিতা আদি সখিগণ মিলে।
চামর ব্যজন করে মহা কুতুহলে ॥
হাসি হাসি সবে মিলি প্রেমরসরঙ্গে।
ফুলমালা পরায়েন শ্রীযুগল অঙ্গে ॥
রসকথা আলাপনে তুষিয়া সকলে।
বিকালি প্রসাদ পান তথা সবে মিলে ॥
রঙ্গ করি প্রভু দেন প্রিয়াজি বদনে।
প্রিয়াজি পালটী দেন প্রভুর আননে ॥
রসরঙ্গে রাসলীলা করিয়া প্রকট।
আইসেন বাহিরেতে গোরাচাঁদ ঝট্ ॥
তবে স্নানাদি করি দিব্য সরোবরে।
নানা জাতি পুষ্প তুলি আনি থরে থরে ॥
করে সবে রাশীকৃত বিষ্ণুগৃহ দ্বারে।
নদীয়ানাগরী যায় মালা গাঁথিবারে ॥
শচীমাতা বধূ সঙ্গে সখিগণে হেরি।
কত না আদর করে জনে জনে ধরি ॥
নিমাই পরিবে মালা ভক্তগণ সাথে।
নাচিবে কীর্ত্তন মাঝে নদীয়ার পথে ॥
নিতাই পরিবে মালা গাঁথ ভাল করি।
এই বলি শচীমাতা আদরে নাগরী ॥
নদীয়া-নাগরী বৈঠে মালা গাঁথিবারে।
প্রিয়াজি চন্দন ঘসে বসিয়া মন্দিরে।
চারি দণ্ড গত হয় এই কার্য্যে তাঁর।
জনপূর্ণ ততক্ষণ গৌরগৃহদ্বার ॥
লোকের সংঘট্ট আর মৃদঙ্গের রোল।
সকলের মুখে মাত্র হরি হরি বোল ॥
ঈশান আসিয়া মালা চন্দন লইয়া।
গদাধরে দিলা সব প্রণাম করিয়া ॥

প্রভু-গলে প্রেমানন্দে অগ্রে দিয়া মাল।
হইলেন গদাধর চরণে দীঘল ॥
অলকা তিলকা ভালে চন্দন লেপনে।
করিলেন নরহরি আনন্দিত মনে ॥
শচীমাতা আর যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
অন্তঃপুর দ্বারে থাকি দিলা হলুধ্বনি ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত নদীয়ানাগরী।
গবাক্ষ দ্বারেতে হেরে গৌরাঙ্গমাধুরী।
প্রেমানন্দে সবে মগ্ন যত সখিগণ।
প্রিয়াজিকে লয়ে করে রসের কথন ॥
তবে প্রভু গণসহ পথে বাহিরয়।
ছাদে উঠি বিষ্ণুপ্রিয়া হরিষে দেখয় ॥
সঙ্গে চলে সখিগণ ছাদের উপরে।
প্রাণ ভরি দেখে সবে গৌরাঙ্গ নাগরে ॥
তিন দণ্ড এই কার্য্যে যায় প্রিয়াজির।
দূর হতে সবে দেখে গৌর নটবীর ॥
গৌরগৃহ হ'তে যবে চলিল কীর্ত্তন।
বহু লোক সঙ্গে চলে না যায় গণন ॥
ছাদে ছাদে কতশত নদীয়া নাগরী।
প্রেমানন্দে হেরে সবে গৌরাঙ্গমাধুরী ॥
গবাক্ষ দ্বারেতে বসি কুলবতীগণ।
গোরা-রূপ-সাগরেতে হয়েন মগন ॥
উঠেছে কীর্ত্তনধ্বনি নবদ্বীপ ভরি।
সর্ব্বলোক মুখে শুনি ধ্বনি হরি হরি ॥
যতদূর দেখা যায় প্রিয়াজি দেখয়।
সখিগণ সঙ্গে রহি কৌতুক করয় ॥
তবে আসি বসি দেবী শচীমার কাছে।
অতি যত্নে সমাদরে পক্ক কেশ বাছে ॥
সাংসারিক কত কথা মৃদু ভাবে বলি।
বিনায়েন কেশ দিয়ে চম্পক অঙ্গুলি ॥
স্নেহ ভরে শচীমাতা চুম্বেন বদনে।
শাশুড়ীর আদরেতে প্রিয়াজি সরমে ॥
সখিগণ হাসি তার কেশবান্ধি দেন।
শচীমা উঠিয়া তবে গৃহকাজে যান ॥
সখি সঙ্গে রসিকতা কেশের সংস্কার।
এই কাজে যায় তার দুই দণ্ড আর ॥
তবে গাত্র ধৌত করি সরোবরে গিয়ে।
ঝটিতি আসেন পুনঃ ঠাকুরের গৃহে ॥
ধূপের আরতি আর দীপ প্রক্ষালনে।
এই কার্য্যে যায় তাঁর দণ্ডেক গণনে।
বত্রিশ দণ্ড দিবালীলা এইভাবে হয়।
প্রেমভক্তি লভ্য হয় ইহা যে স্মরয় ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম-প্রাপ্তি-অভিলাষী।
দণ্ডাত্মিকা দিবালীলা স্মরে হরিদাসী ॥

—•—

রাত্রি-লীলা

সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুপ্রিয়া জ্বালিয়া প্রদীপ।
সর্ব্বাগ্রেতে বিষ্ণুগৃহে দেন ধূপ দীপ ॥
শ্রীতুলসী বৃক্ষমূলে করি দীপ দান।
গললগ্নী কৃতবাসে করেন প্রণাম ॥
গৃহে গৃহে ধূপ ধুনা দিয়ে তবে সতি।
বিষ্ণুগৃহে গিয়ে করেন ধূপের আরতি ॥
দুই দণ্ড কাল তাঁর যায় দেবকাজে।
গৃহকর্ম্মে দেরী হয় মরি যান লাজে ॥
মালা হাতে বিষ্ণুদ্বারে বসি শচীমাতা।
দেখেন বধূর কাজ হয়ে হরষিতা ॥
নিমাই নগরে গেছে সংকীর্ত্তন লঞা।
বসি আছেন শচীমাতা পথ নিরখিয়া ॥
কাঞ্চনাদি সখিগণ আইলেন তথা।
আরম্ভিলা প্রেমানন্দে সবে গৌরকথা ॥
নদীয়ানাগরী-মুখে রসময়ী-বাণী।
শাশুড়ী-বধূতে শুনে হ'য়ে উন্মাদিনী ॥
নতমুখে বিষ্ণুপ্রিয়া সখি সঙ্গে বসি।
শুনেন গৌরাঙ্গকথা মুখে মৃদু হাসি ॥
গৃহকর্ম্ম ছলে দেবী চাহেন উঠিতে।
কাঞ্চনা নিষেধ করে ধরি তাঁর হাতে ॥
দুই দণ্ড রাত্রি যায় গৌর-গুণগানে।
হেনকালে কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনি কাণে ॥
গৌর এল ঘরে বলি শচীমা ত্বরিতে।
নাগরীগণের সাথে আইলা পথেতে ॥
প্রতিবেশীগণ তবে আইলা সকলে।
পূর্ণ হৈল গৌরগৃহ লোকের গহলে ॥

সখি সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া ছাদের উপরে।
কীর্ত্তন-লম্পট গোরা দেখে প্রাণভরে॥
আরতির আযোজন করি সখিগণ।
শচীমা করেন তবে গৌর নির্ম্মঞ্ছন॥
ঈশান আসিয়া করেন চরণ বন্দন।
গৌরপদ ধৌত করি পাদোদক লন॥
বিকালি প্রসাদ রহে গৃহে থরে থরে।
প্রিয়াজি সাজান পাত্র ভক্তগণ তরে॥
কীর্ত্তনশ্রান্ত গোরা করিয়া বিশ্রাম।
শচীমার হাতে তবে পরসাদ পান॥
স্বহস্তে ভক্তগণে করেন বণ্টন।
পাইয়া প্রসাদ তাঁরা করেন গমন॥
সখিসঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরালে বসি।
দেখেন ভোজন-লীলা মুখে মৃদু হাসি॥
দুই দণ্ড কাল তার এই কাজে যায়।
পাকগৃহে চলে দেবী ব্যাকুল হিয়ায়॥
ক্ষিপ্রহস্তে রাত্রি-ভোগ প্রস্তুত করিয়া।
ভোগ দেন বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুগৃহে গিয়া॥
শ্রীবাসঅঙ্গনে গৌর-কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
অতঃপর হবে বলি ব্যাকুলিত মন॥
গৃহকথা কন প্রভু মায়ের সঙ্গেতে।
ইতিমধ্যে সন্ধ্যারতি ভোগের সহিতে॥
সকলি সম্পন্ন করি বিষ্ণুপ্রিয়া সতি।
সখি দ্বারে শাশুড়ীকে ডাকেন ঝটিতি॥
এই কাজে যায় তাঁর দুই দণ্ড কাল।
গোরাচাঁদ তবে পান প্রসাদ রসাল॥
শচীমা নিকটে বসি গৃহকথা রঙ্গে।
বলেন বধূর কথা আন পরসঙ্গে॥
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মোর, বধূ মোর লক্ষ্মী।
দেবসেবা গৃহকর্ম্ম, পাক তার সাক্ষী॥
হাসি হাসি বলে গোরা কি বল জননি।
আমি কেহ নহি তব বধূ গুণমণি॥
আমি লক্ষ্মীকান্ত তবে লক্ষ্মী তব বধূ।
লক্ষ্মীকান্ত প্রভাবেতে তবে এত মধু॥
হাস্য পরিহাসে তুষ্ট করি জননীরে।
প্রসাদ পায়েন গোরা আনন্দ অন্তরে॥

অন্তরালে সখি সঙ্গে শুনি রসবাণী।
হাসিয়া পড়েন ঢলি বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী॥
প্রেমানন্দে গোরাচাঁদ করেন ভোজন।
প্রিয়াজি করেন ধীরে সুপরিবেশন॥
ভোজনান্তে মহাপ্রভু করি আচমন।
শয়ন গৃহেতে যান বিশ্রাম কারণ॥
সুগন্ধি তাম্বুল হস্তে প্রিয়াজি তখন।
শয়ন গৃহেতে ঝাট করেন গমন॥
নিয়মিত পদসেবা করি রসরঙ্গে।
ঝটিতি মিলেন আসি শাশুড়ীর সঙ্গে॥
অন্তরালে সখিগণ করে পরিহাস।
হাসি মুখে বিষ্ণুপ্রিয়া কহে মৃদু ভাষ॥
ছয় দণ্ড যায় কাল প্রিয়াজির কাজে।
ভোজনে বিলম্ব হৈলে মরি যান লাজে।
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ শ্রীবাস-অঙ্গনে।
রাত্রিকালে হয় নিত্য অন্তরঙ্গ সনে॥
নিতাই অদ্বৈত সঙ্গে মুকুন্দ মুরারি।
গদাধর বাসুঘোষ আর নরহরি॥
গোবিন্দ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মিলে।
আইলেন গৌরগৃহে সবে রাত্রিকালে॥
খোল করতাল ধ্বনি উঠিল যেমন।
বাহিরিলা গৌরচন্দ্র প্রসন্ন বদন॥
ঈশান আনিয়া দিল মাল্য চন্দন।
গৌর-অঙ্গে মনসুখে করি বিলেপন॥
গদাধর নরহরি সাজাইলা গোরা।
অলকা তিলকা ভালে ভক্ত-চিত-চোরা।
বাহিরিলা গোরাচাঁদ ভক্তগণ সঙ্গে।
শ্রীবাস-অঙ্গনে গেলা প্রেমরসরঙ্গে॥
অন্তরালে থাকি দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া সতি।
প্রেমানন্দে ডগমগ সখির সংহতি॥
তবে শচী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসাদ পাইয়া।
ঈশানের সঙ্গে চলেন পুলকিত হিয়া॥
কাঞ্চনাদি সখি সবে চলিলেন সঙ্গে।
হাসি চলে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমরসরঙ্গে॥
শ্রীবাস অঙ্গনে হয় প্রভুর নর্ত্তন।
দ্বার বন্ধ করি তিনি করেন কীর্ত্তন॥

বহিরঙ্গ কেহ নাহি পারে যাইবারে।
মধুর কীর্ত্তন হয় রাত্রি দ্বিপ্রহরে ॥
মালিনী বসান সবে করিয়া যতন।
প্রেমানন্দে মগ্ন সবে শুনেন কীর্ত্তন ॥
প্রভুর নটনরঙ্গ কটি দোলাইয়া।
সখি সঙ্গে প্রেমানন্দে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হাস্য কৌতুকরঙ্গে সখি সঙ্গে বসি।
রসকথা কহে দেবী মুখে মৃদু হাসি ॥
তৃতীয় প্রহর রাত্রি কীর্ত্তনের শেষে।
গঙ্গাতীরে যান প্রভু মজ্জন উদ্দেশে ॥
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া তবে ঈশান সংহতি।
গৃহে যান সখি সঙ্গে অতি দ্রুতগতি ॥
রাত্রির প্রসাদপাত্র করি আয়োজন।
শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া করেন পথ নিরীক্ষণ ॥
ভক্তগণ গৃহে রাখি বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথে।
নিজ নিজ গৃহে যান পূর্ণ-মনোরথে ॥
অষ্ট দণ্ড নিশা যায় নর্ত্তন কীর্ত্তনে।
প্রিয়াজি দেখেন রাস শ্রীবাস-অঙ্গনে ॥
গৃহে আসি মহাপ্রভু করেন ভোজন।
সখি সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া করেন দর্শন ॥
শচীমাতা বসি কাছে গৃহকথা কন।
ভোজন করেন প্রভু উল্লাসিত মন ॥
ভোজনান্তে যান প্রভু শয়ন-কক্ষেতে।
প্রিয়াজি সঙ্গেতে যান তাম্বুল হস্তেতে ॥
রসকথা কহি ছুটি আসেন ঝটিতি।
শাশুড়ী বধূতে তবে ভোজনের রীতি ॥
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমা সঙ্গেতে।
পদসেবা তরে যান শাশুড়ী-গৃহেতে ॥
নিয়মিত পদসেবা নিত্যকৃত্য তান।
আদেশ পাইলে তবে স্বামী-গৃহে যান ॥
হাসি মুখে সখিগণে সম্ভাষি মধুরে।
তবে যান বিষ্ণুপ্রিয়া শয়ন-মন্দিরে ॥
প্রিয়াজির আগমনে প্রভুর উল্লাস।
রাত্রি শেষে হয় তবে যুগল-বিলাস ॥
হাস্য পরিহাসরঙ্গে নদীয়া-যুগল।
বিলসয় শচীগৃহে অঙ্গ ঝলমল ॥
প্রেমরঙ্গে অবপাঙ্গে অতি প্রেমোল্লাস।
ভুজে ভুজ আরোপিয়া শয়ন-বিলাস ॥
যুগল-বিলাসরঙ্গে ছয় দণ্ড যায়।
গৌরগৃহে বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর বিলসয় ॥
চারি দণ্ড সুখনিদ্রা হয় রাত্রি শেষে।
অগ্রে দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়া উঠেন প্রত্যুষে ॥
প্রণমিয়া প্রাণনাথে কহি রসকথা।
নিজ কার্য্যে যান দেবী সখিগণ যথা ॥
সলজ্জ বদন তাঁর প্রেমপরিস্নাত।
রহস্য কৌতুক করে সখিগণ যত ॥
বত্রিশ দণ্ড রাত্রি-লীলা এই মত হয়।
বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরলীলা অতি রসময় ॥
চৌষট্টি দণ্ডের লীলা স্মরণ-মঙ্গল।
দিবা রাত্রি কৈলে বাড়ে সাধনের বল ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম প্রাপ্তি অভিলাষী।
দণ্ডাত্মিকা সেবা-রীতি কহে হরিদাসী ॥

আত্মনিবেদন।

পুরীষের কীট মুঞি পতিত অধম।
নদীয়া-যুগলসেবার নাহি জানি ক্রম ॥
হৃদে বসি গৌরচন্দ্র লিখাইলেন যাহা।
প্রকাশিনু অকপটে নিজজনে তাহা ॥
নাহি মোর অনুরোধ না করিহ রোষ।
প্রিয়া সনে উপাসনা প্রভুর সন্তোষ ॥
প্রভুর সন্তোষ যাতে তাই মুঞি চাই।
প্রেমানন্দে সবে মিলে গৌর বল ভাই ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌর (যদি) বল একবার।
পাদোদক লবে তব হরি দুরাচার ॥
আশীর্ব্বাদ কর তারে মাথে দিয়া পদ।
প্রাণান্তে ছাড়ি না যেন ভজন-সম্পদ ॥
(বলি) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ গৌর প্রাণ যেন যায়।
ইহা ভিন্ন হরিদাসী কিছু নাহি চায় ॥
—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টি পাত" ॥—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারি" ॥—
দাসী হরিদাসীর এই ভজন-সম্পত্তি।
ছাড়ি না জীবনে যেন যে হয় বিপত্তি ॥
নদীয়া-নাগর গোরা রসের পাথার।
নদীয়া-নাগরী সবে প্রেম পারাবার ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ ধন নবদ্বীপ-রস।
ভাগ্য যার সুপ্রসন্ন যে পায় পরশ ॥
কি আর বলিব মুঞি দেখ আস্বাদিয়া।
কাঁদ আর জপ নাম গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
—"ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
কহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
লহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম রে।
যে জন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজে—
সে হয় আমার প্রাণ রে ॥"
নগরে নগরে ফিরি দ্বারে দ্বারে ঘুরি।
(এই) প্রভাতী-কীর্ত্তন কর মন প্রাণ ভরি ॥
গ্রামে গ্রামে প্রতি গৃহে পটমূর্ত্তি লঞা।
বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর সেব প্রাণ মন দিয়া ॥
ভজনের রীতি শিখ সদ্গুরু চরণে।
সদাচার সৎসঙ্গ কর প্রাণপণে ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ ধন প্রেম যদি চাও।
বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌর-পদে মন প্রাণ দাও ॥
দাসী হরিদাসী কহে দন্তে তৃণ ধরি।
(বল) জয় জয় বিষ্ণুপ্রিয়া জয় গৌরহরি ॥

প্রিয়াজির এই দণ্ডাত্মিকা-লীলা স্মরণ-মনন-পদ্ধতি শ্রবণ করিয়া সখি অমিতা তাঁহার প্রিয়সখি কাঞ্চনাকে বলিলেন —"সখি কাঞ্চনে! তোমার এই দীনা দাসীটি শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল ভজনোপযোগী মহামূল্য দ্রব্য-সম্ভার সংগ্রহ করিতেছে দেখিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম। দাসীটি মহা ভাগ্যবতী এবং সুচতুরা সেবিকাও বটে।" সখি কাঞ্চনা মৃদু হাসিয়া তাঁহার দীনা দাসীটির প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি-পাত করিলেন—দাসীটি সরমে যেন মরমে মরিয়া গেল। দূর হইতে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া পুনরায় করযোড়ে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল—তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রুধারা,—বদনে মৃদুমন্দ গৌরকীর্ত্তনধ্বনি,—হস্তে জপমালা। সখি কাঞ্চনা তাঁহার মর্ম্মী সখি অমিতাকে কহিলেন—"সখি অমিতে! তুমি আশীর্ব্বাদ কর যে এই দীনা দাসীটির যেন শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-চরণে অচলা ভক্তি হয়। ইহার রচিত একটী শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর-শত-নাম-পয়ার-স্তোত্র আছে—তুমি অনুমতি করত তোমাকে পাঠ করিয়া শুনাইতে পারি।" সখি অমিতা তৎক্ষণাৎ পরমানন্দে সম্মতি দিয়া কহিলেন,—"সখি কাঞ্চনে! তুমি বল কি? গৌর-নাম শ্রবণে তুমি আমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছ? ইহা অপেক্ষা আমার মরণ মঙ্গল।" এই বলিয়া সখি অমিতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহার প্রিয় সখিকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন—

শ্রীগৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর-শতনাম।

"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টপাত ॥"
"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী ॥"
জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া জয় শচীমাতা।
জয় মিশ্রপুরন্দর অদ্বৈত সীতা ॥
জয় প্রভু নিত্যানন্দ জয় গদাধর।
জয় ঠাকুর হরিদাস করুণাসাগর ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ অগতির গতি।
গৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্মে যাঁহাদের মতি ॥
সবে মিলে দয়া কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
অধম পতিত মুঞি মোর কেহ নাহি ॥
কুলের ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ রায়।
কেশে ধরি কিছু কিছু লিখান আমায় ॥
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-পদ করিয়া স্মরণ।
গৌরনাম লিখি কিছু করিয়া যতন ॥
অষ্টোত্তর-শত-নাম লিখিতে বাসনা।
বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু দিলেন তাড়না ॥

অধম পতিত মূর্খ মুঞি কিবা জানি। *
য' লিখান তাই লিখি গুরু অন্তর্য্যামি ॥
যখন গৌর জন্ম নিলেন শচীর উদরে।
নদীয়ার সর্ব্বলোকে হরিধ্বনি করে ॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি গ্রহণের কালে।
উদিলেন গৌরচন্দ্র নদীয়ার ভালে ॥
নিম্ব বৃক্ষতলে গৌর হলেন আবির্ভাব।
সূতিকা গৃহেতে কত দেখান প্রভাব ॥
রাখেন নিমাই নাম শ্রীবাসগৃহিণী।
শচী মা রাখেন নাম সোণার বাছনি ॥
দৈবজ্ঞ দিলেন নাম শ্রীবিশ্বম্ভর।
নদেবাসী নাম দিলা শচীর কোঙর।
বিশ্বরূপের প্রিয় নাম গৌর-দিগম্বর।
রাজচক্রবর্ত্তী নাম রাখেন নীলাম্বর ॥
দাদাঠাকুর নাম রাখেন ভৃত্য ঈশান।
শ্রীরাম রাখিলেন নাম গৌরভগবান ॥
নদীয়া-বালকে ডাকে "নিমে" "নিমে" বলে।
"নিমে" বল কেন বলে বালিকা সকলে ॥
গৌরসুন্দর নাম বালা সবে দিল।
নদীয়া-রমণী ডাকে শচীর দুলাল!
গোরাচাঁদ নাম রাখেন সীতা ঠাকুরাণী।
নদীয়ার চাঁদ বলে নদীয়া-বাসিনী ॥
জগন্নাথমিশ্র ডাকেন বাপ্ বিশ্বম্ভর।
শচীসুত নাম দিলেন অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
পণ্ডিতমণ্ডলী বলেন জগন্নাথ-সুত।
আত্মীয় স্বজনে বলেন শচীদেবীর পুত ॥
নদীয়া-কিশোরী ডাকে সুন্দর নিমাই।
কেহ কেহ বলে তাঁকে বিশ্বরূপ ভাই ॥
গৌরগোপাল নাম রাখে প্রবীণা রমণী।
নদীয়া-নাটুয়া বলে যতেক তরুণী ॥
নদীয়া-বিনোদ নামে যুবতীর রতি।
নদীয়া-নাগর বলে যত কুলবতী ॥
গৌরহরি নাম দিল বৈষ্ণব সজ্জনে।
হরিবোলা নাম রাখে সর্ব্বসাধারণে ॥
চন্দ্রশেখর নাম রাখেন নিজজন-নিঠুর।
দুখীতাপী নাম দিলা কাঙ্গালের ঠাকুর ॥

সর্ব্বজয়া নাম রাখে শচীপ্রাণধন।
নদীয়া-নাগরী বলে রমণীমোহন ॥
তৈর্থিক বিপ্র সত্যভানু উপাধ্যায়।
গৌরাঙ্গগোপাল নাম ধ্যানেতে ধেয়ায় ॥
যাদব রাখিলেন নাম গৌরাঙ্গ-বোনাই।
যাদবের বংশে বলে ঘরের জামাই ॥
একাদশী-তত্ত্ব-সার বলেন জগদীশ।
প্রতিবেশী নারী বলে বিষ্ণুপ্রিয়াধীশ ॥
হিরণ্য রাখেন নাম বাল-নারায়ণ।
শুক্লাম্বর নাম রাখেন সত্য সনাতন ॥
বংশীবদন নাম রাখেন গৌরবংশীধারী।
গৌর-বনয়ারী বলেন নকুল ব্রহ্মচারী ॥
নদীয়ার রাজা বলে ধনী মহাজনে।
পণ্ডিত নিমাই বলে পড়ুয়ার গণে ॥ *
গৌরকৃষ্ণ নাম দিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
নিত্যানন্দের প্রিয়নাম নবদ্বীপচন্দ্র ॥
কাঞ্চনাদি সখি ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
গদাধর বলেন গোরা মোর প্রাণনাথ ॥
শ্রীবাস রাখিলেন নাম উদ্ধতশিরোমণি।
মুরারি রাখিলেন নাম দুষ্ট চূড়ামণি ॥
ঠাকুর হরিদাস ডাকেন অগতির গতি।
সর্ব্বলোকে বলে গোরা জগতের পতি ॥
কীর্ত্তন-লম্পট-গুরু নরহরি ডাকে।
জগতের গুরু গোরা বলে সর্ব্বলোকে ॥
কৃষ্ণচৈতন্য নাম রাখেন কেশব ভারতী।
কেশবকাশ্মিরী ডাকে সরস্বতী-পতি ॥
শ্রীধর রাখিল নাম ঠাকুরের ঠাকুর।
বাপের ঠাকুর নাম দিল কবিকর্ণপুর ॥
মহাপ্রভু বলে সর্ব্ব ভকতমণ্ডলী।
বাসুদেব ঘোষ ডাকেন গৌর-বনমালি ॥
বিদ্যানিধি নাম রাখেন রাধাকান্তিধারী।
মুকুন্দের প্রিয় নাম গৌরাঙ্গ-মুরারি ॥
গৌরগোপাল নামে পূজে সেন শিবানন্দ।
গোরাচাঁদ নাম রাখে শ্রীনয়নানন্দ ॥
শঙ্কর রাখিল নাম নবদ্বীপ-ইন্দু।
ব্রহ্মচারী নাম রাখে করুণার-সিন্ধু ॥

দেবানন্দ নাম রাখেন অপরাধভঞ্জন।
গোবিন্দ রাখিল নাম গৌর-নিরঞ্জন ॥
মানভঞ্জন রসরাজ কৃষ্ণপ্রেমগুরু।
জগদানন্দের প্রিয় নাম বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
মুকুন্দ সঞ্জয় ডাকে গৌর রাজপুত্র।
চাঁদকাজি নাম রাখে সর্ব্ব লোকমিত্র ॥
বুদ্ধিমন্ত নাম দিলা রাজরাজেশ্বর।
শচীর ছাওয়াল বলে ইতর নারী-নর।
নদীয়ানন্দ নাম রাখে নদীয়ার নারী।
নন্দন আচার্য্য ডাকেন গৌর-বনচারী ॥
জগাই মাধাই ডাকে পতিতপাবন।
অগতির গতি আর অধমতারণ ॥
জীবের জীবন গোরা বলে সাধুজনে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণগৌর ডাকে ভক্তগণে ॥
নদীয়া পণ্ডিত বলে তর্কচূড়ামণি।
বিদ্যাসাগর নাম দিলা অদ্বৈত গুণমণি ॥
বক্রেশ্বর নাম রাখেন নৃত্যগোপাল।
বেঙ্কটভট্টের প্রিয় নাম শ্রীগৌরাঙ্গলাল।
রামানন্দের প্রিয় নাম গৌর-গোবিন্দ।
রসরাজ মহাভাব প্রেমানন্দ-কন্দ ॥
সার্ব্বভৌম নাম রাখেন গৌরনারায়ণ।
সাটির মা রাখিল নাম অমোঘউদ্ধারণ ॥
স্বরূপ রাখিলেন নাম রাধা অবতার।
ব্রজগোপীশ্রেষ্ঠভাব প্রেমরসসার ॥
প্রকাশানন্দের প্রিয় নাম কপটসন্ন্যাসী।
রসিক ভকতে বলে যুগলবিলাসী ॥
বর্ণ-চোরা নাম দিলা সাধক সকলে।
বিবর্ত্তবিলাস গোরা সিদ্ধগণে বলে ॥
শ্রীরূপ রাখিলেন নাম ব্রজরসসার।
সনাতন দিলেন নাম গোপীকণ্ঠহার ॥
প্রতাপরুদ্রত্রাতা নাম বিখ্যাত জগতে।
অটল বিশ্বাস তাঁর সচল জগন্নাথে।
পুরী গিরি ভারতীর অতি প্রিয় নাম।
নরনারায়ণ আর গৌরপ্রেমধাম ॥
গোপালভট্ট নাম রাখেন রাধাকান্তি চোর।
রঘুনাথের প্রিয় নাম ভাবনিধি গৌর ॥
শ্রীজীবগোসাঞি বলেন সর্ব্ব তত্ত্বসার।
অবতারী গৌরহরি সিদ্ধান্ত যাঁহার ॥
ভট্টগোসাঞি নাম রাখেন স্বয়ং ভগবান।
রূপের সাগর বলে যত রূপবান ॥
রাঘব পণ্ডিত বলে আচারী গৌরাঙ্গ।
সদাচার যাঁর গৃহে কভু নহে ভঙ্গ ॥
বাচস্পতি নাম রাখেন প্রিয়দরশন।
নাগর ঈশান বলে পৈতাছেঁড়া-ধন ॥
দণ্ডগ্রাহী নাম দিলা পণ্ডিত দামোদর।
নন্দন আচার্য্য বলে সর্ব্ব গুণাকর ॥
অচ্যুতানন্দ নাম রাখেন তত্ত্বের অবধি।
কৃষ্ণমিশ্রের প্রিয় নাম গৌর গুণনিধি ॥
জাতিনাশা বিপ্র বলে যতেক ব্রাহ্মণ।
নবশাখে নাম দিলা সত্যনারায়ণ ॥
যবনে রাখিল নাম হিন্দুর জিন্দাপীর।
কীর্ত্তনীয়া নাম দিলা নাদ-গম্ভীর ॥
পুরীবাসী নাম দিলা মূর্ত্ত জগন্নাথ।
কাশীবাসী সবে ডাকে জয় বিশ্বনাথ।
ব্রজবাসী নাম রাখে কলিযুগকৃষ্ণ।
গোস্বামিচরণ বলেন পরতত্ত্বইষ্ট ॥
ঠাকুর কানাই ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি।
রঘুনন্দনের প্রিয় নাম ধূর্ত্ত ছন্ন যতি ॥
অন্তর্য্যামি নাম দিলা পণ্ডিত রামাই।
শ্রীনিধি রাখিল নাম গৌরাঙ্গ গোসাঞি ॥
তৈর্থিক ব্রাহ্মণ সত্যভানু উপাধ্যায়।
গৌরাঙ্গ-গোপাল নামে মত্ত অতিশয় ॥
দ্বিজ বলরাম ডাকেন বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
গৌরাঙ্গ কিশোরে করেন কোটী প্রণিপাত ॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ মধুময় নাম।
মহাতুষ্ট এই নামে গৌরগুণধাম ॥
সিদ্ধ চৈতন্যদাসের এই প্রিয় নাম।
দাস হরিদাস করে দিবানিশি গান ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
কলিহত জীবে প্রভু কর আত্মসাত ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপা প্রাপ্তি-অভিলাষ।
অষ্টোত্তর-শতনাম গায় হরিদাসী ॥

সখি অমিতা এই অষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রটি শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া দীনা দাসীটিকে কত না আশীর্ব্বাদ করিলেন। সখি কাঞ্চনা তাঁহার দীনা দাসীটির প্রতি পুনরায় কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া ইঙ্গিতে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। দীনা দাসীটি দূর হইতে গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া ভয়ে ভয়ে করযোড়ে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া পুনরায় ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে মহা ভীতভাবে দাঁড়াইলেন। সখি কাঞ্চনা তখন তাঁহাকে আদর করিয়া নিকটে বসিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু দীনা দাসীটি এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই রহিলেন—তাঁহার দরদরিত নয়নাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে—বদনে কোন কথাই নাই—প্রেম-বিস্ফারিত নয়নে তিনি গুরুপাদপদ্ম দর্শন করিতেছেন এবং অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে দু' একটী আশীর্ব্বাদ-বাক্যসুধা পান করাইলেন। তিনি বলিলেন—"তোমার দ্বারা প্রভুপ্রিয়াজি শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগল-ভজন প্রচার করাইবেন—তোমার যথেষ্ট শ্রীগুরুবল আছে,—ভজন কর,—তোমার প্রতি প্রিয়াজি বড়ই প্রসন্ন—তোমার রচিত পদগুলি তিনি পরমানন্দে শ্রবণ করেন—তুমি তাঁহার একটী চিহ্নিতা দাসী।" ইত্যাদি।

দীনা দাসীটি সখিরূপা গুরুমুখে এই সকল আত্মপ্রশংসা-কথা শুনিয়া আত্মগ্লানিতে অধীর হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। শ্রীগুরুচরণ-যুগল দু'টি হস্তে বক্ষে ধারণ করিয়া ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সখি অমিতাকেও তৎপরে তদ্রূপ ভাবেই তিনি প্রণাম করিলেন।

এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্তচূড়াবলম্বী—গোধূলি সময়—বিস্তৃত গঙ্গাতীরে শতশত সবৎসা গাভী দল লইয়া নদীয়ার রাখাল বালকগণ গৃহে ফিরিতেছে। তাহাদের খুরোত্থিত ধূলিপটলে নদীয়া-গগন আচ্ছাদিত—অতি বৃদ্ধ ঈশান গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা দর্শন করিতেছেন আর মৃদু প্রেমগদগদকণ্ঠে উত্তর-গোষ্ঠের একটি প্রাচীন পদ গাইতেছেন—

যথারাগ।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)

—"হ্যাদে হে নাগরবর, শুন হে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায় হে।
চরণ-নখর মণি, জনু চান্দের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায় হে।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যখন তুমি যাও হে রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে হে।
মনে বলে সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রৈল তুঁয়া পানে চাঞা হে।
(যখন) তুঁয়া বন্ধু পড়ে মনে, চাহি কাল মেঘ পানে,
(আবার) চাহি বৃন্দাবন পানে, ধারা বহে দু'নয়নে,
এলাইলে কেশ নাহি বান্ধি হে।
রন্ধন শালাতে যাই, তুয়া বঁধুর গুণ গাই,
ধুমার ছলনা করি কান্দি হে॥
মণি নও মাণিক্য নও, যে আঁচলে বান্ধিয়ে রও,
(যে হিয়ায় পরিলে রও)
ফুল নও যে কেশে করি বেশ হে।*
নারী না করিত বিধি, তুঁয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ হে॥
অগুরু চন্দন হৈতাম, শ্যাম-অঙ্গে মাখা রৈতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায় হে।
কি মোর মনের সাধ, বামনের চান্দে হাত,
বিহি কি হে পুরাবে আমার হে।
নরোত্তম দাসে কয়, তোমার বিচিত্র নয়,
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া হে।
যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ পরাণ যাবে,
সেই দিনে দিও পদছায়া হে॥"—

পদকল্পতরু।

বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার দৈনন্দিন নির্জ্জন ভজন শেষ করিয়া দ্বার খুলিবা মাত্র ভজন-মন্দিরের বাহিরে আসিয়াছেন। আসিবামাত্র এই মধুর ভাবের শ্রীরাধিকার উক্তি পদটীর মধুর গান তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—তিনি ব্রজভাবাবেশে বিভোরভাবে তন্ময় হইয়া গানটী শুনিতেছেন,—এমন সময়ে সেখানে তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরহিণী গৌর-বল্লভার সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া গান শুনিতেছেন। গায়ক বৃদ্ধ ঈশানের কণ্ঠস্বর তাঁহার সুপরিচিত—কিন্তু তিনি এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না—গানটীর প্রতি শব্দ তাঁহার কানের মধ্যে

গিয়া যেন বাসা করিল—গানটীর শব্দবিন্যাসের ছটায় মধুর ভাবে বিভাবিত হইয়া উত্তর-গোষ্ঠের পূর্ব্ব-লীলা-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত করিল, তিনি ব্রজভাবে বিভোর হইয়া অভিন্ন শ্রীরাধিকার ভাবে মনে মনে ভাবিতেছেন—

—"শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে, যখন তুমি যাও হে রঙ্গে,
তখন আমি দু'য়ারে দাঁড়ায়ে হে।
মনে বলে সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রৈল তুয়া পানে চাঞা হে॥"—

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা গৌর-বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তাৎকালিক মনভাব বুঝিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় বসাইলেন। তিনি প্রেমাবেশে অঙ্গ এলাইয়া দিয়া সখি-ক্রোড়ে শায়িত হইলেন। তখন প্রিয়াজির অর্দ্ধবাহ্যভাবাবস্থা—তিনি অস্ফুটস্বরে প্রেম গদগদকণ্ঠে কহিতেছেন—

—"যে দিন তোমার ভাবে, আমার এ পরাণ যাবে,
সেই দিনে দিও পদ ছায়া হে।"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভার মনে আজ যে কি ভাবের উদয় হইয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছেন না। মর্ম্মী সখিদ্বয় অন্তর্যামিনী—তাঁহারা সকলই জানেন—সকলই বুঝেন—কিন্তু তাঁহাদেরও মনের ভাব অব্যক্তভাবেই মনের মধ্যে খেলা করিতেছে,—তাহা প্রকাশের যোগ্য নহে।

বৃদ্ধ ঈশান আপন ভাবেই মগ্ন আছেন। তিনি যে ব্রজ-রসরসিক প্রেমিক পুরুষ এবং মধুর রসের রসিক ভক্ত-চূড়ামণি, তাহা এত দিন কেহই জানিতেন না—তাঁহার শুদ্ধ দাস্যভাবের অভিব্যক্তিই বাহ্যে প্রকাশ পাইত—অন্তরের ভাব ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তরে অন্তরেই খেলিত। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের দুটী ভাব-কদম্বে দেহমন ও প্রাণ সুগঠিত—একটী বাহ্য,—আর অপর ভাব-কদম্ব-পুষ্প-পরিশোভিত হৃদি নিকুঞ্জে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুগল-ভজনানন্দ অনুভব করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর থাকেন। নিত্যপার্ষদ ভক্তগণ সর্ব্ববিধ ভাবরাজ্যেই বিচরণশীল—তাঁহারা সর্ব্বভাবের ভাবযুক্ত সিদ্ধদেহে ভূতলে আবির্ভূত হন, এবং পরমাদ্ভুত ও চমৎকারিতাপূর্ণ লীলারঙ্গ প্রকট করেন। বিষ্ণুবৈষ্ণবের অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ উভয় ভাবেই ভক্তগণের পরমাস্বাদ্য।

ঈশানের উপরিউক্ত গানটি শেষ হইলে তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—ব্রজভাবাবেশে তিনি প্রেমাবেগে পুনরায় গান ধরিলেন—তাঁহার নয়নে প্রেমধারা বহিতেছে—বদন-মণ্ডল প্রফুল্ল।

রাগ ভাটিয়ারী।

—"চান্দ-মুখে দিয়া বেণু, নাম লৈয়া সব ধেনু,
ডাকিতে লাগিলা উচ্চৈঃস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু, ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু রব, বুঝিয়া রাখাল সব,
আসিয়া মিলিল নিজ সুখে।
যে ধেনু যে বনে ছিল, ফিরিয়া একত্র হৈল,
চালাইলা গোকুলের মুখে॥
শ্বেত কান্তি অনুপম, আগে ধায় বলরাম,
আর শিশু চলে ডাইন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে,
তার মাঝে নবঘন শ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গো-ক্ষুর রেণু,
পাছে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
বলরামদাস চলু সঙ্গে॥"— পদকল্পতরু।

সন্ধ্যাকালে গোধুলি সময়ে বিরহিণী প্রিয়াজি মর্ম্মী সখিদ্বয় সহ ঈশানের এই গান শুনিয়া ব্রজ-প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীশ্রীবসন্ত-পঞ্চমী
শ্রীধাম নবদ্বীপ, ১৭ই মাঘ,
সোমবার, সন ১৩৩৯।

(৩৫)

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই জনে নিভৃতে পরামর্শ করিয়া এক দিন বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে গৌরলীলার পূর্ব্বাভাস প্রাচীন মহাজনী পদাবলীর গান শ্রবণ করাইবার প্রস্তাব করিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাঁহার সংখ্যানাম জপ শেষ করিয়া অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবিতেছেন—তাঁহার সম্মুখে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-মূর্ত্তির চিত্রপট —তাঁহার প্রাণ-বল্লভের পাদুকাদ্বয় তাঁহার বক্ষে--তিনি যেন গভীর ধ্যান-মগ্না। এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল—পরে অকস্মাৎ তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল—তিনি চমকিত ও বিস্মিতভাবে তাঁহার মর্ম্মী-সখিদ্বয়ের প্রতি একবার চাহিলেন—এ চাহনির মর্ম্ম যেন তিনি কোন নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ গুপ্ত-কথা—মর্ম্মী-সখিদ্বয়কে কহিবেন—বলি বলি করিতেছেন অথচ বলিতে পারিতেছেন না—তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাবে তাঁহার এই গুপ্ত মন-ভাবটি যেন পরিস্ফুট রহিয়াছে। সুচতুরা মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাদের প্রিয়সখির মনের এই নিগূঢ় ভাবটি বুঝিয়াছেন—কারণ বিরহিণী গৌর-বল্লভার হৃদি-সমুদ্রে যখন যে ভাবতরঙ্গটি উঠে—তাহার ঘাত প্রতিঘাত লাগে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হৃদয়ে—এবং তাহাতেই তাঁহারা বুঝিতে পরেন—তাঁহাদের প্রিয়তমা সখির অন্তরে কি ভাবের কিরূপ তরঙ্গটি উঠিয়াছে। তাঁহারা গৌর-বল্লভার কায়ব্যূহ,—তাঁহারাও তাঁহার অন্তর্য্যামিনী।

সখি কাঞ্চনা তখন সময় বুঝিয়া গৌরলীলার পূর্ব্বাভাসের একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"নিধুবনে দুঁহুজনে, চৌদিকে সখিগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গৌরবরণ।
কিবা তার রূপ ঠাম, জিনি কত কোটি কাম,
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রুকম্প পুলকাদি ভাব-ভূষা নিরবধি,
নাচে গায় মহা মত্ত হৈয়া।
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি,
মন ধায় তাহারে দেখিয়া॥
নব জলধর রূপ, রসময় রস-কূপ,
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত,
কহ নাথ! ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে স্থিরপিত মন, না হইল কদাচন,
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত,বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর।"

পদকল্পতরু।

মর্ম্মী-সখি-মুখে এই গানটি শুনিবামাত্র বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার প্রিয় সখি কাঞ্চনার ক্রোড়ে প্রেমমূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন! তখন দুই সখি মিলিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রিয়াজির মূর্চ্ছা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না—গৌর-নাম-গানে তাঁহার বাহ্য-জ্ঞান হইলে, তিনি সখি-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রেমবাষ্পাকুল-লোচনে দুটি হস্তে সখি কাঞ্চনা ও অমিতার গলদেশ পরম প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিয়া মাত্র দুটি কথা অতি মৃদুস্বরে কানে কানে বলিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রিয় সখি! প্রাণসখি! শ্রীরাধিকার এই কথাগুলি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কি বলিলেন?"

তখন সখি কাঞ্চনা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন।

যথারাগ।

—"শুনইতে রাই, বচন অধরামৃত,
বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাব প্রকাশিতে,
ধনী অনুমতি ভেল জান॥
সুন্দরি! যে কহিলে গৌর-স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনা
মোহে করবি হেন রূপ॥ ধ্রু॥

কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহু ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহব না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে,
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয়॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা,
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়,
না ভজিনু মুঞি নরাধম॥"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা স্থিরভাবে অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তাঁহার মনের নিগূঢ় কথাগুলি ও তাঁহার এই অত্যদ্ভুত বাসনাত্রয় শুনিলেন—তিনি যেন কোন এক মহা ভাব-সমুদ্রের অতলস্পর্শ সলিলে ডুবিয়া আছেন—কোন কথা তাঁহার মুখে নাই—কেবল তাঁহার প্রেমাশ্রুবিগলিত কমলনয়নদ্বয় সখি কাঞ্চনার বদনে ও নয়নে যেন লিপ্ত হইয়া আছে—তাঁহার এই চাহনির মর্ম্ম ও ভাব—"প্রাণ সখি! তার পর শ্রীমতি বৃষভানুনন্দিনী কি বলিলেন?"

তখন সখি কাঞ্চনা তাঁহার কলকণ্ঠে আর একটী শ্রীরাধিকার উক্তি প্রাচীন পদরত্নের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"বঁধু হে! শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুঁহু ব্রজ-জীবন, তুয়া বিনু কৈছন,
ব্রজপুর বাঁধব থেহা॥
জল বিনু মীন, ফনী মণি বিনু,
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন,
ব্রজপুর গতি তুঁহু জান॥
সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি,
পাওবি কোনহি সুখ।
কিয়ে আন জন, তুয়া মরমহি জানব,
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক॥
বৃন্দাবন কুঞ্জ, নিকুঞ্জহি নিকসবি,
তুহু বর নাগর কান।
অহনিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব,
তেজব সবহুঁ পরাণ॥
অগ্রজ সঙ্গে, রঙ্গে যমুনা তটে,
সখা সঞে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি,
না বুঝয়ে বলরাম দাস॥"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা এখনও সখি-ক্রোড়ে শায়িতা—তাঁহার কেশদাম আলুলায়িত—পরিধান বসন অসম্বর—কমল নয়নে প্রেমাশ্রুধারা—তিনি অতিশয় মনঃসংযোগের সহিত সখি কাঞ্চনার মুখে তাঁহার প্রাণ-বল্লভের পূর্ব্বলীলার মধুময় কথা শুনিতেছেন—তাঁহার কমল নয়নদ্বয় মর্ম্মী সখি কাঞ্চনার নয়নে যেন লিপ্ত রহিয়াছে—তাঁহার এই সপ্রেম চাহনির মর্ম্ম,—"সখি! তার পর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কি উত্তর দিলেন,—

তখন সখি কাঞ্চনা প্রেমগদগদ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"শুনহ সুন্দরি! মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর-প্রেম করব পরকাশ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি।
নদীয়া নগর পরে করবহু কেলি।
তনু তনু মেলি হই এক ঠাম।
অবিরত বদনে বোলব তব নাম॥
ব্রজপুর পরিহরি কবহু না যাব।
ব্রজ বিনু প্রেম না হোয়ব লাভ॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মনকাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম॥"—

এতক্ষণে বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরে ধীরে সখিক্রোড় হইতে উঠিয়া বসিলেন,—আজ তাঁহার মনে একটা বিষম খট্‌কা লাগিল—তিনি সর্ব্বজ্ঞা—তাঁহার প্রাণবল্লভের তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সকলি তিনি জানেন—তথাপিও কলির প্রচ্ছন্ন-অবতার-তত্ত্বের প্রচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য এবং গৌরলীলার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রসাস্বাদনের লালসায় কোন রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়াস পাইলেন না। তিনি তখন তাঁহার প্রেম-

বিস্ফারিত কমল নয়নে—সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন কি ভাবিতেছেন—তাঁহার এই চাহনির মর্ম্ম—"সখি তার পর বৃষ-ভানু-নন্দিনী কি বলিলেন ?"—

সখি কাঞ্চনা তখন গৌর-লীলায় পূর্ব্বাভাসের শেষ প্রাচীন পদটী গাহিলেন।

যথারাগ।

"এত শুনি বিধুমুখী, মনে হ'য়ে অতি সুখী,
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য,
সেই রূপ দেখিব হে আমি॥
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে,
অসম্ভব হইবে কেমনে!
চূড়া ধড়া কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে,
কাল গৌর হইবে কেমনে।
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে,
দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ॥
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা,
ভাব প্রেমময় সব অঙ্গ।
নিধুবনে এই ক'য়ে, দুই তনু এক হ'য়ে,
নদীয়াতে হইল উদয়।
সঙ্গেতে যে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে,
প্রেম-বন্যায় জগত ভাসায়॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন,
ব্রজবাসী সখা সখি সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ
না ভাসিলাম সে সুখ-তরঙ্গে॥"—

এই পদটি শুনিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভার হৃদি-সমুদ্রে একের পর এক নানাবিধ ভাব-তরঙ্গাবলী উত্থিত হইল,—তিনি এইরূপ অপূর্ব্ব ভাব-সমুদ্রের তরঙ্গরাজির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া বিহ্বলভাবে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তাঁহার তাৎকালিক মনের ভাবটি তিনটী কথায় ব্যক্ত হইতে পারে অর্থাৎ **"তবে আমি কে ?"** কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না—তাঁহার বদনের ভাবে,—তাঁহার নয়নের চাহনিতে মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার মনভাব বুঝিতে পারিতেছেন। উক্ত পদটিতে একটী চরণ আছে—

"নিধুবনে এই কয়ে, দু'হু তনু এক হয়ে,
নদীয়াতে হইল উদয়।"—

এই কথাতেই বিরহিণী গৌরবল্লভার মনে আরও একটি বিষয় সমস্যার উদয় হইল, **"তবে আমি কে ?"** তাঁহার এক্ষণে স্তম্ভভাবাবস্থা—মর্ম্মী সখিদ্বয় দুই জন দুই দিকে তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া আছেন—রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর—নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে এই গভীর নিশীথে মর্ম্মী সখিদ্বয়-বেষ্টিতা বিরহিণী প্রিয়াজি সখিমুখে গৌরলীলার পূর্ব্বাভাস শুনিতেছেন,—চতুর্দ্দিক নীরব, নিস্তব্ধ—সখিদ্বয় তাঁহাদের প্রিয়সখির অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত আছেন এবং মন্দ মন্দ গৌরনাম কীর্ত্তন করিতেছেন—গৌরবল্লভার বাহ্য জ্ঞান নাই—এই ভাবে কতক্ষণ গেল। অকস্মাৎ প্রিয়াজির বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিয়া সখি কাঞ্চনার বদনের প্রতি সপ্রেমাশ্রুনয়নে একবার চাহিলেন—সে চাহনির মর্ম্ম "প্রাণসখি! তুমি বল দেখি **তবে আমি কে ?"**

সখি কাঞ্চনা তখন পরম প্রেমভরে তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সখির চিবুক স্পর্শ করিয়া মৃদু হাসিয়া সাদরে ও সস্নেহে কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি আমাদের **নদীয়ার রাই**,—আর আমাদের নদীয়ার চাঁদ **ব্রজের কানাই**।" এই কথা শুনিয়াই বিরহিণী প্রিয়াজি নিজ মলিন বসনাঞ্চলে বদন ঝাঁপিয়া প্রিয়তমা সখিক্রোড়ে পুনরায় বদন লুকাইয়া শয়ন করিলেন। এখন তাঁহার নিপট্ট বাহ্যাবস্থা। সখি কাঞ্চনা তখন ঠাকুর চণ্ডীদাস রচিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-যুগল-লীলার পূর্ব্বাভাসের আর একটী অপূর্ব্ব প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাঁহার ইন্দ্র-নীল-কান্ত-তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু।
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন দেশে ছিল॥

কে বনাইল হেন রূপ খানি।
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণী ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখিগণে করে ঠারা ঠারি।
কুঞ্জে ছিল কানু-কমলিনী।
কোথা গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে ॥"—পদকল্পতরু।

বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখিক্রোড়ে বদন লুকাইয়া স্থিরচিত্তে বিশিষ্ট মনঃসংযোগের সহিত এই প্রাচীন পদরত্নটি শ্রবণান্তে সবিশেষ লজ্জিতা হইয়া মৌনভাবে বহুক্ষণ রহিলেন।

এই ভাবে কিছুক্ষণ গেল। সখি কাঞ্চনা দেখিতেছেন তাঁহাদের প্রাণসখি পুনরায় মূর্চ্ছাপন্না হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন—তখন দুই সখি মিলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন—তাঁহার বদনের বসন সরাইয়া দেখিলেন—চক্ষুদ্বয় নিমীলিত, কিন্তু নয়ন-কোনে প্রেমাশ্রু বিগলিত,—কলেবর ঘর্ম্মাক্ত—সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতেছে—হস্তপদ শীতল—নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। এরূপ অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় অতিশয় ভীত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ স্মরণ করিয়া মন্দ মন্দ গৌরনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণ,—অন্তঃপুরের অন্যান্য সখি ও দাসীবৃন্দ জাগরিত হইয়া তাঁহাদের দৈনন্দিন প্রভাতী-ভজন-গান করিতেছেন,—

যথারাগ—

—"উঠ হে নদীয়া-নাথ রজনী পোহাল।
উঠ সখি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভাত হইল ॥ধ্রু ॥
বিগলিত সুললিত দুহুঁক বিলাস।
সোঙরি কাঞ্চনাদি পরম উল্লাস ॥
অদ্ভুত অপরূপ যুগল উজোর।
রসালাপে নিশি জাগি ভোরে ঘুম ঘোর ॥
(যেন) হেম-বৃক্ষে হেমলতা রহত জড়ায়ে।
গৌরবক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া হরিষে ঘুমায়ে ॥
অরুণ উদিত প্রায় পূরব গগণে।
ভ্রমরা ঝঙ্কারি ধায় কমলেরই বনে ॥
শুক পিক ফুকারত জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
ময়ূরের কেকা রবে চাহে চমকিয়া ॥
অলসে অবশ তনু উঠন না যায়।
দৃঢ় ভুজদণ্ডে বান্ধি আলিস তেজয় ॥
কতক্ষণে দুহুঁ জনে উঠিয়া বৈঠল।
(প্রিয়ার) বিগলিত কেশ গোরা যত্নে বান্ধি দিল ॥
(মরি যাইরে প্রেমের বালাই ল'য়ে)
(কত ছান্দে কেশ বান্ধে)
দুহু মুখে দুহুঁ জন ঘনই চুম্বন।
বিচ্ছেদ সোঙরি প্রিয়া করয়ে রোদন ॥
কান্দি বলে "প্রাণনাথ! মুঞি অভাগিনী।
এত ভাগ্য বিধি মোর রাখিবে কি জানি ॥"
(তবে) হাসি গোরা বলে "প্রিয়ে! তুহু মোর প্রাণ।
তুহুঁ বিনা এজগতে নাহি জানি আন ॥
প্রিয়ে! নিখিলের যত নিধি তুহুঁ তারই সার।
তুহুঁ মোর নয়নমণি হৃদি-ফুল হার ॥"
(মোরে ব্যথা দিতে কেন প্রিয়ে! কাঁদ তুমি)
গবাক্ষ আড়ালে রহি সব সখিগণ।
কর্ণ তৃপ্ত করি শুনে প্রেম-আলাপন ॥
(তখন) রঙ্গ হেরি কোন সখি হাসিয়া উঠিল।
সখি আগমন জানি (প্রিয়া) লজ্জিত হইল ॥
ত্বরিতে ঘুঙটা দেই মিলিল সখিরে।
সখিগণ তবে পুছে বিলাস-ব্যাপারে ॥
লাজে লজ্জিতা প্রিয়া রহে মৌন ধরি।
রঙ্গিনী কহত ইহ প্রিয়াক' চাতুরী ॥
এই মত নিত্য নব বিচিত্র বিলাসে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাসী হেরে মনের হরিষে ॥"—

অন্তঃপুরবাসিনী সখি ও দাসীবৃন্দের এই মধুর প্রভাতী কীর্ত্তনধ্বনি বিরহিণী প্রিয়াজির নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের কর্ণ-কুহরে যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে—এত দুঃখের মধ্যেও তাঁহারা এই প্রভাতী কীর্ত্তন শ্রবণে মনে মনে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। একই সময়ে যুগপৎ হর্ষবিষাদের এই অত্যদ্ভুত অনুভবটি একসঙ্গে বিষামৃতপানবৎ বোধ হইতেছে—তপ্ত ইক্ষু

চর্ব্বণের সুখ ও দুঃখানুভূতির পরিপূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ গত হইলে বিরহিণী প্রিয়াজির প্রেম-মূর্চ্ছা অকস্মাৎ ভঙ্গ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইল। তিনি এতক্ষণ প্রেমমূর্চ্ছাবস্থায় নিচেষ্টভাবে সখিক্রোড়ে শায়িত ছিলেন—কোন প্রেমরাজ্যে তিনি যে কি ভাবে বিচরণ করিতেছিলেন—তাহা তিনিই জানেন, আর তাঁহার অন্তর্য্যামিনী মর্ম্মী সখিদ্বয়ই জানেন। গৌর-বল্লভার প্রেমমূর্চ্ছা ভঙ্গের পরক্ষণ হইতেই দিব্যোন্মাদ-দশার লক্ষণ সকল একে একে দৃষ্ট হইতে লাগিল। গৌরপ্রেমাবেগে তিনি নিজেই উঠিয়া বসিলেন এবং মর্ম্মী সখিদ্বয়ের প্রতি কুটিল কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপ করিয়া উন্মাদিনীর স্থায় হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন—"বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ আমার কে? আমার প্রাণবল্লভ নবদ্বীপচন্দ্র কোথায় গেলেন? তিনি যে এই মাত্র আমার সঙ্গে কত না বিলাস-বিভ্রমযুক্ত রসকেলিরঙ্গ করিতেছিলেন—আমি হতভাগিনী এখন আর যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না—সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! আমার প্রাণবল্লভ কোথায় গেলেন? তাঁহার স্থানে আমার নিকটে গোপবেশ-বেণুকর-পীতবসন-মুরলিধারী নন্দকুলচন্দ্র গোপীজনবল্লভকে দেখিতেছি। নন্দনন্দন কৃষ্ণ আমার কে? তাঁহার অলৌকিক ও অত্যদ্ভুত অপরূপ-রূপ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে আমার মনপ্রাণ আজ এত ব্যাকুল হইল কেন? প্রাণ সখিরে! এতকাল পরে আজ আমার একি দশা হইল।"

এই বলিয়া অতিশয় লজ্জায় ও অত্যন্ত মনঃক্ষোভে বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার ভজন-মন্দিরের ভূমিতলে পড়িয়া অঙ্গ আছাড়িয়া আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার করুণ ক্রন্দনে কাষ্ঠপাষাণ দ্রব হইতে লাগিল—স্থাবর জঙ্গম অস্থির হইয়া উঠিল। তখন মর্ম্মী সখিদ্বয় মহা বিপদে পড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণ স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রাণসখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

সুচতুরা সখি কাঞ্চনা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আর একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন,—

—"জয় নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুর-মুনিগণ-মনমোহন-ধাম॥
জয় নিজ কান্তা— কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী— লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন
প্রেম বর্দ্ধন-নবঘন-রূপ।
জয় রাসাদি সুন্দর প্রিয় সহচর
জয় জগমোহন গৌর অনুপ।
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ-আনন্দ।
জয় জয় সজ্জনগণ ভয়-ভঞ্জন
গোবিন্দদাস আশ অনুবন্ধ॥"—

পদকল্পতরু।

দিব্যপ্রেমোন্মাদিনী বিরহিণী গৌরপ্রিয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়াই এই পদটি শ্রবণ করিলেন এবং কিছু কিছু রস আস্বাদনও করিলেন। "নন্দনন্দন গোপীজন-বল্লভ রাধা-নায়ক নাগর শ্যাম-ই যে "শচী-নন্দন নদীয়া-পুরন্দর সুর-মুনিগণ মনমোহন ধাম" তাহাও তখন তিনি বুঝিলেন। কিন্তু তাঁহার মন যে ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না—এ তত্ত্ব জানিয়াও মানিতেছে না—তিনি যেন নিদারুণ মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্টে অতলস্পর্শ অগাধ দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত আছেন। কিছুক্ষণ তিনি নীরবে কি চিন্তা করিলেন—পরে বল পূর্ব্বক মর্ম্মী সখিদ্বয়ের হাত ছাড়াইয়া উন্মাদিনীর স্থায় একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তৎক্ষণাৎ তাঁহা[র] সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দুইজনে দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাহুবেষ্টনে তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। দিব্যোন্মাদিনী গৌরবল্লভা তাঁহার নিজ ক্ষীণ বাহুযুগলে পরম প্রেমভরে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের কণ্ঠদেশ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া মহোৎকণ্ঠার সহিত প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে সখি কাঞ্চনার মলিন ও বিষাদভরা বদনের প্রতি চাহিয়া করুণ হইতেও সকরু[ণ] ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন—"প্রাণ-সখি কাঞ্চনে! তোমা[র] গান শুনিয়া আজ আমার একি দশা হইল? নন্দ-নন্দ[ন] কৃষ্ণচন্দ্র আমার ইষ্টদেব—ভজন-ধন। শচীনন্দন গৌর হরি আমার প্রাণবল্লভ,—হৃদয়ের ধন—প্রাণেশ্বর। আমা[র]

পাপ মন আজ শ্যামরূপে মুগ্ধ হইল কেন? আমি যে সধবা সতিসাধ্বী ব্রাহ্মণকুমারী। বৃন্দারণ্যবাসী গোপকুমারের সহিত আমার প্রেম-সম্বন্ধ কিরূপে সম্ভব? কালরূপে আমার মন মজিল কেন সখি? তবে আমি কি দ্বিচারিণী হইলাম? এখন আমার মরণই মঙ্গল'! এই কথা বলিতে বলিতে সখিদ্বয়ের প্রেমালিঙ্গিত হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক মুক্ত হইয়া নিজ শিরে বিষম করাঘাত করিয়া অঙ্গ আছড়াইয়া তিনি পুনরায় ভূমিতলে নিপতিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ শিরে করাঘাত করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিতে লাগিলেন—

—"মরিব মরিব আমি নিশ্চয় মরিব।
গোরা হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পড়িব।
গোরা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব॥"—

মর্ম্মী সখিদ্বয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিদারুণ মনস্তাপের সহিত তাঁহাদের বিরহিণী প্রিয়াজির অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ দিব্যোন্মাদিনী গৌরবল্লভার অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল—দিব্যোন্মাদ-দশা হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি দশমী-দশাগ্রস্থা হইলেন। তিনি তাঁহার ভজন-মন্দিরের অভ্যন্তরে ভূমিতলে জড়বৎ পড়িয়া আছেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিস্পন্দ চক্ষুদ্বয় নিমীলিত—শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে কি না বুঝা যাইতেছে না—সখি অমিতা তাঁহার নাসিকারন্ধ্রে তুলা দিয়া দেখিতেছেন, আর "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ! এ কি করিলে?" বলিয়া শিরে করাঘাত করিতেছেন। গৌর-বল্লভার অকস্মাৎ এই ভাব বিপর্য্যয়ে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের মনে বিষম আশঙ্কার সৃষ্টি হইল। তাঁহারা দুই জনে মিলিত হইয়া সমস্বরে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা প্রিয়াজির কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে গৌরনাম শুনাইতে লাগিলেন।

এক্ষণে প্রভাতের পূর্ব্বক্ষণে নদীয়ার প্রভাতী কীর্ত্তনের দল আসিয়া বহির্দ্বারে কীর্ত্তন করিতেছে।

—"ভজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া কহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
লহ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম রে।
(নিতাই বলে রে,)
যে জন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজে
সে হয় আমার প্রাণ রে॥"—

তখনও নদীয়ার মহাগম্ভীরা-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ—কিন্তু মর্ম্মী সখিদ্বয়ের আত্যান্তিক সেবা সুশ্রূষার ফলে প্রেম-সমাধিপ্রাপ্তা গৌরবিরহিণী প্রিয়াজির কথঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইয়াছে—তিনি অঙ্গমোড়া দিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার বদনে ও নয়নের জলের ছিটা তখনও দিতেছেন—ক্রমশঃ তিনি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মর্ম্মী সখিদ্বয় অত্যন্ত মর্ম্মবেদনায় নিপীড়িতা—নয়নজলে তাঁহাদের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। এই দেখিয়াই গৌর-বল্লভা পুনরায় নয়ন মুদ্রিত করিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল। অতঃপর তিনি আপনা আপনিই ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন—নিজের পরিধানবস্ত্র নিজেই সম্বরণ করিলেন। এখন তাঁহার বাহ্যাবস্থা—তিনি প্রকৃতিস্থা হইয়া মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিলেন। এই চাহনির মর্ম্ম "সখি! মরণ ত আমার হইবে না,—আমি যে মহা পাপিয়সী"। বিরহিণী প্রিয়াজির কমল নয়নের চাহনিতে তাঁহার মর্ম্মস্তলের মর্ম্মান্তিক গৌরবিরহ-বেদনার সূচীভেদ্য যন্ত্রনা সমূহ পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে,—মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহার শরীরের ও মনের অবস্থা দেখিয়া বিষম শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হইলেন এবং কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এখন গৌর-বল্লভার বাহ্যাবস্থা—তিনি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা মর্ম্মী সখিদ্বয়ের দুঃখে আন্তরিক দুঃখ পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—তিনিই ত তাঁহাদের এই দুঃখের মূল কারণ—এই কথাটি ভাবিতে ভাবিতে বিরহিণী গৌরবল্লভা নিজ দুঃখ ভুলিয়া গিয়া সখিদ্বয়ের দুঃখে বড়ই ব্যথিত হইলেন। এরূপ মনের অবস্থায় ভাল মন্দ হিতাহিত বিচার থাকে না। তিনি তখন তাঁহার দুটী ক্ষীণ বাহু প্রসারণ করিয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতার কণ্ঠদেশ পরম প্রেমভরে জড়াইয়া ধরিয়া নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রেম-গদগদ বচনে কহিলেন—"প্রাণসখি কাঞ্চনে! প্রিয়সখি অমিতে! তোমাদের দুঃখ আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না—আমার দুঃখ অপেক্ষাও তোমাদের দুঃখ আমি অধিকতর মনে করি। এই হতভাগিনীর সঙ্গিনী হইয়াছ বলিয়াই তোমাদের এত দুঃখ প্রাণসখি! অনেক বিবেচনা করিয়া আমি আজ তোমাদের নিকট আমার প্রাণের কথা বলিতেছি। আমার মত মন্দভাগিনীর

সঙ্গগুণেই তোমাদের ভাগ্যও সর্ব্বতোভাবে মন্দ হইয়াছে,—অতএব এক্ষণে আমার মত অভাগিনীর সঙ্গ তোমাদের সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।"

এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে বিরহিণী গৌর-বল্লভার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি পুনরায় মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সখিমুখে এরূপ নিদারুণ প্রাণঘাতী কঠোর বাক্য জীবনে কখন শুনেন নাই—শুনিবার দুর্ভাগ্যের কথা স্বপ্নেও কখনও ভাবেন নাই। অদ্য তাঁহাদের মস্তকে যেন সহসা বজ্রাঘাত পড়িল—তাঁহাদের কোমল হৃদয় দুঃখে ও ক্ষোভে শতধা বিদীর্ণ হইল। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্বধন প্রাণসখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা নিজ দুঃখ ভুলিয়া গিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন—তাঁহাদের মলিন বসনাঞ্চলে নিজ বদন লুকাইয়া বালিকার মত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেছেন এরূপ প্রাণঘাতী নির্ম্মম কঠিন বাক্য পরম স্নেহবতী ও সখি-সুখদাত্রী গৌরবল্লভার মুখে কি করিয়া আসিল? তিনি কি বাস্তবিকই পাগলিনী হইয়াছেন? এ কি তাঁহার প্রলাপ-বাক্য? এইরূপ ভাবের প্রশ্নের পর প্রশ্ন সকল স্বতঃই তাঁহাদের কুসুমকোমল হৃদয়ে বারম্বার উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সখির মূর্চ্ছাবস্থার প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রেই তাঁহারা নিজ দুঃখ সকলই ভুলিয়া যাইতেছেন ও তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতেছেন। এক্ষণে অরুণোদয়ের পূর্ব্বক্ষণ—কিন্তু নদীয়ার গম্ভীরা মন্দিরাভ্যন্তরে আবদ্ধা গৌরবিরহিণীত্রয়ের সে জ্ঞান নাই—তাঁহারা ভাবিতেছেন এখন গভীর রাত্রি-কাল। প্রভাতীকীর্ত্তনের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা উভয়ে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং ভূমি-শয্যাশায়িনী বিরহিণী গৌরবল্লভার কর্ণমূলে গৌরনাম শুনাইতে লাগিলেন। এইরূপ করিতে করিতে প্রিয়াজির মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল—তিনি ধীরে ধীরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন—তাঁহার তাৎকালিক বদনের ভাবেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয়খানি যেন অতিশয় দুঃখে, ক্ষোভে, মনঃকষ্টে ও অনুতাপানলে দগ্ধীভূত এবং ভস্মীভূত হইতেছে। মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি তিনি চাহিতে পারিতেছেন না। তখন সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহাদের প্রিয়তমা সখির হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে উঠাইলেন—নিজ নিজ বসনাঞ্চলে প্রাণসখির অশ্রুসিক্ত মলিন বদনখানি মুছাইয়া দিয়া মৃদুমধুর বচনে কহিলেন—"প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি একটু মনস্থির করিয়া বল দেখি গৌরলীলার পূর্ব্বাভাসের পদাবলী শ্রবণে অকস্মাৎ তোমার মনে এমন কি গুরুতর মর্ম্মান্তিক ভাবের উদয় হইল যে তুমি তোমার প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলে? আমরা তোমার চরণে শত অপরাধিনী—কি বলিতে কখন কি বলিয়াছি—কি করিতে কি করিয়াছি—আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর সখি! তুমি সখি! মন স্থির কর—সুস্থ হও। ঐ দেখ প্রভাত হইয়াছে—অন্তঃপুরে চল—দেখ তোমার অন্তঃপুরের সখি ও দাসীবৃন্দ সকলেই তোমার ভজন-মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া প্রভাতী নাম কীর্ত্তন করিতেছে—তুমি তাহাদের জীবনসর্ব্বস্বধন—তোমার বিষণ্ণ বদন দেখিলে, তাহারা প্রাণে মরিয়া যাইবে—আমাদের কথা ছাড়িয়া দাও—আমরা তোমার সঙ্গ-সুখে পরমানন্দ-সুখেই আছি,—তাহাদিগের মুখ পানে একবার করুণ নয়নে চাহিয়া দেখ দেখি সখি।"

বিরহিণী প্রিয়াজি নীরবে সকল কথাই শুনিলেন—কিন্তু কোন কথারই উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়ন-সলিল বক্ষ প্লাবিত করিয়া ভূমিতল সিক্ত করিতেছে—বদন কালিমাকার—তিনি যেন পুঞ্জীকৃত দুঃখের একটী বিষম বোঝা মাথায় করিয়া বসিয়া আছেন। তখন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সখি কাঞ্চনা পুনরায় করযোড়ে মিনতি করিয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার বিষণ্ণ বদন দেখিলে আমরা যে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি,—বল বল প্রিয়সখি! আজি তোমার মনে এমন কি ভাবের উদয় হইল যাহাতে তোমাকে ও আমাদিগকে এরূপভাবে অস্থির করিয়া তুলিল? আমাদের যে প্রাণ যায় যায় হইয়াছে,—আর যে আমরা স্থির থাকিতে পারিতেছি না।" এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা বদনে বসন ঝাঁপিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বালিকার মত কান্দিতে লাগিলেন।

তখন বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরে ধীরে তাঁহার প্রেমাশ্রুপূর্ণ মলিন ও কাতর বদনখানি উঠাইলেন, কিন্তু নয়ন মেলিয়া

প্রিয়তমা মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার বদনের ভাব গম্ভীর অথচ কাতর এবং ম্রিয়মান। সখি কাঞ্চনা তখন নিজ বসনাঞ্চলে প্রিয়াজির মলিন বদনখানি এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নদ্বয় মুছাইয়া দিয়া প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! বল বল কি দুঃখ আজি তোমাকে এত মনঃকষ্ট দিতেছে—আমরা তোমার মঙ্গলাকাঙ্খিনী জন্মজন্মান্তরের সঙ্গিনী ও দাসী—আমরা তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্ম প্রাণপাত করিতেছি। বল বল প্রিয়সখি! কি করিলে তোমার এই নিদারুণ মনদুঃখ দূর হয়।" এই বলিয়া মর্ম্মী সখিদ্বয় কান্দিয়া আকুল হইলেন এবং দুই হস্তে দুই জনে তাঁহার হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক নয়নের জলে বক্ষ ভাসাইয়া পুনরায় কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! প্রাণের ব্যথা, মনের দুঃখ মনে মনে চাপিয়া রাখিলে শরীরে উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হইবে—তোমার ব্যাধির অবধি নাই—দেহানুসন্ধানও নাই। আমরা তোমার সখির সম্পূর্ণ অযোগ্য,তাহা আমরা বিশেষ ভাবেই জানি। তোমার প্রাণের ব্যথা শ্রবণ করিবার অধিকার দিয়া এখন যে বঞ্চিত করিতেছ—ইহাতেই আমাদের আত্যন্তিক মনদুঃখ এবং এই দুঃখই আমাদেরও প্রাণপাতের কারণ হইবে। এখন এই আমাদের শেষ কথা—তোমার চরণে শেষ প্রার্থনা—তোমার এই আগন্তুক মনদুঃখের কারণটি প্রকাশ করিয়া বল—আমরা তাহার প্রতিকারের কথঞ্চিত প্রচেষ্টা করিয়া কৃতকৃতার্থ হই এবং আত্মগ্লানি দূর করি।"

এই কথা কয়টী বলিতে সখি কাঞ্চনার হৃৎপিণ্ড যেন ছিন্ন হইয়া গেল—সখি অমিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রিয়াজির চরণতলে পড়িলেন। দয়াময়ী গৌরবল্লভা আর তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না—তিনি অতিকষ্টে প্রেমাবেগে তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয়কে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং পরম প্রেমভরে নিজ ক্রোড়ে প্রেমালিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ করিলেন, কিন্তু তিনি প্রেমাবেগে কোন কথাই কহিতে পারিলেন না—কেবল অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—মর্ম্মী সখিদ্বয়েরও তদবস্থা। এইভাবে কিছুক্ষণ গেল—পরে বিরহিণী প্রিয়াজি আত্মসম্বরণ করিয়া নিজ বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মৃদু মধুরভাবে করুণ ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে! প্রাণসখি অমিতে! আজি আমার বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ তোমাদিগকে যে মর্ম্মান্তিক কঠোর কথা কহিয়াছি—তোমাদের প্রাণে যে অযথা ব্যথা দিয়াছি—সে পাপের কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই। অধমা ও অকৃতজ্ঞ তোমাদের এই মন্দভাগিনী সখিটিকে নিজগুণে তোমরা দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। আমার বিকৃত মস্তিষ্কের ফলে এরূপ অঘটন ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। প্রাণসখি কাঞ্চনে! তুমি যে গৌরলীলার পূর্ব্বাভাসের প্রাচীন পদাবলী গান করিলে তাহার ফলেই আমার দুষ্ট মন অধিকতর দুষ্ট হইয়া আমাকে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার স্বপ্নানুরূপ আমিও একটী স্বপ্ন দেখিয়াছি—তাহা তোমাদের কাছেও মুখ ফুটিয়া বলিতে আমি সরমে মরিয়া যাইব—আমার বুক ফাটিয়া যাইবে। তোমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা হেতু আমি ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই পরম নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ পরম গোপ্য কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি—তবে শুন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম—

—"কোন এক কৃষ্ণবর্ণ যুবক সুন্দর।
বংশীধারী নটবর রূপ মনোহর॥
সুন্দর বদনচন্দ্র ত্রিভঙ্গ আকার।
তেরছ নয়নে চাহি বলে বারম্বার॥
আমি তব প্রাণবঁধু নন্দকুলচন্দ্র।
এবে নবদ্বীপে আমি নবদ্বীপচন্দ্র॥
কৃষ্ণ-গোবিন্দ আর গৌর-গোবিন্দ।
অদ্বয়-অত্ত্ব-জ্ঞানে পাইবে আনন্দ॥
বৃষভানু-নন্দিনীর স্বপন-বিলাসে।
পরিচয় দিছি আমি অশেষ বিশেষে॥
স্বপ্নে দেখালাম তোমা আপন স্বরূপ।
গৌরকৃষ্ণ-রূপ মোর একই স্বরূপ॥
প্রাণপ্রিয়ে! তুমি মোর ব্রজ-সুন্দরী।
বৃষভানুনন্দিনী এবে ব্রাহ্মণ-কুমারী॥
নন্দকুলচন্দ্র এবে মিশ্রকুলচন্দ্র।
নদীয়ার নিজজন গোপ-গোপীবৃন্দ॥"—

এই কথাগুলি বলিয়াই যখন এই কৃষ্ণবর্ণ সুন্দর যুবকটি আমার প্রতি সপ্রেম কুটিল কটাক্ষ পাত করিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে ধাবিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল—আমি সরমে প্রাণে মরিয়া গেলাম, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব যুবকের অপরূপ শ্যাম-গোপ-রূপে আমার মন মুগ্ধ হইল—সেই অপরূপ রূপরাশি যেন আমার নয়নের উপর

এখনও সর্ব্বদা ভাসিতেছে। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে প্রাণসখি! তোমার গৌরলীলার পূর্ব্বাভাসের গীতগুলির প্রত্যেক কথা আমার তখন মনে পড়িল—আর আমার হৃদয় কি জানি কি ভাবে মথিত হইল—মন উচাটন হইল—প্রাণ অস্থির হইল—আমি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইলাম—এরূপ অদ্ভুত স্বপ্নের মর্ম্মার্থ বুঝিলাম না,—কতই প্রলাপবাক্য বলিলাম—আর কি করিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই। এখন তোমরা যাহাতে আমার কুল মান ও নারীধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহার প্রতিবিধান কর"। এই বলিয়া বিরহিণী প্রিয়াজি পুনরায় সখিক্রোড়ে মূচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন মর্ম্মী-সখিদ্বয় পুনরায় তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে প্রেমমূর্চ্ছা এবং অর্দ্ধবাহ্য ও বাহ্যদশায় বিরহিণী গৌরবল্লভা শেষ রাত্রি কাটাইলেন। স্বপ্ন দেখার পরক্ষণ হইতেই তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছে।

সখি কাঞ্চনা বড়ই সুচতুরা, তিনি বিরহিণী গৌর-বল্লভার তত্ত্ব সকলি জানেন,—তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন প্রিয়াজির এই অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গীর মর্ম্ম অতিশয় নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। তিনি অত্যন্ত চতুরতার সহিত ধীরে ধীরে পরম প্রেমভরে ও সস্নেহে তাঁহার প্রাণ-সখির চিবুক স্পর্শ করিয়া পরমাদরে প্রেম-গদগদ মৃদুমধুর ভাষে কহিলেন—"প্রাণসখি বিষ্ণু-প্রিয়ে! তোমার এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন-বিলাসের মধুর ভাবটি তুমিই তোমার প্রাণবল্লভের শুভ ইচ্ছায় প্রকট ও প্রকাশ করিয়া জীব-জগতের পরম মঙ্গল সাধন করিলে, তুমি ত নিজ মুখেই বলিয়াছ—

—"গৌরমন্ত্রে গৌরপূজা ইথে দ্বন্দ্ব নাহি।
প্রকৃত দ্বন্দ্বের কারণ শুন এবে কহি॥

স্বতন্ত্র (গৌর)-মন্ত্র-দ্বন্দ্ব উপলক্ষ্য মাত্র।
প্রকৃত কারণ শুন অতীব বিচিত্র॥

মুক্তি অভাগিনী হব দ্বন্দ্বের কারণ।
এ মোর করম ফল অদৃষ্ট লিখন॥

মোহান্ত বৈষ্ণবে হবে দ্বন্দ্ব অকারণ।
জটিলা কুটিলা হবে প্রতিপক্ষগণ॥

রস পুষ্টি তরে হবে অঘটন ঘটন।
নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ ভবিষ্য কথন॥

গোপনে রাখিও সখি এ সকল কথা।
শুনিলে বৈষ্ণবে পাবেন বড় মনব্যথা॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মঙ্গল।

মর্ম্মী-সখির এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বিরহিণী-প্রিয়াজি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন—তিনি যেন কোন গভীর চিন্তামগ্ন। সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তখন এই কথাগুলি আরও একটু সুস্পষ্ট-ভাবে তাঁহার প্রিয়তমা সখিকে বলিবার উদ্দেশে পুনরায় তিনি মৃদুমধুর বচনে অতিশয় সাবধানতা ও চতুরতার সহিত গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কানে কানে কহিলেন—

"প্রাণ-সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! গৌর-কৃষ্ণ অদ্বয় তত্ত্ব,—আর রাধা-বিষ্ণুপ্রিয়াও তদ্রূপ অদ্বয়-তত্ত্ব। তোমার প্রাণবল্লভের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র পার্ষদভক্ত গোস্বামিপাদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভই রাধা-বল্লভ আর রাধাবল্লভই বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ। "ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হইল সেই" এই তাঁহাদের হইল বিদ্বদনুভব—তাহা হইলে তোমার প্রাণবল্লভই ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ—এই ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ রাধাঙ্গ বিনা অন্য কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করেন না—তিনি এই যুগে গৌর-গোবিন্দরূপে শচীগর্ভে উদয় হইয়া তোমাকে কান্তারূপে গ্রহণ করিয়াছেন—এবং তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া পরম প্রেমভরে চুম্বন-আলিঙ্গনাদি সম্ভোগ রসাস্বাদন করিয়াছেন—অতএব তুমিই রাধা। গোস্বামিশাস্ত্রমতে নাগরী-জনবল্লভ শ্রীগৌরসুন্দর গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্যামসুন্দরের বিশিষ্ট-আবির্ভাব,—তাহা হইলে সনাতন-নন্দিনী গৌর-বল্লভা বৃষভানু-নন্দিনী কৃষ্ণ-বল্লভার বিশিষ্ট আবির্ভাব। অতএব সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমার এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন সম্বন্ধে ভয়, লজ্জা ও চিন্তার কোন কারণই নাই।"

বিরহিণী গৌর-বল্লভা তাঁহার মর্ম্মী-সখি-মুখে সকল কথাই অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক ধীর ভাবে শ্রবণ করিলেন—কিন্তু কোন কথার আর উত্তর করিলেন না। তিনি যেন অন্যমনস্কা হইয়া নীরবে কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মর্ম্মী-সখিদ্বয় ভাবিতেছেন,—"মৌনং সম্মতি লক্ষণং"। তথাপিও সখি কাঞ্চনা পুনরায় তাঁহাকে একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন "প্রাণসখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! আমার কথাগুলি এখন তোমার মনে ভাল লাগিবে না, তাহা আমি

বিশেষভাবে জানি—তথাপিও তোমাকে এখন এ সকল কথা বলিবার আমার কিছু অধিকার আছে, তাহা তুমিই আমাকে দিয়াছ—তাই বলিলাম। আমার কর্ত্তব্য আমি করিলাম—তোমার কর্ত্তব্য এখন তুমি কর।" এই কথা বলিয়া সখি কাঞ্চনা সেখান হইতে গাত্রোত্থান করিলেন,—বিরহিণী প্রিয়াজি তাঁহার বদনের প্রতি একবার সপ্রেমলোচনে চাহিলেন—সে চাহনির মর্ম্ম—"সখি এসকল কথা প্রকাশ করিবার সময় এখনও আসে নাই। এ সকল বেদগুপ্ত রহস্যকথা গোপনে রাখিও—তুমি আমার গৌরপ্রেমের গুরু—আমাকে গৌর-প্রেম শিক্ষা দাও—গৌর-তত্ত্ব শিখাও—আমার নিজ তত্ত্ব-কথা লইয়া আর অধিক গোলযোগ করিও না" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিলেন।

বিরহিণী গৌর-বল্লভাকে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে তাঁহার পরমান্তরঙ্গা সেবিকা দাসী ও সখিবৃন্দের হস্তে সাবধানে সমর্পণ করিয়া দিয়া সখি কাঞ্চনা ও অমিতা পুনরায় তাঁহাদের প্রিয়সখির ভজন-মন্দিরে আসিলেন। সেখানে একটী নিভৃত নিকুঞ্জ-মন্দিরে বসিয়া দুইজনে প্রিয়াজির পূর্ব্বরাত্রির পরমাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ স্বপ্ন বিলাস-রসরঙ্গের পরমাস্বাদ্য মধুরতা এবং অভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদ্য সিদ্ধান্ত-রসপূর্ণ তন্নিহিত ভাবনিধির বিস্তারিত পর্য্যালোচনা ও রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। সখি অমিতার হৃদয়খানি বড়ই ভাব-গম্ভীর—সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে নাদ-গম্ভীর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের "লীলা-তত্ত্ববাগীশ" উপাধি দিয়াছেন। এই তত্ত্ববাগীশ মহোদয়া আজ প্রথমেই পরম গৌর-প্রেমানন্দের সহিত প্রশ্ন করিলেন—"সখি কাঞ্চনে! তুমি বল দেখি আমাদের প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ার এই পরমাদ্ভুত স্বপ্নবিলাসরঙ্গটি যদি গৌরভক্ত সমাজে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন?"

সখি কাঞ্চনা বড়ই সুচতুরা এবং মহা তেজস্বিনী ও স্পষ্টবক্তা। তিনি গৌর-বল্লভার প্রধানা সখি। তিনি গৌর-প্রেমানন্দে ডগমগ হইয়া উত্তর করিলেন—"সখি অমিতে! প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়ার এই যে স্বপ্নবিলাস-রঙ্গ—ইহা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি—মহা মূল্যবান নিজ গুপ্তবিত্ত। গৌর-প্রেম-ধনে ধনী গৌরভক্ত মহাজনগণই ইহার মহান্ ভাব এবং অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত বুঝিতে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ যাঁহারা মহা মহা ভাগ্যবান শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পদ-দাসী এবং শ্রীরাধা-পদ-দাসী তাঁহারাই পূজ্যপাদ রসিকভক্ত কবিরাজ শ্রীল চণ্ডীদাসের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-লীলার পূর্ব্বাভাসের পদরত্নটিকে বহু মানন করেন ও করিবেন। তাঁহারাই প্রিয়াজিকথিত এই স্বপ্নবিলাস-রঙ্গটিকে শ্রীরাধিকার স্বপ্ন-বিলাস রস-সার রূপে গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ পাইবেন।"

সখি অমিতা এই কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"সখি কাঞ্চনে! আমাদের প্রিয়সখি বিষ্ণুপ্রিয়া-পদ-দাসী রসিক গৌরভক্তগণের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত-রত্নটি লইয়া প্রতিকূল সমালোচনা হইবে। ইঁহাদের অনেকের হৃদয়ে এখন পর্য্যন্ত গৌর-কৃষ্ণের অদ্বয়তত্ত্বজ্ঞানটি স্ফুরিত হয় নাই কি করিয়া শ্রীরাধা-বিষ্ণুপ্রিয়া-অদ্বয়তত্ত্ব তাঁহারা বুঝিবেন? সখি কাঞ্চনা হাসিয়া উত্তর করিলেন—"শুদ্ধা গৌর-কৃষ্ণ-ভক্তির অভাবেই তাঁহাদের মনে এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। গোস্বামী-পাদের নিগূঢ় সিদ্ধান্তপূর্ণ সূক্ষ্মাশয়গুলি সদ্গুরুমুখে তাঁহাদের শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ হয় নাই। ভক্তবৎসলা দয়াময়ী প্রিয়াজি সে সৌভাগ্য তাঁহাদিগকে অচিরে দান করিবেন"।

এই কথা বলিয়াই তাঁহারা দূর হইতে দেখিলেন বিরহিণী প্রিয়াজি সখি ও দাসী সঙ্গে পুনরায় ভজন-মন্দিরে আসিতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উঠিয়া গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাস॥

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-কুঞ্জ
৩০শে মাঘ ১৩৩৯।

(৩০)

"শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র।
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র ॥
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর।
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥"

"প্রিয়াজি-চরিত্র শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল গৌরহরি ॥"

কীর্ত্তন করহ সবে—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি ॥"—

—"জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত ॥"—

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার পর এক বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। পুনরায় ভুবনমঙ্গল শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীশ্রীশচী-নন্দন গৌরহরির শুভ জন্মোৎসব আগত। ফাল্গুন মাস—নব বসন্ত সমাগমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে শ্রীশ্রীগৌর-চন্দ্রস্থলী নদীয়ানগরী অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—বৃক্ষ লতা তৃণ গুল্ম প্রভৃতি নবপল্লবে নব নবায়মান শোভা বিশিষ্ট অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে। মন্দ মন্দ মলয়ানিল সঞ্চালিত সুগন্ধি পুষ্প-গন্ধে নবদ্বীপ-বন আমোদিত করিতেছে—সর্ব্বমঙ্গলা ফাল্গুনীপূর্ণিমা তিথিতে এবার শ্রীশ্রীগৌর-জন্মতিথির সমস্ত শুভলগ্নাদির শুভসংযোগ হইয়াছে। নবদ্বীপবাসী এবং বিদেশী গৌরভক্তগণের এই শুভদিনে আনন্দের আর সীমা নাই। নানা দেশ হইতে গৌরভক্তগণ দলে দলে শ্রীনবদ্বীপধামে আসিয়া শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসবে যোগদান করিয়াছেন। বহুদূর হইতে ভক্তিমতী কুলকামিনীগণ যূথে যূথে শ্রীধামে আসিয়া এই আনন্দোৎসবে প্রমত্তা হইয়াছেন।

শচী-আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য—আনন্দ-কোলাহলে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠের শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দির মুখরিত,—"**জয় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের জয়**" রবে সর্ব্ব নদীয়া প্রকম্পিত—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের শ্রীমূর্ত্তি আজ বিশেষভাবে অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত,—নানা বর্ণের ধ্বজা-পতাকা পরিশোভিত সুবিস্তৃত শচীআঙ্গিনায় আজ অগণিত অনুরাগী গৌরভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। নদীয়ার প্রতি গৃহদ্বারে আজ কদলীবৃক্ষ আর আম্রপল্লবপূর্ণ মঙ্গলঘট শোভা পাইতেছে। নদীয়ার পথে পথে কদলীবৃক্ষ শ্রেণী-বদ্ধভাবে রোপিত হইয়াছে। সর্ব্বনদীয়াব্যাপী আনন্দোৎ-সবে আজ বাল-বৃদ্ধ-যুবা এবং সর্ব্ব নরনারীবৃন্দ প্রমত্ত, আজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের শুভজন্মযাত্রা—আজ শিব-বিরিঞ্চি আরাধিতা সেই ভুবনমঙ্গলা ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।

বিরহিণী গৌরবল্লভা কিন্তু তাঁহার সেই নির্জ্জন ভজন-মন্দিরে একান্তে বসিয়া ভুবনমঙ্গল হরিনাম জপে মগ্ন এবং পতি-পাদপদ্ম-ধ্যানরতা। তাঁহার মর্ম্মী সখিদ্বয় সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহার নিকটেই আছেন। তাঁহারাও নির্জ্জন ভজনরতা। শচী-আঙ্গিনায় অষ্টপ্রহর শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি ॥"—

উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি সমগ্র নদীয়া মুখরিত করিতেছে—দলে দলে চৌদ্দমাদল সঙ্কীর্ত্তনের দল শচীআঙ্গিনায় আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে যোগদান করিতেছে—সকলেই শচী আঙ্গিনার সেই মূল সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়াছে।

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া বিহারি ॥"—

শচী-আঙ্গিনায় গৌরপ্রেমের পাথার বহিতেছে—সে প্রেমের পাথারে গৌরভক্তগণ হাবুডুবু খাইতেছেন—সে প্রেম-তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে নদীয়াবাসী নরনারীবৃন্দের প্রাণে গৌরপ্রেমের অনন্ত উৎস সৃষ্টি করিতেছে। এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তনে সর্ব্ব নদীয়ায় যেন একটা প্রেমের বিশাল বন্যা প্রবাহিত হইতেছে।

এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে ধ্যানমগ্না বিরহিণী প্রিয়াজির অকস্মাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইল তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের রূপ-সাম্য চিত্রপটখানি ধীরে ধীরে বক্ষে ধারণ করিলেন,—তাঁহার পাদুকা দু'খানি পরে প্রেমভরে এক হস্তে মস্তকে ধারণ করিলেন—সখি কাঞ্চনা তাঁহাকে পশ্চাৎদিক হইতে ধরিয়া অতি সাবধানে ক্রোড়ে

বসাইলেন—সখি অমিতা তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় ব্রতী হইলেন।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভা গৌরানুরাগরঞ্জিত নয়নধারায় নিজ বক্ষ প্লাবিত করিয়া মর্ম্মী প্রাণসখিদ্বয়ের বদনের প্রতি উদাস নয়নে প্রেমাকুলভাবে চাহিয়া অতি ধীরে ধীরে প্রেম-গদগদ অস্ফুট ভাষায় ক্রন্দনের সুরে কহিলেন—"প্রাণসখি কাঞ্চনে! প্রিয়সখি অমিতে! আজ আমার প্রাণ-প্রাণবল্লভের সঙ্গ-সুখ-লালসায় বড়ই উৎকণ্ঠিত—মন আমার আর কোন বাধাই মানিতেছে না—হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যেন একটা প্রবল প্রেরণার অনুভূতি আসিয়াছে—আজ রাত্রি শেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমার প্রাণবল্লভের সহিত আমার শুভ চির মিলন হইবে। তোমরাও সখিগণ আমাদের অপ্রকট প্রকাশে নিত্য যুগলমিলন দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবে। তোমাদের চিরবাঞ্ছিত বস্তু আজ তোমরা লাভ করিবে।"—

মর্ম্মী সখিদ্বয় তাঁহাদের প্রিয়সখি গৌরবল্লভার এই কথাগুলি অতি ধীরভাবে শুনিলেন—তাঁহার বদনের ভাব ও কথার ভঙ্গীতে বুঝিলেন তাঁহাদের প্রাণসখি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অপ্রকট প্রকাশ লীলারঙ্গের সূচনা তিনি স্বয়ংই করিলেন।

সখি কাঞ্চনা ও অমিতা অধোবদনে বহুক্ষণ নীরবে অঝোর নয়নে ঝুরিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির পরিধান মলিন বসনখানি তাঁহাদের উষ্ণ নয়ন-সলিল-সম্পাতে সিক্ত হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ ধৌত বিধৌত করিল। তিনি তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন—দুইটি মর্ম্মী সখিকে দুই পার্শ্বে বসাইয়া দুই হস্তে দুই সখির গলদেশ বেষ্টন করিয়া পরম প্রেমভরে প্রেমগদগদ কণ্ঠে অটস্ফুভাষে করুণস্বরে কহিলেন—"সখি কাঞ্চনে! সখি অমিতে! তোমরা অনর্থক বৃথা দুঃখ মনে পোষণ করিয়া অকারণ মনঃকষ্ট পাইতেছ। তোমরা আমার নিত্য সখি—প্রকটাপ্রকট লীলারঙ্গে তোমাদের সর্ব্বকাল যুগলমিলন রসরঙ্গে আমার সঙ্গে এই নিত্য নবদ্বীপে নিত্য স্থিতি। এখন অপ্রকট প্রকাশের শুভ সংযোগ ও শুভকাল উপস্থিত। মনে দুঃখ করিও না সখি! ধীরভাবে একবার একটু চিন্তা করিয়া দেখ দেখি কে তুমি? কে আমি? আর কেনই বা আমরা এই দুর্ব্বিসহ গৌর-বিরহ-দুঃখ-রস আস্বাদন করিতেছি? পরম স্বতন্ত্র লীলা-পুরুষোত্তম আমার প্রাণবল্লভ লীলা সম্বরণ করিয়াছেন—এখন অপ্রকট প্রকাশে তাঁহার সহিত আমাদের নিত্য মিলন ও নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ-বিলাস-রসাস্বাদনের শুভকাল উপস্থিত! প্রিয়সখি কাঞ্চনে! প্রাণসখি অমিতে! অকারণ বৃথা শোক করিও না"।

মর্ম্মী সখিদ্বয় এত কাল পরে এই প্রথম গৌর-বল্লভার শ্রীমুখে তাঁহার এই অনির্ব্বচনীয় ও অপূর্ব্ব বিরহ-লীলাভিনয়ের নিগূঢ় রহস্যকথা সম্বন্ধে পরম ও চরম তত্ত্বকথা শুনিলেন। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞা—তাঁহারা সকলি জানেন—তাঁহারা প্রিয়াজির কায়ব্যূহ—যেমন ব্রজগোপী-তত্ত্ব ও শ্রীরাধা-তত্ত্ব এক বস্তু—তেমনি নদীয়ানাগরী-তত্ত্ব এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব একই বস্তু। সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তথাপিও ভৌম-নবদ্বীপ-লীলারঙ্গে প্রিয়াজির অপ্রকট-সম্বাদে বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন—কাহারও মুখে কোন কথা নাই—তাঁহাদের বাক্যগুলি লুক্কায়িতভাবে মনের মধ্যে লুকাচুরী খেলা করিতেছে—নীরব ভাষায় নীরব ধ্বনি অন্তরের মর্ম্মস্তলে ধ্বনিত হইতেছে। বিরহিণী গৌরবল্লভা পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াই গৌরপ্রেমাবেশে সখিক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন—তাঁহারা প্রিয়াজির কৃপায় তখন কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন। গৌররঙ্গবিলাসিনীর তখন বাহ্যজ্ঞান নাই—তাঁহাকে ভূমিতলে শয়ন করাইয়া সখিকাঞ্চনা অন্যান্য সখিগণকে নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। প্রাণশূন্যার মত বিরহিণী গৌরবল্লভা দশমীদশাগ্রস্থা হইয়া ভূমিতলে নিপতিতা রহিলেন—উপস্থিত সকল সখিগণের নীরব ক্রন্দনের অস্ফুটধ্বনি "হা গৌরাঙ্গ গুণনিধে! হা বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ!" বিরহিণী প্রিয়াজির কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভের রূপসাম্য চিত্রপটখানি নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন,—কৃপাময় পাঠকবৃন্দ! তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা প্রাচীন একটী পদে আস্বাদন করিয়া আত্মশোধন করুন,—

যথারাগ।

"সোণার বরণ দেহ, পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ।
গলয়ে সঘনে লোর, মুরছে সখিক কোর॥
দারুণ-বিরহ-জ্বরে, সো ধনী গেয়ান হরে।
পুনশ্চ—জীবনে নাহিক আশ, কহয়ে জ্ঞান দাস॥"

যথা রাগ।

"গৌর-পট এক, হৃদয় উপর ধরি
গৌরাঙ্গী ভাবহি ভোর।
কিয়ে লাগি সো ধনী কাঁদয়ে নিরবধি
(বুঝি) ভাবয়ে নিজ মন-চোর॥
ইহ মঝু মরমক শেল।
যো রসময়ী তনু, সুনীক পুতলি যনু,
তাহে করয়ে এত দুঃখ ভোগ। ধ্রু॥
জলে যত জলচর, কাঁদয়ে থাবর,
বিরিখ উপরে অরু পাখী।
আর যত পশুকুল, কান্দি বিয়াকুল,
ধনীক কান্দনা শুনি দেখি॥
কান্দি অছু মুরছিত, পড়ল ভূমিতল,
গৌর নাম শুনি ভেল জ্ঞান।
যো বর বিরহ, প্রকট বিষ্ণুপ্রিয়া
গৌর দাসহি করু গান॥

বিরহিণী প্রিয়াজির এখন দশমী-দশার প্রেম-সমাধি-অবস্থা—মর্ম্মী সখি ও দাসীগণ সকলেই ভজন-মন্দিরে আসিয়াছেন—তাঁহারাও সকলে প্রিয়াজির অন্তরঙ্গ-সেবায় নিযুক্ত আছেন—সকলেই গৌর-বল্লভার দুর্ব্বার গৌর-বিরহ-শোকে শোকাকুলা হইয়া তখন কি করিতেছেন, তাহাও নিম্নোদ্ধৃত পদটিতে অনুভব করিয়া প্রাণ ভরিয়া ক্রন্দন করুন এবং নয়নজলে আত্মশোধন করুন,—

যথারাগ।

—"কুঞ্জ-ভবনে ধনী, গোরাগুণ গণি গণি,
অতিনরী দুবরী ভেল।
দশমীক পহিল, দশা হেরি সহচরী,
ঘর সঞে বাহির নেল।
দারুণ দুখ-বারতা বোলোব কোয়?
নদীয়া-রমণীগণ, নিশ্চয় মরণ জানি,
"প্রিয়া—প্রিয়া" করি রোয়॥ ধ্রু॥
তঁহি এক সহচরী, প্রিয়াক শ্রবণ ভরি,
পুন পুন কহে গৌর-নাম।
বহু খনে সুন্দরী, পাই পরাণ পুন,
বিকশয়ে কমল নয়ান॥
কান্ত-দরশ লাগি, ইতি উতি নিরখয়ে,
না হেরি নয়নে ঝরু লোর।
পুন ভেল মুরছিত, সখিগণ রোয়ত,
হা হা কাঁহা গৌর-কিশোর॥
এত দিনে দশমী— দশা পরিপূরল,
শ্বাস পবন দেল ভঙ্গ।
গৌরদাস কহ, ধনী তব জীয়ব,
পরশব যব গোরা-অঙ্গ॥"

শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সন্দর্ভ।

ভজন-মন্দিরের বারান্দায় বিরহিণী প্রিয়াজিকে এক্ষণে সখিগণে ধরাধরি করিয়া আনিয়াছেন—সকলে মিলিয়া মন্দ মন্দ গৌর-নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন, আর অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। নীরব ক্রন্দনের কোনরূপ রোল নাই সত্য, কিন্তু উপস্থিত গৌর-বিরহিণী সখি ও দাসীবৃন্দের উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা কাতর ধ্বনি আছে—তাহাই এক্ষণে শ্রুতিগোচর হইতেছে,—তাঁহাদিগের নয়নধারা-সম্পাতে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির প্লাবিত হইতেছে—এই প্রেম-নদীর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত নদীয়ায় গৌর-ভক্তগণের গৃহে গৃহে লাগিতেছে। সেখানেও গৌরগণের মধ্যে নীরব ক্রন্দনের অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-লীলার অবসানে নন্দব্রজে পুনরাগমন করতঃ দুই মাস কাল যেরূপ সপ্রেম ও সস্নেহ ব্যবহার দ্বারা ব্রজবাসীগণের হৃদয়ের তীব্র বিরহব্যথা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে অনবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দ দান করিয়াছিলেন, শচীনন্দন শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রও নীলাচল-লীলাবসানকালে ভক্তিব্রজ শ্রীনবদ্বীপে পুনরাগমন পূর্ব্বক তদ্রূপ প্রেমব্যবহার দ্বারাই নদীয়াবাসীগণের হৃদয়ের তীব্র গৌর-বিরহ-ব্যথা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমানন্দসাগরে ভাসাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনীলাচলের লীলা সম্বরণ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার লৌকিকী-লীলারঙ্গ মাত্র। তাহার পর তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে পুনরাগমন পূর্ব্বক তাঁহার নিত্যপরিকর ও নিজ পার্ষদভক্ত নিজগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন এবং সেখানে কিছুদিন প্রকট বিহার করতঃ অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করিলেন। এই যে প্রকটাপ্রকট-প্রকাশ-লীলারঙ্গ,—

ইহা সাধারণ সাধক ভক্তগণের লোকলোচনের গোচরীভূত নহে। এই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন—

—"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

নিত্য নবদ্বীপধাম গৌর ও গৌর-পরিকরগণের নিত্য-মিলন—স্থলী। এই বিষয়টী সম্বন্ধে গোস্বামী-শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচারপ্রণালী যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি "শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সন্দর্ভের" শেষাংশ পাঠ করিবেন।

এক্ষণে কৃপাময় ও কৃপাময়ী পাঠক পাঠিকাবৃন্দ! নদীয়া-গম্ভীরা-মন্দিরের বারান্দায় দশমীদশাগ্রস্থা সখি-দাসীগণপরিবেষ্টিতা ও সেবিতা বিরহিণী গৌরবল্লভার প্রেমসমাধির অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় মহামহিমার মহৈশ্বর্য্যময়ী লীলাবিভব-বৈচিত্র্য স্ব স্ব মানসচিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া ভক্তিভরে হৃদয়ে অনুধ্যান করুন। ভুবনমঙ্গল চিদানন্দময় বিপ্রলম্ভরস-সার, এই বিচিত্র লীলা-চিত্রখানি স্ব স্ব চিত্তপটে গৌরপ্রেমানুরাগরঞ্জিত তুলিকাদ্বারা পরমপ্রেমভরে অঙ্কিত করিয়া জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনের পরিপাক-শক্তি অর্জ্জন করুন—এবং গৌরপ্রেমানন্দে অকপটে প্রাণ-ভরিয়া নিরন্তর ক্রন্দন করুন,—ইহাতেই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমধন লাভ হইবে।

—"গৌর-বিরহে কান্দে যে সুকৃতি জন।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
গৌরকৃষ্ণ-বিরহের ক্রন্দনের ধ্বনি।
শুনিয়া যে কান্দে তিনি ভক্তশিরোমণি॥
গতি তাঁর বৈকুণ্ঠেতে শাস্ত্র পরমাণ। (১)
দাসী হরিদাসী তাঁরে করে পরণাম॥"

নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরে বিরহিণী গৌর বল্লভা ও তাঁহার মর্ম্মী সখিগণ—শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমার গভীর রাত্রিকালে এইভাবে গৌর-বিরহ-রসাস্বাদন করিতেছেন। এই যে প্রাণ-ঘাতী হৃদিবিদারক বিপ্রলম্ভ-রস-লীলারঙ্গ এবং ইহার মর্ম্ম-ভেদী পরম করুণ-রস-পয়োধির প্রবল ঊর্ম্মিমালার অপূর্ব্ব-উচ্ছাসাবলীর পরম চমৎকারিতাপূর্ণ মধুর প্রভাব—ইহাই মধুর রসের রসিক ভক্তসাধকগণের ভজনের পরিপাকাবস্থা। গৌরকৃষ্ণবিরহিণী কান্তাভাবাপন্ন মধুর রসের প্রেমভক্তির সাধকবৃন্দের ইহাই জীবাতু। এই অপূর্ব্ব বিষামৃত পানেই তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়। (২) কৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিতা হইয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার কণককেতকী সদৃশ নয়নধারায় বক্ষ ভাসাইয়া হরিনাম মহামন্ত্র জপে মগ্না হইয়া তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্যামসুন্দরের সঙ্গ-সুখ-লালসায় বিরহের গান গাইতেন। এই ষোল-নাম-বত্রিশ-অক্ষরযুক্ত মহামন্ত্রের তিনি কিরূপ সাধন করিতেন,—তাহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ শ্রীল দাস গোস্বামিপাদের ভাষার ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া কৃত কৃতার্থ হউন। (৩)

(১) "কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতিজন।
সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব বন্ধ বিমোচন।"—
"কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণধন মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে।"— চৈঃ ভাঃ

(২) গৌর-কৃষ্ণপ্রেমে যে বিষামৃতের একত্র মিলন, তাহা শ্রীল রূপ-গোস্বামীপাদ কৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের ১৮ সংখ্যক শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে—যথা—

পীড়াভির্নব কালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেম সুন্দরি নন্দ-নন্দন পরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥"—

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বাংলা পদ্যে ইহার ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—যথা—

—"এই মত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহিরে বিষ-জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমের আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥"—

হরিনাম মহামন্ত্রের অর্থ।

(৩) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ অস্যার্থঃ—একদা কৃষ্ণবিরহাদ্ধ্যায়ন্তী প্রিয়সঙ্গমং। মনোদুঃখ নিরাসার্থং জল্পতীদং মুহুর্মুহুঃ॥ হরেকৃষ্ণেত্যাদি। হে হরে স্বমাধুর্য্যেন প্রথমং মচ্চেতো হরসি।১॥ তত্র হেতুঃ হে কৃষ্ণেতি কৃষ্ শব্দস্য সর্ব্বার্থে নচ্চ আনন্দস্বরূপ ইতি স্বার্থেনঃ সর্ব্বাধিক পরমানন্দেন প্রলভ্যেতি ভাবঃ।২॥ ততশ্চ হে হরে ধৈর্য্যলজ্জা গুরুভয়াদিক মপি হরসি॥৩॥ ততশ্চ হে কৃষ্ণ স্বগৃহেভ্যো বনংপ্রতি আকর্ষসি॥৪॥ ততশ্চ হে কৃষ্ণ বনং প্রবিষ্টায়া মে কুঞ্চুকীং সহসৈবাগত্য কর্ষসি॥৫॥ ততশ্চ কৃষ্ণ

অভিন্না-শ্রীরাধিকা গৌরবিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার সেই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গই শ্রীনবদ্বীপের গম্ভীরামন্দিরে প্রকট করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে প্রায়শঃই অন্তর্দ্দশায় অবস্থিত,—কখন বা অর্দ্ধবাহ্য, কখন বা বাহ্য—আবার কখন বা নিপট-

মৎকুচৌ কর্ষসি নখৈরাকর্ষসি ॥ ৬ ॥ ততশ্চ হে হরে স্ববাহুনিবদ্ধাং মাং পুষ্পশয্যাং প্রতি হরসি ॥ ৭ ॥ ততশ্চ হে হরে তত্র নিবেশিতায়া মে উত্তরীয়মপি বলাদ্ধরসি ॥ ৮ ॥ হে হরে উত্তরীয় বসন হরণমিষেণ আত্ম-বিরহপীড়াং সর্ব্বামেব হরসি ॥ ৯ ॥ ততশ্চ হে রাম স্বচ্ছন্দং ময়ি রমসে ॥ ১০ ॥ ততশ্চ হরে যদবশিষ্ট কিঞ্চিন্মে বাম্যমাসীত্তদপি হরসি ॥ ১১ ॥ ততশ্চ হে রাম রময়সি স্বস্মিন্ পুরুষার্থমপি করোসি ॥ ১২ ॥ ততশ্চ হে রাম রমণীয় চূড়ামণে তদাত্মানং তব রামণীয়কং মন্নয়নাভ্যাং স্বাভ্যামেবা-স্বাদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ততশ্চ হে রাম কেবলং রমণরূপং নাপি রমণকর্ত্তা নাপি রমণ প্রযোজকঃ কিন্তু তদ্ভাব রূপাবতি মুর্ত্তিমত্বং ভবসীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥ ততশ্চ হে হরে মচ্চেতনাং মৃগীমিব হরসি আনন্দমূর্চ্ছাং প্রাপয়সীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥ যতো হরে সিংহস্বরূপ তদপি রতিকর্ম্মণি প্রকটিত মহাপ্রাবল্যেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ এবম্ভূতেন ত্বয়া প্রেয়সা বিযুক্তা ক্ষণমপি কল্পকোটিমিব কথং যাপয়িতুং প্রভবামীতি স্বয়মেব বিচারয়েতি নাম ষোড়শ কস্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ততশ্চ নামভিশ্চ স্বকীয়ৈব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণায় সহৈবাকৃষ্টা মিলিত পরমানন্দ এব তস্মাৎ। অস্য তৎসখীনাং তৎ-পরিবারকাস্য তদ্ভাব সাধকানাং মৰ্বাচীনানাং নানামপি সম্পুরকা-মাসেতি ॥ ১৭ ॥ ইতি শ্রীহরিনামার্থ রত্নদীপিকা সমাপ্ত।

(২)

হ কারে ললিতা খ্যাতা রে কারে চ শ্রীদামকঃ। বিশাখা চ কৃকারে তু সুদামা চ ষ্ণকারকে ॥ ১ ॥ সুচিত্রাপি হকারে চ রেকারেব সুদামকঃ। কৃকারে চম্পকলতা ষ্ণকারে কিঙ্কিনী সুথা ॥ ২ ॥ তুঙ্গবিদ্যা কৃকারে চ সুবলশ্চ ষ্ণকারকে। ইন্দুলেখা কৃকারে চ স্তোকঃ কৃষ্ণ ষ্ণকারকে ॥ ৩ ॥ হকারে রঙ্গদেবী চ রেকারে গোপ অর্জ্জুনঃ। হকারে শশিরেখা চ ষ্ণকারে চ বরূথপঃ ॥ ৪ ॥ হকারে বসুদেবী চ রেকারে উজ্জ্বল সুথা। হরিপ্রিয়া চ রাকারে মকারে চ সুভানকঃ ॥ ৫ ॥ হকারে বিমলাদেবী রেকারে বৃষভস্তথা। রাকারে পালিকা বৈচ বিমলশ্চ মকারকে ॥ ৬ ॥ রাকারে মঞ্জুরী নাম্নী দেবপ্রথমকারকে। রাকারে মধুমতীদেবী মকারে তু মহাবলঃ ॥ ৭ ॥ হকারে শ্যামলা খ্যাতা রে মহাবাহুরেবচ। হকারে মঙ্গলা দেবী রেকারশ্চ সুমেধসঃ ॥ ৮ ॥ ইত্যাদি হরিনামাখ্যা গোপাশ্চ গোপনায়িকাঃ। হরিনামানুসেবীনাং কুঞ্জকুট্যাস্তু সংস্থিতিঃ ॥ ৯ ॥ ইতি শ্রীদাস গোস্বামিনা বিরচিতং ॥

(৩)

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং। হরত্যবিদ্যা তৎকার্য্য মতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥ ১ ॥ আনন্দৈকঃ সুখঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ কমললোচনঃ। গোকুলানন্দনেঃ নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে ॥ ২ ॥ বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্ব মুর্ত্তি-লীলাধিদৈবতং। শ্রীরাধা রময়েন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩ ॥ অজ্ঞান তৎ কার্য্য বিনাশ হেতোঃ সুখাত্মনঃ শ্যামকিশোর মূর্ত্তেঃ। শ্রীরাধিকায়া রমণস্য পুংস স্মরন্তি নিত্যং মহতো মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ বিলোক্য তস্মিন্ রসিকঃ কৃতজ্ঞং জিতেন্দ্রিয়ং শান্তমনন্যচিত্তং। কৃতার্থয়ন্তে কৃপয়া স্বশিষ্যং প্রদায় নামং প্রিয়যুক্ত পত্যং ॥ ৫ ॥ রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দ-চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ ৬ ॥ কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ॥ ৭ ॥ তয়োরৈক্যপদং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যাভি-ধীয়তে ॥ ৭ ॥ হরতে শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী। ততো হরত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিগীয়তে ॥ ৮ ॥ রাসাদি প্রেমসৌখ্যার্থে হরের্হরতি যা মনঃ। হরা সা গীয়তে সদ্ভির্বৃষভানুসুতা পরা ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মেশাদি মহেন্দ্রঞ্চ যমং বরুণমেব চ। প্রগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধরিরিহোচ্যতে ॥ ১০ ॥ ক্রমদীপি-কায়াং চন্দ্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ মমনামশতেনৈব রাধানাম সদুত্তমং। য স্মরেত্ত সদা রাধাং ন জানে তস্য কিং ফলং ॥ ১১ ॥

(৪)

শ্রীনিত্যানন্দো প্রভুর্জ্জয়তি ॥ হরে ইতি কৃষ্ণস্য মনোহরতীতি হরা—রাধা—তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে ॥ ১ ॥ কৃষ্ণঃ রাধায়া মনো কর্ষতীতি কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ ॥ ২ ॥ হরে কৃষ্ণস্য লোকলজ্জাধৈর্য্যাদি সর্ব্বং হরতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হে হরে ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণো রাধায়া লোক লজ্জাধৈর্য্যাদি সর্ব্বং কর্ষতীতি কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণো যত্র তত্র রাধা তিষ্ঠতি গচ্ছতি বা তত্র তত্র সা পশ্যতি কৃষ্ণো মাং স্পৃশতি বলাৎ কঞ্চুকাদিকং সর্ব্বং কর্ষতি হরতীতি কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হে কৃষ্ণ ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ পুনরেষতা গময়তি বনং কর্ষতীতি তস্য সম্বোধনে কৃষ্ণ ॥ ৬ ॥ হরে যত্র কৃষ্ণো গচ্ছতি তিষ্ঠতি বা তত্র তত্র পশ্যতি রাধা মমাগ্রে তিষ্ঠতি পার্শ্বে সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে ॥ ৭ ॥ হরে পুনস্তং কৃষ্ণং হরতি স্বস্থানমভিসারয়াতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে ॥ ৮ ॥ হরে পুনঃ কৃষ্ণং বনং রময়তি বনমাগমতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে ॥ ৯ ॥ রাম রময়তি তাং নর্ম্মনিরীক্ষণাদিকং রামস্তস্য সম্বোধনে রাম ॥ ১০ ॥ হরে তাৎকালিকং ধৈর্য্যাবলম্বনাদিকং কৃষ্ণস্য হরতীতি হরা রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে ॥ ১১ ॥ রাম চুম্বনস্তনকর-শালিঙ্গনাদিভি রমতে তস্য সম্বোধনে রাম ॥ ১২ ॥ রাম পুনস্তাং পুরুষোচিতাং কৃত্বা রময়তি রামস্তস্য সম্বোধনে রাম ॥ ১৩ ॥ রাম পুন স্তত্র রমতে রাম স্তস্য সম্বোধনে রাম ॥ ১৪ ॥ হরে পুনঃ রাসান্তে কৃষ্ণস্য মনো হৃত্বা গচ্ছতীতি হর রাধা তস্যাঃ সম্বোধনে হরে ॥ ১৫ ॥ রাধায়া মনো হৃত্বা গচ্ছতীতি হরিঃ কৃষ্ণস্তস্য সম্বোধনে হরে ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থ,—

একদা কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কোন সখী প্রিয়সঙ্গম ধ্যান করিতে করিতে মনোদুঃখ নিরাস করিবার জন্য মুহুর্মুহুঃ "হরেকৃষ্ণ" এই প্রকার মুখে বলিতেছেন ও চিন্তা করিতেছেন। হে হরে তুমি তোমার মাধুর্য্য-গুণে প্রথমে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছ। ১। তাহার কারণ তুমি কৃষ্ণ (কৃষ্ শব্দে সর্ব্বার্থ এবং ন শব্দে আনন্দস্বরূপ এই বাক্যে স্বার্থে ন) অতএব তুমি সর্ব্বপ্রকার পরমানন্দহেতু, সেজন্য আমি প্রলুব্ধা হইয়াছি। ২।

বাহ্যদশায় অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ লীলা আর বিপ্রলম্ভ-লীলা-রস-সম্ভার বিস্তার করিতেছেন। এই অপরূপ লীলারস-বিষামৃত স্বরূপ এবং এই লীলা-রসসারের মূল উৎসটি নদীয়ার মহা গম্ভীরামন্দিরে অবস্থিত। হরিনাম মহামন্ত্র গৌর-কৃষ্ণ প্রাপ্তির

তাহার পর হে হরে তুমি ধৈর্য্যলজ্জা গুরুজনগণের ভয়ও হরণ করিয়াছ। ৩। তাহার পর হে কৃষ্ণ তুমি আবার গৃহ হইতে আমাকে বনে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছ। ৪। তাহার পর হে কৃষ্ণ বনপ্রবিষ্টা (আমার) কাঁচুলী সহসা আকর্ষণ করিতেছ। ৫। তাহার পর হে কৃষ্ণ আমার কুচদ্বয় আকর্ষণ করিতেছ। ৬। তাহার পর হে হরে আমাকে তোমার বাহু-নিবদ্ধা করিয়া পুষ্পশয্যায় শয়ন করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছ। ৭। তাহার পর তথায় স্থাপন করিয়া আমার উত্তরীয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছ। ৮। হে হরে তুমি আমার উত্তরীয় বাস গ্রহণচ্ছলে আমার সর্ব্বপ্রকার বিরহব্যথা নষ্ট করিতেছ। ৯। তাহার পর হে রাম স্বচ্ছন্দ-চিত্তে আমাতে রমণ করিতেছ। ১০। তাহার পর হে হরে আমার অবশিষ্ট যে বামাত্ব (স্ত্রীত্ব) অথবা (বিপরীতকারিণীত্ব) যাহা আছে তাহা হরণ করিতেছ। ১১। তাহার পর হে রাম তোমাতে রমণ করাইতেছ এবং পুরুষার্থ করাইতেছ। ১২। তাহার পর হে রাম রমণীয় চূড়ামণে তোমার রমণীয় শরীর ও কান্তি আমার নয়নদ্বয় দ্বারা আস্বাদিত হইতেছে। ১৩। তাহার পর হে রাম তুমি কেবল রমণরূপ, তুমি রমণকর্ত্তা বা কারয়িতা নহ, কিন্তু আমাতেই সেইরূপ ও ভাবযুক্ত মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। ১৪। তাহার পর হে হরে তুমি আমার চেতনা মৃগীর ন্যায় হরণ করিতেছ,—আনন্দচ্ছটাও পাওয়াইতেছ। ১৫। যেহেতু হরি শব্দে সিংহ স্বরূপ ও রতিকর্ম্মে মহাপ্রবল-ভাব সমুত্থিত হয়। ১৬। অতএব এই প্রকার প্রিয়জন বিরহে প্রতিক্ষণ কল্পকোটি বলিয়া মনে হয়। আমি কেমন করিয়া কাল যাপন করিব তাহা বিচার কর। ইহাই এই ষোড়শ নামের অভিপ্রায়। তাহার পর চুম্বক স্বরূপ এই নাম দ্বারা লৌহের ন্যায় আকৃষ্ট ও মিলিত হইয়া যেন তোমাতে পরমানন্দ লাভ করি। নিজের সখীগণের এবং তাহার পরিবারবর্গের ঐ প্রকার ভাব সাধকের ইচ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন। ১৭। ইতি শ্রীহরি-নামার্থ রত্নদীপিকা।

'হ' কারে ললিতা "রে" কারে শ্রীদাম, 'কৃ' কারে বিশাখা 'ষ্ণ' কারে সুদাম। ১। 'হ'কারে সুচিত্রা 'রে'কারে সুদাম, 'কৃ'কারে চম্পকলতা 'ষ্ণ'কারে কিঙ্কিনী। ২। তুঙ্গবিদ্যা 'কৃ'কারে ও 'ষ্ণ'কারে সুবল। ইন্দুলেখা 'কৃ'কারে তোককৃষ্ণ 'ষ্ণ'কারে। ৩। 'হ'কারে রঙ্গদেবী 'রে'কারে গোপ অর্জ্জুন, 'হ'কারে শশিরেখা 'রে'কারে বরূথপ। ৪। 'হ'কারে বসুদেবী 'রে'কারে উজ্জ্বল, 'রা'কারে হরিপ্রিয়া 'ম'কারে সুভানক। ৫। 'হ'কারে বিমলাদেবী 'রে'কারে বৃষভ, 'রা'কারে পালিকা 'ম'কারে বিমল। ৬। 'রা'কারে মঞ্জুরী 'ম'কারে দেবপ্রথ, 'ক'কারে মধুমতীদেবী 'ম'কারে মহাবল। ৭। 'হ'কারে শ্যামলা 'রে'কারে মহাবাহু, 'হ'কারে মঙ্গলাদেবী, 'র'কার সুমেধা। ৮। এইরূপ হরিনাম গোপ ও গোপনায়িকা হরিনামানুসারিগণের কুঞ্জকুটীরের অন্তসংস্থান। ৯। ইতি শ্রীদাস গোস্বামী বিরচিত হরিনামার্থ রত্নদীপিকা।

(৩)

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য ও মন হরণ করেন, এজন্য তিনি হরি। ১। আনন্দই যাঁহার কেবল সুখ শ্রীমান শ্যামকলেবর কমললোচন গোকুলানন্দ সেই নন্দনন্দনই কৃষ্ণ। ২। বিদ্যার সর্ব্বস্বরূপিণী লীলার দেবী শ্রীরাধা তাঁহাকে নিত্য রমণ করেন বলিয়া তিনি রাম। ৩। অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য সংসার বিনাশ জন্য মহাত্মাগণ সুখাত্মা শ্যামকিশোর মূর্ত্তি রাধিকারমণকে নিত্য স্মরণ করেন॥ ৪॥

শ্রীকৃষ্ণের এই নামগুণাদি দেখিয়া, রসিক কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, অনন্যচিত্ত শিষ্যকে দয়া করিয়া এই নাম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন। ৫। যোগিগণ সত্যানন্দ স্বরূপ অনন্তে রমণ করেন, ইহা এই রাম পদ হইতেই পরব্রহ্ম অভিহিত হয়। ৬। কৃষি ভূবাচক ণ শব্দ নির্বৃতিবাচক এবং এই দুই পদের একত্বই কৃষ্ণ এবং এই কৃষ্ণ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন। ৭। আহ্লাদস্বরূপিণী হরা শ্রীকৃষ্ণের মন আকর্ষণ করিয়া হরণ করেন এই হেতু তিনি রাধা নামে কীর্ত্তিতা হন। ৮। রামাদিতে প্রেম সুখ্যাতি দ্বারা যিনি হরির মন হরণ করেন সেই বৃষভানুসুতা রাধাই হরা। ৯। ব্রহ্মা মহেন্দ্র বরুণ ও যমকে যিনি হরণ করেন তিনি হরি। ১০। ক্রমদীপিকায় চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যে আমার ১০০ নাম অপেক্ষা রাধার ১ বার নাম সৎ ও উত্তম। এই রাধা নাম যিনি সর্ব্বদা উচ্চারণ করেন জানি না তাহার কি ফল হয়। ১১।

(৪)

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জয়যুক্ত হউন। হরে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মনঃ হরণ করিতেছেন যে হরা,—রাধা তাহার সম্বোধনে হরে। ১। কৃষ্ণ রাধার মন আকর্ষণ করিতেছেন, তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ২। হরে অর্থাৎ কৃষ্ণের লোকলজ্জা ধৈর্য্যাদি সব হরণ করিতেছেন সেই হরা রাধা, তাহার সম্বোধনে হরে। ৩। কৃষ্ণও রাধার গুরুজনভয় লজ্জাদি আকর্ষণ করিয়া হরণ করিতেছেন, তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ৪। রাধা যেখানে যেখানে থাকেন বা যান সেখানে সেখানে তিনি দেখেন যেন কৃষ্ণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছেন ও কাঁচুলি আকর্ষণ করিয়া হরণ করিতেছেন, তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ৫। কৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া বলপূর্ব্বক মন আকর্ষণ করিতেছেন, তাহার সম্বোধনে কৃষ্ণ। ৬। হরে অর্থাৎ যেখানেই কৃষ্ণ যান বা থাকেন রাধা তাঁহার সম্মুখে পার্শ্বে ও সর্ব্বত্র রহিয়াছেন তাহা দেখেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ৭। হরে পুনরায় সেই কৃষ্ণকে স্বস্থান হইতে হরণ করিয়া অভিসার করাইতেছেন সেই জন্য তিনি হরা রাধা, তাহার সম্বোধনে হরে। ৮। হরে অর্থাৎ কৃষ্ণকে বনে আগমন করাইতেছেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ৯। রাম নর্ম্মনিরীক্ষণাদি দ্বারা তাঁহাকে রমণ করিতেছেন তাহার সম্বোধনে রাম। ১০। হরে অর্থাৎ তাৎকালিক কৃষ্ণের ধৈর্য্য-

সাধন। এই পরম চমৎকারিণী লীলারঙ্গের সহায়িণী সখিবৃন্দ —যাঁহাদের নামান্তর নদীয়া-নাগরী।

বিরহিণী গৌরবল্লভা ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—তাঁহার গৌরানুরাগরঞ্জিত কণক-কেতকীসদৃশ নয়নদ্বয়ে যেন গৌরপ্রেমের উৎস ছুটিতেছে—নদীয়ার মহা গম্ভীরা-মন্দিরের এই উৎস হইতে শতশত প্রেম-নদী প্রবাহিত হইতেছে—তাহারা সকলেই গৌরপ্রেম-মহাসাগরে মিলিত হইতেছে।

এক্ষণে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—বিরহিণী প্রিয়াজির হস্তে জপমালা—তিনি মন্দ মন্দ সংখ্যানাম জপ করিতেছেন—কিছুক্ষণ এইভাবে গেল। অতঃপর তিনি একবার ধীরে ধীরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন—তিনি এতক্ষণ ভূমিশয্যায় শয়ান ছিলেন—উঠিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। তখন সখি কাঞ্চনা ও অমিতা তাঁহাকে ধরিয়া কোনমতে বসাইয়া দিলেন—বিরহিণী গৌর-বল্লভা সখিক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতের মালা হাতেই রহিল—তিনি উদাস নয়নে মর্ম্মী সখিদ্বয়ের বদনের প্রতি একবার চাহিলেন—নয়নে নয়নে মিলন হইলেই তিনি যেন সরমে বদনচন্দ্র অবনত করিলেন। কিন্তু মৃদুমধুর করুণস্বরে প্রেমগদ্গদবচনে অতি ধীরে ধীরে বামহস্তে সখি কাঞ্চনার এবং দক্ষিণহস্তে সখি অমিতার হস্ত দু'খানি পরম প্রেমভরে ধারণ করিয়া কহিলেন,—

—"দ্বারের আগে ফুলের বাগান
কি সুখ লাগিয়া কৈনু।
মধু খাই খাই ভ্রমরা মাতল
বিরহ জ্বালাতে মৈনু॥
জাতি রুইনু যুথি রুইনু
রুইনু গন্ধ মালতী।
ফুলের সুবাসে নিদ্রা নাহি আসে
কেমন পুরুষ জাতি॥
কুসুম তুলিয়া, বোঁটা তেয়াগিয়া,
শেজ বিছায়িনু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে গায়
রসিক নাগর বিনে॥"—

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে বিরহিণী প্রিয়াজির যেন হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল—তিনি পুনরায় বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তখন মর্ম্মী সখিদ্বয় পুনরায় তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন—অতি কষ্টে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি পুনরায় কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন,—

—"বঁধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিনু দীপ উজারিনু
মন্দির হইল আলা॥
সই, পাছে এসব হইবে আন।
নদীয়া-নাগর গুণের সাগর
কেন বা হইলা বাম॥
কত আশা করি, সব পরিহরি,
আইনু গহন বনে।
পথ পানে চাহি কত বা রহিব,
কত প্রবোধিব মনে॥"—

কথা বলিতে বলিতেই পুনরায় বিরহিণী গৌরবল্লভার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন তাঁহার প্রাণবল্লভের পাদপদ্ম-ধ্যান-মগ্না। এখন পুনরায় তাঁহার প্রেম-সমাধি—মর্ম্মী সখিদ্বয় মহা সশঙ্কিত হইয়া পুনরায় তাঁহার অন্তরঙ্গসেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং মন্দ মন্দ গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সখিগণ কীর্ত্তনের সুরে কহিলেন,—

—"শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র!
শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র!
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচোর!
প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর!"—

মন্দ মন্দ গৌরনাম চলিতেছে ও ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ-সেবাও চলিতেছে—এইভাবে কিছুক্ষণ গেল,—তখন অকস্মাৎ বিরহিণী প্রিয়াজির পুনরায় বাহ্যজ্ঞান হইল—তিনি

লজ্জাদি হরণ করিতেছেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ১১। রাম অর্থাৎ চুম্বন স্তনাকর্ষণ আলিঙ্গনাদির দ্বারা রমণ করিতেছেন, অতএব রাম। ১১। রাম অর্থাৎ তাঁহাকে পুরুষোচিত করিয়া রমণ করাইতেছেন তাহার সম্বোধনে রাম। ১৩। পুনরায় আবার তাঁহাকে রমণ করিতেছেন অতএব রাম। ১৪। হরে অর্থাৎ রাসান্তে কৃষ্ণের মন হরণ করিয়া যাইতেছেন, তাহার সম্বোধনে হরে। ১৫। রাধার মন হরণ করিয়া যাইতেছেন হরি, তাহার সম্বোধনে হরে। ১৬।

ধীরে ধীরে গৌরাঙ্গুরাগরঞ্জিত ও প্রেমবিস্ফারিত নয়নে ইতি উতি চাহিতে লাগিলেন—কোন কথাই বলিতে পারিতেছেন না—যেন কিছু বলি বলি করিতেছেন। অনেক্ষণ পরে করুণ হইতেও সকরুণ ক্রন্দনের স্বরে অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

যথারাগ।

—"সই কেবা শুনাইল গৌর নাম। *
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু গৌর নাম আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে চাহি মনে, পাশরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়॥"—

সুরসিকা ও সুচতুরা সখি কাঞ্চনা তখন ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাভাবিক মধুকণ্ঠে বিরহিণী প্রিয়াজির অনুমতি লইয়া প্রেমাশ্রু-বিগলিত-নয়নে মৃদু মধুর প্রেমগদগদ বচনে কহিলেন—"প্রিয় সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি যে পদটি বলিলে উহা বিরহিণী বৃষভানু-নন্দনী শ্রীরাধিকার উক্তি—শ্যাম-নামের পরিবর্ত্তে তুমি গৌরনাম সংযোগ করিয়া তোমার প্রচ্ছন্নঅবতার-পরনারীত্বের মধুর ভাবটি অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়াছ। বলিহারি তোমার চাতুরী! এখন রসিকশেখর বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার প্রতি উক্তি একটী গান শুন সখি!" এই বলিয়া একটী প্রাচীন পদের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

প্রাণপ্রিয়ে!

—"জপিতে তোমার নাম বংশী ধরি অনুপাম
তোমার চরণে পড়ি বাস।
তুয়া প্রেম সাধি গৌরী আইলাম ব্রজপুরী
বরজ মণ্ডলে পরকাশ।
ধনি! তোমার মহিমা জানে কে?
অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত,
গাইয়া করিতে নারি শেষ।
গঞ্জন বচন তোর শুনি সুখের নাহি ওর
সুধাময় লাগয়ে মরমে।
তরল কমল আঁখি তেরছ নয়ন দেখি
বিকাইনু জনমে জনমে॥
তোমা বিনু যেবা যত পিরীতি করিনু কত
সে পিরীতে না পূরল আশ।
তোমার পিরীতি বিনু স্বতন্ত্র না হলো তনু
অনুভবে কহে চণ্ডীদাস।"—

বিরহিণী প্রিয়াজি ধীরভাবে পদটী শুনিলেন—কোন কথা বলিলেন না—কিছুক্ষণ মনে মনে কি ভাবিলেন পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে উদাসনয়নে একবার মর্ম্মী সখির প্রতি চাহিয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রেমগদগদবচনে কহিলেন—"প্রিয়সখি কাঞ্চনে! বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার কথা স্বতন্ত্র—তিনি কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি—রসিক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে তিনি প্রেমে বশীভূত করিয়াছিলেন—রাধাপ্রেম কৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষাও সমধিক উজ্জ্বল—রাধানাম কৃষ্ণনাম হইতেই শ্রেষ্ঠ,—রাধাপ্রেমের ও রাধানামের তুলনা নাই সখি! * তুমি এসকল কথা এখন এখানে উঠাইলে কেন?

এই বলিয়া গৌরবল্লভা অধোবদন হইলেন। তখন মর্ম্মীসখি কাঞ্চনা দুই একটী মাত্র কথা বলিলেন—"প্রিয়-সখি বিষ্ণুপ্রিয়ে! তোমাতে আমাতে এখন আর এত লুকাচুরি ও ঢাকাঢাকি শোভা পায় না। এখন তোমার আত্মপ্রকাশের শুভ সময় উপস্থিত—তুমি আত্মস্বভাবে আত্মগোপন করিলেও আমরা তোমাকে এখন প্রকাশ করিব।" সখি কাঞ্চনার কথা শুনিয়া বিরহিণী গৌরবল্লভা আর কোন কথা কহিলেন না—কিয়ৎক্ষণ মৌনী রহিলেন। "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বুঝিয়া সখি কাঞ্চনা পুনরায়

* শ্রীল চণ্ডীদাসের রচিত এই পদটিতে "শ্যাম" নাম স্থানে "গৌর" নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

* ক্রমদীপিকায়াং চন্দ্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং—
"মম নাম শতে নৈব রাধানাম সদৃত্তমং।
য স্মরেতু সদা রাধাং ন জানে তস্য কি ফলং॥"

কহিলেন—"দেখ সখি! প্রকটাপ্রকট দুইটি অপূর্ব্ব লীলারঙ্গে তোমরা স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ কর। এযুগে তোমরা দু'জনেই ছন্ন অবতার—কাজেই প্রকটে আত্মপ্রকাশ তোমাদের এই অপূর্ব্ব লীলা, সর্ব্বরসতত্ত্বপূর্ণ-লীলা পুরুষোত্তমের ছন্ন-অবতার-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু অপ্রকট প্রকাশে তোমাদের নিত্য লীলারই যখন পরিপূর্ণ প্রকাশ—তখন সেখানে ছন্নত্বের কোন প্রয়োজনই নাই। তোমাদের সর্ব্বোত্তম নর-লীলার পরিপুষ্টির এখন শুভ কাল উপস্থিত—আমরা তাহা বুঝিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে নিজ মুখে তুমি সে কথার আভাসও আমাদের দিয়াছ।" এই বলিয়া সখি কাঞ্চনা মর্ম্মান্তিক মনঃদুঃখে অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি আর কোন কথা বলিলেন না।

এদিকে অন্তঃপুরাঙ্গনে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের শ্রীমূর্ত্তির শুভপ্রতিষ্ঠাদিনে অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন চলিতেছে—এখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—মন্দ মন্দ অতি সুমধুর নাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে—সেই মধুর কীর্ত্তনধ্বনি—গম্ভীরা-মন্দিরাবদ্ধা বিরহিণী গৌরবল্লভা ও তাঁহার মর্ম্মী সখিগণের কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছে। প্রিয়াজির ভজন-মন্দিরে এক্ষণে গভীর নীরবতা একছত্রী রাজ্য বিস্তার করিয়াছে—তিনি এবং তাঁহার মর্ম্মী সখিবৃন্দ যেন ঘোর গৌর-বিরহ-সমাধিমগ্না।

অকস্মাৎ গৌর-অঙ্গ-গন্ধে ভজন-মন্দির মহমহ করিতে লাগিল—দিব্যালোকে নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির উদ্ভাসিত হইল—সেই স্নিগ্ধালোকের অপূর্ব্ব জ্যোতি ও কিরণচ্ছটা অন্তঃপুরাঙ্গণের কীর্ত্তনস্থলীতে পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ বিস্ময়ে চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন—তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন বিরহিণী গৌরবল্লভার ভজন-মন্দির হইতে এই অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ দিব্যালোকচ্ছটার উদ্ভব হইয়াছে—মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যেন স্থির-ঘন-বিদ্যুল্লতার মধুর স্নিগ্ধ শীতল-কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া কীর্ত্তন-পরিশ্রান্ত ভক্তগণের নয়ন মন-প্রাণ ও শরীর স্নিগ্ধ করিতেছে।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরে অকস্মাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আবির্ভাব হইল—অকস্মাৎ গৌর-প্রেম-সমাধিমগ্না গৌর-বল্লভার এবং তাঁহার সখিবৃন্দের সমাধিভঙ্গ হইল। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিলেন নদীয়া-নাগর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ তাঁহার দিব্য পর্য্যঙ্কোপেরি অপূর্ব্ব নবনটবর-নাগরবেশে গৌর গোবিন্দরূপে ত্রিভঙ্গভাবে দাড়াইয়া বংশী হস্তে অপরূপ মধুর স্বরে বংশী বাদন করিতেছেন—সেই মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণেই বিরহিণী প্রিয়াজি আর তাঁহার মর্ম্মী সখিবৃন্দের সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে—এবং এই অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি কীর্ত্তন-স্থলীর ভক্তবৃন্দের কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে—তাঁহারাও বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন—এই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ সুমধুর বংশীধ্বনি আসিতেছে প্রিয়াজির ভজন মন্দির হইতে, তাহাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন—সেই দিকে তাঁহাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। মন্দ মন্দ কীর্ত্তন চলিতেছে—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারি॥
জয় নন্দনন্দন জয় বংশীধারী।
জয় রাধাবল্লভ নিকুঞ্জবিহারী॥"

এই সময়ে অতিবৃদ্ধ ঈশান কীর্ত্তনস্থলীতে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর অনুমতি লইয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিলেন—

যথারাগ।

—"আজু গৌর-গোবিন্দ-জনম-অভিষেক।
ভকতবৃন্দ সব নয়ন ভরি দেখ॥
সেই শুভ লগন, পূর্ণিমা গ্রহণ,
গৌর-মঙ্গল-গান, জগ-ভরি গাহিছে।
আওয়ে নদীয়া-পতি, অধম-পতিত-গতি,
কোটি কোটি নতি, পদে তব করিছে॥
আও শচী-নন্দন, জগজন-জীবন,
বিষ্ণুপ্রিয়া-ধন, আও চলি আওয়ে।
আনন্দ-ঘন-রূপ, প্রেম-ভকতি-কূপ,
নবদ্বীপ-ভূপ, হরি বোলে নাচিয়ে॥
নদীয়া-পুরন্দর, কলি-দুষ্কৃতি-হর,
প্রভু বিশ্বম্ভর, আও চলি রঙ্গে।
আও শচী-দুলালিয়া, সহ বিষ্ণুপ্রিয়া
হেম কান্তি লৈয়া, ভকতগণ সঙ্গে॥
যুগল রূপ হেরি, হে প্রাণ গৌরহরি,
তাপিত হৃদয়েরি জুড়ায়ব জ্বালা।
যুগল চরণেতে, চন্দন গন্ধেতে,
সবে মিলে মনসাধে, পিনায়ব মালা॥

ভণয়ে হরিদাসী আঁখি নীরে সদা ভাসি
(ডাকে) আওয়ে জগবাসী, হের নবদ্বীপ-চন্দ।
(বলে) নদীয়া যুগল ভজ, প্রেম-ভকতি যজ,
বাঞ্ছিত ভবঅজ, আনন্দকন্দ।"—
গৌর-গীতিকা

অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন চলিতেছে—মধ্যে মধ্যে পদাবলীও গীত হইতেছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের অতিবৃদ্ধ প্রাচীন ভৃত্য ঈশানের কীর্ত্তন সর্ব্ব গৌরভক্তগণের অতিশয় প্রিয় এবং বিশিষ্ট উপভোগ্য। ঈশানের ভজন কেবল রোদন—কিন্তু আজ একান্ত প্রাণের আবেগে তিনি একটী পদ গাইলেন—মধ্যে মধ্যে তিনি মনের আবেগে এরূপ করেন—তাঁহার দন্তহীন বদনে পদের বাক্যবিন্যাসছটার উপযুক্ত সন্মান হয় না সত্য—কিন্তু তাঁহার ভাবের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এবং প্রেমভক্তির প্রাবল্যে তাঁহার কীর্ত্তন সকলের মনমুগ্ধকর হয়। গৌরভক্তমাত্রেই তাঁহাকে মহাসমাদরে কীর্ত্তনে আহ্বান করেন। ঈশান বৈষ্ণবীয় দৈন্যের মূর্ত্ত অবতার—তাঁহার তুলনা তিনিই।

কৃপানিধি পাঠক ও পাঠিকাবৃন্দ! কীর্ত্তনস্থলী হইতে বিরহিণী গৌরবল্লভার ভজন-মন্দিরের অপূর্ব্ব দৃশ্যটি একবার মনশ্চক্ষে দর্শন করুন—বিরহিণী প্রিয়াজির রাতুল শ্রীচরণযুগল অন্তরে ভক্তিভরে ধ্যান করিয়া একবার "জয় বিষ্ণুপ্রিয়া" প্রেমধ্বনি দেন—জীবন সার্থক হউক—আপনাদের গৌরভজন সফল হউক।

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তরে বংশীধারী শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ ত্রিভঙ্গবঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া মধুর বংশীধ্বনিতে গান করিতেছেন—আর আড়নয়নে তাঁহার বিরহিণী প্রাণবল্লভার প্রতি করুণ নয়নে,চাহিতেছেন—রসিকচূড়ামণির সেই অপূর্ব্ব রসতত্ত্বসার মধুর গীতরত্নটি শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বশেষ সারতত্ত্বটি শিক্ষা করুন—রসতত্ত্বের চরমসীমা আস্বাদন করুন।

যথারাগ।

নদীয়ার রাই তুমি।
(ওগো নদীয়ার) —রাই, তুমি সে আমার গতি!
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি বসি গীত আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসে থাকি তার তীরে।
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুন হে কিশোরি চারিদিকে হেরি
যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান,
তব প্রেমে হিয়া ভোর।
ভজন সাধন জানে যেই জন,
তাহারে সদয় বিধি।
আমার ভজন তোমার চরণ
তুমি রসময়ী নিধি॥"— চণ্ডীদাস।

সুস্পষ্টভাবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের সুপরিচিত মধুর কণ্ঠস্বরে সখিমণ্ডলমধ্যস্থা বিরহিণী প্রিয়াজি স্থিরভাবে এই গানটি আমুল শ্রবণ করিলেন,—আকুলপ্রাণে প্রেমবিস্ফারিত নয়নে একবার তাঁহার প্রাণবল্লভের বদনের প্রতি চাহিলেন—চাহিবামাত্র দিব্যালোকচ্ছটা অন্তর্হিত হইল, ভজনগৃহ ঘোর অন্ধকারে আবৃত হইল—উর্দ্ধে দৈববাণী হইল—

"প্রিয়তমে বিষ্ণুপ্রিয়ে!
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আজি দারু মূর্ত্তে লীন।
হবে তুমি মোর অঙ্গে,(নহি) তুমি আমি ভিন॥
অপ্রকট পরকাশে যুগল-মিলন।
মোর সব ভক্তগণে পাবে দরশন॥
(মোর) নদীয়ার দারুমূর্ত্তে যুগল-বিলাস।
রসিক ভকতগণে দেখিবে প্রকাশ॥
পুষ্পোদ্যানে নিত্য রাস নাগরীর সনে।
যোগপীঠ মায়াপুরে হবে নিরজনে॥
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।
(পুনঃ) সেই ভাবে প্রকাশিব আমার স্বরূপ॥
তুমি মোর পরাশক্তি রাধাবির্ভাব।
আমি যৈছে পরতত্ত্ব কৃষ্ণাবির্ভাব॥
(এই) বিশিষ্ট ভাবেতে নবদ্বীপে পরকাশ।
মাধুর্য্য-বৈভব মোর যুগল-বিলাস॥"—

এই দৈববাণী সখিগণ সহ গৌরবল্লভা শ্রবণ করিবামাত্র

সকলেই প্রেমানন্দে গৌরকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন সখি-কাঞ্চনা গানের ধুয়া ধরিলেন,—

প্রাণগৌরাঙ্গ হে!

—"হৃদি-নদীয়ায় বেঁধেছি কুঞ্জ,
কুসুম তুলিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ,
সাজায়ে রেখেছি কুটীর মঞ্চ,
তোমারি কারণ গৌর হে!
দূরে ত্যজিয়া কুলের গর্ব্ব,
সতীর সতীত্ব করিয়া খর্ব্ব,
হৃদয়ে পেতেছি আসন দর্ভ,
এস এস এস বস হে!!
বিছায়ে রেখেছি কুসুম-শয্যা,
যতনে করেছি বিলাস-সজ্জা,
এসেছি বিজনে ত্যজিয়ে লজ্জা,
(তোমার) গৌর রূপেতে ভুলিয়
গৌর-রতন ধরিব বক্ষে,
(ও) রূপ-মাধুরী হেরিব চক্ষে,
এস হে নাথ! হৃদয়-কক্ষে,
দাসীরে করুণা করিয়া॥
ছাড়ি গৃহবাস বিজনারণ্যে,
বেঁধেছি কুঞ্জ তোমারি জন্যে,
ভয় হয় পাছে শুনিবে অন্যে,
গুপত প্রণয়-কাহিনী।
ত্যজি কুলশীল তোমারি সঙ্গ,
করিতে এসেছি পিরীতি-রঙ্গ,
ক'রনা সুখের স্বপন ভঙ্গ,
মোরা যে কুলের রমণী॥
কুঞ্জে এস হে পরাণ-কান্ত,
দগ্ধ হৃদয় কর হে শান্ত,
মোরা যে তোমারি দাসী একান্ত,
তুমি হে জীবন-ভরসা।
অধমা বলিয়া ক'রনা উপেক্ষা,
তব পদে নাথ! এইটি ভিক্ষা,
তোমারি পিরীতি দীক্ষা-শিক্ষা,
দাও হে চরণ পরশা॥
নদীয়া-বিহারি! এস হে কুঞ্জে,
(মোদের) হৃদি-নদীয়ায় ভ্রমরা গুঞ্জে,
অধমা দাসীর পিরীতি ভুঞ্জে,
মিটাও প্রাণের বাসনা।
নাগর-শেখর ওহে গৌরাঙ্গ,
হৃদি-নিকুঞ্জে কর হে রঙ্গ,
মধু হতে মধু তোমার সঙ্গ,
তোমার পিরীতি সাধনা।
(মোরা) কুলে দিয়ে কালি হয়েছি ধন্য,
না জানে অধমা তোমারে ভিন্ন,
সাধন-যুদ্ধে বড় বিপন্ন,
নিবেদি চরণে ধরিয়া।
বল দাও প্রাণে, দাও হে শক্তি,
শিখাও যতনে প্রেম-ভক্তি,
চাহিনা আমরা মোক্ষ মুক্তি,
তোমার পিরীতি ছাড়িয়া॥
পাতিয়ে তোমার প্রেম-ফান্দ,
ভালবাসা-ডোরে মোদের বান্ধ,
নিরখি তোমার বদন-চান্দ,
(যেন) পরম পিরীতি পাই হে।
গৌর হে! তুমি নয়নানন্দ,
মূরতি তোমার প্রেম-কন্দ,
হেরিলে নয়ন হয় যে ধন্দ,
তোমারি তুলনা তুমি হে॥
মধুর ভজন পরম-তত্ত্ব,
নদীয়া-যুগল ভজন নিত্য,
নদীয়া-নাগরী তাহাতে মত্ত,
শ্রেষ্ঠ সাধন জানিয়া।
আভাস পাইয়া লয়েছে সঙ্গ,
চরণে ঠেলনা প্রাণ-গৌরাঙ্গ,
হৃদয়ে দহিছে সদা অনঙ্গ,
দুখিনী এ হরিদাসিয়া॥"—

গৌর-গীতিকা।

এই ভাবে আত্মনিবেদন করিয়া সখি কাঞ্চনা—অন্যান্য সখিগণসহ সসম্ভ্রমে তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজির এখন অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা—তিনি পতিপাদপদ্ম-ধ্যান-নিরতা—তাঁহার প্রাণবল্লভের কাষ্ঠ-পাদুকা দু'খানি বক্ষে

ধারণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের রূপসাম্য চিত্রপটখানির প্রতি নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন—তাঁহার কমল নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমধারা বহিতেছে। তখন মণ্ডলী করিয়া সখিবৃন্দ তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বক্ষণ। সখি কাঞ্চনাপ্রমুখ নিত্য সখিবৃন্দ অপ্রকট-প্রকাশের পূর্ব্বাভাস পাইয়া মহা-গম্ভীরা-মন্দিরাভ্যন্তরেই যাহা দর্শন করিতেছেন—তাঁহাদের প্রভাতী কীর্ত্তনেই তাহার মর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন শ্রীশ্রীনদীয়াযুগল বিচিত্র বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মনিময় রত্নখচিত স্বর্ণপালঙ্কে শয়ন করিয়া পূর্ব্ববৎ পরম সুখে শয়নমন্দিরে নিদ্রা যাইতেছেন। ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নবিলাস-দর্শন নহে। অপ্রকট-প্রকাশের পূর্ব্বাভাস তাঁহারা জাগ্রতেই যেন সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নিত্য সখিবৃন্দ। তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরম প্রেমানন্দে রীতিমত সঙ্গতের সহিত তখন প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—সখি কাঞ্চনা ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"উঠ গো নদীয়া-নাথ রজনী পোহাল।
উঠ সখি গৌরপ্রিয়া প্রভাত হইল॥ ধ্রু॥
বিগলিত সুললিত দুঁহুক বিলাস।
সোঙরি কাঞ্চনাদির পরম উল্লাস॥
অদভুত অপরূপ যুগল উজোর।
রসালাপে নিশি জাগি ভোরে ঘুম ঘোর॥
(যেন) হেম-বৃক্ষে হেম-লতা রহত জড়ায়ে।
গৌরবক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়া হরিষে ঘুমায়ে॥
অরুণ উদিত প্রায় পূরব গগনে।
ভ্রমরা ঝঙ্কারি ধায় কমলেরই বনে॥
শুক পিক ফুকারত জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
ময়ূরের কেকারবে চাহে চমকিয়া॥
অলসে অবশ তনু উঠন না যায়।
দৃঢ় ভুজদণ্ডে বান্ধি আলিস তেজয়॥
কথোক্ষণে দুঁহুজনে উঠিয়া বৈঠল।
বিগলিত কেশ গোরা যত্নে বান্ধি দিল॥
(মরি যাইরে প্রেমের বালাই লয়ে)
(কত ছান্দে কেশ বান্ধে)
দুহু মুখে দুঁহুজন ঘনই চুম্বন।
বিচ্ছেদ সোঙরি প্রিয়া করয়ে রোদন॥
কান্দি বলে প্রাণনাথ মুঞি অভাগিনী।
এত ভাগ্য বিধি মোর রাখিবে কি জানি॥
(তবে) হাসি গোরা বলে প্রিয়ে! তুহু মোর প্রাণ।
তুহু বিনা এ জগতে নাহি জানি আন॥
নিখিলের যত নিধি তুঁহু তারই সার।
তুঁহু মোর নয়নমণি হৃদি-ফুলহার॥
(মোরে ব্যথা দিতে কেন প্রিয়ে কাঁদ তুমি)
গবাক্ষ আড়ালে রহি সব সখিগণ।
কর্ণতৃপ্তি করি শুনে প্রেম-আলাপন॥
রঙ্গ হেরি কোন সখি হাসিয়া উঠিল।
সখি আগমন জানি (প্রিয়া) লজ্জিত হইল॥
তুরিতে ঘুঙঠা দেই মিলল সখিরে।
সখিগণ পুছে তবে বিলাস-ব্যাপারে॥
লাজে লজ্জিতা প্রিয়া রহে মৌন ধরি।
রঙ্গিনী কহত ইহ প্রিয়াক চাতুরী॥
এই মত নিত্য নব বিচিত্র বিলাসে।
বিষ্ণুপ্রিয়া-দাসী হেরে মনের হরিষে॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ

অপ্রকট-প্রকাশের পূর্ব্বাভাস-গীতি প্রথমে গাইলে সখি কাঞ্চনা। সখি অমিতা গৌরপ্রেমাবেশে তাহার প ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"বিনোদ নাগর, বিনোদ সুন্দর,
বদনে বিনোদ হাসি।
বিনোদ ঠামে, বিনোদিনী সনে,
(কিবা) শোভিছে বিনোদ-শশী।
বিনোদ রঙ্গিমা, বিনোদ ভঙ্গিমা,
বিনোদ চিবুক ধ'রে।
বিনোদ আদরে, বিনোদ সুস্বরে,
পিরীতি আরতি করে।
বিনোদ ভুজেতে, বিনোদ গলেতে
বিনোদ প্রেমের ফাঁসি।

বিনোদ চাহনি, গৌর-বিনোদিনী,
বদনে বিনোদ হাসি ॥
বিনোদ নাগর, রসের সাগর,
বিনোদ রসিক ভূপ।
বামে বিনোদিনী, বিনোদ রঙ্গিনী
বিনোদ প্রেমের কূপ ॥
বিনোদ গলায়, বিনোদ মালায়,
বিনোদ মধুর দোলে।
বিনোদ রঙ্গিনী বিনোদ গাঁথুনী
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে ॥
বিনোদ চিকুরে, শোভে থরে থরে
বিনোদ সুন্দর মালা।
বিনোদ অধরে, কত সুধা ঝরে,
ভুবন করেছে আলা ॥
বিনোদ চরণে, বিনোদ স্বননে,
বিনোদ নূপুর ধ্বনি।
বিনোদ গমনে, বিনোদ হেলনে,
মূরছে বিনোদ ধনি ॥
বিনোদ নগরে, বিনোদ বিহরে,
বিনোদ নাগর রায়।
বিনোদ মঙ্গল, বিনোদ যুগল,
বিনোদ মধুর গায় ॥
বিনোদ বন্ধনে, বিনোদিনী সনে,
বিনোদ বিলাস-রঙ্গ।
বিনোদ মন্মথ, বিনোদিনী যূথ,
বিনোদ নাগর সঙ্গ।
বিনোদ গৌরাঙ্গ, বিনোদিনী সঙ্গ,
বিনোদ মিলন গীতি।
বিনোদ রূপেতে, যোগেন্দ্রের চিতে,
বাড়ুল যুগল প্রীতি ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

বিরহিণী গৌরবল্লভার এখন নিপট বাহ্যদশা। তিনি ধীরভাবে সকলি শুনিলেন ও সকলি বুঝিলেন। তাঁহার বদনের ভাব প্রসন্ন—শ্রীমুখে যেন ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিয়াছে। তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত অপ্রকট-প্রকাশে শুভ মিলনোদ্দেশে তিনি যেন গৌর-প্রেমরসে ডগমগ হইয়াছেন—তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া সখিবৃন্দের মনে গৌরপ্রেমানন্দের লহরী ছুটিতেছে।

এমন সময়ে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ণক্ষণে বিরহিণী গৌর-বল্লভা ধীরে ধীরে তাঁহার ভজন-মন্দির হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার মনে আজ অসাধারণ স্ফূর্ত্তি—ক্ষীণ অঙ্গে অলৌকিক বল—ক্ষীণাঙ্গী, মলিন-বসনা, মহা তপস্বিনী গৌরবক্ষবিলাসিনী প্রিয়াজির সর্ব্বাঙ্গে যেন পরম স্নিগ্ধকর দিব্যজ্যোতিচ্ছটা প্রকাশ পাইতেছে—তাঁহার শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত কোটীচন্দ্রসুশীতল পদ-নখরে শত কোটিচন্দ্রের শোভা বিকশিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার নিত্য সখি ও দাসীবৃন্দসহ ধীর-মৃদু-মন্থর-গমনে তাঁহার এত সাধের গৌর বিরহ-রসাস্বাদনাগার নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-মন্দির হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দু'টী মর্ম্মী-সখি কাঞ্চনা ও অমিতা দুই পার্শ্বে তাঁহাকে ধরা-ধরি করিয়া বাহু বেষ্টনে তাঁহার তড়িত প্রতিমাসদৃশ শ্রীঅঙ্গ-খানি প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রাণকোটিসর্ব্বস্বধন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সখিসঙ্গে ধীর-গমনে ভজন-মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরহিণী প্রিয়াজি সসম্ভ্রমে তাঁহার ভজন-মন্দিরদ্বারে গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন—একবার করযোড়ে উর্দ্ধমুখে মুক্তাকাশের প্রতি চাহিয়া কি যেন প্রার্থনা করিলেন। তখন অকস্মাৎ গৌর-অঙ্গ-গন্ধে সে স্থান মহমহ করিতে লাগিল।

—অতঃপর দৈববাণী হইল—

—"মোর দারু মূর্ত্তে মোর নিত্য আবির্ভাব।
বিষ্ণুপ্রিয়া পরাশক্তি মূর্ত্ত-মহাভাব ॥
মোর অঙ্গে হবে লীন এ মোর আদেশ।
অপ্রকট-পরকাশে পীরিতি বিশেষ ॥
দুঃখ নাহি কর চিত্তে দৃঢ় কর মন।
নদীয়া-নাগরী সবে মোর নিজজন ॥
নদীয়ার পুষ্পোদ্যানে রাস-সহচরী।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কায়ব্যূহ নদীয়া-নাগরী ॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গল।

এই দৈববাণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের কণ্ঠস্বরে উপস্থিত সকলেই শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। গৌর-বিরহিণী প্রিয়াজির কণককেতকী সদৃশ কমল নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল

—সখি ও দাসীবৃন্দের শতসহস্র নয়নরাজি যেন গৌর-বক্ষ-বিলাসিনী প্রিয়াজির বদনকমলে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তখন গৌর-প্রেমাকুলা প্রিয়াজির ইঙ্গিতে সখি ও দাসী-বৃন্দ রীতিমত সঙ্কেতের সহিত গৌরকীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশঃ ধীর-পদে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণের শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গলে,—

—"তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, ভেল তরলিত হিয়া,
সখি সঙ্গে শ্রীমন্দিরে করিলা গমন।
কাণ্ডাপটে অঙ্গাবৃতা, হরিনাম-মালাযুতা,
ধীর পদে চলে দেবী ল'য়ে নিজজন॥
সখি দাসী অগণন, ভাগ্যবতী অকথন,
চলে সঙ্গে করি প্রেমে গৌর-কীর্ত্তন।
তার মধ্যে হরিদাসী, অভাগিয়া সর্ব্বনাশী,
সর্ব্বশেষে চলু সঙ্গে স্থির করি মন।—"

তথাহি কীর্ত্তন-পদং—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"

অন্তঃপুরের শ্রীমন্দিরে তখনও শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমার অষ্ট-প্রহর কীর্ত্তন চলিতেছে—গৌরভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের আদি কীর্ত্তনের ধুয়া ধরিয়াছেন—

—"হরি হরয়ে নম কৃষ্ণ যাদবায় নম।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"—

শচী-আঙ্গিনায় প্রেমের পাথার বহিতেছে—গৌর-প্রেমানন্দে গৌরভক্তগণ উন্মত্তভাবে উদ্দণ্ড নর্ত্তনকীর্ত্তনে মগ্ন। অকস্মাৎ তাঁহারা দেখিলেন,—

—"কীর্ত্তন করিয়া আসে নাগরীর দল।
কোটী চন্দ্রালোকে করি আঙ্গিনা উজল॥"—

কীর্ত্তনদলের পশ্চাদ্ভাগে ভক্তগণ দেখিতেছেন বিরহিণী গৌরবল্লভা কাণ্ডাপটে শ্রীঅঙ্গ আবরিত করিয়া অপূর্ব্ব গৌরপ্রেমরঙ্গে ধীর পদবিক্ষেপে শ্রীমন্দিরে আসিতেছেন। কোটি সূর্য্যসম অপূর্ব্ব তেজপুঞ্জ তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বিকশিত হইয়া বিস্তৃত আঙ্গিনা দিব্যালোকে উজ্জল করিয়াছে—যথা,—

—"কোটি সূর্য্যসম তেজ প্রিয়াজির অঙ্গে।
সখিমণ্ডল মধ্যস্থা ধীরে চলু রঙ্গে॥"

সর্ব্বাগ্রে অতিবৃদ্ধ ঈশান আসিয়া কীর্ত্তনমত্ত গৌরভক্ত-গণকে সাবধান করিয়া দিলেন—গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীশ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সখিসঙ্গে তাঁহার প্রাণবল্লভকে দর্শন করিতে আসিতেছেন। এই কথা বলিয়াই তিনি আঙ্গিনার এক পার্শ্বে আছাড়িয়া পড়িয়া নীরব প্রেম-ক্রন্দনের অস্ফুট সকরুণ প্রেমধ্বনি উঠাইলেন। তখন গৌরভক্তগণ সসম্ভ্রমে গৌর-বল্লভার উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সখিবৃন্দের কীর্ত্তনে দোহার দিতে লাগিলেন—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"

মর্ম্মী সখি কাঞ্চনা ও অমিতার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া—অপূর্ব্ব গৌরপ্রেমাবেশে রঙ্গেভঙ্গে ধীর মন্থর গমনে বিরহিণী প্রিয়াজি শ্রীমন্দিরের জগমোহনের পাদদেশে উঠিয়া তাঁহার প্রাণ-বল্লভকে গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। যথা—

—"সখি সনে আগমন, দেখি গৌরভক্তগণ
সম্ভ্রমে ছাড়িলা পথ দণ্ডবৎ করি।
কীর্ত্তন ধরিলা সবে, নাগরীর মনোভাবে
"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"

তাৎকালিক বিরহিণী গৌরবল্লভার ভাব,—

—"অভিসারে যেন রাধা, নাহি মানে বিঘ্ন বাধা,
শ্যাম দরশনে চলু নিকুঞ্জ-কাননে।
তৈছন বিষ্ণুপ্রিয়া, ভেল তরলিত হিয়া,
নিত্য মিলন আশে প্রাণ-নাথ সনে॥"—

গম্ভীরা-মন্দিরাবদ্ধা, নির্জ্জন ভজননিরতা বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই যে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রাণবল্লভের সহিত মিলনের অপূর্ব্ব মধুর ভাবটি, ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম আছে। অদ্ভুত-চরিত্রা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রপ্রকৃতি প্রিয়াজির এই যে অদ্ভুত চেষ্টা, তাহার মর্ম্ম বুঝিবার ক্ষমতা ও শক্তি তাঁহারই সাধনায় ও উপাসনায় অর্জ্জিত হয়। ইহা সাধকের সাধনালব্ধ অমূল্যধন।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গলে—

—"অঙ্গনে ভকতগণ, করে নাম সঙ্কীর্ত্তন,
তা-সবার সম্মুখেতে দেবীর বিজয়।
কাণ্ডাপট দূরে রাখি, প্রেমাবেশে ঠারি আঁখি,
বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া (গৌর) পিরীতি জাগায়॥
এ যে বড় অদভুত, প্রিয়াজির সুচরিত,
নদীয়া-নাগরীগণে করে কানাকানি।
প্রিয়াজির লীলারঙ্গ, নাহি বুঝে বহিঃরঙ্গ,
অন্তরঙ্গ ভক্ত মাঝে ভেল জানাজানি॥
দাসী হরিদাসী ভণে, প্রিয়াজি আপন মনে,
স্বতন্ত্রতা পরিচয় দিলেন আপনি"—

বিরহিণী গৌর-বল্লভা এক্ষণে গৌরানুরাগরঞ্জিত নয়নে প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া সখি ও দাসীবৃন্দের নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। প্রধানা সখি কাঞ্চনা ও অমিতার কণ্ঠদেশ গৌরপ্রেমাবেশে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া প্রিয়াজি তখন কানে কানে গোপনে কি প্রেমরহস্য-কথা কহিলেন—তাহা অন্যে কেহ শুনিতে পাইলেন না। মণ্ডলী করিয়া সখি ও দাসীবৃন্দ সেখানে দাঁড়াইয়া প্রেমাশ্রু-নয়নে তাঁহাদের পরমারাধ্যা ইষ্টদেবীর শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের নয়নে প্রেমনদী বহিতেছে। পরম দয়াবতী ও স্নেহবতী প্রিয়াজি তাঁহাদের জনে জনের হস্ত ধারণ করিয়া মধু হইতে মধুর সুমিষ্ট প্রেম-গদগদভাবে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন—এ বড় মর্ম্মভেদী হৃদিবিদারক ও প্রাণঘাতী করুণ দৃশ্য—ইহা ভাষায় বর্ণনার যোগ্য নহে—ইহার বর্ণনার ভাষাও নাই।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে,—

—"কাঞ্চনা অমিতা সখি দাঁড়ায়ে দু'পাশে।
প্রিয়াজি বিদায় মাগে সুমধুর ভাষে॥
প্রেমভরে কণ্ঠে ধরি বাঁধি আলিঙ্গনে।
প্রিয়াজি গোপনে কিছু কহেন সখিগণে।
নয়নে প্রেমাশ্রু বহে প্রফুল্লবদন।
মণ্ডলী করিয়া আছে যত নিজ জন॥
শুভ দৃষ্টিপাত করি সভার উপরি।
বিদায় মাগেন দেবী করে কর ধরি॥
অস্পৃশ্য পামরী পাপী দাসী হরিদাসী।
দূরে দাঁড়াইয়া দেখে আঁখিনীরে ভাসি॥"—

অতঃপর অকস্মাৎ গাঢ় অন্ধকারে শচী-অঙ্গিনা পরিপূর্ণ হইল—কেহ কাহাকেও দেখিতে পারিতেছে না—চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তনের ধ্বনি তখন কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল,—

তখন,—

—"প্রবেশিলা বিষ্ণুপ্রিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে।
পড়িল কবাট তবে অতি ধীরে ধীরে॥"—
—"ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রভুর জন্ম দিনে।
দারুমূর্ত্তে লীন দেবী হইলা আপনে।"—

তৎক্ষণাৎ দিব্যালোকে শ্রীমন্দির ও আঙ্গিনা উদ্ভাসিত হইল—কীর্ত্তন তখন পূর্ব্ববৎ সুশৃঙ্খলার সহিত পুনরায় নিয়ন্ত্রিত হইল—সর্ব্ব গৌরভক্তবৃন্দ সমস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"

এই যে অপ্রকট-প্রকাশে নদীয়ায় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের নিত্য যুগল-মিলন—কৃপাময়ী প্রিয়াজি যাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিলেন, তিনিই দেখিতে পাইলেন। যথা—

—"দিব্যচক্ষু কৈলা দান প্রিয়াজি যাহারে।
সে দেখিলা এ মিলন দিব্য চক্ষুদ্বারে॥
দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইলা প্রাঙ্গণ।
প্রভাত হইতে এবে আছে কিছুক্ষণ।"—

এখনও প্রভাত হয় নাই—অকস্মাৎ শ্রীমন্দিরের দ্বারের কপাট খুলিয়া গেল—তখন প্রিয়াজির বিশিষ্ট কৃপাপ্রাপ্ত পরম সৌভাগ্যবান নদীয়া-যুগলভজন-ভিখারী রসিক ভক্তগণ কি দেখিলেন ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করুন,—

—"খুলিল কবাট তবে প্রিয়াজি ইচ্ছায়।
নদীয়া-যুগলরূপ হেরে আঙ্গিনায়॥"—
—"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"—

তখন আনন্দ-কোলাহলে শচী-আঙ্গিনা পরিপূর্ণ হইল। গগনভেদী গৌর-কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিল,—

—"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী॥"—

কাঞ্চনাদি সখিগণ তখন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের যুগল-বিলাস-গীতি গাইলেন—তাল মান লয় সংযোগে সুমধুর বাদ্যযন্ত্রসহ সখি কাঞ্চনা কলকণ্ঠে ধুয়া ধরিলেন,—

রাগ—বেহাল একতালা।

—"হের বিষ্ণুপ্রিয়া রঙ্গিণী।
রস-গৌর-অঙ্কে, রস-পালঙ্কে
বিলসে গৌর-কামিনী॥
কাঁপে থর থর আহা কি রঙ্গে,
(প্রাণ)-নাথ অঙ্গে রস-প্রসঙ্গে,
যাপিতে মধুর যামিনী।
মুখ-শোভা জিনি বিমল ইন্দু,
সিঁথিতে সিন্দুর কপালে বিন্দু,
নাশায় বেশর পরি মনোহর,
মোহনে মোহে মোহিনী॥
পিন্ধন-সাড়ী অতি বিচিত্র
রাঙ্গা পাড় তাহে রঙ্গিণ চিত্র
পদে অলক্তক রাগ-দীপ্ত—
তপ্ত হেম-বরণী।
অতি অপরূপ রস-আবেশ,
নাহি অন্তরে লাজ লেশ,
অধরে নাহি আবরে কেশ,
রসভরে উন্মাদিনী॥
উজ্জ্বল চারু গণ্ড উপরে,
কজ্জল ভাসে নয়ন-নীরে,
মজ্জিত যেন রস-সাগরে,
কান্ত-ক্রোড়ে সীমন্তিনী।
ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিকাশ,
উল্লাসে বহে সঘনে শ্বাস,
গদগদ আধ মধুর ভাষ,
ভাবে অমিয়া-ভাষিণী॥
তাহে আর কত রস-তরঙ্গ,
(সে প্রেম-) পয়োধি অঙ্গে হয় যে ভঙ্গ,
এ দাস বিশ্বরূপ স্মরি সে রঙ্গ,
করে প্রিয়ার জয়ধ্বনি॥"—

গৌর-লীলা-গীতিকাব্য।

সখি অমিতা স্বভাবতঃ পরম গম্ভীরা-প্রকৃতি—আজ তিনি নদীয়া-যুগলরসে উন্মাদিনী হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রাণ খুলিয়া গৌর-যুগল-গীতির ধুয়া ধরিলেন,—

যথারাগ।

—"পূর্ণিমা চাঁদিনী মধুর যামিনী,
কুন্দ-মালতী-কুসুম-শোভিনী,
মনমোহিনী সুখদায়িনী,
উয়ল নদীয়া-মাঝে!
রতন আসনে কুসুম ভূষণে,
জড়িত শোভিত ললিত রচনে,
ধরণী উজোরি রস-গাগরী,
গৌর-প্রিয়াজি সাজে॥
কিবা অমল-কোমল-নয়ন-ছাঁদ,
প্রেমে-গড়া-তনু গৌর-চাঁদ,
রসরঙ্গিনী গোরা-মোহিনী,
বামেতে প্রিয়াজি রাজে।
বিমল উজল যুগল সাজ,
হেরি রতি-পতি পাওল লাজ,
প্রেম-বাদর রস-আদর,
রসবতী রসরাজ॥
সরস মধুর মধুর ভাষ,
মৃদুল মঞ্জুল মোহন হাস,
সুধা-মাধুরী রস-চাতুরী,
কণককিঙ্কিণী বাজে।
নিরখি দুঁহুক বদন-ইন্দু,
উছলে ভকত হৃদয়-সিন্ধু,
বিন্দু যাচত সিন্ধু সমীপে,
সেবারাম নিরলাজে॥"—

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ।

এই যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের যুগলবিলাস-লীলারঙ্গ, ইহা তাঁহাদের নিত্য সখিবৃন্দের এবং তদনুগা নবদ্বীপ-রস-রসিকা সখি ও দাসীবৃন্দেরই মধুর ভজন-বিজ্ঞতাবেদ্য এবং তাঁহাদেরই পরমোপাস্য নিজস্ব অমূল্য বস্তু। তাঁহাদিগেরই পদাশ্রিত ও কৃপানুগত রসিক গৌরভক্তগণ—এই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ রহোলীলার আধ্যাত্মিক রহস্য ও মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। অতএব শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের নিত্যসখি ও দাসীবৃন্দের আনুগত্য স্বীকার ভিন্ন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের গৌর ভজনপ্রণালী জানিবার অন্য কোন উপায় নাই,—আর এই অপূর্ব্ব চমৎকারিতাপূর্ণ উন্নতোজ্জল মধুর নবদ্বীপ-রসাস্বাদনের অন্য কোন পন্থাও নাই।

সখিরূপা শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়া তাঁহারই কৃপা দত্ত নাম, বর্ণ ও সেবোপযুক্ত মঞ্জরী ও দাসীরূপা অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনপন্থার উপদেশ সদ্‌গুরু-চরণান্তিকে বসিয়া শিক্ষণীয়। "সাধকদেহে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাইবে তাহা" গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ভজনের এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তবলে গুরুদত্ত সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি হয়।

অতঃপর সখি ও দাসীবৃন্দ সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীনদীয়া-যুগলের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় ভুবন-মঙ্গল মঙ্গল-আরতি করিলেন। সখি কাঞ্চনা স্বয়ং এই আরতি করিতেছেন—

যথারাগ।

—"আরতি কিয়ে নদীয়া-নাগরী।
অমিতাদি সখি দেয় আয়োজন করি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজয়ে কাঁসরী।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে বোলে গৌরহরি॥
বিশুদ্ধ গোঘৃত ঢালি, সপ্ত প্রদীপ জ্বালি
শ্রীমুখ হেরত মনপ্রাণ ভরি।
সুগন্ধি চন্দন নিয়ে, ধূপ গুগ্‌গুল দিয়ে
আরতি কিয়ে নদীয়া-নাগরী॥
শঙ্খ ভরি সুশীতল, সুবাসিত গঙ্গাজল,
শ্রীঅঙ্গ ধোয়ায়ত সুযতন করি।
অঞ্চল ধরিয়া করে, কত না সোহাগ ভরে,
শ্রীঅঙ্গ মুছায়ত অতি ধীরি ধীরি॥
মল্লিকা মালতি যূঁথি, সুচিকন মালা গাঁথি,
সখিগণ সাজায়ত কিশোর কিশোরী।
ফুল আনি রাশি রাশি, সখিগণ হাসি হাসি,
চারিদিকে ছড়ায়ত বোলে গৌর-হরি॥
সখিগণ হাসি হাসি, প্রেমানন্দে ভাসি ভাসি,
চামর ঢুলায়ত যাই বলিহারি॥"—

যেমন রঙ্গমঞ্চের একটী দৃশ্য অভিনয়ান্তে পট পরিবর্ত্তন হয়, তদ্রূপ সর্ব্ব-মঙ্গলা শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা তিথির শেষ রাত্রির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অপ্রকট-প্রকাশে নদীয়া-যুগল-বিলাস-লীলারঙ্গের এই অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দর্শনান্তর পট-পরিবর্ত্তনে অপ্রকট-প্রকাশ অভিনয়টি যেন সম্পূর্ণ হইল।

অতঃপর উপস্থিত সর্ব্ব ভক্তগণ দেখিতেছেন শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ালিঙ্গিত এবং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-মিলিত-বপু নটবর নাগর শচীনন্দন শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপে" শ্রীমন্দিরে বিচিত্র রত্নবেদীর উপর মণিময় রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। উপস্থিত গৌরভক্তগণ পরম প্রেমানন্দে প্রভাতী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন—

যথারাগ।

—"জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণ-গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিবর্ত্ত বিলাস-যুগল হে!
যাঁহার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
সে ধন উদয় নদীয়ায় হে!
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করে, যে লীলা দর্শন করে,
কর যোড়ে শচীমায়ের দ্বারে হে!"—
(তাঁরা) "নরদেহে জনমিল, গৌরলীলা আস্বাদিতে,
ব্রহ্মা হরিদাস ভেল, শঙ্কর অদ্বৈত ভেল,
জয় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রাণ-গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া,
বিবর্ত্ত-বিলাস-যুগল হে!"—

এই প্রভাতী সঙ্কীর্ত্তনে গৌর-আনা-গোঁসাঞি শান্তিপুর-নাথ অতিবৃদ্ধ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং অভিন্ন-গৌরাঙ্গ অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন গৌর-পার্ষদগণও তাঁহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ-সকলি জানিতেন,—শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের অপ্রকট-প্রকাশ-লীলারঙ্গ দর্শনোদ্দেশে সর্ব্বমঙ্গলা শ্রীশ্রী-গৌর-পূর্ণিমা-তিথির আরাধনা করিতে তাঁহারা শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উপরি উক্ত শেষ পদটির আখরটি স্বয়ং অবধূত শ্রীশ্রীনিতাইচাঁদের দত্ত।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গলে লিখিত আছে—

—"ব্রজে কৃষ্ণ অপ্রকট-পরকাশ-লীলা।
ব্রজজন তুষ্টি হেতু যৈছে প্রকটিলা॥
তৈছে নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র দয়াময়।
প্রকটিলা সেই লীলা আপন ইচ্ছায়॥
বৈষ্ণব-তোষণী আর শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে।
পুরাণাদি শাস্ত্র আর মহাজন সর্ব্বে॥
কৃষ্ণচন্দ্র-অপ্রকট-লীলা-পরকাশ।
বর্ণিলা গোস্বামি শাস্ত্রে করিয়া বিশেষ॥ (১)

---

(১) "শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সন্দর্ভের" শেষভাগ পাঠ করিলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের অপ্রকট-প্রকাশ-লীলারঙ্গের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি সকল দেখিতে পাইবেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পুনর্ন্নবদ্বীপাগমন ও যুগলবিলাসাদির বিষয় শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত না হইবার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু নিজ-জনাধীন।
লীলাচলে অপ্রকট জগন্নাথে লীন॥
সেথা হ'তে নবদ্বীপে পুনরাগমন।
অপ্রকট-পরকাশ শাস্ত্রের কথন॥
বেদগোপ্য কথা এই যে করে শ্রবণ।
অনায়াসে পায় সেই গৌরাঙ্গ-চরণ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
অপ্রকট-পরকাশ গায় হরিদাস।"

এদিকে সাধারণ লোক-চক্ষে এবং লৌকিক ব্যবহারে নবদ্বীপবাসী জনসাধারণ বাল-বৃদ্ধ-যুবা প্রিয়াজির অপ্রকট-সংবাদে গভীর শোকের সাগরে নিমগ্ন হইলেন। নদীয়ার গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি উঠিল—গৌরশূন্য গৌর-গৃহে এতদিন বিরহিণী গৌরবল্লভার কঠোর ভজন-প্রণালীর কথা তাঁহারা লোকমুখে শুনিয়া মনদুঃখে নীরবে অশ্রুপাত করিতেন—এখন গৌরশূন্য গৌরগৃহ একেবারেই অন্ধকার করিয়া গৌর-বক্ষবিলাসিনী অপ্রকট হইলেন। তাৎকালিক নদীয়াবাসী জনসাধারণের অবস্থার কথা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মঙ্গলে যৎকিঞ্চিৎ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। যথা—

—"প্রিয়াজির অপ্রকট সংবাদে নদীয়া।
শোকের সাগরে ভাসে ব্যাকুলিত হিয়া॥
নদেবাসী নরনারী স্থাবর জঙ্গম।
দুখের পাথারে ডুবি বিষাদিত মন॥
নিত্যদাস দাসীগণে সকলে দেখিলা।
অপ্রকট-পরকাশ বেদ-গোপ্য-লীলা॥
শুনিলেক আন্ জনে দেবী-তিরোভাব।
বুঝিলেক মনে মনে যার যেন ভাব॥
ভক্তগণ গৃহে গৃহে উঠে হাহাকার।
এড়িলেক কেহ কেহ শোকে দেহ-ভার॥
নদীয়া-রমণী বহু হইলা বাউরী।
স্নানে আসি গঙ্গাতীরে দেন গড়াগড়ি॥
তেয়াগিয়া লাজ মান বসন ভূষণ।
পাগলিনী ভেল সবে কুলবধূগণ॥
সুরধুনী কাঁন্দে শোক তরঙ্গের ছলে।
পশুপক্ষী কীট কান্দে "বিষ্ণুপ্রিয়া" ব'লে॥
শোকেতে অধীর যত স্থাবর জঙ্গম।
দুখের সাগরে ভাসে উত্তম অধম॥"—

নদীয়ার মহা-গম্ভীরা-লীলা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভের নীলাচল ধামের গম্ভীরা-লীলার বিশিষ্ট পরিশিষ্ট। গৌর বক্ষ-বিলাসিনী বিরহিণী প্রিয়াজির গৌর-বিরহোচ্ছাসপূর্ণ এই যে পরম চমৎকারিতাময়ী অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় কাষ্ঠ-পাষাণ-গলান মর্ম্মভেদী ও প্রাণঘাতী করুণ-রসাত্মক লীলা-কাহিনী—ইহার আভাস মাত্র দিয়া গিয়াছেন পূর্ব্ব রসিকভক্ত মহাজনগণ তাঁহাদের স্বরচিত প্রাচীন পদে—তাহাই এক্ষণে প্রভু-প্রিয়াজির ইচ্ছায় কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে বিবৃত হইল। * প্রভু-প্রিয়াজির যুগলভজননিষ্ঠ যোগ্যতর রসিকভক্ত সাধকগণ অধিকতর যোগ্যতা এবং লিপিচাতুর্য্যের সহিত গৌরবক্ষবিলাসিনী বিরহিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এই বিপ্রলম্ভ-রস-সার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ গৌর-বিরহ-লীলা-কাহিনী আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া কলিহত হতভাগ্য জীবের কাষ্ঠপাষাণবৎ কঠিন হৃদয় দ্রব করাইয়া গৌরভজনোপযোগী করিয়া ধন্য হইবেন। সে আশা দীনাতিদীন এবং সর্ব্বভাবে অযোগ্য গ্রন্থকার মনে মনে অবশ্যই পোষণ করেন।

(১)

শ্রীশ্রীগৌর-বল্লভার শ্রীচরণে প্রার্থনা।

যথারাগ—

—'ওগো বিষ্ণুপ্রিয়ে! করুণা করিয়ে,
(একবার) অধমার প্রতি চাহ গো!
তোমার চরণে, জীবনে মরণে,
মতি যেন মোর থাকে গো!
'তুমি গো আমার, জীবনের সার,
মূর্ত্ত-ভকতি-রূপিণী।

কারণ ও উক্ত সন্দর্ভে শাস্ত্র প্রমাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কৃপাময় পাঠকবৃন্দ "শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব-সন্দর্ভ" শ্রীগ্রন্থখানি কৃপা করিয়া পাঠ করিলে সকলি বুঝিতে পারিবেন। এই নিগূঢ় লীলারহস্য পরোক্ষভাবে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়মিতি"—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

* —"কিছু কিছু পদলিখি, যদি কেহ ইহা দেখি,
প্রকাশ করয়ে গৌর-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥"—
ঠাকুর নরহরি সরকার।

श्रीश्रीगौराङ्ग देव और विष्णुप्रिया

[illegible] Sri Sri Gourang Dev (&) Vishnupriya

Published by—BANDHU SINGH
25 A Mechua Bazar St. Calcutta

प्रकाशक :—बन्धु सिं,
२५-ए, मछुआ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता।

তোমার কৃপায়, পাই গোরারায়,
তুমি গো ভবের তরণী॥
সাধ্য-সাধন, তব শ্রীচরণ,
কলিহত জীব-সম্বল।
প্রেম-ভকতি, তুমি মূর্ত্তিমতী,
শীতল তব পদতল॥
দিয়ে মোর শিরে, উদ্ধার দাসীরে,
চরণের রেণু কর গো।
হরিদাসিয়ার, জীবন-আধার,
(ঐ) রাঙ্গা চরণের রেণু গো॥—"
গৌর-গীতিকা

(২)

—"তোমার দাসীর দাসী হৈতে বাঞ্ছা করি।
ভজন সাধনে মুক্রি নহি অধিকারী॥
তোমার মহিমা সেবা অনন্ত অপার।
এক কণ স্পর্শিমাত্র সে কৃপা তোমার॥
শচী-আঙ্গিনায় মুক্রি ঝাড়ুদারী চাই।
সেই ত জানিহ দেবি! আমার বড়াই॥
দয়া কর দয়াময়ি! দাসী অঙ্গীকারি।
ধৃষ্টতা মূর্খতা ক্রটি সব ক্ষমা করি॥
মূর্ত্তিমতী ক্ষমা তুমি ওগো ক্ষেমঙ্করি!
ক্ষমা কর সর্ব্ব দোষ মাথে পদ ধরি॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ জয় গৌরহরি।
বলিতে বলিতে যেন মরে দাসী হরি॥
তোমার চরণ-পদ্ম হৃদে অভিলাষি!
নদীয়া-গম্ভীরা-লীলা গায় হরিদাসী॥"
গৌর-গীতিকা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভ-চরণে প্রার্থনা

-"সকল নিগম-সারঃ পূর্ণ-পূর্ণাবতারঃ
কলি-কলুষ-বিনাশঃ-প্রেম-ভক্তিপ্রকাশঃ।
প্রিয় সহচরসঙ্গে রঙ্গভঙ্গ্যা-বিলাসী
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ॥

বহুবিধ মণিমালা বদ্ধকেশো বিচিত্রো
মলয়জ তিলকোজ্জ্বাল দেশোহলকালিঃ
শ্রবণ-যুগল লোলং কুণ্ডলো হারবক্ষাঃ
স্ফুরতু হৃদয় মধ্যে গৌরচন্দ্রো নটেন্দ্রঃ॥

ন ধনং ন যশো ন কুলং ন তপো
ন জনং ন শুভং ন সুতং ন সুখং।
চরণে শরণং তব গৌরহরে
মম জন্মনি জন্মনি দেহি বরং॥

নানা ক্লেশ ময়া যুক্তং স্মৃতিহীনঞ্চ মাং প্রভো!
ভবভীতাদ্ গৌরচন্দ্র ত্রাহি ত্রাহি কৃপানিধে!
অনেক জন্ম ভ্রমণে মনুষ্যোহহং ভবন্ কলৌ।
ব্যাকুলাত্মা পদাব্জে তে শরণং রক্ষ মাং প্রভো॥

কাতরং পতিতং শোচ্যং ত্রাহি মাং শ্রীশচীসূত।
সর্ব্বে প্রেমসুখে মগ্না বঞ্চিতং মা কুরু প্রভো॥
সর্ব্বেষাং পাপযুক্তানাং ত্রাতুং শক্তোহন্য দৈবতঃ
মমোদ্ধারে প্রভু গৌরো যতঃ পতিতপাবনঃ॥

চরণ-দ্বন্দ্বে যাচে যাচে পুনঃ পুনঃ।
জীবনে মরণে বাপি তব রূপং বিচিন্তয়ে॥

কৃষ্ণ ত্বং দ্বাপরে শ্যামং কলৌ গৌরাঙ্গবিগ্রহং।
ধৃত্বাহশেষ জনান্ প্রেমভক্তিং যচ্ছসি লীলয়া॥